হর-পার্ব্বতী

(প্রাচীন কাংড়া)

ষড়বিংশ বর্ষ
১৩৪৮ সাল

কার্ত্তিক

দ্বিতীয় খণ্ড
১ম সংখ্যা

দুর্গোৎসব

বাঙালী মায়ের পূজা করে নাই, করিয়াছিল উৎসব—অহ মিকার প্রদর্শনী। সে উৎসবের হাট ভাঙ্গিয়াছে, প্রদর্শনীর র শেষ হইয়াছে। আজ বাঙালী অবসন্ন। বাংলার আশা ও উদ্যম তার দুর্ব্বার সংগ্রাম-শক্তি আজ যেন নিস্তেজ, নিষ্প্রভ। যোদ্ধা প্রাণের তূণ আজ শূন্য। তার হৃদয়ের কল্যাণ-শ্রদ্ধা নির্ব্বাপিত প্রায়। এ বিরাট্ আঁধার ভেদ করিয়া আবার কি বিদ্যুৎ ঝিলি দিয়া ফুটিবে? নবারুণের জ্যোতিঃ-প্রবাহ নামিয়া আসিবে জাতির ধমনীতে আবার কি দৈবশক্তি জাগিয়া উঠিবে?

পঞ্চকোটী বাঙালী, নয়নের কুহেলী দূর কর। আজ দশ কোটী ভুজ ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া, উচ্চ কণ্ঠে হাঁকিয়া বল—

"সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।"

—আর মহামহিমময়ী দেশমাতৃকার চরণতলে নত হইয়া এক হও বীরজাতি, মায়েরই নিকট জ্ঞান, প্রেম, শক্তি, অসীম করুণ যাচিয়া লও। হৃদয়ের হিংসা-দ্বেষ দূর করিয়া সেথা শুদ্ধা ভক্তি জাগ্রত কর।

পঞ্চ কোটী সন্তানের হৃদয়ের পুঞ্জীভূত ভক্তি জমাট হইয়া যে মহাভাব সৃষ্টি করিবে, যে মহাশক্তির উদ্ভব হইবে, তাহাই বঙ্গের দুর্গোৎসব।

—শ্রীম

আমরা এই অবিচল শ্রদ্ধা ও প্রত্যয় লইয়াই যুগ-সন্ধিক্ষণে, মহাশক্তির অংশসম্ভূত, দেবমাতার আশীষপূত, সিংহ-বাহিনীর বরপুত্র তরুণ বাঙালী জাতিকে আহ্বান করিতেছি—শক্তির উপাসনা কর, শুদ্ধ, নিষ্কাম, ধৃতবীর্য্য দেহে দেবী চণ্ডিকাকে আবাহন কর—অভয়া বরদায়ি বরাভয় লাভ করিয়া, মাতৃ-প্রেমে অভিষিক্ত, মাতৃসে সিদ্ধকাম হও। ভারতের সংস্কৃতি-রক্ষা ও জগতে ধর্ম্মরা প্রতিষ্ঠার চিহ্নিত বীরজাতি তোমরাই।

চামুণ্ডা

(অপ্রকাশিত রচনা)

পণ্ডিত ৺অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

চামুণ্ডা অতি প্রাচীন দেবতা। প্রাচীন হইলেও রামায়ণ-মহাভারতযুগের পূর্ব্বের বা তদ্‌যুগের নয়, কেননা বৈদিক সাহিত্যে কোথাও 'চামুণ্ডা' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় না। রামায়ণ বা মহাভারতে কোথাও চামুণ্ডার কথার ইঙ্গিতও নাই। পুরাণেই সর্ব্বপ্রথম আমরা চামুণ্ডার পরিচয় পাই। কিন্তু অতি প্রাচীন পুরাণ—ব্রহ্ম, বায়ু বা বিষ্ণু-পুরাণে চামুণ্ডার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। তবে পরবর্ত্তী অনেকগুলি পুরাণে চামুণ্ডা-সম্বন্ধে অনেক বিবরণ জানিতে পারা যায়। তন্ত্র-সাহিত্যেও চামুণ্ডা-সম্বন্ধে যথেষ্ট উপাদান আছে।* বশীকরণাদি অভিচার-ব্যাপারে চামুণ্ডার বহু মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। বাৎস্যায়নের পরবর্ত্তী কামশাস্ত্রের গ্রন্থে নায়ক-নায়িকার অভিচারাদি-ক্রিয়ায় চামুণ্ডা-মন্ত্র স দেখিতে পাওয়া যায়। চামুণ্ডা-তত্ত্বনির্ণয়ে তন্ত্র হইতে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ভিন্ন তন্ত্রের কাল-সম্বন্ধে আলোচনা সহজসাধ্য ন সুতরাং আপাততঃ চামুণ্ডা-সম্বন্ধে তন্ত্রের আলো স্থগিত রাখিলাম।

সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে ৮ম শতকের প্রথম প ভবভূতির 'মালতী-মাধব' নাটকের পঞ্চমাঙ্কে (২২ শ্লো সর্ব্বপ্রথম কাপালিক অঘোরঘণ্টদ্বারা চামুণ্ডার পূ কথা আছে। অঘোরঘণ্ট মালতীকে দেবী চামুণ্ডার নি বলি দিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে মাধব মালতীকে উ করেন। চামুণ্ডা-মন্দিরের অস্তিত্ব মালতী-মাধবে দেখি পাওয়া যায়। অঘোরঘণ্ট চামুণ্ডার ধ্যান করিতেছেন—

'চামুণ্ডে ভগবতি সাধনাদাবুদ্দিষ্টামুপনিহিতাং ভজস্ব পূজাম্।'

—মালতী-মাধব ৫.

চামুণ্ডাদেবীর পূজার ব্যবস্থা প্রভৃতিও নানা হইতে জানিতে পারা যায়। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন হইতে আমাদের দেশে দুর্গোৎসবে প্রথমে চামুণ্ডার প করিয়া দুর্গাদেবীর পূজা করিতে হয়। 'তন্ত্রসারে' চামু পূজার ধ্যানাদি প্রদত্ত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ঐতিহা গ্রন্থ—কহ্লনের 'রাজতরঙ্গিণী'র তৃতীয় তরঙ্গে ৪৬ শ্লো চামুণ্ডার কথা আছে। ইহার পূর্ব্বের কয়েকটী শ্লো মেঘবাহন রাজা এক কিরাতকে চামুণ্ডাদেবীর ম নরবলি দিতে উদ্যত দেখিয়া তাঁহার নিজের কর্ত্তব্য করিয়াছিলেন। সপ্তম তরঙ্গে ১১০৭ শ্লোকেও পু চামুণ্ডার কথা দেখিতে পাওয়া যায়।

---

* 'চামুণ্ডা' শব্দের নিরুক্তি-সম্বন্ধে নানা মত আছে। মতবিশেষে পাওয়া যায়—'যস্মাচ্চণ্ডং চ মুণ্ডং চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা। চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবি ভবিষ্যতি।' হেমচন্দ্র সূরি বলেন—'চর্ম্মমুণ্ডা চণ্ডমুণ্ডা চামুণ্ডা'। ত্রিকাণ্ডেও (১. ১. ৬৩) অনুরূপ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। শান্তনবী-নিরুক্তি এইরূপ—

'ততঃ পৃষোদরাদিত্বাচ্ছিষ্টশব্দপ্রয়াগতঃ।
চণ্ডশব্দস্ত চাদেন চামুণ্ডেতি প্রসিদ্ধতি।'—৭. ২৫

ব্যাখ্যান্তরে পাওয়া যায়—

'চান্ তস্করান্ মুণ্ডয়তি খণ্ডয়তি চ
চামুণ্ডা চামুণ্ডৈব চামুণ্ডেতি।'

দংশোদ্ধার বলেন—

'চানাং চৌরাণাং মুণ্ডঃ খণ্ডনং যস্তাঃ। মুণ্ডি খণ্ডনে।'

একাক্ষরকোষে চ-শব্দের অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে—

'চন্দ্রমাশ্চ সমাখ্যাতস্তস্করশ্চ উদাহৃতঃ।'

চামুণ্ডা মাতৃকা-দেবী। হেমচন্দ্রের 'অভিধানচিন্তামণি' (২০১) ও কেশবের 'কল্পদ্রুকোষে' অষ্টমাতৃকার অন্তর্গত বলিয়া চামুণ্ডার উল্লেখ আছে। কল্পদ্রুকোষে দেখা যায়—

'ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈন্দ্রী কৌমারী বৈষ্ণবী তথা।
বারাহী চণ্ডী চামুণ্ডা মাতরোষ্টাবতঃ পরাঃ' ॥—৩৯১. ১০৫।

চামুণ্ডার উৎপত্তি-সম্বন্ধে আলোচনা করিলেও, তাঁহাকে আমরা মাতৃকারূপেই দেখিতে পাই। অধিকাংশ পুরাণে সপ্তমাতৃকার কথা আছে—তাঁহারা ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী ও চামুণ্ডা। বরাহ-পুরাণে মাতৃকার সংখ্যা আট। 'প্রপঞ্চসারতন্ত্রে'ও (৭. ১১) চামুণ্ডাকে অষ্টমাতৃকার অন্তর্গত বলা হইয়াছে। উহাতে যোগেশ্বরী অষ্টম মাতৃকা। বরাহপুরাণে বলা হইয়াছে, অষ্টমাতৃকা অষ্ট-ভাবের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। যোগেশ্বরী কামের অধিষ্ঠাত্রী, মাহেশ্বরী ক্রোধের, বৈষ্ণবী লোভ, ব্রহ্মাণী মদ, কৌমারী মোহ, ইন্দ্রাণী মাৎসর্য, বারাহী অসূয়া এবং যমী বা চামুণ্ডা পৈশুন্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এলোরা, কুম্ভকোনম্, বরাবর-পাহাড়, বেলামন্দির প্রভৃতি স্থানে অষ্টমাতৃকার ক্ষোদিত মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

মাতৃকাদেবীর পূজা ভারতবর্ষে বহু প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই মাতৃকাপূজা-সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মত এই যে, এই পূজা আমরা দ্রবিড়দিগের নিকট হইতে পাইয়াছি। মাতৃকাদেবীর পূজায় দ্রবিড়-প্রভাব অতি স্পষ্ট। মাতৃকাপূজা দ্রবিড়-জাতির একটী বৈশিষ্ট্য। প্রধানতঃ যুগপৎ ভয়ঙ্কর-ভাবের সহিত অভয়-ভাবের বিকাশ ও প্রসন্নভাব দ্রবিড় মাতৃকাদেবীর বিশেষত্ব। কিন্তু দ্রবিড়দিগের প্রভাব-সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে; এখানে আমরা তাহার আলোচনা করিব না।

শিবপত্নী রুদ্রাণী বা মৃড়ানী—উমা, গৌরী, পার্বতী, দুর্গা, ভবানী, কালী, কপালিনী, চামুণ্ডা প্রভৃতি নামে পরিচিতা। উমা, পার্বতী, গৌরী প্রভৃতি গৌরবর্ণা এবং কালী, দুর্গা, কপালিনী, চণ্ডা, চামুণ্ডা, করলা প্রভৃতি কৃষ্ণা। রুদ্রাণীর প্রসন্ন অথচ মহাভয়ঙ্কর বহু রূপ বর্তমান; তন্মধ্যে ভয়ঙ্করমূর্তিনিচয়ে চামুণ্ডার অভয়মূর্তি অন্যতমা। অনেক স্থানে দেখা যায়, দেখিতে পাওয়া কালীর আখ্যায়িকার সহিত চামুণ্ডার আখ্যায়িকা জড়িত। চামুণ্ডা দৈত্য-বিনাশিনী। তাঁহার প্রসন্নমূর্তির মধ্যে সর্বমঙ্গলা, শাকম্ভরী, রক্ষাকালী প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

দেবী চামুণ্ডা শিবানী হইতে উদ্ভূতা। মার্কণ্ডেয়-পুরাণে (৮৭ অঃ) দেবীমাহাত্ম্যে দেবী-কর্তৃক শুম্ভ ও নিশুম্ভকে নিধন করিবার কালে চামুণ্ডার উৎপত্তির কাহিনী আছে। শুম্ভ ও নিশুম্ভ দেবগণকে বিধ্বস্ত ও বিতাড়িত করিয়া ত্রিভুবনে তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তার করেন। তখন দেবী পার্বতী গঙ্গাস্নানে আগমন করিলে, দেবগণ অসুর-অত্যাচারের প্রতীকারের জন্য তাঁহার শরণাপন্ন হন। তখন পার্বতীর দেহ হইতে অম্বিকা বা চণ্ডিকা দেবীর আবির্ভাব হয়। শুম্ভ চণ্ডিকার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু দেবী বলেন, যুদ্ধে তাঁহাকে পরাভূত করিলে তিনি বিবাহে সম্মতি দিবেন। ইহাতে চণ্ডিকার সহিত শুম্ভের যুদ্ধ হয়। শুম্ভ-প্রেরিত ধূম্রলোচন সসৈন্য দেবীর হস্তে নিহত হইলে চণ্ড ও মুণ্ডকে শুম্ভ প্রেরণ করেন। চণ্ড-মুণ্ডকে দেখিয়া দেবী অতিশয় ক্রুদ্ধা হন এবং তাঁহার ললাটদেশ হইতে ভীষণদর্শনা কালীর আবির্ভাব হয়। কালীর শরীর শীর্ণ, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, কণ্ঠে দোদুল্যমান নর-কপালমালা এবং মুখবিবর হইতে দীর্ঘ জিহ্বা প্রলম্বিত। এই কালী চণ্ড-মুণ্ডকে ভীষণ যুদ্ধে নিহত করিলেন এবং তখন হইতেই তিনি চামুণ্ডা নামে প্রখ্যাতা হইলেন। চণ্ড-মুণ্ডের নিধনের পর যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং শুম্ভ অবতীর্ণ হইলেন, আর তাঁহার সহিত আসিলেন নিশুম্ভ। শুম্ভের সেনাপতি রক্তবীজ যুদ্ধক্ষেত্রে আতঙ্ক উপস্থিত করিল। রক্তবীজকে সংহার করিলে তাহার রক্ত ভূতলে পড়িবা-মাত্র অসংখ্য রক্তবীজের উৎপত্তি হয় দেখিয়া চণ্ডিকা চামুণ্ডাকে রক্তবীজের রক্ত ভূতলে পতিত হইবার পূর্বেই উহা পান করিবার আদেশ দিলেন। চামুণ্ডা সেইরূপ করিয়া রক্তবীজের উচ্ছেদ সাধন করিলেন। অতঃপর শুম্ভ-নিশুম্ভও নিহত হন।

বামনপুরাণে (৫৫ অঃ) অনুরূপ আখ্যান থাকিলেও, কিছু বৈষম্য আছে। উহাতে দেখা যায়, শুম্ভ ও নিশুম্ভ মহাদেবী-কর্তৃক নিহত মহিষাসুরের অমাত্য চণ্ড ও

মুণ্ডকে সলিলগর্ভ হইতে উদ্ধার করিবার পর, মহাদেবীকে বিবাহ করিবার মানসে তাঁহাকে বলপূর্বক ধরিয়া আনিবার জন্য ধূম্রলোচনকে প্রেরণ করেন। ইতঃপূর্বে ত্রিভুবন শুম্ভ-নিশুম্ভের অধিকারে আসিয়াছিল। ধূম্রলোচন আসিলে, দেবী তাহাকে সসৈন্য ভস্ম করিয়া ফেলেন। তখন শুম্ভ চণ্ড, মুণ্ড ও রুরুকে প্রেরণ করিলেন। তাহাদের দেখিয়া ক্রুদ্ধা দেবীর ললাট হইতে যোগিনী কালীর উৎপত্তি হইল এবং এই কালী রুরুকে নিহত করিলেন। অতঃপর মহাদেবীর একগাছি জটা হইতে অর্ধকৃষ্ণা ও অর্ধশুক্লা এক নারী-মূর্তি আবির্ভূতা হইলেন, দেবী তাঁহার নাম রাখিলেন চণ্ডমারী। চণ্ডমারী দেবীর আদেশে চণ্ড-মুণ্ডকে ভীষণ যুদ্ধে দমন করিয়া দেবীর নিকট ধরিয়া আনেন। দেবী তাহাদের মস্তক ছিন্ন করিলে, চণ্ডমারী তাঁহাদের ছিন্ন মস্তকদ্বারা শেখর রচনা করিয়া কৌশিকীর নিকট আগমন করেন। চণ্ড-মুণ্ডের ছিন্ন মস্তকের মালা পরিয়াছিলেন বলিয়া তদবধি তাঁহার নাম হইল চামুণ্ডা।'

মৎস্যপুরাণে (১৭৯ অঃ) অন্ধকাসুরের কাহিনীতে অনুরূপ ঘটনা দেখা যায়। হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু কশ্যপের ঔরসে ও দিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু বরাহ-অবতারে হিরণ্যাক্ষকে নিহত করেন। হিরণ্যকশিপুও বিষ্ণু-কর্তৃক নৃসিংহ-অবতারে নিহত হন। হিরণ্যাক্ষের পুত্র প্রহ্লাদ ভক্ত হইয়া সংসার ত্যাগ করেন। প্রহ্লাদের পর অন্ধকাসুর অসুরগণকে শাসন করেন। কৃচ্ছ্রসাধনদ্বারা তিনি ব্রহ্মার নিকট হইতে কয়েকটী বর লাভ করেন। ক্রমে তিনি মহাপ্রতাপশালী হইয়া উঠেন। তিনি দেবগণের প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিলেন। দেবগণ কৈলাসে গিয়া শিবের নিকট সমস্ত জানাইলেন। অন্ধকাসুরও কৈলাসে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে অন্ধক পার্বতীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন। তজ্জন্য 'মহাকাল' নামক অরণ্যে তাঁহার সহিত মহাদেবের ভীষণ যুদ্ধ হয়। অবশেষে মহাদেব পাশুপত অস্ত্রধারা অন্ধককে আঘাত করিলেন। অন্ধকের দেহ হইতে অজস্র রুধির নিঃসৃত হইতে লাগিল; তাঁহার রক্তবিন্দু যেমন মৃত্তিকা স্পর্শ করিল অমনি সেই রুধির হইতে অসংখ্য অন্ধকাসুর আবির্ভূত হইল। সেই সকল অন্ধক বিদারিত হইলে, তাহাদের রুধির হইতেও বহুসংখ্যক অন্ধক উৎপন্ন হইল। তখন মহাদেব সেই রুধির পান করিবার জন্য মুখাগ্নি হইতে 'যোগেশ্বরী' নামে এক শক্তির সৃষ্টি করিলেন। ইন্দ্রাদি সপ্তদেবগণও তখন তাঁহাদের স্ব স্ব শক্তি প্রেরণ করিলেন। এই সপ্ত-শক্তিগণই সপ্তমাতৃকা নামে অভিহিতা; যোগেশ্বরী অষ্টম মাতৃকা।

মার্কণ্ডেয়-পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, দেবী পার্বতী হইতে অসুর-বিনাশের জন্য দশমহাবিদ্যার আবির্ভাব হয়। ছিন্নমস্তা এই দশমহাবিদ্যারই অন্যতমা। ছিন্নমস্তাই পরবর্তী কালে চামুণ্ডা বা চাউণ্ডা নামে পরিচিতা হইয়াছেন।

স্কন্দপুরাণে (আবন্ত্যঃ, অবন্তীঃ, ৩৭ অঃ) চামুণ্ডা দৈত্যবধের জন্য আহূত মন্ত্রণাসভায় শিবের শরীর হইতে প্রকাশিতা শক্তি। এই পুরাণে অন্ধকাসুরবধ-বর্ণনার অধিকাংশই মার্কণ্ডেয় ও বামনপুরাণের অনুরূপ; তবে চামুণ্ডোৎপত্তি অন্য প্রকারের। অসুরদের প্রহারে পীড়িত হইয়া মহাদেব সিংহনাদ করেন। তাহাতে পাপাত্মা অসুরগণ মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হয়, কিন্তু পরে উঠিয়া পুনরায় তাহারা মহাদেবকে তাড়িত করে। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ তাহাদিগকে দুর্দমনীয় মনে করেন এবং প্রতিবিধানের জন্য এক মন্ত্রণাসভা আহ্বান করেন। ঐ সভায় 'এক স্ত্রী সৃষ্টি করিতে হইবে' ইহাই নিরূপণ করিয়া ব্রহ্মা স্বয়ং হংসাননা এক রমণীর সৃষ্টি করিলেন। সেই রমণী এইরূপ—

> 'চতুর্বক্ত্রাং চতুর্হস্তাং ব্রহ্মাণীং রূপধারিণীম্।১৯
> কুমারশ্চৈব কৌমারীং ময়ূরবরবাহনাম্।
> রক্তমাল্যাম্বরধরাং শক্তিকুক্কুটধারিণীম্।'২০

পুনরায় কুমার-কৌমারী শক্তি সৃষ্টি করেন—

> পুনঃ কুমারঃ কৌমারীং পক্ষীন্দ্রবরবাহনাম্।
> কৃষ্ণাং করালবদনাং ধর্মরাজস্তবাহনীম্।২১
> দৈত্যদেহপ্রমথনীং দণ্ডমুদ্গরধারিণীম্।
> ললাটলোচনাং নীলাং কপালকরভূষণাম্।২২
> সিংহাজিনধরাং কৃষ্ণাং সর্বভূষণভূষিতাম্।
> কর্ত্রীহস্তাং খড়্গহস্তাং খেটখট্বাঙ্গধারিণীম্।
> চর্মাস্থিকেশবপুষং চামুণ্ডামসৃজৎ প্রভুঃ।' ২৩

স্কন্দপুরাণে (মাহেঃ, কেদারঃ, ৩. ৪৯-৫০) অন্যত্র বর্ণিত আছে, দক্ষযজ্ঞ নাশ করিবার জন্য মহাদেব বীরভদ্রকে প্রেরণ করেন। বীরভদ্রের সহিত নবদুর্গা আগমন করেন। চামুণ্ডা এই নবদুর্গার অন্যতমা।

দেবীপুরাণে (৩৭ অঃ) চামুণ্ডার আবির্ভাব একেবারে অন্য প্রকার। রুরুদৈত্যের চর্ম ও মুণ্ড, ব্রহ্মশির, স্বামিমুণ্ড ধারণপূর্বক বীভৎস বলিয়া তথায় মাতৃগণের প্রবরা দেবী চামুণ্ডা নামে খ্যাতা হইয়াছেন।

মূর্তিতত্ত্বে চামুণ্ডা

মূর্তিতত্ত্বে চামুণ্ডা-সম্বন্ধে এইবার কিছু বলিব। চামুণ্ডার মূর্তি ও প্রকারভেদ-সম্বন্ধে অগ্নিপুরাণ, বিষ্ণুধর্মোত্তর, অংশুভেদাগম, পূর্বকারণাগম ও রূপমণ্ডনে বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। চামুণ্ডার মূর্তি সাধারণতঃ দণ্ডায়মানা, আসীনা বা নৃত্যপরায়ণা। চামুণ্ডা-মূর্তি নয় প্রকার। ১ম, রুদ্র-চর্চিকা। ইনি উর্দ্ধ্বাস্যপাদশালিনী। পরিধানে— গজচর্ম। ইঁহার হাত আটটী। ইনি

'গজচর্মধৃদুর্দ্ধাস্যপাদা স্যাদ্রুদ্রচর্চিকা।
সৈব চাষ্টভুজা দেবী শিরোডমরুকান্বিতা।'—অগ্নিপুরাণ ৫০. ৩১।

এই বর্ণনার অনুরূপ মূর্তি কোথাও পাওয়া যায় নাই। তবে বরেন্দ্রের প্রত্নশালায় ২টী মূর্তি আছে। সে দু'টীতে বর্ণনার সহিত কিছু মিলও আছে। মূর্তি দু'টী ষড়্‌ভুজা— অষ্টভুজা নয়। একটী তালিকার $\frac{D\ (d)\ 7}{334}$ সংখ্যক মূর্তি; অপরটী $\frac{D\ (d)\ 10}{240}$ সংখ্যক মূর্তি—এই মূর্তিটীতে খ্রীষ্টীয় ১১শ।১২শ শতকের প্রাচীন অক্ষরে ক্ষোদিত আছে 'চর্চিকা'।

২। দ্বিতীয় প্রকার মূর্তির নাম—রুদ্রচামুণ্ডা

'.........শিরোডমরুকান্বিতা।৩১
তেন সা রুদ্রচামুণ্ডা নাদেশ্বর্যথ নৃত্যতী।'৩২

এইরূপ চামুণ্ডামূর্তি কোথাও আছে বলিয়া আমার জানা নাই।

৩। তৃতীয় প্রকার-ভেদ—(ক) মহালক্ষ্মী।

অগ্নিপুরাণ (৫০. ৩২) বলেন—

'ইয়মেব মহালক্ষ্মীরূপবিষ্টা চতুর্মুখী।

(খ) মহাকালী। 'কঙ্কালমালিনীতন্ত্রে' (৪ পটল) ইঁহার বর্ণনা এইরূপ—

'নীলেন্দীবরবর্ণিনী সুগ্মাপীনতুঙ্গস্তনীম্।
মুণ্ডশ্রীহরিপীঠরাজিতত্রতীং ভীমাং ত্রিনেত্রাং শিবাম্॥
মুণ্ডাখড়্গাকরাং বরাভয়যুতাং চিত্রাম্বরোদ্দীপনীম্।
বন্দে চঞ্চচন্দ্রকান্তমণিভির্মালাং দধানাং পরাম্॥'

'সারদাতিলকে'র ২২ পটলে আছে—

কালাম্বুদাভামসিলম্বশূন্যগলাচাহন্তাং তরুণেন্দুচূড়াম্।
ভীমাং ত্রিনেত্রাং জিতশত্রুবর্গাং দেবীং স্মরেৎ দুর্গাতভঞ্জহন্তাম্॥'১০৪

এই দুইটী বর্ণনার অনুরূপ মূর্তি Mayur. Arch. Sur., Vol. I, lxvi, lxviii পৃষ্ঠায় আছে। Plate No. 30, 30A.

৪। চতুর্থ প্রকার মূর্তির নাম—সিদ্ধচামুণ্ডা। অগ্নিপুরাণে (৫০ অঃ) ইঁহার বর্ণনা এইরূপ—

'নৃবাজিমহিষেভাংশ্চ খাদন্তী চ করে স্থিতান্।
দশবাহুস্ত্রিনেত্রা চ শস্ত্রাসিডমরুত্রিকম্॥৩৩
বিভ্রতী দক্ষিণে হস্তে বামে ঘণ্টাং খেটকম্।
খট্বাঙ্গং ত্রিশূলঞ্চ সিদ্ধচামুণ্ডকাহ্বয়া॥৩৪
সিদ্ধযোগেশ্বরী দেবী সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িকা।'

ইঁনি হস্তস্থিত নৃ, বাজী, মহিষ ও গজসকল ভক্ষণ করিতেছেন। ইঁহার বাহু দশ ও নয়ন তিন। দক্ষিণ হস্তে শস্ত্র, অসি ও ডমরু এবং বাম হস্তে ঘণ্টা, খেটক, খট্বাঙ্গ ও ত্রিশূল। ইনি সিদ্ধযোগের ঈশ্বরী এবং ইনি সর্বসিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন।

রাজসাহীর বরেন্দ্র-প্রত্নশালায় চারিটী সিদ্ধচামুণ্ডার মূর্তি আছে। ১, ৩, ৫, ৬ সংখ্যক মূর্তি। 'বীরভূমবিবরণ' দ্বিতীয় খণ্ডের ১৪৪ পৃঃ আসীনা ও দণ্ডায়মানা সিদ্ধচামুণ্ডার চিত্র আছে।

৫। পঞ্চম মূর্তি—রূপবিদ্যা।

'এতদ্রূপা ভবেদন্যা পাশাঙ্কুশযুতারুণা।
ভৈরবী রূপবিদ্যা তু ভুজৈর্দশভির্যুতা॥'
—অগ্নিপুরাণ ৫০, ৩৬।

রূপবিদ্যা—রক্তবর্ণা, দশভুজা। ইঁহার এক হস্তে পাশ, এক হস্তে অঙ্কুশ। অপর আটটী হস্তে কি থাকিবে তাহার উল্লেখ নাই। বরেন্দ্র-প্রত্নশালায় ২ সংখ্যক মূর্তি রূপবিদ্যার। সাধারণতঃ এই মূর্তি দণ্ডায়মানা হইলে নাম হয় সিদ্ধযোগেশ্বরী, আসীনা হইলে রূপবিদ্যা।

৬। ষষ্ঠ প্রকার মূর্তি—ক্ষমা। ইনি বৃদ্ধা, বিবৃতাননা, দ্বিভুজা।

'ক্ষমা শিবাবৃতা বৃদ্ধা দ্বিভুজা বিবৃতাননা।'—অগ্নিপুরাণ ৫০. ৩৭।

৭। সপ্তম মূর্তি—দন্তুরা।

'দন্তুরা ক্ষেমকারী স্যাদ্‌ভূমৌ জানুকরা স্থিতা'। —ঐ, ৩৭।

জানুকরাস্থিতা এইরূপ একটী আসীনা মূর্তি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে আছে। ইহা পরিষদের প্রত্নশালার $\frac{J(b)2}{380}$ সংখ্যক মূর্তি। Pl. XX.

৮। অষ্টম মূর্তি-ভেদ—(ক) কালিকা। মৎস্যপুরাণে (২৬১) ইহার বর্ণনা এইরূপ—

'দিগ্বাসাঃ কালিকা তদ্বদ্‌রাসভস্থা কপালিনী। ৩৭

সুরক্তপুষ্পাভরণা বর্দ্ধনীধ্বজসংযুতা।' ৩৮

চামুণ্ডা যখন কালিকা-মূর্তি পরিগ্রহ করেন, তখন তিনি দিগ্‌বাসা, রাসভবাহিনী ও কপালধারিণী এবং বর্দ্ধনীযুক্ত-ধ্বজ ও রক্তপুষ্পাভরণা হইয়া থাকেন।

বরেন্দ্র-প্রত্নশালায় ৯ সংখ্যক মূর্তিই এই 'কালিকা'। প্রাচীন অক্ষরে ক্ষোদিত আছে—'পিশিভাসানা'।

(খ) কুব্জিকা। অগ্নিপুরাণে (১৪৪.) ইহার মূর্তির বর্ণনা এইরূপ—

নীলোৎপলদলশ্যামা ষড়্‌বক্ত্রা ষট্‌প্রকারিকা॥৩০

চিচ্ছক্তিরষ্টাদশাখ্যা বাহুদ্বাদশসংযুতা।

সিংহাসনসুখাসীনা প্রেতপদ্মোপরিস্থিতা॥৩১

কুলকোটিসহস্রাঢ্যা কর্কোটো মেখলাস্থিতঃ॥৩২

শাস্ত্রান্তরে চামুণ্ডার অনুরূপ প্রকারভেদ আছে। 'বিষ্ণুধর্মোত্তরে' বারুণী-চামুণ্ডার বর্ণনা আছে। বারুণী-চামুণ্ডা লম্বোদরী, রক্তাম্বরা, লোলপয়োধরা। তাঁহার হস্তে শূল ও বাণ। বারুণী দেবী অতি সুন্দরী। তবে তাঁহার হাত অনেকগুলি, আর হাতের নখগুলি খুব বড় বড়। চামুণ্ডা সকল জীবকে বশ করিয়া থাকেন।

'রূপমণ্ডনে' রক্তচামুণ্ডার বিবৃতি আছে। ইহাতে, রক্তচামুণ্ডার নামান্তর যোগীশ্বরী। ইঁহার চারি হস্ত। হস্তের প্রহরণ—খড়্গ, পাত্র, মুষল ও লাঙ্গল। দেবী সমগ্র জগৎ—স্থাবর ও জঙ্গম ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন। যিনি ইঁহার পূজা করেন তিনিও চরাচরব্যাপ্ত হন।

ঢাকা-প্রত্নশালায় দ্বাদশভুজা সিদ্ধযোগেশ্বরীর একটী মূচামুণ্ডা-র্তি আছে। ইনি কুব্জিকা না হইলেও কিছু সাদৃশ্য আছে। মূর্তি সংখ্যা—$3\frac{B(ii)h}{1}$। আর একটী চামুণ্ডা-মূর্তি $3\frac{6(ii)h}{2}$ সংখ্যক মূর্তি।*

সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত মূর্তিটী ষড়্‌ভুজা চামুণ্ডা-মূর্তি। এই মূর্তিটী দৈর্ঘ্যে ২১" এবং প্রস্থে ১৩¼"। মূর্তিটী ললিতক্ষেপমুদ্রায় আসীনা। মূর্তিটীর সর্বাঙ্গে কঙ্কাল পরিস্ফুট। চক্ষু কোটরগত, তারা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। দেবী ব্যাদিতাননা, প্রকটদশনা। মুখের সৃক্কদ্বয় বিবৃত। শির ও কর্ণভূষণ অস্পষ্ট। দক্ষিণের এক হস্তে নরকপাল—ইহা বক্ষঃসংলগ্ন; অপর দুই হস্ত ভগ্ন। বামে—এক হস্তে খট্বাঙ্গ, অপর হস্তে বাম হাঁটুর উপর অসুর-মুণ্ড। অন্য হস্ত উর্দ্ধে—করতলে অক্ষমালা। সম্ভবতঃ নরমুণ্ডমালা স্কন্ধ হইতে বিলম্বিত হইয়া দক্ষিণ বাহুর উর্দ্ধদেশের উপর ও নিম্নাংশের নিম্ন দিয়া নাভির নিম্নদেশ দিয়া বাম দিকে গিয়াছে—কোথায় শেষ হইল তাহার চিহ্ন নাই।

মূর্তিটীর দুইটী স্তর। উপরিস্তরে মহাম্বুজোপরি আসীনা চামুণ্ডা-মূর্তি। নিম্নস্তরে দক্ষিণে—একটী শয়নাবস্থায় নগ্ন পুরুষমূর্তি; ইহার শিরোভূষণ আছে বলিয়া বোধ হয়—ইহার নাভিমূল হইতে একটী সনাল পদ্ম নির্গত হইয়া মহাম্বুজপীঠ নির্মাণ করিয়াছে। মহাম্বুজোপরি দেবী আসীনা। বামে তিনটী উপাসিকা উপবিষ্টা।

বাঙলার বাহিরে নানা স্থানে চামুণ্ডার মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কাশীতে একটী চামুণ্ডামূর্তি আছে। এ মূর্তিটী শবোপরি সমাসীনা বৃদ্ধা। ইঁহার স্কন্ধদেশ পর্যন্ত খট্বাঙ্গ প্রলম্বিত। দক্ষিণ হস্তে পাত্র—সম্ভবতঃ ইনি রক্তপানোদ্যতা। দ্বিতীয় দক্ষিণ হস্তে খড়্গ ও দ্বিতীয় বাম হস্তে নরকপাল।—Arch. Sur. of India, 1903-4 III, 309. মান্দোরে নরমুণ্ডমালা-বিভূষিতা, শবোপরি সমাসীনা একটী চামুণ্ডার মূর্তি পাওয়া গিয়াছে।—Arch. Sur. of India, 1909, IX, 93-4. ওসিয়ায় যে সমস্ত মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে চতুর্ভুজা পদ্মাসনে সমাসীনা একটী চামুণ্ডা-মূর্তি আছে। ইহার বিবরণ Arch. Sur. of India, 1908-9, VIII, 103-এ আছে। পঞ্জাবের

* ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ও চামুণ্ডার বিভিন্ন মূর্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

চাম্বায় কয়েকটী গ্রামেও চামুণ্ডার মন্দির আছে। চাম্বা শহরেও একটী চামুণ্ডার মন্দির দেখা যায়।— Arch. Sur. N. Circle-এ ইহার চিত্র আছে। এখানকার লোকেরা প্রতি বৎসরেই এই দেবীর উদ্দেশ্যে মেলা বসাইয়া থাকে। পূজারও বিপুল অনুষ্ঠান করা হয়। কিন্তু এ সমস্ত অনুষ্ঠান প্রাচীন নয়। মহলা পরগনায় সির্না গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র-সংক্রান্তিতে চামুণ্ডার পূজা ও উৎসব হইয়া থাকে। সামরা পরগনায় গওয়ারি গ্রামে ৭ই বা ৮ই আষাঢ় চামুণ্ডাদেবীর উৎসবের দিন। ব্রমাওর পরগনার সের গ্রামে প্রতি বৎসর ৩রা ভাদ্র দেবীর মহোৎসব হয়। সামরা পরগনায় সনাহন গ্রামে ১লা বা ২রা আষাঢ় এবং ২রা ও ৩রা আশ্বিন মহাসমারোহে চামুণ্ডার পূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যেও কোথাও কোথাও চামুণ্ডা-পূজা দেখিতে পাওয়া যায়। মহীশূরের রাজগণ শ্রীরঙ্গনাথের সেবক। তথাপি তাঁহারা চামুণ্ডার পূজা ও উৎসবাদি করিয়া থাকেন। আমি ইহাদের চামুণ্ডা পূজা ও উৎসবাদি স্বয়ং দর্শন করিয়াছি।

যোধপুররাজ্যের অন্তর্বর্তী যশোবন্তপুর জেলায় যশোবন্তপুর হইতে পাঁচ ক্রোশ উত্তরে সুন্ধাপাহাড়; ভিনমাল হইতে ইহা সাত ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। এই সুন্ধাপাহাড়ের গুহা-মন্দিরে চামুণ্ডাদেবী অধিষ্ঠিতা। সমগ্র পর্বতটী দেবীর নামে উৎসৃষ্ট। মন্দিরের শীর্ষস্থান অতি উচ্চ এবং নাটমন্দির মর্ম্মর-প্রস্তরের। মন্দিরটী ১২৬২ খ্রীঃ নির্মিত হইয়াছে। ইহাতে অনেকগুলি-লিপি উৎকীর্ণ আছে। মন্দিরনির্ম্মাণের সমসাময়িক উৎকীর্ণ-লিপি হইতে সৌরিগড়রাজবংশের পূর্বতন উনবিংশ জন রাজার নামের তালিকা ও তাঁহাদের রাজ্যের প্রয়োজনীয় ঘটনাবলী উৎকীর্ণ আছে। সুন্ধাপাহাড়ের চাচিগদেবের লিপিতে পাওয়া যায়, চাচিগদেব সুগন্ধাদ্রিতে গমন করিয়াছিলেন এবং সেখানে চামুণ্ডাদেবীর পূজা করিয়াছিলেন। এই চামুণ্ডাদেবীর নাম ছিল 'অঘটেশ্বরী'। ব্রাহ্মণগণ ১৩১৯ বিক্রমাব্দে অক্ষয়-তৃতীয়ায় তাঁহার মন্দিরে মণ্ডপ স্থাপন করেন।—Epigraphia Indica, IX, 74.

সিতাবল্ভি-লিপিতে মহাসামন্ত ধাড়ীভণ্ডক যে চামুণ্ডাদেবীর প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন তাহা ক্ষোদিত আছে। লিপিকাল শকসংবৎ ১০০৮ অব্দ। ইহা ৬ষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকালের লিপি।—Epigraphia Indica, III, 305.

সাধারণতঃ চামুণ্ডার ধ্যান মার্কণ্ডেয়পুরাণ হইতে গৃহীত হইয়া থাকে। বহু গ্রন্থে কিন্তু চামুণ্ডার ধ্যান আছে। 'ক্রিয়াকাণ্ডবারিধিতে'ও চামুণ্ডার ধ্যান আছে। ধ্যান যথা—

'দংষ্ট্রাকোটিবিশঙ্কটা সুবদনা সান্দ্রান্ধকারে স্থিতা।
খট্বাঙ্গাশনিপুচ্ছদক্ষিণকরা বামেন পাশং শিরঃ॥
শ্যামা পিঙ্গলমূর্দ্ধজা ভয়করী শার্দ্দূলচর্ম্মাবৃতা।
চামুণ্ডা শববাহিনী জপবিধৌ ধ্যেয়া সদা সাধকৈঃ॥'

প্রচলিত ধ্যানাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত ধ্যানটীও দেখিতে পাওয়া যায়—

'কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী।
বিচিত্র খট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা॥
দ্বীপিচর্ম্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা।
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্না রক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা॥

ধর্ম্মের শেষ কথা

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

ধর্ম্মের শেষ কথা ত্যাগ নহে, নহে তীর্থবাস—
তিতিক্ষা নহে উপরতি,
পঙ্কের, মৃণালের, সলিলের ত্যজি সহবাস
লভি পদ্মের পরিণতি।
গন্ধে, বরণে, রূপে—রূপায়িত চুপে চুপে
আপনার স্বরূপ প্রকাশ—
ভোগ নহে, ভস্ম নহে—
নহে চীর, নহে বহির্ব্বাস।

শুভাশুভ

শ্রীজগদীশ গুপ্ত

"হোয়াইট হাউস্"-এ বসে' ওরা চা খাচ্ছিল…

প্রোপ্রাইটর মহেন্দ্র দত্ত তার চায়ের দোকানের নাম রেখেছিল "লগ্ কেবিন"; কিন্তু কোন-কোন সুরুচি-সম্পন্ন খদ্দের তাতে আপত্তি কর্‌ল, বল্‌ল', "লগ্ কেবিন" বল্‌তে নিকৃষ্ট একটা স্থান বুঝায়, যেমন বুঝায় খোলার ঘর বল্‌তে। তারপর তারাই বল্‌ল', মহেন্দ্র, তোমাকে আমরা ডাক্‌ব' আব্রাহাম বলে'; এই ঘরের দেওয়ালে কলি ফিরিয়ে দোকানের নাম রাখো "হোয়াইট কেবিন"। বলে' হোয়াইট কেবিনের ঐতিহ্য, আভিজাত্য আর উচ্চতা তাকে বুঝিয়ে দিল—শুনে' মহেন্দ্র পুলকিত হ'ল…

কিন্তু প্রোপ্রাইটর মহেন্দ্র দত্তের পুলক বা হোয়াইট কেবিনের ইতিহাস এখানে অবান্তর;—কথা লিপিবদ্ধ করা হবে তাদেরই, যারা আজ অপরাহ্ণ পাঁচটায় হোয়াইট কেবিনে বসে' সানন্দে চা খাচ্ছে…

অন্য কথা হ'তে হ'তে একটা বিশেষ কথা উঠ্‌ল বুড়ো ভদ্রলোকটি চা খেয়ে উঠে' গেলে—

মুকুন্দ বল্‌ল, বুড়ো মানুষ বড় কুৎসিৎ। দেখ্‌লে ত' ঐ লোকটাকে! খুঁটিয়ে চোখ মুখ দেখ্‌তে গেলে চেহারা ভালই—যৌবনে সুপুরুষই ছিল; কিন্তু এখন ভেঙেচুরে' বড় বিশ্রী হয়েছে…

অন্নদা বল্‌ল,' কতকটা আমাদের বৈরাগ্যের ভাব থেকে, কতকটা বিবেচনার দোষে ওটা ঘটে। দেখো ত' একজন বুড়ো ইংরেজকে—নিজেকে কেমন পরিচ্ছন্ন "টিপ্‌টপ্" রাখে!

—"বার্দ্ধক্যে যুবতী নারী করিবে যে ঘৃণা,
সেই দুঃখে, হে বার্দ্ধক্য, বাঁচি না বাঁচি না।"

একেবারে মনের ওই কথাগুলো কে লিখিছে হে?—জান্‌তে চেয়ে সুনীল হাস্‌তে লাগ্‌ল…

অন্নদা বল্‌ল', জানা নেই…

অসিত বল্‌ল,' তোমার ত' জানা থাক্‌তেই পারে না—কাব্যচর্চ্চা ত' তোমার লাইনে নয়!

—তোমার যদি তা' হয় তবে তুমিই বলো।

—লিখেছেন, ভাওয়ালের কবি গোবিন্দ দাস।

বিমলানন্দ বল্‌ল', রসিক বটে। সে-দুঃখ যে কত বড় দুঃখ…

—এখনি কি তার? এখনো ত' সাম্‌নে অন্ততঃ পঁয়ত্রিশ বছর—পুরো জোয়ার—তারপর প্রৌঢ়ত্ব—তারপর বার্দ্ধক্য। যে-দেহ যুবতী নারী ঘৃণা করে না, সেই দেহের প্রচুর দৈর্ঘ্য দেখাইয়া নীরেন ভরসা দিল।

—কিন্তু আমাদের শাস্ত্রের উক্তি অন্য রকম।

—অসিত শাস্ত্র পেলে কোথায়?

—ঘেঁটেছি।

—শাস্ত্রের উক্তি বল শুনি—

—শাস্ত্রে বলে…

বলে' অসিত থেমে রইল।

—বুঝেছি। ঘেঁটে চচ্চড়ি ছাড়া আর-কিছু করনি'।

সকলে হাস্‌তে লাগ্‌ল'…

সুরেশ বল্‌ল', কিন্তু পুরুষের কার্য্য-কলাপের ভিতর নারীর প্রাধান্য আজকাল যতই দেখা যাক্, বুড়োকে তারা অগ্রাহ্য করতেই পারে না—

—কি ভাবে? নীরেন বল্‌ল।

—অসুখ-বিসুখে বুড়ো ডাক্তারকেই ডাক্‌বার হুকুম হয়…

ধিক্কার দিয়ে বিমলানন্দ বল্‌ল, ধ্যুৎ।

—হ্যাঁ, তা' জানি—তোমার ধ্যুৎ-এর অর্থ বুঝলাম। কবি যা' বলেছেন সে-ও একটা দিক্ বটে, কিন্তু কাজের দিক্ নয়, শুভ ভাবের দিক্‌ও নয়—জীবনের ইতিহাসে তা' উল্লেখযোগ্য নয়…

—পাদ্‌রী সায়েব।—বলে' মুকুন্দ হাস্‌তে লাগ্‌ল।

—কোথাকার এক ৬৫ বছরের বুড়ো মোক্তারি পাশ করে' প্র্যাক্‌টিস্ করছে—খবরের কাগজে পড়েছিলাম।—অন্নদা খবর দিল।

অসিত। ধন্য ধৈর্য্য!

বিমলানন্দ। আমাদের পাড়ার বিধু মজুমদারের শেষ-সন্তান হয় বাহাত্তর বছর বয়সে।

সুরেশ। তা'ও সম্ভব। কিন্তু কবি যে-ঘৃণার কথা

বলেছেন তা' গার্হস্থ্য কি মস্তিষ্কের ব্যাপার নয়; তিনি অন্য ভাবে কথাটা বলেছেন—তার ব্যাখ্যা না করাই ভাল⋯

এমন সময়ে দেখা দিল অনাথ গুপ্ত। অনাথই এদের একরকম চালক আর অবলম্বন; কথা চালা'তে, হাসা'তে সে খুব পারে—ভাল ভাল চুটকি গল্প তৈরি করতে' পারে—হাসিখুশির উপরেই সে অষ্টপ্রহর থাকে; কিন্তু আজ সে এল ভারি বিমর্ষভাবে⋯

উদ্বিগ্ন হ'য়ে ওরা যখন জানতে চাইল অনাথের বিমর্ষতার কারণ কি, তখন অনাথ কোণের দিকে বসেছে—

বল্‌ল, আমার এক মেসো'মশায় মারা গেছেন। শুনে' অবধি মনটা খারাপ হয়ে আছে⋯

অসিত বল্‌ল, দুঃখের কথা নিশ্চয়ই; আত্মীয় ত' বটে! তাঁকে দেখেছ কখনও?

—তার মানে?

—মেসোর সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা চিরকালই খুব অল্প থেকে' যায়। আমার পাঁচ মেসো—তাঁদের কাউকে আজ পর্য্যন্ত আমি দেখি নাই।

—কিন্তু আমার মেশোমহাশয়ের সঙ্গে আমার দেখা হ'ত। তিনি অসাধারণ লোক ছিলেন, অথচ তাঁর মৃত্যু হ'ল অপঘাতে।

—ইস্‌

অনেকেরই মুখ দিয়ে আপশোষের ঐ শব্দটা বেরল।

—কেমন অবস্থায় মারা গেছেন?

—বল্‌ছি। আব্রাহাম, এক কাপ চা দাও ত' আমায়। ⋯আমার মেসো মশায় ছিলেন একজন অসাধারণ ব্যক্তি। অসাধারণ এই হিসাবে যে, তিনি ছিলেন একজন নিপুণ কারিগর। কারিগুরি মানেই হচ্ছে, একটা জিনিষ আর-একটা জিনিষে নিপুণভাবে পরিবর্ত্তিত করা—যেমন মাটি প্রভৃতি দিয়ে প্রতিমানির্ম্মাণ। অমন অমন অনেক কাজ তিনি ভালই পারতেন—কাক তাড়ানোর অটোমেটিক তীর ধনুক এমন সুন্দর তৈরী করেছিলেন যে, আজও তার অনুকরণ হ'চ্ছে। কিন্তু তাঁকে হত্যা করল' তাঁরই দাঁত⋯

বলে' অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে অনাথ অশ্রু গোপন করল'।

—দাঁতে জিব কেটে ধনুষ্টঙ্কার হয়েছিল বুঝি?

অনাথ ঐ প্রশ্নে অসন্তুষ্ট হ'ল; বল্‌ল', অন্যায় অনুমান করতে যেও না তোমরা কেউ। আমি বল্‌ছি আমার মেসোর কথা—নীরেন, তোমার মেসোর নয়।

কিন্তু নীরেনই আবার বল্‌ল',—আশ্চর্য্য! কিন্তু দন্তমূল ফুলে', কি দাঁতের কন্‌কনানি, কি যন্ত্রণায় মানুষ মারা গেছে এমন কখনও শুনি নাই। হার্ট খুব দুর্ব্বল ছিল বুঝি?

—না। ক্রমাগত মই বয়ে তিনি ১০।১২ বার ঘরের মটকায় ওঠানামা করতে পারতেন—ঐ ছিল তাঁর প্রাত্যহিক ব্যায়াম।⋯তোম্‌রা দন্তপীড়ার কথা বারবারই বল্‌ছ—কিন্তু ঘটনার যখন সূত্রপাত, তখন তাঁর দাঁত গিয়েছিল সবগুলিই পড়ে'—একটাও ছিল না।

—তবে! অসিত বিস্ময় প্রকাশ করল'⋯

বিমলানন্দ অনুমান করল': নকল দাঁত গলায় আটকে⋯

—তবে তোমরাই বল আমার মেসোর মৃত্যু-বিবরণ—অনুমান করতে থাক।

—না, না; বল তুমি।

—দাঁত তাঁর একটাও ছিল না; আর, তাঁর বয়স তখন ছেষট্টি। কিন্তু ধন্যবাদ দিই বৈজ্ঞানিককে—তারই আবিষ্কারে তাঁর সে-অভাবের পূরণ হয়েছিল। দাঁত বাঁধানো হয়েছিল; কিন্তু তা' সইল না।

—অনেকেরই⋯

—অনেকের কথা এখানে খাটবে না, অসিত।⋯মাস তিনেক বেশ চল্‌ল'; যন্ত্রণা অনুভব তেমন কিছু করতেন না—খানিক অসুবিধা বোধ করতেন কেবল; খাবার সময়ে আর শোবার সময়ে ছাড়া দাঁত খুলে' রাখার দরকার হ'ত না। কিন্তু যখন তিনি কায়মনোবাক্যে আশা করেছেন যে, আর দেড় কি দুই মাসেই দাঁত যে লাগানো দাঁত তা' মনেই থাকবে না, তখনই এল ভয়ঙ্কর একটা পরিবর্ত্তন; তারপর ক্রমশঃ অবস্থা এমন দাঁড়া'ল যে, দু'মিনিটের বেশী তিনি সহ্য করতে পারেন না—

তাড়াতাড়ি দাঁত খুলে' নিতে হয়; যন্ত্রণায় তাঁর মেজাজ গেল বিগড়ে'—মাসীমাকেই এমন সব গালে'র কথা বল্‌তে লাগলেন, যা' শুন্‌লে পশ্চিমেরাও কাণে আঙুল না দিক্, শিখ্‌বে কিছু…

মাসীমা দূরে দূরে থাকেন—কেঁদে' কেটে' শয্যা নেন্… ডাক্তার ডাকা হ'ল; তিনি ব্যবস্থা করলেন পটাস্ ব্রোমাইড আর লঘু পথ্য। উপরন্তু মেসোমশায় গেলেন সেই লোকটার কাছে, যে তাঁকে দাঁত দেখিয়ে দাঁত দিয়েছিল; বল্‌লেন, এতগুলো টাকা আমার জলে দেওয়ালেন! এ কি যন্ত্রণা আমার…

ডেন্‌টিষ্ট বল্‌লে,—কি হয়েছে বলুন।

—দাঁত যে সইতে পার্‌ছিনে—আগুন হ'য়ে উঠ্‌ছে! বেশি দাম নিয়ে সস্তা জিনিস দিয়েছিলেন—এ তারই অনিবার্য্য ফল—খাটো হয়ে গেছে…

বলে' তাঁর নিজস্ব ভাষাটাকে তিনি প্রাণপণে দমন করে' রইলেন—.

ডেন্‌টিষ্ট বল্‌লে, তা' সত্যি নয়। আচ্ছা, দেখি—হাঁ করুন…

মেসোমশায় হাঁ কর্‌লেন, ডেন্‌টিষ্ট ভিতরটা দেখ্‌ল; দেখে বল্‌ল'…কি বল্‌ল' সে, তা' অনুমান কর দেখি!

কেউ তা' অনুমান করল' না—

অনাথ বল্‌তে লাগ্‌ল,—ডেন্‌টিষ্ট বল্‌ল, আপনার মত সৌভাগ্য কম লোকেরই ঘটে। এমন ঘটনা ঘটেছে শুনেছি, কিন্তু চোখে কখনও দেখি নাই, দেখব' বলে' আশাও করি নাই। আপনার আবার দন্তোদ্গম হ'চ্ছে। যন্ত্রণা যা' পাচ্ছেন তা' বাইরের দাঁতের নয়, ভিতরের দাঁতের। ওষুধ নিয়ে যান্, যন্ত্রণার উপশম হবে।

যন্ত্রণার উপশমের জন্যে মেসোমশায় ওষুধ নিয়ে বাড়ী এলেন…

কচি মাড়িতে দাঁত উঠ্‌তেই শিশুর জ্বর আসে—ছেষট্টি বছরের পাকা মাড়িতে দাঁত উঠতে কি যে এল আর কি যে না এল, তা' বলা যায় না…ওষুধের গুণে উপশমের পরও যা' থাক্‌ল, তারি ঠেলায় মাসীমা তীর্থযাত্রা কর্‌লেন…

—এবং সেই অবস্থাতেই বঝি… ?

—উহুঁ, তার অনেক পরে—মাসীমা তখন ফিরেছেন, এই খবর পেয়ে যে, দাঁত ওঠা শেষ হয়েছে—মেসোমশায় আর দুর্বাক্য বলেন না…

তারপর তাঁর চেষ্টা হ'ল পুরণো দাঁত বেচে' ফেলার—

—তোমার মাসীমার? —নীরেন বল্‌ল'।

—মাসীমার পুরণো দাঁতের কথা আমি বলিনি' ত'!

—আমি বল্‌ছি বেচে' ফেলার।

—না; সে চেষ্টা হ'ল মেসোমহাশয়ের। কিন্তু ব্যবহার-করা পুরণো দাঁতের যে-দাম ওরা দিতে চাইলে তা' হাস্যকর নয়, ক্রোধজনক। মেসোমশায় চটে' গিয়ে সেই দু'পাটি দাঁত দিয়ে বানালেন ইঁদুর মারা কল—চমৎকার কল; স্প্রিং-এর এম্‌নি জোর আর কায়দা যে, ইঁদুরে টোপ ছুঁয়েছে কি মরেছে। মাথা বটে তাঁর! "দীনবন্ধু" নামক দৈনিক কাগজে সেই কলের তারিফ ছাপা হ'ল; মন্তব্য করলে যে, গৃহশিল্পের উন্নতির জন্য অন্যবিধ কলও যদি বীরেশ্বরবাবু আবিষ্কার করেন, তবে তিনি দেশের উপকারই করবেন।

তিনি তা' করতেন কি না, তা' জানিনে; কিন্তু সেই কলে একদিন তিনিই দিলেন পা…

বিমলানন্দ বল্‌ল',—ইস্।

—তা'-ই বটে। অন্ধকারে দেশ্‌লাই খুঁজ্‌তে গিয়ে সেই কলে দিলেন পা—গোড়ালি প্রায় ছিঁড়ে গেল…ঘা হ'ল প্রচণ্ড, আর ঘা হ'ল বিষাক্ত।

—তা'তেই বুঝি… ?

—না, তা'তেও না। বক্তাকে অতিক্রম কর্‌তে যেও না, মুকুন্দ।…ডাক্তার এল, অস্ত্রোপচার কর্‌ল'—মেসোমশায় সেরে' উঠ্‌লেন, আর গর্ব্বভরে বলে' বেড়া'তে লাগ্‌লেন যে, নিজের পা নিজের দাঁতে ছিন্ন করেছেন কেবল তিনি…

—"তারপর"? জিজ্ঞাসা করে' দু'তিন জন হাস্‌তে লাগ্‌ল'।

—তাঁর সে-ফাঁড়া কাট্‌ল' বটে; কিন্তু সুরু হ'ল আশ্চর্য্য এক ব্যাপার। অমন যে বুদ্ধিমান্ লোক, তাঁরও খানিক্ বুদ্ধি লোপ পেল, আঘাতের দরুণ নয়, বাহাদুর হিসাবে—তিনি খেয়ে বাহাদুরি দেখা'তে লাগ্‌লেন…

মানুষের রূপে যেমন তেম্নি অভ্যন্তরেও, উদর প্রভৃতি স্থানে, একটা চুম্বকত্ব থাকে—কিন্তু তাব হ্রাসবৃদ্ধি আছে। মেসোমশা'র দাঁত আর সেই চুম্বকের অসাধারণ ক্রিয়া দেখ্‌তে লোকসমাগম হ'তে লাগ্‌ল···

মেসোমশায় খেতে পারতেন খুব—বিনা দাঁতেই দেড়পো মাংস খেতেন—দাঁত বেরুলে খেতে লাগ্‌লেন আড়াইপো তিনপো··· নূতন দাঁত দিয়ে মড়্‌মড়িয়ে হাড় ভাঙেন আর চিবোন্—বলেন, ভাত ভাঁটো রেখো—ছোলার ডা'ল অর্দ্ধেক সিদ্ধই ভাল লাগে···

দেশের লোকে তাঁর খাওয়ার কথা গল্প কর্‌তে লাগ্‌ল'···

তাঁর বুদ্ধি যে খানিক্ লোপ পেয়েছে তার প্রমাণ এই যে, তিনি ভুলে' গেলেন, দাঁত নূতনই বটে, শক্তও বটে, কিন্তু হজমের যন্ত্র তখনও সেই পুরণো যন্ত্রই। —তারা নূতন দাঁতের মর্য্যাদা রাখ্‌ল' না—বদ্‌হজমের গ্যাস উৎপন্ন হ'তে লাগ্‌ল'···বসে থাকতে থাকতে এই সেদিন তিনি হঠাৎ দু'হাত আকাশে তুলে লুটিয়ে পড়্‌লেন···

ডাক্তার বলল', লিভার উঠে' গেছে হার্টে···

—মারা গেলেন ?

—উঁহু, তখনই না ; তার পর দিন।

ফিরে গেছে দশভূজা

শ্রীগোপেশ্বর সাহা

মৈত্তির বাড়ী মন্দিরে বড় জাঁকিয়া উঠেছে ভীড়—
নবমীর দিন বালিকা দাঁড়ায়ে, নয়নে ঝরিছে নীর।
তিনদিন থেকে উপবাসী তারা, জননী ভুকিছে জ্বরে,
ছোট ভাইটার আমাশয় রোগ, সেও বুঝি কবে মরে।
দুঃখী তাহারা সম্বল নাই, নাইকো সহায় জন,
বাবুদের বাড়ী পূজার পরব, তাই হেথা আগমন।
দয়া করে ওগো দাও মোরে কিছু, খাইয়া পরাণ বাঁচে,
কাতর কণ্ঠে বার বার করি' বালিকা করুণা যাচে।
ভোগের বাদ্য বাজেনি তখনো, বামুনভোজন বাকী,
এখনি কে তোরে খাবার দিবেরে, বল ওরে হতভাগী?
বালিকা যতই যাচিছে কাতরে, ধমকি বলিছে—বেরো,
কি এক ফ্যাসাদ আসিয়া জুটেছে
একি রে আপদ 'গেরো'!
রাজ্যের যত ছোটলোক সব আস্কারা পেয়ে তা'রা
দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠেছে—
বেড়েছে সবার বাড়া!
কুৎসিত কহে, ধিক্কার দেয়, ভেংচায় কেহ মুখ,
অঝোরে ঝুরিয়া বালিকা পলায়,
কেহ না বুঝিছে দুখ।

ভোগের বাদ্য বাজিয়া উঠিল উৎসব-কোলাহল,
করযোড় করি' দাঁড়াল দু'ধারে যতেক ভক্ত দল।
'জয় মা', 'জয় মা' 'জয় মহামায়া' উচ্চ করিয়া কহে,
দরদর করি' কারো বা বক্ষে নয়নের ধারা বহে।
ভোগ সারা হ'ল, কপাট খুলিল, দেখিল সকলে চাহি,
ভিতরে একটি শৃগালে খাইছে, আর কেহ কোথা নাই।
ভক্তেরা সবে প্রমাদ গণিল, কর্ত্তা ফুকারি' উঠে,
গৃহিণী কণ্ঠে কাপড় জড়ায়ে অঙ্গনতলে লুটে।
'হায়, হায়' করে বাড়ীর লোকেরা, নয়নে বহিছে ধারা,
কোন্ অপরাধে এমন করিল, করযোড়ে কহে তারা।
রামু মোহান্ত আখড়ায় বসি' জপিছে ইষ্টনাম,
মৈত্তির বাড়ীর ভোগের বিপদ সহসা শুনিতে পান।
সকল শুনিয়া বুড়া মোহান্ত কহিছে 'হায়রে হায়',
দ্বারে আসি মাতা চলিয়া গিয়াছে, আর কে
এ ভোগ খায় ;
মানবী হইয়া মহামায়া নিজে ফিরিছে করুণা মাগি',
অন্ধ মানুষ বুঝিল না কভু আপন দম্ভ লাগি'।
সেবার হইতে সেই মন্দিরে শেষ হয়ে গেছে পূজা,
দুই ভুজে চেয়ে বিমুখ হইয়া ফিরে গেছে দশভুজা।

২৯

অরুণ আসিয়া পৌঁছিল। পণ্ডিচারী যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলাম। সস্ত্রীক যাইব। পূর্ব্বেও গিয়াছি, আত্মগোপন করিয়াও গিয়াছি; কিন্তু এইবার পণ্ডিচারী যাওয়া বেশ আড়ম্বরপূর্ণ হইলেও, বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম না।

বালিকা বধূকে ঘরে আনিয়াছিলাম, তাহার পর এই দীর্ঘদিন তিনিও আমার সঙ্গে বন্দিনী। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তাঁহাকে লইয়া পণ্ডিচারী যাত্রা করিব, সে কত পথ, কত দূর দেশ; তিনি আনন্দে বিদেশযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। কিন্তু আমার অন্তরের আনন্দপ্রদীপ যেন নিভিয়া আসিতেছিল।

অরুণের সহিত অনেক কথা হইল। কথায় কথায় বুঝিলাম—শ্রীঅরবিন্দকে আশ্রয় করিয়া আমি যে আত্মসমর্পণের সাধনা করিয়াছি, কল্পনার জগতে তাহার সিদ্ধির পরিমাণের সহিত প্রত্যক্ষ জীবনের ক্ষেত্রে খুব অল্পই মিল হইয়াছে। শ্রীঅরবিন্দের বাণীমূর্ত্তির ধ্যান করিয়া তদনুযায়ী যে চরিত্র গড়িয়াছি, সে চরিত্র শ্রীঅরবিন্দের নিকট আমার ধারণানুযায়ী সুস্পষ্ট নহে। অরুণের সহিত কথা কহিয়া যে অঞ্জন চক্ষে লেপিয়া শ্রীঅরবিন্দকে দেখিতাম, চক্ষের জলেই তাহা যেন ধুইয়া যাইতে লাগিল। মনের ভাব গোপন করিয়া অরুণকে প্রশ্নের পর প্রশ্নে স্পষ্টই বুঝিলাম—শ্রীঅরবিন্দ আমার প্রতি অকারণে সংশয়াপন্ন হইয়াছেন। এই সংশয়ের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে, আমার জীবনই ব্যর্থ হইবে। দীর্ঘদিনের উৎসর্গ-ব্রত যদি নিরর্থক হয়, সে অবস্থায় যোগ ও জীবন দুইয়েরই অন্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমার এইরূপ মনোভাবের কারণ যথেষ্ট ছিল। শ্রীঅরবিন্দকে আমি এমন আপন করিয়া লইয়াছিলাম যে, সেখানে আমার বিরুদ্ধবাদ কোন মতেই ঠাঁই পাইবে না, এইরূপ ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু বুঝিলাম—শ্রীঅরবিন্দের উত্তুঙ্গ ব্যক্তিত্বের আশ্রয় মাত্র পাওয়ার প্রলোভনে আমার পরিচিত বন্ধুগণ অজস্র বিরুদ্ধ প্রচারে তাঁর চিত্ত এমনই ভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে যে, সেখানে আমাকে আর যেন স্পষ্ট করিয়া ধরা যায় না। শ্রীঅরবিন্দ এই সকল মিথ্যা প্রচার সর্ব্বাংশে প্রশ্রয় না দিলেও, কিয়দংশ যে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, এইখানেই পরস্পরের মধ্যে যে হৃদয়ভেদের মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা, তাহাতেই আমি অস্থির হইয়াছিলাম। কিন্তু তবুও আশা হইল—তিনি আমায় সস্ত্রীক দীর্ঘদিনের জন্য আহ্বান দিয়াছেন। অস্পষ্টতা যতই ঘনীভূত হউক, তাহা দূর করার যথেষ্ট অবসর পাইব। আমি অরুণ প্রভৃতির উপর সঙ্ঘের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া চন্দননগর পরিত্যাগ করিলাম। সঙ্গে লইলাম স্ত্রী ছাড়া আরও কয়েক জনকে, যাহাদের সহিত আমার শুধুই পথের সম্বন্ধ, আত্মার ঐক্য নাই। কিন্তু হৃদয়ের অন্ধ আবেগে সেদিন ইহাদের প্রকৃত স্বরূপ আমার চক্ষে ধরা পড়ে নাই! অতিশয় ক্ষুন্ন চিত্তেই পণ্ডিচারীর পথে চলিতেছিলাম। কেবলই মনে হইতেছিল—জীবনের একটা অশ্রুপাত যেন আসন্ন।

বাংলার শ্যামল দৃশ্য অন্তর্হিত হইল। প্রাতে চক্ষে পড়িল পম্পা সরোবরের মনোহর দৃশ্য, নব সূর্য্যকরে নীলজল নৃত্য করিতেছে। সুশ্যাম দ্বীপপুঞ্জ বুকে ধরিয়া পম্পা দ্রুতগামী রেলযাত্রীকে বিদায় দিল চক্ষের নিমেষে। চক্ষের সম্মুখে ধূসর পর্ব্বতশ্রেণী। কত গিরি, নদী, কানন, কান্তার, গ্রাম, নগর অতিক্রম করিয়া মাদ্রাজে আসিয়া উপনীত হইলাম। মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ পুস্তকবিক্রেতা মিষ্টার গণেশ আসিয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার গৃহে লইয়া চলিলেন। মোট-ঘাট নামাইতে গিয়া দেখিলাম—একটা থলিয়ার মধ্যে এক কাঁদি কাঁচকলাও রহিয়াছে। আমি সবিস্ময়ে সঙ্গীদের দিকে চাহিলাম। তাহারা হাসিল। কিন্তু আমার স্ত্রী বলিলেন "এমন অকল্যাণ কে করিল? কাঁচকলা যে বড় অযাত্রা!" তাঁহার কথায়, একটা চক্রান্তের আভাষ মনে ছায়া ফেলিয়া গেল।

অনেক দিন হইল রাশিচক্র, গ্রহ-নক্ষত্রাদির প্রভাব অস্বীকার করিয়াছি। পাঁজি দেখিয়া দিন-ক্ষণের বিচার ছাড়িয়াছি। সদাচার, কদাচার এক করিয়াছি। বাস্ত-বিগ্রহ শিকায় উঠিয়াছে। শ্রীঅরবিন্দই ধর্ম্মবিগ্রহ। কুসংস্কার অন্তর স্পর্শ করিল না, কিন্তু যে শ্রেণীর লোক আমার সঙ্গী, তাহাদের চিত্তবৃত্তির কথা ভাবিয়া আমার অন্তর অতিশয় ক্ষুন্ন হইল। আমার গৃহলক্ষ্মী সেই মোটটা সেইখানেই রাখিয়া চলিলেন, আমিও তাহার কোন প্রতিবাদ করিলাম না। তার পরদিন প্রভাতে গাড়ী আসিয়া পণ্ডিচারী পৌঁছিল। প্ল্যাটফর্ম্মে সৌম্যমূর্ত্তি নলিনী আর সদানন্দ সুহৃৎ অমৃত উপস্থিত ছিলেন। উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া আমার অন্তরের গ্লানি দূর হইল। এই উভয় সহতীর্থের প্রফুল্ল মুখশ্রী হৃদয়ের স্পর্শে আমায় অভিভূত করিল। কোথায় পার্থক্য? কোথায় ভেদ? কি অকৃত্রিম আকুতিতে নলিনী আমাদের অভিনন্দিত করিল। তার সশ্রদ্ধ প্রণতি আমার অন্তরে অগ্রজের গর্ব্ব জাগরিত করিল। "বৌদিদি" বলিয়া আমার স্ত্রীর প্রতি তার কুশল প্রশ্ন আজও নলিনীর সহিত আমার অপার্থিব আত্মীয়তার সুরেরই মূর্চ্ছনা তুলে। কর্ম্মভেদ হয়, অমর স্মৃতি বুঝি ভবিষ্যতের জন্য চিরায়ুঃ হইয়া থাকে; নতুবা এই যুগের ইতিহাস আজিও অন্তর আচ্ছন্ন করিয়া জাগ্রত থাকে কেন?

তারপর সে এক অপূর্ব্ব শোভাযাত্রা। মুক্তকচ্ছ পণ্ডিচারীবাসীদের বেশভূষা সম্পূর্ণ পৃথক্ ধরণের। তাহাদের দুই হাতে স্বর্ণ শঙ্খ বা বলয়। কর্ণযুগলে পাথর-বসান সোনার টোপ। কৃষ্ণকায় জনগণের দিকে চাহিয়া আমার স্ত্রীর কৌতূহলের সীমা নাই। অনবগুণ্ঠনে কিশোরী, তরুণী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা পথে চলিয়াছে। বাঙ্গালী বধূর ন্যায় তাহারা অবগুণ্ঠনমুখী নহে। কৃষ্ণকায়া, কিন্তু তাহাদের দেহ সবল সুস্থ বলিয়াই মনে হয়। একেবারে নূতন দেশে আসিয়া একজন চির অন্তঃপুর-মহিলার অন্তরের যে কি উল্লাস, তাহা সেদিন তাঁর চক্ষের দীপ্তিতে প্রকাশ পাইয়াছিল।

পরিশেষে আমার সেই চির পরিচিত শ্রীঅরবিন্দের ভবনদ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেদিন সেখানে ছিলেন হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, বারীন্দ্রকুমার ও প্রিয়দর্শন সুরেশচন্দ্র। পরস্পর প্রীতি সম্ভাষণ করিয়া দ্বিতলে গিয়া উপনীত হইলাম।

সেই টেবল্, সেই কাঠের সীট্ পুরাতন চেয়ার। সেই কৌচের খুঁট গায়ে দিয়া শ্রীঅরবিন্দ। সেই তাঁর ইন্দীবরতুল্য নয়নের দৃষ্টি। সেই স্ফুরিত অধরে স্নিগ্ধ মধুর হাসি। সেই হিরণ্ময় শ্মশ্রু কেশাদিশোভিত সমুজ্জ্বল মুখকান্তি। দূরত্বের ব্যবধানে হৃদয়ে যে ভেদের গ্রন্থি কঠিন হইয়া উঠিতেছিল, যে সংশয়ের কাল মেঘে চিরোজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্র ঢাকা পড়িয়া যাইতেছিল, তাহা দুঃস্বপ্ন মনে হইল।

প্রণাম করিবে কে? ভাবপ্রবণ হৃদয় সূর্য্যকরোজ্জ্বল অভ্রভেদী তুষারশৃঙ্গ যেমন ধারা সৃষ্টি করে, তেমনি নয়ন ঝাঁপিয়া অজস্র অশ্রুবর্ষণে বক্ষ প্লাবিত করিল। শ্রীঅরবিন্দের পরিধানে আমারই নিবেদিত লালবাগানের কালাপেড়ে ধুতি। পদযুগলে ঠনঠনিয়ার চটি। উন্নত বক্ষ শ্রীঅরবিন্দের চরণে ভূনত হইবা মাত্র, তিনি প্রাচীন ঋষিদের ন্যায় দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিলেন। সঙ্গী দুইজন প্রণাম করিল। তারপর আমার স্ত্রীও অরবিন্দচরণে প্রণতা হইলেন।

অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী পুরনারী—নয়পদ, যুগল হস্তে সোনার চুড়ি ঝকমক করিতেছে—উপুড় হইয়া পড়িলেন শ্রীঅরবিন্দের চরণযুগলে। তাঁহারও চক্ষের জলে শ্রীঅরবিন্দের পদযুগল সিক্ত হইল। শ্রীঅরবিন্দ কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট। আমি তাঁর সম্মুখের আসনে উপবেশন করিয়া আছি। মধ্যে ধূলিবিলুণ্ঠিতা প্রণতা পত্নী। এক মিনিট, দুই মিনিট ঘড়ির কাঁটা সরিয়া চলে—সংজ্ঞাহীনা নারী, শ্রীঅরবিন্দের পদচুম্বন করিয়া লতাবল্লরীর ন্যায় অর্দ্ধ-শায়িতা। কে যেন তাঁহার এ সুখসুপ্তি ভঙ্গ করিতে চাহিল। শ্রীঅরবিন্দ বামহস্তে আমার গৃহলক্ষ্মীর মস্তক স্পর্শ করিয়া দক্ষিণ হস্তে তাহা নিষেধ করিলেন। আমি স্তব্ধ, বিমুগ্ধ। এই বিজয়িনী নারীশক্তিকে কোথাও এমন নতি স্বীকার করিতে দেখি নাই। তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনেতিহাসে এমন ঘটনা কখনও ঘটে নাই। দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু, পুরোহিত—হিন্দু সংসারে নতিগ্রহণের লোকাভাব নাই; কিন্তু কোথাও তিনি এমন করিয়া মাথা

নত করিয়াছেন মনে হইল না। পূজাপার্ব্বণে শুভদিনে তাঁহাকে আমারই চরণে ভূনতা হইতে দেখিয়াছি; আর কোথাও তিনি আপনাকে প্রণতা করেন নাই। তাঁহার ইহা দাম্ভিকতা বলিয়া নানা কথাও শুনিতে হইয়াছে; কিন্তু এই তেজস্বিনী নারীকে তাঁহার জন্য কোথাও কুণ্ঠা প্রকাশ করিতে দেখি নাই।

মিনিটের পর মিনিট প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল এইরূপ নিশ্চল নিস্পন্দ থাকিয়া, পরে ভাবভঙ্গে সুপ্তোত্থিতার ন্যায় তিনি একবার শ্রীঅরবিন্দের দিকে, তারপর আমার দিকে চাহিয়া, মাথার কাপড় কিছু নামাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। কি এক অপার্থিব অনিন্দ্য আনন্দ তাঁহার বদনমণ্ডলে জ্যোতির আলিপনা লেপিয়া দিয়াছিল, আমি মুগ্ধ নেত্রে তাঁহার পানে চাহিলাম। তাঁহার এই অভাবনীয়, আচরণের মর্ম্ম আমার হৃদয়ঙ্গম হইল না। দীর্ঘদিন দুইজনে একত্র থাকিয়া তাঁহার হৃদয়ের উপর আমার যে পূর্ণাধিকারের দাবী ছিল, শ্রীঅরবিন্দের চরণে তাঁহার এই অকৃত্রিম নতি-জ্ঞাপন যেন তাঁর অপূর্ণ আত্মনিবেদনের পূর্ণ তর্পণ বলিয়াই মনে হইল। ঘটনা কিছুই নহে; কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি আমি যে ভাবে জানিয়াছিলাম তাহাতে এই ঘটনায় বিস্মিত হইলেও, অন্তরে শান্তি পাইলাম এই ভাবিয়া যে, সহধর্ম্মিণীর হৃদয়ের সার্থকতাই পতির কাম্য। মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিলাম—তাঁহার এই আত্মনিবেদন যেন তাঁহার সর্ব্বার্থ-সিদ্ধির কারণ হয়।

ঘটনাস্থলে এই সময়ে আর কেহই ছিল না। শ্রীঅরবিন্দ ও আমার স্ত্রীর মধ্যে এই অধ্যাত্মমিলন-প্রবাহ যখন উভয়কে অবহিত রাখিয়াছিল, যেন মর্ত্ত্যলোক হইতে কোন ঊর্দ্ধতর লোকে উভয়ের আত্মা সম্বন্ধের অমৃত আস্বাদ করিতেছিল, সেই ফাঁকে দৃষ্টি পড়িল মীরাদেবী শাড়ী পরিয়া, বঙ্গমহিলার ন্যায় বারান্দার প্রান্তস্থিত এক কক্ষের কপাটের ফাঁকে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তাঁর সমুজ্জল দৃষ্টি বিদ্যুতের ন্যায় আমাদের স্পর্শ করিতেছিল।

যত ব্যথা, যত সংশয়, যত অন্ধকার বুকে ঘনাইয়া উঠিতেছিল, সব নিরসিত হইল। শ্রীঅরবিন্দ অমৃতকে ডাকিয়া বলিলেন "মতিলালের জন্য যে বাড়ী ভাড়া করিয়াছ, সেইখানে ইহাদের পাঠাইয়া দাও।"

তারপরে হাসিয়া বলিলেন "এখানেও তোমার নূতন সংসার পাতিতে হইবে। অপরাহ্নে কথা কহিব।"

শ্রীঅরবিন্দ নিগূঢ় উদ্দেশ্য লইয়াই কথা বলিয়াছিলেন। আমি তখন প্রিয়দর্শনসুখে বিভোর ছিলাম। বিদায় লইয়া সিঁড়ির নিকট আসিতেই মনে হইল—শ্রীঅরবিন্দের এ গৃহ আর শ্রীহীন নহে। শ্রীঅরবিন্দসকাশে আসিয়া যে ঘরে আমি বার বার স্থান পাইয়াছি, সে ঘর মীরাদেবী অধিকার করিয়াছেন। আমাদের ভিন্ন বাড়ীতেই থাকিতে হইল। কাঁচা মনে কিছু আঘাত লাগিল। ইচ্ছা হইল—পূর্ব্বপরিচিত ঘরখানি একবার দেখিয়া যাই। আর মীরাদেবীকেও অভিনন্দন জানাইবার শিষ্টতা আছে।

দ্বার ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিলাম। পশ্চাতে উৎফুল্লা শ্রীমতী। সম্মুখে একখানি কৌচে মীরাদেবী বসিয়াছিলেন। এই মীরা ১৯২০ খৃষ্টাব্দের মীরা নহেন। তখন এই বিদেশিনী মহিলা বিদেশিনীবেশেই আমাদের আতিথ্য করিতেন। তাঁহার পাশে বসিয়া কতদিন সান্ধ্য ভোজন করিয়াছি। আজ তিনি শাড়ী পরিয়াছেন। পদযুগলও অলক্তরঞ্জিত করিয়াছেন। মনে হইল—যে মীরাকে ভগ্নী বলিয়া শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে অগ্রসর হইয়াছিলাম, সে মীরা আজ নববেশে শ্রীঅরবিন্দের সত্যলক্ষ্মীর আসন অধিকার করিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দের মহিমাদীপ্ত মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া এই মহিলার পদস্পর্শ করিলাম, মীরা স্মিত বচনে উৎসাহবাক্য উচ্চারণ করিলেন।

পশ্চাতে ফিরিলাম। কি গরীয়সী মূর্ত্তি! উন্নতগ্রীবা ঋজুমূর্ত্তি তন্বী অপলকে মীরার দিকে চাহিয়া আছেন। সীমন্তের সিন্দূর বালারুণশোভায় জল-জল করিতেছে। এই নীরব নিস্পন্দ মূর্ত্তির দিকে মীরাদেবীও একবার কটাক্ষপাত করিলেন। আমি মনে করিয়াছিলাম—আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার পত্নীও মীরার পদ-বন্দনা করিবেন। কিন্তু তাঁহাতে সে ভাবের আভাস না পাইয়া, একটু অপ্রস্তুত হইয়াই গৃহ হইতে বাহিরে আসিলাম। মীরাদেবী গৃহদ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া আমাদের প্রত্যভিবাদন করিলেন।

(ক্রমশঃ)

ব্রাহ্মণবেশী রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ : প্রাম্বানন শিবমন্দিরের উৎকীর্ণ গাত্রচিত্র

বৃহত্তর ভারতে হিন্দু-মন্দির

স্বামী সদানন্দ গিরি

যাভা, বলী, শ্যাম, মালয়, সুমাত্রা প্রভৃতি বৃহত্তর ভারতের দেশগুলিতে আমি বার বার ভ্রমণ করিয়া যে সকল হিন্দু সভ্যতার প্রভাব ও নিদর্শন লক্ষ্য করিয়াছি, তাহাতে ভারতের বিশেষ করিয়া পৌরাণিক ভারতের সঙ্গে ইহাদের অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র যে একদা কত নিবিড় ছিল সে সম্বন্ধে আমি সুনিশ্চিত হইয়াছি। সেখানে হিন্দু রাজত্বের উত্থান-পতনের চিহ্ন এখনও সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণকারীর দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট ধরা পড়ে।

মধ্য যবদ্বীপের অন্তর্গত বোরোবুদর স্তূপের তলদেশে আবৃত উৎকীর্ণের উপর সংস্কৃত ভাষায় লিখিত একটি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। তদ্দৃষ্টে মনে হয়, সম্ভবতঃ ৯২৫ খৃষ্টাব্দে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যাহার দ্বারা মধ্য যবদ্বীপে হিন্দু রাজত্বের সম্পূর্ণরূপে পতন হয়। সুমাত্রার বিজয়ের হিন্দু শৈলেন্দ্র বংশীয় কোন রাজা যবদ্বীপ জয় করিয়া শতাধিক বর্ষ রাজত্ব করেন; এই সময়ে মধ্য যবদ্বীপের অপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যের নিদর্শন আজও দেদীপ্যমান।

পূর্ব্ব যবদ্বীপের শৈব রাজা শৈলেন্দ্র-বংশের হৃতরাজ্য উদ্ধার করিয়া মধ্য যবদ্বীপে প্রাম্বানানে রাজত্ব করেন এবং শৈব-প্রভাব পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাম্বানানের পৌরাণিক হিন্দু-প্রভাব যাহা দেখিয়াছি সেই সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিব।

এই প্রদেশের যবদ্বীপবাসীদের মধ্যে কিম্বদন্তী আছে যে, এক সময়ে রাতুবোকো (Ratu Boko) নামে এক দৈত্যরাজপুত্র ছিল। প্রাম্বানানের দক্ষিণে রাতুবোকোর প্রাসাদে তাহার বাসস্থান ছিল। এই প্রাসাদটী শত শত অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অবস্থিত ছিল। এবং হয়ত উহাই প্রাচীন মাতরম্ রাজার রাজধানী ছিল। কিম্বদন্তী অনুসারে এই দৈত্যরাজের কন্যা লোরো জংগ্রানের (Loro Jongran) উদ্যোগে প্রাম্বানানের মন্দির নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হয়। কোন এক যুবক এই রাজকন্যার পাণিগ্রহণ প্রার্থী হইলে তিনি তাঁহার প্রেমের আবেদন অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে এক অসম্ভব কার্য্যে নিযুক্ত করেন। তিনি অঙ্গীকার করেন যে, যদি এই যুবক এক রাত্রির মধ্যে এক হাজার মূর্ত্তিসম্বলিত একটি বিশাল মন্দির নির্ম্মাণ করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে স্বামীরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। অনেক অপদেবতা এই যুবকের বন্ধু ছিলেন এবং তাঁহারা যুবকের হইয়া এক রাত্রির মধ্যে একটি মূর্ত্তি ভিন্ন সমস্ত মন্দির ও মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। প্রাতঃকালে রাজকন্যা যখন দেখিলেন

তাঁহার অসম্ভব আদেশ একরূপ কার্য্যে পরিণত হইয়াছে, তখন তিনি একটি মাত্র মূর্ত্তি অবশিষ্ট থাকিতে এই কার্য্য বিনষ্ট করিতে উদ্যোগী হইলেন। এই যুবক যাদুবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং রাজকন্যা তাহার অভিসম্পাতে প্রস্তরমূর্ত্তিতে পরিণত হইলেন। এইরূপে সহস্র মূর্ত্তি নির্ম্মাণ হইল। আজিও এই ছয়টি মন্দিরের মধ্যে প্রধানতম শিব মন্দিরে রাজকন্যার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

ধনুকহস্তে রামচন্দ্র : প্রাম্বানান্ শিবমন্দিরের গাত্রচিত্র

প্রাম্বানানের এই মন্দিরগুলির চারিদিকে প্রস্তরের প্রাচীর দিয়া ঘেরা। ইহার পরিধি প্রায় এক বর্গ মাইল। বাহিরের প্রাচীরের ভিতরেও দুইটি অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্য-বিশিষ্ট প্রাচীর আছে। সবার ভিতরের প্রাচীরের মধ্যে দুই শ্রেণীতে ৮টী মন্দির ও মধ্যবর্ত্তী প্রাচীরের ভিতরে ১৬০টী মন্দির আছে। এই মন্দিরের সমষ্টিকে স্থানীয় লোকেরা চণ্ডীলর জংগ্রাং বলে। মন্দিরগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। আমরা কাঠের ফটকের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিলাম। মন্দিরের প্রাঙ্গণে কারু-কার্য্যবিশিষ্ট প্রস্তরখণ্ডগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, কোথাও বা শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত হইয়া আছে। এক সময়ে ইহা যবদ্বীপের বৃহত্তম মন্দির ছিল। ভিতরের প্রাচীরের মধ্যে দুই শ্রেণীতে তিনটি করিয়া ছয়টি বৃহৎ এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুইটি ক্ষুদ্র মন্দির মিলিয়া সর্ব্বসমেত আটটি মন্দির আছে। তন্মধ্যে ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণুর প্রধান তিনটি মন্দির পশ্চিমদিকে অবস্থিত। সম্ভবতঃ পূর্ব্বদিকের ক্ষুদ্র তিনটি মন্দির তিন দেবতার বাহনের। কেবলমাত্র শিবের মন্দিরের সম্মুখে নন্দীর (বৃষ) মন্দিরটি অবশিষ্ট আছে। বৃহৎ মন্দিরটি শিবের, উহা মধ্যস্থলে অবস্থিত। শিব-মন্দিরের দক্ষিণে ব্রহ্মা ও উত্তরে বিষ্ণুর মন্দির। ব্রহ্মার মন্দিরের প্রস্তর ফলকের কারুকার্য্য একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মন্দিরের ভিতরে পাথরের সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার মূর্ত্তি আছে। বিষ্ণু মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের জীবনী পাষাণের ভাষায় অনূদিত হইয়া রহিয়াছে। বিভিন্ন প্রস্তর ফলকে খোদিত একাধিক মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের বাল্য জীবনের ঘটনাবিশেষ অবলম্বনে রচিত। মূর্ত্তিগুলি বাৎসল্য প্রেম, সৌখ্য প্রেম, বীরত্বের কাহিনীতে ভরা। আলোচ্য প্রস্তর ফলকগুলির কোথাও লাস্যময় ভাবের ইঙ্গিত পর্য্যন্ত নাই। প্রম্বানানের বিষ্ণুমন্দিরে প্রস্তরময় আখ্যানগুলিতে কোথাও "রাধার" মূর্ত্তি নাই। অথচ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার প্রায় সবটাই পাষাণের ভাষায় অনূদিত রহিয়াছে। বৃহত্তর ভারতের কোথাও বংশীবাদন শ্রীকৃষ্ণের বা তাঁহার প্রেমিকা শ্রীরাধার মূর্ত্তি নাই। বৃহত্তর ভারতে বীর অবতার শ্রীকৃষ্ণই পূজিত হইয়াছেন। সেখানে প্রেম ভালবাসার নায়করূপে শ্রীকৃষ্ণকে কেহ চিনে না। পরাধীন হিন্দু জাতির বৈষ্ণবশাখা বীরাগ্রগণ্য শ্রীকৃষ্ণকে উপেক্ষা করিয়া বিলাসপরায়ণ নৃত্য-গীত-বাদ্যরত শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার কল্পিত প্রণয়িনী (রাধা) সৃষ্টি করিয়াছে। মন্দিরের ভিতরে চতুর্ভুজ বিষ্ণুর মূর্ত্তি অবস্থিত। উপরের দুই হাতে শঙ্খ ও চক্র আছে এবং নিচের হাত দুটি কব্জি পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। শিবের

মন্দিরের চারিদিকে চারিটি গৃহ। গর্ভগৃহটি সর্পদ্বারা বেষ্টিত। বেদীর উপর নয় ফুট উচ্চ দণ্ডায়মান শিবমূর্ত্তি। শিবমূর্ত্তির পশ্চাদ্দিকের দেওয়ালে অতি সুন্দর কারুকার্য্য-শোভিত অপর তিনটি গৃহে উপবিষ্ট গণেশ, দণ্ডায়মান শ্মশ্রুবিশিষ্ট শিবগুরু বা অগস্ত্য। শিবগুরুর দক্ষিণ হস্তে থালা এবং হস্তের পশ্চাদ্দিকে ত্রিশূল আছে। অপর একটি গৃহে চমৎকার অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনী দুর্গামূর্ত্তি। স্থানীয় কিম্বদন্তী অনুসারে দৈত্যরাজ-কন্যা লোরা জংগ্রাম এই দুর্গামূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা আছে। এই শিব মন্দিরের গাত্রে শ্রীরামচন্দ্রের জীবনের ইতিহাস আশ্চর্য্যভাবে প্রতিফলিত করা হইয়াছে। রাজা দশরথ ও তাঁহার অনুচরদিগের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহের কথোপকথন, শ্রীরামচন্দ্রের বিশ্বামিত্র মুনির তপোবনে আগমন ও যজ্ঞ শেষ করিয়া রাক্ষস মারীচকে সমুদ্রে নিক্ষেপ ও অপর রাক্ষসকে বধ, শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক হরধনু ভঙ্গ প্রভৃতি আরম্ভ করিয়া বানরসৈন্য কর্ত্তৃক সেতুবন্ধের জন্য সমুদ্রে প্রস্তর নিক্ষেপ এবং জলজন্তু কর্ত্তৃক প্রস্তর সাজান, শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও বানরকটকের লঙ্কা অভিমুখে যাত্রা পর্য্যন্ত অনেকগুলি ঘটনা প্রস্তরময় চিত্রে অনুদিত হইয়া রহিয়াছে। এইরূপে রামায়ণোক্ত মূর্ত্তিসকলের ও তাহাদের কার্য্যাবলীর সংবাদ পাওয়া যায়। প্রাম্বানানে শিবমন্দিরের গাত্রে শ্রীরামচন্দ্রের জীবনের ভিতর দিয়া বীরত্বের কাহিনী একটির পর একটি প্রস্তরময় ফলকে অভিব্যক্ত। এই শিবমন্দিরের গাত্রে বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের সতরটি দেবতার মূর্ত্তি আছে, যথা—ইন্দ্র, বৃহস্পতি, অগ্নি, যম, ব্রহ্মণস্পতি, নৈঋত, সূর্য্য, বরুণ, বায়ু, সোম, বিশ্বকর্ম্মা, শিব, কার্ত্তিক, কামদেব, কুবের, নারদ, হনুমান। বোরোবুদুরের অপেক্ষা প্রাম্বানানে শিবমন্দিরের কারুকার্য্য সূক্ষ্ম বলিয়া বোধ হয় এবং ভাস্কর্য্যশিল্পেও শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এতদ্ব্যতীত প্রাম্বানানের শিবমন্দিরের গাত্রে ঢোলকবাদ্য সহযোগে অপ্সরার নৃত্য; কল্পবৃক্ষের উপরে পক্ষীদের নীড় ও যবদ্বীপের জীবজন্তু, বৃক্ষলতা, পত্রপুষ্প, কুটীর প্রভৃতি অতি সূক্ষ্মভাবে প্রস্তরময় ফলকে খোদিত আছে। এইরূপ বিরাট্ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মনুষ্য-শ্রমের নিদর্শন এবং প্রাচীনকালের রীতি ও রুচির এত অত্যাশ্চর্য পরিসর স্থানে একত্র
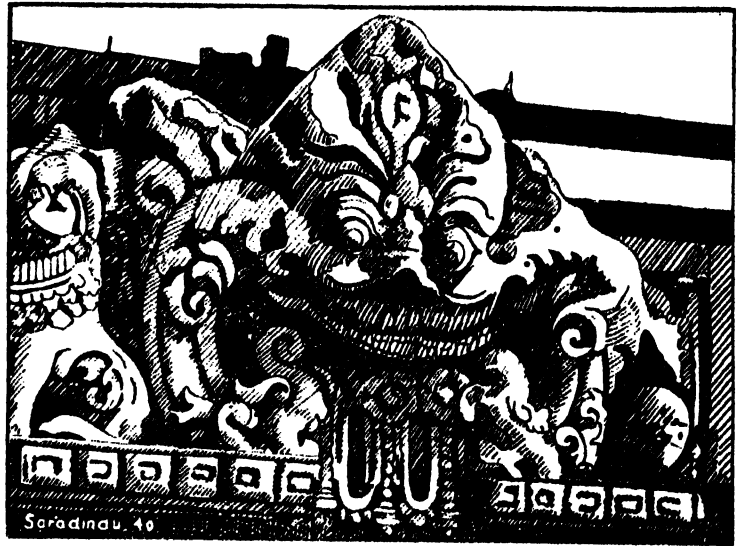
কীর্ত্তিমুখ : প্রাম্বানান

সমাবেশ যবদ্বীপের অন্য কোথাও দেখি নাই। স্থানীয় অধিবাসীরা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে এখনও পুষ্প, ধূপ, ধুনা দিয়া মন্দিরে পূজা দিয়া থাকেন। কুমারীগণ সৎ পতি লাভের জন্য ও বিবাহিতা রমণীগণ তাঁহাদের পুত্রকন্যার মঙ্গলের জন্য এইসব মন্দিরে প্রার্থনা করিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ নবম শতাব্দীতে "দক্ষ" নামে একজন রাজা এই মন্দিরগুলির নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন করেন। পুনরায় কোন অজ্ঞাত কারণে পূর্ব্ব যবদ্বীপে রাজরাণীকে স্থানান্তরিত করা হয় এবং প্রাম্বানানের মন্দিরগুলি পরিত্যক্ত হয়। প্রাম্বানানের দক্ষিণদিকে যবদ্বীপের কিম্বদন্তীতে বর্ণিত, দৈত্য রাজপুত্র রাতু বোকোর প্রাসাদ অবস্থিত। সম্ভবতঃ

ইহা প্রাচীন মাতরমের রাজধানী ছিল। বহু প্রস্তরনির্ম্মিত অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ, চারিদিকে পরিখা ও প্রাচীর বেষ্টিত প্রাসাদের স্মৃতিচিহ্ন আজও অবশিষ্ট আছে। এই ধ্বংসাবশেষ দেখিতে যাইবার পথে পাহাড়ের উপর দুইটি গুহা দেখিলাম। স্থানীয় কিম্বদন্তী অনুসারে একদা রাজারা কখন কখন নির্জ্জন ও কোলাহলবর্জ্জিত এই গুহা দুইটীতে বাস করিতেন। 'প্রাম্বানানের উত্তরদিকে চণ্ডীসেবুতে (sewu) হাজার মন্দির অবস্থিত। মন্দিরগুলি চতুষ্কোণ প্রাচীরে বেষ্টিত ও উহার চারিদিকে চারিটি দ্বার আছে।

জলনিকাশের পথ : বোরোবুদর

প্রত্যেক দ্বারে এক হস্তে সর্প ও অন্য হস্তে গদাধারী একটি করিয়া দ্বারপাল বা রাক্ষসের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি বসিয়া আছে। উচ্চ বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত প্রধান মন্দিরটি কেন্দ্র করিয়া চারিদিকে চারিটী শ্রেণীতে ২৪০টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির আছে। এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্দিরশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে আরও পাঁচটী অপেক্ষাকৃত বড় মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহা বৌদ্ধ মন্দির এবং ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য সম্ভবতঃ অসম্পূর্ণ ছিল। মন্দিরের বাহিরের ও ভিতরের গাত্র বিশেষভাবে কারুকার্য্যশোভিত। মন্দিরের ভগ্নস্তূপের ভিতর কতকগুলি বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল। শুনিলাম, বাহিরের প্রাচীরের চারিটি দ্বারের সম্মুখে চারিটী মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ছিল। ইহাদের মধ্যে তিনটি মন্দির একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কেবল দক্ষিণ দিকে অবস্থিত চণ্ডীবুব্রার (Bubrah) ভগ্নাবশেষ এখনও কিছু দেখা যায়। পূর্ব্বদিকে চণ্ডী অসু (Asu) নামে আরও একটি মন্দির ছিল। এই মন্দিরের নিকটে কম পক্ষে পাঁচটি কুবেরের মূর্ত্তি ছিল। ইহা দেখিয়া মনে হয় যে, ঐ মন্দিরটি বনদেবতাকে উৎসর্গ করা হইয়াছিল।

চণ্ডীসেবুর দক্ষিণ দিকে চণ্ডীলুমবং (Loembong) অবস্থিত। ষোলটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির দ্বারা বেষ্টিত হইয়া যে ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে তাহার নাম চণ্ডীলুমবং। মধ্যস্থলের মন্দিরে খিলান আছে; কিন্তু তাহার ভিতরে কোন মূর্ত্তি নাই। মন্দিরে কতকগুলি দণ্ডায়মান বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি খোদাই করা আছে। এই মন্দিরটি দেখিতে চণ্ডীসেবুর ন্যায়। কিন্তু কোন বারান্দা নাই ও মন্দিরের গাত্রে কোন কারুকার্য্য নাই। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, ইহা সম্পূর্ণ করা সম্ভবপর হয় নাই। চণ্ডীসেবুর উত্তর পূর্ব্ব দিকে চণ্ডীপ্লাসনের (Plaosan) অল্পবিস্তর ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। একটি সমচতুষ্কোণ প্রাঙ্গণ চারিদিকে দুই প্রস্থ প্রাচীরে বেষ্টিত। বৃহৎ প্রাঙ্গণটিকে একটি প্রাচীর দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুইটি চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণে বিভক্ত করা হইয়াছে। দুইটি প্রাঙ্গণেই একটি করিয়া বিহার আছে। ইহা চণ্ডীসেবীর অনুরূপ নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। উপর তলাটি বসবাসের জন্য ও নীচের তলাটি ধর্ম্ম-কর্ম্মের উপযোগী করিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। এই স্থানে কতকগুলি বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি পাওয়া যায়। এক্ষণে ঐগুলি যোকযাকরতার যাদুঘরে রক্ষিত আছে। বহুদিন পূর্ব্বে এই স্থান হইতে একটি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়ীর মস্তক অন্তর্দ্ধান হয়। কয়েক বৎসর পরে দেখা যায় যে, ঐ মস্তক কোপেনহেগেন যাদুঘরে রহিয়াছে। উভয় বিহারে একটি করিয়া গবাক্ষ সংযুক্ত পার্শ্বগৃহ আছে এবং এইগুলি বারান্দার ন্যায় ব্যবহার করা হইত। বারান্দার পার্শ্বের দেওয়ালের কুলুঙ্গীতে মূর্ত্তি ছিল। এই মন্দির যখন আবিষ্কার হয়, তখন ১৮টি বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি পাওয়া যায়, কেবল বেদীর উপরে উপবিষ্ট বুদ্ধ

মূর্তিগুলি পাওয়া যায় নাই। গৃহগুলির পশ্চাৎ দিকের দেওয়ালের পশ্চাতে যজ্ঞবেদীর উপরেও কয়েকটি মূর্তির সন্ধান পাওয়া যায়। দুইটী প্রাচীরের মধ্যে তিন সারিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরের এখনও ধ্বংসাবশেষ আছে। এই বেদীগুলির উপরে ঘণ্টাকারের ক্ষুদ্র ইমারতের অবশিষ্ট উর্দ্ধাংশ স্তূপের অস্তিত্বের পরিচয় দেয়। এই স্তূপের সারির প্রত্যেক কোণে একটী করিয়া উপবিষ্ট ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূর্ত্তিসহ মন্দির ছিল এবং ক্ষুদ্র স্তূপগুলির ভিতরে এক একটি পাত্রে মৃত ব্যক্তির ভস্ম ছিল। যোকযাকরতা হইতে প্রাম্বানানে যাইবার পথে পশ্চিম দিকে চণ্ডী কালসন (Kalasan) বা কালি বোনিং এর ধ্বংসাবশেষ আছে। চণ্ডী কালসন যবদ্বীপে সর্ব্বপ্রথম বৌদ্ধ-মন্দির। এই মন্দির বোরোবুদর হইতে সম্ভবতঃ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। এই মন্দিরটির মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ গৃহ ও চারিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ আছে। পূর্ব্ব দিকের গৃহটি প্রধান মন্দিরের সহিত সংলগ্ন, কোন গৃহেই মূর্ত্তি নাই। মন্দিরের চারিদিকে চারিটি সোপানবলী ও চারিটি প্রবেশ-পথ আছে, প্রত্যেক প্রবেশ-পথ দিয়া মন্দিরের পার্শ্বগৃহে যাওয়া যায়। মন্দিরের দক্ষিণ দিকের প্রবেশ-পথ সূক্ষ্ম কারুকার্য্য দ্বারা সুশোভিত। প্রবেশ-পথের খিলানের দুই পার্শ্বে দুইটি সুন্দর মকরের মুখ এবং শিরোদেশে আড়ম্বরপ্রকাশক কীর্ত্তিমুখ আছে। কারুকার্য্যভূষিত প্রবেশ দ্বারের দুই পার্শ্বে ক্ষুদ্র দুই কুলঙ্গীতে বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে।

বৃহৎ কুলঙ্গীগুলির ভিতর বেদীর উপরে বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি আসীন আছে। মন্দিরের তিনতলা ছাদ এবং প্রত্যেক ছাদের নিজস্ব কার্ণিস্ বর্ত্তমান। সর্ব্বনিম্ন তলাটি কুড়ি-কোণ বিশিষ্ট এবং কুলুঙ্গীর দ্বারা সাজান। প্রত্যেক কুলুঙ্গীর ভিতর পদ্মপত্রে উপবিষ্ট ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় তলার ছাদ আটকোণ বিশিষ্ট। প্রত্যেক দিকে এক একটি কুলুঙ্গীতে ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূর্ত্তি ও কুলুঙ্গীর দুই দিকের ফলকে দণ্ডায়মান বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি খোদিত আছে। সর্ব্ব উপরের ছাদের আটটী কুলুঙ্গীতে আটটি ধ্যানমগ্ন মূর্ত্তি আছে। তিনটি তলাতেই স্তূপ-মালার দ্বারা সজ্জিত চণ্ডীকালসনের সন্নিকটে চণ্ডীসরি (sari) অবস্থিত। ইহা মন্দির নহে। যতিদিগের মঠ বা চণ্ডীকালসনের পুরোহিতদিগের অথবা চণ্ডীসরির রক্ষক-দিগের বাস ভবনের জন্য উহা ব্যবহৃত হইত। সম্ভবতঃ এই অট্টালিকাটি সভাগৃহ ছিল এবং যতিরা এই স্থানে ধর্ম্মসভা করিতেন। এই অট্টালিকার দেয়ালে বহির্গত তোরণ-আকারে শোভিত কুলুঙ্গীগুলি দেখিলেই তিনতলা বলিয়া ভ্রম হয়। বস্তুতঃ ইহা একতলা। ইহার ছয়টি গৃহ, উচ্চ জায়গায় তিনটি ও নিম্ন জায়গায় তিনটি। এই অট্টালিকার বহির্ভাগ নয়নরঞ্জন কারুকার্য্য দ্বারা অলঙ্কৃত। জানালার ফলকগুলির দুই দিকেই প্রতিমূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। মধ্য যবদ্বীপের মন্দিরগুলি প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর অপর একটি প্রস্তর খণ্ড দিয়া সাজান এবং গাঁথুনির জন্য কোন রকম মালমসলা ব্যবহার

শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক রাক্ষস বধ : প্রাম্বানান শিবমন্দির : মধ্য যবদ্বীপ

বোরোবুদরের স্তূপ

বর্ষীয়া রাজকুমারীরা পর্ব্বাদি উপলক্ষে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সমক্ষে নৃত্য করিয়া থাকেন। রাজপরিবারের যুবকগণও নৃত্য ও নাট্যাভিনয়ে সুদক্ষ। যোকযাকরতার ও সুরকরতার প্রাচীন যবদ্বীপবাসীর আচার-ব্যবহার, রীতি, নীতি, বেশ, ভূষা, শিল্পকলা দেখিতে পাওয়া যায়। সুলতানগণ প্রাচীন যবদ্বীপবাসীর রীতি অনুযায়ী অন্নপ্রাশন এবং বিবাহাদি শুভকার্য্য উপলক্ষ্যে আম্রপল্লব, পূর্ণকুম্ভ ও কদলীবৃক্ষ

করা হয় নাই। মধ্য যবদ্বীপের মন্দিরগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইবার ও রাজধানী পূর্ব্ব যবদ্বীপে স্থানান্তরিত করিবার কারণ হইয়াছিল সম্ভবতঃ ভূমিকম্প। নানাকারণে মধ্য যবদ্বীপের মন্দিরগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল। ওলন্দাজ অধিকৃত দ্বীপপুঞ্জের প্রত্নতত্ত্ববিভাগ অত্যন্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত হিন্দু-মন্দিরগুলির সংস্কারে যত্নবান্ হইয়াছেন ও কতকগুলি মন্দিরের সংস্কার করিয়াছেন। এইজন্য তাঁহারা প্রত্যেক হিন্দুমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ।

মধ্য যবদ্বীপের প্রাচীনকালের হিন্দুদিগের অদম্য উৎসাহ ও অপূর্ব্ব কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া ভগ্ন অন্তঃকরণে সুরকরতা বা কোলোয় আসিলাম। সুরকরতায় সুলতানের রাজধানী অবস্থিত। সুলতানের উপাধি ভুবন সেনাপতি ও সুসুহুনান। চারিদিকে প্রাচীরবেষ্টিত প্রাঙ্গণের মধ্যে রাজবাটী অবস্থিত। প্রাঙ্গণের মধ্যে রাজকর্ম্মচারীদিগের ও সুলতানের আত্মীয় স্বজনের বাসস্থান। রেসিডেন্টের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া প্রতি বুধবার রাজবাটী বা ক্র্যাটন্ দেখিতে পাওয়া যায়।

গণেশমূর্ত্তি: যাভা

যোক্‌যাকরতার ও সুরকরতার সুলতানদিগের প্রাসাদে রাজবাটীর স্ত্রীলোকেরা বিশেষতঃ দ্বাদশ হইতে চতুর্দ্দশ দ্বারা তাঁহাদের প্রাসাদের তোরণ-দ্বার অদ্যাবধি সজ্জিত করিয়া থাকেন। সুরকরতায় যোকযাকরতার ন্যায় ওয়াং

ওয়াং ও ওয়াং কুলিতের অভিনয় হইয়া থাকে। সুর-করতায় শ্রীবেদারির (Sri wedari) যাদুঘরে কতকগুলি তাম্রশাসন, নানারূপ পিতলের ও প্রস্তরের দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রভৃতি রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে সিংহোপরি পদ্মাকার আসনে উপবিষ্ট পিতলের ছয় হাত বিশিষ্ট তারামূর্ত্তি ভ্রমণকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মূর্ত্তিটির দক্ষিণপদ একটি পদ্মের উপর রহিয়াছে এবং ছয় হস্ত ছয়টি গুণ প্রকাশ করিতেছে। সম্ভবতঃ ৯১৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ব যবদ্বীপে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। মধ্য যবদ্বীপে মাতরমের হিন্দুরাজত্ব ৮৬৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ৯১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। ৮৭৬ শকাব্দের (৯২৪ খৃঃ) একটি শিলালিপিতে দেখা যায়, মধ্য ও পূর্ব্ব যবদ্বীপের রাজা ভব কুভকতান মন্দিরের জন্য সঙ্গুরম নামে একটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। উক্ত শিলালিপিতে রাজা ভবএর মহাপতি বা মন্ত্রী পু-সিন্দোকের (Mpusindok) নাম উল্লেখ আছে। রাজা ভবর মৃত্যুর পর যবদ্বীপের ইতিহাস হইতে মধ্য যবদ্বীপের নাম মুছিয়া যায়। হিন্দুপ্রভাবও এই সময় হইতে লোপ পাইতে আরম্ভ করে। বৃহত্তর ভারতের অধুনা লুপ্তপ্রায় এই সকল হিন্দু কৃষ্টি ও সাংস্কৃতির নিদর্শন দেখিয়া সত্যই মন গর্ব্বে ভরিয়া উঠিল।

আগমনীর সুরে

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

১

দরিদ্র কেরাণী কামাখ্যানাথের ছয়-সাত বৎসর বয়সের ফুটফুটে ছোট মেয়ে মিনু দোতালার সঙ্কীর্ণপরিসর বারান্দার এক কোণে সারাদিন খেলা করে; ঘন, কালো কুঞ্চিত বাবরি-কাটা একমাথা চুল বাতাসে উড়াইয়া, বড় বড় দুইটি টানা চোখ ও মুক্তার মত দুই পাটি দন্তের আভায় পূর্ণিমার রাত্রির বীচিবিক্ষুব্ধ গঙ্গাবক্ষের স্নিগ্ধ চপল দীপ্তি ফুটাইয়া আকাশের বিদ্যুতের জীবন্ত একটি শিখার মত সারা বারান্দায় ছুটিয়া বেড়ায়, কখনও নীচে ফুটপাতের উপরেও নামিয়া আসে, কদাচিৎ পথ পার হইয়া ও-পাশের মুদীর দোকান হইতে গৃহস্থালীর দুই একটি ছোটখাট জিনিষও কিনিয়া লইয়া যায়।

একটু বেলায় প্রত্যহই মেয়েটির মা কালীতারা অ্যালুমিনিয়ামের ছোট, নোংরা একটি বাটিতে করিয়া মেয়ের জন্য হয় এক মুঠা মুড়ি মুড়কী, না হয় সস্তা দামের দুই একখানা বিস্কুট লইয়া বাহির হইয়া আসে। চোখে পড়িতেই মিনু উৎসাহ ও আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠে, খেলা ফেলিয়া সাগ্রহে দুই হাত বাড়াইয়া মায়ের কাছে ছুটিয়া আসে, বাঁশীর মত মিষ্টি মিহি সুর তাহার কণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়া উঠে, "আমার খাবার—দাও মা, দাও।"

অন্তরের গভীর আনন্দানুভূতি কালীতারার চোখের দৃষ্টি, ওষ্ঠের হাসি ও গণ্ডের প্রদীপ্ত আভার ভিতর দিয়া সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠে। খেলার ছলে খাবারের বাটিটি ছোট মেয়ের নাগালের ঊর্দ্ধে তুলিয়া সহাস্য কুটিল কটাক্ষে মিনুর মুখের দিকে চাহিয়া মা বলে, "দেব? কেন দেব? সকাল থেকে একবারও তুমি আমার কাছে যাওনি। তোমায় আমি খেতে দেব না তো—তুমি যাও, খেলগে'।"

মিনু ভয়ও পায় না, ক্ষুব্ধ ও হয় না; বরং খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠে এবং মায়ের কোমর জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া নিজেরই হাসির ছন্দের তালে তালে স্বতঃস্ফূর্ত্ত নৃত্যের ভঙ্গীতে কোলে উঠিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিতে থাকে, "দাও মা, দাও।"

কালীতারা ঈষৎ নত হইয়া মেয়েকে বুকের উপর তুলিয়া লইয়াও মিথ্যা করিয়া বলিতেই থাকে, "দেব না, দেব না—"

কোন কোনদিন কামাখ্যানাথকেও বারান্দায় দেখা যায়—মলিন বসন, শীর্ণ দেহ ও শুষ্ক মুখের উপর দারিদ্র্য ও তৎসঞ্জাত অকাল বার্দ্ধক্যের সুস্পষ্ট ছাপ-আঁকা বাংলার 'ভদ্রলোকে'র সুপরিচিত মূর্ত্তি। মিনুর পিছনে দাঁড়াইয়া গভীর মমতার দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া

থাকিয়া হঠাৎ এক সময়ে মেয়েটির ঝাঁকড়া চুলের কয়েকটি গুচ্ছ মুঠার মধ্যে হাল্‌কাভাবে চাপিয়া ধরিয়া সে কৃত্রিম কোপের সঙ্গে বলিয়া উঠে, "কি রে বুড়ী, খেলা নিয়েই কেবল থাকবি বুঝি ? লেখাপড়া করবি নে ?"

হাসি মুখ ফিরাইয়া মিনু পিতার মুখের দিকে চায়, কিন্তু পরক্ষণেই অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিয়া উঠে, "না, করব না ; কেন করব ? তুমি তো আমার গলার হার এখনও গড়িয়ে দিলে না।"

মেয়েকে কোলে তুলিয়া লইয়া কামাখ্যানাথ অপ্রস্তুতের মত উত্তর দেয়, "দেব মা দেব ; এবার পুজোর সময় নিশ্চয়ই সোণার হার এনে দেব।"

ফুলের মত সুন্দর, রামধনুর মত বিচিত্র ও নির্ঝরিণীর মত প্রাণচঞ্চল এই মেয়েটি। কি বর্ণ, কি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন, কি অন্তরের সেই অবর্ণনীয় সুষমা যা হাসির লাস্যে, গতির ছন্দে ও কণ্ঠের ঝঙ্কারে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নূতন হইয়া ফুটিয়া উঠে,—দর্শকের মন মুগ্ধই করে, কিন্তু উহার সীমানার মধ্যে পাকাপাকি ধরা দেয় না—ইহাদের কোনটির বাঞ্ছনীয় কোন কিছুরই অভাব যেন এ মেয়েটির মধ্যে নাই। অযত্নবর্দ্ধিত অবিন্যস্ত কেশ, অমার্জ্জিত তনুশ্রী এবং সস্তা দামের ছিটের কাপড়ের শতছিন্ন ধূলি-মলিন ফ্রকটির ভিতর দিয়াও তাহার যে রূপ নিরন্তর ঠিক্‌রাইয়া পড়ে উহা দেখিয়া তৃপ্তি আর হয় না।

হয় না যে তাহা পথের অপর পারে দ্বিতলের বারান্দায় উপবিষ্টা কমলার বুভুক্ষু চক্ষের কাতর দৃষ্টির মধ্যে সুস্পষ্ট দেখা যায়।

ভোরেই স্নান সারিয়া মেঘের মত কালো, সুদীর্ঘ চুলের রাশি পিঠের উপর ছড়াইয়া দিয়া কমলা সেই যে এদিকের বারান্দায় টুলের উপর আসিয়া বসে, তাহার পর রৌদ্রের তাপ অসহ্য হইয়া না উঠা পর্য্যন্ত সে মিনুর দিকে চাহিয়া রোজই বসিয়া থাকে। মেয়েটিকে যতই সে দেখে, ততই তাহার নিজের অতীত জীবনের অসংখ্য স্মৃতি বায়স্কোপের ছবির মত তাহার মনের পটের উপর ফুটিয়া উঠিতে থাকে। আজ সে পতিতা। সমাজ ও সংসারের অসংখ্য নিষ্ঠুর অনুশাসনের নির্ম্মম বন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের দুর্ভেদ্য আশ্রয় ও স্নেহের বাহুডোর হইতেও সর্ব্বতোভাবেই মুক্ত হইয়া আজ সে একেবারেই পথের উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। জোর করিয়া তাহার গতিকে বাধা দিতে পারে, এমন কেহই যেমন তাহার নাই, তেমনই তাহার সম্ভ্রমকে রক্ষা করিবার মত নিতান্ত পাতলা সামান্য একটু আবরণও কোথাও আর তাহার পাইবার উপায় নাই। সে বারবণিতা। নিতান্ত নগণ্য যে পুরুষ, সমাজে কুষ্ঠ রোগীর মতই যে ঘৃণিত, সেও পথ চলিবার কালে নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে তাহার লালসা-কলুষ দৃষ্টি দিয়া কমলার সর্ব্বাঙ্গ লেহন করিয়া যাইতে পারে—প্রতিবাদ করিবার অধিকার আজ আর কমলার নাই। নিজের দেহকে সর্ব্বতোভাবে পুরুষের লোভনীয় করিয়া প্রত্যহ অসংখ্য পুরুষের দৃষ্টিতলে স্থাপন করাই তাহার ব্যবসায়ের একমাত্র কৌশল। পরিচিত, অর্দ্ধপরিচিত, অপরিচিত যে কোন পুরুষই তাহাকে যাচ্ঞা করুক না কেন, তাহারই বাহুবন্ধনের মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করিয়া দেওয়াই তাহার বৃত্তি।

অথচ চিরদিনই এমন ছিল না। একদিন তাহারও ঘর ছিল, সংসার ছিল, সে সংসারে তাহার সুস্থ, সবল স্বামী ছিল ; অতি অল্পদিনের জন্য হইলেও স্বামীকে সে অন্তরে ও বাহিরে নিবিড়ভাবেই লাভ করিয়াছিল। যৌবনোদ্গমের পর স্বপ্নের মত ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু স্বপ্নের মতই তীব্র সুখানুভূতি-পরিপূর্ণ সেই দিনগুলির স্মৃতি আজও থাকিয়া থাকিয়া কমলার মনের কোণে ভীড় জমাইয়া তোলে। হায় রে ! সে জীবনে দারিদ্র্য ছিল, অভাবের দুঃসহ ক্লেশ ছিল, তবু কত মধুই না ছিল তাহার সেই স্বল্পকালস্থায়ী গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যে ! তাহার বর্ত্তমানের পথের উপরকার নির্বন্ধন জীবনে সে দারিদ্র্য আর নাই, কিন্তু দারিদ্র্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবনের সমস্ত মধুও যে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে !

কমলার মনে পড়ে তাহার গার্হস্থ্য-জীবনের কথা, তাহার স্বামী হারাইবার কথা, তারপর প্রতিবাসী এক প্রবঞ্চক যুবকের প্রলোভনে পড়িয়া ধীরে ধীরে পাপের পথে তাহার সশঙ্ক, কিন্তু উন্মাদনাময় অভিযানের কথা। সব চাইতে বেশী করিয়া তাহার মনে পড়ে, স্বামী বর্ত্তমানে যে সৌভাগ্য তাহার হয় নাই, স্বামীর মৃত্যুর পর নারীর

দেহ ও মনের শাশ্বত লালসার গোপন পরিতৃপ্তির ফলে তাহার সেই মাতৃত্বের অভিজ্ঞতা লাভের কথা। কি সুখের সে অনুভূতি, অথচ কি শোচনীয় তার পরিণতি! যাহার কার্য্যের ফলে নারীজীবনের চরম ও পরম লাভ তাহার নিজের দেহের মধ্যেই ফুলের সুবাস ও ফলের ঐশ্বর্য্য লইয়া বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই স্বার্থপর, অসংযত, কাপুরুষ যুবকেরই প্ররোচনায় তাহারই মর্য্যাদা ও নিরাপত্তার জন্য, আর তাহাকে নিরন্তর পাওয়ার পথ নিষ্কণ্টক করিবার উদ্দেশ্যেই কমলা গর্ভস্থ শিশুর সকাতর অনুনয় নিজের হৃৎপিণ্ডের গতিধ্বনীর মধ্যে শুনিতে পাইয়াও উহাকে নির্ম্মম নৃশংসতার সঙ্গে উপেক্ষা করিয়া অবৈধ উপায়ে সেই অপরিণত নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করাইবার প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছিল। সেদিন যাহাকে সে প্রিয়তম বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল, সে তাহাকে প্রকাশ্য রাজপথের উপর একেবারে নিরাবরণ করিয়া ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে; নিজের দেহজাত সন্তানকে বিসর্জ্জন দিয়াও যে সমাজের ভ্রূকুটির মর্য্যাদা সেদিন সে রক্ষা করিয়াছিল, সেই সমাজ তাহাকে পায়ের তলে দলিয়া, পিষিয়া পদাঘাতের পর পদাঘাত করিয়া স্বীয় আশ্রয় হইতে দূর করিয়া দিয়াছে। সেদিন যে যে বস্তুকে মহামূল্য মনে করিয়া তাহাদের চরণতলে স্বীয় অজাত সন্তানকে বলি দিতেও সে কুণ্ঠিত হয় নাই, তাহাদের কোনটিকে শেষ পর্য্যন্ত ধরিয়া রাখা সম্ভব হয় নাই বলিয়াই যেন আজ সেই অজাত সন্তানের অভাব বোধ অহর্নিশি কমলার অন্তরকে কাঁটার মত খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া রক্তাক্ত করিতে থাকে।

মিনুর দিকে চাহিলেই কমলার মনে হয় যে নিজের য সন্তানকে গর্ভের মধ্যেই সে অসময়ে হত্যা করাইয়াছে, সময়ে ভূমিষ্ঠ হইলে সে মেয়েই হইত এবং এতদিনে এই মেয়েটিরই সমবয়স্ক হইয়া মাথার চুল, চোখের তারা, গায়ের রুক্ ও ত্বকের বর্ণে ইন্দ্রধনুর মতই বিচিত্র ও সুন্দর হইয়া তাহার রূপের বৈচিত্র্যে কমলার জীবনকে বিচিত্র ও রসের সুমিষ্ট স্নিগ্ধতা দিয়া কমলার ঊষর হৃদয়-ক্ষেত্রকে গঙ্গাবিধৌতা ধরিত্রীর মত সরস ও উর্ব্বর করিয়া তুলিত।

মিনুর দিকে চাহিয়া চাহিয়া কমলার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিতে থাকে, কিন্তু দৃষ্টি সে ফিরাইতে পারে না।

দাসী হরিমতি আসিয়া স্মরণ করাইয়া দেয়, "দিদিমণি, বেলা যে অনেক হ'ল।" কোন কোনদিন বলে, "দু'জন বাবু এসেছে গো, আজ রাত্রে মহ্ ফিল করতে চায়।"

কোন কোনদিন কমলা উত্তর দেয়, "ফরাস পেতে বসাও গে, আমি যাচ্ছি।" কিন্তু কোন কোনদিন আবার সে চটিয়া উঠিয়া বলে, "হাকিয়ে দে গে ঝি। এ সব আর আমার সহ্য হয় না—আমি কাশী গিয়ে ভিক্ষে করে' খাব।"

২

সেদিনও সকালে কমলা পথের দিকে বারান্দায় তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে আসিয়া বসিয়াছিল।

সেদিন পঞ্চমী কি ষষ্ঠী। এদিকের পথ, মাঠ ও বাড়ীগুলির গায়ের উপর গলিত সোণার মত শরতের সোণালী রৌদ্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল আর উহারই বর্ণ ও দীপ্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ই যেন আকাশের গাঢ় নীল আরও বেশী নীল এবং নীচে গাছের পাতা ও ঘাসের সবুজ আরও বেশী সবুজ হইয়া উঠিয়াছিল। কাছাকাছি কোন এক পূজা বাড়ীতে সানাই ধরিয়াছিল আগমনীর সুপরিচিত সুর আর পাশের বাড়ীতেই গ্রামোফোনের রেকর্ড গান ধরিয়াছিল—

"রাণি, গা তোল, গা তোল;
ওঠ, চল চল;
ঐ এল, ঐ এল,
এল মা ভবানী।
রাণি—"

স্পষ্ট ও অস্পষ্ট, শ্রুত ও অশ্রুত, আগমনীর সুপরিচিত সুর কেবল শব্দেই নহে, রূপ, রস ও বর্ণের ভিতর দিয়াও আজ যেন নরনারীর মনের বীণার সূক্ষ্মতম তারটিতে পুনঃ পুনঃ ঝঙ্কার জাগাইয়া তুলিতেছিল। অথচ কমলার অন্তরের তারে আনন্দের একটি ঝঙ্কারও উঠিল না। নিজের গর্ভজাত যে সন্তানকে একটি মুহূর্ত্তের জন্যও সে চোখে দেখে নাই, সেই সন্তানের জন্যই তাহার অন্তর

আজ নিরন্তর 'হায়, হায়' করিয়া কাঁদিতে লাগিল আর তাহার বুকের ভিতরের বেদনা যতই তীব্র হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই তাহার দুই প্রত্যাশী চক্ষের ব্যাকুল দৃষ্টি সম্মুখের বাড়ীর বারান্দায় মিনুর অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিল।

কিন্তু মিনু আসিল আজ অনেক বিলম্বে এবং তাহাকে দেখিয়া প্রথম দিকে কমলার বিস্ময়ের আর অন্ত রহিল না। মেয়েটি বারান্দায় আসিল—রোজ যেমন আসে তেমন হাঁটিয়া নহে, মায়ের কোলে চড়িয়া; অন্য দিনের মত ছেঁড়া নোংড়া একটি ফ্রক্ পরিয়া নহে, মামুলি হইলেও নূতন একটি ফ্রক্ পরিয়া, আর সবার চাইতে যাহা বেশী লক্ষ্য করিবার মত, অন্যান্য দিনের মত হাসিমুখে নহে, কাঁদিতে কাঁদিতে।

কমলা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল, মেয়েটি কাঁদিতেছে—মায়ের বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কি তাহার কান্না! মুহূর্ত্তের জন্যও যাহার মুখের হাসি সে নিভিতে দেখে নাই, আজ তাহারই এই ভাবান্তর দেখিয়া কমলার বিস্ময় দেখিতে দেখিতে উদ্বেগে পরিণত হইল।

একটু পরেই কামাখ্যানাথ ম্লানমুখে ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিল, স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পারলে না শান্ত করতে?"

সরু গলির ওপার হইতে কমলা স্পষ্ট শুনিতে পাইল—স্বামীর প্রশ্ন এবং স্ত্রীর উত্তরও।

ম্লানমুখে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কালীতারা উত্তর দিল, "এতদিন আশায় আশায় রেখে আজ ওকে নিরাশ করেছ। হ'লই বা ও ছোট; তবু এতটুকু ও বুঝতে পারে।"

কামাখ্যানাথ একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, "কি করব বল! সোণার হার—যত ছোটই হউক, সে তো কেবল মুখের কথায় পাওয়া যায় না!"

কালীতারার চোখে জল দেখা দিল। রোরুদ্যমানা কন্যাকে বুকের উপর আরও জোরে চাপিয়া ধরিয়া সে নীচে পথের দিকে চাহিল।

পথে জনস্রোত চলিয়াছে—অগণিত যান, বাহন, নরনারীর বিচিত্র জনস্রোত। কিন্তু চোখে যাহা পড়ে এবং অন্য যে কোন দৃশ্যের চাইতে বেশী যাহা আজ মনকে নাড়া দেয়, উহা বালকবালিকার উল্লাসমুখর জয়যাত্রা—বিচিত্র বেশভূষা ও মনোহর আভরণে সজ্জিত হইয়া ছোট বড় ধনী নির্ধনের ছেলেমেয়েরা সবাই আজ হাসি মুখের ফুল ফুটাইয়া মহোল্লাসে পূজা দেখিতে বাহির হইয়াছে।

কন্যাকে আরও জোরে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া কালীতারা স্বামীর মুখের দিকে ফিরিয়া চাহিল, কহিল, "দেখ, আজকাল বাজারে কেমিকেলের অনেক জিনিষ খুব সস্তা দামে পাওয়া যায়। না হয় তারই এক ছড়া হার বাছাকে আমার এনে দাও। দাম খুব বেশী লাগবে না।" একটু থামিয়া, একবার ঢোক গিলিয়া সে পুনরায় কহিল, "আমার পূজার কাপড় এবার আর না আনলে। সেই টাকা দিয়েই ওকে যা হয় একছড়া হার এনে দাও।"

কমলা আর শুনিতে পারিল না। সহসা তাহার সর্ব্ব অঙ্গে যেন আগুন ধরিয়া উঠিল। সে নিজের দেহের দিকে চাহিল—গিনি সোণার উপর দামী পাথরের কাজ করা কত অলঙ্কারই না সে সর্ব্বাঙ্গে পরিয়া আছে! তাহার পরিধানের আটপৌরে শাড়ীখানির পাড়ের নক্সার মধ্যেই যতটুকু সোণা আছে, বোধ করি উহাতেই ঐ ছোট মেয়েটির গলার হার গড়া যাইতে পারে। কমলার এত ভালবাসার ধন ঐ মিনু হার না পাইয়া কাঁদিয়া সারা হইতেছে, আর এদিকে নিজে সে এত সোণাদানা গায়ে পরিয়া বসিয়া আছে? তাহার পরিধানের বস্ত্র ও গায়ের অলঙ্কার সহসা যেন জলন্ত অঙ্গার হইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে ছেঁকা দিয়া ফিরিতে লাগিল। দুই হাতের দুই তর্জ্জনী দিয়া স্বীয় কর্ণদ্বার রুদ্ধ করিয়া কমলা কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া ভিতরে চলিয়া গেল এবং নিজের গায়ের সমস্ত অলঙ্কার টানিয়া টানিয়া খুলিয়া ফেলিয়া অনাবৃত মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া ঐ মেয়েটির মতই সেও ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

অনেকক্ষণ পর অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া আবার যখন কমলা পথের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন বিপরীত দিকের বারান্দায়ও ঝড়বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, ভাঙা মেঘের ফাঁকে সূর্য্যও উঠিয়াছে।

কমলা শুনিতে পাইল, মা মেয়েকে বলিতেছে, "উনি গেছেন তোমার হার কিনতে। এইবার লক্ষ্মী মেয়ের মত আমার একটি কাজ ক'রে দাও তো মা।"

মিনু হাসিয়া, নাচিয়া, আনন্দে ফাটিয়া পড়িবার মত হইয়া কহিল, "সত্যি? আজই পাব ত মা? কখন? কখন বাবা হার নিয়ে আসবে?"

মেয়েকে বুকে তুলিয়া লইয়া তাহার গণ্ড ও ললাটের উপর উপর্য্যুপরি কয়েকটি চুম্বন করিয়া মা কহিল, "এই এক্ষুণি আসবে মা। ততক্ষণে ঐ মুদীর দোকান থেকে তুমি আমাকে এক পয়সার লঙ্কা এনে দাও। ছুটে যাবে, আর ছুটে আসবে। কিন্তু খুব সাবধান—গাড়ী চাপা পড়ো না যেন।"

একটু পরেই মেয়েটি নীচে নামিয়া আসিল। কমলা দেখিল—মেয়েটি সন্তর্পণে পথ পার হইয়া তাহারই বাড়ীর পাশের মুদী দোকানের দিকে আসিতেছে।

ক্ষণকাল পূর্ব্বে কমলা নিজের দেহে অগ্নিশিখার নিষ্ঠুর অবলেহন অনুভব করিয়াছিল, এখন তাহার মাথার মধ্যে অকস্মাৎ যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ন্যায় অন্যায়, ভাল মন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা হারাইয়া একটা দুর্ব্বোধ্য, দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তির প্রেরণায় সে নিজেও ছুটিয়া নীচে নামিয়া আসিল।

ভীড় ঠেলিয়া, যানবাহন এড়াইয়া ছোট মেয়েটি ছুটিয়া আসিতেছিল নদীর বুকের রামধনু আঁকা চঞ্চল একটি তরঙ্গের মত। একমাথা ঘন কালো কুঞ্চিত কেশের মধ্যে গৌরবর্ণ নিটোল সুন্দর মুখখানি শারদ সূর্য্যের উজ্জ্বল সোণালী আলোকে আজ বড় স্পষ্ট হইয়াই কমলার চোখে পড়িল। কি একটা উন্মত্ত আবেগে কেবল কমলার অন্তরই নহে, দেহখানিও থর থর করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল। নিশ্বাস বন্ধ করিয়া সে সম্মুখের বাড়ীর দোতালার দিকে চাহিল,—মেয়েটির মাকে বারান্দায় আর দেখা গেল না। পরক্ষণেই কমলা পথে নামিয়া মেয়েটির পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল।

বাধা পাইয়া মিনু চোখ তুলিয়া চাহিল। ভাসা ভাসা, ডাগর চোখ দুইটিতে ফুটিয়া উঠিল খানিকটা বিরক্তি, ঈষৎ আশঙ্কা এবং অনেকখানি বিস্ময়। কিন্তু সে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই কমলা নত হইয়া নিজের দুই হাতে মেয়েটির গালের কাছ দিয়া ছোট মুখখানির প্রায় সবটুকুই চাপিয়া নিজের মুখের কাছাকাছি আনিয়া কোমল সহাস্য কণ্ঠে কহিল, "এস খুকী, এস; তোমার বাবা তোমার হার নিয়ে আমার ঘরে বসে রয়েছেন যে!"

কমলার মুখ মিনুর পরিচিত, নিজের বাড়ীর বারান্দা হইতে প্রত্যহই এ মুখ সে দেখিয়াছে। বোধ করি সেই জন্যই তাহার মুখের শঙ্কিত, বিহ্বল ভাবটা সম্পূর্ণ না হইলেও, অনেকটা কাটিয়া গেল।

কমলা পুনরায় কহিল, "চমৎকার হার, এমন সুন্দর মানাবে তোমার গলায়!" বলিতে বলিতে আরও একটু নত হইয়া সে মেয়েটির ললাট চুম্বন করিল।

এবার মিনুর মুখের উপর হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "বাবা এনেছে? আমার হার? কোথায়?"

সম্মুখের বাড়ীর বারান্দার দিকে কমলা চকিতে আর একবার চাহিয়া লইল—না, মেয়েটির মা সেখানে নাই। পরক্ষণেই সে মিনুকে বুকের উপর তুলিয়া লইয়া তাহার কচি মুখখানি নিজের গালের উপর চাপিয়া ধরিয়া আবেগের কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "আমার ঘরে গো। দেখবে, এস।"

কমলার কোমল বাহু দুইটির বলিষ্ঠ বেষ্টন, তাহার উন্নত বক্ষ ও সুপুষ্ট গণ্ডের উষ্ণ স্পর্শ ও নিবিড় সান্নিধ্যের মধ্যে মেয়েটি বোধ করি তাহাই অনুভব করিল, জন্ম হইতেই, ভাষাবোধ জন্মিবার অনেক পূর্ব্বেই মায়ের বুকের নিবিড় স্পর্শের মধ্যে যাহা নিরন্তর অনুভব করিয়া যাহার সম্বন্ধে কোন শিশুই বোধ করি কোনদিন ভুল করে না। একান্ত নির্ভর ও গভীর বিশ্বাসে কচি হাত দুইখানি দিয়া তৎক্ষণাৎ কমলার গলা জড়াইয়া ধরিয়া মিনু সোৎসাহ কণ্ঠে কহিল, "চল, আমি হার নেব,—আমার হার।"

মেয়েটির টোল-খাওয়া গাল দুইটি টিপিয়া দিয়া কমলা কহিল, "নেবে বই কি, এখনই নেবে। চল আগে ঘরে।"

"কিন্তু মা?" হঠাৎ মিনু জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল।

তাহার মাথাটি তাড়াতাড়ি নিজের গালের উপর চাপিয়া ধরিয়া কমলা সশঙ্ক দৃষ্টিতে আবার সম্মুখের দিকে চাহিল। মিনুদের বাড়ীর বারান্দায় তাহার মাকে দেখিতে না পাইয়াই যেন কতকটা আশ্বস্ত হইয়া কমলা

কহিল, "মা, মা,—তোমার মা জানে, তুমি আমার কাছে আছ।" বলিতে বলিতেই সে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া তৎক্ষণাৎ সদর দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

দাসী হরিমতি মেয়ে দেখিয়া অপরিসীম বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "মেয়ে কোথায় পেলে দিদিমণি? কার মেয়ে এ?"

"মেয়ে আমার", মিনুকে বুকের উপর আরও জোরে চাপিয়া ধরিয়া কমলা উত্তর দিল, "হারিয়ে গিয়েছিল, এতদিন পর ফিরে' পেয়েছি।"

আশঙ্কায় দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তথাপি হরিমতি কহিল, "কিন্তু—"

দুই চক্ষের ক্রুদ্ধ জ্বলন্ত দৃষ্টি দাসীর মুখের উপর বিন্যস্ত করিয়া কমলা কহিল, "তুই থাম্", এবং পরক্ষণেই এক রকম ছুটিতে ছুটিতে সে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

শুইবার ঘরে যে খাটের উপর কমলা ক্ষণকাল পূর্ব্বে নিজের গায়ের অলঙ্কারগুলি ছড়াইয়া ফেলিয়া গিয়াছিল, উহারই উপর মেয়েটিকে বসাইয়া দিয়া পরিত্যক্ত অলঙ্কারগুলি একে একে উহারই কোলের কাছে রাখিতে রাখিতে কমলা কহিল, "এ সব গয়না তোমার। এ ছাড়া আরও অনেক আছে ঐ বাক্সের মধ্যে। সে সবও আমি তোমাকেই দেব।"

সোনা জহরতের এত সব সুদৃশ্য অলঙ্কার মিনু ইতিপূর্ব্বে কোনদিনই চোখে দেখে নাই। উহা আজ কেবল চোখের দেখাই নহে, নিজের পায়ের কাছে নিজের আয়ত্তের মধ্যে দেখিতে পাইয়া তাহার উল্লাসের আর অন্ত রহিল না। দুই হাতের মুঠার মধ্যে যে কয়খানি সম্ভব অলঙ্কার সজোরে চাপিয়া ধরিয়া আনন্দের আতিশয্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়া খাটের উপরেই সে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিয়া দিল এবং অর্থহীন কাকলি ও ছন্দহীন নৃত্যের মধুর কল-ঝঙ্কারে মুহূর্ত্তে সমস্ত বাড়ীখানি মুখরিত হইয়া উঠিল।

আনন্দের প্রথম উচ্ছ্বাস কাটিয়া গেলে মিনু আবার কমলার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "এ সব গয়না পরে' আমি পূজো দেখতে যাব? সব? একখানাও আর কেউ নেবে না?"

অকস্মাৎ রুদ্ধ অশ্রু কমলার দুই চোখ ছাপাইয়া বন্যার বেগে বাহির হইয়া আসিতে লাগিল এবং অপরিসীম আবেগে মিনুর গণ্ড, ওষ্ঠ ও ললাটের উপর অজস্র চুম্বন বর্ষণ করিতে করিতে উহারই অবসরে কমলা থামিয়া থামিয়া অবরুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "সব তোমার মা, সব। আমি শুদ্ধ তোমার। আমাকেও নিতে হবে কিন্তু।"

"কিন্তু বাবা? বাবা কৈ?" মিনু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল।

কমলার মুখের উপর কে যেন একটা আঘাত করিল। পাংশুমুখে সচকিতে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া সে বার দুই ঢোক গিলিয়া পরে উত্তর দিল, "তোমার বাবা এ সব রেখে একবার বাইরে গেছেন। এখনিই আসবেন।" মেয়েটির চোখের দিকে এবার আর সে চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না।

কিন্তু উত্তর শুনিয়া উহা বিশ্বাস করিতে মিনুর বোধ করি কোন অসুবিধা হইল না, অন্ততঃ এই প্রসঙ্গটিকেই টানিয়া সে আর দীর্ঘ করিল না। আপাততঃ যাহা তাহার সমগ্র অন্তরকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, সেই অলঙ্কারেরই একখানি কমলার মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া সাগ্রহকণ্ঠে মিনু কহিল, "পরিয়ে দাও। এটা কোথাকার গয়না? গলায় পরা যাচ্ছে না তো!"

কমলা মুখ ফিরাইয়া মিনুর মুখের দিকে চাহিল—অপূর্ব্ব সুন্দর মুখ, কিন্তু ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত। দীর্ঘকালের অযত্নে গলায়, কাণে, এমন কি গাত্রের উপরেও ময়লা জমিয়া রহিয়াছে। এমন ঘন, কালো, কুঞ্চিত কেশ—কিন্তু উহারও স্থানে স্থানে জট বাঁধিয়া আছে। ভালবাসার অসংযত উচ্ছ্বাসে এই ছোট মেয়েটিকে দলিয়া, পিষিয়া সে নিজেও তাহার উপর এতক্ষণ যে অত্যাচার করিয়াছে, বিপর্য্যস্ত কেশ ও লাঞ্ছিত ত্বকের উপর তাহারও চিহ্ন কমলা কালিমারেখায় অঙ্কিত দেখিতে পাইল।

বাষ্পের উচ্ছ্বাসে আবার কমলার দুই চক্ষু ঝাপ্সা হইয়া আসিল। অসহায় দুর্ব্বল এই শিশুটির সেবা করিবার, নিজের হাতে ইহাকে ধোয়াইয়া, মুছিয়া পরিচ্ছন্ন করিয়া তুলিবার একটা দুর্নিবার আগ্রহ অকস্মাৎ যেন কমলার বুকের ভিতরটাকে দোলা দিয়া নাড়িয়া দিল। নিজের ওষ্ঠ দুইটি দিয়া আলগোছে মিনুর ললাট স্পর্শ

করিয়া কমলা স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "আগে তোমাকে স্নান করিয়ে দি', তারপর গয়না পরবে।"

হরিমতিকে উদ্দেশ করিয়া কমলা ডাকিয়া কহিল, "শীগ্‌গির গরম জল নিয়ে আয়; আর তোয়ালে, সাবান, লাইমজুস্, ক্রীম, পাউডার, সব।"

খানিকক্ষণ পূর্ব্বে কমলার বুকের উষ্ণ স্পর্শের মধ্যে সাত বৎসরের ছোট মেয়ে মিনু যে উপাদেয় স্নেহের সন্ধান পাইয়াছিল, কমলার নিপুণ হস্তের ঐকান্তিক সেবা ও যত্নের মধ্যে উহাই আরও বেশী পরিমাণে লাভ করিয়া সে কৃতার্থ হইয়া গেল। স্নান ও প্রসাধনের অবসরে এক সময়ে হঠাৎ সে কমলার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "তুমি কে? তোমায় আমি কি বলে' ডাকব?"

প্রশ্ন শুনিয়া কমলার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। মুখ ফিরাইয়া দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া সে অবরুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিল, "আমায় তুমি মা—সীমা বলে ডেকো।"

হরিমতি ঘরের কোণে নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া সমস্ত লক্ষ্য করিতেছিল, এবার আর সে থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, "এ কার মেয়ে নিয়ে এলে দিদিমণি? শেষে থানা পুলিসের হাঙ্গামে পড়বে না তো?"

কমলা হরিমতির মুখের দিকে চাহিল, অঞ্চলপ্রান্তে চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া গাঢ়স্বরে কহিল, "পড়ি যদি, তাতেও আমার ভয় নেই, দুঃখও নেই। জেলে গিয়েই এ জীবনের শেষ যদি হয়, আমি বরং খুশীই হব।" একটু থামিয়া আর একবার চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া সে কহিল, "যে সাধ আমার ছিল আজ তা মিটেছে। এবার আর কিছুতেই আমার ভয় নেই।"

স্নান ও প্রসাধনে কোন পক্ষেরই কোন অসুবিধা হইল না। কিন্তু অলঙ্কার পরাইতে গিয়াই কমলা এতক্ষণ পর বুঝিতে পারিল যে, তাহার গায়ের অলঙ্কারের মূল্য ও সৌষ্ঠব যাহাই হউক না কেন, উহার একটিও মেয়েটির গায়ে মানাইবে না, অধিকাংশ মোটে পরানই যাইবে না। বিমূঢ়ের মত হরিমতির মুখের দিকে চাহিয়া সে হতাশ ভাবে কহিল, "এ কি হ'ল ঝি? এ গয়নায় তো কাজ চলছে না।"

—"তা তো চলবেই না", হরিমতি বিজ্ঞের মত উত্তর দিল, "তোমার গায়ের গয়না ঐ ছোট মেয়ের গায়ে চলবে কেন? ওকে দিতেই যদি চাও, বাজার থেকে কিনে দিতে হবে।"

কমলার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে কহিল, "তাই দেব। তুই ট্যাক্‌সি ডাক্।"

হরিমতি কিন্তু কিছুমাত্র উৎসাহ দেখাইল না, কহিল, "বাজারে অমনিতেই গয়না পাওয়া যায় না দিদিমণি, নগদ টাকা দিয়ে কিনতে হয়। সে টাকা তোমার কোথায়? তোমার বাবু সেদিন যে টাকা দিয়ে গেছেন, তাতে এ মাসের খরচ চলবে কি না, তাই সন্দেহ!"

কমলার দুই চোখে হঠাৎ যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "টাকার অভাবের কথা তুই আমায় কি শোনাচ্ছিস্ হরিমতি? আমার গায়ের এত সব গয়না আমার পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে—এ সব টাকা নয়? এই সব গয়নার বদলে আমি আমার মেয়ের জন্য গয়না কিনব। তুই ট্যাক্‌সি ডাক্।" মিনুকে আবার বুকে তুলিয়া লইয়া সে কহিল, "চল মা, আমরা বাজারে যাই। তোমাকে হার, বালা, দুল, সব কিনে দেব। তারপর—"

—"তারপর কি?" মিনু সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল।

একবার ঢোক গিলিয়া কমলা উত্তর দিল, "তারপর ট্যাক্‌সি চড়ে' আমরা দু'জনে বেড়াতে যাব—ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, লেইক্, চিড়িয়াখানা, শিবপুরের বাগান, আরও কত সব জায়গায়।"

"বাঃ বাঃ; বেশ হবে, বেশ হবে", মেয়েটি হাততালি দিয়া কলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই ছোট হাত দুইটি প্রসারিত করিয়া কমলার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আবদারের সুমিষ্ট কণ্ঠে কহিল, "চল মাসীমা, শীগগির চল।"

ধরার বুকে রাত্রির অন্ধকার তখনও পাখা মেলিয়া নামিয়া আসে নাই। রবি বিদায় লইবার পূর্ব্বে পশ্চিমের আকাশে মুঠায় মুঠায় যে আবীর ছড়াইয়া দিয়া গিয়াছিল,

উহারই রক্তরাগ তখনও সারা আকাশকে চিত্রিত ও নীচের ধরণীকে ফিকে গোলাপী আভায় রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহার অমর্য্যাদা করিবার সাহস হয় নাই বলিয়াই বোধ করি, রাজপথের সরকারী আলোগুলি তখনও জ্বলিয়া উঠে নাই।

কিন্তু কমলার বাড়ীর কাছে আলো না জ্বলিলেও, পুলিসের লাল পাগড়ী আকাশের লালিমাকে প্রতিযোগিতায় ম্লান করিয়া দিয়া উদ্ধত ভঙ্গিতে সাড়ি সাড়ি বিরাজ করিতেছিল। তাহার বাড়ীর দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিল উর্দ্দিপরা পুলিসের দারোগা, আরক্ত মুখ গোড়া সার্জ্জেণ্ট আর ধুতি কামিজ পরা এ পাড়ার কয়েকজন ভদ্রলোক; নীচে দাঁড়াইয়াছিল লাল পাগড়ি ও তকমা পরা দশ বারজন পুলিস কনেষ্টবল আর তাহাদিগকে ঘিরিয়া জটলা করিতেছিল বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী ও বিভিন্ন বয়সের শতাধিক কৌতূহলী নরনারী।

শিঙ্গার হুঙ্কারে এই জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিয়া একখানি বিশালকায় ট্যাক্সি কমলার বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দ্বার খুলিয়া নিরাভরণা কমলা সালঙ্কারা মিনুকে কোলে লইয়া বাহির হইয়া আসিল।

মিনু ঝলমিল আগুনের একটি শিখার মত—গায়ে লাল রঙের জমির উপর সোণার ফুল লতা পাতা আঁকা শাটিনের ফ্রক; পায়ে মখমলের উপর জরির কাজ করা জুতা; হাতে, গলায় ও কাণে হীরা জহরতের কারুকার্য্যখচিত মহামূল্য কয়েকখানি অলঙ্কার; মাথায় সুবিন্যস্ত ঘন কালো চুলের উপর রক্তের মত লাল রেশমের ফিতার হাতে গড়া একটি ফুল; গালে রুজের লালিমা; চোখের আনন্দোজ্জ্বল দৃষ্টি ও ওষ্ঠের হাসিতে বিদ্যুতের শাণিত দীপ্তি। কমলা গাড়ী হইতে নামিয়া ভাল করিয়া দাঁড়াইবার পূর্ব্বেই মিনু "এসে গেছি, এসে গেছি" বলিয়া মহোল্লাসে কলরব করিয়া উঠিল আর সঙ্গে সঙ্গেই অসংযত জনতার উশৃঙ্খল গুঞ্জন যেন লজ্জা পাইয়াই মুহূর্ত্তে থামিয়া গেল।

কেবল দ্বিতলের বারান্দা হইতে কামাখ্যনাথ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এই যে মিনু!"

কণ্ঠস্বর অনুসরণ করিয়া উপরের দিকে চাহিয়া পিতাকে চিনিতে পারিয়া মিনু ডাকিল, "বাবা, ও বাবা!"

কামাখ্যানাথের পার্শ্বে যাহারা দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের মন্ত্রমুগ্ধ ভাবটা এতক্ষণে যেন কাটিয়া গেল, দুই তিনজন সহসা যেন আপনাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া বলিয়া উঠিল, "পাকড়ো, পাকড়ো।"

পরক্ষণেই একটি নারীকণ্ঠের আর্ত্ত চীৎকার শোনা গেল, "মা, আমার মা এসেছে—"

কমলা বুঝিল সবই। একটি উদ্গত দীর্ঘনিঃশ্বাস সযত্নে চাপিয়া রাখিয়া মিনুকে সে সজোরে বুকের উপর চাপিয়া ধরিল, তারপর সম্মুখের লোকটিকে লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "সরে' যাও। আমায় বাড়ী যেতে দাও।"

কিন্তু সে দ্বিতল পর্য্যন্ত উঠিতে পারিল না। ভিতরের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতে না হইতেই কালীতারা উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া আসিয়া কমলার কোল হইতে মিনুকে কাড়িয়া লইল। কামাখ্যানাথও ছুটিয়া নীচে আসিল, সঙ্গে সঙ্গে আসিল দারোগা ও গোরা সার্জ্জেণ্ট দুইটিও।

কিন্তু অপর কেহ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই মিনু মহোৎসাহে চীৎকার করিয়া উঠিল, "এ সব আমাকে মাসীমা দিয়েছে মা। কত ভালই যে মাসীমা আমায় বেসেছে, কত ভাল ভাল জিনিষ খাইয়েছে, কত জায়গায় বেড়াতে নিয়ে গেছে—মা, মাসীমা আমাদের বাড়ীতে থাকবে।" অকস্মাৎ মায়ের কোল হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দক্ষিণ হস্তে কমলার বুকের কাপড় দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া সে কহিল, "মাসীমা, তুমি আমাদের বাড়ীতে চল"; মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া সে কহিল, "মা, বল না মাসীমাকে"; পিতার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "বাবা, তুমি বল; তুমি বললে মাসীমা আসবে।"

কাহারও মুখে তৎক্ষণাৎ বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। কেবল কমলা মিনুর মুঠার বন্ধন হইতে বুকের কাপড় ছাড়াইয়া লইয়া ঐটুকু বক্ষেই দুই চক্ষু আবৃত করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মাটিতে বসিয়া পড়িল।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অবশেষে যে কথা কহিল, সে দারোগা। ঈষৎ একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া মিনুর মুখের দিকে চাহিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "এ সব জামা, গয়না কে তোমায় দিয়েছে খুকি?"

মিন্নু মহা উৎসাহের সঙ্গে উত্তর দিল, "মাসীমা, সব মাসীমা দিয়েছে। বাবা আমাকে কিচ্ছু দেয় নি!"

কালীতারা এইবার গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "হতভাগী আমার মেয়েকে যাদু করেছে গো! এ গয়না কাপড় সব খুলে ফেল—বেশ্যাবৃত্তির উপার্জ্জন দিয়ে এ সব কেনা হয়েছে। এ সব অপবিত্র, এর মধ্যে বিষ আছে, যাদু আছে। খুলে ফেল সব", স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া সে আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ওগো, হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? টেনে খুলে ফেল না, এ সব।"

কিন্তু কামাখ্যানাথ স্ত্রীর অনুরোধ বা আদেশ পালন করিতে কিছুমাত্র আগ্রহ প্রদর্শন করিল না। মুখ নত করিয়া যেখানে ছিল, সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

দারোগা কিন্তু তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া কহিল, "হ্যাঁ, এ সব খুলে দিতেই হবে। মামলা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এ সব থাকবে আমাদের হেফাজতে।"

কামাখ্যানাথ মুখ তুলিয়া একবার কন্যার দিকে চাহিল, একবার কমলার দিকে চাহিল, তারপর একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া দারোগার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমি মামলা করব না দারোগা বাবু, তবে ওর গয়না সব খুলিয়ে দিচ্ছি।"

কমলা সেই যে মুখ ঢাকিয়া বসিয়াছিল, এতক্ষণ পর মুখ তুলিয়া সে আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আপনারা মামলা করুন,—আমায় জেলে দিন, ফাঁসি দিন, শূলে দিন, যা' খুসি করুন। শুধু ঐ জিনিসগুলি মেয়ের গা থেকে খুলে আমায় ফেরৎ দেবেন না।"

কালীতারা ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "ঝাঁটা মারি মুখে! শয়তানীর ন্যাকামির আর অন্ত নেই। তোর এই পাপের ধন আমার মেয়ের গায়ে থাকবে?"

ইহার পর এক কাণ্ড আরম্ভ হইল। কালীতারা মিন্নুর দেহ হইতে এক এক করিয়া প্রত্যেকটি অলঙ্কার ও বস্ত্রখণ্ড টানিয়া, ভাঙ্গিয়া, ছিঁড়িয়া খুলিয়া লইয়া, একে একে কমলার গায়ের উপর ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল। মিন্নু "মাসীমা, মাসীমা" বলিয়া আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল, কেবল কমলার মুখ দিয়া একটি কথা বা চোখ দিয়া এক ফোঁটা জলও বাহির হইল না। মেয়েটিকে উলঙ্গীকরণের প্রক্রিয়া যখন শেষ হইয়া গেল, তখন ঠাস্ করিয়া তাহার গালের উপর একটি চড় বসাইয়া দিয়া কালীতারা কহিল, "হ্যাংলা মেয়ে! কোনদিন কিছু চোখে দেখনি, না?" কমলার উপর একটি জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পরক্ষণেই সে ঝর-ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, "ডাইনী আমার মেয়েকে যাদু করেছে গো—।"

কামাখ্যানাথ স্ত্রীর হাত ধরিয়া কহিল, "চল, বাড়ী চল। আমরা কালই এ পাড়া ছেড়ে যাব।"

মিন্নু আবার আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, "মাসীমা, মাসীমাগো"।

কিন্তু তাহার চীৎকারে কেহই কর্ণপাত করিল না। কামাখ্যানাথ স্ত্রীর হাত ধরিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার পশ্চাতে দারোগা এবং তাহার লোকজনও বাহির হইয়া গেল। এ বাড়ীর গোলযোগ থামিয়া গেল আর সেই জন্যই পাশের বাড়ীর গ্রামোফোনের গান অনেকক্ষণ পর আবার সুস্পষ্ট শুনা গেল—

"রাণি, গা তোল, গা তোল;
উঠ চল, চল;
ঐ এল, ঐ এল,
এল মা ভবানী
রাণি—"

আলোচনা

‘বন্দেমাতরম্’ এবং “ওঁ মা”

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী

আজকাল বহু শিক্ষিত বাঙ্গালী চিঠিপত্রাদির শিরোভাগে ‘ওঁ মা’ এবং কেহ কেহ “বন্দেমাতরং” লিখিয়া চিঠির প্রতিপাদ্য বিষয় লিখিয়া থাকেন, প্রাচীন যুগে অনেকেই উপাস্যের নাম লিখিতেন। ১৯০৫ সনে অধিকাংশ বাঙ্গালীর জনমত অগ্রাহ্য পূর্ব্বক লর্ড কার্জ্জন যখন বঙ্গবিভাগ (Partition of Bengal) করেন, তখন উহার বিরুদ্ধে আন্দোলন নিমিত্ত বহু মনীষী শিক্ষিত. বাঙ্গালী নেতৃগণ প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের বিদ্রোহী সন্ন্যাসী সন্তানগণের একত্র ও সংঘবদ্ধ থাকার জীবন্ত মন্ত্র “বন্দেমাতরম্”কে স্বাধীনতার প্রতীক, সংগ্রামাত্মক ধ্বনি (war-cry) রূপে গ্রহণ করেন, ঐ ধ্বনি এখন ভারত-ব্যাপী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী “ওঁ মা” মহামন্ত্র ও মাতৃ-বন্দনার প্রধান মন্ত্র “বন্দেমাতরম্” প্রাচীন ভারতের আর্য্যঋষিগণের প্রচারিত বেদে ও তন্ত্রে গুপ্তভাবে আছে, গুরুপরম্পরাক্রমে এখনও বহু শিষ্য ও সন্ন্যাসীর মধ্যে উহা প্রচলিত আছে। প্রসিদ্ধ “বন্দেমাতরম্” মন্ত্র সম্পর্কে কথিত আছে যে, বঙ্কিমচন্দ্র একদা এক সন্ন্যাসী প্রমুখাৎ ঐ মন্ত্রটী শুনিয়াছিলেন ; তিনি কালে উহাই সন্ন্যাসী সন্তানদলের প্রধান জীবন্ত ও চিন্ময় মন্ত্ররূপে “আনন্দমঠে” প্রকাশ করেন।

আমি কোন বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি যে, স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন পণ্ডিত মহাশয় বন্দেমাতরম্ মন্ত্রটী বেদে উল্লেখ থাকার বিষয় তিনি ১৩৩৬ সনের মাসিক ‘বসুমতী’ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। মাতৃবন্দনা বা জগজ্জননীবিষয়ক স্তোত্রাদি প্রাচীন কালে (বৈদিক যুগে) প্রচলিত ছিল এবং গায়ত্রী দেবীর উপাসনা ব্রহ্মোপাসনা নামে খ্যাত ছিল। কেনোপনিষদে উমা হৈমবতীকে “সা ব্রহ্মেতি হোবাচ” এবং “অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং” ইত্যাদি চণ্ডীতে “এক অম্বয়া পুরিতং জগৎ” ও “একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা” প্রভৃতি উল্লেখ থাকায় মাতৃভাবের উপাসনা প্রচলিত থাকা বেশ বুঝা যায়—মায়ের নিকট সন্তানের কোন পাণ্ডিত্য, মানাদি থাকে না—সরল বালকের প্রার্থনা ঐ উপাসনার প্রধান উপাদান—বেদের মন্ত্রে “পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ” উপদেশ আছে। বন্দেমাতরং এই মহা-মন্ত্রটী বেদের কোন সূক্তে উল্লেখ আছে আমি বলিতে পারি না, তবে স্বর্গীয় পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের ঐ প্রবন্ধে উল্লেখ নিশ্চয় আছে, পাঠকগণ উহা দেখিতে পারেন। তবে আমি বন্দেমাতরং সম্পর্কে প্রাচীন হস্তলিখিত একখানি খাতা (ছোট পুস্তিকা) হইতে মাতৃধ্যান মধ্যে পাইয়াছি, উহা **“মাতৃ-হৃদয়তন্ত্রের”** অন্তর্ভুক্ত যথাহি “ওঁ শ্যামাঙ্গীং ধ্যানমগ্নাং কুশতনুরুচিরাং নামাবলীশোভিতাং কণ্ঠমালাতুলস্যা। সকলপদহরা শ্রীবিষ্ণুভক্তিপ্রদা যজ্ঞাত্যাং ধ্যান গম্যামভয়বরাং বাৎসল্যশান্তিপ্রিয়াং। এবম্ভূতাংধরিত্রীমিব সর্ব্বসহাংধিয়া বন্দেমাতরম্”। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিম যে জন্মভূমি (বঙ্গ) দেশ-মাতৃকার সম্বন্ধে উক্ত শ্লোকের অনুরূপ অতি প্রসিদ্ধ সঙ্গীত রচনা দ্বারা জগতে অমর হইয়াছেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই “বন্দেমাতরম” মন্ত্রটী বৈদিক ও তান্ত্রিক বিষয় ভারতীয়গণের প্রাণে যথেষ্ট সাড়া দিয়া থাকে, এমন কি পুলিসের আঘাতে প্রাণত্যাগ হওয়ার উপক্রম হইলেও বহু স্বদেশী স্বেচ্ছাসেবক ঐ মন্ত্র ত্যাগ করেন না—জননী, জন্মভূমি ও জগজ্জননী একই মহাশক্তি, ক্ষুদ্র নিজ জীবনাপেক্ষাও প্রিয়তমা। মাতৃবন্দনার এই “বন্দেমাতরং” ধ্বনিতে সাম্প্রদায়িকতার আরোপ করা সংকীর্ণচেতাঃ স্বার্থপর ব্যক্তির হীন প্রয়াস মাত্র, ইহা সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক মহামন্ত্র বটে এবং প্রত্যেক ধর্ম্মের প্রাণ বলা যায়।

এক্ষণে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী, অবিসংবাদী, আদি, অকৃত্রিম, স্বতঃ-প্রকাশিত, স্বয়ম্ভু, সনাতন, শাশ্বত, নিত্য মহামন্ত্র “ওঁ মা” সম্পর্কে বেদে, তন্ত্রে, গীতা, ভাগবতে, চণ্ডীতে যেরূপ প্রকাশিত আছে, অতি সংক্ষেপে নিম্নে যৎকিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করার প্রয়াসী হইলাম। এই “ওঁ মা” শব্দ পৃথিবী ব্যাপিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে নিত্য নব নব মানবশিশুকণ্ঠে সর্ব্বত্র অনাদিকাল হইতে স্বতঃ ভূমিষ্ঠকালে উচ্চারিত হইয়া আসিতেছে ও আসিবে, তাই এই ধ্বনি (“ওঁ মা”) সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উচ্চারিতবিধায় “বৃহত্বাৎ” “ব্রহ্ম” নামে ইহাই কথিত হইবার যোগ্য। “শব্দব্রহ্ম অদধৎ বপু”—সর্ব্বপ্রথমেই প্রত্যেক মানবশিশুকণ্ঠেই “ওং মা” বা “ওংগা” বা “ওংআ” ধ্বনি জননী জঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রথম শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া আরম্ভ হওয়া মাত্রই স্বতঃ (intuitively) প্রকাশ করিয়া তার জীবনী-শক্তির প্রথম পরিচয় দিয়া তার আত্মীয়স্বজনের আনন্দের কারণ প্রথম হইয়া থাকে। শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া যে পর্য্যন্ত ঐ ধ্বনি না করে, সে পর্য্যন্ত সকলেই অত্যন্ত উৎকণ্ঠায় থাকে। মানব ছাড়া অন্যান্য জন্তু যথা কাক—কা-কা-কা শব্দ, পাঁঠা ভ্যা-ভ্যা শব্দ, বিড়াল মিউ-মিউ শব্দ ইত্যাদি ভূমিষ্ঠ হইয়া করিতে থাকে—ইহা তো প্রত্যক্ষ। মানব-শিশু শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রথম ক্রিয়ারম্ভ হইতেই “ওং” যুক্ত “মা” অথবা “ওঁগা” বা “ওংআ” ধ্বনি প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যক্ষভাবে করিতেছে দর্শন করিয়াই বেদের ঋষি “ওঁকারস্ত ব্রহ্মর্ষির্গায়ত্রীছন্দ **সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে** বিনিয়োগঃ” প্রচার করেন এবং গীতার “সহজং কর্ম্ম” অর্থাৎ সহজন্ম প্রথম কর্ম্মই শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে “ওঁ মা” ধ্বনি বা প্রণবযুক্ত “মা-গা-বা-আ”। উহাকে স্বতঃ বা “স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম” বা “প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্মং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্” (গীতা) বলা যায়—এই প্রণবাত্মা মা বা প্রণবস্বরূপিণী মা যাহা সর্ব্বপ্রথম মানবের কণ্ঠতালু ভেদ করতঃ প্রথম নিঃশ্বাসের সঙ্গে ব্যক্ত, তাহাই প্রকৃষ্টরূপে তাঁর স্তুতি হওয়ার যোগ্য (প্র+নুতে স্তু রতে

ইতি প্রণব অথবা প্রকৃষ্টরূপে নব নব অর্থাৎ সদাই মানবকণ্ঠে নূতন নূতন রূপে প্রথম উচ্চারিত প্রণব)। এবং ইহাকে মানবমাত্রের জন্মগত অধিকার (birth right) বলা যায়। আর্য্য ঋষিগণ "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ ইতিহাস পুরাণং" ইত্যাদি (বৃহদারণ্যকে ২।৪।১০) শ্রুতি বিশ্বাস করেন, কারণ মানবগণই যদি প্রাণচেষ্টা প্রথম নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে (ওঁ মা) বাক্য প্রকাশ করে, তবে বিরাট্ পুরুষের নিঃশ্বাসেই যে বেদ-পুরাণাদি শব্দ-রাশি হইবে, তাতে আর বিচিত্র কি? তাই বেদকে অপৌরুষেয় বলাও হয়। প্রণব বেদের সার, উহাই আবার "মা"কে লক্ষ্য করিয়া প্রথম শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে উচ্চারিত হওয়ায় উহাই মহামন্ত্র। ঋগ্বেদীয় কৌষতকী উপনিষদে ৪র্থ অধ্যায় ১৯-২৪ সূক্তে আছে, "চেতন পুরুষ যখন প্রবুদ্ধ হয়, তখন সে হৃদয়স্থিত হিতা নাম্নী সূক্ষ্ম নাড়ী হইতে উত্থিত (জ্বলন্ত অগ্নি হইতে যেমন স্ফুলিঙ্গ বাহির হয়) হইয়া বাগিন্দ্রিয়াদি **প্রাণচেষ্টাসমূহ** নিজ নিজ আয়তনক্রমে নিৰ্গত হয়।" মানবশিশু গর্ভে থাকার সময়ে কোন শব্দ করে না, তার শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া মাতৃহৃদয়যোগে সম্পন্ন হয়, যদি সে জরায়ু মধ্যে স্বতন্ত্র-ভাবে নিঃশ্বাস ফেলিত, তবে গর্ভ বিষাক্ত (carbon dioxide gas) হইয়া ভ্রূণের অপমৃত্যু ঘটিত; তাই সৃষ্টিকর্ত্তার অদ্ভুত সুকৌশলে মাতৃ-হৃদয়যোগে শিশুর উহা নির্ব্বাহ হয়। পরম কারুণিকা জগজ্জননী মা প্রতি মানবের নিকট নিত্য নব নব হইয়া থাকেন, এই জন্য প্রণবযুক্ত মাতার বিরাট্ গর্ভে ও ক্রোড়ে ও অঙ্গে সব সৃষ্টি পালিত ও ধ্বংস সদা হইতেছে। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ভাগবতের ১ম শ্লোক ও বেদান্ত দর্শনের ২য় সূত্রে দ্রষ্টব্য—যে শক্তি হইতে জন্মাদি হইতেছে বা যে শক্তিতে আদ্যের জন্ম—'অ'দ্যস্য জন্ম' হইয়াছে। হার্বার্ট স্পেনসারও মহাশক্তি হইতেই নিত্য নব নব সৃষ্টি-লয়াদি হইতেছে এবং তিনিই "Divine Mother or Eternal Infinite energy from which all things ever proceed" বলেন। এই মহাশক্তি বা প্রণবরূপিণী মা-য়ের কোন রূপ বা লিঙ্গ নাই, এক বিরাট্ শক্তি—রূপ ক্রিয়াভেদে বহু। শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে "ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি, ত্বং কুমার উত বা কুমারী" ইত্যাদি। এই ভাব লক্ষ্য রাখিয়াই গীতার ৯ম অধ্যায় (১৭) শ্রীকৃষ্ণ উপাস্যের সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, "পিতামহস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ, বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কারঃ" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতে পরম বৈষ্ণব উদ্ধব কহিয়াছেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ "সর্ব্বেষামাত্মজোহি আত্মা পিতামাতা স ঈশ্বর" (১০।৪৬।৪২)। শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীধরস্বামীপাদ মঙ্গলাচরণে প্রণবযুক্ত শক্তি ও নারায়ণের বা মহাদেবের কৃপা প্রার্থনা করেন, যথা হি

> ওঁ মাধবোমাধবাবীশৌ সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনৌ
> বন্দে পরস্পরাত্মনৌ পরস্পরনতিপ্রিয়ৌ।
> যৎকৃপাতমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্"

* ওঁ মা—লক্ষ্মী বা মাতা এবং তার ধ্রুব স্বামী—মাধব—নারায়ণ বা বাবা। এবং উমাধব অর্থাৎ শঙ্কর। উঁহারা পরস্পর নতিপ্রিয় ও একাত্মা শক্তিযুক্ত হরিহরই প্রণবাত্মক। কাজেই হিন্দুগণের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক (শাক্ত, বৈষ্ণব ও শৈবের) বিবাদ, তাহা নিরর্থক। আমরা যদি জীবন ভরিয়া শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের সহিত তালে তালে সম-ধারায় সম-মাত্রায় স্বতঃ প্রথম অনাহতনাদোত্থিত "ওঁ মা" মহামন্ত্র উপাস্যের প্রধানতম প্রিয় নাম মনে করিয়া জপ করিতে পারি এবং উহাই অনাদ্যের প্রথম অবতরণ বুঝিয়া স্মরণ-মনন করিতে পারি তবে প্রাণ নিশ্চয়ই পাইব। এই মহামন্ত্রজপকে তাই মাতৃজপরহস্যে সাক্ষাৎ ইষ্টস্বরূপ ঘোষণা করেন, যথা হি—

> "প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য মা ততঃ সমুদীরয়েৎ।
> মাতরোচ্চঃ মহামন্ত্রঃ সাক্ষাদিষ্টস্বরূপকঃ॥"

—সন্তানের উপর গভীর বিপুল স্নেহবশতঃ মহাশক্তি মাতৃরূপে স্থূল বিশ্বে নামিয়া আসিয়া শিশুর মুখে প্রথম ঐ "ওঁ মা" ধ্বনি করাইয়া নিজেও সন্তানকে আনন্দে প্লাবিত করেন। আমরা দুঃখনাশের সময়ে বা কোপে, দুঃখে ও ভয়ে, অনেক সময়ে স্বতঃ ও 'মা' বা 'ওঁ মা' ধ্বনি করিয়া থাকি। তাই এক সাধক—

> "ভয়ে, কোপে, সুখে, দুঃখে স্বতঃএব তৎক্ষণাৎ
> সুধাময়ঃ কোমলমাতৃশান্তিকঃ
> মুখাদ্বিনির্গচ্ছতি ওমেতি নামকঃ
> তথাপিল মাতৃগুণস্তুরিক্তা" (পুষ্পাঞ্জলি)

—কেহ কেহ বলেন যে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে, ভগবান শিশুকে 'ও মা রুদ' কহিয়া রোদন নিষেধ করায় রুদ্র নামে খ্যাত। শ্রীবাল্মীকি মুনি কবিতার প্রথম সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিও কোপে "মা" শব্দ দ্বারা নিষেধ বুঝাইয়াছেন যথা "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাত্বম" ইত্যাদি। 'ওমা' বা 'ওঁমা' উচ্চারণের স্বরভেদে (pronounciation) স্নেহ, কোপ, ভয় প্রভৃতি প্রকাশ করা স্বতঃ হইয়া থাকে। আমরা পরিচিতা কি অপরিচিতা স্ত্রীলোককে অনেক সময়ে আহ্বান বা আবাহনের জন্য ডাকিতে হইলে, স্বাভাবিকভাবে "ওঁ মা" উচ্চারণ করিয়া থাকি। শিশুর ক্ষুধা বা দুঃখ বোধ হইলেই 'ওমা' বা 'ওগো' শব্দ দ্বারা মাকে ডাকিয়া থাকে। এবং সন্তানভূমিষ্ঠ হইবার সময়ে মাকেই প্রথম দেখে বা তার স্পর্শসুখ অনুভব করে এবং তখনি তাকে 'ওমা' বা 'ওঁমা' বলিয়া ডাকে, ইহা তো প্রত্যক্ষ। পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্ম্মাবলম্বিগণই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে হউক ও 'ওঁ' শব্দ দ্বারাই প্রথম ভগবানের উপাসনা আরম্ভ করেন। যথা, হিন্দু তো প্রণবযুক্ত মা বা অন্য দেবতার নাম, শিখগণ "ওয়া গুরুজীক্য ফতে" বৌদ্ধগণ "ওঁ মণিপুর পদ্মে হুং", খৃষ্টানগণ "ও প্রভু, Oh Lord," মুসলমানগণ ও অসমন বা ও আল্লা হু আখবর" ইত্যাদি। জগৎ জুড়িয়া প্রায় প্রত্যেক ভাষাতেই "মা" শব্দটী 'Mother, Matre, মাতৃ, আম্মা, মাম্মা' ইত্যাদি ভাবে প্রচলিত আছে। মাতা পিতাপেক্ষাও পরম গুরু,

সেই মা প্রণবযুক্ত হইয়া মানবের প্রধান উপাস্য মন্ত্র স্বতঃ হইয়াছে। উহা পরম পবিত্র ও ত্রাণকারক—এই 'ওঁ মা' মন্ত্রের জন্য আর দীক্ষা লওয়ার আবশ্যক নাই, মোহ নষ্ট হইলেই স্মৃতিলাভ ঘটিবে এবং "ওঁ মা" মন্ত্র যাহা স্বতঃ শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে প্রথম বহির্গত হইয়াছিল এবং ক্রমে মায়ায় পড়িয়া ভুলিয়া যাইয়া কষ্ট পাই, তাহা যদি পুনঃ স্মৃতিপথে আনিয়া সর্ব্বদা মায়ের কৃপা মনে করিতে পারি, তবেই পাপতাপনাশ হইবে। ঐ "ওঁ মা" মন্ত্র দ্বারাই যদি বুঝিতে পারি, তবে transformation বা রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া দ্বিজত্ব লাভ করিয়া **নব জন্ম** বা 'conversion' প্রাপ্ত হইব। উহা ধীরভাবে স্মরণ, মনন ও ধ্যান করিলে সকলেই যে আমরা মানব, **এক মায়ের সন্তান,** হৃদয়ঙ্গম করিয়া 'Universal brotherhood' বিশ্বভ্রাতৃত্বধর্ম্মস্থাপনে প্রয়াসী হইতে পারিব। এই **পৃথিবী** আমাদের জন্মভূমি এবং ভুবনত্রয়ই আমাদের স্বদেশ—"স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্" এবং মা-শব্দের অর্থ 'মান্যতে পূজ্যতে ইতি মা' এবং ইহা বসুমতী, লক্ষ্মী, জননী, গরু অর্থে ব্যবহৃত হয়, এই জন্য উঁহাদের সেবাতেই আমরা ধন্য হইতে পারিব ও প্রতিপালিত হইব। মা—স্বর্গের চেয়েও গরীয়সী; তাই "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" (রামায়ণে) এবং "Paradise lies at the feet of mother"—মায়ের চরণতলে স্বর্গ "ওয়ালিদয়নে কদম তলা বেহস্ত" (ইতি কোর-আন)। ক্ষুদ্র প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা ভুলিয়া মাতৃ-বন্দনার প্রধান মন্ত্র "বন্দেমাতরম্" এবং উপাস্যের প্রথম খাঁটি মন্ত্র "ওঁ মা" মানবকণ্ঠে সদা সর্ব্বত্র আবার বুঝিয়া ধ্বনিত হইয়া আকাশ বাতাস পূর্ণ হয়, তবেই জগতে শান্তি আসিবে। ভগবান সৃষ্টির সময়েই আমাদিগকে যে মন্ত্রে জননীজঠরে স্বয়ং দীক্ষাশিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই তো অভ্রান্ত, অকৃত্রিম, পবিত্র, মহান্ মন্ত্র, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের যেরূপ অসীম শক্তি, তাঁর প্রদত্তও শিক্ষিত এই মন্ত্রেরও তেমনি অতুলনীয় শক্তি। ইহাতেই মৃত্যুময় সংসার অমৃতে রূপান্তরিত হইবে, দুঃখ সুখে পরিণত হইবে। তাহাকে প্রেমের সহিত ভজনা করিলে, তিনি ঐ নামের সঙ্গে সঙ্গে নমনীয় হইয়া আসিবেন, নাম-নামী তো অভেদ, মা যে সদা সন্তানের অজ্ঞাননাশের জন্য ব্যাকুল, তাই আমাদের জীবনের প্রথম স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে কৃপাপূর্ব্বক তাঁর বন্দনার ও উপাসনার জন্য "**ওঁ মা**" মন্ত্র শিক্ষা দিয়াছেন এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের নিমিত্ত তাঁকে ধ্যান করার জন্য "বন্দেমাতরম্" এই শুভ বাণী বেদে তন্ত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা আছে বেদে, তাহা আছে জগতে। তাঁর আশ্রিত হইয়া যত্ন করিলে, ("মামাশ্রিত্য যতন্তি যে" গীতা), জগতে চিরশান্তি আসিবে (establishment of Heaven's kingdom on earth)। তাই প্রত্যেকেই ডাক "ওঁ মা", ভাব "ওঁ মা", জপ "ওঁ মা", দেখ "ওঁ মা", শুন "ওঁ মা", এবং "মাতৃবৎ সর্ব্বদারেষু যঃ পশ্যতি সঃ ধার্ম্মিকঃ"—এই বাণীর সার্থকতা সন্ন্যাসিগণের ন্যায় করিতে অভ্যাস কর এবং বসুমতীকে, গরুকে ও অর্থকে মাতৃ জ্ঞানে সদ্ব্যবহার কর ও "বন্দেমাতরম্" বলিয়া উঁহাদিগকে প্রণাম কর, তবেই উপাস্য সন্তুষ্ট হইবেন। ঐ দুই মহামন্ত্রে কোন সুসন্তান আপত্তি উত্থাপন করিতে পারে না, কুসন্তানই মাতৃ-বন্দনার ও উপাসনার মন্ত্রে বিঘ্ন উপস্থিত করে। সন্তানের সৃষ্টির জন্য মাকে কত বেদনা ও যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, সন্তানের দুঃখ দূর করাতেই আবার মায়ের সুখ এবং তাঁর দয়াতেই লোকে শান্তি পায়, তাই ঐ মাতৃহৃদয়তন্ত্রে তাঁর প্রণাম-মন্ত্র, যথা হি—

"ওঁ মূর্ত্তিদ্দয়াবাইব ভাতি লোকে শান্তিঃ পরমামনুজস্য বিশ্বে দুঃখং সুতার্থং সুখমেব যস্যা, তাং মাতরং **সর্ব্বসহাং** নমামঃ"। মহাশক্তি-শালিনী ভগবতী মা তাঁর নির্গুণ অরূপা শক্তিকে স্বীয় **মায়া** (জ্ঞান বা কৃপা) দ্বারাই পৃথিবীতে মাতৃরূপে আত্মবলিদান পূর্ব্বক (sacrifice) নিজেকে পরিণত করিতে যে মহান্ প্রকৃতি-যজ্ঞ সদা সম্পন্ন করিতেছেন, আমরা মানব যদি আবার সেই রকম তাঁহাতে আত্মসমর্পণ (surrender) করিতে পারি, তবে ভাগবতী তনু ও শক্তি লাভ করিতে পারিব। মায়ের স্নেহ ও করুণা তো আছে; আমাদের কর্ত্তব্য প্রীতিপূর্ব্বক প্রাণের সহিত জগজ্জননীকে ভালবাসা। তবেই মা শান্তি পাইবেন। সরল প্রাণে সকলে ডাক "ওঁ মা" ও "বন্দেমাতরম্।"

গর্বিত লেখকদের প্রতি

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

পাঠক এবং সাধারণ লোকে আমার লেখাকে ভালইবাসে,
কেবল বাসে না লেখক বলিয়া যাহাদের মনে গর্ব অতি;
কিন্তু কী ভয়?—রান্না খাইয়া অতিথির যদি তৃপ্তি আসে,
পর পাচকের নিন্দাতে সেথা কার এল গেল—কীইবা ক্ষতি।*

* (Sir J. Harington হইতে)

আদায়ের ইতিহাস

শ্রীমানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব্বপ্রকাশিতের সারাংশ

[পিতা অবিনাশবাবুর চেষ্টায় তাঁহারই অফিসে ত্রিষ্টুপের চাক্‌রী জুটিয়া গেল—মাহিনা পঁচাত্তর টাকা। কামিনী দেবী ছেলের এই চাক্‌রীকে উপলক্ষ করিয়া কল্পনায় ভবিষ্যতের একটা স্বপ্ন গড়িয়া তুলিলেন—ত্রিষ্টুপ চাকরী পাইয়াছে, সে বিবাহ করিবে, তাহার পর আরও কত কি। প্রভা এ বাড়ীতে আশ্রিতের মত আসিয়াছে, তাহার বেকার স্বামী রমেশ ও ছোট মেয়ে রাণুকে লইয়া। স্বামীর অকর্মণ্যতা ও নিজের অসহায়তার চিন্তায় সে অভিমানী হইয়া উঠিয়াছে, সংসারের খুঁটিনাটির আঘাতে কারণে অকারণে মেয়েটির দু'টি চোখ জলে ভরিয়া ওঠে। ভাইয়ের চাক্‌রীর সংবাদে সেও যেন একটু আরাম পাইল—এইবার হয়তো সংসারের একটু সুরাহা হইবে। ত্রিষ্টুপ কিন্তু এই চাক্‌রীর ব্যাপারে খুসী হইয়া উঠিতে পারিল না। জীবনে সে বৃহত্তর সার্থকতার স্বপ্ন দেখে। বন্ধু মণীশ তাহাকে বুঝাইল, জীবনে বড় কিছু করিবার পরিকল্পনা যখন সে এখনও ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই, তখন আপাততঃ চাক্‌রী ছাড়িয়া লাভ নাই।

ত্রিষ্টুপের চাক্‌রী-জীবন আরম্ভ হইল। চাক্‌রীর প্রথম দিনেই মণীশ তাহাকে বাড়ী লইয়া গেল, এখানেই তাহার অবিবাহিতা ভগ্নী কুন্তলার সহিত ত্রিষ্টুপের আলাপ হইল। ইহার পর নিয়মিত মণীশের বাড়ীতে যাওয়ার একটা আকর্ষণ তাহার নিকট দুর্নিবার হইয়া উঠিল। ত্রিষ্টুপ বুঝিতে পারে, তাহার চাকরী হইয়াছে, কাজেই পাত্র হিসাবে কুন্তলাকে ত্রিষ্টুপের হাতে দিতে মণীশ ও তাহার মায়ের আগ্রহ থাকাই স্বাভাবিক। মাঝে মাঝে তাহার মন বিমুখ হইয়া ওঠে। ত্রিষ্টুপ ভাবে এখন হইতে যাওয়া আসাটা কমাইয়া একেবারে বন্ধ করিতে হইবে।

ত্রিষ্টুপ কয়দিন মণীশদের বাড়ী যায় নাই। সে দিন সন্ধ্যার পর মণীশের ভাই ক্ষিতীশ তাহাকে ডাকিতে আসিল—জলযোগের নিমন্ত্রণ। ত্রিষ্টুপ অসুখের অছিলায় তাহাকে ফিরাইয়া দিল। মণীশ আসিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেল। কুন্তলার দিদি রমলা শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিয়াছে। তাহাকে উপলক্ষ করিয়াই একটু জলযোগের আয়োজন হইয়াছে। কুন্তলা ও রমলা যেন দু'টি যমজ বোন। কুন্তলা ভীরু, লাজুক, নম্র; রমলা হাসিখুসী, মিশুক, কথা বলিতে পটু। ত্রিষ্টুপ বুঝিতে পারিল, কুন্তলার সঙ্গে রমলার শুধু বিকাশের পার্থক্য, কুঁড়ির সঙ্গে ফুলের। রমলার স্বামী ধীরেনের আনন্দোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া ত্রিষ্টুপের হঠাৎ এক সময়ে মনে হইল, তিরাশী টাকার একজন কেরাণী এমন সুখী হয় কি করিয়া?]

তিন

ত্রিষ্টুপ বুঝিতে পারে—এটা সে পছন্দ করিতে পারিতেছে না। মানুষকে সুখী দেখিয়া কোথায় সে নিজেও সুখী হইবে, তার বদলে মন তার বিরূপ হইয়া পড়িতেছে। তিরাশী টাকার কেরাণীর জীবনে সুখশান্তির অস্তিত্ব মানিতে সে রাজী নয়। দেখিয়া যা' মনে হইতেছে তা' সত্য নয়, আসলে এদের দু'জনের জীবন দুঃখময়—এ ধারণা জোর করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়।

কয়দিন এদের কথাই সে ভাবিয়া যায়। চিন্তাধারার তিবাদের মত, অভিজ্ঞতার ব্যতিক্রমের মত দু'জনে াকে পীড়ন করিতে থাকে। চারিদিকে সে দেখিতে ায় মানুষের মুখে দুঃখের কালো ছায়া, দেহের ক্ষয়, াবনের অপচয়, সঙ্কীর্ণ, নিঃস্ব অবেষ্টনীর পেষণ। এই রিচয়ের ছাপমারা তারও বর্ত্তমান। তাই তো সে বিষ্যৎ রচনা করিতে চায়? আজ কিছু নাই, কাল ঐশ্বর্য্য চাই। এই অবস্থায় ধীরেন ও রমলা আবার কি ধাঁধাঁ সৃষ্টি করিল!

মণীশকে সে জিজ্ঞাসা করে, 'ধীরেনবাবু বেশ লোক না?'

মণীশের কথার মানে তার কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিল কয়েক দিন পরে। নিজেদের সংসারে ধীরেন ও রমলাকে দেখিয়া আসিবার ইচ্ছাটা সে দমন করিতে পারিতেছিল না। রবিবার বিকালে সে সহরের এক প্রান্তে তাদের ছোট একতলা বাড়ীতে গিয়া হাজির হইল।

আগের দিন প্রথম রাত্রে অসময়ের ঝড় উঠিয়াছিল। ঝড় উঠিলে, ত্রিষ্টুপ গভীর উল্লাস বোধ করে। ঝড়ের বেগে বাড়ীর কাছে সিধা তরুণ আমলা গাছটি যত বাঁকা হইয়া যায়, তার বাঁকা মন যেন অনির্ব্বচনীয় পুলকে ততই খাড়া হইয়া ওঠে। এই সতেজ গর্ব্বিত আনন্দ সাপের মত

মনের কোন অন্ধকার কোণে কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া থাকে, সাপুড়িয়ার বাঁশীর মত ঝড়ের সাঁ-সাঁ আওয়াজে ঘুম ভাঙ্গিয়া ফণা উঁচু করে। ঝড় থামিয়া যাওয়ার পরেও এই উত্তেজনার প্রভাব মিলাইয়া যাইতে কয়েকদিন সময় লাগে, ত্রিষ্টুপের অনুভূতি রসে ভিজিয়া সজীব হইয়া থাকে।

ধীরেনের বাড়ীর অবস্থানটি ত্রিষ্টুপের ভারি ভাল লাগিল। এ সহরতলী পুরাণো, সহরের পরিসর বাড়ানোর প্রয়োজনে নূতন সৃষ্টি হয় নাই। পুরাণো বাড়ীগুলি এলোমেলোভাবে বসানো, রাস্তা আঁকাবাঁকা। গাঁয়ের আগাছাভরা বাগানের কয়েকটি টুক্‌রা এখানে ওখানে বসানো আছে। ধীরেনের বাড়ীর অদূরে পানার আস্তরণ বিছানো একটি পুকুর। কাছে ও দূরে অনেক নারিকেল গাছ মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। রাস্তায় ছোট ছেলেদের মার্ব্বেল খেলায়, বাড়ীর সামনে রোয়াকে বসিয়া বড় ছেলেদের জট্‌লা করায়, উবু হইয়া বসিয়া এক প্রৌঢ়ের হুঁকা হাতে তামাক খাওয়ায়, ছেলে কোলে এক বাড়ীর দুয়ার হইতে বাহির হইয়া একটি আধ-ময়লা শাড়ী পরা তরুণীর আরেক বাড়ীর দুয়ারে ঢুকিয়া পড়ায়, তার এখনকার শান্ত মানসিক অবস্থার সঙ্গে কেমন একটা আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য সৃষ্টি হইতেছে।

বাড়ীর ভিতরে গৃহসজ্জার মধ্যেও একটি সার্ব্বাঙ্গীন সুসঙ্গতি তার বড়ই তৃপ্তিকর মনে হইল। এসব সংসারে বিশৃঙ্খলার চেয়ে বেশী চোখে পড়ে অসঙ্গতি। ভাঙ্গা চৌকীর পাশে মস্ত দামী ড্রেসিং টেবিল, পেরেক-মারা কাঠের চেয়ারের পিঠে রঙীন সুতার কাজ করা খোল, দামী ফ্রেমে বাঁধানো তৈলচিত্রের পাশে আটা দিয়া দেয়ালে আঁটা মাসিকের ছবি, ময়লা বিছানার চাদরে ধবধবে পরিষ্কার ওয়ার-পরানো তেল-চটচটে বালিশ, পিঁড়ির সঙ্গে কার্পেটের আসন, সযত্নে সাজানো জিনিষের একটি তাকের নীচেই অযত্নে ছড়ানো জিনিষের আরেকটি তাক। এ বাড়ীর গৃহোপকরণে সে বিসদৃশ বিরোধ নাই, চারিদিকে ছড়ানো একটি বিস্ময়কর সাম্যের ভাব দৃষ্টিকে আনন্দ দেয়।

ত্রিষ্টুপের মনে হয়, এ ঘর যারা সাজাইয়াছে তাদের সত্যই বুদ্ধি আছে। অতিরিক্ত ঝকঝকে কিছু তারা চায় নাই বলিয়া একেবারে রঙচটা কিছু তাদের রাখিতে হয় নাই। তিনটি ভাঙ্গা চেয়ারের মধ্যে একটি খুব দামী চেয়ারে তাকে বসানোর গৌরব বাতিল করিয়া দিয়াছে বলিয়া চারটি সাধারণ শক্ত চেয়ারের যে কোন একটিতে তাকে নিশ্চিন্ত মনে বসিতে বলিতে পারিয়াছে।

ধীরেন ও রমলা যে রকম আগ্রহের সঙ্গে তাকে অভ্যর্থনা জানাইল, ত্রিষ্টুপের বিশ্বাস করাই কঠিন হইয়া পড়িল যে, তার সবটাই আন্তরিক। তার সঙ্গে এদের পরিচয় শুধু একদিনের। রমলা একবার শুধু তাকে বলিয়াছিল, সে এ বাড়ীতে আসিলে তারা খুসী হইবে। ভদ্রতা করিয়া ও-কথা কে না বলে? ওই আহ্বানেই কেউ বাড়ীতে আসিলে, ভদ্রতা করিয়া কে না সুখী হয়? কিন্তু সে আসায় সত্যই এদের যেন আনন্দের সীমা নাই। তার এই অনুগ্রহে তারা যেন কৃতার্থ হইয়া গিয়াছে।

রমলা বলিল, 'আপনি একদিন আসবেন জানতাম।'

'কি করে জানতেন?'

'অনেকে বলে যায়, কিন্তু আসে না। দু'চার মাস পরে দেখা হলে বলে, সময় পাইনি, বড্ড ব্যস্ত ছিলাম, এবার একদিন নিশ্চয় যাব। আপনি তাদের মত নন। সে দিন কথা বলে'ই বুঝতে পেরেছিলাম।'

ছোট মেয়েটিকে কোলে করিয়া রমলা বসিয়াছে, বড় মেয়েটি চেয়ার ঘেঁষিয়া মার পিঠে একটি হাত রাখিয়া শান্ত কৌতূহলের দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। রমলার ভাব দেখিলে সত্যই মনে হয়, ত্রিষ্টুপ আজ ঠিক এই সময়ে আসিবে জানিয়া নিশ্চিন্ত মনে তার সঙ্গে কথা বলার জন্য আগে হইতেই সব কাজ, সব হাঙ্গামা চুকাইয়া রাখিয়াছে। অন্য সমস্ত বিষয়ের চিন্তাও সে এখনকার মত মনের এক পাশে সরাইয়া দিয়াছে, তার সবটুকু মনোযোগ এখন অভ্যাগতের প্রাপ্য। সংসারের কোন কাজ, কোন দায়িত্ব যাদের নাই, বাড়ীতে কেউ আসিলে তাদেরও ত্রিষ্টুপ এমন স্থির শান্ত একাগ্রভাবে কখনও এক মিনিট আলাপ করিতে দেখে নাই, প্রতি মুহূর্ত্তে রমলা যেন তার আত্মমর্য্যাদা বাড়াইয়া দিতে থাকে। প্রথম একজনের বাড়ীতে আসার

অপরিহার্য্য অস্বস্তি ও সঙ্কোচ আপনা হইতে যেন কোথায় মিলাইয়া যায়।

আজ ত্রিষ্টুপ প্রথম বুঝিতে পারে—অন্যে তুচ্ছ করিলে নিজের কাছে মানুষ কি ভাবে তুচ্ছ হইয়া যায়, অন্যে দাম দিলে দাম বাড়ে। জীবনকে রমলা শ্রদ্ধা করে। ধনীকে নয়, মানীকে নয়, গুণীকে নয়, জীবনের প্রতীক মানুষকে সে সম্মানের অর্ঘ্য দিয়া পূজা করে। তার কাছে থাকিলে ব্যর্থতার ক্ষোভ মানুষের তুচ্ছ হইয়া যায়, কারণ কিছু না বলিয়াও সে যেন ক্রমাগত বলিতে থাকে—ব্যর্থতা বা সার্থকতার চেয়ে মানুষ অনেক বড়, যে অবস্থায় সে জীবন যাপন করুক, মানুষ চিরদিন মানুষ।

রাত প্রায় আটটার সময়ে ত্রিষ্টুপ বিদায় নিল। পথে এবং বাড়ী ফিরিয়া রাত্রে ঘুম আসা পর্য্যন্ত এই নূতন অভিজ্ঞতাই সে মনে মনে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। তিরাশীর টাকা কেরাণীর জীবন রমলা সুখে ও শান্তিতে ভরিয়া দিয়াছে। অপূর্ণতা তাকে পীড়ন করে না, রমলা তার আত্মগ্লানি জাগিতে দেয় না। দুঃখের ছোঁয়াচ লাগিলে, রমলা তাতে নিজের আনন্দের প্রলেপ লাগাইয়া দেয়। এক বিষয়ে হতাশা জাগিলে, অনেক বিষয়ে আশা জাগাইয়া রমলা তাকে সঞ্জীবিত করে। যা' আছে, তারই সন্তোষে মন ভরিয়া রাখিয়া, বাঁচিবার প্রয়োজনে মাসে মাসে তিরাশী টাকা দানের জন্য দেবতার কাছে কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিয়া, দারিদ্র্যের পেষণ ভুলাইয়া রাখে।

মণীশ বলিয়াছিল, ধীরেন ভালমানুষ। তাকে কাঁদাইলে সে কাঁদে, হাসাইলে সে হাসে। তাই কি রমলা তার মুখে হাসি ফুটাইয়া রাখিতে পারিয়াছে? অন্য কোন মানুষ হইলে পারিত না?

এই একটা খটকা ত্রিষ্টুপের মনে জাগিয়া থাকে। রমলাই যে ধীরেনকে সুখী করিয়াছে, তাতে তার কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু সেটা যে ধীরেনের ব্যক্তিত্বের অভাবের জন্য সম্ভব হইয়াছে, তা'ও সে বিশ্বাস করিতে পারে না। ধীরেনের পরিচয়ও সে আজ ভাল করিয়া জানিয়া আসিয়াছে। দুর্ব্বল, পরনির্ভরশীল, হাবাগোবা মানুষ সে নয়। ত্রিষ্টুপের তাই মনে হয়, শুধু ধীরেন নয়, যে কোন মানুষকে রমলা সুখী করিতে পারিত; বিকারগ্রস্ত অস্বাভাবিক মানুষ ছাড়া।

তাকেও পারিত।

বিছানায় শুইয়া এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে আধা-ঘুম আধা-জাগরণের মধ্যে ত্রিষ্টুপের চিন্তা ও কল্পনা জড়াইয়া যাইতে থাকে। সে যেন দেখিতে পায়—তাকে সুখী করার জন্য কুন্তলা প্রতীক্ষা করিয়া আছে। সে রকম একটি ছোট একতলা বাড়ীতে রমলা আর ধীরেন বাস করে, অবিকল সেই রকম একটি বাড়ীতে ঠিক রমলার মত সাজ করিয়া কুন্তলা কাঠের চেয়ারে বসিয়া আছে, তার কোলে একটি শিশু, তার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া আছে আরেকটি মেয়ে।

মণীশের বাড়ী যাওয়া সে বন্ধ করিয়া দিল। ধীরেনের বাড়ীতেও আর গেল না। রমলাকে দেখিলে মনে পড়িবে, কুন্তলাও তারই মত। ধীরেনের পরিতৃপ্ত মুখ দেখিতে হইবে, কুন্তলাকে নিয়া এমনি সুখের সংসার পাতিতে তার কোন বাধা নাই। সে সুখশান্তি চায় না। ধীরেনের মত আনন্দোজ্জ্বল হাসির বিনিময়েও সঙ্কীর্ণ খাঁচায় সে ঢুকিবে না। আর বিচার বিবেচনা নয়, বসিয়া বসিয়া লাভ লোকসানের হিসাব নিয়া মাথা ঘামানো নয়। যা' সে ঠিক করিয়াছে, তাই ঠিক। জগৎ চুলোয় যাক্।

মণীশ খোঁজ করিতে বাড়ী আসিল না, ক্ষিতীশও আসিল না। দিন সাতেক পরে ত্রিষ্টুপ আপিস হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল, সেই চায়ের দোকান হইতে মণীশ তাকে ডাকিল।

দোকানে এখন ভীড় জমিয়াছে, একটি চেয়ারও খালি ছিল না। দোকানের ছোকরা কোথা হইতে একটা ভাঁজ করা চেয়ার আনিয়া ছোট একটু ফাঁকের মধ্যে গুঁজিয়া দিল।

'একজন আজ একশ' টাকা ঠকিয়েছে তিষ্টু।'

'কে?'

'তুমি চিনবে না। পাল চৌধুরী কোম্পানীর পালবাবু।'

'চিনি। একবার চাকরীর খোঁজে দেখা করেছিলাম।'

'ওর একশ' লাখ টাকা আছে। আমার একশ'টা টাকা কি করে আদায় করা যায় বসে বসে ভাবছিলাম।'

ব্যাপারটা আগাগোড়া শুনিয়া ত্রিষ্টুপ মাথা নাড়িয়া বলিল, 'ও টাকার আশা ছেড়ে দিন। ভেবে আর কি করবেন?'

মণীশ মৃদু হাসিল।—'ভেবে আর কি করব, টাকা আদায় করব।'

টাকার জন্য মণীশকে একটু বিচলিত মনে হয় না। পালবাবু টাকাটা না দেওয়ায় সে যেন খুসী হইয়াছে,—আদায়ের জন্য লড়াই করিতে পারিবে। মণীশের প্রকৃতির এই দুর্ব্বল দিক্‌টা ত্রিষ্টুপ ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। পাওনা আদায়ের জন্য লড়াই করিতে সে যদি ভালবাসে, সামান্য কয়েকটা টাকার জন্য একজনের সঙ্গে শুধু লড়াই না করিয়া অনেক টাকার জন্য অনেকের সঙ্গে লড়াই করে না কেন? সে কি মনে করে' সে যা' পায়, তার বেশী আর কিছু তার পাওনা নাই? উপার্জ্জন বাড়ানোর জন্য সে তাই তার অসাধারণ শক্তিগুলি কাজে লাগাইতে অবহেলা করে; কিন্তু কেউ একটী পয়সা ফাঁকি দিলে নির্ম্মম ধৈর্য্যের সঙ্গে সেই পয়সাটী ছিনাইয়া আনিবার জন্য প্রায় সাধনা সুরু করিয়া দেয়?

'ক'দিন যাওনি কেন তিষ্টু?'

'খুব ব্যস্ত ছিলাম।'

মণীশ আর কিছুই বলিল না। তার আগ্রহের অভাবে ত্রিষ্টুপও একটু আহত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে রাস্তায় নামিয়া হঠাৎ সে বলিল, 'কুন্তলার যদি বিয়ে দেন—'

ত্রিষ্টুপের দুই কাণ গরম হইয়া উঠিল। কথায় কথায় মণীশের কাছে কুন্তলার বিবাহ সম্পর্কে একটা প্রস্তাব উত্থাপন করিবে ভাবিয়া রাখিয়াছিল, বিনা ভূমিকায় এমনভাবে কথা তুলিবার কোন ইচ্ছাই তার ছিল না। মণীশ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

'কুন্তলার বিয়ে দেবেন না?'

'দেব বৈকি। বিয়ে না দিলে চলবে কেন?'

'আমাদের আফিসে একটী ছেলে আছে, তার সঙ্গে চেষ্টা করতে পারেন। নরেশ নামে ছেলেটা। ছেলেটী বেশ ভাল, বাড়ীর অবস্থাও মন্দ নয়। আপনি যদি বলেন—'

মণীশ হাসিমুখে তার একটি হাত ধরিয়া বলিল, 'কুন্তলার বিয়ের জন্য ভেবো না ভাই। যার তার হাতে ওকে দিতে পারব না। আমি ছাড়া ওর জন্য কেউ ছেলে খুঁজে বার করতে পারবে না।'

'এ ছেলেটি—'

'খুব ভাল ছেলে। কিন্তু কুন্তলার সঙ্গে ওর যে বনবে তার ঠিক কি? আমার কথা তুমি ঠিক বুঝতে পারনি তিষ্টু। বাংলা দেশের সব চেয়ে ভাল পাত্রটির সঙ্গেও আমি কুন্তলার বিয়ে দেব না। এমন একটী ছেলে খুঁজে আনব, যার সঙ্গে বিয়ে হলে কুন্তলা সুখী হবে। ছেলের অবস্থা কেমন, স্বাস্থ্য কেমন, চরিত্র কেমন এ সব দেখার আগে আমি দেখব ছেলের প্রকৃতি কেমন, কুন্তলার সঙ্গে খাপ খাবে কি না।'

ত্রিষ্টুপ সায় দিয়া বলিল, 'হ্যাঁ, সেটা দেখা দরকার বটে।'

তাড়াতড়ি কুন্তলার বিবাহ মিটাইয়া দিয়া নিজেকে বাঁচানোর জন্যই সে ভাল একটী ছেলের সন্ধান দিয়াছে, অথচ একটু বিবেচনা পর্য্যন্ত না করিয়া মণীশ প্রস্তাবটী বাতিল করিয়াই তাকে যেন বাঁচাইয়া দিল। মণীশের কথা শুনিতে শুনিতে যতই তার মনে হইতে লাগিল কুন্তলার উপযুক্ত ছেলে খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নয়, ততই যেন মনটা তার হাল্কা হইয়া যাইতে লাগিল।

মণীশ বলিল, 'সব চেয়ে বেশী দরকার। অন্ততঃ আমি তাই মনে করি। তোমাদের হিসাবে ধীরেনের চেয়ে হাজারগুণ ভাল একটি ছেলে রমলার জন্য পাওয়া গিয়েছিল,—এখন সে মাসে হাজার টাকা রোজগার করে। আমিই জোর করে' ধীরেনের সঙ্গে রমলার বিয়ে দিয়েছিলাম। ভালই করেছিলাম, কি বল?'

'আচ্ছা মণি দা, বিয়ের আগে ওদের পরিচয় ছিল?'

মণীশ মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না।'

—ক্রমশঃ

ইউরেশিয়া

ভূপর্য্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

দেখ্‌তে দেখ্‌তে মহাসমর ইউরোপ হতে এসিয়ার দরজায় কড়া নারতে সুরু করেছে। সংবাদপত্রে পাঠ করলাম, "ফেলুজ্জা" বৃটিশ দখল করেছেন এবং ফেলুজ্জার নিকটের যে সেতু তা আরবরা ভাঙ্গেনি, ঠিক ঠিকই আছে। অতীতের স্মৃতি মানসপটে ভেসে উঠল। একদিন এই ফেলুজ্জার পথের ধারে বসে বিশ্রাম করছিলাম। সামনে ইউফ্রেটিজ। দেখতে দেখতে কত জল গড়িয়ে চললো সাগরে। পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। যতই জল পান করি ততই পিপাসা বাড়ে। সে কি অসহ্য গরম। সূর্য্য পশ্চিম দিগন্তে ঈষৎ হেলে পড়েছে। অসহনীয় রবিকিরণ যেন শলাকার মতই শরীরে বিঁধছিলো। পরিশ্রমে মাথার শিরাগুলো ফুলে উঠেছে। অথচ অদূরে আশ্চর্য্য আরামে একটি আরবী তরুণ মোটর লরীর ছায়ায় বসে কড়া সুরে সারেঙ্গী বাজিয়ে চলেছিল। তন্ময় হয়ে সে বাজাচ্ছিল, কোনদিকে দৃষ্টি নেই। উঠে গিয়ে তারই পাশে বসলাম।

যুবকটি তন্ময় হয়ে গাইছিলো। বেশ বুঝলাম, সে "আল্লারই" গুণগান করছিল। চোখের চাহনি, হাতের শক্ত কব্জি, প্রশস্ত বক্ষস্থল, রুক্ষ মুখাবয়ব দেখে ভাবাই কঠিন হয়, কি করে সে সারেঙ্গীতে এমন মন মাতানো ঝঙ্কার তুলতে পারে! মনে হল, মানুষের মন ও যৌবন, তার সুখ দুঃখ সর্ব্বত্রই সমান। আলাপের ইচ্ছা হ'ল, কিন্তু ভাবের বাহন ভাষা বাধা সৃষ্টি করলে। আমি উঠলাম।

কলিকাতার আশপাশের গঙ্গাতীরের মতই ফেলুজ্জার উভয় তীর ঘন বসতিতে পূর্ণ। ঘাট কম। মাঝে মাঝে কচিৎ দু'একটা ঘাট। এর কারণ ফেলুজ্জার জল বড় একটা কেউ ব্যবহার করে না। উষ্ণ জল। কি অভিশাপ বুঝি না। গরম দেশ, জলের দরকার সব চেয়ে বেশী। অথচ জলে না করে কেউ স্নান—না ধরে মাছ। বিশেষ কোন কাজে লাগে বলে মনে হয় না। তবে নদীতটে বসে বহু লোক আরাম করছে দেখলাম। এও কম লাভ নয়।

একটু দূরে ব্রিটিশের এ্যারোড্রোমের বিমান মেরামতের উচ্চ গৃহশীর্ষ দেখা যাচ্ছিল। একবার ভাবলাম গিয়ে দেখি ভিতরে কি ব্যাপার। অনেক বাধা বিঘ্নের কথা ভেবে আর যেতে মন উঠলো না। শুনলাম, এই কারখানায় অনেক ভারতবাসী কাজ করে। এখানে ভারতবাসীদের ব্রিটিশ শ্রদ্ধা করে।

ইরাকীরা ভারতের লোকদের হিন্দী বলে। কয়েকজন হিন্দী দেখলাম কাজ থেকে ফিরছে। খৃষ্টান, মুসলমান শিখই বেশী। শিখরা একটু গম্ভীর। কাজ ছাড়া এরা যেন অন্য কিছু বুঝে না। প্রাণ খুলে আমার সঙ্গে আলাপ করলে না দেখে বিস্মিত হলাম। সব চেয়ে বিস্মিত হলাম ইরাকী ও ভারতীয় মুসলমানদের সম্পর্কের কথা ভেবে। ইরাকীরা এদের অবজ্ঞা করে—বয়কট করে। অথচ উভয়েই সুন্নি মুসলমান। কেন এমন হয় ভেবে কিনারা করা কঠিন। ভারতীয় মুসলমান ভারতের মাটিতে বসে ইরাকীদের কত গর্ব্বের চোখে দেখে। হিন্দীরা বলছিল, তাদের প্রতি আরবীয় সুন্নিদের কোনরূপ সহানুভূতি নেই। ইরাকে ধর্ম্মের গোড়ামী শিথিল হয়েছে। জাতীয় চেতনায় তারা ক্রমশঃ সজাগ হয়ে উঠছে। আরবীরা কখনও ভারতীয় মুসলমান নাপিত দিয়ে কামায় না বা ভারতীয় ধুবির কাছে কাপড় কাচতে দেয় না। ভারতীয় দরজী কাঁচি হাতে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু কোন ইরাকী তাদের কাছে ঘেঁষছে না, এমন কি ভারতীয় খাদ্যের দোকানে খৃষ্টান, ইহুদী, আসরিয়ান আসে কিন্তু মুসলমান আরব আসে না। ওদেশে তারাই হলো এখন মেজরিটি, তারাই পলিটিক্স চিন্তা করছে। আমি ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের কথা বলছি। তারপর অবস্থা আরও শোচনীয় হয়েছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ভারতীয়দের পক্ষ হয়ে মানবতার দোহাই দিয়ে আবেদন জানান। কিন্তু জাতীয়তাবাদী আরব সে কথায় কর্ণপাত করেনি। বিগত মহাসমরের পর থেকে মধ্য এসিয়ায় ভারতবাসীর বিরুদ্ধে যেন জেহাদ ঘোষণা করা হয়েছে।

হামাদানের (Hamadan) পশ্চিম দিগন্তে সূর্য্য প্রায় ডুবে আসছিল। আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! এরই মধ্যে শীতল বাতাস বইতে সুরু করেছে। প্রবল পশ্চিমে-হাওয়া যেন, আমার পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ালো। সবটুকু সামর্থ্য দিয়ে সাইকেলের প্যাডেল ঘোরাচ্ছি। তবু যেন সাইকেল এগোয় না। মনে হচ্ছিল—প্রবল পশ্চিমে-হাওয়ার শন্‌শনানি যেন আমার কাণে কাণে বলছিল যে, ভারতে ফিরে যাও। শ্রান্ত শরীর, মনের সকল আক্রোশ গিয়ে পড়লো পবন দেবতার উপর। আশ্চর্য্য, মনের কোণে এই সময় পবন-দেবতার এক বীভৎস মূর্ত্তি ভেসে উঠলো: বাঁদরমুখো বিশ্রী মুখ, দুটো লম্বা দাঁত, ডাগা-ডাগা রক্তবর্ণ চোখ, শরীরের চেয়েও লম্বা দু'খানি হাত। অদ্ভুত চেহারার পবন। চোখ বুঁজে সাইকেল চালাতে লাগলাম।

অনেকটা রাত্রিতে হামাদানে উপস্থিত হলাম। তখন গারেজের (হোটেল) লোকসমাগম প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। গারাজের দরজা মাত্র একটু খোলা রয়েছে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে গারাজের কাফেতে বসেই "চাই" (চা)-এর আদেশ দিলাম। গরম চা দেখেই যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে এল।

চা-এর কাপ সামনে নামিয়ে রেখেই হোটেলের 'বয়' আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। আমার পরিচয় পেয়েই সে একটু দূরে সরে দাঁড়াল। বুঝলাম, এটা আমার দোষ নয়, আমার জাতের দোষ। গারাজে বিছানার দাম দ্বিগুণ দিতে হ'ল। অনুরূপ ঘটনা ইন্দোচীনেও ইতিপূর্ব্বে ঘটেছিল। কিন্তু আমার পরিচয় পাবার পর দ্বিগুণ তো লাগেই নাই, বরং অনেক স্থানে বিনা পয়সায়ও থাকতে পেরেছি। কিন্তু ইরাকের ইরাণীরা সেরূপ লোক নয়। ওসব দয়া-ধর্ম্মের বড় একটা ধার ধারে না ওরা। হোটেল করেছে পয়সা রোজগার করার জন্য। তারা পয়সাই চেনে। এমনকি মুসলমান হলেও তাদের প্রাণ গলে না। যাহোক আশ্রয় পেলাম, এই ঢের। শয্যা নিতেই ঘুমে অভিভূত হয়ে পড়লাম।

হামাদান-সহরটা নূতন করে গড়ার পরিকল্পনা হচ্ছিল। তাই বোধ হয় সমুদয় হিন্দীদের সরিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। গত যুদ্ধের পরে নানা কাজে অনেক "হিন্দী" এখানে এসেছিল। আমি গিয়ে আর কাউকে দেখলাম না। মাত্র একজন ভারতীয় খৃষ্টানের সন্ধান পেয়ে তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করলাম। ভদ্রলোক ভারী অমায়িক। তিনি তেলের কোম্পানীতে কাজ করেন। নাম মিঃ পিল্লে। মিঃ পিল্লে আমাকে পেয়ে কত যে খুসী হলেন তার অন্ত নেই। সঙ্গে সঙ্গে বল্লেন, আমরা কি মানুষ ভায়া, শুধু চাক্‌রী করতে জানি, কিন্তু জাতের ইজ্জত্‌ কাকে বলে তা আমরা জানি না। জাতের ইজ্জত্‌ কি জিনিস যদি আমরা জানতাম তবে হামাদান হতে তিন হাজার ভারত-বাসীর নির্ব্বাসন হতে পারতো না।

হামাদানের কিছু উত্তরেই পর্ব্বতসঙ্কুল কাজাবিন প্রদেশ। এই প্রদেশে অনেক "রুস্কির" বসবাস। কেউ আর্ম্মাণী, কেউ জর্জ্জিয়ান আর কেউ বা ইউরোপের রুশ। এরা কেউ ইরাণী সরকারের অধীনে কাজকর্ম্ম করে না। ইরাণ সরকারের কাজে যোগ দিয়েছে পলাতক রাশিয়ানরা। কেউবা পুলিশে কাজ করছে আর কেউ বা পল্টনেও কাজ করছে। কাজ করে যৎসামান্য উপার্জ্জন করে তাতেই তাদের দিন কোনমতে কাটে। কিন্তু কাজভিন হতে হামাদান পর্য্যন্ত শীতের আধিক্য বেশী, তাই এ অঞ্চলের অধিবাসীরা কচরা সিরিনের দিকে এগিয়ে আসতে পছন্দ করে। অন্ততঃপক্ষে মোয়ামারা পর্য্যন্ত পৌছুনো যেন ওদের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে উপস্থিত হতে ওরা সবাই যেন ব্যস্ত। মিঃ পিল্লে তাই আমাকে সেদিন ভাল করে বুঝালেন। বর্ত্তমানে ইরাণে যে রেল লাইন হয়েছে, তারও অভিপ্রায় যেন তাইই। আরবদের ওরা যেন বলছে, তোমাদের সভ্যতা, তোমাদের ধর্ম্ম এর বেশী যেন পূর্ব্বদিকে না এগোয়। বর্ত্তমানে ইরাণে ভারতীয় মজুরের নামগন্ধও নেই, তবুও ইরাণী হিন্দীকে সুনজরে দেখে না। অথচ রুশ তাদের দেশে তাদেরই বুকের উপর বসে আপন মতলব হাসিল করছে। হিন্দীরা ইরাণীদের সহযোগীতা করেও ঠাঁই পেল না। যেহেতু রুশ স্বাধীন, আর ভারত পরাধীন। আমাদের ভাগ্য ঘরে বাইরে সমান। জাতের মেরুদণ্ড না থাকলে এমনিই হয়।

আরব এবং ইরাণীদের মধ্যেও সদ্ভাব নেই। তবুও তাদের মধ্যে এমন একটা গুণ আছে, যার কল্যাণে

নিজেদের মধ্যে ঘরোয়া বিবাদ তারা করে না। ইরাণীদের ধর্ম্ম আর ইরাকের সকল আরবীদের ধর্ম্মও এক নয়। কুর্দ্দরা দুরন্ত, পারলেই ইরাণে এসে অত্যাচার করে। কিন্তু দুজনের সকল অত্যাচার লোপ পায় তখনই যখন বিদেশীদের দ্বারা তারা উপকৃত হয়। ইরাকী এবং ইরাণী উভয়েই ভারতবাসীকে সন্দেহের চোখে দেখে। হিন্দীর বেলায় উভয় জাতিরই "বেরাদরী" (ভ্রাতৃভাব) ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে। এদের শাসন করতে ব্রিটিশের একদিন হিন্দীর দরকার হয়েছিল। তারপর রেজা শা ইরাণের শাসনভার নেওয়ার পর কুর্দ্দ আর আসে না—কুর্দ্দ-অত্যাচার গেল থেমে। হামাদানে ভারতবাসীর উপস্থিতি আর দরকার হ'ল না।

আসল কথা তারা হয়ে গেল আত্মপ্রতিষ্ঠ আর ভারত যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেল। আমরা হিন্দু মুসলমান নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি করে মরছি আর আরবী মুসলমানের চোখে হিন্দু-মুসলমান সবই সমান—সবই হিন্দী। ইউরেশিয়ার মুসলমান দেশসমূহে এইটাই আমার বড় অভিজ্ঞতা।

পূর্ণচ্ছেদ

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

ময়মনসিং হইতে ঝরিয়া—পথটা খুব সহজ এবং মনোরম। ইহার চেয়ে কলিকাতা হইতে বিলাত যাত্রা অপেক্ষাকৃত আরামের ও নির্ভাবনার। একথা সমরেশের জানা আছে, কারণ এঞ্জিনীয়ার সে গ্লাসগো হইতেই হইয়া আসিয়াছে। বসা, শোয়া, খাওয়া, বেড়ানো, নামা, ওঠা, কোনও বিষয়েই নিজেকে সতর্ক সপ্রশ্ন ও সচেতন থাকিতে হয় না, কোম্পানীর ও জাহাজের লোক সারা পথ সে সব ব্যাপারে অবহিত থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষে ভ্রমণ, বিশেষ ময়মনসিং হইতে ঝরিয়া—এখানে কাহারও কাছ হইতে প্রত্যাশা করিবার কিছুই নাই। যেটি নিজে না দেখিবে, সেটি মাটি হইয়া গেছে বুঝিতে হইবে।

এবং সমরেশের দুর্ভাবনা শিপ্রাতেও সংক্রামিত হইল। মাসের শিশুসন্তানকে লইয়া এই সুদীর্ঘ স্থলপথ জলপথ নিরাপদে পার না হইলে বিশ্বাস কি?

তবু ত' তাহাদের সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট ছিল। কিন্তু চিরদিনের জন্য ব্রহ্মপুত্রের তীরের পৈত্রিক ভবন হইতে বাস তুলিতে হইতেছে, যত ফার্ণিচার, যত কিছু বাসন-কোশন রীতিমত প্যাক্‌ করিয়া 'বুক' করিয়া দিতে হইয়াছে, সঙ্গে একটা আর্দ্দালী আছে, আয়াও আছে, তবু একবার ট্রেণ আবার ষ্টীমার, আবার ট্রেণ, আবার হোটেল, আবার ট্রেণ, আবার ওয়েটিংরুম, আবার ট্রেণ আবার ট্যাক্সি—ভাবিতে গেলে মাথা ঘুরিয়া যায়।

ঘুরিলেও নির্দ্দিষ্ট দিনে ঘোড়ার গাড়ীর মাথায় মালপত্র তুলিয়া ষ্টেশনের দিকে যাত্রা করিতেই হইল। শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের পরিচিত মাতৃভূমি ছাড়িয়া চিরদিনের জন্য বিহারে বাসা বাঁধিবার কল্পনায় সমরেশের মন একটু কেমন করিয়া উঠিল।

শিপ্রা বিক্রমপুরের, তার অত ভয় হয় নাই। তাহাদের বাসার চতুর্দ্দিকে বর্ষার জল সমুদ্রের রূপ ধরে, গ্রীষ্মের সময়ে টিলার উপর বাঙ্‌লো, মনে হয়, সে দ্বীপান্তরিত জীবনে একেই তাহার বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছিল, ময়মনসিংও বড় নির্জ্জন, বড় মাঠের ধার দিয়া নদীতটে সন্ধ্যার সময়ে ফিরিবার কালে তার বড় করুণ লাগিত আসন্ন অন্ধকারের নিঃশব্দ মর্ম্মবিলাপে।

সে সঙ্গ চায়, বহু মানবের সঙ্গ চায়—বহু কণ্ঠের কোলাহল, বহুজনের কর্ম্মব্যস্ততা। কলিকাতা হইলে ভালই হয়, একবার দেখা কলিকাতা তার মনকে আজও আচ্ছন্ন করিয়া আছে। ঝরিয়া হইলেই বা মন্দ কি? অসংখ্য কোলিয়ারীর অগণিত শ্রমিকের দেশ। নবীন জীবন, নূতন অনুভূতি।

কামরাগুলি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, সরু লাইনের খেলাঘর যেন। জান্‌লায় হাত রাখিয়া সে বসিল, মলিনা, আরতি, সন্ধ্যা, বাসন্তী, ইভা-অনুভাদের বাড়ী পার হইয়া গেল, সকলেই বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল, কেহ হাত নাড়িয়া, কেহ রুমাল নাড়িয়া, কেহ শুধু হাসিয়া বিদায় জানাইল। আনন্দমোহন কলেজ ও হোষ্টেল পার হইয়া গেল, মুক্তাগাছা রোড লাইন ক্রশ করিয়া গেল, পরিচিত ব্রহ্মপুত্রের তীর ও চর দেখা গেল, ওপারে গারো পর্ব্বতমালা আরও পরিষ্কার হইয়া দেখা দিল—সঙ্গীর মত কতক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে চলিল, ছাড়িতে যেন চায় না। চলিয়া গেল কিনা বোঝা গেল না; দ্বিতীয়ার অন্ধকার নামিয়া আসিল।

সিংজানি জংশন পার হইয়া দেখা গেল ব্রহ্মপুত্র এখনও ছাড়ে নাই, নৌকার লাল আলো জলে কাঁপিতেছে। সরিষাবাড়ী আসিবার সঙ্গে সঙ্গে মিলাইয়া গেল।

সমরেশ দু'একটা কথা বলিতেছিল, খোকাকে ভাল করে' ঢাকা দাও, জান্‌লার ধার থেকে সরে' এস—ইত্যাদি, যদিও বিদায়ের ব্যথা তরণীর দীপের মত তাহারও মনের অন্ধকারে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু শিপ্রা মর্ম্ম দিয়া অনুভব করিতেছিল—বাঁধন ছিঁড়িব বলিলেই সহজে ছিঁড়িতে পারে না নারী।

ষ্টীমারে অবশ্য তাহাদের ভীড় সহ্য করিতে হইল না, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের মত মরি-বাঁচি করিয়া ছুটিয়া ধাক্কাধাক্কি করিতে হইল না। স্বতন্ত্র প্রবেশপথ, উপরে উঠিবার সোপান, উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত স্বতন্ত্র সুশোভিত কক্ষ।

তবু মালগুলা বুঝিয়া লইতে হইল, অল্পবুদ্ধি আয়া উঠিয়াছে কিনা সন্ধান লইতে হইল, পরিশ্রমে অবসন্ন হইয়া সমরেশ আরামপ্রদ সোফায় এলাইয়া পড়িল।

বড় বড় ভারী ভারী কাঠের কেসে মাছের পার্শ্বেল 'খবর্দ্দার' 'খবর্দ্দার' করিয়া বিকট কোলাহল করিয়া কুলীরা ষ্টীমারের উপর আছড়াইয়া ফেলিতেছিল, একটা নয় একশোটা।...একজন লোকের অসাবধানতায় সেই দুর্ব্বহ বোঝা পায়ের উপর পড়িতে পায়ের চামড়া অনেকটা উঠিয়া গেল, সেই লইয়া হৈ হৈ ব্যাপার।

এঞ্জিনের কাছটা কয়লার আগুনে গরম হইয়া আছে, কাছে যায় কার সাধ্য। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে সারেংরা কাজ করিতেছে, এধারে ওধারে লোকজনের আনাগোনায় খাবার কেনার ধূমে ব্যস্ততার অবধি নাই, যেন একটা হাট বসিয়াছে, বিয়ে বাড়ী কোথায় লাগে!

এম্‌নি সময়ে চাঁদ উঠিল। নিঃশব্দ সমারোহে যমুনার তীরে চন্দ্রোদয়, আকুল দক্ষিণ পবনে সমস্ত যাত্রীদের কোলাহল কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ করিয়া দিল, রেলিংএর ধারে ভীড় করিয়া মেয়েপুরুষ কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হইয়া গেল।

শিপ্রাও বসিয়া নাই, তার কি জানি কেন মনে পড়িল ঢাকার ফরাসগঞ্জের যে ছেলেটিকে জীবনে প্রথম সে ভালবাসিয়াছিল, তার নাম ছিল অমিতাভ। আর্টিষ্ট্ সে, চন্দ্রোদয় কি মনোরম করিয়াই না আঁকিত। লক্ষ্যায় একদিন নৌকা করিয়া যাইবার সময়ে এম্‌নি চাঁদ উঠিতেছিল, 'নৌকা' না 'লৌকা', এই লইয়া হাসাহাসি চলিয়াছিল, দু'জনেরই পরিবার ও অভিভাবকেরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাহাদের মনের মিল দেখিয়া অনুচ্চস্বরে কি যেন বলাবলি করিয়াছিলেন।

তাহাদের মিলন হয়ত শেষ পর্য্যন্ত হইতই; কিন্তু বিলাতযাত্রী পাত্র ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা লইয়া যখন অযাচিত আসিয়া পড়িল শুধু শিপ্রার রূপ দেখিয়া, তখন মধ্যবিত্ত আর্টিষ্টের কথা হঠাৎ ভুলিয়া যাওয়া আশ্চর্য্য নয়।

তা'ছাড়া শিপ্রা সেভাবে তৈরীও হয় নাই যে বলিয়া বসিবে, অমিতাভের সঙ্গে বিবাহ না হইলে সে আত্মহত্যা করিবে।

অমিতাভও অত্যন্ত লাজুক, সেও কোনদিন মুখ ফুটিয়া কিছু বলে নাই। কিন্তু দু'জনকারই জীবনে সেই প্রথম এবং হয়ত শেষ রোমান্স্—যতটুকু রোমান্স্ অবশ্য বাঙ্‌লা দেশে সম্ভব।

কিছু হাসি, কিছু কথা, কিছু লিপিমালা
কিছু সেবা, প্রীতিভরা স্মরণের ডালা।

এই সংবাদটুকু কিন্তু সমরেশের বরাবরই অগোচর ছিল, এবং অমিতাভের সঙ্গে যে শিপ্রার কোনদিন পরিচয় অবধি হইয়াছিল, এমন খবরও সে পায় নাই;

কারণ বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই অমিতাভ রঙ্গমঞ্চ হইতে সরিয়া পড়িয়াছিল এবং কোথায় কোন্ টেক্‌নিক্যাল স্কুলে নাকি কি শিখিতে যায়।

জল কাটিয়া ষ্টীমার চলিয়াছে, উচ্ছলিত তরঙ্গে রূপালী কিরণের শত সহস্র ধারা বিচ্ছুরিত হইয়া কূল হইতে কূলে বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, প্রথম ফাল্গুনের মৃদু বাতাসে যে কথা যেমন করিয়া ভাবিতে ভাল লাগে, শিপ্রা তেমনি করিয়া ভাবিতে বসিল।

কিন্তু তখন পিংনার আলো দেখা গিয়াছে।

পিংনায় উজ্জ্বল আলোকে জেটিতে কাহাকে দেখিয়া শিপ্রা শিহরিয়া উঠিল! অবিকল অমিতাভ যে!

তার চীৎকার করিয়া ডাকিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু হঠাৎ পাশে সমরেশকে দেখিয়া চুপ করিয়া গেল।

হাঁ, অমিতাভই।

সে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া সমরেশকে বলিল, গুড্ ইভ্‌নিং স্যর। আমি আপনার চিঠি পেয়েছিলাম। এক সঙ্গেই গিয়ে কাজে জয়েন করব।

সমরেশ বলিল—চল। সিরাজগঞ্জ ঘাটে আমার জিনিষপত্রগুলো একটু দেখে তুলিয়ে দিও।

নিশ্চয়ই স্যর, সে বল্‌তে হবে না।

সে যেমন আসিয়াছিল, তেম্‌নি নামিয়া গেল। শিপ্রাকে লক্ষ্যই করিল না, কোনদিন যে চিনিত, এমন ভাবও দেখাইল না।

সে চলিয়া যাইবার পর শিপ্রা প্রশ্ন করিল—কে ভদ্রলোক!

অমিতাভ। আমাদের কোম্পানীর সার্ভেয়ার।

ও! মাইনে কত?

এখন বুঝি পঞ্চাশ পাচ্ছে।

কত তফাৎ! শিপ্রা ভাবিতে বসিল, তার স্বামী ম্যানেজার, বেতন আটশো, তারই অধীনে পঞ্চাশ টাকার সার্ভেয়ার অমিতাভ। কিন্তু মাহিনা এবং টাকা দিয়াই কি পৃথিবীর সব জিনিসের বিচার চলিত!

শিপ্রার দীর্ঘশ্বাস পড়িল।

পরপারে সেকেণ্ড ক্লাস কামরার সাম্‌নে সিঁড়ি দেওয়া ছিল, শিপ্রাদের উঠিতে কষ্ট হইল না, কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর সোপানবিহীন কামরায় অন্ধকারে দোদুল্যমান অবস্থায় অমিতাভ কি করিয়া নিরাপদে উঠিবে, এই তার চিন্তার বস্তু হইল।

ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া আলো নিভাইয়া দিয়া আরামে নিদ্রার আয়োজন করিবার সময়েও তার মনে জাগিল ভীড়ে ও গোলমালে বেচারা বোধ হয় সারা রাত ঘুমাইতেও পারিবে না, এখানে তার সঙ্গে আকাশপাতাল প্রভেদ আছে, কারণ সে ইণ্টার ক্লাসের যাত্রী। আচ্ছা, থার্ড ক্লাসই বা কেন সে কিনিল, শুনিয়া অবধি তার স্বস্তি নাই, সে কি ইচ্ছা করিলে মধ্যম শ্রেণীতে যাইতে পারিত না? কেন?

কলিকাতায় জিনিসপত্র কেনাকাটায় বাজার-সরকারীর কাছে অমিতাভের যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া গেল এবং শেষ অবধি ঝরিয়ার কোলিয়ারীতে সকলে যে নিরাপদে পৌঁছিল তাহা শুধু অমিতাভেরই জন্য বলিতে হইবে, বুড়ী আয়া ত বরাকরকে ধানবাদ মনে করিয়া নামিয়াই পড়িয়াছিল!

•

ঝরিয়া!—বাতাস সেখানে কয়লার গুঁড়ায় ধূসর, দিগন্ত নিকষের মত কালো। চিম্‌নির পর চিমনি, লিফ্‌টের পর লিফ্‌ট সার বাঁধিয়া চলিয়া গেছে, খনিতে খনিতে ঠোকাঠুকি, ছাইয়ের গাদায়, হার্ড কোকের ধোঁয়ায়, বনতুলসীর বনে যন্ত্রসভ্যতার রুক্ষ মূর্ত্তি হঠাৎ মন ভরাইয়া দেয়।

শিপ্রাদের সাহেবী বাংলোর উঁচু জমি হইতে দেখা যায়, সরু লাইন ধরিয়া টব্‌গাড়ী চলিয়াছে, ভস্মের পাহাড়ের মাথা ছাপাইয়া আর এক কোলিয়ারীর ধাওড়ার সার, হঠাৎ কখনও এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেলে ঝরিয়া সহরটা রাজপ্রাসাদের দুইটা গম্বুজ ঘিরিয়া ঝিক্‌মিক্ করিয়া ওঠে, নীল দিগন্তে সুনীলতম পরেশনাথ পাহাড় জাগিয়া থাকে।

কালো রং-এর রাস্তাটা পার হইয়া ওধারে কোথায় সার্ভেয়ার থাকে, সে খবর পায় নাই; কিন্তু বারুদের ঘরের কটুকটে সাদা রংটা চোখের পক্ষে বড়ই পীড়াদায়ক।

বয়লারের কিম্ভূতকিমাকার ঘরটাকে সে ওখান হইতে হটাইতে পারিলে বাঁচে।

খালি কয়লা আর কয়লা—দিনের পর দিন মানুষ কি করিয়া দেখিতে পারে? এই কালো অপদার্থ কয়লা কত লোকের প্রাসাদ রচনা করিতেছে এবং ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বাড়াইতেছে, সে কথা অবশ্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই; কিন্তু সৌন্দর্য্যের দিক্ হইতে ঝরিয়ার চেয়ে ব্রহ্মপুত্রের তীরে কেয়টখালি অনেক বেশী মনোরম ও লোভনীয়—এ কথা শিপ্রার ফাল্গুনের দ্বিতীয় সপ্তাহেই মনে পড়িল। অবশ্য এ কথা মনে পড়াই মানে বেদনা।

এদিকে জ্যোৎস্না কয়দিনই উঠিয়া মিলাইয়া গেল, কিন্তু অমিতাভের টিকি দেখিতে পাওয়া গেল না।

সে নাকি কাজ লইয়া ব্যস্ত, মস্ত কাজের লোক হইয়াছে!

আলাপ হইল সন্ধ্যার সঙ্গে, সে পাশের কোলিয়ারির ম্যানেজারের স্ত্রী। বেশ হাস্যচপলা মেয়েটি। সে আবার তাহাদের ডাক্তারবাবুর পত্নীর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিল একদিন। রেণুকা—রেণু তার নাম।

তিনজনে মিলিয়া প্রায়ই তারা সান্ধ্য-ভ্রমণে বাহির হইত। দেখিবার কি-ই বা আছে, খালি ছাইয়ের গাদা আর কয়লার ধোঁয়া। কোনও একটি গাছের চিহ্ন নাই, না বা ফুল, না বা শ্যামল তৃণ, যে দিকে চাও খালি বন-তুলসীর বন।

সার্কুলার রোড দিয়া কোন দিন জয়রামপুর কোলিয়ারি কোনদিন বা সাউথ ভিস্‌রা কোলিয়ারি, কোনওদিন বা উঁচু টিলাটা পার হইয়া কাচ্ছিদের শ্মশানের দিকে ঘুরিয়া আসে।

একদিন শিপ্রা ধরিয়া বসিল, কোলিয়ারির বাহির দেখা হইয়াছে, এবার ভিতরে না নামিলে চলিবে না।

সমরেশ শুনিয়াই আপত্তি করিল, নূতন নিয়ম হইয়াছে মেয়েদের খনিতে নামা নিষেধ।

শিপ্রা শুনিবে না, বলে, সে শ্রমিক মেয়েদের জন্যে। দেখবার ব্যবস্থা তুমি খুব করে' দিতে পার। খনির রাজ্যে এলাম, খনি দেখব না, সে কি ক'রে হবে?

অগত্যা সমরেশ বলিল, আচ্ছা, সে হবে'খন।

—হবে'খন নয়, কালই হ'তে হবে।

এগারোটা বাজিয়া গেছে, ছোক্‌রা চাকরটাকে সঙ্গে লইয়া শিপ্রা বাহির হইল। ক[illegible]পাতে রেল লাইনে অনেকগুলি ওয়্যাগন দাঁড়াইয়াছিল, অনেকটা ঘুরিয়া যাইতে হইল। কয়লার গুঁড়ায় স্যাণ্ডাল ও পা দু'খানি একেবারে কালো হইয়া যায়, উপায় কি?

অফিসে ঢুকিতে সাহস হইল না, বাবুরা আছে, একটু পাশ কাটাইয়া অন্যদিকে দাঁড়াইতে গিয়া দেখে, নূতন লাইন পাতা হইবে, রাবিশ ফেলা হইতেছে, কামিনরা কুলীদের কাছ হইতে ঝোড়া ভর্ত্তি করিয়া লইয়া ছুটিতে ছুটিতে এক জায়গায় ফেলিয়া আসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে একটি লোকের কাছ হইতে এক কড়া কড়ি কোমরের কাছে থলিতে ফেলিতেছে।—অর্থাৎ কয় ঝুড়ি হইল তার হিসাব। স্বাস্থ্যের একটি অনুপম সৌন্দর্য্য তাহাদের দর্শনীয় করিয়া তুলিয়াছে। উহাদের মধ্যে আবার যাহারা বিলাসপুরিয়া, তাহাদের বর্ণ ও শ্রী সত্যই দেখিবার বস্তু।

এম্‌নি বিপজ্জনক জায়গায় সমরেশকে কাজ করিতে হয় দেখিয়া সে একটু চিন্তিত এবং বিমর্ষ হইল।

চাকরটাকে দিয়া খবর পাঠাইয়া দিল, সমরেশ শুনিয়াই ছুটিয়া আসিল। বলিল, একেবারে এসে পড়লে? মাইন্‌স্ ডিপার্টমেণ্টের লোক এসেছে, তার সঙ্গে আমার কাজ রয়েছে। আমি ত' সময় করতে পারব না। আচ্ছা, অমিতাভ তোমায় দেখিয়ে আন্‌ছে। আপত্তি আছে? ছেলেটি ভাল আর খুব লাজুক। আর কর্ম্মচারী বই ত নয়, ওকে গ্রাহ্য করতে গেলে চলে না।

শিপ্রা হাঁ-না কিছুই বলিতে পারিল না। ডাকিতেই অমিতাভ আসিয়া হাজির হইল, তাহাকে নিশ্বাস ফেলিবার সময় না দিয়া সমরেশ বলিল, আলো নাও দুটো, এঁকে দু' নম্বর খাদটা দেখিয়ে আন।

স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিল, যাও, এটা ইন্‌ক্লাইন্ আছে, আস্তে আস্তে নামবে, কষ্ট হবে না। আমার লাঠিটা নাও, ঠুকতে ঠুকতে যাও। নামিবার মুখ অবধি সমরেশ পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

সম্মুখে অতলস্পর্শী অন্ধকার, এ্যাসিটিলিনের আলোয় একটি পদক্ষেপের স্থান মাত্র দেখা যায়, তার বেশী নয়। পিছনে পৃথিবীর আলো মিলাইয়া গেছে। সত্যি ভয় করে।

দু'জনেই চুপ... কিশে কাটা তাব, তার পাশেই গভীর খাত।

বাঁ দিকে বাঁকিবার সময়ে অমিতাভ কথা কহিল, এবার এদিকে···সাবধানে।

সরু সুড়ঙ্গ—ক্রমনিম্ন, মাথার উপরে ছাদ প্রায় মাথায় ঠেকে, আলো বহিতে গিয়া হাত 'ভারিয়া' আসে, বাতাস পাওয়া যায় না, গায়ে ঘাম দেখা দেয়।

অমিতাভ কথা কয় না।

শিপ্রা বলে, কথা বল, নইলে যে ভয় করচে!

কি বলব বল—অমিতাভ বলে।

—বোঝাও।

—এই যে দু'পাশে দেয়ালগুলো দেখচ, এগুলো রেক্টাঙ্গুলার, এর নাম পিলার, এইগুলোই আসল কয়লা এবং পিলার কাটিং-এই লাভ, এখনও কাটিংএর সময় আসেনি। মাঝে মাঝে দু'পাশে যে গর্তগুলো দেখচ, ওগুলো ম্যান্‌হোল, ওপর থেকে কয়লার টব লাইন ধরে নেমে এলে, কুলীরা এর ভেতর ঢুকে দাঁড়ায়।

—না দাঁড়ালে?

—পিষে মারা যাবে। যেমন গত সপ্তাহে একটা য়্যাক্‌সিডেন্ট হল। যেখানটা দাঁড়িয়ে ঐ জায়গায়। কুলীটাকে চেনবার উপায় ছিল না।

শিপ্রা শিহরিয়া উঠিল।

কোথায় যেন খুট্‌খুট্ আওয়াজ হইতেছে, শিপ্রা জিজ্ঞাসা করিল, কিসের শব্দ?

—মাল-কাটারা কাজ করছে।

কোথায়?

—ওদিকে চল, দেখতে পাবে।

খানিকক্ষণ পরে মোড় ঘুরিতেই দেখিতে পাওয়া গেল, কেরোসিনের ডিবার স্বল্প আলোকে এবং বহু ধূমে গলদ্‌ঘর্ম হইয়া কালীর চেয়ে কালো মূর্তিগুলি গাঁইতি উঠাইতেছে।

কন্‌ট্রাক্টর তাহাদের দেখিয়াই ছুটিয়া আসিল। সে আরও বেশী বকিয়া, আরও বেশী বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

শিপ্রা বলিল—কত নীচে আমরা এসেছি, বলতে

—এসেছ তিনশো ফুট নীচে। আরও নীচে যেতে চাও?

—চাই। চল। কোন্‌দিকে?

কন্‌ট্রাক্টর পথ দেখাইতে লাগিল।

ক্রমশঃই তারা নীচে নামিতেছে।

শিপ্রা বলিল, আচ্ছা, এ ছাদটা ধ্বসে পড়তে পারে?

—যে কোনও মুহূর্ত্তে। অম্লান বদনে অমিতাভ বলে।

—এখনি কোনও একসিডেণ্ট হতেপারে? গ্যাসের কিম্বা আগুনের?

—অসম্ভব নয়।

শিপ্রার যেন দম বন্ধ হইয়া আসে।

কিন্তু এবারে কোথা হইতে যেন বেশ ঠাণ্ডা বাতাস আসিতেছে। শিপ্রা বলে, হাওয়াটা কোন্ দিক থেকে আসছে বল ত?

লিফ্‌টার কাছে এসে গেছি যে। অনেক দূরে সামনে একটুখানি সাদা আলো দেখতে পাচ্ছ? ঐখানে লিফ্‌টা।

কন্‌ট্রাক্টরকে তারা বিদায় দিল। ঘন অন্ধকারে দুইজনকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সে বেচারা মৃদু হাস্য করিয়া চলিয়া গেল।

শিপ্রা লিফ্‌ট দেখিয়া বলিল, এদিক্ দিয়ে উঠব কেন? যে দিক্ দিয়ে এসেছি, সে দিক্ দিয়ে ফিরে গেলেই ত হয়?

—পারবে তুমি অতখানি উঠ্‌তে? ঘেমে নেয়ে উঠ্‌বে! ওঠ খাঁচার মধ্যে।

দ্বিপ্রহরের রৌদ্র মনে হইল যেন প্রভাতের আলো। তবুও চাহিয়া থাকা যায় না। জামা-কাপড় ঘামে শপ্‌শপ্ করিতেছে।

লিফ্‌টের সামনেই বাড়ী। শিপ্রাকে পৌঁছাইয়া দিয়া অমিতাভ চলিয়া গেল।

পরদিন বিকালে পুখুরিয়া খাদ কেমন করিয়া কাটা হয় দেখিবার জন্য শিপ্রা প্রস্তুত হইতেছিল, দেখিল সমরেশ অফিস হইতে ফিরিয়া আসিল গম্ভীর মুখে।

শিপ্রা কারণ জিজ্ঞাসা করিল, বলিল শরীরটা ভাল নেই।

শিপ্রা একটু চিন্তিত হইয়া পড়িল, বিদেশে অসুখের কথা শুনিলে ভয় করে বৈকি!

কিন্তু কি অসুখ, সমরেশ বলিল না। অনেক পীড়া-

পীড়িতে বলিল, আমার আর বেঁচে থেকে লাভ কি? অমিতাভর সঙ্গে তোমার ত ভাব হয়ে'ই গেছে!

শিপ্রা যেন আকাশ থেকে পড়িল।

—কেন কি হয়েছে?

সংক্ষেপে সমরেশ বলিল, কণ্ট্রাক্টর বাবু নিজের কাণে শুনেছে দু'জনে তুমি-তামি ক'রে কথা বলেছ, হাসাহাসি করেছ, শেষটা তাকে সরিয়ে দিয়ে আবার কোন্‌দিকে গেছ।

শিপ্রা ব্যাপারটা কতকটা অনুমান করিতে পারিল। বলিল, অমিতাভর সঙ্গে আমার বিয়ের আগে থেকে আলাপ যে! সে কথা এতদিন বলিনি।

—কেন বলনি জান্‌তে পারি? বল্‌লে কি আমি খেয়ে ফেল্‌তুম? আর, ওর সঙ্গে সম্ভবতঃ বিয়েরও সম্বন্ধ হয়েছিল?

শিপ্রা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—হাঁ।

—তাহ'লে আমি যা ভাব্‌ছি, ব্যাপারটা তার চেয়েও গুরুতর। কিন্তু আমি তোমায় ভয়ানক বিশ্বাস করেছিলুম শিপ্রা। বলিয়া সমরেশ ঘন ঘন পায়চারী করিতে লাগিল। রাগে তার মুখ রাঙা হইয়া গেছে।

শিপ্রা বলিল, বিশ্বাস এখনও করতে পার, অবিশ্বাসের কিছুই হয়নি। বলিয়া শিপ্রা সমরেশের খুব কাছে যাইতেই সে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিয়া বলিল—স'রে যাও আমার সাম্‌নে থেকে। এখন আমার মাথায় আগুন জ্বল্‌ছে।

শিপ্রা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। পরেশনাথ পাহাড় আবার পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে, বাঘদীঘি কোলিয়ারিতে আগুন লাগিয়াছে, লোদ্‌না কোলিয়ারি ধ্বসিয়া গেছে।

বেঙ্গল ঝরিয়ার দোতলা বাড়ীর রাণীগঞ্জ-টালি সন্ধ্যার আলোয় আরও যেন রাঙা হইয়াছে।

ক্রমশঃ অন্ধকার নামিয়া আসিল, কোলিয়ারির অফিসে আলো জ্বলিয়া উঠিল, উজ্জ্বল বিদ্যুতের আলো, দূর হইতে তারার মত যেন ঝিকমিক্‌ করে। কিন্তু একটি সুখী দম্পতির মনের আকাশে যে নিকষ-কালো তমিস্রা নামিল, সেখানে কোনও আলোকের আভাষ নাই।

সে রাত্রে দুই জনেরই খাওয়া হইল না। সমরেশ ঘরের ভিতর, শিপ্রা বাহিরে [illegible] বসিয়া রহিল। হায়নার মত একটা কি লাফ দিয়া চলিয়া গেল, নেকড়েও হইতে পারে, আধ-বাঘা যাকে বলে। আজ শিপ্রার ভয় নাই। অন্য দিন হইলে—

দু'জনের জীবনের সবচেয়ে দুঃখের দীর্ঘ রাত্রিও প্রভাত হইয়া গেল।

সকাল বেলা সমরেশ আবার ধড়াচুড়া আঁটিতে লাগিল।

যে সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহার সুরাহা কেমন করিয়া করা যাইতে পারে, 'টাই' বাঁধিতে বাঁধিতে সে ভাবিতে লাগিল।

সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র থাকিয়াও সে কোনও উপায় আবিষ্কার করিতে পারে নাই, সকাল বেলাও হঠাৎ কিছু মনে পড়িল না।

অমিতাভকে ত' নোটিশ দিতেই হইবে এবং ঝরিয়া ফীল্‌ডে যাতে না থাকিতে পারে, তাহার ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

তার আগে ডাকিয়া আনিয়া চাবুক লাগানো যায় কিনা, শিপ্রাকেও সেই সঙ্গে।

খুব কঠিন একটা শাস্তির বন্দোবস্ত না করিলে, তার মাথার আগুন নিভিবার সম্ভাবনা নাই।

একেই প্রতারণায় মানুষের রাগের অবধি থাকে না, তা-ই যদি আবার নিজের স্ত্রীর দিক্‌ হইতে আসে—সবচেয়ে বিশ্বাসের পাত্রী যে—তাকে খুন করিয়া ফাঁসী যাইতেও বাধে না, অশিক্ষিতদের শাস্ত্রে অবশ্য এই বলে; শিক্ষিতদের ব্যবস্থাকেও তেম্‌নি নিষ্ঠুর এবং কঠিন করিয়া তোলা যাইতে পারে নাকি?

সমরেশ তা-ই ভাবিতেছিল।

শিপ্রাকে সে সকালের দিকে ছায়ার মত সরিয়া যাইতে দেখিয়াছিল, কোনও কথা কহে নাই।

হয়ত' আর একটু পরে আসিয়া পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে সুরু করিবে, বলিবে 'ওগো, মাপ কর', সে সময়ে কি প্রচণ্ড পদাঘাত সে করিবে, সে কথাই মনে মনে চিন্তা

করিতে লাগল। সবুজ এমন লাথ মারিবে যে, ছিটকাইয়া ঐ উঠানে গিয়া রক্তগঙ্গা হয় হোক্।

বেয়ারা টোষ্ট্ চা দিয়া গেছে, এক শ্লাইস্ রুটি সবে মুখে তুলিয়াছে, দাঁতেও কামড় দিয়াছে, তখনো চিবায় নাই, হঠাৎ প্রচণ্ড এক আওয়াজ হইল—ভুম্। তারপর আবার, তারপর আবার।

একটা মিশ্রিত কোলাহল, আর্ত্তনাদ, ছুটাছুটি ও প্রচুর ধূমে আসন্ন ভীষণ বিপদের সূচনা বোঝা গেল।

সঙ্গে সঙ্গে শিপ্রাও বাহিরে আসিয়াছে। দালানের উপর হইতে সমরেশ লাফ দিয়া ছুটিল। পিছন হইতে আসিয়া শিপ্রা বলিল—তুমি যেয়ো না।

—আমি ম্যানেজার, খনির সব দায়িত্ব আমার বলিয়াই সমরেশ একেবারে লিফ্‌টের কাছে গিয়া হাজির হইল।

কুলীরা কামিনরা চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া পালাইতেছে, তীব্র গন্ধ, অসহ্য ধোঁয়া…

আর একটা বিদ্যুৎ ঝলকিত আলো ও মৃত্তিকা বিদীর্ণকারী ধ্বনি—সমরেশ কোথায়?—একদিকে ট্রাউজার একদিকে কোট আর একদিকে ছিন্নশির শতটুকরা হইয়া ছড়াইয়া পড়িল।

সে দৃশ্য দেখিয়াই শিপ্রা চোখ বুজিল এবং মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

অমিতাভ তাকে পাঁজাকোলা করিয়া তুলিয়া বাংলোয় মধ্যে লইয়া আসিল, তখনো মাটি মুহুমুহু কাঁপিতেছে, তখনো আওয়াজের বিরাম নাই।

কয়েক মিনিট মাত্র—বাংলো হইতে অফিস পর্যান্ত কোনও বিল্ডিংএরই চিহ্ন রহিল না। একটা মাইলব্যাপী বিস্তৃত গহ্বরের তলায় কলমাঝ কোলিয়ারী বিলুপ্ত হইয়া গেল।

সকালের রৌদ্র তখন প্রখর হইয়াছে, কোলিয়ারীর পর কোলিয়ারীর লিফ্‌ট্ ওঠা-নামা করিতেছে, টবগাড়ী চলিয়াছে, কুলীরা লণ্ঠন লইয়া খাদে নামিতেছে।

এবং পরেশনাথ তার সু-উচ্চ মহিমায় উত্তরের নীল দিগন্তে ভাসিয়া উঠিয়াছে।

কাঁটা-তার দিয়া 'ডেঞ্জার জোন' ঘিরিয়া দেওয়া হইল, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে পথিক পাতাল পর্য্যন্ত প্রসারিত সে বিরাট্ ধ্বংসস্তূপের দিকে চাহিয়া সভয়ে শিহরিয়া ওঠে, কিন্তু যে তরঙ্গায়িত সুখদুঃখের, অভিমান-অবিশ্বাসের, প্রেম-প্রণয়ের উপাখ্যান এখানে ধীরে ধীরে রচিত হইতেছিল, তার অপ্রত্যাশিত অসমাপ্তির ইতিহাস জানেই বা কে এবং তার জন্য বেদনাই বা কাহার?

বাণী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

তোমার আকাশবাণী মনে হয় আসে যেন কাণে,
অপলক নক্ষত্রের অগণিত নয়নে নয়নে
সে বাণী অন্তরে মোর নিঃশবদে ফোটে অবচনে।
তথাপি উদাসীরই, অবশেষে হেরি কি সন্ত্রাসে
বজ্ররবে কহ কথা দামিনীর প্রদীপ্ত আভাসে!
প্রবাহিনী বাণী তব ব'য়ে যায় শোণিত-প্লাবনে
মরণের বন্যাজলে, বিশ্বব্যাপী খাণ্ডব দাহনে
সে বারতা ভস্মাক্ষরে রয় লিখা—পড়ি ইতিহাসে।

যুগ হ'তে যুগান্তরে কভু মৌনে কভু ভীমরবে
কহ তুমি নিজ বাণী, বুঝি না যে কি তাৎপর্য তার।
নীরবে কি বল তুমি এ জগতে প্রেম সারাৎসার?
তথাপি স্বার্থের গণ্ডী সযতনে মোরা বাঁধি যবে,
হে শঙ্কর সংহার মুরতি ধরি বজ্র হান ক্রোধে,
সর্বহারা হই মোরা অপ্রেমে ও অন্ধ অভিক্রোধে।

গান ও স্বরলিপি

(ধ্রুপদ)

দরবারী-কানাড়া—ত্রিতাল

আজি নিখিল নিমগন সুন্দর ধ্যানে
পুলক উচ্ছল পরম জ্ঞানে।
আনন্দে চিত জাগে
পরমাশীষ মাগে
দিগন্ত ভরিছে মঙ্গল দানে।

কথা—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, এম এল. সি.

স্থায়ী

```
         +                 ৩                  ০                     ১
সা সা II ণ্া সা সা ণ্া | রা  সা  -া  সা | ণ্া  -সা  সা  রা : ণ্দ্া -ণ্দ্া -ণ্া প্া I
আ-জি     নি খি ল নি  | ম   গ   ০   ন  | সু   ০    ন্দ  র  : ধ্যা০  ০০   ০  নে

+                     ৩                       ০                    ১
ম্া  পম্া  প্া  -া | ণ্দ্া -ণ্দ্া ণ্া প্া | ম্া প্া সা -ণ্া | রা -সা -া সা II
পু   ল০   .ক   ০  | উ০    ০০    চ্ছ ল  | প   র   ম  ০   | জ্ঞা ০  ০  নে
```

অন্তরা

```
   +                  ৩                      ০                     ১
II সা  রা  -া  সা | রা রা মজ্ঞা মজ্ঞা | মজ্ঞা মা পা -মজ্ঞা | মজ্ঞা মজ্ঞমা রা সা I
   আ   ন   ০   ন্দে | চি ত  জা০  গে০  | প০   র  মা  ০০   | শী০  ষ০০   মা গে

+                  ৩                     ০                     ১
মা পা -র্সা র্সা | ণদা -ণদা ণা পা | মা -পা পণা পমা | মজ্ঞা -মা -রা সা II
দি গ   ০   ন্ত  | ভ০  ০০  রি ছে | ম  ০  ঙ্গ০ ল০ | দা০  ০  ০  নে
```

বিশ্ব-সাহিত্যিক-আসরে রবীন্দ্রনাথ

ফরাসী সমালোচক ও গ্রন্থকার আনাতোল ফ্রান্স	সুইডিস কথা-সাহিত্যিক সেল্‌মা লাগেরলেফ	জর্মান সাহিত্যিক ও নাট্যকার গেরহার্ট হাউপটম্যান
বেলজিয়ান কবি ও নাট্যকার মরিস্ মেটারলিঙ্ক	বাঙালী কবি ও সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ফরাসী গ্রন্থকার রোমে রোলাঁ।
ফরাসী কবি ফ্রেডেরিক মিসত্রাল	স্প্যানিস কথা-সাহিত্যিক ভিসেন্তে ব্লাসকো ইবানেজ	ইতালীয় কবি-সাহিত্যিক-নাট্যকার গ্যাব্রিএলে দান্নুনসিও

[[illegible] সৌজন্যে।

উপরের ছবিখানি রবীন্দ্রনাথের মেঘরূপ। নিমতলাঘাট শ্মশানের চিতায় যখন রবীন্দ্রনাথের নশ্বর দেহ আগুনে পুড়িয়া ভস্মীভূত হইতেছিল তখন শ্রাবণ-সন্ধ্যার আকাশে মেঘ জমিয়া যে অপূর্ব্ব রবীন্দ্রাকৃতি গঠিত হইয়াছিল তাহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীঅবনী সেন সেই সময়েই ইহার যে 'চারকোল স্কেচ' করিয়া লয়েন তাহা এখানে প্রকাশিত হইল।

নিম্নের ছবিখানিও শিল্পী শ্রীঅবনী সেনের কল্পনার তুলিতে মনের পটে অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথের চিতাধূম ও অগ্নির প্রতিচ্ছবি।

রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বপ্রকারের স্মৃতির সঙ্গে এই স্কেচ দুইখানি বিশেষভাবে

রবীন্দ্রনাথ—যেমনটি দেখেছি ও বুঝেছি

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

[প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দীর অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মধ্য দিয়া শ্রদ্ধেয় ভাবুক লেখক শ্রীযামিনীকান্ত সেনের মনীষায় যুগঋষি রবীন্দ্রনাথে
ন্তর-বাহিরের যে গূঢ়-বিচিত্র রূপটি মুকুরিত হইয়াছিল, তাহা রবীন্দ্র-জীবনের ইতিহাস রচনায় বহু অজানা মূল্যবান উপকরণ যোগাইবে।
ই দীর্ঘ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা ও অসামান্যতা, আশা করি, পাঠক-পাঠিকা ইহা পড়িলেই অনুভব করিবেন। প্রঃ সঃ।]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরলোকগমনে বাঙ্গলার
তিহাসের একটি বিরাট্ অধ্যায়ের উপর যবনিকাপাত
'ল। বাঙ্গলার ইতিহাস বল্‌তে আমি যে পূর্ব্ব ভারতের
ভৌগোলিক সীমার নির্দ্দেশ করছি তা' নয়; বাঙ্গলাদেশেই
ংরাজযুগের ভিত্তিপাত হয়েছে এবং প্রাচ্য সভ্যতা যা
কছু মহৎ, ব্যাপক ও গভীর তা' মুখ্যত: এখানেই দান
রেছে; তারপর অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ
ংরাজের এই রাজধানী হ'তে তা' গ্রহণ করতে অগ্রসর
য়েছে।

অতি সংকোচে ও ক্লিষ্ট অন্তরে রবীন্দ্রনাথের আলোচনায়
াগ্রসর হ'তে হ'চ্ছে—এত কালের জাগ্রত স্মৃতি ও সম্পর্কে
বির সত্তার সহিত লেখকের যোগ ছিল যে, তা' এক
হূর্ত্তে কিছুতেই ধোঁয়ার মত মুছে ফেলা সম্ভব হচ্ছে না।

রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আধুনিক
াক্রণ্যের চোখে দেখা ব্যাপারের সহিত খাপ খায় না।
ার্ঘ ও পক্বশ্মশ্রু, শিথিল গুরুদেব বা বৃদ্ধ ঠাকুরদার
চহারার ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আমাদের চোখে উপস্থিত
নি। যৌবনের মুকুট শিরে আমরা তাঁকে পেয়েছিলুম।
া চেহারায় পক্বকেশের প্রাচুর্য্যমণ্ডিত ছিল না। প্রশস্ত
লাট, আয়ত চক্ষু, কুঞ্চিত কেশ, দীর্ঘ অবয়ব অনবদ্য
াতে অভিষিক্ত করে' বিধাতা তাঁকে পার্থিব রঙ্গমঞ্চে
াঠান। জীবন-নাট্যে তিনি কর্ম্মবহুল বৈচিত্র্যের মধ্যে
াধারণের নিকট নানাভাবে দেখা দিয়েছেন—কখনও
ার নবীনতা বা আকর্ষণ সামান্য হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের সহিত ভাবগত যোগাযোগের সম্পর্ক
ামাদের ছেলেবেলা হ'তে ছিল। কিন্তু মনে হয়, তাঁকে
থম বক্তৃতার ক্ষেত্রে পাই ১৯০০ সালে—সে প্রায়
কচল্লিশ বছরের কথা। মাঘোৎসবের সময় জোড়াসাঁকোর

বিশ্ববরেণ্য মনীষী রবীন্দ্রনাথ
শিল্পী—শ্রীগৌরীশঙ্কর ঘোষ

ঠাকুরবাড়ীতে তখন যেন নূতন জীবনের উর্ম্মিভঙ্গের মত জনতা ভেঙে পড়ত। মহর্ষি থাকতেন ত্রিতলে—নীচের প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণে উৎসব হ'ত—রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা উপস্থিত থাকলেও, এ সময় প্রবন্ধ বা sermon পাঠের ভার দেওয়া হ'ত রবীন্দ্রনাথকে। দীর্ঘ দেহে, শুভ্র পরিচ্ছদে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের উক্তি উদ্ধৃত করে' শরব্যের মত ব্রহ্মকে বিদ্ধ করতে হবে মননে ও সাধনায়—এরূপ প্রসঙ্গ উত্থাপন করে' একটি মুদ্রিত প্রবন্ধ পাঠ করলেন। আমার তরুণ কল্পনা সেদিন এই পরিবেশের বাস্তবতা ভেদ করে' দেখতে পেল রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব ইন্দ্রজাল। কোনরূপ তরলতা এতে ছিল না, রুক্ষ অধ্যাত্ম প্রস্তাবকে ভাষার কুহকে গ্রহণ করে' সমগ্র প্রাঙ্গণটিকে ঝঙ্কৃত করল রবীন্দ্রনাথের লীলায়িত কণ্ঠস্বর। রবীন্দ্রনাথে তখনও তারুণ্যের জয়দৃপ্ত মুখরতা ভাবের নব নব বাহনকে আশ্রয় করে' অগ্রসর হচ্ছিল। মোক্ষ-লাভের উদ্দেশে ঠাকুরবাড়ীকে প্রদক্ষিণ করতে সে-দিন আমি যাইনি, একটি অভ্রান্ত রসোৎসের বিগলিত কারুতা প্রত্যক্ষ করতে গিয়াছিলাম। ফিরবার সময় মহর্ষির উচ্চকিত আকুলতা ও ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার কম্পিত কণ্ঠস্বর শুনে' এ দৃশ্যের যথার্থ পরিপ্রেক্ষিত অনুভব করলুম।

কলকাতায় বাঙ্গলাসাহিত্য আলোচনা তখন নানা প্রসঙ্গ নিয়ে চরিতার্থ হ'ত। এ দেশের সাহিত্যিকগণ তখন রবীন্দ্রনাথের কাব্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ অনুকূল ছিল না মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কবি নিয়েই অনেকে আত্মহারা ছিল। রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও কবিতা একটা দাহকর বিস্ফোরকের মতই বাঙ্গালাসাহিত্যে উপস্থিত হয়। মার্জ্জিত মনন, সূক্ষ্ম কল্পনা এবং নূতন শতাব্দী ও সভ্যতার চরম প্রসূন উপস্থিত হয় রবীন্দ্রনাথের অর্ঘ্যে। সে-যুগে এর প্রতিরূপ ছিল না—এ জন্য প্রবীণ মহলে যেমন, তেমনি তরুণ মহলে হ'ত তর্কবিতর্ক রবীন্দ্রনাথের কাব্য নিয়ে। মাইকেল, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কাব্যাদি ছিল অতি স্পষ্ট ও স্থূল—তাতে রসপরিবেশের কারুতা সত্বেও ছিল ভাবুকতার বিকার ও classicism-এর সুদৃঢ়তা। মনে হয় তখনও রবীন্দ্রনাথের কাব্যের যাঁরা প্রেমিক ছিলেন তাঁরা বলতেন যে, সমসাময়িক জগতের কোন কবিই তাঁর সঙ্গে তুলিত হওয়ার যোগ্য নয়। অপর পক্ষ বলতেন, "ও সব কবিতা নয়—ঠাকুরবাড়ীর ন্যাকামি!" ঈশ্বরচন্দ্রের ভাঁড়ামি ও ভারতচন্দ্রের ইয়ারকির উত্তরাধিকারীও অনেক ছিল তখনকার বাঙ্গলা সাহিত্যিকদের ভিতর। এদের চোখে রবীন্দ্রনাথের কাব্য ছিল একটা অসহনীয় ছেলেমানুষী—কাজেই বহু কটুবাদ কবিকে প্রতি পদে সহ্য করতে হয়েছে। সে সব যে তাঁকে বিদ্ধ করত তা' আমাদের তরুণ কল্পনা কখনও বিশ্বাস করেনি। কিন্তু নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পরে তিনি যে বহু লোকের সম্মিলিত অভিনন্দনকে প্রত্যাখ্যান করেন তাতে প্রকাশ পেয়েছিল যে, তাঁর অন্তর ছিল অতি সুকুমার ও পেলব এবং সে অন্তরকে অনধিকারী ও ক্ষুদ্র সাহিত্যালোচকগণ কি ভাবে বার বার আঘাত করেছে।

১৯০১ সালে তরুণদলের একখানি মাসিক কাগজ বাহির হয়—তার নাম ছিল "আলো"। সে কাগজের পরবর্ত্তী তরুণ সম্পাদক নলিনীকান্ত সেন কাগজের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে' যে ভাবে নিজের উচ্ছ্বাসকে ব্যক্ত করলেন, তাতে মনে হ'ল রবীন্দ্রনাথের তরুণ সমজদারের সংখ্যাও নেহাৎ সামান্য ছিল না। তাঁর প্রতি যথাযোগ্য স্থানে অজস্র সম্মান প্রদর্শিত হতেও ত্রুটি হ'ত না।

ধর্ম্ম-প্রাঙ্গণ ছেড়ে অন্যত্রও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যপ্রসঙ্গ শোনবার একটি আদিম সুযোগের কথা মনে হচ্ছে। তখন সাহিত্য পরিষদের স্থান ছিল অপার চিৎপুর রোডে। একটি ক্ষুদ্র বাড়ীর একখানি প্রকোষ্ঠে। রাজা বিনয়কৃষ্ণের সহিত মন কষাকষি হওয়াতে সাহিত্য পরিষদকে নিজের একটি স্বতন্ত্র গৃহে স্থানান্তরিত করা হয়। এখানে রবীন্দ্রনাথ একবার বাঙ্গলাভাষা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন—খুব সম্ভব ১৯০০ সালেই। তাঁকে বক্তৃতা করতে বড় একটা দেখা যেতনা—তিনি প্রবন্ধ পাঠই করতেন। এ সভায় তিনি যে প্রবন্ধ পাঠ করেন—তার প্রকাশভঙ্গী, ভাষার ঝঙ্কার ও বিষয়গত বস্তুর আলঙ্কারিক সন্নিবেশ ছিল অপূর্ব্ব। প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ ও বিগলিত কৌতুকে এ প্রবন্ধের কলেবর ছিল ভরপুর। আমরা যে কয়জন যুবক সেখানে যাই—সকলেই লক্ষ্য করেছিলুম রবীন্দ্রনাথের মুখশ্রী—যা'তে ভাবৈচিত্র্যের সহিত যোগ রাখতে বার বার নূতন নূতন

রূপভঙ্গের কারুকার্য্যে প্রতিফলিত হচ্ছিল। আকর্ণবিস্তৃত চোখের চাহনি, ললাটের প্রশস্ততা, কুঞ্চিত কেশপ্রাচুর্য্য (তখন দীর্ঘ শ্মশ্রু ছিল না)—সব মিলে যেন নাটকীয় দৃশ্য সৃষ্টি করছিল বার বার। যতটা মনে হয় সেকালে রবীন্দ্রনাথের চেহারা তরুণ সমাজের বিশেষ আলোচনার বিষয় ছিল এবং সে জন্য তিনি সমসাময়িক সাহিত্যিকদের যে ঈর্ষ্যার পাত্র হননি, এ কথাও নিশ্চয়ভাবে বলা যায় না। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার চিত্রে রবি বর্ম্মা দুষ্মন্তের যে রমণীয় চিত্র এঁকেছিল—আমাদের কেউ কেউ কৌতুক করে' বলত রবীন্দ্রনাথকে দেখেই শিল্পী তা এঁকেছে। বস্তুতঃ এ চিত্রের সহিত রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য ছিল প্রচুর। ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের প্রত্যেকেই নিঃশব্দে এই অভিনয়াত্মক প্রবন্ধ পাঠের রস উপভোগ করছিল। রবীন্দ্রনাথকে সহজে পাওয়া যেত না। একে তিনি বড় ঘরের ছেলে, তা'তে সাহিত্যচর্চ্চাটিও দেশে এতটা জীবন্ত তখনও হয়নি যাতে বেশী সংখ্যক লোককে কোন বিষয়ে সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সভায় এলে সে সভা পরিপূর্ণ হয়ে যেত। অনেক সময় "রবিবাবু গান" "রবিবাবু গান" ইত্যাদি রবে সভাগৃহ মুখরিত হ'ত, সব সময়ে তিনি এ আবদার রক্ষাও করতেন না। সেকালে তাঁকে "রবিবাবুই" বলা হ'ত—আমরা এ নাম বল্‌তেই অভ্যস্ত—তাঁকে বৃদ্ধত্বের মর্য্যাদা দিয়ে গুরুর গদীতে উপবিষ্ট দেখতে আমাদের ভাল লাগে না। যা' হোক্ প্রবন্ধ পাঠের শেষে পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী গেলেন চটে', তিনি বল্‌লেন তাঁকেই সব ব্যঙ্গোক্তি করা হয়েছে এবং কবির প্রত্যেক কথাই প্রতিবাদযোগ্য। সভাপতি হীরেন্দ্রনাথ বল্‌লেন পণ্ডিত-মশাইর ধারণা ভ্রান্ত—কবি কা'কেও লক্ষ্য করে' এ প্রবন্ধ লিখেননি। শেষটা একটা যেন বিরূপবক্রই সূচিত হল। আমরা অনুভব করলুম সেই সনাতন বিরোধের কথা—আধুনিক ও প্রাচীনের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষুরধার দৃষ্টি দেশের সাহিত্য বিচারে দেশ হ'তে বহুদূর এগিয়ে চলেছিল চিরকাল। এই সময়ই রবীন্দ্রনাথের একেবারে অভিনব কবিতার বই—"কণিকা" প্রকাশিত হয়।

এসব চর্চ্চা হ'তে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের দুটি দিক্ প্রকাশ হ'ত। এক দিকে তিনি ছিলেন কবি ও ভাবুক, অন্য দিকে ছিলেন ভাবুক ও সমালোচক। এর কোনদিকে তিনি সামান্য ছিলেন না। পূর্ব্বযুগবর্ত্তী বঙ্কিমবাবুকে প্রামাণী মনে করেছে, ভূদেবকে শ্রদ্ধা দান করেছে এবং কালীপ্রসন্নকে করতালি দিয়েছে। রবীন্দ্রযুগ এ সব পরিধিকে ছাড়িয়ে একটি নবীন বাস্তবতা ও নবীন স্থিতিকে অনুভব করেছে—জগতের জাগ্রত স্পর্শের ভিতর যা' আছে এবং যা দেশকে এক অজানা আন্তর্জাতিক ভবিষ্যতের সহিত সমানধর্ম্মী করে' তুলছিল। এ কাজ আর কা'কেও দিয়ে হয়নি।

এজন্য রবীন্দ্রনাথের মাইকেল-সম্বন্ধীয় আলোচনামূলক গ্রন্থাদিতে যশোগান নেই বলে বা মহাকাব্য সম্বন্ধে অলীক অত্যুক্তি নেই বলে ক্ষুণ্ণ হওয়া বাতুলতা। কালীপ্রসন্নের শূন্যগর্ভ বাক্‌প্রবন্ধের মধ্যযুগীয় ফানুস সে সময় বাহবা পেয়েছে—ভাবের ক্ষেত্রে উহার মূল্য অতি সামান্য। এজন্য রবীন্দ্রনাথের তরুণ রচনাও সেযুগে তুলনাহীন ছিল। তরুণ লেখার সহজ জ্ঞানও অনেক সময়, বাঙলার প্রাচীনদের পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব হয়নি, এ কথা অসঙ্কোচে আজ বল্‌বার সময় হয়েছে।

স্কুল-পালান ছেলে—এ কথা তিনি কতবার পরিহাসের ভিতর বলেছেন। ছিলেন তিনি বিজ্ঞ তবু তাঁর জ্ঞান-পিপাসা ছিল প্রচুর। জগতের উৎকৃষ্ট সাহিত্যের সহিত তিনি যোগ রাখতেন সব সময়—তাঁর পারিবারিক পটভূমিও ছিল অসাধারণ। তিনি বহু গ্রন্থ পাঠ করতেন, তাঁর লাইব্রেরী চিরকালই গ্রন্থের ভারে অবনত ছিল। রাজা রামমোহন, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি কয়েকজনই ভারতীয় প্রগতির পুরোধাস্বরূপ। প্রতীচ্য জগতের সহিত যেমন এদের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ, তেমনি মোগলাই যুগের আড়ম্বর, আদবকায়দা ও আচরণে ছিলেন এঁরা মজ্জিত। রাজা রামমোহন মোগলাই বাণী নিয়ে ইউরোপ যান—প্রিন্স দ্বারকানাথও মোগলাই ঐশ্বর্য্য বিতরণ করেন বিস্মিত ফরাসীবাসীদের ভিতর। অপর দিকে এঁরাই নিয়ে আসেন, প্রতীচ্য সভ্যতার চরম দান—যা' সমগ্র ভারতে একটি নূতন আলোকপাত ক'রে নূতন ভাবের বন্যা সূত্রপাত করে। মোগলাই শীলতার প্রাচুর্য্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার সূক্ষ্মতার সংমিশ্রণ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের পরিবারে—এ রকম আবহাওয়া বাঙলার আর কোনও কবি লাভ করেননি।

রবীন্দ্রনাথের জানবার ইচ্ছাও ছিল প্রচুর এবং জ্ঞানের পরিধিও ছিল বিস্তৃত। ১৯০৩ সালে আমি কিছুকাল আমার কনিষ্ঠের অসুস্থতায় গিরিধিতে বাস করি। তখন স্বাস্থ্যলাভের একটি উৎকৃষ্ট কেন্দ্র বলে' এ জায়গাটির খ্যাতি ছিল। এ সময় প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীশচন্দ্র মজুমদার এখানে গভর্ণমেন্টের কর্ম্মচারীরূপে বাস করতেন। তাঁর নিকটেই একটি বাঙলোয় আমি বাস করতুম। রবীন্দ্রনাথ এ সময় একবার এখানে আসেন। কাজেই জায়গাটি সহজেই কিছুকালের জন্য একবার সাহিত্য প্রসঙ্গের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। তাঁর চালচলন সবই ছিল অভিনব। রোজই বিকেলে তিনি সাদা চোগা-চাপকান পরে' পায়চারি করতেন খানিকটা রাস্তায় উশ্রী নদীর ধার পর্য্যন্ত। অনতিপরিসর জায়গা—তাঁর এদিক ও ওদিক করার দৃশ্য অতি অপূর্ব্ব ছিল। তাঁকে প্রশ্ন করা হ'ল, তিনি দূরে বেড়াতে যান না কেন? উত্তর হ'ল, একটুখানি জায়গায় বারবার প্রদক্ষিণ করলে দূরে যাওয়ার কাজই হয়—অপর দিকে যখন ইচ্ছে তখন বাড়ী ফিরে আসা যায়—দূরে গেলে তা হয় না। কি চমৎকার উত্তর!

এ সময় গিরিধিতে প্রায়ই সন্ধ্যায় মজলিস বসত।

লেখক সাহিত্য ও দর্শনের চিরকাল অনুরক্ত এবং এ দু' শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের সহিত তাঁর চিরকালই ঘনিষ্ঠ যোগ। কাজেই একদিন এই সান্ধ্য-মজলিসে (এও প্রায় আটত্রিশ বছরের কথা) যখন কয়েকজন তাঁর সঙ্গে আলাপের জন্য সমবেত হয়েছেন (এর ভিতর মজুমদার মশাইও ছিলেন) আমি তাঁকে এক প্রশ্ন করলুম। তখন আমার কবিগুরু গ্যেটের একারম্যান লিখিত কথোপকথনের খানিকটা আলাপ স্মরণ হচ্ছিল। ভাবলুম এক শতাব্দী পরে বাঙলার কবি, এ সম্বন্ধে কি বলেন দেখা যাক্। কবিকে আমরা গ্যেটের মতই শ্রদ্ধা করতুম। আমি জিজ্ঞেস করলুম, আপনি কি কারও মনের নিহিত সুদূরস্থিত অন্যের মনের যোগস্থাপন সম্ভব মনে করেন? অর্থাৎ চিন্তার ভিতর দিয়ে কি কারও মনের কোন thought অন্য মনে transfer করা যায়? আমি বললুম, গ্যেটে এ ব্যাপার বিশ্বাস করতেন এবং কয়েকটি উদাহরণও জর্ম্মন কবিগুরু গ্যেটে মুখে উল্লেখ করলাম। রবীন্দ্রনাথের উত্তর দিতে দেরী হ'ল না—তিনি বল্লেন, "এ খুব [illegible] মনে হয়।" এই বলে' তিনি উল্লেখ করলেন যে, কিছুকাল আগে Times কাগজে এক খবর বাহির হয় যে, এক ভদ্রলোক রাত্রে যেন তাঁর প্রিয় কুকুরের আওয়াজ ও ভয়গ্রস্ত উক্তি শুনতে পান। পরদিন দেখা যায় যে, কয়েক মাইল দূরে কুকুরটির মৃতদেহ রেলের লাইনে কাটা অবস্থায় পড়ে আছে; অর্থাৎ সে রাত্রে কুকুরটি প্রভুকে স্মরণ করে' যে আর্ত্তনাদ করে তাই প্রভুর চিত্তে বিম্বিত হয়ে ওঠে। কাজেই কুকুরের পক্ষে এ ব্যাপার সম্ভব হলে, মানুষের পক্ষে এটি আরও অধিকতর সম্ভব।" কাজেই উত্তরটি বেশ চমৎকারই মনে হল—অতিরিক্ত reason প্রসূত অবিশ্বাস বা অতিরিক্ত credulity-র কোন লক্ষণ কবির ভিতর দেখা গেল না। মনে হ'ল কবি কবিতা ছাড়া আরও অনেক গভীর ব্যাপার সম্বন্ধেও সচেতন। দ্বিতীয় প্রশ্ন করা গেল আরও উৎকট রকমের। আমার আইন কলেজের সহপাঠী রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট বন্ধু বহু ভাষাভিজ্ঞ প্রিয়নাথ সেনের পুত্র গল্পলেখক মন্মথনাথ সেন আমায় একবার বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিষ বিশ্বাস করেন। তখন এ বিষয় কৌতূহল হয় প্রচুর। এ সুযোগে তাঁকে বললুম—"শুনেছি আপনি জ্যোতিষ বিশ্বাস করেন—এ কথাটি কি ঠিক?" "কে বল্লে?" প্রিয়নাথ সেনের নাম শুনে তিনি বল্লেন, "ওসব ঠিক বলা কি বোঝা কঠিন, তবে আমার কোষ্ঠিতে কাব্য স্থানে প্রাধান্য এবং বিশেষ যশের কথা আছে। আমার পিতার কোষ্ঠিতেও ধর্ম্ম স্থানে এই প্রাধান্য দেখা যায় শুনেছি।" রবীন্দ্রনাথকে আমরা একান্ত আধুনিক ও সংস্কারবিহীন মনে করি—এ উত্তর পেয়ে মনে হ'ল সকল বিষয়ে তিনি মনকে উন্মুক্ত রেখেছেন—কোন দিকেই তাঁর গোঁড়ামি নেই। তাঁর কথা শুনে আমার মনটি সহজেই একটু আশ্বস্ত হল। পরবর্ত্তী চল্লিশ বছরে তাঁর মনের পরিবর্ত্তন হোক্ না হোক্, আধুনিক জগতে জ্যোতিষচর্চ্চা নিয়ে একটা খেলা চল্‌ছে সন্দেহ নেই—তাকে একেবারে কেউ reject করতে চাইছেন—যুক্তির উপর ভিত্তি না থাকলেও। এটি anti-intellectual যুগ।

এ সময় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যগত যোগ সম্পর্কের অন্য উপাদান ছিল 'ভাণ্ডার' নামক মাসিক পত্র। আমেরিকা-

প্রবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাশগুপ্ত এ কাগজখানি প্রকাশ করেন। তিনি শ্রীমতী সরলা দেবী-কল্পিত স্বদেশী দ্রব্যের জন্য "লক্ষ্মীর ভাণ্ডার"ও স্থাপন করেন। সম্প্রতি তিনি New York-এ East and West Society-র সম্পাদকরূপে আছেন। ভাণ্ডার কাগজে আমারও অনেক লেখা বার হয়—সেও ছত্রিশ বৎসরের কথা।

রবীন্দ্রনাথ এ সময় শুধু কবি বলে পরিচিত ছিলেন না, তাঁর স্বদেশপ্রেম সকলকে আকৃষ্ট করে। বহু পূর্ব্বে ১৮৯৭ সালে কলিকাতায় একটি স্বদেশী ভাণ্ডার স্থাপিত হয়—শ্রীযুক্ত যোগেশ চৌধুরী মহাশয় এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিকগণ এ নূতন আয়োজন করে' অগ্রসর হন। যতদূর মনে হয় এ সময় তিলককে কারাবরণ করতে হয়। এ সময় হ'তে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং স্বদেশী বস্ত্র পরিধান করে' আসছেন। আমরাও সুদূর হ'তে এ আন্দোলনের অঙ্গীভূত ছিলুম—এ সময় হ'তে আমরা আর বিদেশী বস্ত্র কখনও পরিধান করিনি। রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাপারে আছেন বলে সমগ্র তরুণ সমাজের একটা নূতন জাগরণ হয়।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের গভীরতর বৈচিত্র্যের সহিত ঘনিষ্ঠতর যোগের সুযোগও আমার হয়েছিল। ১৯০৬ সালে কবির আহ্বানে আমি বোলপুরের শান্তিনিকেতনে শিক্ষা-মন্দিরে যোগদান করি। উচ্চতর আইন পরীক্ষা পাশ করে' ও কলিকাতা হাই কোর্টের এডভোকেট হ'য়েও ঐ শাস্ত্রের প্রতি আমার যথেষ্ট প্রেম ছিল না। সাহিত্য ও তত্ত্ব প্রসঙ্গ চর্চ্চায় আমরা সে সময় মশগুল ছিলুম। আমার অগ্রজ "আলো" সম্পাদক নলিনীকান্ত সেন মহাশয়ের অসাধারণ কবি-প্রতিভা, সাহিত্য-প্রীতি ও দেশ-সেবার আদর্শ সমসাময়িক যুগে কলিকাতার তরুণ সমাজের উপর বিস্ময়জনক প্রভাব বিস্তার করে। ১৮৯৯ সালে আদিম অধ্যায়ে বাঙ্গলা ভাষায় চিঠিপত্র লেখা, হিন্দুমুসলমান মিলন, প্রাচীন পুঁথি উদ্ধার, স্বদেশী বস্ত্র পরিধান এমন কি মোটা তাঁতের কাপড়-পরা—এসব আমি দেখেছি, তাঁর ভাবসিদ্ধ ব্যবহার ও কার্য্যসূচীতে। কবিতা রচনা করে' তিনি নবীন সেনকে মুগ্ধ করতেন। কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের পুত্র নির্ম্মলচন্দ্রের তিনি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। আইন পড়া ত্যাগ করে' তিনি শিক্ষাদান ব্রত গ্রহণ করেন। ধনীর সন্তান হয়ে বিনা বেতনে এক উচ্চ ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। কাব্য-প্রেমের সহিত রবীন্দ্র-নাথের প্রতি ছিল তাঁর অসাধারণ ভক্তি এবং তা'তে করে' বহু যুবকের আদর্শস্থানীয় ছিলেন। তাঁর চক্রের ভিতর রবীন্দ্রনাথের স্থান ছিল অদ্বিতীয়। এ সমস্ত কারণে বোলপুরের প্রতি আমার বাল্যকাল হতেই আকর্ষণ হয়। আইন-জগতে পিতৃদেবের শীর্ষস্থানীয়তাও আমাকে লুব্ধ করতে পারেনি।

আমার প্রতি ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার ভার দেওয়া হয়। বোলপুরের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ১৯০৫ সালে ছিল অতি সামান্য ব্যাপার। আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে চারি-দিকের আবেষ্টন ও আবহাওয়া দেখে মুগ্ধ হলাম। অশ্রান্ত সীমাহীন প্রান্তর, লাল মাটির রাস্তা, কয়েকখানি কুটির, একটি ক্ষুদ্র উদ্যান—নানা ফুলে সমুজ্জ্বল—এসব ছিল প্রত্যক্ষ সামাজিকতার বস্তু। রবীন্দ্রনাথও একটি কুটিরে বাস করতেন—অতি ক্ষুদ্র, দ্বিতলে মাত্র একখানি ঘর। এর ভিতরই বিশ্বকবি মনের তাঁতে কাব্যের কিংখাব রচনা করতেন। উদ্যানের বিপরীত দিকে ছিল লাইব্রেরী গৃহ, তারই একটি প্রকোষ্ঠে আমার থাকবার জায়গা নির্দ্দিষ্ট ছিল। একখানি শ্বেত-মর্ম্মরের প্রশস্ত ও দীর্ঘ চৌকীতে বসে' আমি পড়াশুনা করতুম এবং চারিদিকের উন্মুক্ত মাঠের সীমায় সুনীল চক্রবাল দেখে মুগ্ধ হতুম। লাইব্রেরী গৃহ এবং রবীন্দ্রনাথের কুটিরের মাঝখানটিতে ছিল উদ্যান, —রবীন্দ্রনাথের কুটির তাই আমার চোখের সামনেই ছিল। রবীন্দ্রনাথের এই কুটিরে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র সুদর্শন শমীন্দ্রনাথও বাস করত। শমীন্দ্রনাথকে দেখতে দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ মনে হ'ত। তখন ওর বয়স ছিল বছর বার তের মাত্র। শমীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কৌতুক করে' বলতেন "ওর জন্য আমার ভাবনা হয়েছে—সে মেঘ দেখে আকাশের দিকে ব্যাকুল হয়ে ফিরে—ও গুরুমন্ত্রে বিচলিত হয়।" কবিকে ত 'কাব্যি'রোগে পেয়েছেই, পাছে আর কেউ সেরূপ হয়ে একটা অনর্থ করে, এই ছিল তাঁর পরিহাসের ব্যাপার।

বোলপুর গিয়েই তাঁর সঙ্গে দেখা হ'তে তিনি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের আদর্শ ও কল্পনার একটা বিস্তৃত ভূমিকা দিলেন। এই ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথকে দেখলুম কবিরূপে।

সমগ্র প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর সঙ্গতি রেখে মানুষের জীবনের উদ্বোধন ছিল তাঁর কাম্য—তিনি তেমন যুবক পাচ্ছেন না যারা এ ভার গ্রহণ করতে পারে—এ কথা বার বার বলে তিনি নিজের অন্তরকে লঘু করলেন। বস্তুতঃ শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মবিদ্যালয়ও তাঁর একটি কবিতাস্থানীয় বস্তু; ধীরে ধীরে এ বিদ্যালয় প্রদক্ষিণ করতে আরম্ভ করলুম। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ সময় আমেরিকায় ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এক বিপত্নীক জামাতাও শিক্ষাদানের ব্রত গ্রহণ করে বোলপুরে থাক্‌তেন। তিনি ডাক্তারী পাশ করে' চিকিৎসা বিদ্যার উপর বিতৃষ্ণ হয়ে শান্তিনিকেতনে এসে বাস করেন।

ক্রমশঃ আমার জন্য বহু গ্রন্থ ক্রীত হ'ল। লাইব্রেরীতে এ শ্রেণীর সব বই ছিল না। কি করে' একে একে বাহির হ'তে ফিনিসীয়, গ্রীক্, শক প্রভৃতি জাতির আগমন ভারতের সভ্যতার উত্তরীয়কে রঞ্জিত করেছে, একদিন তা' তিনি চমৎকারভাবে বর্ণনা করলেন এবং সেভাবেই ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস রচনায় আমাকে উদ্বুদ্ধ করলেন। দেখলুম, কবির অধ্যয়ন ব্যাপক না হ'লেও অসামান্য নয়। এখনও মনে হচ্ছে অধ্যাপক Rhys Davids-এর "Buddist India" গ্রন্থে ভারতের শ্রেণী বিভাগের যে বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিগত বর্ণনা আছে তাতে তাঁর খুবই প্রীতি ছিল। জোর করে' এ দেশে জাতিভেদ সৃষ্টি হয়নি—এ ব্যবস্থা দৃষ্টির নানা আনুষঙ্গিক হেতু ছিল। এ প্রসঙ্গে Chaldia প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতার সহিত ভারতের সম্পর্কও অধ্যয়ন করতে হ'ল। এ সময়ে রবীন্দ্রনাথের কক্ষে Fredarik, Harrison-এর ইতিহাস-বিচার সংক্রান্ত বই দেখে মনে হয়, তিনি ইউরোপের নব্য চিন্তার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখেন। ইউরোপীয় ইতিহাস লেখার ভার পড়েছিল স্বর্গত অজিত চক্রবর্ত্তীর উপর। সে কাজ সম্পন্ন না হ'লেও এই তরুণ যুবক বোলপুর বিদ্যালয়ের আবেষ্টনে রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে চর্চ্চা ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী লিখে যান।

অজিতকুমার ব্রহ্মবিদ্যালয়ের নানা খবর বলে' আমার তৃপ্তি সাধন করতেন। তাঁরা থাক্‌তেন ছেলেদের লম্বা বোর্ডিং গৃহে। প্রায় বহু সময় লাইব্রেরী গৃহে আমার সহিত কাব্য ও কবিতা আলোচনায় কেটে যেত। এখনও এই তরুণ শিক্ষকের স্মৃতি মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে। এঁদের ভিতর জগদানন্দ রায় ছিলেন কৌতুকপ্রিয় এবং বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ও ছিলেন সদালাপী, ধীর, স্থির। শাস্ত্রী মশাই ইদানীং কলিকাতায় এসেছেন।

বলা বাহুল্য এই নূতন আবেষ্টনের ভিতর রবীন্দ্রনাথই ছিলেন আমার পক্ষে একমাত্র জাগ্রত সত্য। সে সময়ে এখানে রবীন্দ্রনাথের গান শোনার সুযোগ অল্পই হ'ত যদিও অনেক সময় ইচ্ছা হ'ত এ ব্যাপার হ'তে আমার বঞ্চিত হওয়া ঠিক নয়। একদিন প্রত্যুষে ঘুম ভেঙ্গে গেল মধুর কণ্ঠস্বরে। আবিষ্ট হয়ে শুনলুম রবীন্দ্রনাথের গান, তিনি বাগানে কুরুবক ফুলের বীথিকার ভিতর দিয়ে একাকী ঘুরে ঘুরে সমগ্র প্রভাতকে তাঁর সুমিষ্ট গানে বন্দিত করছেন। চারি দিকে গোলাপী স্থলপদ্মের সারি কবির সঙ্গীতকে 'স্বাগত' জানিয়ে প্রভাত বায়ুতে বার বার নত হচ্ছিল। পরবর্ত্তী যুগে অনেক অঘটন ঘটন হয়েছে। ইউরোপের সম্বর্দ্ধনা বা কল্‌কাতার উষ্ণ আমন্ত্রণে তিনি বহুবার অভিষিক্ত হয়েছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু এরকম নিঃশব্দ প্রাকৃতিক কুহকের ভিতর কবির বিশ্ব-নিরপেক্ষ মুক্ত লীলা প্রসঙ্গ আর মূর্ত্তিমান হ'তে পারে নি। এ যুগের কবির গভীর রসতৃষ্ণা, মুকুলিত বেদনা ও দীপ্ত স্বপ্নের এরূপ রামধনু কবি-জীবনের মেঘমুক্ত অলকায় আর পরে বিম্বিত হয় নি।

একদিন কবিবরের সঙ্গে কাব্যালোচনা প্রসঙ্গে আমি বললুম, "Wordsworth এবং অন্যান্য কবিদের কবিতা পাঠের সময় বিশেষ অসুবিধা ভোগ করতে হয় না—কারণ কোন্ কবিতা কোথায়, কোন্ সময় বা কি উপলক্ষ্যে রচিত সে সম্বন্ধে প্রচুর খবর পাওয়া যায়—অনেক সময় কবিরা নিজেই সে সব লিখে গেছেন। কিন্তু আপনার কবিতাগুলি একেবারে নিঃসঙ্গ—এ সবের কোন দিক্‌দর্শন নেই। বিশেষতঃ আপনার জীবনের মুখ্য ঘটনা, গতিবিধি বা ভাব ও চিন্তার খবর কেউ জানে না—কাজেই কবিতাগুলি পাঠের কোন অনুকূল আবহাওয়া পাওয়া যায় না। এজন্য আপনি যদি আপনার জীবন সম্বন্ধে কিছু লিখেন, তবে আপনার কবিতার রসভোগের পক্ষে খুবই সুবিধা হবে।" তিনি

র কথা খুব আগ্রহের সহিত শুনলেন এবং আমার সহিত একমত হলেন, মনে হ'ল।

এর কিছুকাল পরে তিনি আমাকে হস্তলিখিত একখানি পাণ্ডুলিপি দিলেন পাঠ করতে। এটিই হচ্ছে তাঁর জীবন-স্মৃতি। এটা হ'ল ১৯০৬ সালের আগষ্ট মাসের ঘটনা। আমি হাতে লেখা গ্রন্থখানি নিয়ে এলুম। মধুর গন্ধে যেমন মৌমাছি আকৃষ্ট হয়, তেমনি হয়ত কবিবরের নিকট ইঙ্গিত পেয়ে একদিন অজিতকুমার এসে আমার সহিত রহস্য সুরু করলেন বালকের মত—যেন আমি কারও কাছ থেকে কিছু লুকিয়ে রেখেছি। শেষটা এই জীবন-স্মৃতির কথা উত্থাপন করাতে আমি বললুম—কবি আমাকে দেখতে দিয়েছেন বিশেষ করে'—এটা এক সময় সকলেই দেখতে পাবে। সে জন্য ছটফট করে' লাভ কি?

অজিতকুমার হাস্‌লেন।

এ প্রসঙ্গে মনে হচ্ছে, কবিবর নবীনচন্দ্র সেনও পাঁচ খণ্ডে লিখিত তাঁহার আত্মজীবনী "আমার জীবনে"র হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি ছাপাবার আগে অনুমোদনের জন্য আমার হাতে প্রথম দেন। কবিবর রবীন্দ্রনাথও সকলের আগে তাঁর জীবন-স্মৃতি"র পাণ্ডুলিপি বোলপুরে আমার হাতেই দেন। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসের এই দু'টি সৃষ্টির সহিত আমি এরূপ বিস্ময়জনক ভাবে জড়িত হয়ে আছি।

একদিন দেখা গেল রবীন্দ্রনাথের ক্ষুদ্র দ্বিতলে এক অতিথি উপস্থিত। অতিথি রবীন্দ্রনাথের সহযোগী বিখ্যাত লোকেন্দ্রনাথ পালিত, আই-সি-এস। দিন দু' তিন ধরে কাব্যচর্চ্চা চল্‌ল কবির সঙ্গে পালিত মহাশয়ের ঐ প্রকোষ্ঠে। তৃতীয় দিন আমি গিয়ে উপস্থিত হলুম। দেখলুম পালিত মহাশয় জলের মত হুইস্কি পান করছেন মাঝে মাঝে—তাতে করে' তাঁর কোন মাদকতাই উপস্থিত হচ্ছে না—কাব্যালোচনার আবেশ আরও গাঢ় হচ্ছে মাত্র। ঠিক বিপরীত চিত্র ছিলেন রবীন্দ্রনাথ—যিনি সকল প্রকার মাদক দ্রব্য, ধূম্রপান বা পান পর্য্যন্ত কখনও গ্রহণ করতেন না। এ দৃশ্যও সেকালে অনেকের পক্ষে লোভনীয় ছিল। কারণ মিঃ পালিত কবিবরের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং কাব্যপ্রীতি সম্বন্ধে সে কালে সমজদার বলে তাঁর খ্যাতি ছিল খুবই। এ দৃশ্যটি দেখবার সাহস সেখানে কারও ছিল না—তাঁর ঘরে ঢোকা একটা বিভীষিকারই বিষয় ছিল দেখ্‌তে পেতুম। আমার শরীর একটু অসুস্থ ছিল, সেই সুযোগে তাঁর নিকট হ'তে কিছু হোমিওপ্যাথিক ওষুধ নেবার অছিলায় ঐ প্রকোষ্ঠে হঠাৎ গিয়ে পড়েছিলুম।

এ সময়টি ছিল ছুটির। বোলপুরের ছেলেরা প্রায়ই দেশে চলে গেছে। শিক্ষকদের ভিতর জগদানন্দ বাবু ও অজিত চক্রবর্ত্তী বোলপুরে বাস করতেন। আমার খাওয়া দাওয়া রবীন্দ্রনাথের এক পংক্তিতেই হ'ত। বোর্ডিং বন্ধ বলে এ সময় জগদানন্দ ও অজিতবাবুও এই আহারে যোগদান করতেন। কবিবরের সাম্‌নে সঙ্কোচে তাঁদের খাওয়াই হ'ত না। রবীন্দ্রনাথ জগদানন্দবাবুর খাওয়ার যশঃ সম্বন্ধে কৌতুক করতেন এবং ওঁদেরকে আমার সম্বন্ধে বারবার বল্‌তেন, "ওঁর বলিষ্ঠ শরীর, দেখো যেন খাওয়ার কোন কষ্ট না হয়"। এ বলে স্মিত হাস্য করতেন। এ সময় দেখতে পেতুম রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত স্বল্পাহারী। তিনি খাওয়া শেষ করে' হাত গুটিয়ে বসে থাকতেন—তাতে আমার ভারি অসোয়াস্তি বোধ হ'ত। সমগ্র ব্যাপারটি ছিল যেন একটা পাড়াগাঁয়ের কাণ্ডের মত। খাওয়ার ঘরটিও ছিল একটি কুটীর বিশেষ। পত্নীহারা রবীন্দ্রনাথ ছিলেন যেন একটি সহজ নিরীহগোছের মানুষ। জোড়াসাঁকোর ত্রিতল অট্টালিকায় লালিত পালিত রবীন্দ্রনাথ এর ভিতর কি করে' আরব্যোপন্যাসের দৈত্যের কুম্ভ প্রবেশের ন্যায় ঢুকে দিন কাটাতেন ভাবলে অবাক্ হ'তে হয়। সম্ভবতঃ এই সহজ জীবনযাত্রার অভিনয় তাঁর উপভোগের ব্যাপারই ছিল।

অথচ একথা ভুল্‌লে চল্‌বে না যে, রবীন্দ্রনাথ শুধু বিলেত ফেরতা মাত্র নন—তাঁর পরিবারেই ভারতের প্রথম সিভিলিয়ান জন্মলাভ করেছেন। তাঁর পরিবারই বিলাত ভ্রমণে সমগ্র দেশের অগ্রণী—তিনি প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র। জমিদারী চালে তিনি অজ্ঞ নন, বিলিতি কায়দায় তিনি দুরস্ত। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের খাতিরে এতটা পরিবর্ত্তনের অভিনয় তাঁর পক্ষে নিশ্চয়ই কঠিন ব্যাপার ছিল। শুধু তা' নয়, তাঁর দ্বিতলের প্রকোষ্ঠ হ'তে তিনি চেয়ার টেবিলও নির্ব্বাসিত করেছিলেন। একদিন তিনি ব্যাখ্যা করলেন, আমাদের সেকেলে শিখার

পদ্ধতিকে—কি করে' হাতের উপর কাগজ রেখে প্রাচীন লিখকেরা বা আধুনিক পণ্ডিতমশাইরা পুঁথিপত্র লিখেন। সারল্যের প্রতি আকর্ষণ এই জটিল সভ্যতার যুগে সহজেই জাগে। কিন্তু গ্রাম্য গান্ধীজীর কৌপীনবাদ যা সম্ভব করতে পারে, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্রের প্রচ্ছন্ন রাজকীয় আবহাওয়ার পক্ষে তা সম্ভব নয়।

আকস্মিক পিতৃদেবের অসুস্থতায় কার্য্যক্রম বন্ধ করে' আমাকে এক মাসের ভিতরই বোলপুর ত্যাগ করতে হয়।

এর পর রবীন্দ্রনাথকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে সম্বর্দ্ধনার সুযোগ ঘটে। ১৯০৫ সাল হতে স্বদেশী আন্দোলনের বিরাট তরঙ্গভঙ্গ উঠে। ১৯০৭ সালে এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র চট্টগ্রামের জনসাধারণ কর্ত্তৃক রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হ'ন চট্টগ্রামে। সাধারণতঃ তিনি কলিকাতার বাইরে এ শ্রেণীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারতেন না—চট্টগ্রাম সে পথ কেটে দেয়। চট্টগ্রাম চিরকালই ছিল ঝড়ের একটা প্রধান কেন্দ্র—প্রাকৃতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক উভয় রকমের। রবীন্দ্রনাথ এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ১৯০৭ সালে চট্টগ্রামে যান। সাধারণের সম্মিলিত ইচ্ছায় কবিকে আমারই গৃহে অতিথিস্বরূপ রাখার ব্যবস্থা হয়। সেকালে আমাদের চক্রই আন্দোলনের প্রধান শিবির ছিল—এবং আমাদের প্রাঙ্গণেই লাঠি খেলা হ'তে সুরু করে' সকল রকম সভাসমিতি অনুষ্ঠানের জায়গা ছিল। প্রায় পনের হাজার লোক এখানে সম্মিলিত হ'তে পারত। বিপিনচন্দ্র পাল চট্টগ্রামে এসে আমাদের প্রাঙ্গণেই তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতাদি দান করেন। স্বর্গীয় হাইকোর্টের জজ সারদাচরণ মিত্রও এই প্রাঙ্গণেই একটি বিরাট্ সভায় বক্তৃতা করেন। সমগ্র দেশের নেতৃত্বে মদীয় পিতৃদেব চিরকাল অভিষিক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন বার এসোসিয়েশনের সংস্থাপক ও সভাপতি—স্বর্গীয় প্রীতিভাজন যতীন্দ্রমোহন সেনের পিতা যাত্রামোহন সেন ছিলেন সম্পাদক। পিতৃদেব রাষ্ট্রীয় জনসভারও চিরন্তন সভাপতি ছিলেন। এরূপ বহু প্রতিষ্ঠানের কর্ণধাররূপে তিনি ছিলেন এ অঞ্চলের অগ্রণী। জনসাধারণের এই নির্ব্বাচন তাঁর রাষ্ট্র ও সাহিত্যক্ষেত্রে অবিসম্বাদিত ও অসামান্য প্রতিষ্ঠাই ছিল কারণ। আমি এ সময় ছিলুম তরুণ যুবক মাত্র—দেশপ্রেমে আত্মহারা ও সাহিত্য চর্চ্চায় উন্মনা—অথচ রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ট ও জাগ্রত পরিচয়ে মণ্ডিত। তাঁর সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও আসেন। কবীন্দ্র যে ক'দিন ছিলেন—তাঁর অভ্যর্থনায় লোকস্রোতে আমাদের গৃহ পূর্ণ হ'ত—প্রকাণ্ড ড্রইংরুমেও সঙ্কুলান হ'ত না। রবীন্দ্রনাথ উপবিষ্ট থাকতেন ধীরস্থির ভাবে—মৃদুহাস্যে অক্লান্তভাবে সকলের সহিত আলাপ করতেন।

এ উপলক্ষে সেখানকার সদরঘাট অঞ্চলে আমাদের একটি বিরাট হলে—তাকে জনসাধারণ Kamalakanta Hall বলে' জানত—একটি সভায় বক্তৃতার জন্য রবীন্দ্রনাথ আহূত হন। সেকালে কলিকাতার বাইরে এত বড় প্রকাণ্ড হল আর কোথাও ছিল না। রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনার যে কোন ত্রুটী হয়নি তার প্রমাণ হল এখানে। লোকারণ্যে সমগ্র হলগৃহটি হয়েছিল পরিপূর্ণ। সভাপতিরূপে তাঁকে পরিচিত করার ভার আমার তরুণ স্কন্ধের উপর অর্পিত হয়। এ শ্রেণীর অনেক ভার বহনে সেকালে আমি অভ্যস্ত ছিলুম—কারাগার আমার জন্য একরূপ খোলাই ছিল। এ সভায় তিনি কোন প্রবন্ধ পাঠ করেননি। একটি চমৎকার বক্তৃতা দান করেন। সমগ্র হলের জনতা নিস্তব্ধভাবে তা শুনে। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনা হয় অতুলনীয়, কলিকাতার বাইরে সেযুগে এরূপ দৃশ্য দুর্ল্লভ ছিল। বক্তৃতায় 'সাহিত্যে সমাজ ও দেশধর্ম্মের প্রসার' সম্বন্ধে উপাদেয় মন্তব্য ছিল—সমসাময়িক দৈনিক পত্রাদিতে তা' দেখতে পাওয়া যাবে। সেকালে সাহিত্যিকরূপে এরূপ বিরাট্ অর্ঘ্য পাওয়া শুধু এখানেই সম্ভব ছিল। যাত্রামোহন সেন প্রমুখ দেশের প্রধানগণ আমাদের গৃহে এসে রবীন্দ্রনাথকে ব্যক্তিগতভাবে সম্বর্দ্ধনা করেন। এই গৃহ নবীনচন্দ্র সেনের আগমনেও কাব্যসংস্পর্শ পেয়েছে। তিনি ছিলেন আমার পিতৃবন্ধু। তাঁর নিকট হতে বহু আহ্বান আমি সেকালে পেতুম। নবীনচন্দ্র সেনের স্বপ্নভূমিতে রবীন্দ্রনাথের পদার্পণ সকলকে আনন্দিত করে, সন্দেহ নেই! তদানীন্তন আই, সি, এস, জজ্ মিঃ বি, কে, মল্লিক রবীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ উভয়কে সান্ধ্যাহারে নিমন্ত্রণ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঈষৎ হাস্য করে' বলেন—"ও আমার কাজ নয়!" সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রপুত্রের মত জরীর পাগ্ড়ীতে মণ্ডিত হয়ে দেখা করার র নিলেন।

যা' বোলপুরে দেখ্তে পেয়েছি—তা' নিজের গৃহেও খলুম—রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ সংযম। ব্যবহার আদব কায়দার শেষ সীমান্তে তাঁর দীক্ষা হয়েছিল—াড়াসাঁকোর মহর্ষি-ভবনে। যেমন বোলপুরে তেমনি ানে তিনি থাকতেন ধীর, স্থির, অবিচলিত—সব সময় hyinx-এর মত। তাঁর মানস-রাজ্যের যে সব ামূর্ত্তি বোলপুরে চলা ফেরা করত, বাহির হ'তে কেউ দেখ্তে পেত না। এখানে এসে সামাজিকতার ন অবেষ্টনে পূর্ণ থাকলেও, শুধু আমিই অনুভব াতুম তাঁর অবগুণ্ঠিত একাকীত্ব ও কঠিন আত্মসম্বরণ। ী আমি বার বার উপলব্ধি করেছি বোলপুরের ইরেও। সেখানে বহুলোক বেষ্টিত থাকলেও, কোথাও টুকু তিনি অধীরতা বা প্রকাশ্য ব্যাকুলতায় আন্দোলিত কন না। অতি কঠিন ছিল তাঁর সংযম ও আচরণ। সময় অতিথিরূপেও তাঁর আহার ছিল অতি সাদাসিদে—ীলতী প্রথায় শুধু অমিশ্র সুসিদ্ধ vegetableমাত্র ও য়েস। মস্লায় তৈরী কোন রান্নাই তিনি খেতেন না।

একদিন সমাগত সজ্জনদের অনুরোধে তিনি গান ালেন। সহজে সম্মত হননি—রবিবাবুর মুখে ব্রহ্মগীত বে বলে' কোন্ প্রাচীন ব্যক্তি বিশেষ পীড়াপীড়ি রন। চট্টলের প্রাকৃতিক দৃশ্যের ঐশ্বর্য্য অতুলনীয়। বর তারই ভিতর কয়েকদিন অতিবাহিত করে' বর কেদারনাথ দাশগুপ্তের সঙ্গে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন রন। এ কালের রবীন্দ্রচক্র জানেনা, কেদারবাবু বিবরের কিরূপ প্রিয় ছিলেন। কবিবরের কনিষ্ঠ কন্যার াহও এঁর সহায়তায় তরুণ যুবক শ্রীযুত নগেন গাঙ্গুলীর ইত সম্পন্ন হয়। কেদারবাবুই রাখীবন্ধনের অনুষ্ঠানে ান কার্ডে "বাংলার মাটি, বাংলার জল, পুণ্য হোক্, পুণ্য ক্, হে ভগবান্" ইত্যাদি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার হতে প্রকাশিত ন। বিলাতেও কেদারনাথ রবীন্দ্রবাবুকে অভ্যর্থনা ার জন্ত অগ্রণী হন এবং কয়েকটি নাটকের ইংরেজী ন্তর করে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন।

বলেছি এর কিছু পূর্ব্ব হ'তেই বাংলাদেশের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন আরম্ভ হয়। সে যুগের সে-উন্মাদনা এক অভিনব বস্তু ছিল। রবীন্দ্রনাথ এ আন্দোলনে আত্মসমর্পণ করেছিলেন—এটা আমাদের বিশেষ প্রেরণা দান করে। আমরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে বক্তৃতা দান, ভারতীয় সঙ্গীতের প্রবর্ত্তন প্রভৃতি কাজে আত্মহারা হই। এ সময়কার রবীন্দ্র-সাহিত্য জাতীয় সঙ্গীতে পূর্ণ হয়ে যায়।

১৯০৬ ইংরাজীতে অনেক ব্যাপারের সংঘটন হয়। বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতিকে স্যার র‍্যামফিল্ড ফুলারের রাষ্ট্রীয় আদেশে ভঙ্গ করা হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, মিঃ, জে, চৌধুরী এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। শোভাযাত্রা করে অগ্রসর হওয়ার সময় আমাদের লাঠী দ্বারা আক্রমণ করা হয় এবং সুরেনবাবুকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ বিষয়টি উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এজন্য যে, এ সময় ওখানে একটা সাহিত্য সম্মিলন হওয়ার প্রস্তাব ছিল রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে। তিনি এজন্য বরিশালে এসেছিলেন। চিরকালই তাঁর ভিতর একটা সহজ অপ্রত্যাশিত নাটকীয় প্রেরণা থাকত—এজন্য এযাত্রায় শোনা গেল, তিনি বজ্‌রায় বাস করছেন নদীবক্ষে। বরিশাল সহরে নামবার তাঁর ইচ্ছে নেই। সহরটি ভয়ানক গরম বা ঐ রকম কিছু কষ্টকর ব্যাপার এতে আছে। এরকম অভিনব ব্যবস্থা রবীন্দ্রনাথকেই শোভা পায়। নদীবক্ষে নৌকায় দিবারাত্রি যাপন ও বাস তাঁর অভ্যাস ছিল—জমিদারী পরিচালনার ভার যখন তাঁর উপর নিহিত হয়—তখন এ রকম ব্যাপার প্রায়ই ঘট্ত। এ সবকে একান্ত ব্যবগত সৃষ্টি বলে আমরা মনে করতুম—তবু এসব ভালই লাগত বৈচিত্র্যের জন্য। মোগলাই যুগের মাদকতা আরও যেন মধুর বোধ হ'ত এই যান্ত্রিক যুগে এবং ভুলি-যাওয়া সে সাজাহানী চাল আবার যেন ক্ষুধিত নদীর বক্ষে জেগে উঠ্ত যুগযুগান্তরে বিস্মৃতির পট ভেঙ্গে। আমরা সকলে গিয়ে—তার ভিতর বরিশালের কবি দেবকুমার রায়চৌধুরীও ছিলেন—নৌকার ভিতর রবীন্দ্রনাথের নিকট উপস্থিত হলুম। সে যাত্রা সাহিত্য সম্মেলন স্থগিত রইল—কিন্তু ঘটনাবহুল দিবসের অবসানে সন্ধ্যার অঙ্কে এই অবাস্তবের মত উদ্ভাসিত স্মৃতি কবিকে ঘিরে রইল একটি প্রভাত-অরুণের মত।

১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হয়। এ সময় গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হয়—কিছুপূর্ব্বে প্রকাশিত নৈবেদ্যও সাহিত্যজগতে একটি মাদকতা সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথের বাঙ্গলা ভাষার প্রতি প্রীতি একটি অসাধারণ ব্যাপার ছিল। এক সময় বাঙ্গলাতে চিঠিপত্র লিখা, বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষাকে জ্ঞানবিতরণের বাহন করা প্রভৃতি ব্যাপার একটি কাল্পনিক বস্তুমাত্র ছিল। রবীন্দ্রনাথের এ বিষয়ে দৃঢ়প্রতীতি ছিল। পাবনা বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীতে তিনি বাঙ্গালায় সভাপতির পুরোভাষণ পাঠ করেন।

১৯১২ সালে চট্টগ্রামে Bengal Provincial Conference হয়। এর পূর্ব্ব বৎসরে সম্ভবতঃ ফরিদপুরে অধিবেশন হয় এবং অম্বিকা মজুমদার মহাশয় সাধারণ সম্পাদক হন। এ বছর সাধারণ সম্পাদকের পদে আমাকেই বৃত করা হয়। ঠাকুর পরিবার হ'তে আগত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমি পূর্ব্বস্মৃতি অনুসারে ব্যক্তিগত অতিথি ক'রে নিলুম—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারও আমার গৃহে রইলেন—তখন তিনি হিন্দুস্থান বীমা-সমিতির সামান্য কর্ম্মচারী মাত্র। অন্যান্যের জন্য স্বতন্ত্র গৃহ নির্দ্দিষ্ট হ'ল। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবির অতি প্রিয় আত্মীয়—মার্জ্জিত, সুশিক্ষিত ও উষ্ণ আন্তরিকতায় পূর্ণ—তিনি রবীন্দ্রনাথের সহকর্ম্মী ছিলেন বলতে হয়। পরবর্ত্তী যুগে রবীন্দ্রনাথের Viswabharati Quarterlyর তিনি সম্পাদক হন। এ কাগজে আমারও বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

এরপর বিলাত ও আমেরিকা হ'তে রবীন্দ্রনাথ ফিরে আসেন ১৯১৩ সালে। ১৯১৪ সাল—এ সময় আমি ৯নং চৌরিঙ্গী লেনে বাস করি। ১৯১৫ সালে কবির জোড়াসাঁকো গৃহে "ফাল্গুনী" নাটকের অভিনয় হয়। রবীন্দ্রনাথের সহিত বহুকাল পরে দেখা হ'তেই তিনি আমাকে এ অভিনয় দেখ্‌তে বল্লেন—পরবর্ত্তী যুগে অধিকাংশ অভিনয়ের আলোচকের ভার আমাকেই নিতে হবে, এ কথা তখন কল্পনা করিনি। টিকিট ফুরিয়ে যাওয়াতে একশত টাকা মূল্যে একখানি বক্স রিজার্ভ করি—রবীন্দ্র-প্রীতি তখন এত গভীর ও ব্যাপক ছিল! এ নাটকে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া গগনেন্দ্র, সমরেন্দ্র ও অবনীন্দ্র অভিনেতা হিসেবে অবতরণ করেন।" রবীন্দ্রনাথ সেজেছিলেন কবি—আবার তাঁকে তরুণ সাজতে হয়—এ চেহারা দর্শকদের অপরিচিতই ছিল।

১৯১৯ সালে আমার বৃহৎ গ্রন্থ "আর্ট ও আহিতাগ্নি" প্রকাশিত হয়। সেকালের ভারতী, ভাণ্ডার, নব্যভারতে আমার বহু প্রবন্ধ বের হত। এ সব ত্যাগ করে' শিল্পের নূতন পথে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করতে আমি উদ্বুদ্ধ হই। ইউরোপে প্রসিদ্ধ লেখকমাত্রেই দেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শীলতা আলোচনায় রসসৃষ্টির সকল দিকই উদ্ঘাটিত করতে অভ্যস্ত। গ্রীক ভাস্কর্য্য, রিনেসাঁসের চিত্রাদি বা মধ্যযুগের Gothic সৃষ্টির মূল তত্ত্ব ও প্রেরণা কাব্য ও নাটকের এক তালেই আলোচিত হয় ইউরোপে। গ্যেটের রচনায় প্রতিপদে দেখ্‌তে পাই প্রকৃতি ও মানবের, প্রকৃতি ও কলাপ্রসঙ্গের (Art and nature) আলোচনায় তিনি বারবার Rubens প্রভৃতি শিল্পীদের রসসৃষ্টিকে দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করেছেন। বাঙ্গলাদেশের কোনও লেখকের—বঙ্কিমচন্দ্র হতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত—রসালোচনা প্রসঙ্গে সাহিত্যের প্রাঙ্গণে এদেশের বা ইউরোপের অতুলনীয় কলাসম্পদ আলোচনা দেখতে পাওয়া যেত না। মনে হ'ত এ সব যেন কেউ দেখেননি বা এ বিষয়ে সকলেই অন্ধ। তাই এ গ্রন্থে কাব্য ও কলার একটি তুলনামূলক আলোচনা উপস্থিত করি—তা'তে মিশর, চীন, গ্রীক্, রোম প্রভৃতি নানা দেশের সৃষ্টিকে পৃষ্ঠপটে রেখে একটা অভিনব সাহিত্যিক প্রসঙ্গ উত্থাপন করার প্রয়াস পাই। "আর্ট ও আহিতাগ্নি"তে রবীন্দ্র-কাব্যের এক অপ্রত্যাশিত তুলনামূলক আলোচনা ছিল এদেশের অজ্ঞাত বেলজিয়ান, ফরাসী ও আমেরিকান কবিদের সহিত। নোবেল প্রাইজ বিভূষিত রবীন্দ্রনাথের নিকট একখণ্ড বই নিয়ে একদিন মধ্যাহ্নে উপস্থিত হলুম। আকারে-প্রকারেও এ বইয়ের তুলনা ছিল না—ষাট পাউণ্ড দুর্লভ য়্যান্টিক কাগজে এ বই ছাপা হয়—যাতে আর কোন বাঙ্গলা বই সেকাল পর্য্যন্ত ছাপা হয় নি। সে প্রকাণ্ড বইখানি দেখে রবীন্দ্রনাথ বিস্ময় প্রকাশ করলেন। রবীন্দ্রনাথ সহজেই নিজের সম্বন্ধে কোন আলোচনা শুনতে অসোয়াস্তি বোধ করতেন—তা' ছাড়া নোবেল প্রাইজ তাঁর শিরে জয়মুকুট দানই করেছে—আর কোন স্তুতি তাঁর

যার প্রয়োজন ছিল না। আমি তবু তাঁর প্রসঙ্গটি আদ্যো
ান্ত পাঠ করলুম—তিনি চোখ বুঁজে প্রশান্ত ও স্থিরভাবে
ুনলেন। তারপর প্রসঙ্গতঃ জিজ্ঞাসা করলেন, বিলেতে যে
বাস্তব রূপসৃষ্টি বস্তুতন্ত্রতাকে বর্জ্জন করছে, সে সম্বন্ধে
আমার বইতে কিছু আছে কিনা। সে প্রসঙ্গ আমার বইতে
প্রচুরভাবে ছিল—কিন্তু এদেশে সে-যুগে কেবল একজন
াত্রই সে খবর জানতেন ও রাখতেন। তিনি হচ্ছেন
বীন্দ্রনাথ—আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নয়। এ প্রশংসা এ
দেশের পক্ষে সামান্য নয়।

১৯১৩ সালে আমি স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বাড়ীর
ামনের নন্দকুমার চৌধুরীর লেনের প্রকাণ্ড অট্টালিকাটিতে
াস করতুম। প্রায় রোজই দ্বিজেনবাবুর সহিত আলাপ
'ত। তখন দিলীপবাবুর বয়স ছিল চৌদ্দ পনের মাত্র।
স সময় রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতিবাদের কেন্দ্র ছিল Mr.
D. L. Roy-এর গৃহ। তিনি বলতেন "কবিতা স্পষ্ট
ওয়া প্রয়োজন"—রবীন্দ্র কাব্য একান্ত অস্পষ্ট। এ নিয়ে
স সময় কলিকাতায় প্রচুর বাদানুবাদ চলত। ব্যক্তিগত-
ভাবে দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন বেশ সামাজিক, সহজ ও সরল
লোক। প্রতিবেশী এবং সাহিত্যচর্চ্চার দিক হ'তে তাঁর
মধুর ব্যবহারে আমি মুগ্ধ ছিলুম। প্রায়ই বিকেলে
ামনের মাঠে বসে তাঁর সঙ্গে কাব্যালাপ হ'ত। তাঁকে
Ruskin-এর 'Modern Painters' গ্রন্থে
Wordsworth বিষয়ে রস্কিনের কি মত জ্ঞাপন করি—
তিনি Wordsworth-এর অনুরাগী পাঠক ছিলেন।
অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। রবীন্দ্রনাথের
কবিতাকে তিনি অস্পষ্ট বলতেন এবং কবিতা যে স্পষ্ট
হওয়া প্রয়োজন, এরূপ মতবাদ পোষণ করতেন। সাহিত্যের
দিক হ'তে দ্বিজেন্দ্রলালের outlook ছিল victorian,
এবং বহু পরিমাণে সীমাবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের অনেক অনুরক্ত
ভক্তকে এ সময় এখানে যাতায়াত করতে দেখে বিস্মিত
। রবীন্দ্রনাথের খোসামোদ তাঁর পক্ষে অসহনীয় ছিল
এবং ঠাকুরবাড়ীর আভিজাত্য গর্ব্বও তাঁর নিকট প্রীতির
ব্যাপার ছিল না।

কাব্যে অস্পষ্টতা বিষয় সম্বন্ধে ফরাসী সাহিত্যে বিশেষ
হয়েছে। সেখানকার কবিরা ইচ্ছা করেই কবিতা
অস্পষ্ট করেছে যাতে ক'রে কবিতার বিষয়বস্তু মন হরণ না
করে। কবিতায় ছন্দগত সুষমা ও ভাবগত নক্সাই লক্ষ্য
করার বিষয়—আখ্যানগত বিবৃতি নয়। এজন্য ম্যালার্মে
বলেছেন "To name is to destroy, to suggest is
to create"। কিন্তু এ শ্রেণীর আলোচনার সহিত বাঙ্গলা
দেশের পরিচয় যৎসামান্য—কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন
বইতে এরূপ প্রসঙ্গ কখনও ছিল না।* কিছুকাল পরে
অনুরুদ্ধ হয়ে বিখ্যাত "নব্যভারত" পত্রে "কাব্যে ও গানে
হাফটোন" শীর্ষক প্রবন্ধে অস্পষ্ট কবিতার সার্থকতা সম্বন্ধে
আমি একটি প্রবন্ধ লিখি। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে লেখকের
"সূক্ষ্ম রসবোধ শক্তি"র প্রশংসা করে' সম্পাদিকাকে এক-
খানি পত্র লিখেন। এর বহু পূর্ব্বে (১৯০৮ ও ১৯০৯ সালে)
"ভারতী" পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের বর্ষা কবিতারও আমি
আলোচনা করি। রবীন্দ্র-কাব্যের আনুকূল্য গভীর
আলোচনা এইভাবে আমি প্রথম আরম্ভ করি।

বলা বাহুল্য প্রসিদ্ধি সত্ত্বেও এবং নোবল প্রাইজ
পাওয়ার পরেও রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও উপন্যাসকে এদেশে
সকলে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে নি। তার সমগ্র
সাহিত্যসম্ভারই একদিক হ'তে পূর্ব্বতন সৃষ্টির প্রতিবাদ।
তাঁর ছন্দাদি অনুকরণ করেও তাঁর বিরুদ্ধতা করা ছিল
একটা মানসিক বাতিক। আমি যখন ১৯১৯ সালে
ল্যান্সডাউন রোডে বাস করি, তখন আমার প্রতিবাসী
ছিলেন শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়। তিনি নৃতত্ত্বে
পারদর্শী বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত ছিলেন।
প্রবাসী পত্রিকায় হঠাৎ তাঁর একটা লিখায় বাহির হয় যে,
"রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ হ'তে একশতটি ভাল কবিতা বেছে
নেওয়া সম্ভব।" অর্থাৎ অবশিষ্ট কবিতা আবর্জ্জনাস্থানীয়
যা হোক সম্পাদক এই লিখাটি পরে বন্ধ করে দেন।
এতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকূলতার আবহাওয়া সুস্পষ্ট হয়—
হয়ত ব্রাহ্মসমাজের ভিতরকার আবেষ্টনে।

এই সময় দার্জ্জিলিঙে আমি কিছুকাল থাকি। ডাক্তার
ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সহিত আমার পূর্ব্বেও পরিচয় ছিল—এ
সময় সে পরিচয় ঘনীভূত হয়। লুইস জুবিলি স্যানি-
টোরিয়ামে প্রথম শ্রেণীর resident রূপে এক জায়গায়
বাস করায় তাঁর সঙ্গে একটু গাঢ়তর সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

সে সম্পর্ক তাঁর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ছিল। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বেও তাঁর আমন্ত্রণে প্রতি সপ্তাহে তাঁর নিকট যেতুম—এবার তিনি ধীরে ধীরে নিজের প্রাথমিক জীবনের কাহিনী আমাকে বলে' তৃপ্তিলাভ করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর দিবস 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' "তত্ত্বক্ষেত্রে ব্রজেন্দ্রনাথের দান" শীর্ষক বিস্তৃত প্রবন্ধে তাঁর স্মৃতি-সম্পর্ক আমি প্রকাশ করেছি।

দার্জ্জিলিঙে চা খাওয়ার পর সকালে টেবিলের সামনে বসে বহু আলাপ আলোচনা হ'ত এই মনীষীর সঙ্গে। তিনি ছিলেন বিজয় মজুমদার মহাশয়ের নিকট বন্ধু। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের উৎকর্ষতা স্বীকার করলেও একদিন তিনি বল্লেন যে, বিলেতে এখন তাঁর কবিতার "parody" রচিত হচ্ছে। "ঘরে বাইরে" সম্বন্ধে অত্যন্ত বিরূপ মত প্রকাশ করাতে আমি দীর্ঘকাল তাঁর সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হলুম। সে সব আলোচনা করবার স্থান এ প্রবন্ধে নেই। তবে রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থে দেশের অতি উৎকৃষ্ট সামাজিক problemকে উপস্থিত করেছেন নিখিলেশের বিবাহিত জীবনের ভিতর দিয়ে তা' তাঁকে বার বার বল্লুম। এ রকমের সমস্যা উপস্থিত বিষয়ে এদেশে রবীন্দ্রনাথই ছিলেন অগ্রণী। তাঁর পূর্ব্বে এ পথেও কোন ঔপন্যাসিক যায় নি।

রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী জীবনের বহু অধ্যায়ের সঙ্গে অনেকের যোগ ঘটেছে—নূতন ভক্ত ও সেবক জুটেছে প্রচুর। অনেকেই এ সময়কার নানা কাহিনী জানেন সন্দেহ নেই। এ সময় বহুবার তাঁর সহিত ঘনিষ্ট ভাব রক্ষা করার সুযোগ আমারও অব্যাহত থাকে। ক্রমশঃ "ফাল্গুনী" ছাড়া বহু নাটকেরও অভিনয় হয়েছে। এর ভিতর English Theatre-এ "বিসর্জ্জন" নাটকের একবার অভিনয় হয়। তাতে নূতনত্ব ছিল দৃশ্যপটের অভাব এবং বাধাহীন ভাবে দৃশ্যগুলি পর পর উপস্থিত করা। পশ্চাতে একটি নীল রঙের পর্দ্দা বা পট ছিল। রবীন্দ্রনাথের সহিত আলাপে আমি এ বিষয়ের প্রসঙ্গ তুলি দু' একদিন পরে। আমি তাঁকে বললুম, এই নীলরঙের দৃশ্যপটের ধারণা তিনি কোথায় পেলেন? তিনি বল্লেন, এটা তাঁর একটা কাল্পনিক সৃষ্টি। আমি বললুম, বিলাতের প্রত্যেক reformed theatreএ সম্প্রতি blue background ও grey proscenium-এর ব্যবহার হয়—আপনার ধারণা কি সেখান থেকে হয়েছে? এ কথা তিনি স্বীকার করলেন না। দৃশ্যপটের অভাব বিষয়েও আমি বললুম জর্ম্মনীতে Herr Savits, non-stop Shakespeare অভিনয় করেছে, তা'তে কোন পট-পরিবর্ত্তনই অনুমোদিত হয় নি। কাজেই এসব দিক্ হ'তে বিসর্জ্জনের নাট্যকলা পশ্চিমকে অতিক্রম করতে পারেনি। আমার কথা শুনে কবি যেন একটু গম্ভীর হলেন।

১৯২৬ সালে Lucknow All India Art Conference ও All India Music Conference হয়। আমিও রবীন্দ্রনাথের সহিত বিশিষ্টভাবে নিমন্ত্রিত হয়ে' সেখানে যাই। এ বিষয়ে কবির সুযোগ্য পুত্র রথীন্দ্রনাথই অগ্রণী হন—আমরা কবির সঙ্গে বলরামপুরের রাজার গৃহে অতিথি হই। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথকে হিন্দুস্থানী ওস্তাদের গান তৃপ্তি দান করেনি। একদিন চন্দন চৌবের গান শুনতে যাওয়া গেল। রবীন্দ্রনাথও গেলেন—তিনি এসব ওস্তাদী গান শুনে' বিশেষ মুগ্ধ হলেন বলে' মনে হ'ল না। নিজেও সে কথা বল্লেন। যে দিন লাট সাহেব সম্মিলনের উদ্বোধন করেন রবীন্দ্রনাথ সেদিন উপস্থিতই হলেন না—তা'তে সেখানকার মন্ত্রীমণ্ডল কিছু ব্যথিত হ'ন সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথকে অত সহজভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব ছিল না। সেখানে থাকতেই তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যুর সংবাদ পান। এ অনুষ্ঠানে বোলপুরের বাকে সাহেব সহ একটি ছোট পার্টি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিল।

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ চিত্রকলা-চর্চ্চা সুরু করেছিলেন। বহুচিত্র এঁকে তিনি নিজেই এ সম্বন্ধে একটা সুষ্ঠু ধারণার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেন। এসময় তিনি একবার আমাকে ছবিগুলি দেখবার জন্য বোলপুরে আমন্ত্রণ করেন। প্রকাশ্যভাবে তখনও কাকেও ছবিগুলি দেখান হয়নি—কবির অন্তরঙ্গ আত্মীয়দেরও নয়। আমি গিয়ে উপস্থিত হলুম এবং সাদরে অভ্যর্থিত হলুম। বলা বাহুল্য, চিত্রকলাক্ষেত্রে কবিবরের পুত্রবধূ শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবীর প্রতিভাও অনন্যসাধারণ। তিনিও আগ্রহের সহিত কবির ছবিগুলি দেখতে বললেন, এবং

এ বিষয়ে কবির উৎকণ্ঠার কথাও জানালেন। মনে ভাবলুম, রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা করবার লোকের ত' অভাব নেই—তবুও তিনি যথার্থভাবে তাঁর চিত্রকলার উৎকর্ষতা ও অপকর্ষতা সম্বন্ধে ভালরকম জানবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, এটা তাঁর পক্ষে সামান্য নয়। তিনি জানতেন বাজে লোকের মত অর্থহীন স্তুতি আমি করব না। প্রশংসার ব্যাপার নয়। রাত্রিরে খাওয়ার টেবিলে রবীন্দ্রনাথের আবাসে শ্রীমতী প্রতিমা দেবীর নিকট কবির চিত্রকলা চর্চ্চার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা শুনে বড়ই আনন্দ হ'ল। কবিবরের বিশেষ স্নেহের পাত্রী শ্রীযুক্তা রাণী মহলানবীশও এ রাত্রির আহারে ছিলেন—তিনিও কবির রচনায় উৎসাহ দেখালেন এবং নিজের গৃহে রক্ষিত দু'টি বুদ্ধমূর্ত্তির কথা বললেন। তা'তে মনে হ'ল, দেশে একটা নূতন স্রোত এসেছে। পরদিন সকালে যথাসময়ে দ্বিতলে কবির নিকট গেলুম। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু কবির ইচ্ছা অনুসারে প্রায় একশত ছবি নিয়ে আমাকে দেখাবার উদ্যোগ করলেন। কবি তাঁর চেয়ারে নীরবে উপবিষ্ট ছিলেন। একে একে সব ক'খানি ছবি ধীরভাবে দেখলুম। ইউরোপীয় সার্ব্বভৌম আবেশ ও ভারতীয় অন্তরঙ্গতা গভীরভাবে এ সব ছবিতে মণ্ডিত ছিল। আমার নিকট এসব চিত্রের মর্ম্ম ও ধারা অপরিচিত ছিল না। দেখা শেষ হ'লে কবিকে জানালুম আমার মতামত। তিনি আমার মতকে বিশেষ প্রীতির সহিত গ্রহণ করতেন। আমি বললুম, আপনার সফলতা প্রমাণ হচ্ছে বিস্ময়কর "Stylisation" দেখে; এ'ত দেখছি খেয়ালের ঝোঁকে দু' একখানি ছবি আঁকা মাত্র নয়—আপনি যে একটি রাজ্য সৃষ্টি করেছেন! আমি বললুম, এ রকম ব্যাপার stylise করাই সফলতার লক্ষণ—তবে তাঁকে জানালুম, এ দেশে এসব কেউ বুঝবে না—বিলেতে যেন এগুলিকে আগে দেখান হয়—তারপর এ দেশে। পরে সেই ব্যবস্থাই হয়েছিল। কিছুকাল পরে যখন কলিকাতার Govt. School of Art-এ তাঁর চিত্রকলার প্রদর্শনী হয়, তখন অনেকেই নানাভাবে বিরুদ্ধ সমালোচনা করে এবং নানা কাগজে যে সব আলোচনা বাহির হয় তা'তে দেখা যায়, কেউ যথাযথ ভাবে সমালোচনাই করতে পারেন নি। কবির ইচ্ছায় তাই "বিচিত্রা" কাগজে এর একটি আলোচনা আমাকেই লিখতে হয়। গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের একটি প্রকোষ্ঠে তিনি অতিথিরূপে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে তাঁর প্রকোষ্ঠে বসে অন্তরঙ্গভাবে চিত্রালোচনা সুরু করলুম। অনেক মহারথী উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও সে প্রকোষ্ঠে আর কেউ উপস্থিত থাকতে ভরসা করেননি। নরসিংহ রবীন্দ্রনাথকে এমনি সকলে ভয়ের চোখে দেখত।

সাহিত্য-কলা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ চিরকালই সাধকের পরম উৎসাহদাতা ছিলেন। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর আমন্ত্রণে বালীগঞ্জ সভ্যসমিতির একটি অধিবেশনে তাঁর বাড়ীতে আমি "সুন্দর ও সৌন্দর্য্য" ও "পরিচ্ছদ কলা" নামক দু'টি বক্তৃতা দিই। এ সব বক্তৃতা সবুজ-পত্র কাগজে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন শিলংএ বাস করছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এ সব পাঠ করে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে লিখেন: "শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সেন কলা-সরস্বতীর একনিষ্ঠ সেবক। এত বড় নিষ্ঠা কি ব্যর্থ হতে পারে? তিনি বর পেয়েছেন—সে বর হচ্ছে ললিত-কলা সম্বন্ধে তাঁর ধারণাশক্তি।" আমায় তিনি এরূপ স্নেহ ও শ্রদ্ধা করতেন বলেই এর কিছুকাল পরে একবার তিনি আমাকে বলেন—"যামিনী, তুমি বোলপুর চলে' এসে বিশ্বভারতীতে join কর। সেখানে গিয়ে তুমি বক্তৃতাদি দাও ও বই ছাপাও। আমি বিনীতভাবে বললুম: "এখনও আমার পক্ষে তা' সম্ভব হবে না—আমি retire করার পর যাব।" এর উত্তরে তিনি বললেন "ততদিন কি আমি বাঁচব?" আজ এই কথা স্মরণ করে' আমি বার বার ম্রিয়মাণ হচ্ছি এবং কবির সেই উক্তির প্রতিধ্বনি যেন শুনতে পাচ্ছি। লক্ষ্ণৌতে তিনি অতুলপ্রসাদ সেনকেও এ রকমের অনুরোধ করেন।

বহু প্রভাত ও সন্ধ্যায় তাঁর নিকট কাব্য, কবিতা ও শিল্প সঙ্গীত বিষয়ে আলোচনা করেছি—সে সব লেখবার সময় ইহা নয়। একবার আমার প্রতি প্রীতিজ্ঞাপন করতে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমার একখানি প্রতিকৃতি আঁকেন। এ কথা রবীন্দ্রনাথকে তিনি যখন জানালেন, তখন কবির দেখবার আগ্রহ হ'ল এবং তাঁর হুকুমে ছবিখানি তৎক্ষণাৎ উপস্থিত করা হ'ল। তিনি

আমাকে যে কতটা কল্পনা ও স্নেহের চোখে দেখেন তার প্রমাণ পেতে দেরী হ'ল না। অবনীবাবুকে সে প্রতিকৃতির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করতে তিনি suggestion দিলেন—পরে তা' করা হয়। এতে তাঁর গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টির পরিচয় পেলাম। রবীন্দ্রনাথ দুরধিগম্য হ'লেও তাঁর প্রীতি, আকর্ষণ সব সময় দুরূহ ছিল না।

জোড়াসাঁকোয় অভিনীত তাঁর বহু নাটকের সমালোচনা আমি লিখে দিতুম। Rehearsal দেখে পূর্ব্বাহ্নেই সে সব পর দিনের দৈনিক কাগজে যাতে প্রকাশিত হয় সেজন্য তৈরী করে' রাখতুম। এসব বিষয়ে কবিবরের সুযোগ্য পুত্র বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দায়িত্বই ছিল অধিক। বিশ্বভারতীর সমস্ত আয়োজনে রথীন্দ্রবাবুর সাধনা, চেষ্টা ও পরিশ্রম দক্ষিণ পবনের মত কাজ করে। শ্রীমতী প্রতিমা দেবী নাটক অভিনয়াদিতে নিজেই পাত্রীগণের সজ্জার ভার গ্রহণ করতেন। কবিবর এরূপ অমায়িক, মার্জ্জিত রুচি ও শিক্ষিত পুত্র ও পুত্রবধূর সৌভাগ্যে নিজের কর্ম্মজীবনকে জয়যুক্ত করেন। আমি আশা করি, বিশ্বভারতীর কর্ণধাররূপে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রাণপণ চেষ্টা ভবিষ্যতেও পিতার কল্পনাকে উত্তরোত্তর সফল করবে।

সেতুবন্ধ

শ্রীফণিভূষণ মৈত্র

নামের বন্ধনে বেঁধে সীমাবদ্ধ হয় না যে ভূমা—
স্বজাতি বলিয়া গর্ব্বে মিছে করা মূঢ় আস্ফালন,
নিতান্ত আপন বস্তু ঢাকে-ঢোলে পায় না তো চুমা—
নিভৃত অন্তর-ক্ষতে বিরহীর বরষা-পালন!

ব্যথার আনন্দরূপে সৃষ্টিদিশি উঠিয়াছে নে'চে—
বিশ্বের প্রতিভূ আত্মা স্বয়ম্ভুর পদনখে শোভে,
ঘুমন্ত পৃথিবী-পুরী মনে হয় যেন আছে বেঁ'চে—
পূতিগন্ধভরা দেহে প্রেম দিয়া রবি-ছবি ডোবে!

তেজোরশ্মি বৃথা নহে; কচি কচি কোরকের প্রাণ
নিগূঢ় কোমল স্পর্শে ধন্য হ'ল, পূর্ণ হ'ল রূপে;
পরিপক্ক-কাঁচা তুমি পরিপূর্ণ রে'খে গেলে ঘ্রাণ—
ধরিত্রী-মন্দির মাঝে বাণী-বায়ু ভরা গন্ধধূপে!

প্রতিটি মানুষ-বক্ষে নিঃস্ব হয়ে বিশ্ব রয় বেঁচে—
প্রাচ্য আর প্রতীচীর সেতুবন্ধ বাঁধা হয়ে গেছে!

কবীন্দ্র

শ্রীবেলা ধর

কোথা অস্ত গেলে রবি! বাংলার বুকে
নামিল তিমির রাত্রি, স্তব্ধ সুগভীর,
হে রবীন্দ্র! বাঙ্গালীর হিয়া তব শোকে
আকুলিত, দরধারে বহে আঁখিনীর।

বাংলার দীপ্ত সূর্য্য! তব রশ্মিজালে
আলোকিত এতদিন আছিল গগন,
তোমা' পুত্র পেয়ে বঙ্গ ছিল দীপ্ত ভালে
তোমা হীনে আজি মাতা বিষাদে মগন।

বাংলার শ্রেষ্ঠ পুত্র! বিশ্বের গৌরব!
হীনমান বাঙ্গালীরে দিয়ে গেছ মান,
বাণীর পূজারি! দেব, তব বীণারব
সাহিত্য ভাণ্ডারে দেছে কি বিপুল দান।

অস্ত গেছ, যাও রবি, রাত্রি অবসানে,
আবার উদিত হয়ো অমৃত প্রয়াণে।

রবীন্দ্র-উপন্যাসে অধ্যাত্মজীবনের সন্ধান

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

উপন্যাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিক জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ক পরিচয় দিয়াছেন সেই সম্বন্ধে এখানে সামান্য একটু আলোচনা রিব। উপন্যাসকে বৈরাগ্যশতক বা প্রবোধচন্দ্রোদয়ে পরিণত না রিয়া, বিশুদ্ধ রসসৃষ্টির বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত না ঘটাইয়াও যে কিরূপে ধ্যাত্মজীবনের অনুভূতির এবং সাধ্যসাধনের ইঙ্গিত প্রদান করা যায়, াহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাই আমরা তাঁহার "চতুরঙ্গ" উপন্যাসে। ারতীয় সাধনার বিভিন্ন ধারা যাঁহার মধ্যে বংশানুক্রম, পারিপার্শ্বিক াবেষ্টনী এবং স্বকীয় তপস্যার ফলে একত্র সম্মিলিত হইয়াছিল, কমাত্র তিনিই অধ্যাত্মচেতনার ক্রমবিকাশ সুস্পষ্টরূপে অভি[illegible] রিয়াছেন। জগতের বা ভারতের অন্য কোন মনীষী উপন্যাসের াকারে এরূপ দুরূহ বিষয়ের অবতারণা করেন নাই।

চতুরঙ্গের নায়ক শচীশ যেন অপ্রত্যক্ষ অনুভূতির সাধনা করিতেই গ্রহণ করিয়াছিল। শিব ও সুন্দরকে অনুসন্ধান ও সত্য পথকে বহু ীক্ষার দ্বারা আবিষ্কার করিবার যোগ্যতা দিয়াই যেন বিধাতা াকে এ জগতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহার সহপাঠী শ্রীবিলাস াকে প্রথম দর্শনেই ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল, কারণ—"শচীশকে খিলে মনে হয় যেন একটা জ্যোতিষ্ক—তা'র চোখ জ্বলিতেছে; তা'র লম্বা সরু আঙুলগুলি যেন আগুনের শিখা; তা'র গায়ের রং যেন রং নহে, তাহা আভা। শচীশকে যখন দেখিলাম অমনি যেন তা'র অন্তরাত্মাকে দেখিতে পাইলাম,—তাই এক মুহূর্তে তাহাকে ভালবাসিলাম।" শচীশ তাহার জ্যাঠামশায় জগমোহনের প্রভাবে নাস্তিক হইয়াছিল; অর্থাৎ লোক তাহাকে নাস্তিক বলিত। ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতিতে ঈশ্বর-না-মানা-লোককে নাস্তিক বলে না; সাংখ্যবাদীরা নাস্তিক নহেন, কেননা তাঁহারা বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করেন। শচীশ সামাজিক রীতিনীতি ও সংস্কারের নিকট [illegible]নার বিচারবুদ্ধি বলি দেয় নাই বলিয়াই বোধ হয় তাহাকে লোকে নাস্তিক বলিত। কিন্তু সে বা তাহার জ্যাঠামশায় চার্বাকপন্থী নাস্তিক ছিল না—'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ' নীতি করিতে যাইয়া, সত্য বলিয়া যাহা বুঝিয়াছে তাহার অনুসরণ করিতে যাইয়া তাহারা স্বেচ্ছায় অনেক দুঃখ ও ক্ষতিকে বরণ করিয়া লইয়াছে। তাহাদের জীবনের ব্রত ছিল—"প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধন"। সাকার বা নিরাকার কোন দেবতাকে না মানিলেও তাহারা দরিদ্র জনসাধারণকেই নারায়ণ জ্ঞান করিত। জগমোহন বলিতেন—"আমার এই চামার, মুসলমান, দেবতা। তাহাদের আশ্চর্য্য এই এক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে,

তাহাদের সামনে ভোগের সামগ্রী দিলে তাহারা অনায়াসে সেটা হাতে করিয়া তুলিয়া খাইয়া ফেলে। তোমার কোন দেবতা তাহা পারে না। আমি সেই আশ্চর্য্য রহস্য দেখিতে ভালবাসি, তাই আমার ঠাকুরকে আমার ঘরে ডাকিয়াছি;—দেবতাকে দেখিবার চোখ যদি তোমার অন্ধ না হইত তবে তুমি খুসি হইতে।" শচীশ নিজের সুখদুঃখের কথা বিন্দুমাত্র বিবেচনা না করিয়া লাঞ্ছিতা, অপমানিতা ননীবালাকে বিবাহ করিতে রাজী হইয়াছিল। পরের দুঃখ মোচনের জন্য যে যুবক এমন করিয়া আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিতে পারে, তাহাকে লেখক যাহাই বলুন, আমরা বলিব সে জন্মান্তরীণ সাধনার বলে উচ্চ স্তরের সাধক পুরুষ, যাহাদের সম্বন্ধে গীতায় বলা হইয়াছে—"শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে, যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে।" চতুরঙ্গের প্রথম অধ্যায়ে দেখা গেল যে শচীশ শুদ্ধসত্ত্বগুণান্বিত, জনহিতপরায়ণ, পরদুঃখকাতর যুবক, সুতরাং উচ্চতর সাধনার উপযুক্ত পাত্র।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখি শচীশ দুই বৎসর নিরুদ্দিষ্ট থাকিবার পর লীলানন্দ স্বামীর দলে ভিড়িয়া গিয়াছে। 'নাস্তিক' শচীশ গুরুভক্তিতে সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছে; রসের সাধনায় সে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। তাহার এ পরিবর্ত্তন বাহির হইতে দেখিলে আকস্মিক বলিয়া মনে হইলেও, ইহা কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধবিহীন নহে। সে জগমোহনের নিকট যে স্নেহ পাইত, তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহার হৃদয় শুষ্ক হইতে বসিয়াছিল; শুধু নিষ্কাম কর্ম্ম বা জনহিতব্রত তাহাকে তৃপ্তি দিতে পারিতেছিল না; বিপুলতর কোন আনন্দের সন্ধান পাইবার জন্য তাহার অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল গুরুসেবা ও কীর্ত্তনের মধ্য দিয়া সে রসলোকের সন্ধান পাইবে। নিষ্কাম কর্ম্মযোগী যখন ভক্তিযোগকে অবলম্বন করে তখন সে শনৈঃ শনৈঃ সাধনপথে অগ্রসর হইতে থাকে। লীলানন্দ স্বামীর মনে লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠার বাসনা ছিল প্রবল; তাই সাধনরাজ্যে তাঁহার স্থান অতি নিম্নে; আর শচীশ সর্ব্বান্তঃকরণে চাহিয়াছিল আনন্দব্রহ্মের অনুভূতি; তাই শ্রীবিলাস একদিন হঠাৎ কি এক আবেশে শচীশের এমন একটি অলৌকিক রূপ দেখিতে পাইল, যাহা বিশেষ কোন একজন দেবতাতেই সম্ভব।" যে রূপকে নিরন্তর ধ্যান করা যায়, সাধক সেইরূপই প্রাপ্ত হয়; ইহাকেই শাস্ত্রে সারূপ্য মুক্তি বলে। কাজেই শ্রীবিলাসের পক্ষে শচীশের মধ্যে সেই বিশেষ দেবতারূপ প্রত্যক্ষ করাকে তাহার কল্পনাবিলাস বা hallucination বলা যায় না।

কিন্তু মন বায়ুর মতই চঞ্চল; চিত্তকে একাভিমুখী রাখা বড়ই কঠিন। দামিনী আসিয়া শচীশের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাইল। রসের সাধকের পক্ষে এরূপ বিঘ্ন আসা অস্বাভাবিক নহে। তীব্র বৈরাগ্য ও তপস্যা না থাকিলে কেবলমাত্র রসকীর্ত্তনকে সম্বল করিলে সাধকের পতন হওয়া বিচিত্র নহে। বৈষ্ণব শাস্ত্রকারগণ শ্রবণ, কীর্ত্তন, সাধুসঙ্গ, ভগবদারাধনা প্রভৃতি নানাবিধ ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া চিত্তকে ভগবন্মুখী রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন। লীলানন্দ স্বামীর দলে ধ্যানধারণা ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহের ব্যবস্থা ছিল না; কেবলমাত্র কীর্ত্তনের উত্তেজনায় চিত্তকে আবিষ্ট রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। কেবলমাত্র উত্তেজনার দ্বারা ভাবের সঞ্চার করিতে গেলে, উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ার সময় চিত্ত ভোগাসক্ত হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী দিনান্তে একটু ঘোল খাইয়া নির্জ্জনে রাধাকুণ্ড তীরে সাধনা করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পারিষদবর্গের সকলের মধ্যেই ত্যাগ ও বৈরাগ্য প্রচুর। তাঁহারা কেহই কেবল মাত্র নাচিয়া গাহিয়া ভাবাবেগের সৃষ্টি করেন নাই; প্রত্যেকেই ভাবকে স্থায়ী করিবার জন্য সুকঠোর তপস্যা করিয়াছেন।

শচীশের ভিতর প্রথমে এই তপস্যার অভাব ছিল—কিন্তু তাহার স্বভাবসুলভ বৈরাগ্য তাহাকে পতনের হাত হইতে শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করিল। দামিনী শচীশকে তাহার অন্তরের সমস্ত মাধুর্য্য ও চিরসঞ্চিত প্রণয়ের দ্বারা আকর্ষণ করিল। শচীশ তাহার মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া ডায়রীতে লিখিল "ননীবালার মধ্যে আমি নারীর এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি, অপবিত্রের কলঙ্ক যে নারী আপনাতে গ্রহণ করিয়াছে, পাপিষ্ঠের জন্য যে নারী মরিয়া জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণতর করিল। দামিনীর মধ্যে নারীর আর এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি; সে নারী মৃত্যুর কেহ নয়, সে জীবন-রসের-রসিক। বসন্তের পুষ্পবনের মত লাবণ্যে গন্ধে হিল্লোলে সে কেবলি ভরপুর হইয়া উঠিতেছে সে কিছুই ফেলিতে চায় না, সে সন্ন্যাসীকে ঘরে স্থান দিতে নারাজ, সে উত্তুরে হাওয়াকে সিকি-পয়সা খাজনা দিবে না পণ করিয়া বসিয়া আছে।" শচীশ দামিনীর মনের মাধুর্য্যেরই আস্বাদন চাহিয়াছিল; রস-সাধকের পক্ষে তাহাই স্বাভাবিক। কিন্তু দামিনী শচীশকে শুধু মন দিয়া নহে, দেহ দিয়াও পাইতে চাহিয়াছিল। শচীশের সত্ত্ব গুণের সংস্কার তাহাকে পতন হইতে বাঁচাইল। দামিনীর কামভাবকে সে স্বরূপ দৃষ্টিতে, জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পাইল। সমুদ্র তীরের নির্জ্জন গুহায় শুইয়া শচীশের অবচেতন মনে কামের ভাব উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল। পবিত্র চিত্ত শচীশের মনে কামভাব যেন গুহায় পুঞ্জীভূত অন্ধকারের প্রতীক। সে অর্দ্ধচেতন অবস্থায় অনুভব করিল—"সেই গুহার অন্ধকারটা যেন একটা কালো জন্তুর মত—তার ভিজা নিশ্বাস যেন আমার গায়ে লাগিতেছে। আমার মনে হইল, সে যেন আদিম কালের প্রথম সৃষ্টির প্রথম জন্তু। তার চোখ নাই, কাণ নাই, কেবল তার মস্ত একটা ক্ষুধা আছে, সে অনন্তকাল এই গুহার মধ্যে বন্দী; তা'র মন নাই, সে কিছুই জানে না, কেবল তা'র ব্যথা আছে—সে নিঃশব্দে কাঁদে।" কামের ক্লেদাক্ত কদর্য্যতা যখন তাহার মনকে এইরূপে পীড়া দিতেছে, সেই সময়ে দামিনী অভিসারে আসিয়া সেই নির্জ্জন অন্ধকার গুহায় তাহার পা জড়াইয়া ধরিল। শচীশের তখন মনে হইল, "কোনো একটা বুনো জন্তু। কিন্তু তাদের গায়ে তো রোঁয়া আছে—এর রোঁয়া

ই। আমার সমস্ত শরীর যেন কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। মনে হইল একটা সাপের মত জন্তু, তাহাকে চিনি না। তা'র কি রকম মুণ্ড, কি রকম গা, কি রকম ল্যাজ কিছুই জানা নাই—তা'র গ্রাস করিবার প্রণালীটা কি ভাবিয়া পাইলাম না। সে এমন নরম বলিয়াই এমন বীভৎস, সেই ক্ষুধার পুঞ্জ। ভয়ে ঘৃণায় আমার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। আমি দুই পা দিয়া তাহাকে ঠেলিতে লাগিলাম। মনে হইল, সে আমার পায়ের উপর মুখ রাখিয়াছে—ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে—সে যে কি রকম মুখ জানি না। আমি পা ছুড়িয়া লাথি মারিলাম।" এই লাথি খাইয়া দামিনীর দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিছু কাল পরে এই আঘাতজনিত বুকের ব্যথাতেই তাহার জীবনাবসান হইল, কিন্তু তাহার চিত্ত পবিত্র হইল—সে জীবনোদ্যানে কাঁটা বাদ দিয়া বিশুদ্ধ ভক্তির ফুল ফুটাইতে মন দিল।

শচীশ এইবার কাম জয় করিয়া যৌন-আকর্ষণকে প্রকৃতির প্রয়োজন সাধনের উপায়মাত্র বলিয়া উপলব্ধি করিল। সে শ্রীবিলাসকে বুঝাইল —"যে সুন্দর রূপ দেখাইয়া আজ তোমাকে সে ভুলাইয়াছে, প্রয়োজনের দিন ফুরাইয়া গেলেই সেই রূপের মুখোষ সে খসাইয়া ফেলিবে; যে তৃষ্ণার চশমায় ঐ রূপকে তুমি বিশ্বের সমস্তের চেয়ে বড় করিয়া দেখিতেছ প্রয়োজন গেলেই সেই তৃষ্ণাকে সুদ্ধ একেবারে লোপ করিয়া দিবে।" নরনারীর যৌবনোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে কাম তৃষ্ণা জাগে প্রকৃতির সৃষ্টি ধারাকে অব্যাহত রাখিতে; তাহাদের উৎপাদিকা শক্তি লোপ পাইবার পর কাম তৃষ্ণাও মন্দীভূত হয়। জৈব বিজ্ঞানের এই স্থূল কথাটা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির দ্বারা বুঝিলেও, হৃদয় দ্বারা অনুভব করিয়া নিজেকে প্রকৃতির ফাঁদ হইতে বাঁচাইতে চেষ্টা করেন না—সাধক করেন। শচীশ দামিনীকে এড়াইয়া যাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু এই চেষ্টার ফলে তাহার মন আরও যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। শেষে সে দামিনীকে বলিল, "আমাদের সঙ্গে তুমি যোগ দাও, অমন করিয়া তফাৎ হইয়া থাকিও না।" দামিনী কহিল, "তাই যোগ দিব, আমি কোনো অপরাধ করিব না।" এই বলিয়া সে আবার নত হইয়া পা ছুঁইয়া শচীশকে প্রণাম করিল এবং আবার বলিল, "আমি কোনো অপরাধ করিব না।" দামিনী ভবিষ্যতের প্রলোভনের হাত হইতে নিজেকে বাঁচাইবার জন্যই শ্রীবিলাসকে বিবাহ করিয়া বসিল।

লীলানন্দ স্বামীর দলে থাকিয়া কেবলমাত্র ভাবসম্ভোগের দ্বারা শচীশের আত্মোপলব্ধি হইতেছিল না; হইবার কথাও নহে। সে এখন নিজের তপস্যার দ্বারা সেই উপলব্ধির রাজ্যে পৌঁছাইবার জন্য ব্যাকুল হইল। সে এখন বুঝিয়াছে, "আর সব জিনিষ পরের হাত হইতে লওয়া যায়, কিন্তু ধর্ম যদি নিজের না হয়, তবে তাহা মারে, বাঁচায় না। আমার ভগবান অন্যের হাতের মুষ্টি ভিক্ষা নহেন; যদি তাঁকে পাই ত আমি তাঁকে পাইব, নহিলে নিধনং শ্রেয়ঃ।" পরের মুখে যেমন ঝাল খাওয়া যায় না, তেমনি পরের অনুভূতি ধার করিয়া লইয়া ভগবৎ-উপলব্ধি হয় না; নিজের জীবনপণে সেই অনুভূতি লাভ করিতে হয়।

শচীশ এইবার জীবনপণ করিয়াই সাধনায় লাগিয়াছে। তাহার সাধনার স্থানটির বর্ণনা কবি এইভাবে করিয়াছেন—"চারিদিক ধু ধু করিতেছে—জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই। রৌদ্র যেমন নিষ্ঠুর, বালির ঢেউগুলাও তেমনি। তারা যেন শূন্যতার পাহারাওয়ালা, গুঁড়ি মারিয়া সব বসিয়া আছে। যেখানে কোনো ডাকের কোনো সাড়া, কোনো প্রশ্নের কোনো জবাব নাই, এমন একটা সীমাহারা ফ্যাকাশে সাদার মাঝখানে দাঁড়াইয়া দামিনীর বুক দমিয়া গেল। এখানে যেন সব মুছিয়া গিয়া একেবারে গোড়ার সেই শুক্‌নো সাদায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। পায়ের তলায় কেবল পড়িয়া আছে একটা 'না'। তা'র না আছে শব্দ, না আছে গতি, তাহাতে না আছে রক্তের লাল, না আছে গাছপালার সবুজ, না আছে আকাশের নীল, না আছে মাটির গেরুয়া। যেন একটা মড়ার মাথার প্রকাণ্ড ওষ্ঠহীন হাসি, যেন দয়াহীন তপ্ত আকাশের কাছে বিপুল একটা শুষ্ক জিহ্বা মস্ত একটা তৃষ্ণার দরখাস্ত মেলিয়া ধরিয়াছে।" নির্বিকল্প সমাধির জন্য এমন একটি স্থানের কল্পনা আর কাহারও মনে কখনও জাগিয়াছে বলিয়া জানি না। এইরকম স্থানে দীর্ঘকাল সাধনা করিবার পর শচীশ বুঝিল, "তিনি রূপ ভালবাসেন, তাই কেবলি রূপের দিকে নামিয়া আসিতেছেন। আমরা ত শুধু রূপ লইয়া বাঁচি না, আমাদের তাই অরূপের দিকে ছুটিতে হয়। তিনি মুক্ত, তাই তাঁর লীলা বন্ধনে; আমরা বদ্ধ, সেই জন্য আমাদের আনন্দ মুক্তিতে।"

একদিন ঝড়ের রাতে দামিনী শচীশের ঘরের জানালা বন্ধ করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু শচীশের মনে হইয়াছিল যে তাহার বুঝি অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে। তাই সে প্রবল ঝঞ্ঝা ও বিদ্যুৎগর্জনের মধ্যে বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া সে দামিনীকে বলিল:

"যাঁকে আমি খুঁজিতেছি তাঁকে আমার বড় দরকার—আর কিছুতেই আমার দরকার নাই। ...ী, তুমি আমাকে দয়া কর, তুমি আমাকে ...া করিয়া যাও।"

সাধক-জীবনের সবচেয়ে বড় কথা এইখানে রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে শচীশের মুখ দিয়া শুনাইয়াছেন।

বিশ্ব-সঙ্গীত

শ্রীক্ষীরোদবিহারী ভট্টাচার্য্য ও শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

আজ কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথের কথা আমাদের মনে পড়িতেছে—যেদিন তাঁহার হৃদয়ের কাব্য-ভাবোচ্ছাস নির্ঝরের ন্যায় পাষাণকারা ভেদ করিয়া মহাম্বুধির টানে উন্মত্ত ছুটিয়া চলিয়াছিল। আরও মনে পড়িতেছে, কবি ইহার কিছুকাল পরেই দারজিলিংয়ে আসিয়াছিলেন এবং 'প্রতিধ্বনি' নামক কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন। কবির নিজের ভাষায়ই বলি—

"বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে সে কোন্ গানের ধ্বনি জাগিতেছে, প্রিয় মুখ হইতে, বিশ্বের সমুদয় সুন্দর সামগ্রী হইতে প্রতিঘাত পাইয়া যাহার প্রতিধ্বনি আমাদের হৃদয়ের ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিতেছে।"

ইহার পরের অনির্ব্বচনীয় অনুভূতি সত্যকার কাব্য আনন্দের অনুভূতি। পরিণত কবি-মনের তাহা কেবল ইঙ্গিতমাত্র করে নাই, পূর্ণতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

"অন্তরের কোন একটি গূঢ়তম গুহা হইতে সুরের ধারা আসিয়া দেশে কালে ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং প্রতিধ্বনিরূপে সমস্ত দেশ কাল হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া সেইখানে আনন্দ স্রোতে ফিরিয়া যাইতেছে।"

কাব্যজীবন উন্মেষের এই অনাস্বাদিত আনন্দানুভূতি ক্রমশঃ গভীরতর হইয়া কাব্যবিকাশ ও পরিণতিতে নিবিড় ও ঘন হইয়াছে। সুব্যাপ্তবিশ্বে বিচ্ছুরিত আনন্দোপলব্ধির ফলে কবি পার্থিব দুঃখে সুখে উদাসীন ও অন্যমনা হইলেন। ইহা কাব্যশক্তি উৎসারিণী বাগ্‌দেবীর অশেষ স্নেহ ও করুণা।

চারিদিকে সবে বাঁটিয়া দুনিয়া
আপন অংশ নিতেছে গুণিয়া
আমি তব স্নেহ বচন শুনিয়া
পেয়েছি স্বরগ সুধা।

বিশ্বসঙ্গীত মূর্চ্ছনার অভিভব—আকর্ষণে কবি পরবর্ত্তী জীবনে অনন্তের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অনুসন্ধানের অজানা পথে সঙ্গীতই তাঁহার আলোক হইয়াছে। কবি বলিতেছেন,

গান দিয়ে যে তোমায় খুঁজি বাহির মনে
চিরদিবস মোর জীবনে।

বিশ্বসঙ্গীতের অনুকরণ আপন হৃদ্‌বীণায় প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। বিশ্বের আকাশে বাতাসে, জলে স্থলে বিচ্ছুরিত অসীম আনন্দের পরিপূর্ণ পরিচয় কবি পাইয়াছেন। অনন্তের আনন্দ-ছন্দ তাঁহার অন্তরে প্লাবন আনিয়াছে। বাধাবন্ধবিহিন অপূর্ব্ব এই আনন্দ-ছন্দ—ভাঙা, গড়া, লোটা, ছোটার অভিনব আনন্দ। আবার কবির নিজের কথাতেই বলি,

"বিশ্বকবির কাব্য গান যখন আনন্দময় হইয়া তাহারই চিত্তে ফিরিয়া যাইতেছে তখন সেইটেকে আমাদের চেতনার মাঝে বহিয়া যাইতে দিলে আমরা জগতের পরম পরিণামটিকে যেন অনির্ব্বচনীয়রূপে জানিতে পারি। যেখানে আমাদের সেই উপলব্ধি......সেখানে আমাদের মন সেই অসীমের অভিমুখীন আনন্দ স্রোতের টানে উতলা হইয়া সেই দিকে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে চায়।"

কবির এই উক্তি কতখানি অন্তর্গূঢ়, কত গভীর আন্তর উপলব্ধিপ্রসূত বুঝিতে পারি, যখন তাঁহার কাব্যে প্রবাহিত বিশ্বজনীন আনন্দের রূপটি ধরতে পারি। কেবল অন্তরে উপলব্ধি করিয়াই কবির অসীম আনন্দ বেগ শান্ত হইয়া যায় নাই, বিশ্ব প্রাণে তাহা প্রবাহিত হইয়া, উচ্ছ্বসিত স্পন্দনে আপনাকে শতধা করিয়া সুব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে বিশ্বজন সে আনন্দামৃত পান করিয়া ধন্য হইতেছে।

কবি বিশ্বরাগিণীর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে গিয়া তাহা যে রূপ দেখিয়াছেন, কবির গানে উহা মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিয়াছে।

যে রাগিণী সদা গগন ছাপিয়া
হোম শিখা সম উঠিছে কাঁপিয়া
অনাদি অসীমে পড়িছে ঝাঁপিয়া
বিশ্বতন্ত্রী হতে।

গানের ধারার মাঝে, গানের ওপারে যিনি দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি ধরা দিয়াছেন। কবির উপলব্ধি সার্থক হইয়াছে। কবির কাব্যজীবন প্রভাতে, তাঁহার সুরগুলি যে চরণ স্পর্শ করিয়াছিল, জীবন সায়াহ্নে তাহাতেই তিনি বিলীন হইয়াছেন। আনন্দ-চপল নির্ঝর অনন্ত আনন্দ সাগরকোলে আপনাকে সঁপিয়া দিয়াছেন,—কবির আত্মা সত্যই আনন্দামৃতরূপ।

কিশোর-দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ : শিল্পী—শ্রীসনৎকুমার বসু (বয়স ১১, হেয়ার স্কুলের ছাত্র)

শিল্পী-রবীন্দ্রনাথ

শ্রীমহীতোষ বিশ্বাস

রবীন্দ্রনাথ কবি হিসাবে জগদ্বিখ্যাত, কিন্তু তাঁর আরও [illegible]টী রূপ প্রকাশ পেয়েছে,—কর্মী ও শিল্পী। রবীন্দ্র-[illegible]থের শিল্পীরূপ খুব বেশীদিন প্রকাশ না পেলেও, অন্তরে [illegible]নি যে জন্ম-শিল্পী তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

শিল্পী-রবীন্দ্রনাথের কাজ অনেকদিন পূর্ব্বেই আরম্ভ [illegible]য়েছিল। তাঁর কবিতার খাতায় তিনি অমনোনীত [illegible]নাগুলি কেটে আঁকা-বাঁকা রেখায় যে বিচিত্র ভঙ্গিমা[illegible] [illegible]-একটি চিত্র অঙ্কন করেছেন, তার নমুনা আমরা [illegible]খেছি। এই ছবিগুলির মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয় বস্তু [illegible], কিন্তু তবুও এগুলিকে চিত্র বলা যায়, যেহেতু সে[illegible] [illegible]াসমষ্টিতে এক একটি মূর্ত্তির আভাস মিলে। তারপর [illegible]গুরু বহু চিত্র এঁকেছেন, যার মধ্যে ভাব ও ভঙ্গিমা [illegible]র্ণ পরিস্ফুট হ'য়েছে রঙে ও রেখায়।

কবিগুরুর ছবির বিশেষত্ব এই যে, সে ছবি আঁকা [illegible]ছে কোন ধনীর 'ফরমাস' কিম্বা 'Anatomy'র বালাই [illegible] নয়, সম্পূর্ণ নিজের মনের ভাবকে তিনি ফুটিয়ে [illegible]ছেন অভিনবরূপে নিজের খেয়ালমত। কারও অঙ্কন পদ্ধতির প্রভাব এই সব ছবিতে নাই। কবিতা লেখার মতই শিল্পসৃষ্টির সহজানন্দেই তিনি ছবি এঁকেছেন। আশী বছর বয়সেও কবিগুরুর শিল্প-সৃষ্টির উৎসাহ ও আনন্দ শান্তিনিকেতনে আমি তাঁর সংস্পর্শে গিয়ে উপলব্ধি করেছি। কবিগুরুর "উত্তরায়ণে" প্রথম সিঁড়িতে উঠতেই সাম্‌নের ঘরে কবির আঁকা ছবি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই ঘরে তিনি নামজাদা শিল্পীর ছবি না রেখে নিজের আঁকা ছবি সযত্নে সাজিয়ে রেখেছেন। এই রূপ-সৃষ্টির মাঝে তাঁর যে কি অসীম দরদ, ইহা তারই পরিচয়।

[illegible]বীন্দ্রনাথ তাঁর মনের শিল্পীকে জগতের কাছে প্রকাশ [illegible]ছেন, আজ তাই আমরা দেখছি, তিনি ছবি এঁকেছেন, [illegible]ন শিল্পী। ইউরোপেও তাঁর ছবির প্রদর্শনী হ'য়েছিল। সে দেশের লোকও কবির চিত্রাঙ্কণে মুগ্ধ হ'য়েছে।

রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে ছবি এঁকেছেন বটে, কিন্তু তিনি গোড়া থেকেই শিল্পী, সে কথা জানা যায় কবির গড়া শান্তিনিকেতনের দিকে চাইলে। কি প্রয়োজন ছিল এই নিভৃত নির্জ্জনে এই প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলতে? সহরে

হয়তো এর চেয়ে অনেক সুবিধা হ'ত। মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে শান্তিনিকেতন কবীন্দ্রের মস্তবড় শিল্পসৃষ্টি।

আশ্রম হতে যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু নির্জ্জন প্রান্তর। দূরে—অতি দূরে সারি দিয়ে তাল বৃক্ষ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে প্রহরীর মত। কবির সাধনায় তারা যেন মুগ্ধ—নির্ব্বাক্। প্রভাতে আশ্রমের দ্বার খুললেই প্রথমে দৃষ্টি পড়ে অসীম নীল আকাশের দিকে। বর্ষা যবে নেমে আসে, সাদা কালো মেঘ ঢেলে দিয়ে যায় অমৃতধারা, তখন পার্ব্বণ চলে বৃক্ষরোপণের। আশ্রমবাসী দলে দলে গায় গান—বর্ষার গান, নৃত্যের তালে তালে তারা করে বৃক্ষ রোপণ—বর্ষাকে জানায়—স্বাগতম্। আবার বসন্তের আগমনে যখন গাছে গাছে, পাতায় পাতায় সবুজ রঙ ধরে, ফুলের শোভায়—আশ্রমের শোভা বর্দ্ধন করে, তখন নৃত্য ও সুরে ভেসে ওঠে—বসন্তের আগমনী-গীতি। এমনি করে' সকল ঋতুর সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে তাল রেখে চলেছে সেখানকার সকল রকমের শিক্ষা, এবং মানুষে মানুষে মিলন। সত্য, শিব, সুন্দরের নৈবেদ্য যেন এই শান্তিনিকেতন। কত বড় শিল্পী হ'লে এরূপ ছন্দোময় প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলার পরিকল্পনা করতে পারেন, তা সহজেই অনুমেয়। তাঁর শিল্প-প্রতিভা রূপায়িত হ'তে চেয়েছিল এই শান্তিনিকেতন-প্রতিষ্ঠার মাঝে।

চিত্রাঙ্কনরত রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বভারতীর কলাভবনে ভারতীয় পদ্ধতির চিত্রাঙ্কনমূলক সাধনা ও অবদান আজ কোন সভ্যজাতির কাছে বোধহয় অজ্ঞাত নেই। বহু শিল্পী 'কলাভবনের' শিক্ষা শেষে দেশে খ্যাতি লাভ ক'রেছেন, এমন কি পাশ্চাত্য দেশেও তাঁদের কাজ উচ্চ প্রশংসা পেয়েছে। এই ভারতীয় পদ্ধতির চিত্রাঙ্কনের প্রবর্ত্তক যদিও শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ, তবুও কবিগুরুর দান বড় কম নহে। পূর্ব্বে কলিকাতা সরকারী আর্ট স্কুলে এই 'ভারতীয়' ছবি আঁকা শেখান হ'ত না এবং এবিষয়ে শিক্ষার জন্য কোন শিক্ষকও ছিলেন না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে এই নূতন ধরণের চিত্রাঙ্কন শিক্ষার সুযোগ ক'রে দিলেন। শ্রীযুত অসিত হালদার মহাশয় শান্তিনিকেতনে একটি ছোট ঘর নিয়ে প্রথমে ছবি আঁকা আরম্ভ করেন। তারপর শিল্পাচার্য্যের কাজের ভার নিলেন—শ্রীযুত নন্দলাল বসু। অতি অল্প সংখ্যক ছাত্র নিয়ে কলাভবনের কাজ আরম্ভ হ'য়েছিল। তারপর একে একে ছাত্র তৈরী হ'তে লাগল। মনীন্দ্র গুপ্ত, রমেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ধীরেন্দ্র দেব বর্ম্মণ, বিনোদবিহারী মুখার্জ্জি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী এই শান্তিনিকেতনেরই ছাত্র।

বিশ্ববরেণ্য কবিগুরুর আন্তরিক দরদ যদি এই 'কলাভবনে'র উপর না পড়ত—অর্থাৎ তিনি যদি মনে প্রাণে 'শিল্পী' না হতেন, তা'হলে আজ 'ভারতীয় চিত্রকলা' জগতের ক'জন জানতে পারত তা' বলা যায় না।

মানুষ

শ্রীইন্দু গুপ্ত

মানুষই ভগবান—এই মোর জ্ঞান;
মানুষের আত্মার উপলব্ধি ধ্যান।
আমার উপাসনা—মানুষের ভালো;
মানুষেরই মাঝে দেখি—অমৃতের আলো।

উত্তরায়ণে একদিন

শ্রীমতী বাণী চৌধুরী (মজুমদার)

চলার পথে ছোটখাটো স্মৃতিই অনেক সময় প্রিয় হয়ে চিত্তে গভীর রেখাপাত করে' যায়। সেদিনের এক শ্রাবণ-সন্ধ্যার স্মৃতি সবচেয়ে মূল্যবান হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার জীবনে। রবীন্দ্রনাথকে দেখবার সৌভাগ্য অনেকবার হয়েছিল ; কিন্তু এমন কাছাকাছি দেখবার সুযোগ কখনও মেলেনি। ১৯৩৮ সালের আগষ্ট মাস; ইউরোপ ঘুরে' বিলাত হয়ে সবে ফিরেছি। কবিগুরুর আশীষকামী হয়ে গেলাম শান্তিনিকেতনে। গোধূলি বেলায় শান্তিনিকেতনে পৌঁছলাম।

আমি তৈরী হ'য়ে নিলাম। কবিগুরু তখন ছিলেন উত্তরায়ণের দক্ষিণ-পূর্ব্ব বারান্দায়। কবির সামনে একটা টেবিল, কয়েকটা বই, একটা খাতা। তিনি গভীরভাবে কি লিখে চলেছেন। সাদা রেশমের আঙরাখা-পরা — আর পায়ের কাছে এক জোড়া নাগরা। অপরাহ্নের শেষ রবিরশ্মি তির্য্যকভাবে এসে পড়েছে লাল মেঝেতে। সারা পরিবেশে অনির্ব্বচনীয় রূপ-মাধুরী। কবিগুরু কি যেন লিখছিলেন। দীপ্ত প্রতিভা তাঁর চোখে-মুখে। আর বাধিত কলম ঊর্দ্ধশ্বাসে চলেছে খস্ খস্ খস্,— পূর্ব্ব এক সঙ্গীতসঞ্চারী। লেখায় নিমজ্জিত রবীন্দ্রনা... কি অপূর্ব্ব! কবির কত বিচিত্র সৃষ্টির কথা এক প... মনে হল: বঙ্গ সাহিত্যে নবসৃষ্ট চেনা-অচেনা নরনা... উপন্যাসের চরিত্র) আমার মনের পর্দায় ভীড় করে দাঁড়ালো। তাঁরই রচিত মধুবর্ষী গানের কলি কণ্ঠে নিঃশব্দ গুঞ্জন তুললো।

এই অপরূপ স্রষ্টাকে আশ্চর্য্য হয়ে দেখছি, এমন সময়ে কবি তাঁর দিব্য দুটী চোখ তুলে আমার দিকে চাইলেন। সে কি চোখ! জল জল করছে, চোখের দিকে তাকান যায় না। আমার বুকের ভেতর পর্য্যন্ত যেন তিনি দেখতে পাচ্ছেন। প্রণাম করবার জন্য তাড়াতাড়ি নীচু হলাম। মাথায় হাত রেখে স্মিতহাস্যে বলে' উঠলেন, "আস্তে, টেবিলের সঙ্গে মাথাটা ঠুকে যাবে যে"। কি মিষ্টি গলা! এমন কণ্ঠস্বর কখনো শুনিনি। আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললেন, "ওদেশ থেকে খুব নাম করে ফিরে এসেছো শুনে খুব খুশী হয়েছি।"

উত্তরায়ণ প্রাসাদে রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বগুরুর মুখে নিজের প্রশংসা শুনে সত্যই গর্ব্ব হ'ল। মনে পড়লো, একদা লণ্ডনের এক হোটেলে বার্ণার্ড শ'কে দেখেছিলাম। দেখেছিলাম খুব নিকট হতে। বারবার তিনি আমায় লক্ষ্য করছিলেন। তীক্ষ্ণ, তীব্র খর সে দৃষ্টি—মনকে আকর্ষণ করে না—মাথা নত করানো দূরে থাকুক। আর রবীন্দ্রনাথ কত স্নিগ্ধ, সুন্দর অভিনন্দনীয়। আমার ভাবনার সূত্র ছিন্ন করে' কবিগুরু প্রশ্ন করলেন, "কেমন লাগল ওদেশ?"

ঢোক গিলে বললাম, "মন্দ না।"

"ওটা কি উত্তর হ'ল?" কবি হাসলেন।

চুপ করে রইলাম। কিন্তু তিনিই পুনঃ কথা ওঠালেন, ...আঁকার সখ আছে?"

"আছে, কিন্তু আসে না।"

"গান ভালবাস?"

"বাসি।"

একটু থেমে কবি বললেন, "নাচে যখন এত নিপুণ তখন অভিনয় নিশ্চয়ই খুব ভালো পারো?"

বললাম, "আপনি শেখালে কেন পারবো না।"

খুব হাসিখুসীর সহিত তিনি বললেন, "বেশ, বেশ। জানো, অভিনয় করাতে আমার খুব সখ। ঠিক মত বাঙ্গালী মেয়ের অভাবে নাটকগুলোকে নাচে-গানে রূপান্তরিত করে উঠতে পারছি না। এখানে তা'হলে থাকছো?"

"হাঁ, পরে আস্‌বো।"

"নিশ্চয়ই এসো। আঁকা, নাচ, গানের ক্লাস নিয়মিত করবে। আচ্ছা আর একদিন তোমার অভিজ্ঞতা শুনবো।"

বিদায় নিলাম। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। আর সবাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ সেরে খাবার ঘরে গেলাম। চমৎকার সাজানো আর পরিচ্ছন্ন ঘর। মধ্যে মধ্যে জয়পুরের সুন্দর থালা বসান। কবিগুরুর নাত্‌নি নন্দিনী (পুপে) সামনে বসে নানান গল্প করতে লাগলেন।

আহারান্তে উত্তরায়ণে ফিরে এলাম। হলের পাশেই আমার শোবার ঘর। হল ঘরের ঠিক ওপাশের কোণা-কোণি ঘরটীতে দেখলাম, গুরুদেব তখনও পড়ছেন। বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গড়িয়ে চললো। ঘরে একা কবি পাঠনিরত। আমি পর্দ্দার পাশে বসে একমনে দেখছিলাম। নীরব গভীর নিশীথে 'পাঠ-নিমগ্ন রবীন্দ্রনাথ' যেন এ জগতের মানুষ নন। মনে হ'ল যেন শ্বেত পাথরের মূর্ত্তি। মাঝে মাঝে মশা বিরক্ত করছিল। দু'একটা জোনাকী মাঝে মাঝে কবির শ্মশ্রুকেশ কেন্দ্র করে নৃত্য করছিল। সে এক অদ্ভুত ছবি! সম্ভবতঃ মশার কামড়েই মাঝে একটু চঞ্চল হয়ে আবার স্থির হয়ে বসলেন। এর মধ্যে আমি যে কতবার নড়ে বসলাম তার ঠিক নাই। ভাব্‌ছিলাম, আহা আমি যদি তাড়াতে পারতাম ঐ মশাগুলো! কবিগুরুর বিছানা ছিল ঐ হলে আমার ঠিক জানালার সামনে। তাঁকে শুতে না দেখে আমি ঘুমুবো না, এই সঙ্কল্প নিয়েই পর্দ্দার পাশ ঘেঁসে বসে রইলাম। ঘুমে চোখ ভেঙ্গে পড়ছে। কিন্তু কোথায় তিনি? তাঁর সেই সুন্দর শুভ্র শয্যা! মোটা মোটা তাকিয়াগুলো প্রিয়-মিলনের আশায় যেন হাঁ করে চেয়ে আছে।

রাত্রি বারটারও পরে কবি উঠে বিছানা নিলেন। আমিও শুয়ে পড়লাম।

ভোরেই আমরা রওনা হব। ভাবলাম, এত সকালে আর তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না। ওমা, ঘরের দরজা খুলতেই দেখি, কবি আঙিনায় ইতস্ততঃ পায়চারী করছেন।

ভূমিষ্ঠ প্রণতঃ হয়ে বিদায় নিলাম।

এর পরেও গুরুদেবের সাহচর্য্য করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাঁর চরণতলে বসে অভিনয় শিক্ষা করেছি। মাথায় হাত দিয়ে তিনি কতবার আশীর্ব্বাদ করেছেন। পেয়েছি তাঁর সুন্দর ব্যবহার, স্নেহ, প্রীতি, উৎসাহ, ভরসা। কিন্তু এই দিনের সেই বর্ষণ-মুখর শ্রাবণ রাত্রির স্মৃতি সব কিছুকে ছাপিয়ে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে।

গান

শ্রীনমিতা মজুমদার

ভয় কি আমার তবে
জানি জানি বেদন এই
এই তো মধুর হবে।
বাজবে বীণা কঠিন তানে
মীড়ে মুখর কী ভাবণে
যখন, সুর লাগিবে আঘাত কী আর রবে॥

অন্ধকারের তীরে এনে
আলোর মাঝে ফেলা
তোমার, রাত্রিদিবা এই চলেছে খেলা।
জাগ্‌বে তখন তাপের তপে
আলোর ধ্যানে আলোর জপে
যখন ভাবেরে মোর হরণ করি' লবে॥

একটী দিন

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

দিন ত ত্বরায় ফুরায়ে আসিছে
স্মৃতি হয়ে আসে ক্ষীণ,
দীর্ঘ জীবনে পেয়েছিনু শুধু
একটী সুখের দিন।
মেঘলা দিবস এলোমেলো হাওয়া,
সম্ভব নয় বাহিরেতে যাওয়া,
নেত্রোৎসব মেঘ পানে চাওয়া
সে কি শোভা আভাহীন!

গোটা দিন ধরি অকারণ সে কি
উল্লাসে যায় বেলা,
ভিতরে বাহিরে চলেছিল শুধু
আলো ছায়া লয়ে খেলা।
বাহিরে সকলি কুহেলিকাবৎ,
ভিতরে মধুর আলোর জগৎ,
দেবতা এবং মানুষের যেন
অৰ্দ্ধোদয়ের মেলা।

জয় কি যশের বার্ত্তা আনেনি
পার্ব্বণ তিথি নহে,
সব চেয়ে বড় সেই শুভ দিন
অভয়ের কথা কহে।
কিছু বলে নাক তবু বলে সব,
অধিক মুখর যেহেতু নীরব,
সমারোহহীন চলে উৎসব
অমৃতের নদী বহে।

মনে হল মোর আকাশ মুকুরে
হেরিলাম শ্যামা মাকে,
শব-সাধনায় সাধক হয়ত
ঢের বেশী দেখে থাকে
পলকের দেখা—না দেখারি মত,
তারি আনন্দ, উচ্ছ্বাস কত!
রাঙা চরণের লাগে লাল করি
দিল এ জীবনটাকে।

সহসা হেরিনু নূতন ভুবন
ভুবন চমৎকার,
পাষাণেতে যেন হইল কেমনে
চেতনার সঞ্চার।
কি পেলাম আর, কি হলাম ভাবি,
কমল লভিল পূজিবার দাবী
স্বাতী সলিলের পরশন পেয়ে
সে শুক্তি নাহি আর।

একটী দিনের ক্ষীণ সঞ্চয়,—
বক্ষে হয় না ঠাঁই
জীবনে পরম সন্তোষ এলো
কিছুই কাম্য নাই।
যে দেখাই এক স্বর্গ রাজ্য
মিছে ধন মান করিনে গ্রাহ্য
যে শোভার আভা লভিবারে আঁখি
মুদে আসে একাজাই

তৃতীয় কপোত

স্‌টেকান ৎমুঈগ ঃ অনুবাদক—শ্রীঅশোক গুহ

তৃতীয় কপোত মিলিয়ে গেল।...

যতদূর চোখ যায় শুধু থই থই করছে কালো জল, শ্যামলতার চিহ্ন মেলে না! আরারাত পর্বতের উপর গোষ্ঠীপতি নোয়ার আর্ক। এই মহাপ্লাবনের পর পৃথিবীর নোতুন করে পত্তন হবে, তার বীজ তাঁরই হাতে।

নোয়া আর্ক থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখেন আর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলেন। এ প্লাবনের কি আর শেষ নাই! জল শুধু জল; কোথায় শ্যাম মায়াময়ী পৃথিবী, কোথায় প্রাণীর বন্দনা গান! সৃষ্টির সলিল সমাধিই কি বিধাতার লিখন! অবশেষে তিনি কপোত পাঠালেন পৃথিবীর বার্তা আনতে।

প্রথম কপোত ফিরে এলো, পাখা তার ভিজে, সর্বাঙ্গে ক্লান্তি; দ্বিতীয় ফিরলো জলপাইয়ের একটা পাতা ঠোঁটে। তৃতীয়?—তৃতীয় মহাশূন্যে বিলীন হ'য়ে গেল, আর ফিরলো না গোষ্ঠীপতি নোয়ার কাছে।

কেউ জানলো না তার কথা।

বিংশ শতাব্দী আবার তার সন্ধান আনলো। নোয়ার আদেশে সে বেরিয়েছিল পৃথিবীর বার্তা আনতে; বার্তা আনা তার হলোনা। শিশু পৃথিবী তার সবুজ মায়ায় তাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। সে ভুলে গেল নোয়া আর তাঁর আর্কের কথা! পিঞ্জরাবদ্ধ কপোত, সবুজ বনের কোলে, নীল আকাশ যেখানে ঢালু হ'য়ে নেমে বনের ললাট স্পর্শ করেছে, সেখানে তার বাসা বাঁধলো।

সবুজ পাতার দোলনায় শুয়ে বাতাসের ঘুম পাড়ানী গান শুনতে শুনতে কাটল তার দিন। কত ঋতু, কত বছর কেটে গেল, তার খেয়াল নেই! মৃত্যু তার সুখস্বপ্ন ভাঙতে এলোনা, সে হোল মৃত্যুঞ্জয়ী।

কুমারীবন, মানুষের পায়ের চিহ্নে তার শ্যামবুক কলঙ্কিত হয়নি কোনো দিন। কিন্তু একদিন তাই হোল। একদল কাঠুরে কাঠ কাটতে এলো। তাদের শাণিত কুড়ুলের ঘায় বনস্পতিরা লুটিয়ে পড়লো; কুমারী[illegible] বেদনায় গুমরে মরলো। আর একদিন তৃতীয় কপো[illegible] আবিষ্কার করলো এক প্রণয়ী-যুগলকে। তারা এ-ওর কা[illegible] কি যেন ব'লতে-ব'লতে চলেছে। বন তাদের হাসিতে শিউরে উঠছে! আর একদিন ফুট ফুটে একপাল ছেলে মেয়ে জাম কুড়োতে এলো! জামের বেগুণী রস মুখে মেখে নাচলো, গাইল তারা। পাতাঢাকা আশ্রয় থেকে তৃতীয় কপোত তা তাকিয়ে দেখলো।

তারপর একদিন তার ঘুম ভেঙে গেল বনভূমির আর্তনাদে। বাসা থেকে মুখ বার করে' সে দেখলো, হাজার হাজার ধাতুর জলন্ত গোলক চলেছে বাতাসের ওপর দিয়ে। কি তাদের চিৎকার! যেখানে তারা পড়ছে, সেখানেই ধ্বংসের তাণ্ডব লীলা!

দেখতে দেখতে বনভূমি বিধ্বস্ত হ'য়ে গেল। এতটুকু আড়াল নেই; সূর্য্যের আলো তার রিক্ততাকে আরো ভীষণ করে তুললো। বিচিত্র পোষাক-পরা একদল মানুষ বেরিয়ে এল এবার। তাদের পায়ের দাপে কেঁপে উঠলো পৃথিবী। তারপর অগ্নি-নালিকার ধূমোদ্গার আর চারিদিকে ভীষণ মৃত্যু।

তৃতীয় কপোতের সবুজ স্বপ্ন ভেঙে গেলো! তার চারদিকে মৃত্যু, ধ্বংস। একদিন প্লাবন পৃথিবীর ধ্বংসের বীজ নিয়ে এসেছিল, আর আজ এসেছে যুদ্ধ। আবার তাকে আকাশে উড়তে হোল একটি শান্তি-নীড়ের লোভে।

পৃথিবী ঘুরলো সে, কিন্তু কোথায় শান্তির নীড়? যুদ্ধমানা পৃথিবী; দিকে দিকে সমর-সজ্জা। সেবারের প্লাবন ভয়ঙ্কর ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু এ প্লাবন তার চাইতেও ভয়ঙ্কর। সে ছিল জল; এ রক্ত। পুরাণো স্মৃতি তার মনে জাগলো। এই প্লাবনের পর শান্তির বার্তাস্বরূপ জলপাইয়ের পাতা মুখে করে' সে যাবে গোষ্ঠীপতির কাছে। কপোত দিশাহারা হ'য়ে তাই ঘুরতে লাগলো শান্তির সন্ধানে।

শান্তি কোথায়? প্লাবন উত্তরোত্তর বেড়ে চললো। আজও মানুষ তার হাত থেকে মুক্তি পায়নি। দিকে দিকে তার ভয়াল প্রসার। তৃতীয় কপোত আজও তাই ঘোরে, গোষ্ঠীপতির শান্তির সন্ধান তার মেলেনি, গোষ্ঠীপতির কাছেও সে তাই ফিরতে পারেনি।

দুপুর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে তার পাখার ধ্বনি [illegible]দের কাণে বাজে। আমাদের অশুভ চিন্তা জড়িয়ে [illegible]ছে তার পাখায়, আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা তার চেষ্টায়। হাজার হাজার বছর ধরে চেষ্টা করেও সে পারেনি, পারবে কি ভবিষ্যতে সাম্য আর শান্তির বার্তা নিয়ে গোষ্ঠীপতির কাছে ফিরে যেতে?

বর্তমানের নিকষ কালো তো সে আলোর ইঙ্গিত বহন ক'রে আনে না!

বাঙালীর মেয়ে

শ্রীশান্তা দেবী

এই যুগ-সঙ্কটের দিন কথার দিন নয়, কাজের দিন। ...ন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, বাঙালীর সাংসারিক ...সামাজিক জীবনে কথার পারিপাট্য যতখানি উন্নতিলাভ ...রছে, কাজের উন্নতি তার তুলনায় অত্যন্তই সামান্য। ...ত্তজনার মুহূর্ত্তে বাঙালী অনেক বড় বড় কাজে হাত ...রছে, কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা নিখুঁৎ সততা ...নিঃস্বার্থ শ্রমশীলতার অভাবে সব কাজগুলি বড় ও ...স্থায়ী হতে পারেনি। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ...ত রকম ত্রুটির বোঝা নিয়ে আমরা চলেছি, তা' এক ...থায় বলে শেষ করা যায় না। এই অসংখ্য ত্রুটির জন্যই ...মরা পৃথিবীতে মানুষের মত মানুষ হয়ে দাঁড়াতে ...রিনি। সাধারণভাবে বাঙালী জাতির কথা ছেড়ে দিয়ে ...ঙালী মেয়েদের বিষয় কয়েকটি কথা বলব। মনে ...খতে হবে, বাঙালীর জীবনে জাতিগতভাবে যে সকল ...ট ও অভাব লক্ষিত হয়, তা' শুধু পুরুষের চরিত্রেই ...ি, মেয়েদের চরিত্রেও আছে। মেয়েদের কর্ম্মক্ষেত্র ...র্ণতর বলে' হয়ত সবগুলি তেমনভাবে ফুটে ওঠে না। ...'ছাড়া মায়ের জাত বলে' তাদের কাছে হয়ত নিঃস্বার্থ-...তা ও শ্রমশীলতার একটু উচ্চ আদর্শও আমরা দেখবার ...শা করতে পারি। নিজের সংসারের গণ্ডীর ভিতর ...যতখানি নিঃস্বার্থভাবে পরিশ্রম করে' যান, ততখানি ...স্বার্থ যদি মেয়েরা বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্রে হতে পারেন ...ং তদুপরি চিন্তা ও কার্য্যধারায় সুশৃঙ্খলা, সততা ও ...ানুবর্ত্তিতা পালন করে' যেতে পারেন, তা'হলে বাংলা-...শের ভবিষ্যৎ মেয়েরাই উজ্জ্বল করে' তুলতে পারেন।

ভারতবর্ষ আজও পরপদানত কেন? সে ... বলে। তার বাহুবল নেই, অর্থবল নেই, বুদ্ধিব... ...ব নব উন্মেষশালিনী শক্তিতেও সে বহু জাতি হতে... ...। এই শক্তিহীনতার লজ্জা তাকে দূর করতে হবে। ...র দরবারে তাকেও মাথা উঁচু করে' দাঁড়াতে হবে। ...াসের পূর্ব্ব কাল হতে এই যে ধনধান্যশালিনী ...দের জন্মভূমি কত শত জাতিকে প্রলুব্ধ করে' এনেছে, কত শত জাতির ভাণ্ডার ভরে' তুলেছে, এমন কি কত শত জাতিকে জ্ঞান ও ধর্ম্মের খোরাকও জুগিয়েছে—শক্তিহীনতার লজ্জা তার কি শোভা পায়? ইতিহাসের পাতা থেকে এই পাতাগুলি আমাদের মুছে ফেলতে হবে। শক্তিমন্ত্রে আমাদের দীক্ষিত হতে হবে।

আমাদের দেশে বলে—নারী শক্তিরূপিণী, এ কথাটা নিছক কবিত্বমাত্র নয়। শক্তি যদি শুধু শারীরিক বল মাত্র হয়, তা'হলে নারী অবশ্য পুরুষ অপেক্ষা দুর্ব্বল। কিন্তু দৈহিক বল এবং বীর্য্যে পুরুষকে জন্ম হতে উদ্বুদ্ধ করে নারী। তার বীর্য্যের প্রেরণা এবং জয়মাল্য দুই নারীর হাতে। তা'ছাড়া দেশের নারীজাতি যদি মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিমতী না হন, তা'হলে সে দেশের উন্নতির কোন আশা নেই।

এই দৈহিক শক্তি এবং মানসিক শক্তি পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। এক অপরকে জাগরিত করে। আমাদের গার্গী, লীলাবতী, খনা ও ভারতীর দেশ বলে' আমরা গর্ব্ব করি, কিন্তু আজ কি আমাদের দেশে গার্গীর মত অমৃতের বাণী উচ্চারণ করবার মেয়ে তৈরী হচ্ছে? অমৃতলাভের আশায় সমস্ত পার্থিব সুখের মোহ ত্যাগ করার মত কয় জন মেয়ে আমাদের দেশে আছেন? যুগযুগান্তর ধরে' যাঁদের নাম ভবিষ্যৎ বংশের মুখে উচ্চারিত হবে, এমন মেয়ে কি এখন আমরা দেখতে পাই? তা' যদি না পাই, তবে আমাদের গৌরব অতীতকে নিয়েই চলবে। মহাপুরুষ বলে' কথা আছে, তাঁদের আবির্ভাবও হয় যুগে যুগে; কিন্তু মহানারী বলে' কোনও কথা নেই, যদিও ...দের দেশে মহামানবীর জন্ম যে হয়নি তা' নয়। ... পুত্রকামনা করে, কিন্তু কন্যাকামনা বলে কোনও কথার চলন নেই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বিদুষী কন্যা কামনা করার অনুষ্ঠানের কথা আছে। তবে আমাদের দেশের লোকে একথা বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না। কন্যাদের নিজেদের যোগ্যতার দ্বারা বুঝিয়ে দিতে হবে যে, তাঁরাও কামনা করবার মত সন্তান।

সংসার সৃষ্টি ও স্থিতিতে প্রাকৃতিক নিয়মে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সমান প্রয়োজন আছে। আজকালকার পৃথিবীব্যাপী প্রলয়ের দিনে দেখা যাচ্ছে, সেখানেও নারীর মূল্য অনেক। তবে সুখের বিষয়, প্রলয়ঙ্করী শঙ্করীরূপে তার মূল্য যতটা, তার চেয়েও বেশী মূল্য প্রলয়ের মধ্যেও সৃষ্টিকে ধরে' রাখবার জন্য। যুদ্ধক্ষেত্রে নারীবাহিনী বহু স্থানে দেখা দিয়েছে, কিন্তু তার চেয়েও বেশী দেখা দিয়েছে, পুরুষপরিত্যক্ত নগরীর ও পল্লীর ধাত্রীরূপে নারীসঙ্ঘ। তাঁরা আহত, রুগ্ন, শিশু সকলের শুশ্রূষা-কারিণী, তাঁরা পথে ঘাটে প্রহরী, তাঁরা যানবহনের কাণ্ডারী। এক কথায়, তাঁরাই প্রলয়পয়োধিজলে সৃষ্টিকে ধারণ করে রয়েছেন। সুদিনের শিক্ষা ও দুর্দ্দিনের কাতর আহ্বান তাঁদের সকল কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশের পথ করে দিয়েছে এবং সর্ব্বত্রই তাঁরা যোগ্যতর পরিচয় দিচ্ছেন। গত মহাসমরে পুরুষরা যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছেন, নারীরা গৃহ-সংসার ও সমাজকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু এবারকার যুদ্ধে অগ্নিবর্ষী বিমান ঘরের দরজায় এসে হানা দিচ্ছে। মাথার উপর থেকে অগ্নিগোলা বর্ষিত হয়ে প্রাসাদ, অট্টালিকা, দোকান, বাজার সব ধ্বংসস্তূপ করে' দিচ্ছে। মানুষের গৃহ কোণই আজ সমরাঙ্গন। এই সমরাঙ্গনের ভিতর থেকে মানুষকে উদ্ধার করছে, শিশু, বৃদ্ধ, আতুরকে রক্ষা করছে, নিরাপদ্ স্থানে নিয়ে গিয়ে ধাত্রীর মত পালন করছে মেয়েরা। পিতৃমাতৃ-পরিত্যক্ত হাজার হাজার শিশু অপরিচিত ধাত্রীরূপিণীদের সঙ্গে বিদেশে চলে' যাচ্ছে। সেখানেও তারাই মায়ের মত তাদের পালন করছে, গুরুর মত তাদের শিক্ষা দিচ্ছে। মেয়েরা একাধারে গৃহ-সমরাঙ্গনের (home-front) যোদ্ধা, আবার জীবপালয়িত্রী ধাত্রী। এমন কন্যার জননী ত ভাগ্যবতী। কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েরা কি দুর্দ্দিনে এমন [illegible] দেশকে সাহায্য করতে পারবেন? দেশকে সা[illegible] করা দূরে থাক, নিজেদের রক্ষা করতেও তারা অক্ষম। আমরা দেখ্‌তেই ত পাচ্ছি, বাংলাদেশে নারীর উপর অত্যাচার, নারীহরণ ইত্যাদির কথা প্রত্যহ কাগজে বেরোয়। সীমান্ত প্রদেশেও কত নারীকে হরণ করে' নিয়ে যাচ্ছে। এই সব মেয়েদের পুরুষ আত্মীয়রাও তাদের রক্ষা করতে পারছেন না। এমন দিনে মেয়েরা যদি স্বাস্থ্য, শক্তি ও সাহসকে সমুন্নত না করেন, তবে তাঁদের ভবিষ্যৎ কেবল অপমানের বোঝামাত্র হবে। বাংলাদেশে কথায় বলে 'মেয়েরা কুড়ি পেরোলেই বুড়ী।' প্রকৃতি শৈশবে বেঁচে থাকবার জন্য শিশুর শরীর মনে যে জীবনীশক্তির সঞ্চার করে' দেন, বাঙালী মেয়ে শৈশব অতিক্রম করতে না করতে সে পুঁজি শেষ করে' ফেলে। তার পরের জীবনের ইতিহাস কেবল ছোট-বড় রোগের ইতিহাস। সন্তানদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের রোগের তালিকা আয়ও বেড়ে চলে। সেই সব অজীর্ণরোগগ্রস্তা ক্ষীণজীবিনী স্বল্পায়ু: মেয়েদের কাছে আমরা কি আশা করতে পারি? যারা নিজেদের কোনও রকমে বাঁচিয়ে রাখ্‌তেও পারে না, আত্মরক্ষা দেশরক্ষা তাদের কাছে কে দাবী করবে? পলায়মান স্বাস্থ্যের পিছনে ছুটবার ক্ষমতা তাদের নাই, দেশী বিলাতী অঙ্গরাগে কোনরকমে নিজেদের শ্রীহীনতার লজ্জা ঢাকবার চেষ্টাটুকু মাত্র আছে।

অথচ আমরা জানি, এই পৃথিবীব্যাপী প্রলয়ের দিনে, এই দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা ও অরাজকতার দিনে, মেয়েদের বহু কঠিন পরীক্ষাকে সম্মুখীন হ'তে হবে বার বার। শক্তিসঞ্চয়ই সে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হবার একমাত্র উপায়। দেহ-মনে যার শক্তি নেই, সে তলিয়ে যাবেই। কাজেই শিশুকন্যার জন্ম হতে তার স্বাস্থ্য, শক্তি ও বুদ্ধি-বৃত্তির চর্চ্চা করতে হবে। এদিকে সে শুধু নিজেকে অর্থাৎ স্ত্রীজাতিকে বাঁচাবে না, সমগ্র দেশকে বাঁচাবে। কারণ মায়ের কাছে সন্তান যতখানি শেখে, ততখানি আর কারও কাছে শেখে না। এই মেয়েদের হাতেই সমস্ত ভবিষ্যৎ জাতির ভার। শক্তিমতীর পুত্রই শক্তিমান হবার আশা করতে পারে। আজকাল ভদ্রঘরের মেয়েরা [illegible]স কলেজে পড়ছে, কাজেই বিদ্যালয়ের হাতে মেয়েদের তৈরী করার ভার অনেকখানিই এসে পড়েছে। এই কিশোর বয়স বয়ঃসন্ধির বয়স, এসময়ে মেয়েদের যে পরিমাণ যত্নের প্রয়োজন, এই সময়ে তাদের দেহ মনকে যেমন ওজন করে' পুষ্টি দেওয়া দরকার, আমাদের দেশে কেহই প্রায় তা' করে না বলা যায়। হয়ত রাত্রি জেগে পড়বার ও লেখবার প্রচুর ফরমাস আছে, কিন্তু পুষ্টিকর খা[illegible]

সারাদিনে একবারও মেলে না, উন্মুক্ত আলো বাতাসে প্রাণ খুলে খেলা করবার সময় সুযোগ ও ব্যবস্থা নেই, ব্যায়াম বলে' কোনও জিনিষই নেই। অথবা নাম রক্ষা করার মত একটু কিছু আছে, যাতে ফল প্রায় কিছুই হয় না। সারাদিনের পাঠাভ্যাসে শ্রান্ত মেয়েদের হয়ত বিশ্রামের আগেই বলা হয়—এখন ব্যায়াম করতে হবে। এতে হয় হিতে বিপরীত।

জাপানের মত আমাদের দেশের প্রত্যেক স্কুলে মেয়েদের একবার করে' পুষ্টিকর খাদ্য দেবার ব্যবস্থা থাকা উচিত। মেয়েদের আহার্য্যের প্রতি একেই মেয়েদের দৃষ্টি কম, তার উপর গরীব গৃহস্থ ঘরে পয়সারও অভাব। সুতরাং স্কুলে অন্ততঃ পুত্রকন্যা ও ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলের একবার প্রয়োজনমত আহার্য্য পাওয়া উচিত। তাতে বিদ্যালয় মেয়েদের শুধু মন গড়বে না, মনের ভিত্তিস্বরূপ শরীরও গড়বে। অনেকে বলবেন—এত অর্থ কোথায় বিদ্যালয়ের? অর্থ-সংগ্রহ করতে হবে। আমাদের দেশের দরিদ্রনারায়ণের সেবা ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের লোভে মানুষ পথের কাঙালীদের ডেকে ভোজ খাওয়ায়, পাল-পার্ব্বণে যাকে কত দানধ্যান করে। কিন্তু বালগোপালের সেবা কি সেবা নয়? মুসলমান পাড়াতে দেখেছি, প্রতি শুক্রবারে ভিখারীর দলে রাস্তা ছেয়ে যায়। সেদিন তারা বাড়ী-বাড়ী ভিক্ষা পায়। ভিক্ষা এদের উপার্জ্জনের পথ, এদের তাতে লজ্জা নেই, লাভবান্ ব্যবসা হিসাবে এরা তা' গ্রহণ করেছে। হিন্দু-মুসলমান সকলেই যে সব ভিখারীদের দান করে পুণ্য লাভ করেন, তারা ব্যবসাদার ভিখারী। তার চেয়ে পুণ্য অনেক বেশী লাভ হয় বিদ্যালয়ে দরিদ্র গৃহস্থের ছেলেমেয়েদের ধনীরা যদি পালা করে' খাদ্য ও দুগ্ধ দান করেন। জাপানে একটি স্কুলে এই আহার্য্য দেখেছি—স্কুলের মেয়েরা এবং মেয়েদের মায়েরা পালা করে' সেখানে রন্ধন করেন। এদেশেও সেই প্রথামত চললে, রাঁধুনীর খরচ বেঁচে যায় ও খাবারগুলি নির্দ্দোষ হয়।

তার উপরে চাই প্রত্যেক মাসে প্রত্যেক ছেলেমেয়ের স্বাস্থ্যপরীক্ষা। এখানেও ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের দিকে বেশী সজাগ দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন আছে। মেয়েরা তাদের স্বাস্থ্যের কথা যতখানি লুকিয়ে রাখে, ছেলেরা তা' রাখে না। মেয়েরা কিশোর বয়সে যত রকম ছোট-বড় রোগ জোটায়, ছেলেরা তা' জোটায় না। আমাদের দেশের চিকিৎসকেরা ধনী। তাঁরা ইচ্ছা করলে, বিনামূল্যে মাসে একবার প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে' যেতে পারেন। এতে বাড়ী-বাড়ী ঘুরে দেখবার সময় নষ্ট হয় না, একদিনেই অনেক কাজ হয়ে যায়।

শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা বেশী শীঘ্র শ্রান্ত হয়। কাজেই পরিশ্রমের মাঝে মাঝে তাদের বিশ্রামের প্রয়োজন বেশী। শরীরে শক্তি ও মনে সাহস জাগাবার জন্য অনেক বিদ্যালয়ে মেয়েদের লাঠিখেলা, ছুরিখেলা ইত্যাদি শেখানো হয়। এই নিয়মগুলি সমস্ত বালিকা বিদ্যালয়েই থাকা দরকার। এর উপর ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা দিলে, আত্মরক্ষার আর একটা উপায় বাড়ে। কিন্তু এইসব ব্যায়ামই বিশ্রামের পর শেখা দরকার। সেই জন্য প্রয়োজন হলে, মেয়েদের শিক্ষণীয় বিষয় একটু কমিয়ে দেওয়াই ভাল। কিন্তু আধুনিক যুগে ঘরে বাইরে সর্ব্বত্রই মেয়েদের কাজ থাকতে পারে বলে' ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের শিক্ষণীয় বিষয় বেশী হয়ে যায়। এর উপর আছে মনোরঞ্জিনী বিদ্যা।

বালিকাবিদ্যালয়ে গান সেলাই, রন্ধন, গৃহিণীপনা ইত্যাদি কতকগুলি অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয় আছে, যা' বালকদের বিদ্যালয়ে নেই। মেয়েদের জীবনে এগুলির প্রয়োজন কেউ অস্বীকার করবে না; কিন্তু দেখতে হবে শিক্ষণীয় বিষয় মোটের উপর বালকদের চেয়ে বালিকাদের বেশী হয়ে পড়ছে কি না। আর দেখতে হবে বিদ্যালয়ে ও গৃহে বিশ্রামের সময় ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের বেশী কি না। গৃহস্থ ঘরের মেয়েরা বিশ্রাম কম পায়, কারণ অনেক পরিবারেই স্কুলে যাবার আগে এবং ফিরে এসে এদের অনেক গৃহকর্ম্ম করতে হয়। বালিকাবয়সে ছোট ছোট ভাইবোনদের পরিচর্য্যায় ও রন্ধনাদি কাজে মায়ের সাহায্য না করে, গৃহস্থ ঘরে এমন মেয়ে কম আছে। এরা যদি স্কুলে ও ঘরে না খেটে কারখানায় খাটত, তা' হলে শিশুদের প্রতি অত্যাচারের অপরাধে কারখানার মালিকের শাস্তি হয়ে যেত।

দেখা যাচ্ছে মেয়েদের মানুষ করে' তোলার সমস্যা বেশ

বড় সমস্যা। তাদের স্বাস্থ্যবতী হতে হবে সুসন্তানের জননী ও পালয়িত্রী হবার জন্য। তাদের শক্তিমতী হতে হবে এই নারীহরণের যুগে আত্মরক্ষার জন্য এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামার দিনে গৃহরক্ষার জন্য, তাদের গৃহকর্ম্মনিপুণা ও পরিশ্রমী হতে হবে সংসারের হাল ধরবার জন্য, তাদের চারুকলা শিক্ষা করতে হবে আত্মীয় অনাত্মীয়কে অবসরকালে আনন্দ দেবার জন্য, তাদের বুদ্ধিবৃত্তির চর্চ্চা করতে হবে প্রকৃত মানুষ হবার জন্য এবং মানুষ গড়বার জন্য। তদুপরি আরো একটা বিদ্যা প্রত্যেক মেয়েকে শিখতে হবে, সেটা হচ্ছে কোনও অর্থকরী বিদ্যা। আজকাল একান্নবর্ত্তী পরিবারের যুগ উঠে যাচ্ছে এবং ছেলেমেয়েদের বিবাহের বয়স বেড়ে যাচ্ছে নানা কারণে। বৈধব্যসমস্যা ত এ ক্ষেত্রে কঠিনতর হচ্ছেই, তদুপরি আসছে কুমারীসমস্যা ও স্বামিপরিত্যক্তাদের সমস্যা। বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার মেয়েদের হলে অনেক মেয়ে অত্যাচারী ও অমানুষ স্বামীর আশ্রয় ছেড়ে দিতে পারে। কিন্তু এই অন্নসমস্যার দিনে এই সমস্ত মেয়েদের এবং তাদের পোষ্যদের অন্ন ত জোটাতে হবে। গরীবের ঘরে বয়স্থা কুমারী মেয়ের পিতা মাতার বোঝা না হয়ে পিতামাতার সহায় হওয়া প্রয়োজনীয়। বিবাহিতা মেয়েরও অনেক সময়ে আত্মসম্মান রক্ষার জন্য, এমন কি অনেক সময়ে জীবধর্ম্মের নানা প্রয়োজন মেটাবার জন্য নিজস্ব অর্থের প্রয়োজন হয়। এই সমস্তের জন্যই অর্থকরী বিদ্যা মেয়েদের কিছু শিখা দরকার। তা'ছাড়া অর্থেই স্বাধীন চিন্তার শক্তি বাড়ে। যে পরান্নজীবী, সে স্বাধীন চিন্তা করতে সাহস করে না। সব কাজ সকলেই পারে না। যার শক্তিসামর্থ্যে যা' কুলায়, তার তাই করা ভাল। নানা রকম কুটীরশিল্প মেয়েদের আজকাল শেখানো হয়। তার উপর আরও কতকগুলি কাজ যোগ করা দরকার। কেহ কেহ সেগুলিও শিখে অর্থ আনতে পারেন। টাইপরাইটিং, ডিস্পেনসারীর ঔষধ তৈয়ারী, কাগজের ছাঁট দিয়ে নূতন কাগজ তৈরী, সৌখীন কাপড়ের ছাতা সেলাই, বই বাঁধাই, রং ও বার্ণিশের কাজ ইত্যাদি অনেক এমন কাজ আছে, যা' মেয়েরা বিশেষ করেন না, অথচ মনে হয় মেয়েরা বেশ সাবধানতার সঙ্গে করলে কাজ আরও ভালই হবে। এই সব কাজে কলকারখানার দরকার নেই, ছোট একটু জায়গা পেলে, ঘরের একটু বারান্দা ঘিরে নিলেও করা যায়।

কি গৃহে, কি বিদ্যালয়ে, কি সংসারে, কি আশ্রমে সর্ব্বত্রই মানুষের সার্ব্বাঙ্গীন উন্নতিই প্রকৃত উন্নতি। শুধু স্বাস্থ্য, শুধু শক্তি, শুধু বিদ্যা, কি শুধু অর্থ আমাদের মুক্তি এনে দেবে না। সবগুলিকে একত্র আয়ত্ত করতে পারলেই আমাদের মুক্তি, পুরুষেরও এবং স্ত্রীলোকেরও। স্থিরচিত্তে ভেবে সব দিক ওজন করে' সেই সার্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথে যাতে আমরা দ্রুত অগ্রসর হতে পারি, সে সম্বন্ধে জাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বিশেষভাবে অবহিত হওয়া আজকের দিনে সবচেয়ে বাঞ্ছনীয়।

"মনে আজ শুনছি যেন ভুল করেছি"

—শ্রীবর্ধমান—

তোমারে অর্ঘ্য দেবার দিন এসেছে,
অর্ঘ্য আজি দিব।
ধরণীর সবার মতই হয়ে নত
চরণধূলি নিব।
একা যা' পাইনি খুঁজে, পাইনি বুঝে
অন্ধকারে দিবসরাতি একলা যুঝে
তাহারি সন্ধানে আজ শরণ তোমার নিব।

একা ত' অনেক হ'ল চলা
বহু সে আঁধার পারাবার।
বিফলে কাট্‌ল' শুধু বেলা
হৃদয়ের নাম্‌ল না ত' ভার।
মনে আজ শুনছি, যেন ভুল করেছি
আজি তাই একলা চলার পণ ধরেছি;
মন্ত্রে তোমার ঘুচে যাবে সকল অন্ধকার।

ব্রহ্মসূত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

(দ্বিতীয় পাদ)

শ্রীমতিলাল রায়

সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ ॥১৮॥

সমুদায় (বাহ্য পরমাণুর দ্বারা নিষ্পন্ন বহিঃ-প্রপঞ্চ ও ...ত্তমূলক অন্তঃ-প্রপঞ্চ) উভয়হেতুকেঽপি (এই উভয় প্রকারের মিলন কল্পনা করিলেও) তৎ (তাদৃশ সকল ...ই) অপ্রাপ্তিঃ (অনুপপন্ন হয়)।

অর্থাৎ বৌদ্ধেরা বলেন—ভূত ও ভৌতিক, চিত্ত ও ...ত্ত, এই দুই প্রকার মিলনে সৃষ্টি হইয়াছে। ব্যাসদেব ...তেছেন—ইহাও সঙ্গত নহে। বৈশেষিকের মত খণ্ডন ...রিয়া বৌদ্ধমতখণ্ডনের জন্য এই সূত্রের অবতারণা করা ...য়াছে। বৌদ্ধেরা প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ... শ্রেণীর বৌদ্ধ সর্বাস্তিত্ববাদী। অন্য এক সম্প্রদায় ...নাস্তিত্ববাদী। অন্য এক শ্রেণীর বৌদ্ধ সর্বশূন্যবাদী। ...ম শ্রেণীর বৌদ্ধেরা বাহ্য ও আন্তর পদার্থের অস্তিত্ব ...র করেন। বাহিরে ভূত ও ভৌতিক সৃষ্টি। চিত্ত ...চত্তসৃষ্টি অন্তরে। ইহার প্রতিবাদ করিয়া দ্বিতীয় দল ... বলেন—বাহিরের সৃষ্টি কিছুই নহে। অন্তরের ...নই বাহ্যরূপে প্রতীত হয়। তৃতীয় শ্রেণীর বৌদ্ধ ...ন—অন্তরের বিজ্ঞান বস্তুতঃ সৎ নহে। ১৮ সূত্রে ... শ্রেণীর বৌদ্ধদের মত খণ্ডন করা হইয়াছে। ইহারা ...—পার্থিব, তৈজস, জলীয় ও বায়বীয়, এই পরমাণুগুলি ...পঞ্চ। রূপ-রসাদি গুণ এবং ইহাদের গ্রাহক ...দি ইন্দ্রিয় ভৌতিক। পরমাণু সকল সংঘাত প্রা... পৃথিব্যাদি সৃষ্টি করিয়াছে। আর রূপ, বিজ্ঞান, ..., সংজ্ঞা ও সংস্কার, এই পাঁচ স্কন্দ আধ্যাত্ম। এইগুলি ... হইয়া অণুর ব্যবহার নিষ্পন্ন করিতেছে। 'বৌদ্ধদের ...ই প্রকার সমুদয়, একটী ভৌতিক সংজ্ঞা আর একটী ...-সংজ্ঞা, এই দুই অপ্রামাণ্য। রূপাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ...'আমি' এই বোধের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ বিজ্ঞান। সুখ-...র অনুভব বেদনা। গো-মনুষ্য প্রভৃতি নামীদের জ্ঞান বিশেষ সংজ্ঞা। রাগদ্বেষাদি ধর্মাধর্ম সংস্কার। এইগুলি বৌদ্ধমতে বিজ্ঞান স্কন্দ। এইগুলিকেই চিত্ত বলা হইয়াছে। ভৌতিক পদার্থচতুষ্টয় চৈত্ত নামে খ্যাত। বৌদ্ধেরা বলেন—এই সমুদায়ের মিলনে সৃষ্টি এবং সৃষ্টিকর্ম পরিচালিত হইতেছে। কথা হইতেছে, চিত্ত ও চৈত্ত, দুইই অচেতন পদার্থ। পরমাণু ও পঞ্চ স্কন্ধের অধ্যক্ষের কথা বৌদ্ধবাদে স্বীকৃত হয় নাই। অচেতন বস্তুর স্বতঃই ক্রিয়া-প্রবৃত্তি যদি স্বীকার করিয়াই লওয়া হয়, তবে তাহার অবিশ্রান্ত সৃষ্টিপ্রবাহই চলিবে। বৌদ্ধবাদে যে বিজ্ঞান-প্রবাহের কথা উক্ত হয়, উহা কি এক, না ভিন্ন ভিন্ন স্রোতের সমষ্টি? যদি ভিন্ন বলা হয়, তাহা হইলে তাহার প্রমাণ দিতে হইবে; সে প্রমাণ বৌদ্ধ শাস্ত্রে নাই। যদি অভিন্ন প্রবাহ বলা হয়, তাহা হইলে তাহা ক্ষণিক হইল না। ক্ষণিক জন্মিয়াই শেষ হয়, কোনরূপ প্রবৃত্তিপ্রকাশের অবকাশ থাকে না। এই সকল কারণে এই মতবাদ অসিদ্ধ প্রমাণিত হইতেছে।

ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতিচেন্নোৎপত্তিমাত্র-নিমিত্তত্বাৎ ॥১৯॥

ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাৎ (পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কারণভাব প্রযুক্ত হওয়ায়) ইতি চেৎ (সংঘাত আপনা হইতেই সম্পন্ন হইতেছে, এইরূপ যদি বলি) ন (এইরূপ ... পার না) [কুতঃ?] উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ ...হেতু উৎপত্তি পক্ষে অবিদ্যা প্রভৃতি পরস্পর পরস্পরের কারণ হইতে পারে)।

অর্থাৎ অবিদ্যাদির মধ্যে পরস্পর কার্য্য-কারণ ভাব থাকা হেতু লোকযাত্রা উৎপন্ন হইতে পারে। ইহার জন্য ভোক্তা, নিয়ন্তা, আত্মা, ঈশ্বর কিছুরই প্রয়োজন হয় না; বৌদ্ধরা যে অবিদ্যাদি হইতে সৃষ্টি-প্রকরণের কথা বলেন, তাহা হইতেছে—অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে

বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তন প্রভৃতি। এই সকল পরস্পর পরস্পরের দ্বারা উৎপন্ন হয়, এ কথা স্বীকার করা যায়; কিন্তু পরস্পর পরস্পরের উৎপত্তি-কারণ হইলেও, সংঘাতের কারণ হয় না। অবিদ্যাদিতে সংঘাতজনক কারণ বৌদ্ধমতে নাই। প্রথম অবিদ্যা, তারপর সংস্কার, তারপর বিজ্ঞান—এইরূপ একটী অপরটীর উৎপত্তির কারণ হইতে পারে; কিন্তু এইগুলিকে সংহত করে, একত্র করে, এরূপ কারণ অবিদ্যাদিতে নাই। ক্ষণিক-ধ্বংসিতাই ইহার প্রতিবন্ধক হইতেছে। ভোগের নিমিত্তই দেহাদি। কিন্তু ইহার ভোক্তা যে জীব, সে ক্ষণবিধ্বংসী। এই অবস্থায় অবিদ্যা হইতে পর পর পদার্থের উৎপত্তি-হেতু হইলেও, স্থায়ী ভোক্তার অভাবে সংঘাত উৎপন্ন হইতে পারে না। বৌদ্ধেরা বলেন—পরবর্ত্তী ক্ষণ জন্মিলেই পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষণ বিনষ্ট হয়; প্রকারান্তরে ইহাই বলা হয় যে, পরক্ষণ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেই পূর্ব্বক্ষণ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্ব ক্ষণের অস্তিত্ব পরক্ষণ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইলে, পূর্ব্বক্ষণের আয়ুঃ দুই ক্ষণ স্বীকার করিতে হয়; ইহাতে ক্ষণভঙ্গবাদ দোষ জন্মে। বৌদ্ধ মতে, কোন বস্তু এক ক্ষণের বেশী থাকে না। এই জন্যই বলা হইতেছে যে, অবিদ্যাদি পরস্পর পরস্পরের উৎপত্তির কারণ হইলেও, এই অবিদ্যাদি কারণ-সংঘাত অর্থাৎ দেহাদির সৃষ্টি সিদ্ধ হয় না।

উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ ॥২০॥

উত্তরোৎপাদে (সংস্কারাদির উৎপত্তিকালে) পূর্ব্ব-নিরোধাৎ (পূর্ব্বক্ষণ বিনষ্ট হইয়া যায়) অর্থাৎ পরবর্ত্তী ক্ষণের উৎপত্তি পূর্ব্বে, পূর্ব্বক্ষণ বিনষ্ট হইয়া যায়, এইরূপ হইলে সৃষ্টির ভিত্তি মিলে না। কারণ তৎসদৃশ কার্য্য [illegible] করে। যেমন ঘটের কারণ মৃত্তিকা। ঘটোৎপত্তি [illegible] না হইতে কারণ যদি বিনষ্ট হয়, তবে ঘটের অস্তিত্ব [illegible] প্রকারে থাকিবে? ক্ষণিকবাদ এই হেতু সৃষ্টিপক্ষে অসঙ্গত।

অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যৌগপদ্যমন্যথা ॥২১॥

অসমতি (কর্ম্মোৎপত্তিকালে কারণভূত পূর্ব্ব ক্ষণ বিদ্যমান থাকে না) প্রতিজ্ঞোপরোধো (ইহাতে প্রতিজ্ঞা-হানি হইয়া যায়। কেননা, কার্য্যোৎপত্তি নির্হেতু হইয়া পড়ে) অন্যথা (পক্ষান্তরে) যোগপদ্যম্ (বলিতে হইবে কারণ কার্য্যের উৎপত্তি-ক্ষণেও বিদ্যমান থাকে)।

অর্থাৎ উৎপত্তিকালে কারণবস্তু না থাকিলেও কার্য্য হয়, এইরূপ বলিলে বৌদ্ধদের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইয়া যায়। তাঁহারা বলেন "চতুর্ব্বিধান্ হেতূন্ প্রতীত্যচিত্ত-চৈত্তা উৎপদ্যন্তে"—চারি প্রকার হেতুর দ্বারা চিত্তচৈত্ত জন্মে; এই প্রতিজ্ঞা বিনা কারণে কার্য্যসৃষ্টি বলিলে নষ্ট হইয়া যায়। আর যদি বলা হয় যে, কারণ-বস্তু থাকে, তাহা হইলেও "ক্ষণিকাঃ সর্ব্বে ভাবাঃ" সমস্তই ক্ষণিক এ প্রতিজ্ঞাও থাকে না। সৃষ্টি-স্থিতি মানিলে কার্য্য-কারণের যৌগপদ্য অর্থাৎ সহাবস্থান মানিতে হয়। বৌদ্ধমতের অসঙ্গতি আরও আছে।

প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তে-রবিচ্ছেদাৎ ॥২২॥

অবিচ্ছেদাৎ (বৌদ্ধমতে প্রবাহের বিচ্ছেদ অসম্ভব হওয়া হেতু) প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তে (প্রতিসংখ্যা নিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যা নিরোধ, দুই অসম্ভব হয়)।

বৌদ্ধেরা বলেন—প্রতিসংখ্যা নিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যা নিরোধ এবং আকাশ, এই তিনটী ব্যতীত আর সব উৎপাদ্য অর্থাৎ ক্ষণিক এবং প্রমেয়। নিরোধ অভাবে বুঝায় অর্থাৎ বস্তুর অনবস্থান। ইহার অন্য নাম বিনাশ। বুদ্ধিপূর্ব্বক বিনষ্টির নাম প্রতিসংখ্যানিরোধ, আর অবুদ্ধিপূর্ব্বক বিনাশের নামই অপ্রতিসংখ্যানিরোধ। আকাশ আবরণের অভাব। আমরা এই সূত্রে দুইটী নিরোধের আলোচনা করিব।

বৈনাশিক অর্থাৎ বৌদ্ধেরা বলেন—সন্তানের বিচ্ছেদ নাই। সন্তান অর্থে প্রবাহ। তরঙ্গের স্রোতঃ চলিয়াছে একটী সৃষ্টি করিয়া পূর্ব্ব তরঙ্গটী লয় পাইয়া যাইতেছে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ ইহার দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইতেছে না— হেতু বলা যায় যে, প্রবাহের বিচ্ছেদ হয় না। এখন বৈনাশিকদিগের যে নিরোধ-তত্ত্ব, এই নিরোধ কাহার প্রবাহের? না প্রবাহের অন্তর্গত পদার্থের? বৈনাশিক

াযায় সন্তান না সন্তানীর ? ভাবের না বস্তুর ? প্রবাহের য বিচ্ছেদ নাই, ইহার অর্থ কি তরঙ্গের বিচ্ছেদ আছে, না লের বিচ্ছেদ আছে ? যেমন একটী তরঙ্গ অন্য তরঙ্গ সৃষ্টি রিয়া লয় পাইলে উদ্ভূত তরঙ্গটী আর একটী তরঙ্গ সৃষ্টি রিয়া নষ্ট হয়, তেমনি একটী ভাবের পর অন্য ভাব, আবার স ভাবটী হইতে অন্য ভাবের সৃষ্টি ; এমনই অনন্ত কাল ন্ম-বিনাশের স্রোতঃ চলিয়াছে। অবিদ্যা সংস্কার জন্মায়। ংস্কার বিজ্ঞানের জন্ম দেয়। কারণ ও কার্য্যের স্রোতঃ ইরূপে অবিরাম চলে। অতএব নিরোধ বা বিশ্রাম কিছুর হইতে পারে না। বস্তুর রূপান্তর বিনাশে নহে, ্রত্যভিজ্ঞার দ্বারা আমরা এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুর বিজ্ঞান জানিতে পারি বলিয়াই নিঃসংশয়ে বলিতে পারি পূর্ব্বে অমুক বস্তু অমুক প্রবাহের ছিল, এক্ষণে এইরূপ ইয়াছে। ইহার দ্বারা বস্তু যে বিনাশী নহে, ইহা প্রমাণিত । কোন কোন ক্ষেত্রে অস্পষ্ট প্রত্যভিজ্ঞা বশতঃ র বিচ্ছেদ অনুভূত হয়। "ক্বচিৎ দৃষ্টেনব্যবিচ্ছেদেনান্ত-পি তদনুমানাৎ"—বীজ হইতে অঙ্কুর হয়, অঙ্কুর হইতে হয়, এইরূপ অবস্থায় স্পষ্ট প্রত্যভিজ্ঞা থাকে না। ন উপরোক্ত ক্বচিৎ দৃষ্ট অন্বয়ের বিচ্ছেদের অভাব হেতু র অবিচ্ছেদ অনুমিত হয়। বৌদ্ধেরা যে স্বরূপশূন্য অর্থাৎ অবিদ্যার নিরোধে শূন্যত্বপ্রাপ্তির কথা বলেন, সংখ্যা অপ্রতিসংখ্যাও সেই অবিদ্যাবস্তুর অন্তর্গত। এব উক্ত দ্বিবিধ নিরোধ অযুক্ত হইল।

উভয়থা চ দোষাৎ ॥২৩

উভয়থা চ (প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যা-রোধ) দোষাৎ (দোষযুক্ত হওয়া হেতু সৌগত মত সাধু)।

বৌদ্ধেরা বলিবেন—অবিদ্যার অভাব হইলে, শূন্যত্ব-ভাবী। অভাব অর্থে নিরোধ। প্রতিসংখ্যা অপ্রতিসংখ্য অবিদ্যারই অন্তর্ব্বর্ত্তী। ভাল কথা। ্যার অভাব হেতু কিছুর কি আপেক্ষিকতা আছে ? অথবা নিরোধের অভাব স্বতঃই হয়। যদি ইহাতে জ্ঞানের অপেক্ষা থাকে, তাহা হইলে সমুদয় পদার্থ ক্ষণবিধ্বংসী—সৌগত মতের এই প্রতিজ্ঞার ভঙ্গ হইবে। আর যদি স্বতঃই নিরোধ হয়, তবে আবার প্রতিসংখ্যানিরোধের উপদেশ কেন ? মতের অসামঞ্জস্য হেতু উভয় পক্ষই দোষযুক্ত হয়।

আকাশে চাবিশেষাৎ ॥২৪॥

আকাশে চ (আকাশ ও) অবিশেষাৎ (অভাবরূপী অবস্তু, এই হেতু বৌদ্ধ মতের এই যুক্তিও ন্যায্য নহে)

কেন, তাহা বলিতেছি। বৌদ্ধেরা আকাশ কিছুই নহে, বলেন। প্রতিসংখ্যাদি নিরোধ যেমন বস্তু বলিয়া গণ্য হয়, বৈদিক মতে আকাশও তদ্রূপ বস্তু বলিয়া গণ্য হইবে। সৌগতেরা অপৌরুষেয়শ্রুতিসিদ্ধ মত্ত অসিদ্ধ করিতে চাহে। শ্রুতি বলিতেছেন "আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ"; আত্মা হইতে আকাশ জন্মিয়াছে। শ্রুতিবিশ্বাসী যাঁহারা নহেন, তাঁহাদের অনুমানপ্রমাণের দ্বারা আকাশের বস্তুসত্তা স্বীকার করিতে হইবে। আকাশ ভূতাদির অন্তর্গত ও গুণাদিসম্পন্ন। আকাশের শব্দগুণ অবশ্য স্বীকার্য্য। গুণের আশ্রয় যাহা, তাহা অবস্তু নহে, পরন্তু বস্তু। বৈশেষিকের শাস্ত্রে এইরূপ আছে, 'পৃথিবী ভগবন্ কিং-সন্নিঃশ্রয়া'; 'হে ভগবন্! পৃথিবীর আশ্রয় কি ?' এই রূপ প্রশ্ন-প্রবাহের শেষে আছে—'বায়ুঃ কিং-সন্নিঃশ্রয়ঃ' অর্থাৎ 'বায়ু কিসের আশ্রয় ?' উত্তরে বলা হইয়াছে 'বায়ু-রাকাশসন্নিঃশ্রয়ঃ' অর্থাৎ 'বায়ুর আকাশই আশ্রয়।' এইরূপ হইলে, আকাশ নিরপেক্ষ হয় কি প্রকারে ? আকাশকুসুম অবস্তু, তাহা কি কিছুর আশ্রয় হইতে পারে ? যাহা বস্তু নহে, তাহা কিছুই নহে। বায়ুর আশ্রয় আকাশ বলায়, বৌদ্ধমতেও বায়ু নিরপেক্ষ হইল না। ...ব বৌদ্ধেরা যে দ্বিবিধ নিরোধ ও আকাশকে অনুৎ-... বলিয়াছিলেন, অবস্তু বলিয়াছিলেন, তাহা নিরসন করা হইল।

(ক্রমশঃ)

সন্তরণ-প্রতিযোগিতার অব্যবহিত পূর্ব্বমুহূর্ত্তে : বাম হইতে চতুর্থ শ্রীবাণী বসু

সন্তরণে আমার অভিজ্ঞতা

শ্রীবাণী বসু (ঘোষ)

২

১৯৩৬ সালের ২৫শে অক্টোবর আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। কেন—সেই কথাটাই এখানে বলবো।

একটা উত্তেজনার মুহূর্ত্তে সমুদ্রে সুলিয়াদের সহিত সন্তরণপ্রতিযোগিতার আহ্বান তো স্বীকার করে' নিলুম, কিন্তু এক রাত্রির ঘুমের পর মনের সে উষ্ণতা অনেকখানি থিতিয়ে এল। ভোরের আলো ফুটতেই দুশ্চিন্তার ঘন কালো মেঘ এসে আমার চিত্তাকাশ আচ্ছন্ন করে ফেললো। কি করা যায়, এই নিয়ে অনেক ভাবনা-চিন্তা, জল্পনা-কল্পনা চললো।

পুরীর নরেন্দ্রসরোবরে সন্তরণপটু বাছা বাছা নুলিয়াদের আমি হারিয়েছি এবং যে কোন স্থানের যে কোন পুকুরে তাদের আমি হারাতে পারি, এ আত্মবিশ্বাস আমার যথেষ্টই আছে। কিন্তু বঙ্গোপসাগর—[illegible] অক্টোবরের—যেমনি দুরন্ত দুর্দ্দান্ত, তেমনি বিপ[illegible] তাতে সাগর-সন্তরণে আমি অনভ্যস্ত, মনটা স্বভাবতঃই [illegible] যেতে লাগলো। দু'পাড়ের আবেষ্টনীবদ্ধ জলরাশি আমার খেলার সামগ্রী। সাত-পাঁচ এমনি কত দুর্ভাবনা!

অবশেষে বাবার সিদ্ধান্ত ও উৎসাহ আমায় তাতিয়ে তুললো। বাবা (শ্রীদেবেশচন্দ্র ঘোষ) বললেন, "বাণি, তোমায় প্রতিযোগিতায় নামতেই হবে। পিছনে হটা বাঙালী জাতির কলঙ্ক জাতির মুখ চেয়ে আমার এক মাত্র মেয়েকে আমি মরণের মুখে ছুঁড়ে দিচ্ছি।" আমার সন্তরণগুরু প্রফুল্ল ঘোষও এই কথায় সায় দিলেন।

মনটাকে জাতীয়তার সুরে বেঁধে নেবার চেষ্টা করতেই সারা অন্তর প্লাবিত করে' শক্তি অজস্রধারে ঢল দিয়ে নেমে এল। মনে হ'ল, সত্যিই তো, দেশ ও জাতির মুখ চেয়েই পুরীর রাজা নগণ্য নুলিয়াদের পরাজয় এত বড় করে' নিলেন। তুচ্ছ আমার একটি জীবন বাঙালীর মর্য্যাদারক্ষায় বঙ্গোপসাগরগর্ভে যদি তলিয়েও যায় তাতেই বা ক্ষতি কি। সবলের সে মরণেও সান্ত্বনা আছে। এই উত্তেজনার বশেই স্বাধীন জাতির যৌবন শক্তি সানন্দে অগ্নিগোলকের মুখে আজ নির্ব্বিচারে বুক বাড়িয়ে দিচ্ছে। সাঁতারের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম।

২৫শে অক্টোবর অপরাহ্ন ঠিক সাড়ে চারিটায় প্রতিযোগিতা সুরু হ'ল। দূরবিসারী সাগর-সৈকত লোকে লোকারণ্য। সারা পুরী সহর এবং দূর দূরান্তের দর্শক বেলাভূমে বহু পূর্ব্ব হতেই ভীড় জমিয়েছে।

প্রতিযোগিতার দ্বার সকলের জন্য মুক্ত হ'লেও, বিশেষ ভাবে নির্ব্বাচিত পাঁচ জন নুলিয়া মাত্র এই প্রতিযোগিতায়

যোগ দিল। স্বর্গদ্বার থেকে বি-এন-আর হোটেল কিনার ঘেঁষে মাইল তিনেক হবে। সমুদ্রের কিনারে সাঁতার কেটে এগুনো সম্ভব নয়, যেহেতু বড় বড় ঢেউ তা হলে আছড়ে সন্তরণকারীকে পাড়ে এনে ফেলবে। তাই স্থির হল, স্বর্গদ্বার হতে সোজা এক মাইল সমুদ্রের ভিতরে এগিয়ে গিয়ে তারপর পাড়ের সমান্তরাল আড়াআড়ি তিন মাইল সাঁতার কেটে বি-এন-আর হোটেলের সামনের এক মাইল দূরে পৌছে আবার সোজা এক মাইল কিনারের দিকে এসে হোটেল ঘাটের নির্দ্দিষ্ট পয়েন্ট-এ পৌছতে হবে। আধ মাইল ভিতরে সাধারণতঃ সমুদ্র অনেকটা শান্ত। কিনারের অগভীর জলে ঢেউয়ের তরঙ্গ উত্তাল হয় বেশী। আর একটা কথা এখানে মনে রাখতে হবে যে, কোন ডিঙ্গি নৌকা এই বিশাল ঢেউয়ের মধ্যে উপযোগী নয় বলেই আরম্ভ ও শেষ পয়েন্টের এক এক মাইল দূরে মোটা-সোটা কাঠের কুঁদো-একত্রিত-করা দু'খানা ভেলা মাতালের মতে দুলছিল।

কটকে প্রতিযোগিগণ: বাম হইতে দ্বিতীয় সুদর্শন পাহরাজ, তৃতীয় বাণী বোস, চতুর্থ যতীন মুখার্জ্জি

স্বর্গদ্বার থেকে পাঁচ জন নুলিয়া ও আমি এই ছয়টি প্রাণী ষ্টার্ট করলাম। সমুদ্র-সন্তরণে নিত্য অভ্যস্ত নুলিয়ারা একেবারে নিঃশঙ্ক ও নির্ভীক। সমুদ্রের ভিতর থেকে কিনারের দিকে আসতে সাধারণতঃ ঢেউয়ের আনুকূল্য মিলে, কিন্তু কিনার থেকে ভিতরের দিকে সাঁতার কাটতে এর ঠিক বিপরীত অবস্থা হয়। তাই ষ্টার্টেই তাল গাছের মত উঁচু উঁচু ঢেউয়ের প্রতিকূলতায় আমার তাল সামলানো দায় হয়ে উঠল। কিনারের মাটি চিত্তে ভরসা জাগায়। কূল-কিনারাহীন অসীম বারিধি-বিস্তার মনের উপর বিভীষিকার কালো ছায়া ফেলে যায়। কত অজানা আশঙ্কা। পারাপারহীন অতল সাগর গর্ভে কত অসহায়—কত অসমর্থ আমি! কিন্তু জিতবার জেদ সমগ্র চেতনাকে যেন সম্মোহিত করে ফেলেছে। আশে পাশে পাঁচজন নুলিয়া ছাড়া আর কেহ নেই। সত্যই এরাই তখন বন্ধু ও ভরসা। প্রতিযোগী হলেও এদের খুব আপনার মনে হতে লাগলো।

কিন্তু কতক্ষণ! এরা সকলেই আমাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চললো। অদ্ভুত তাদের ঢেউ কাটানোর কৌশল। জলের উপর ভেসে চললে ঢেউয়ের বেগে কিনারের দিকে পেছনে হটে আসতে হয়। প্রথমটা আমি একটু মুস্কিলেই পড়লাম। নুলিয়াদের কৌশলটা ভাল করে লক্ষ্য করলাম। দেখলাম, ঢেউয়ের ছন্দ এরা সুন্দর রক্ষা করে চলেছে। জলের মধ্যে ডুব সাঁতার কেটে নুলিয়ারা ঢেউগুলো অনায়াসে অতিক্রম করে চলেছে। এতে প্রচুর দম ও গায়ের শক্তি-প্রয়োগ দরকার। আমিও বুক সাঁতারে (breast stroke) তাদেরই রীতি অনুসরণ করলাম। পর্ব্বতপ্রমাণ এক একটা তরঙ্গ মাথার উপর ভূমিকম্পের মত ভেঙ্গে পড়তে লাগলো। সমুদ্রে কত চোরা-স্রোত (under current) আছে। অজানা আশঙ্কা থেকে থেকে চিত্তে জাগতে লাগলো। তবুও যখন সোজা এক মাইল দূরে গিয়ে পৌছলাম তখন দেখি আমার প্রতিযোগিরা অনেকটা এগিয়ে গেছে।

এখানে সমুদ্রের সে রুদ্রমূর্ত্তি নাই। অনেকটা শান্ত। পাড়ের জনতা অস্পষ্ট দেখা যায়। থেকে থেকে আবার ঢেউয়ের আবডালে মিলিয়ে যায়। দর্শকের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো দূরবীণ দিয়ে আমাদের লক্ষ্য করছে। কঠিন নিরাপদ মাটির উপর দাঁড়িয়ে দর্শকবৃন্দ কৌতুক উত্তেজনায়

উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। আর মরণের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে নিঃসঙ্গ একাকী আমার সাগরবুকের এ অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা অসাধারণ এবং অনমুভবনীয়।

আমরা প্রায় মাইলখানেক দূর দিয়ে পাড়ের সমান্তরাল সাঁতার কেটে চলেছি। এ অপেক্ষাকৃত শান্ত সমুদ্রে আমি আমার অভ্যস্ত শিক্ষা ও বিজ্ঞানসম্মত দূর সাঁতারের উপযোগী 'ফ্রি ষ্টাইল' (free style) ধরলাম। শোঁ শোঁ করে এগিয়ে চললাম। মাইলখানেকের মধ্যেই আমি একে একে চারজনকে অতিক্রম করলাম। একজনের সঙ্গে সমান তালে চলতে লাগলাম। এ যেন একদিকে সমান গতিসম্পন্ন দু'খানি রেলগাড়ী চলার মত। এগুচ্ছি কি পিছুচ্ছি কিছুই বুঝা যায় না। মনে হয় যেন এক জায়গায়ই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। হাত-পা কিন্তু সমানই চলছে। এলোপাথাড়ি সাঁতার দিলেও মুলিয়াটা নিছক গায়ের শক্তি ও দমের জোরে আমাকে কিছুতেই এগুতে দিলে না। কিন্তু লোকটি ত্রুটী (foul) করলে। অর্থাৎ ঠিক পয়েণ্টে না গিয়ে আড়কেটে কোণাকুণি হোটেলের ঘাট ধরলে। আমি একটু দ্বিধায় পড়লাম, কি করি? বিবেকে বাধলো। মনে হল যেন খেলোয়াড়ের (sportsman) মত নির্দ্দিষ্ট পয়েণ্ট ধরে চলাই শ্রেয়ঃ। ভাবলাম, অন্যায় (wrong) করলে বিচারকেরা আমাদের দু'জনকেই নাকচ করে দিতে পারে। তবুও হোটেল-ঘাটের শেষ পয়েণ্টএ আমি মাত্র একশো গজের ব্যবধানে দ্বিতীয় হলাম।

কিনারে পৌছেই আমি বিচারকদের নিকট আমার আপত্তি জানালাম। আরও অনেকেই এ বিষয়টি লক্ষ্য করে আপত্তি পেশ করলে। কিন্তু রাজার নির্ব্বাচিত বিচারক কোন কথা না শুনেই মুলিয়াকে প্রথম স্থান দিলে। কিন্তু আমার বিবেক এ বিচার সেদিনও যেমন মেনে নেয়নি, আজও তেমনি নেয় না। স্থানীয় বাঙালী অধিব পক্ষ থেকে আমায় একটি রৌপ্য-কাস্কেট উপহার দে হল। মিঃ এ, কে, মণ্ডল একটি স্বর্ণপদক ও হাইকোর্টে শ্রীযুক্ত দাশরথি দত্ত একটি রৌপ্য-পদক দিলেন। কিন্তু এতে আমি সান্ত্বনা পেলাম না। মরমে মরে গেলাম। কেবলই মনে হতে লাগলো, সমুদ্রের অতলে তলিয়ে গেলে বোধ হয় এর চেয়ে ছিল ভাল।

দিন দুই পরে আমরা উড়িষ্যার রাজধানী কটকে এলাম। এ দুঃখের, পরাজয়ের গ্লানি মুছবার জন্য শুধু পুরীর নয়, সমগ্র উড়িষ্যাবাসীকে চ্যালেঞ্জ করে একটি স্বর্ণ-পদক ঘোষণা করলাম। সহস্র সহস্র হ্যাণ্ডবিল এবং সমগ্র স্থানীয় সংবাদপত্রের মারফৎ ঘোষিত হ'ল:

An open Challenge for 5 mile Swimming Competition on Tuesday the 3rd. Nov. 1936 at Municipal Tank at 2-30 p. m. Award of a Gold Medal to any one who can beat Kumari Bani Ghose the favourite student of Sj. Prafulla Ghose, world Swimming Champion. Entrance free, Public are cordially invited.

এবার আমার অন্তরটা জয়ের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। দূর পাল্লার সাঁতারের জন্য স্থানীয় সাঁতারুরা ইচ্ছা প্রকাশ করলে, আমি এক থেকে দশ মাইল বা ততোধিক দূরত্ব স্থির করার ভার তাঁদের উপরই দিলাম। তাঁদেরই ইচ্ছাক্রমে স্থির হল পাঁচ মাইল। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর বি, এন, মিশ্র হলেন প্রধান বিচারক এবং বিশিষ্ট বাঙালী ও উড়িষ্যাবাসী মিলে অপর পাঁচ জন বিচারকের এক বোর্ডও গঠিত হল। প্রতিযোগী মোট ৮ জনের মধ্যে আমি বাদে আর এক জন স্থানীয় (domiciled বাঙালী তরুণও (শ্রীযতীন্দ্রমোহন মুখার্জ্জি) ছিলেন।

মিউনিসিপ্যাল ট্যাঙ্ক লম্বায় ১১০ গজ। অর্থাৎ ১৬ পাকে (round) এক মাইল এবং ৮০ পাকে পাঁচ মাইল পুরো হবে। একখানা প্রকাণ্ড বোর্ডে প্রতিযোগিদে পর পর নাম লেখা হল এবং প্রত্যেকের নামের পাশে প্রতি পাকের হিসেব ধরা হতে লাগলো।

যথাসময়ে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ষ্টার্ট দিলেন। আমি খুব শান্তভাবে সাঁতার সুরু করলাম। দীর্ঘ পথ—হাঁকপাঁক করেও লাভ নেই। সকল সাফল্যের গোড়ার কথাই এই ...ল আবেগহীন বিচার বুদ্ধি। এরই অভাবে দেখলাম ...০ বার (length) এপার-ওপার করার পরই জন কয়েক প্রতিযোগী নেতিয়ে পড়লো। আমি প্রথম এক ঘণ্টা একেবারে স্বাভাবিকভাবেই চললাম। ৫০ পাক যখন হয়েছে তখন মাত্র তিনজন বাকী আর পাঁচজনই খসে পড়েছে। তিন জনের মধ্যে আমি দ্বিতীয় চলেছি। আশ্চর্য্য, পাড়ের বাঙালী জনতা ইতিমধ্যেই বুক চাপড়ানো সুরু করেছে।

অজস্র প্রশংসা-অপ্রশংসা বাক্যে আমায় উৎসাহ দিতে লাগলো। বিদেশিনী এবং মেয়ে বলেই সম্ভবতঃ আমার উপর বাঙালী নারী-পুরুষের সহানুভূতি একটু বেশী।

কিন্তু এ তো সমুদ্র নয়। চার পাড়ের মৃণ্ময় আবেষ্টনী জলকেই বন্দী অসহায় করে তুলেছে। তার উপর দশ পনের হাজার জনতার কৌতূহলী দৃষ্টি সর্ব্বদার জন্য আমাদের সচকিত করে রেখেছে। নৃত্য-সঙ্গীতের মতই সাঁতারও ছন্দোবদ্ধ। বিজ্ঞানসম্মত সন্তরণ ব্যাপারে হাত-পা শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনা ঘড়ির কাঁটার ঐক্য ধরেই নিষ্পন্ন হয়। পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত সরলরেখার মতই জলের উপর সমান্তরাল ভেসে থাকার নিয়ম। মাথা জল ছাড়া থাকলে শরীরের উপর মস্তিষ্কের ভার পড়ে এবং এই ভার বহনের জন্য অনর্থক শক্তির অপচয় হয়। আমার প্রতিযোগিদের মধ্যে অনেককেই এই সব রীতির ব্যতিক্রম করতে দেখেই জয় সম্বন্ধে আমি অধিকতর সুনিশ্চিত হলাম।

আমার যখন ৫০ পাক তখন সুদর্শনবাবুর ৫২ পাক সম্পূর্ণ হল অর্থাৎ প্রায় ২২০ গজ তিনি এগিয়ে চলেছেন। যতীনবাবু তৃতীয় চলেছেন। এই সময় বাবা আমাকে পাড় থেকে একবার সতর্ক করে দিলেন। আমি আমার বারো আনা শক্তি প্রয়োগ করলাম। ৬৫ পাকের (round) সময়ে আমিও সুদর্শনবাবু পাশাপাশি সমান সমান চলতে লাগলাম। বেশ অনুভব করলাম সুদর্শন-বাবু প্রাণপণে সাঁতার কাটছেন। ৬৫ পাক পর্য্যন্ত এই অবস্থায়ই প্রায় চললো। উৎসাহকারী পাড়ের দর্শকগণের মধ্যে বিপুল চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। কলিকাতার ফুটবল খেলার মাঠের মত চাঞ্চল্য। সহস্র সহস্র মুখে আমার ও সুদর্শনবাবুর নাম উচ্চারিত হতে লাগলো। মুহুর্মুহু 'বন্দেমাতরম্' ও 'বাংলার জয়' ধ্বনি আমায় উৎসাহ দিতে... ধীরে অতি ধীরে এগুতে লাগলাম। দু'জনে এমন সমান তালে চলেছি যে সুদর্শনবাবুর শারীরিক দৈর্ঘ্যটুকুকে ব্যতিক্রম করতেই প্রায় তিন পাক লাগলো। এর পরে প্রতি পাকেই সুদর্শনবাবু ও আমার ব্যবধানের দৈর্ঘ্য বেড়ে যেতে লাগলো। পাড়ের উৎসাহকারী উড়িষ্যা-বাসীদের মাথায় যেন বজ্র ভেঙে পড়লো। সে করুণ মুখ চাপড়ানি আজও ভুলতে পারিনি।

৮০ পাক সম্পূর্ণ করে যখন আমি শেষ পয়েন্ট স্পর্শ করলাম তখন সুদর্শনবাবু আড়াই পাক অর্থাৎ প্রায় ২৫০ গজ পেছনে তখনও সাঁতার কাটছেন কিন্তু গতি যেন অনেকটা শ্লথ হয়ে এসেছে। মোটের উপর ৩ ঘণ্টা ৫ মিঃ সময় লাগলো। বিনা সাহায্যেই আমি সহজভাবে জল থেকে উঠে গিয়ে বিচারকের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

বিপুল জনতার সমবেত সানন্দ করতালি আমায় অভিনন্দন জানালে। শ্রীযুক্তা লীলা সেনগুপ্তা এসে আমায়

পুষ্পমাল্যে সজ্জিতা বিজয়িনী বাণী ঘোষ

জয়মাল্য পরিয়ে দিলেন। চারটি সোনার ও গোটা কুড়িক রৌপ্যপদক আমার ফ্যাকাসে সিক্ত অঙ্গ অলঙ্কৃত করলে।

তাই নয়, ভীড়ের মধ্য হতে আমাকে গৃহ-প্রাঙ্গণে নিয়ে গিয়ে মহিলারা এক সভা করলেন এবং পুষ্পমাল্যে ভূষণে তাঁদের ইচ্ছামত সাজিয়ে পরিতৃপ্ত হলেন। আমার পনের বছর বয়সের এই সামান্য মেয়েটির উচ্ছ্বসিত গুণগরিমায় উপস্থিত সকলেই মুখর হয়ে উঠলেন।

সন্তরণ এবং সন্তরণপ্রতিযোগিতা আমার নিত্যদিনের অতি সাধারণ বস্তু। কটকে তাই জয়ের চেয়ে মানুষের, স্বজাতির এই অনাবিল প্রেম-প্রীতির স্পর্শই আমার

পুরীতীর্থের সাধারণ দৃশ্য : অন্যতম তীর্থ-বিগ্রহ ভুবনেশ্বরের বিরাট মন্দির দেখা যাইতেছে

পুরীতীর্থে

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এম্. এল. সি.

উৎকলখণ্ডে আসিয়া যাহা সবার আগে চোখে পড়ে, তাহা হইতেছে এ দেশের বহুবিধ মন্দির। মন্দির গাত্রে পাথরে খোদাই করা ভাস্কর্য্যের সুচারু কারুশীলতার তুলনা নাই। কত দেবদেবীর মূর্ত্তি তাহাতে নিহিত। এ সকল দেখিলে সারা ভারতের প্রাচীন মূর্ত্তি-কল্পনার কথা একসঙ্গে মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠে। দেবদেবীগণ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে, উঁহারা সব Typal beings অর্থাৎ উঁহারা পরিবর্ত্তনবিহীন বিবিধ বিশ্বভাবসমূহের আদর্শ প্রতি[illegible] এই সকল প্রতিমা-সত্তা বিকাশশীল মানবাত্মার বিবর্ত্তনে সহায়তা করেন। আমাদের রূপশিল্পীরা এই স[illegible] দেব-দেবীদের ভাবমূর্ত্তিকে রেখায়, চিত্রে, ভাস্কর্য্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—আমাদের সুরশিল্পীরা এই সব দেবসত্তাসমূহকেই রাগরাগিণীর বিবিধ বিশিষ্ট সুরে ও ছন্দে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই তেত্রিশ কোটি দেবতা বা বিশ্বজগতের স্থায়ী এই অসংখ্য সূক্ষ্ম দিব্য ভাবসত্তাসমূহের স্থায়িত্ব চিরদিনের জন্য। ঈশ্বরেরই ইহারা চিরন্তন বিভূতি, অমর প্রকাশসমূহ—একই সূর্য্যের অনাদি বিকীর্ণ রশ্মিরাজি। এই সব দেব-দেবীর দর্শনে, চিন্তনে ও সংস্পর্শে মানুষ তার পশুজন্ম, মানবজন্ম পার হইয়া ক্রমে দিব্যজন্মের দিকে অগ্রসর হইতে পারে।

চারিদিকে মন্দিরের নানা পার্শ্বে এই তেত্রিশ কোটি দেবতা, আর মন্দিরের মধ্যে নিভৃতে ঈশ্বর বা ঈশ্বরীর [illegible] স্থাপিত। ঈশ্বরের নানা ভাব মহাদেব, পুরুষোত্তম প্রভৃতি, ঈশ্বরীও বিমলা, মহালক্ষ্মী প্রভৃতি নানা মূর্ত্তি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন মন্দিরে পূজিতা। এই সকল মূর্ত্তির পূজা আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্ম্মের নৈমিত্তিকতা আজ শুষ্ক কর্ত্তব্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু এ সকল মন্দির ও মূর্ত্তির মধ্যে যে সত্যকে রূপ দিবার চেষ্টা হইয়াছে, শতকরা নিরানব্বই আনুষ্ঠানিক হিন্দুই বর্ত্তমানে সেদিকে লক্ষ্য রাখেন না। যে মহান্ সত্য ও মহান্ ভাব সকল মানবাত্মাকে উদ্বোধিত

করিয়া মুক্তিতন্ত্রের সূচনা করিয়াছিল, সেই ভাব ও বোধি অন্তর্হিত হওয়ায় সকল তীর্থই আজ শুষ্ক, প্রাণহীন ও সাধনাবর্জ্জিত হইয়া পড়িয়াছে। নিত্যকর্ম্মের routine পালনে যেমন হিন্দুর পারমার্থিক উৎকর্ষের কোনও সহায়তা করিতেছে না, তীর্থযাত্রাও তেমনই ঘর্ম্মাক্ত পণ্ডশ্রমেই পরিণত হইয়াছে। সাধক, ভাবুক সব না আসিলে, না দেখিলে, এই সকল তীর্থের মহিমা বুঝিবে কে? প্রতি তীর্থেই অশুচি, জঞ্জাল ও অস্বাস্থ্যের আকর মন্দিরের নিকট পুঞ্জীভূত। ঐ সব স্থানে সর্ব্বনিকৃষ্ট লোকের ও ময়লার সমাবেশ, কর্দ্দমের রাশি, সবই মন্দিরের কাছে জমা হয়। মন্দিরের সংস্কার করিবে কে?

আমরা হিন্দু সংগঠনের কথা প্রায়ই শুনি; কিন্তু হিন্দুচিত্তের রূপ যে সব স্থানে আত্মপ্রকাশ করে, লক্ষ লক্ষ ধনী ও দরিদ্র যে সব স্থানে বৎসরে বৎসরে বা সম্বৎসর ধরিয়া ধর্ম্মোদ্দেশ্যে সমবেত হয়, সেই সব তীর্থ বারাণসী, পুরী, কামাখ্যা প্রভৃতি হিন্দু-তীর্থসমূহের সংস্কার-সাধন, শুচিতা ও বিমলতা রক্ষা করা হিন্দু মহাসভা, হিন্দু মিশন প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মের উত্থানকামী মণ্ডলীসমূহের এবং হিন্দু দরদীর প্রধান কর্ত্তব্য। এই সকল তীর্থে হিন্দুধর্ম্ম এক উদার ভাব স্বতঃই পরিগ্রহ করে। উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ এই সকল স্থানে আসিয়া স্বতঃই ভেদভাব ভুলিয়া যায়। এক ভগবৎ প্রভাবের মধ্য দিয়া ছত্রিশ জাতির মধ্যে ভাববিনিময় ও একপ্রাণতা আসিয়া উপজাত হয়। তীর্থ বিশেষে মহাপ্রসাদের উদার ব্যবহারে উৎকট ভেদ-বৈষম্যের সঙ্কীর্ণ সীমাও মিলাইয়া যায়।

হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি হিন্দুর উন্নতিকামী প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তব্য প্রতি বৎসরেই কোনও না কোনও প্রধান তীর্থে হিন্দু সম্মেলনের অনুষ্ঠান করা। জনসাধারণের মধ্যে হিন্দুপ্রভাব জীবন্ত করিতে হইলে, এই সব তীর্থের মধ্য দিয়াই হিন্দু-ধর্ম্মের ও হিন্দু-জাতির নব উদ্বোধন করিতে হইবে। নচেৎ রাজধানীতে বা সভা-সমিতিতে কেবল হিন্দু সম্মেলনের অথবা বড় বড় বক্তৃতায় হিন্দু "Mass" বা হিন্দুর গণচিত্তে কার্য্যকরী স্পন্দন জাগিবে না। ধর্ম্মের দিকে একটা বড় প্রেরণা না আসিলে হিন্দু আন্দোলন দেশে স্থায়ী সার্থকতাও আনিতে পারিবে না। তীর্থ, মন্দির ও বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়াই হিন্দু-সংস্কৃতির জাগরণ আনিতে হইবে, নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চ

শ্রীতারাকিশোর বর্দ্ধন

বর্ত্তমান সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপীয় মহাসমর তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চে দ্রুতগতি ঘটনা-ঘাতপ্রতিঘাতে বিগত দুই বৎসর যাবত বিশ্ববাসী উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু রুশিয়ার দুর্গম প্রান্তরে আসিয়া জার্ম্মাণীর দুর্জ্জয় রথচক্রের গতি আজ শিথিলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। জার্ম্মাণীর অপরাজেয় বাহিনীর অগ্রগতি যদিও থামিয়া যায় নাই, তথাপি ঝঞ্ঝার মত ব্লিৎস্‌ক্রিগের ভীষণ বেগ আর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। এই রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধই পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণতম যুদ্ধ। বিংশ শতাব্দীর রণদেবতার প্রচণ্ড দাপটে স্বর্ণপ্রসবিনী রুশভূমিতে শোণিত তরঙ্গিণীর তরঙ্গোচ্ছ্বাস দর্শন করিয়া বিশ্বের সুধীবৃন্দ মানবসমাজের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া শঙ্কিত উঠিয়াছেন। সুসভ্য মানবের রাক্ষসবৃত্তির তাড়নায় রুশিয়ার ধনধান্যময়ী সন্তানবহুলা ইউক্রাইন ভূমি আজ মহাশ্মশানে পরিণত। কিন্তু রণভূমি হইতে ৪০০০ মাইল দূরে অবস্থান হেতু আমরা মহাসমরের ভীষণতা তেমন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। তাহা ছাড়া এই সমর-সমুদ্রের প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে যে সব কূটনৈতিক আবর্ত্তের সৃষ্টি হয়, তাহার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বুঝিবার ক্ষমতাও এই পরাধীন দেশবাসীর অভিজ্ঞতার মধ্যে নাই।

ভারত—

এদেশে অনেকক্ষেত্রে কথা উঠিয়াছে যে, ইংলণ্ড এখন বিপন্ন, সুতরাং এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া একটা বিরাট্ আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করা উচিত এবং তাহাতেই ইংরাজ আমাদিগকে স্বাধীনতা না দিয়া পারিবে না। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর অপটু নেতৃত্বের জন্যই নাকি আমরা এখনও পরাধীন রহিয়াছি……ইত্যাদি। সুতরাং এই বিষয়ে একটু আলোচনার প্রয়োজন আছে মনে করি। উহাতে রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চে ভারতের স্থান নির্দ্দেশ করিতে সহায়তা করিবে।

এস্থলে ইহা বলিয়া রাখা ভাল যে, এই প্রকারের মনোভাব মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে ত্রিপুরী কংগ্রেসের সময় হইতেই প্রচারিত হয়। তারপর আজ দুই বৎসর যাবত ইউরোপীয় মহাসমরের রথচক্র অশ্রান্ত গতিতে প্রধাবিত হইতেছে। কবে উহার বিরাম হইবে তাহা কেহ জানে না। ইতিমধ্যে বৃটিশবাহিনীর ভীমপ্রহারে ইটালীয়গণ পূর্ব্ব আফ্রিকা পরিত্যাগ করিয়া পলায়িত, বৃটিশ সিংহের ঘোরগর্জ্জনে প্রচণ্ড প্রহরণধারী জাপান পর্য্যন্ত সভয়ে কম্পিত এবং সিরিয়া, ইরাক ও ইরান আজ বৃটিশকেশরীর চরণে অবলুণ্ঠিত। মোট কথা, ইউরোপ খণ্ডের যুদ্ধে ইংলণ্ডের সম্ভ্রম কিয়ৎপরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইলেও, আফ্রিকা এবং এশিয়ায় আজ এমন কেহ নাই যিনি বৃটিশ শক্তির বিপক্ষে তর্জ্জনী হেলন করিতে পারেন। এই প্রকারের পারিপার্শ্বিক অবস্থায় যাহারা আশা করেন—যে ঘন ঘন মিটিং করিয়া বাঁধাবুলি আওড়াইলে (slogans) এবং কয়েক সহস্র লোক দ্বারা জেল পূর্ণ করিয়া একটা হৈ-হৈ ব্যাপার সৃষ্টি করিলেই বৃটিশ সিংহ এই রণতাণ্ডবের সময়ে সভয়ে ভারতবাসীর সঙ্গে একটা রফা ক[illegible] ফেলিবে—(চার্চ্চিল সাহেবের এবারের সর্ব্বশেষ বক্তৃ[illegible] পর) তাহাদিগের রাজনৈতিক শৈশব যে এখনও অতিক্রান্ত হয় নাই, এ কথা দৃঢ়ভাবেই বলা যায়।

বৃটিশ শক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে আসিবার পক্ষে ভারতবাসী এখন প্রস্তুত নয়—মহাত্মা গান্ধীর এই সিদ্ধান্ত। উহার সপক্ষে তাঁহার যুক্তি এই যে, হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রসার, বিভিন্ন প্রদেশবাসিগণের মধ্যে প্রাদেশিক স্বার্থের সংঘাত এবং কংগ্রেস কর্ম্মিগণের মধ্যে শৃঙ্খলাজ্ঞানের অভাব, এই তিনটী অবস্থা সমভাবে বিদ্যমান থাকায় এ কথা জোর করিয়া বলা যায় যে, দেশবাসী এখনও স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য তৈরী নয়। ফরওয়ার্ড ব্লকের তরফ হইতে ঐ কথার উপর যথেষ্ট বিদ্রূপ করা হইয়াছে। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর ঐ তথ্য আজ নিষ্ঠুর সত্যের আকারে দেশবাসীর মন আলোড়িত করিতেছে। সংগ্রাম করিতে হইলেই সৈন্য প্রয়োজন। কিন্তু সৈন্য কোথায়? হিন্দু ও মুসলমানে এবং বাঙ্গালী ও বিহারীতে অর্থাৎ প্রদেশে-প্রদেশে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছে, আবার তাহার উপর কংগ্রেসের ভিতরে শৃঙ্খলাহীনতা ও নানারূপ ভেদ-বিভেদের ফলে বিষাক্ত আব্‌হাওয়া সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় অতি ধীর স্থিরভাবে আজ মহাত্মা গান্ধী নীলকণ্ঠের মত এই হলাহল পান করিয়া অপেক্ষমান। হিন্দুসভা, মুসলিম লীগ ও ফরওয়ার্ড ব্লক সকলেই আজ গান্ধী-নিন্দায় পঞ্চমুখ। অথচ কোনরূপ নিখিল ভারত আন্দোলন বা গঠনমূলক কর্ম্ম করিতেও উহারা অক্ষম।

মহাত্মা গান্ধীকে বাদ দিলে ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে এমন কোনও নেতা পাওয়া যাইবে না যিনি ভারতের বৃহত্তর গণ-আন্দোলন পরিচালনায় সক্ষম। গান্ধী-নেতৃত্বের বিরুদ্ধবাদীরাও তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য কোনও নেতার বিষয় এখনও কল্পনা করেন নাই। গান্ধী কেন সংগ্রাম করেন না, ইহাই তাঁহাদের দাবী। সুতরাং, আমরা বলিতে বাধ্য যে, প্রথমতঃ দেশবাসী সকলে মহাত্মা গান্ধীর মতবাদের সম্পূর্ণ সমর্থন না করিলেও তাহার পরিবর্ত্তে অন্য কোনও নেতার উপর আন্দোলন পরিচালনার ভার দিতে নারাজ এবং উক্ত কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক [illegible] কোনও জননায়ক ভারতের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে এখনও দেখা দেন নাই। এক কথায় স্বাধীনতাসেবীগণের বর্ত্তমান সময়ে গান্ধী-নেতৃত্ব ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

দ্বিতীয়তঃ:—দেশের বর্ত্তমান আবহাওয়া ব্যাপক গণ-আন্দোলনের উপযুক্ত নহে—এজন্য কংগ্রেসের গৃহীত কর্ম্ম-পন্থা সর্ব্বাংশে কালোপযোগী হইয়াছে এবং ঐ কর্ম্মপন্থার ভিতরে বৃহত্তর গণ-আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার উপকরণ সব নিহিত আছে।

তৃতীয়তঃ—এদেশের গণ-আন্দোলন ইউরোপের বিপ্লবের স্থলবর্ত্তী। এই গণবিপ্লব বা গণ-আন্দোলন কোনও নেতার ফরমাইস মত তৈরী হয় না। উহা ঐতিহাসিক আবেষ্টনের উপর পারিপার্শ্বিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের একটী বিরাট্ অভিব্যক্তি। এই কথাটা এই প্রবন্ধে বিস্তারিত প্রকাশ করিয়া বলিবার মতন স্থানাভাব। সুতরাং ফরওয়ার্ড ব্লকের যে দাবী (গান্ধী কেন আন্দোলন করেন না)—তাহা যুক্তিহীন। নেতা যত বড়ই হউন না কেন, তিনি আন্দোলন সৃষ্টি করিতে পারেন না। এবং আন্দোলন আকাশ হইতেও টুপ্ করিয়া খসিয়া পড়ে না। নেতা আন্দোলনের সম্ভাবনা পূর্ব্ব হইতে বুঝিতে পারেন এবং তারপর রাষ্ট্রীয় তরণীর কর্ণধার হিসাবে তিনি উহাকে সুপরিচালিত করেন। উহাতেই তাঁহার নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা। ঝটিকার তিনি স্রষ্টা নহেন—তরণীর তিনি হুঁসিয়ার কাণ্ডারী। সুতরাং আন্দোলন আসে নাই বলিয়া নেতাকে দোষ দেওয়া রাষ্ট্রনৈতিক শিশু-মনোবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়। আন্দোলন যে আসে নাই তাহার দ্বারা এবং কংগ্রেসবিরোধীগণের ক্রমশঃ ক্ষীয়মান জনপ্রিয়তা দ্বারা নেতার জাতির রোগ-নির্ণয়ের ক্ষমতাই প্রমাণিত হইতেছে।

চতুর্থতঃ—বিগত আইন অমান্য আন্দোলন প্রথমে একটা ব্যাপক গণ-আন্দোলন হিসাবে আরম্ভ হয়, কিন্তু উহা অবশেষে ব্যক্তিগত আইন অমান্যে পর্য্যবসিত হয়। এবারে এই ধরণের ক্রমাবনতি (anti-climax) দর্শন করিতে গান্ধীজী প্রস্তুত নহেন। গত বারের তিক্ত অভিজ্ঞতা একমাত্র তাঁহারই। সেজন্যই তিনি বলিয়াছেন যে, এবারের আন্দোলন দীর্ঘকাল স্থায়ীত্বের এবং ক্রমশঃ অগ্রগতির মধ্য দিয়া আপনার গতিতেই আপনি পরিচালিত হইয়া (it might become of its own volition and momentum) অবশেষে উহা উৎকৃষ্টতর পরিণতির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিবে। জগতের রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চের ক্রম পটপরিবর্ত্তন গোড়া হইতে লক্ষ্য করিলেই এ কথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইবে যে, কংগ্রেসের বর্ত্তমান কার্য্য-পদ্ধতি ভারতের পক্ষে সর্ব্বাংশে উপযোগী হইয়াছে। যতই দিন যাইতেছে ততই ভারতের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এমন কি পণ্ডিত মালবীয়, তেজবাহাদুর সপ্রু, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী প্রভৃতিও কংগ্রেসের কর্ম্মপদ্ধতির উপরে আস্থাবান হইয়া উঠিতেছেন। কারণ নিরস্ত্র দেশের অহিংস সংগ্রাম পরিচালনার জন্য মহাত্মাজী ব্যতীত বর্ত্তমান জগতে আর দ্বিতীয় কোনও নেতা নাই।

ইউরোপ—

বর্ত্তমানে ইউরোপের প্রধান ঘটনা রুশিয়া ও জার্ম্মাণীর যুদ্ধ। এই যুদ্ধ বার সপ্তাহ অতিক্রম করিয়াছে। পরস্পর বিরোধী সংবাদ হইতে এটুকু সংগ্রহ করা যায় যে, জার্ম্মাণ সৈন্য কিয়েভ দখল করিয়াছে এবং লেনিন গ্রাড্ ও ওডেসার দ্বারদেশে উপনীত হইয়াছে। বর্ত্তমান যান্ত্রিকযুগে বড় বড় সহরগুলিকে দুর্ভেদ্য করিবার ব্যবস্থা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সহরের চারিপাশে কয়েক সারি পরিখা ও ট্যাঙ্ক ধরিবার ফাঁদ, তাহার আড়ালে গোলন্দাজবাহিনী ও অন্যান্য যান্ত্রিকবাহিনী অবস্থান করে। ফলে আক্রমণকারীগণের পক্ষে সুরক্ষিত নগর দখল করা বর্ত্তমানকালের যুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ব্যাপার। এই কথাটী মনে রাখিলেই আজিকার রুশিয়ার সামরিক পরিস্থিতি বুঝা সহজ হইবে। আধুনিক সমর-বিজ্ঞানের নীতি অনুসারে সুরক্ষিত নগরীসমূহ দখল করিতে হইলে উহাকে চারিদিক হইতে অবরোধ করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। জার্ম্মাণী সেই ব্যবস্থাই করিয়াছে। রুশিয়ার পক্ষ হইতে বলা হইতেছে যে, শীতঋতু আসন্ন এবং সেনাপতি শীতের নিকট হিটলারের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী—যেহেতু নেপোলিয়নও উহার দ্বারাই পরাজিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে ঘটনা দেড়শত বৎসর পূর্ব্বেকার। আজিকার বৈজ্ঞানিক যুগের যান্ত্রিকবাহিনী সাহারা মরুভূমির তাপ, হিমমণ্ডলের শৈত্য, উষ্ণ মণ্ডলের বর্ষা, দুর্গম গিরি, কান্তার মরু অথবা দুস্তর পারাবার [illegible]তিক্রম করিতে সমর্থ। তাহা ছাড়া শীত তো এক [illegible]ক্ষের জন্য নয়। উহার বিক্রম উভয় পক্ষের উপরেই [illegible]ভাবে প্রযুক্ত হইবে। বিগত মহাসমরেও রুশ সৈন্যের সঙ্গে জার্ম্মাণ সৈন্যের তিন বৎসর যুদ্ধ হয় এবং তিনটি শীত ঋতু যুধ্যমান পক্ষদ্বয়ের উপর দিয়া বহিয়া যায়। তাহাতে জার্ম্মান সৈন্যগণের অপেক্ষিকভাবে অধিক কোনও ক্ষতির প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

হিটলারের আর্য্যরক্তের শ্রেষ্ঠত্বমূলক মিথ্যা ধারণার মতই রুশিয়ার পক্ষে মার্কস্-লেনিনের মতবাদ বা আগামী শীত ঋতুর দোহাই ভরসার হেতু হইতে পারে না। তাহার একমাত্র আশা, তাহার সৈন্যবল, যুদ্ধোপকরণ ও তাহার সেনানায়কগণের নির্ভুল ষ্ট্রাটেজি-পরিচালনা। তাহার আশা সেনাপতি বুদিনী, টিমোশিঙ্কা এবং ভরশিলফের নির্ভুলভাবে রণনীতির পরিচালনা এবং মিত্রশক্তির সময়োপযোগী সাহায্য লাভ। বস্তুতঃ প্রকৃত সংগ্রামক্ষেত্রে সাংগ্রামিক কারণগুলিই পক্ষদ্বয়ের জয়-পরাজয় নির্দ্দেশ করিবে। রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধের ফলাফল জানিবার জন্য বিশ্ববাসী আজ উৎসুক। এ বিষয়ে কোনও ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়। তবে আগামী শীতের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জার্ম্মাণীর যে প্রচণ্ড আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইবে, তাহা যদি রাশিয়া ঠেকাইয়া রাখিতে পারে, তাহা হইলে পাল্লা অনেকটা সমান হইয়া আসিবে।

কূটনৈতিক পাকচক্র—

এবারে কূটনৈতিক পাকচক্রের প্রধান নাট্যশালা তুর্কি ও প্যারিস নগরী। যতটুকু খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, জার্ম্মাণী ও ফ্রান্সের মধ্যে ভবিষ্যৎ নববিধানের কাঠামোর উপরে সৌহার্দ্দ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহা কেবল সমারোহ সহকারে ঘোষণা করাই বাকি আছে। এই অনুমান সত্য হইলে, জগতের কূটনৈতিক ইতিহাসে উহা একটা যুগান্তকারী ঘটনা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইবে। উহার সামরিক গুরুত্বও অসাধারণ। তাহা ছাড়া সমগ্র ইউরোপে জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের প্রভাব উহা দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হইবে। ঐ বিষয়ের আলোচনা করিবার সময় এখনও আসে নাই। জার্ম্মাণ কূটনীতির পরিচালনার ফলে একমাত্র সুইজারল্যাণ্ড ব্যতীত ইউরোপের প্র[illegible] রাষ্ট্র জার্ম্মাণীর সামরিক নেতৃত্বে রুশিয়ার বিপক্ষে সা[illegible] প্রেরণ করিয়াছে। স্পেন, ফ্রান্স, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী, ফিনল্যাণ্ড ইটালী প্রভৃতি সকল দেশের সৈন্যই আজ রুশিয়ার বিপক্ষে যুদ্ধে ব্যাপৃত আছে। এমতাবস্থায় রুশিয়াকে সহায়তা না করিলে ভবিষ্যতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইতে পারে, এই বিবেচনা করিয়াই প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চহিল ও রুজভেল্ট সাহেব রুশিয়াকে সক্রিয় সাহায্য দান করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন।

কূটনীতির খেলায় জাপানও পশ্চাৎপদ নয়। সে বুঝিতে পারিয়াছে যে, এখন যুদ্ধে নামিলে, চীন রুশিয়া, ইংলণ্ড ও আমেরিকার সমবেত শক্তির বিপক্ষে তাহাকে লড়িতে হইবে। এই অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্য নিয়া সে আমেরিকার সঙ্গে একটা বুঝাপড়া করিতে চায়। যদি উহাতে সফল হয়, তাহা হইলে সে জার্ম্মাণীর প্রীত্যর্থে সাইবেরিয়া আক্রমণ করিতে পারে অথবা রুশিয়ার সঙ্গে নিরপেক্ষতা চুক্তি ঝালাই করিয়া দক্ষিণ দিকে থাইল্যাণ্ড গ্রাস করিতে পারে। জাপান ঠিক কোন্ পথ অবলম্বন করিবে তাহা এখনও বলা যায় না। সবই আমেরিকার সঙ্গে মিত্রতা প্রতিষ্ঠার সাফল্যের উপরে নির্ভর করে। যদি আমেরিকার সঙ্গে মিত্রতা প্রতিষ্ঠায় সে অপারগ হয় তবে টালবাহেনা করিয়া আরও সময় নষ্ট করিতে জাপান বাধ্য হইবে। ওদিকে ইতিমধ্যে যদি জার্ম্মাণীর নিকট রুশিয়া পরাস্ত হইতে থাকে, তখন তাহার সাইবেরিয়াতে ঝাঁপাইয়া পড়িবার ও সম্ভাবনা আছে। আর যদি জার্ম্মাণী পরাস্ত হইতে থাকে, তাহা হইলে জাপান তুষ্ণিভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু জাপানের মতিগতি দেখিয়া ইহাই মনে হয় যে, জার্ম্মাণীর জয়লাভের উপরে আস্থা রাখিয়া সে এখনও কূটনীতি পরিচালনা করিতেছে।

আমেরিকা ইংলণ্ডে যুদ্ধসম্ভার প্রেরণ করিতেছে। এইজন্য জার্ম্মাণী আমেরিকার ছয়টী জাহাজের উপর আঘাত করিয়াছে। উহার ফলে আমেরিকার নৌবহরের উপর রুজভেল্ট সাহেব ইংলণ্ডগামী জাহাজ সকলের নিরাপত্তার দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন। ইহা বর্ত্তমান যুদ্ধের একটা গুরুতর ঘটনা এবং যুদ্ধের পূর্ব্বাভাষ সূচনা করে। জার্ম্মাণী ও জার্ম্মাণ-অধিকৃত অঞ্চলের উপর ব্রিটিশ বিমান-হানার তীব্রতা বৃদ্ধি পাইলেও সামরিক আক্রমণ দ্বারা রুশিয়ার উপর জার্ম্মাণীর চাপ হ্রাস করিবার জন্য ব্রিটিশ যে এখনও প্রস্তুত নয় তাহা চার্চ্চিলের উক্তি হইতেই বেশ বুঝা যায়। তুর্কীকে কেন্দ্র করিয়া আসন্ন ঝটিকার যে ধূলিজাল উড়িতে সুরু হইয়াছে তাহাই অদূর ভবিষ্যতের সম্ভবতঃ পূজার ছুটীর হইবে বড় ঘটনা।

অপূর্ব স্বপ্নতত্ত্ব

শ্রীপ্রফুল্ল বিশ্বাস বি. এ.

তখন ইংরাজী স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি। পূজার পরে ব্যাড্‌মিণ্টন খেলার নূতন প্রবর্ত্তনে আমাদের গ্রাম্য খেলার যুগান্তর আসিয়া গেল। ব্যাড্‌মিণ্টনের বড় পাণ্ডা ছিলেন আমাদের যতীনদা আর তাঁহারই দক্ষিণ হস্তস্বরূপ আমি। অলৌকিক উৎসাহে পড়াশুনার কথা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিলাম, এমন সময় একদিন আসন্ন পরীক্ষার নোটীশে চমকিত হইয়া উঠিলাম। বহি পত্রের কথা এতদিন বিশেষ মনে ছিল না। ইংরাজী বহিখানি বহু চেষ্টার পরও খুঁজিয়া পাইলাম না। খাটের নীচে ইঁদুরের মুখ হইতে অর্দ্ধভুক্ত এলজেবরাখানি উদ্ধার করা গেল বটে, কিন্তু দারুণ দুশ্চিন্তায় রাত্রে ঘুম হইত না। আসন্ন পরীক্ষার দিন ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিল।

পরীক্ষার আর মাত্র তিন দিন বাকী, এমন সময় নিশাশেষে এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিয়া আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিলাম। উহা এইরূপ :

আমি বিষণ্ণ বদনে বসিয়া আসন্ন পরীক্ষার কথা চিন্তা করিতে-ছিলাম এমন সময়ে সেখানে এক সন্ন্যাসী আবির্ভূত হইলেন। সন্ন্যাসী বলিতে আমরা জটাজুটধারী ভস্ম-বিভূষিত কমণ্ডলু-ধারী যে প্রাণী বুঝি ইনি কিন্তু সে শ্রেণীর প্রাণী নহেন। দাড়ি গোঁপ পরিষ্কার করিয়া কামান, পরিধানে গেরুয়া এবং দক্ষিণ হস্তে একখানি সুন্দর ব্যাড-মিণ্টনের র‍্যাকেট্ লইয়া ইনি আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন। হাসিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "বৎস ! তুমি বাৎসরিক পরীক্ষার কথা চিন্তা করিতেছ, কিন্তু তোমার কোন ভয় নাই, আমার বরে তোমার দিব্য জ্ঞানের উদয় হইবে এবং উহাতে তুমি পরীক্ষার পূর্ব্বেই সমস্ত প্রশ্ন জানিতে পারিবে।"

আনন্দ-গদগদ হইয়া আমি তাঁহার পদতলে নিপতিত হইয়া বলিলাম, "কে আপনি মহাভাগ, আমাকে এই বিপদ-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিলেন ?"

প্রশান্ত হাসিতে বদন মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া তিনি বলিলেন, "আমি ব্যাড্‌মিণ্টনের দেবতা। আমার ভক্তদের জন্য আমি সব করিতে পারি। তুমি আমার একজন অতি প্রিয় ভক্ত। তোমার আসন্ন পরীক্ষার বিপদে আমি স্থির থাকিতে না পারিয়া আমার বর্ত্তমান হেডকোয়াটার ন্যুয়র্ক হইতে তোমাকে বর দিবার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছি।" আনন্দে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না—হে পরম কারুণিক দেবতা! পদধূলি লইয়া মাথায় দিলাম। কিন্তু হঠাৎ বুদ্ধি যোগাইল—বলিলাম, "হে দয়াময়! যদি দয়া করিয়া দর্শনই দিয়াছেন, তবে অধীনের কৌতূহল চরিতার্থ করিয়া কৃতার্থ করুন। ব্যাড্‌মিণ্টন তো বিদেশী খেলা, কিন্তু আপনি তাহার দেবতা হইয়া কি করিয়া গেরুয়া ধুতি চাদর পরিলেন!" পূর্ব্বের ন্যায় অনাবিল প্রশান্ত হাস্যে তাঁহার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, বলিলেন, "বৎস! যখন কৌতূহল হইয়াছে, তখন শ্রবণ কর। পূর্ব্বে আমার কাজ খুবই কম ছিল, শুধু ইউরোপ ও আমেরিকার কয়েকটী দেশেই আমাকে হ্যাট কোট পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। কিন্তু অল্প কয়েক বৎসর হইল ভারত, জাপান, তুর্কি প্রভৃতি প্রাচ্য ভূখণ্ডেও ব্যাড্‌মিণ্টন খেলা এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, আমার আর বিশ্রামের বিন্দুমাত্র অবসর নাই—এখন বর্ম্মা ও জাপানের জন্য এক জোড়া লুঙি, কাবুল পারস্য প্রভৃতির জন্য পায়জামা ও ভারতবর্ষের হিন্দুদিগের জন্য আমার এক জোড়া গেরুয়া ধুতি চাদর কিনিতে হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভারতীয় মুসলমানদের জন্য একজোড়া দাড়ি ও ফেজ এবং আমার নিজের স্যুট তো আছেই।"

দেবতা আর কিছু বলিলেন না; তাঁহার ব্যাটখানি আমার কপালে ছোঁয়াইয়া মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইলেন।

স্বপ্ন-বৃত্তান্ত চিন্তা করিতেও মন আনন্দে ভরিয়া উঠিতেছিল। এ স্বপ্ন সত্য না হইয়া যায় না। এমন সুস্পষ্ট স্বপ্ন ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হইল না। রাত্রি প্রভাত হইয়া গিয়াছিল, উঠিয়া পড়িলাম। দিদিমা প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া মালা টিপিতে বসিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "দিদিমা! স্বপ্ন কখনও সত্য হয়?" দিদিমা মালা টিপিতে টিপিতে কহিলেন, "ভোর রাত্রে স্বপ্ন দেখার পর যদি আর না ঘুমান যায়, তবে সে স্বপ্ন অবশ্য সত্য হইবে।" দিদিমার আশ্বাস-বাক্যে আর মনে সন্দেহের বাষ্প মাত্রও রহিল না। ছুটিয়া যতীনদার নিকট গিয়া স্বপ্ন-বৃত্তান্ত সকল খুলিয়া বলিলাম। যতীনদাও স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনিয়া অত্যন্ত হর্ষ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু কি করিয়া এবং কখন দিব্য জ্ঞানের উদয় হইবে, বহুক্ষণ আলোচনার পরও এ বিষয়ে আমাদের মতভেদ পূর্ব্বের মতই রহিয়া গেল। যতীনদা বলিলেন যে, রাত্রে দেবতা সমস্ত বিষয়ের এক একখানা প্রশ্নপত্র বিছানায় রাখিয়া যাইবেন—এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহের লেশ মাত্রও ছিল না। কিন্তু আমার মন খুঁত খুঁত করিতে লাগিল। যাহা হউক, সে রাত্রে তিরস্কারের ভয়ে নামমাত্র বহি লইয়া বসিয়া-ছিলাম। কেবলই মনে হইতেছিল—কখন ঘুমাইতে যাইতে পারিব। সেই রাত্রেই তো দেবতার প্রশ্নপত্র দিয়া যাইবার কথা। তাড়াতাড়ি পড়াশুনা শেষ করিয়া আকুল আগ্রহে বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলাম এবং এক ঘুমেই রাত্রি শেষ হইয়া গেল। কিন্তু দেবতা তাঁহার প্রতি-শ্রুতি রক্ষা করিতে আসিলেন না। না দিলেন স্বপ্ন। সকালে উঠিয়া তন্ন তন্ন করিয়া বিছানা বালিশ খুঁজিয়াও পাইলাম না একখানা প্রশ্ন পত্র। তাহার পরের দিনও দেবতার ভরসায় রহিলাম—এশিয়ার কাজ বাড়িয়া যাওয়ায় হয়ত গত রাত্রে সময় পান নাই, আজ আসিবেন। কিন্তু হায় তিনি বোধ হয় আমাদের কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন—রাত্রি প্রভাত হইলেই পরীক্ষা; কিন্তু তিনি আসিলেন না—দিব্য জ্ঞানেরও উদয় হইল না। আর সময় নাই। ভোর হইতেই যতীনদা আসিয়া উপস্থিত। অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কিছু পেলিরে"? দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া সংক্ষেপে উত্তর দিলাম "নাঃ।" রাগিয়া যতীনদা ব্যাড্‌মিণ্টনের দেবতাকে মিথ্যুক, জোচ্চোর প্রভৃতি বলিয়া গালি গালাজ করিতে লাগিলেন।

মিথ্যা আশায় প্রলুব্ধ করিয়া হতভাগ্য দেবতা আমাদের কি সর্ব্বনাশই না করিয়া গেলেন। এ তিন দিন বৃথা তাঁহার আশায় না থাকিয়া পড়িলেও অনেকটা কাজ হইত। আর একবার দেখা পাইলে যতীনদা তাঁহাকে বেশ কিছু শুনাইয়া দিবার জন্য উপদেশ দিয়া স্কুলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে চলিয়া গেলেন।

পরীক্ষা কোন প্রকারে কাটিয়া গেল। ব্যাড্‌মিণ্টনের দেবতার কুকীর্ত্তির কথাও আর আমরা কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই। কিন্তু এই ঘটনার পর হইতে স্বপ্ন-তত্ত্বের ফলাফলের উপর আমাদের অনুরাগ অমানুষিকরূপে বাড়িয়া গেল। প্রায়ই সকালে উঠিয়া দিদিমার কাছে শুনিতাম—স্বপ্ন সফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা। নির্দ্দিষ্ট সময় শুনিয়া ও মাঝে মাঝে পঞ্জিকায় তিথি দেখিয়া দিদিমা মতামত ব্যক্ত করিতেন।

এমন সময়ে একদিন একখানি মহামূল্য পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গেল। "অপূর্ব্ব স্বপ্ন-তত্ত্ব" নামক একখানি দুষ্প্রাপ্য পুস্তক অতি সন্তর্পণে যতীনদা আমাকে নিভৃতে ডাকিয়া দেখাইলেন। অতি পুরাতন। স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছে। রক্তবর্ণ অক্ষরের ছাপা ও অনেক স্থানে ফিকে হইয়া গিয়াছে। অতি যত্নে যতীনদা সেখানার একখানি নূতন মলাট দিয়া আনিয়াছেন। কোন্ এক সন্ন্যাসীকে কত অনুরোধ করিয়া এবং আট আনার পয়সা প্রণামী দিয়া কি কঠোর উপায়ে যতীনদা সেই পুস্তকখানি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সবিস্তারে সেই কথা শুনিয়া সেদিন যে যতীনদার শৌর্য্যে সত্যই বিমোহিত হইয়া গিয়াছিলাম, তাহা আজও মনে আছে।

"কলিযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী কেলারাম ভট্টাচার্য্য" পুস্তকখানি লিখিয়াছিলেন। দেখিয়া ভক্তি অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। সেইদিন হইতেই আমরা অখণ্ড মনোযোগের সহিত পুস্তক-বর্ণিত বিদ্যা আয়ত্ত করিতে আরম্ভ করিলাম। টিফিন আওয়ারে সেদিন আর বেশী সময় হইল না, নদীর ধারে দুইজনে গিয়া লুকাইয়া আকুল আগ্রহে শুধু ভূমিকাটুকুই পড়িয়া ফেলিলাম। উহা এইরূপ :—

"স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন মাত্র মস্তিষ্ক বিকার,
এ কথা কেমন করে করিব স্বীকার।
চিরকাল হতে মোরা ধর্ম্ম প্রাণ জাতি,
(আর আজ কিনা) স্বপ্ন উড়িয়ে দেবে দুপুরে ডাকাতি।"

নহে। নহে!! নহে!!! হে ভারতবাসী, তোমরা যদি পাশ্চাত্য শিক্ষায় অন্ধ না হইয়া দেখিতে এই স্বপ্নের মধ্যে কি পদার্থ আছে, আমরা প্রতিদিন যে সকল স্বপ্ন দেখি, তাহার যদি তোমরা অর্থ আবিষ্কার করিতে পারিতে, তবে আহার নিদ্রা তোমাদের ঘুচিয়া যাইত। এই রসেই তোমরা হাবুডুবু খাইতে। তোমরা যে পাশ্চাত্য শিক্ষার গর্ব্ব কর, সেই শিক্ষার কৌস্তুভ-রত্ন, উনবিংশ শতাব্দীর রণদেবতা, সমগ্র ইউরোপের একছত্র অধিপতি, সম্রাট্ নেপোলিয়ান পর্য্যন্ত এই স্বপ্ন-তত্ত্বে ঘোর বিশ্বাসী ছিলেন। এই পুস্তকে যাহা লিখিত আছে, তাহা যদি তোমরা ঠিক ঠিক পালন করিতে পার, তবে ইহকালের অতুল ঐশ্বর্য্য ও পরকালের নিশ্চিত মোক্ষ তোমাদের নিঃসন্দেহে করায়ত্ত হইবে। —ইত্যাদি। অতি আনন্দে যতীনদা আমার পিঠে সজোরে চড় মারিয়া বসিলেন।

পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদেই তিথি অনুসারে স্বপ্নের ফলাফল নির্ণয়ের নির্দ্দেশ এবং স্বপ্নের শ্রেণী বিভাগ। স্বপ্ন সাধারণতঃ দুই প্রকার : শুভ ও অশুভ। শুভ স্বপ্ন দেখিলে উহা যাহাতে সফল হয়, তাহা করিতে হইবে এবং অশুভ স্বপ্ন দেখিলে, উহা যাহাতে মিথ্যা হয়, সেজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে।

আমরা এই দুষ্প্রাপ্য পুস্তক যেদিন প্রথম হাতে পাইলাম, সেদিন ছিল কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশী তিথি। তিথিটী ভাল। ঐ রাত্রের দৃষ্ট স্বপ্ন যে অবশ্য সফল হইবে, এ বিষয়ে কেলারাম হইতে সম্রাট্ নেপোলিয়ন পর্য্যন্ত কাহারও মতদ্বৈধ ছিল না। প্রথম দিনেই এমন একটি তিথি নক্ষত্রের অপূর্ব্ব সমাবেশ পাইয়া আমরা কৃতার্থ হইয়া গেলাম।

ভাবিয়াছিলাম, এ হেন সুদিনে এমন একটি সুস্বপ্ন দেখিব, যাহাতে আর স্কুলে যাইবার হাঙ্গামা পোহাইতে হইবে না। কিন্তু হা ভগবান, সেই রাত্রিতে এমন এক দুঃস্বপ্ন দেখিলাম যে, কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম—যেন আমি আর বাঁচিয়া নাই, সর্পাঘাতে মরিয়া স্কুলের ক্রিকেট মাঠের উপর উড়িয়া বেড়াইতেছি। ইচ্ছা হইতেছিল—হারাণকে ও অঙ্কের মাষ্টার সতীশবাবুকে ধরিয়া খাইয়া ফেলি। সমস্ত স্কুলের মধ্যে আমি এই দুইটী প্রাণীকে কোন-দিনই পছন্দ করিতাম না। আবার ক্রিকেট খেলায় যতীনদার বোলিং সুবিধাজনক হইতেছে না দেখিয়া সময়ে সময়ে ইচ্ছা করিতেছিল—আমি নিজেই যাইয়া বল ধরি। কিন্তু আমি যে পক্ষী হইয়া উড়িয়া বেড়াইতেছি এবং ঠোঁট দিয়া যে বোলিং করা যায় না, তাহা বল ধরিয়াই বুঝিতে পারিলাম। হারাণ ব্যাট লইয়াই আমাকে তাড়া করিল। প্রাণভয়ে ছুটিতে লাগিলাম। কিন্তু কিছুতেই হারাণের নাগালের বাহিরে যাইতে পারিলাম না—এমন সময়ে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মন বড়ই খারাপ হইয়া গেল। সকালে উঠিয়াই যতীনদার কাছে গেলাম; তিনি গত রাত্রে কোন স্বপ্ন দেখেন নাই। বরং ভাল। কিন্তু আমার একি হ'ল।

দুইজনে বহুক্ষণ ঘাঁটিয়া বাহির করিলাম যে অশুভ স্বপ্নের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ প্রতিকার হইতেছে—স্বপ্ন-বৃত্তান্ত কাহাকেও না বলিয়া সাতটী ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছাগের দক্ষিণ কর্ণে সকল কথা খুলিয়া বলা। কৃষ্ণবর্ণ ষাঁড় হইলেও অবশ্য হয়, কিন্তু ওদিকে ঘেঁষিতে বিশেষ ভরসা পাইলাম

না। অগত্যা ছাগশিশুদের স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনাইবার জন্য মাঠের দিকে চলিলাম। যতীনদা আমার সহগামী হইলেন।

মাঠে আসিয়া নিখুঁত কৃষ্ণবর্ণ সাতটী ছাগ বাহির করা গেল না। যে কয়টী ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছাগ দেখা গেল, তাহাদেরও আমাদের স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনিবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ পরিলক্ষিত হইল না। সমস্ত মাঠ ঘুরিয়া মাত্র তিনটী সর্ব্ব সুলক্ষণযুক্ত ছাগ পাওয়া গেল। প্রয়োজন আমাদেরই, কাজেই এক একটী ছাগ ধরিয়া দুষ্ট স্বপ্ন সবিস্তারে বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলাম। উল্লম্ফন ও উৎকট চীৎকারের জন্য বড়ই অসুবিধা হইতে লাগিল। এক একটীর দেহে আবার উৎকট দুর্গন্ধ। একটি ছাগ আবার এমন পরিত্রাহি আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার সুরু করিল যে, তাহার কাছে আর কিছু বলা সম্ভব হইল না।

অবশেষে যতীনদা আর না পারিয়া বলিলেন—"সাতটী অভাবে তিনটী হইলেও চলে।" কিন্তু আমার জীবন-মরণের সমস্যা, কাজেই সহজে আশ্বস্ত হইতে পারিলাম না। যতীনদা বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। আমি চলিলাম নূতন সুলক্ষণযুক্ত ছাগের সন্ধানে।

উল্লম্ফন ও উৎকট চীৎকারের জন্য বড়ই অসুবিধা হইতে লাগিল

কর্ত্তব্য সমাপ্ত করিয়া যখন নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ী ফিরিলাম, তখন অপরাহ্নের আর অধিক বিলম্ব নাই। একটু আড়াল করিয়া ভয়ে ভয়ে খিড়কী দিয়া বাড়ী ঢুকিতেই যাহার সহিত চোখাচোখি হইয়া গেল, তাহাকে এড়াইবার জন্যই ছিল আমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সতর্কতা। আর যায় কোথা—বড়দা গম্ভীর স্বরে আহ্বান করিলেন; বলিলেন—"এ বাড়ী যায়গা হবে না। এতক্ষণ যেখানে ছিলে, সেখানে যাও। পাজী নচ্ছার, বেরোও বাড়ী থেকে।" অপরাধী আমি। সঙ্কুচিত হইয়া নতশিরে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তখন কি করিয়া জানিব যে, আমার সমস্ত কার্য্যই ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ হইয়া গিয়াছে এবং একটু বিচিত্র আকারেই।

দিদিমা ঘরে ছিলেন, কথাবার্ত্তা শুনিয়া বাহিরে আসিতে আসিতে বলিলেন—"হাঁরে পাঁচু, তোর জ্বালায় কি গ্রাম ছাড়তে হবে? ফুলির মা এসে বলে গেল তুই নাকি মাঠের সমস্ত ছাগল ধরে' কাণে সর্ষে পুরে দিয়েছিস। এখানে বলিয়া রাখি যে, ছাগলের কাণে সরিষা পুরিয়া দিলে যে, উহারা বাঁচে না এ কথা আমি পূর্ব্বে বহুবার শুনিয়াছিলাম। এবং সকলের ন্যায় আমিও উহা বিশ্বাস করিতাম। নিম্নস্বরে উত্তর করিলাম—"মিথ্যে কথা।"

"মিথ্যে কথা—তবে ফুলির মার ছাগল ধরে' তার কাণের কাছে বসে কি করছিলি। হতভাগা ছেলে একটা সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড করে আসবে, আবার বলা হচ্ছে কিনা মিথ্যে কথা।"

এইবার ফাঁপরে পড়িলাম। কলিযুগের শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী কালারাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দৃঢ় নিষেধ—এ সকল সুগুপ্ত তথ্য কাহারও নিকট প্রকাশ করা যাইবে না। এমন কি মায়ের নিকটেও নয়। আর যে সে কথা নয়। আমার নিজের জীবন-মরণের সমস্যা। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিন্তু বড়দা চুপ করিয়া রহিলেন না। তাহার পর পৃষ্ঠদেশে ও গণ্ডদ্বয়ে যে সকল পদার্থ পড়িল, তাহা আর বলিব না।

বীরের মত সমস্ত নির্য্যাতন মুখ বুজিয়া সহ্য করিলাম, স্বপ্নকথা ঘুনাক্ষরেও প্রকাশ হইতে দিলাম না। ইহাতে আরও সহজে প্রমাণ হইয়া গেল যে, আমি সত্যই অপরাধী। শাস্তি আমার চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল; কিন্তু সমস্তই ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া নীরবে সহ্য করিলাম।

পরদিন যতীনদাকে সমস্ত বলিলাম। গম্ভীর ভাবে সমস্ত শুনিয়া সে মন্তব্য করিল "বেশ করেছিস্।" অতঃপর আমার বীরত্বের প্রশংসা করিয়া সে পিঠ চাপড়াইয়া দিল। সেদিন যে আত্মতৃপ্তি লাভ [illegible]ছিলাম, তাহাতেই সমস্ত অন্তর ভরিয়া উঠিয়াছিল—মুহূর্ত্তেই [illegible]য়ের সমস্ত বেদনা নিরাময় হইয়া গেল।

কয়েকদিন পরে সেদিন সকালে হাঁপাইতে হাঁপাইতে যতীনদা আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, পশ্চিমপাড়ার হীরু কর্ম্মকারের কলেরা হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ও পাড়ার মৃত যদুদাস নাকি গত রাত্রে তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছিল। যদু আসিয়া বলিল "চল হারু, বেড়িয়ে আসি"। কিন্তু হারু তাহাতে রাজী হয় নাই, তখন যদুদাস তাহাকে ভয় দেখাইয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহার পর শেষ রাত্রি হইতে হীরুর কলেরা আরম্ভ হইয়াছে। এই

যদুদাস প্রায় মাসখানেক পূর্ব্বে স্ত্রীর সহিত ঝগড়া করিয়া গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছিল। এই ভয়ে আমরা সন্ধ্যার পর আর ও-পাড়ার দিকে যাইতাম না। লোকটী কিন্তু বাঁচিয়া থাকিতে ভাল ছিল, মরিয়াই তাহার নষ্টামী বাড়িয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত কিনা হীরুর মত নিরীহ লোককেও স্পষ্ট পরলোকে যাইবার নিমন্ত্রণ করিয়া গেল।

পুস্তকে দেখিলাম—এ স্বপ্নের ফল ঘোর অমঙ্গলজনক। হইলও তাহাই। সন্ধ্যা হইতে না হইতেই হীরু মারা গেল।

স্বপ্নতত্ত্বের প্রতি আমাদের অটুট আস্থা বাড়িয়াই চলিল। প্রায় পনেরো দিন কাটিয়া গিয়াছে; ইহার ভিতর আমি নাই, তাহার উপর আজ হীরুর মৃত্যু। আমাদের আর মনে অবিশ্বাসের বাষ্পমাত্রও রহিল না।

এইবার যে কোন প্রকারে একটি শুভ স্বপ্ন দেখিতেই হইবে। দু'জনে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলাম। এবং অবশেষে স্বপ্নও একটি দেখা গেল। এবার স্বপ্ন দেখিলেন যতীনদা। কিন্তু তাহা শুভ কি অশুভ, তাহা আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও স্থির করিতে পারিলাম না।

শ্রেণী বিভাগ করিতে না পারিলেই বা কোন পন্থা অবলম্বন করিব? ইহা নিবারণের জন্য মাঠে সুলক্ষণযুক্ত ছাগদের নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে যাইব, না স্বপ্ন যাহাতে সফল হয়, সেই

বক্তৃতারত কেলারাম জ্যোতিষীর একহাতে স্বপ্নতত্ত্ব
অপর হাতে বীজগণিত

চেষ্টা করিব। যতীনদার কিন্তু দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল যে, স্বপ্নটী বিশেষ শুভ নয়; পরন্তু ইহা ঘোর অমঙ্গলকর স্বপ্ন, নতুবা স্বপ্নে হিন্দু কুল-চূড়ামণি কলিযুগের শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী দ্বিজ কেলারাম ভট্টাচার্য্য কিনা এক হাতে 'স্বপ্নতত্ত্ব' অপর হাতে বীজগণিত লইয়া বক্তৃতা করিতে করিতে শেষ পর্য্যন্ত অদৃশ্য হইয়া গেলেন। কিন্তু দুঃস্বপ্ন হইলেও, আমি আর ইহার নিবারণ প্রচেষ্টায় বিশেষ উৎসাহ পাইলাম না। পিঠের ব্যথাটা তখনও সম্পূর্ণ সারে নাই। দুঃখিত যতীনদা বলিলেন—"পাঁচু স্বপ্নটা কি তা'হলে সত্যই খেটে যাবে।" আমি বলিলাম "যাক্‌গে, তাতে আমাদের কি?"

হায়, তখন যদি বুদ্ধি একটু বেশী থাকিত!

এই অত্যদ্ভুত স্বপ্ন-সন্দর্শনের পরও আমরা চেষ্টা ছাড়িলাম না, যদি কোন-দিন সুস্বপ্ন দেখি। এবার যতীনদা অনেক চিন্তার পর একটি সুচিন্তিত মত ব্যক্ত করিলেন। প্রথমটায় বেশ ভালই মনে হইয়াছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যে এই প্রকার পরিণতি হইবে, তাহা তখন কেমন করিয়া জানিব। যতীনদা বলিলেন—"দেখ একটা কাজ আছে, এ কয় মাসে আমি হিসাব করে' দেখেছি যে গড় পড়তা তুই-ই বেশী স্বপ্ন দেখিস্‌। পারসেণ্টেজ্‌ শিখেছিস্‌ তো, তবেই দেখ—তুই দেখেছিস্‌ বিয়াল্লিশ দিনে আটাশটা স্বপ্ন, আর আমি দেখেছি বিয়াল্লিশ দিনে একুশটা। তাহলে তোর শতকরা গড় হচ্ছে ৬৬⅔% আর আমার গড় হচ্ছে ৫০%। অতএব এ অমূল্য বইখানা এখন থেকে তোরই কাছে থাকবে।" আনন্দে আটখানা হইয়া উঠিলাম। যতীনদাকে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব, তাহার ভাষা খুঁজিয়া পাইলাম না। যতীনদা বলিলেন, "অপূর্ব্ব স্বপ্নতত্ত্ব" এবং একখানা পকেট পঞ্জিকা সব সময়ে ঘুমুবার আগে শিয়রে রেখে দিবি। স্বপ্ন দেখে তিথি নক্ষত্র মিলিয়ে যদি দেখিস্‌ স্বপ্ন শুভ, তবে আর ঘুমুবি নে; বুঝলি।" ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলাম। যতীনদা বলিলেন—"এতে আরও এক সুবিধা আছে; আমরা ঘুম থেকে উঠে সকালে অনেক স্বপ্নই ভুলে যাই। অনেক সময়ে মনের উপর গত রাত্রের স্বপ্নের শুধু একটা ক্ষীণ স্মৃতি থাকে। কিন্তু রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াই যদি সেটা নোট করা যায়, তবে আর এ ভুল হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না।"

যতীনদা বলিলেন—"মহারাণী ভিক্টোরিয়া কি করে রাজত্ব পেল জানিস্‌?" জানিতাম না, তাহা অকপটেই স্বীকার করিলাম। তখন তিনি বলিলেন, "তবে শোন—একদিন ভিক্টোরিয়া রাত্রি শেষে স্বপ্ন দেখ্‌লেন যে, তিনি সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হয়েছেন। ঘুম তাঁর ভেঙে গেল। মা পাশে শুয়েছিলেন; তাকে ডেকে বল্লে মা, আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্ন কথা শুনে মা দিলেন ভিক্টোরিয়ার দুই গালে দুই চড় বসিয়ে। খানিকক্ষণ কেঁদে যেই চুপ করেছেন, আবার মা দিলেন ঐ রকম দু গালে দুই চড়। এই রকম করে ক্রমে ক্রমে সকাল হয়ে গেল। তখন রাণী ভিক্টোরিয়াকে সব খুলে বল্লেন যে, সুস্বপ্ন দেখার পর আর ঘুমুতে নেই।"

আমি এ বৃত্তান্ত অবগত ছিলাম না; নির্ব্বাক্‌-বিস্ময়ে চাহিয়া-ছিলাম। বলিলাম, "কিন্তু আমাদের ইতিহাসে তো তেমন কিছু লেখা নাই।"

যতীনদা বলিলেন, "দুত্তোর তোর ইতিহাস, খাঁটী খবর কি আর সব ইতিহাসে পাওয়া যায়।"

তাও ত' বটে।

যতীনদা সাবধান করিয়া দিয়া গেলেন—"ভাল স্বপ্ন দেখলে ঘুমুসনি যেন।" তারপর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "আমার দ্বারা তো কিছু হ'ল না, দেখি তোর দ্বারা যদি কিছু হয়।"

প্রত্যহ রাত্রে পঞ্জিকা ও 'অপূর্ব্ব স্বপ্নতত্ত্ব' বালিসের নীচে রাখিয়া শুইয়া পড়িতাম। সুস্বপ্ন যদি কোনদিন দেখি, তাহা কোন প্রকারেই নিস্ফল হইতে দিব না।

সুযোগ আসিতেও বিলম্ব হইল না। পরদিন রাত্রেই স্বপ্ন দেখিলাম—ক্রিকেটে ১০৩ রাণ করিয়াছি। এ হেন সুস্বপ্ন। উঠিয়া দেখি, রাত্রি মাত্র ২টা ৩৯ মিনিট। কিন্তু সে যাহাই হউক, ঘুমান আর হইবে না। কিন্তু কি করিয়া জাগিয়া থাকি, ডানদিকে দিদিমা, বাঁ দিকে ছোড়দা, বড়দা প্রভৃতি। উঠিয়া বসিতে ভয় করিতে লাগিল, কিন্তু শুইয়া থাকিলে যে ঘুমাইয়া পড়িব, ইহাও সুনিশ্চিত। হঠাৎ বুদ্ধি জোগাইল। ইতিহাস আনিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম—Shivaji was the creatar of the Marhatta...বাক্যটী শেষ হইবার পূর্ব্বেই বড়দা চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বুঝিলাম—তাঁহার ব্যাঘাত হইতেছে। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া, গণিতশাস্ত্রে জ্ঞান লাভের জন্য সমুৎসুক হইয়া অঙ্ক কষিতে আরম্ভ করিলাম। রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। আর ভয় নাই। নবমীর স্বপ্ন অবশ্য সফল হইবে।

মানুষের যখন শুভ গ্রহের উদয় হয়, তখন কেহই তাহাকে চাপিয়া রাখিতে পারে না। পরদিন রাত্রে আবার সুস্বপ্ন দেখিলাম। রাত্রি তখন ৩টা ১৪ মিনিট, একাদশী সবে লাগিয়াছে, উঠিয়া বসিলাম পাটিগণিত লইয়া। কিন্তু তন্দ্রা আসিলেই সমস্ত বিফল হইবে। গত রাত্রে ঘুম হয় নাই, কাজেই অতি কষ্টে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অঙ্ক কষিয়া কোন প্রকারে রাত্রি কাটাইলাম। একদিন অব্যাহতি পাইলাম, আবার পর রাত্রে সুস্বপ্ন! আমাদের অঙ্কের শিক্ষক সতীশবাবু সেদিনও আমাকে ক্লাশে বেঞ্চের উপর দাঁড় করাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারই সঙ্কটাপন্ন পীড়া। এ হেন শুভ স্বপ্ন। রাত্রে আজ আর ঘুমাইব না তা' কপালে যাহাই থাকুক না কেন।

আলো ধরিয়া দেখিলাম—রাত্রি মাত্র ১টা বাজিয়া ১৫ মিনিট। হা ভগবান! থাক, ভয় করিলে কি আর অভীষ্ট লাভ হয়? হয় না। একথা জ্যোতিষী কেলারাম বহুবার তাঁহার পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন। ঘুমে চোখ বুজিয়া আসিতে লাগিল। কোন প্রকারে আর বসিয়া থাকিতে পারি না; অথচ অন্যথায় এত বড় একটী শুভ স্বপ্ন বিফল হইয়া যায়। হঠাৎ পণ্ডিতমহাশয়ের একটি উপদেশ মনে পড়িয়া গেল। রাত্রে ঘুম-নিবারণের জন্য তিনি প্রায়ই চোখে লঙ্কা ঘসিয়া দিতে উপদেশ দিতেন। আজ প্রয়োজনের দিনে উহাই ব্যবহার করিয়া দেখিবার মনস্থ করিলাম। ভগবানের অপার করুণা, একটি লঙ্কা ব্যবহার করিয়াই বুঝিলাম যে শুধু রাত্রি নহে, দিনের বেলায়ও উহার জের চলিবে। মুখ ফুটিয়া যন্ত্রণা ব্যক্ত করিবারও উপায় নাই। কোন দিক্ হইতে কি প্রকারে রাত্রি কাটিয়া গেল বুঝিতে পারিলাম না। চোখ রক্তবর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠিল। কিন্তু প্রকৃত তথ্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

সেদিন শুনিলাম—বড়দা, বাবাকে বলিতেছেন, পাঁচু আজকাল পড়াশুনায় খুব যত্ন নিচ্ছে। অঙ্কে উইক বলে' সারা রাত খেটে মেক-আপ কচ্ছে। বাবা বলিলেন না, না; অত রাত জেগে পড়তে দিস্ নি। মনে মনে হাসিলাম। কিন্তু এই সুগুপ্ত তথ্য সাধারণের নিকট প্রকাশ করি কি করিয়া। শুরুর দৃঢ় নিষেধ।

আবার কয়েক দিন বিরাম দিয়া উপর্য্যুপরি তিন রাত্রে সুস্বপ্ন—প্রথম দিনে বড়দা বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছেন, দ্বিতীয় দিনে এবারও যতীনদা ও আমি আমাদের ক্লাস হইতে সরস্বতী পূজার প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছি এবং তৃতীয় দিনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুস্বপ্ন সর্ব্বাপেক্ষা অল্প রাত্রিতে দেখিলাম। রাত্রি তখন মাত্র বারোটা চুয়াল্লিশ মিনিট, এমন সময়ে স্বপ্ন দেখিলাম যে, অঙ্কে এবার ছিয়ানব্বই নম্বর পাইয়া প্রথম হইয়াছি। গ্রহ প্রসন্ন থাকিলে এমনই হয়। রাত্রে আর ঘুমাইলাম না এবং এ কয়দিনের ভিতর একদিনও দুঃস্বপ্ন দেখি নাই। যতীনদা আসিয়া উৎসাহ দিয়া গেলেন।

কিন্তু শরীরেরও একটা সহ্যের সীমা আছে। সেদিন সকালে আর বিছানা হইতে উঠিতে হইল না। দিন পাঁচেক প্রবল জ্বরের ঘোরে বেহুঁস অবস্থায় কাটিল। অসুখটা বেশ শক্ত রকমেরই ছিল। অনেক ঔষধ-পত্র সেবন করিয়া ত্রয়োবিংশ দিবসে অন্ন পথ্য করিলাম। সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে প্রায় মাস দেড়েক কাটিয়া গেল।

আরোগ্য হওয়ার পর বহু অনুসন্ধানেও 'অপূর্ব্ব স্বপ্নতত্ত্ব' গ্রন্থের কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। বৌদির নিকট হইতে বহুকষ্টে যে গোপনীয় সংবাদটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম, তাহাতে জানা গেল যে, আমাদের সমস্ত সতর্কতা উপেক্ষা করিয়া স্বপ্নতত্ত্বের সমস্ত [illegible] প্রলাপেই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। এবং সেই সূত্রে অনুসন্ধান করিয়া বালিসের নীচে হইতে পুস্তকখানি সংগ্রহ করিয়া কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেন। চোখ ফাটিয়া জল আসিল; কিন্তু ভয়ে ও সম্বন্ধে কিছু উচ্চবাচ্য করিবার ভরসা পাইলাম না।

যতীনদা আর এক খণ্ড 'অপূর্ব্ব স্বপ্নতত্ত্বের' জন্য অনেক খোঁজা খুঁজি করিয়াছিলেন; কিন্তু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ আর পাওয়া যায় নাই।

সাময়িকী

সঙ্ঘের অর্থনৈতিক কেন্দ্রের বার্ষিকী :

গত ৩০শে ভাদ্র বহুবাজার স্ট্রীটস্থ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েসন হলে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের অর্থনৈতিক কেন্দ্রের ১০ম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার মেয়র শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বৈদিক স্তোত্র পাঠ ও বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের পর শ্রীযুত কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় অর্থনৈতিক কেন্দ্রের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। ইহার মধ্য দিয়া বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় বাংলার শিল্পবিস্তারের সম্ভাবনা ও প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের বিবিধ অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার দিকটি বিশেষ মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিল। সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল রায়ের ওজস্বিনী ভাষায় প্রবর্ত্তক সাধনার আদর্শবাদ ও ধর্ম্মের দিকটি উজ্জ্বল হইয়া ওঠে। তিনি বলেন—অপৌরুষেয় বেদ আমাদের জীবনের ভিত্তি হইবে। লোকবাদে প্রলুব্ধ হইয়া আমরা জাতি-সম্প্রদায় ভেদে সংহতি শক্তি হারাইয়াছি। আমাদের পরিচ্ছন্ন মতবাদ পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিয়া আবার সংহতিবদ্ধ হইতে হইবে। সমাজে ও রাষ্ট্রে তবেই আমরা জয়শ্রী-মণ্ডিত হইব। অপৌরুষেয় বেদবাদের আশ্রয় লইবার জন্য হিন্দুকে সাধনত্রয় আশ্রয় করিতে হইবে। সত্য, সংযম ও সম্বন্ধের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে আমরা শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায়, তথা মন্ত্র, প্রতিমা ও গুরু, ভারত-সংস্কৃতির এই অমর প্রস্থানত্রয়ের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিব। সভাপতি শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম একটি সুন্দর বক্তৃতা করিয়া সভার উপসংহার করেন। সভায় কলিকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুত জ্ঞানাঞ্জন নি মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ দিলে পর সভা ভঙ্গ হয়।

মেয়র শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম

নিখিল বঙ্গ প্রবর্ত্তক-সভ্য সম্মেলন :

আগামী ডিসেম্বর মাসের বড়দিনে কলিকাতায় নিখিল-বঙ্গ প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের অষ্টম বার্ষিক সম্মেলন হইবে। সম্মেলন উপলক্ষে একটি ধর্ম্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইতেছে। মূর্ত্তিশিল্পে, চিত্রে ও রেখাঙ্কনে প্রদর্শনীটি সমৃদ্ধ হইবে। এই উপলক্ষে একটি দর্শনীও খোলা হইবে। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের আদর্শবাদের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন সুহৃদগণকে লইয়া একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠনের আয়োজন চলিতেছে।

মেডিকেল ছাত্রদের সেবাকার্য্য :

কলিকাতা মেডিকেল কলেজ ষ্টুডেণ্টস্ ইউনিয়ন গত চূড়ামণি যোগে কলিকাতা কর্পোরেশন নিয়ন্ত্রিত গঙ্গার তীরবর্ত্তী পাঁচটি যাত্রী-সেবা শিবিরে পাঁচটি মেডিকেল ইউনিটস্ পাঠাইয়া জন-সেবাকার্য্যে সহায়তা করেন। প্রকাশ ইহারা বাংলার পল্লীতে পল্লীতে স্বাস্থ্য-সংগঠন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবেন বলিয়া এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। পল্লীর স্বাস্থ্য-সংগঠন ও বিবিধ জনহিতকর কার্য্যে মেডিকেল ছাত্রদের যদি সঙ্ঘবদ্ধ উৎসাহ জাগে তবে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

প্রবর্ত্তক ট্রাষ্ট লিমিটেড :

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রবর্ত্তক ট্রাষ্ট লিমিটেড-এর ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ অফিসে এই কোম্পানীর সাধারণ বার্ষিক সভা কোম্পানীর চেয়ারম্যান শ্রীমতিলাল রায়ের সভাপতিত্বে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভায় ১৯৪০-৪১ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব দৃষ্টে দেখা যায় যে, কোম্পানী উত্তরোত্তর উন্নতির পথেই চলিয়াছে। সঙ্ঘের এই অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার পশ্চাতে ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃতি ও অধ্যাত্মবাদের উপর ভিত্তি করিয়া জাতিগঠনমূলক যে আদর্শবাদ নিহিত সেই সম্বন্ধে শ্রীমতিলাল রায় বিশদভাবে সভায় পরিস্ফুট করেন। শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, স্বামী বোধানন্দজী, স্বামী অমৃতানন্দজী, শ্রীফণিভূষণ রায়, শ্রীইন্দুভূষণ রায়, শ্রীমণীন্দ্রনাথ নায়েক ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী নূতন বৎসরের জন্য কোম্পানীর ডাইরেক্টর নিযুক্ত হন।

ভাইস্‌রয়ের কার্য্যকাল বৃদ্ধি :

সিমলার একটি সংবাদে প্রকাশ যে, ডাউনিং ষ্ট্রীট হইতে একটি ঘোষণায় মহামান্য সম্রাট্ ভারতের ভাইস্‌রয় ও গবর্ণর জেনারেল মার্কুইস্ অফ লিন্‌লিথগো মহোদয়ের কার্য্যকাল ১৯৪৩ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিয়াছেন।

ময়মনসিংহে আশ্রম প্রতিষ্ঠা-উৎসব :

ময়মনসিংহে প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের ঢাকা বিভাগীয় কেন্দ্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা উৎসব গত ১০ই সেপ্টেম্বর বুধবার প্রাতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সঙ্ঘগুরু শ্রীযুত মতিলাল রায় সঙ্ঘাশ্রমের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই উপলক্ষে ময়মনসিংহ

সহরের অধিবাসীগণের মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনা ও উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। ৯ই সেপ্টেম্বর বেলা ১১-৩০ টার সময় চট্টগ্রাম মেইলে সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল রায় ময়মনসিংহে পৌছিলে ষ্টেশনে এক বিরাট সম্বর্দ্ধনায় তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হয়। তৎপরদিবস ১০ই সেপ্টেম্বর আশ্রমের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা উৎসব সুসম্পন্ন হয়। সন্ধ্যায় শ্রীযুত ধীরেন্দ্রকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী এম, এল, এ (সেণ্ট্রাল) মহাশয়ের পৌরোহিত্যে সূর্য্যকান্ত টাউন হলে শ্রীযুত মতিলাল রায় সঙ্ঘের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। ১১ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকার সময় অধ্যাপক শ্রীযুত অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, মহাশয়ের পৌরোহিত্যে টাউন হলে আর একটি বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। এই সভায় ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা সম্বন্ধে সঙ্ঘগুরু একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ১৫ই সেপ্টেম্বর শ্রীযুত রায় ময়মনসিংহ ত্যাগ করিয়া মেলান্দহ প্রবর্ত্তক আশ্রম পরিদর্শন করিয়া কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কলিকাতায় পেট্রল নিয়ন্ত্রণ:

গত ১৫ই আগষ্ট হইতে কলিকাতায় পেট্রল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার ফলে কলিকাতার পথে ঘাটে মোটর চালিত যানবাহনের চলাচলে উল্লেখ-যোগ্য হ্রাস পরিলক্ষিত হইতেছে। কলিকাতা সহরের বিভিন্ন ট্যাক্সি দাঁড়াইবার স্থানগুলি প্রায় শূন্য দেখা যায় এবং ইহার পরিবর্ত্তে সাইকেল ও ঘোড়ার গাড়ীর যাতায়াতই অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ দৃশ্যও দেখা গিয়াছে যে ব্যবসায়ের মালিক, কেরাণী ও পিয়ন পাশাপাশি সাইকেল বাহনে পথ অতিক্রম করিতেছেন। এই ব্যবস্থায় কলিকাতার সামাজিক জীবনে বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বাস চলাচলও কিছু হ্রাস পাইয়াছে এবং পেট্রোল অভাবে বাসের মাসিক টিকিট উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ট্রামেও নূতন মাসিক টিকিট দেওয়া হইতেছে না। এ অবস্থায় সর্ব্বশ্রেণীর লোকেরই যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

পরিধেয় বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি:

সম্প্রতি প্রকাশিত একখানি সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, সকল প্রকার ছিট ও পরিধেয় বস্ত্রের যে মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে তাহাতে গবর্ণমেণ্ট বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। জুলাই মাসের মাঝামাঝি পূর্ব্বোক্ত কাপড়ের অধিকাংশের মূল্য যুদ্ধের পূর্ব্বের মূল্যের অপেক্ষা শতকরা ৭০ হইতে ৮০ গুণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। জুলাই মাসের মাঝামাঝি হইতে ফাট্‌কা বাজারের কারসাজির জন্ত অবস্থা আরও মন্দ হইয়াছে। ইস্তাহারে আরও বলা হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট এই অতিরিক্ত লাভ বন্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন এবং প্রয়োজন হইলে বাঙ্গলায় ব্যবহৃত সাধারণ বস্ত্রের মূল্য বাঁধিয়া দিয়া ইহার প্রতিকার করা হইবে।

সুরেন্দ্রনাথের প্রতিমূর্ত্তি:

গত রবিবার ১৪ই ভাদ্র অপরাহ্নে গড়ের মাঠে কার্জ্জন পার্কে স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু স্বর্গীয় স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জীর একটি পূর্ণাবয়ব ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন।

স্যার সুরেন্দ্রনাথের এই মূর্ত্তিটি ১১ ফুট দীর্ঘ; উহা ১৪ ফুট উচ্চ একটি স্তম্ভের উপর ময়দান সম্মুখ করিয়া স্থাপিত হইয়াছে। বাগ্মিশ্রেষ্ঠ সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতাদান-কালীন ভঙ্গীতে এই প্রতিমূর্তিটি স্মৃতিরক্ষা কমিটি কর্ত্তৃক ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। মাদ্রাজ [illegible]ণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীযুত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী মূর্ত্তির পরিকল্পনা করেন। ভারতের রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি-রক্ষার এই আয়োজন বিশেষ প্রশংসার্হ।

স্যার ৺সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি

আর্য্য-জ্যোতিষ মহামণ্ডল:

বর্ত্তমানে আর্য্য-জ্যোতিষ মহামণ্ডল জ্যোতিষ শাস্ত্র ও তাহার গবেষণায় প্রশংসনীয় কার্য্যের পরিচয় দিতেছেন। বেদকে মুখ্য করিয়া জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা, রাষ্ট্রীক

ও প্রাকৃতিক অবস্থা-নির্ণয়, দ্রব্যগুণ ও প্রক্রিয়া দ্বারা ব্যাধি নিরাময় ইত্যাদি কার্য্যের দ্বারা মহামণ্ডল খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। সুপরিচিত জ্যোতিঃশাস্ত্রবিদ্ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী জ্যোতিষ-সিদ্ধান্তাচার্য্য ইহার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত থাকিয়া মণ্ডলের উন্নতি ও প্রতিষ্ঠাকল্পে আন্তরিক চেষ্টা করিতেছেন।

কুমারী উর্ম্মিলা মিত্র :

কুমারী উর্ম্মিলা মিত্র ১৯৪১ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মহিলাদের মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া ষোল

কুমারী উর্ম্মিলা মিত্র

টাকা বৃত্তি পাইয়াছেন। ১৯৩৫ সালে বঙ্গীয় বালিকা শিক্ষা পরিষদের পরীক্ষায় ইনি প্রথম স্থান অধিকার করেন ও ১৪৲ টাকার বৃত্তি পান। তৎপর ১৯৩৬ সালে গবর্ণমেন্ট গার্লস স্কলারশিপে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া ২০৲ টাকা বৃত্তি ও গুরুদাস মেডেল লাভ করেন। বিভিন্ন সঙ্গীত প্রতিযোগিতায়ও কুমারী উর্ম্মিলা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। কুমারী উর্ম্মিলার বয়স বর্ত্তমানে ১৫ বৎসর ও ইনি বেলিয়াঘাটা নিবাসী [illegible] প্রাপ্ত উকীল শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের কন্যা।

মাতৃতীর্থ :

চন্দননগর প্রবর্ত্তক আশ্রমে সঙ্ঘজননী সতীনারী শ্রীশ্রীরাধারাণী দেবীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা যে বিশেষ একটি পরিকল্পিত মন্দিরে হইয়াছিল তাহার নির্ম্মাণকার্য্য এতদিনে

প্রবর্ত্তক আশ্রমে নবনির্ম্মিত মাতৃমন্দিরের নির্ম্মাণকালীন অবস্থা

প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিল। পুণ্যতোয়া ভাগীরথী তীরে মন্দিরটি অবস্থান করিয়া মাতৃসাধক বাঙালীর বুকে সতী মহিমার জয় ঘোষণা করিবে।

১৯৪০ সালে খদ্দর বিক্রয় :

১৯৪০ সালে ভারতে নিখিল ভারত চরকা সঙ্ঘের অনুমোদিত খদ্দর ৭৬ লক্ষ টাকার বিক্রি হইয়াছে। তৎপূর্ব্ব বৎসর ৬৫ লক্ষ টাকার বিক্রী হইয়াছিল।

কাটুনীর সংখ্যা ২৪৩০০০ জন, তন্মধ্যে হিন্দু ১৪০,০০০ এবং মুসলিম ৫১,০০০ জন, অবশিষ্ট হরিজন ও অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত।

বাঙলায় ১১০০০ জন কাটুনীর মধ্যে মুসলিম ৮৭০০ জন এবং হিন্দু ২২০০ জন।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর হইতে ৬ই অক্টোবর পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তক ট্রাষ্ট লিমিটেডের এবং "প্রবর্ত্তক" পত্রিকার অফিস পূজা উপলক্ষে বন্ধ থাকিবে। অফিস সংক্রান্ত কোনরূপ কার্য্য ঐ সময়ে হইবে না।

যুগ্ম সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী
প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ কর্ত্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত এবং প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৫২।৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ষড়বিংশ বর্ষ
১৩৪৮ সাল

অগ্রহায়ণ

দ্বিতীয় খণ্ড
২য় সংখ্যা

বিজয়ার আকূতি হৃদয়ে লইয়া "প্রবর্ত্তকে"র পাঠক-পাঠিকা, অনুরাগী, শুভানুধ্যায়ী সকলকেই অভিবাদন জানাইতেছি। আকূতি জয়ের। সে জয়—জাতির, জাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির। জাতি যাহা লইয়া এখনও বাঁচিয়া আছে, বাহিরে আর সব গেলেও এখনও অন্তরে সম্পূর্ণ নিঃস্ব, রিক্ত হয় নাই—সেই কৃষ্টি ও সংস্কৃতিগত বিজয়ের অনুপ্রেরণা এখনও এ জাতির অন্তরের অন্তস্তলে ফল্গুধারার ন্যায় বহমান—এ ধারা রক্ষা করিতে পারিলে একদিন আকূতির পূরণ, জাতীয়তার বিজয় অবশ্যম্ভাবী। সেই দিনই আমাদের সত্য বিজয়ার অনুষ্ঠান—মাতৃপূজার জয়োৎসব। তাহারই স্বপ্নমূর্ত্তির আজ উপাসনা। জাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির এই মর্ম্মক্ষেত্র হইতেই একদিন জাতির আত্মশক্তি চণ্ডীরূপে ঘোষণা করিয়াছিলেন—"যো মাং জয়তি সংগ্রামে···"—সে অপ্রাকৃত দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান (চ্যালেঞ্জ) কোনও দুর্দ্ধর্ষ কামাসুর এ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়া স্থির থাকিতে পারে নাই—দেবধর্ম্মী, মানবধর্ম্মী, আর্য্যধর্ম্মী মহাজাতিকে আক্রমণ করিয়াছে ভিতরে ও বাহিরে বহু অসুর, দানব ও রাক্ষস, বহু কামধর্ম্মী পাপশক্তি—কিন্তু ভারতের বাহিরের ঐশ্বর্য্য লুণ্ঠন করিলেও, কেহই তাহার অন্তরলক্ষ্মীকে চিরদিনের জন্য লুণ্ঠন বা হরণ করিতে পারে নাই। ভারতের রাষ্ট্রপতি নিগৃহীতা, অপহৃতা, বন্দিনী রাজলক্ষ্মীকে আবার অগ্নিশুদ্ধা করিয়া ঘরে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। এই ভারতাত্মার বিজয়াই যুগে যুগে, [illegible] অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অতীতে হইয়াছে, ভবিষ্যতেও হইবে। শ্রীরামচন্দ্রের নীলনয়নোৎপাটী তপস্যার দ্বারাই ভারতের মর্ম্মলক্ষ্মী সীতার উদ্ধার সম্ভব হইয়াছিল। আজও চাই পূর্ণ আত্মনিবেদনের তপস্যা। তবেই স্বপ্ন সিদ্ধ হইবে। ধ্যান মূর্ত্ত হইবে। আদর্শ বিগ্রহ ধারণ করিয়া জাতির জীবন ভরিয়া রূপ গ্রহণ করিবে। জাতির হৃদয়-সিংহাসনে মহিমময়ী সমাজলক্ষ্মী ও রাষ্ট্রলক্ষ্মীরূপে জাতীয়তার পূর্ণ শতদলশোভায় মহাশক্তি পুনরাবির্ভূতা হইবেন। কোটী কোটী ভারতসন্তান দিগ্বিজয়ী বীর বেশে সেই চির-নবীন অথচ অতি-প্রাচীন ও সনাতন শীল, সভ্যতা ও সাধনার জয়পতাকা হস্তে মেরু হইতে মেরু পর্য্যন্ত জয়োৎসবে মুখরিত করিবে। আমরা সেই ভবিষ্য নব-বিজয়ার প্রতীক্ষায়ই সকল বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও স্বজাতি মাত্রকে প্রণাম, প্রীতি ও আলিঙ্গন জানাইয়া, সঙ্গে সঙ্গে তপোমন্ত্র স্মরণ করাইতেছি—"তপঃ, তপঃ, তপঃ!"

ধর্ম্মবিশ্বাসের মূল্য

হিন্দুর তীর্থে, ধর্ম্মস্থানে ধর্ম্মবিশ্বাসী ও পুণ্যার্থী অসংখ্য নর-নারীর সমাবেশ দেখা যায়। তাহাদের সেই ধর্ম্মপ্রবণ চিত্তের উদ্বেলভাব ও আবেগ-তরঙ্গ অনুভব করিলে, মনে অপূর্ব্ব শ্রদ্ধা ও বিস্ময়েরই সঞ্চার হয়। সেই সঙ্গে এই প্রশ্নও মনে জাগে—এত গভীর নিষ্ঠা-ভক্তির ধারাপ্রপাত সত্ত্বেও কেন জাতির দেব-চৈতন্য জাগে না, ধর্ম্মস্থানের প্রকৃত মাহাত্ম্যরক্ষা হয় না, দেবভূমি পর-পীড়ন ও পর-প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া স্বকীয় গৌরব ও মহিমায় দৃপ্ত সমুজ্জ্বল হইয়া দেখা দেয় না?

"তীর্থং কুর্ব্বন্তি তীর্থানি"—যে সাধকের তপস্যা, তাহা আজ ম্লান। ভারতের ব্রাহ্মণ শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করেন; কিন্তু শাস্ত্রের মর্ম্ম অগ্নিবীর্য্য হইয়া তাঁহার প্রতিভায় আর আগুন ধরাইয়া জাতির মোহান্ধকার দূর করার স্পর্দ্ধা রাখে না। ভারতের ক্ষাত্রশক্তি পরের হস্তে অস্ত্রসজ্জা তুলিয়া দিয়া, ধর্ম্মরক্ষায় ও দেশরক্ষায় ক্লীব বা উদাসীন। ভারতের বৈশ্য ব্যষ্টি অথবা গোষ্ঠীর জন্যই অর্থসঞ্চয়ে সঙ্কীর্ণ, জাতির জন্য বিরাট্ অর্থসাধনার কল্পনা পর্য্যন্ত বিস্মৃতপ্রায়। ভারতের আপামর সাধারণ শূদ্রধর্ম্মী; কিন্তু আত্মকৃষ্টি, শক্তি ও ঐশ্বর্য্যের সার্থক সেবাব্রত ইহা নহে, পরন্তু নিছক শিশ্নোদরপরায়ণতায় দিনগত পাপক্ষয়ের পুঞ্জীভূত জড়িমা মাত্র। এ জাতির ধর্ম্মবিশ্বাসের আজ মূল্য কতটুকু?

প্রতিভাহীন টোলের মস্তিষ্ক শাস্ত্রের সূত্র ও শ্লোক আবৃত্তি করিয়া তবু কথঞ্চিৎ শাস্ত্রবচনের অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে। পক্ষান্তরে, বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত মেধা ও মনীষা শাণিত যুক্তি-তর্কের কুঠারে এই পরিশেষ শ্রদ্ধাটুকুও ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া শূন্যত্বেই পর্য্যবসিত হইতেছে। এই সকল শিক্ষিত মানুষের না থাকিতেছে একটা পরম নির্ভরের স্থল ঘরের শাস্ত্রে ও সাধনায়, না পাইতেছেন তাঁহারা পরের অনুগ্রহাঞ্চলচ্ছায়ায় যথার্থ স্বস্তি ও আশ্বাসের স্থান—এই 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় ইঁহাদের স্তম্ভিত মস্তিষ্কবৃত্তি পূর্ব্বোক্ত সনাতনী মস্তিষ্কের চেয়ে কোন অংশে লোভনীয় পর্য্যায়ে আসিয়া দাঁড়ায় নাই। বরং ইঁহাদের অবস্থা প্রকৃত পক্ষে সমধিক শোচনীয়। যুগের শিক্ষায় ও সাধনায় ধর্ম্মবিশ্বাসের মূল্য এত অল্প আজ শুধু হিন্দুর দেশেই; খৃষ্টানের বা মুসলমানের দেশে নহে—এমন কি এই দেশেরই মুসলমান বা খৃষ্টান যাঁরা, তাঁহাদের ক্ষেত্রেও কথাটা সত্য নয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দুর মেধা ও মস্তিষ্ক ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করার যেন অব্যর্থ কৌশল আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। গত পৌনে এক শতাব্দী কাল ধরিয়া এই ভাঙ্গনের পালা পুরা দমে চলিয়াছে। মাঝে মাঝে বিদ্রোহী কণ্ঠ বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের বাণী তুলিলেও, তাহা কার্য্যকরী হয় নাই। শিক্ষার ধারা অপ্রতিহত বেগে ছুটিয়াছে। এই যৌবন-জলতরঙ্গ রোধ করার সাধ্য কাহারও হয় নাই—বাংলার জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের নয়, কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়, গুজরাটের জাতীয় বিদ্যাপীঠেরও নয়। ধর্ম্মবিশ্বাসকে ধর্ম্মজীবন দিয়াই উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতে হয়, এ সত্য তো আমরা ভুলিয়াছি কালধর্ম্মে; তদুপরি প্রতিদিন যে পরকীয় শব্দমন্ত্র কণ্ঠস্থ ও অন্তরস্থ করিতেছি, তাহাতে ধর্ম্মবিশ্বাসই যে জাতীয় সভ্যতা ও সাধনার মূল মর্ম্মশক্তি ও অটল মেরুদণ্ড, এই ধারণাটুকু পর্য্যন্ত আমাদের সম্পূর্ণ লোপ পাইতে বসিয়াছে।

জনসাধারণের দেবভক্তি চৈতন্যের লক্ষণ নহে; উহা এক প্রকার বিমূঢ় চিত্তবৃত্তি। শিক্ষিত যুগের মানুষ দেব-তত্ত্বে তর্কশীল, সন্দিহান—তাঁহাদের ভক্তির নেশা টুটিয়াছে, কিন্তু কোনও সমধিক বস্তুতন্ত্র সত্য সেই শূন্য স্থল অধিকার করিয়া তাঁহাদের চিত্তকে ভরাইয়া তুলে নাই। তাই সেখানে আছে তীর্থে, দেবতায় অনাস্থা, উপেক্ষা—কিছু না হউক, একটা লঘু ঔদাসীন্য। হিন্দু জাতি এইভাবে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয় স্তরেই ধর্ম্মের জাগ্রত অনুভূতি লইয়া তীর্থ, দেবতাকে আশ্রয় করিতে

না পারিয়া, গতানুগতিক জীবনস্রোতেই ভাসিয়া চলিয়াছে। হিন্দুর ধর্ম্মস্থানে পাণ্ডারা অর্থমূল্যে ধর্ম্মবিশ্বাসের কাঠামো রক্ষা করিতেছে বটে; সাধনার সজীব প্রভাব সেখানে হিন্দুপ্রাণে যথার্থ জ্ঞান, উৎসাহ, অমৃত সঞ্চার করে না।

বস্তুতঃ, ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম বিশ্বাস জীবনেরই মূল সত্য। ধর্ম্মহীন মানবতার যথার্থ অর্থই হয় না। মানবতাই তাহার জীবনের ধর্ম্মস্বরূপ। এই মানবতা পশুত্ব নহে। মানুষ কি কি তত্ত্ব লইয়া মানুষ, মনুষ্যত্বের প্রকৃত স্বরূপ কি, কি তাহার জীবনের কর্ত্তব্য, এই সকলই তো ধর্ম্মের বিষয়ীভূত। ধর্ম্ম শুধু তাত্ত্বিক জীবনদর্শন নয়, তাহা জীবনেরই ঋতময় নিয়ম ও কর্ম্মবিগ্রহ। এই কর্ম্ম-লক্ষণ ধর্ম্মকে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের উৎসরূপে হিন্দুই ধারণা ও দর্শন করিয়াছে। তাহারই আলোকে ও প্রেরণায় সে শিক্ষা, সম্পদ্, সমাজ ও রাষ্ট্র গড়িতে চাহিয়াছে। হিন্দু সেই ধর্ম্ম-প্রেরণায় যদি আজ আস্থাহীন, বিশ্বাসহীন হইয়া পড়ে, ধর্ম্মবিশ্বাসের নামে হয় শুধু দেশাচার, লোকাচার-বিশেষের অনুসরণ অথবা ধর্ম্মেরই উপর নিদারুণ সন্দেহ ও উপেক্ষা জাগিয়া উঠে, তাহা আমাদের ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ করিবে, ইহাতে আর কি কথা আছে ?

ধর্ম্মের লক্ষ্য মানবের সুখ ও কল্যাণ। সমাজ, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞানেরও কি ইহাই লক্ষ্য নহে ? তবে কেন ধর্ম্মবিশ্বাসকে জীবন হইতে বিযুক্ত মনে করিয়া আমরা ধর্ম্মানুগত জীবন তথা জীবনেরই ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হইব ? আমরা আজ জীবন-ধর্ম্মই চাই। আমাদের সামাজিক উন্নতি, আর্থিক উন্নতি, রাষ্ট্রীয় উন্নতি, আমাদের শিক্ষা, শিল্প, স্বাস্থ্য, জীবনের সর্ব্ববিভাগে অভ্যুদয় ও অভ্যুত্থানের বীর্য্যময় প্রেরণা সঞ্চয় করিব ধর্ম্ম হইতেই। ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া সংহতি গড়িব—বাণিজ্য-সম্পদ্ করিব —রাষ্ট্ররচনা করিব। এ সবই তো ধর্ম্ম-কার্য্য। ধর্ম্ম প্রেরণারূপে কারণ—এই সকল তাহার প্রকাশস্বরূপ কার্য্য। আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই আজ ধর্ম্মবিশ্বাসের মূল্য অবধারণ করিব। তীর্থ, মন্দির, আশ্রম—সব ব্যর্থ প্রাণহীন, যদি তাহা জীবন্ত ও জীবনদায়ী ধর্ম্মবিশ্বাসেরই কেন্দ্র না হয়, যদি সেখানে গিয়া ধর্ম্মার্থী মানুষ জীবনেরই পাথেয় সঞ্চয় করিতে না পারে। যাহাতে ইহা করিতে পারে, তাহারই তো ব্যবস্থা করিতে হইবে। গতানুগতিক তীর্থ-দেব-সেবা নহে, পরন্তু প্রত্যেক দেবমন্দিরে, আশ্রমে হিন্দু কৃষ্টি ও সাধনারই শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিতে হইবে। অর্থমূল্যে পুণ্যক্রয় নহে, পরন্তু জাতীয় জীবনপ্রেরণার পরিচয়-স্পর্শের জন্যই তীর্থবাস, দেবালয় ও দেবতাদর্শন, দেব-যজনের প্রয়োজন আছে—ইহা কি আজ শিক্ষিত হিন্দু বাঙালী বুঝিবেন ও সেইজন্য এই সকলের ধ্বংস কামনা না করিয়া, শ্রদ্ধাপূত চিত্তে জাতি-গঠনের উপায়-রূপেই ধর্ম্মবিশ্বাসের স্থান নির্দ্দেশ করিবেন ?

ভারতের জীবনদর্শন ও বাঙালী তরুণের কর্ত্তব্য

"প্রবর্ত্তকে"র ব্রত—গোড়া হইতেই ধর্ম্ম ও জীবনের সমন্বয়। এই সমন্বয় একটা জোড়াতাড়া নয়, পরিপূর্ণ জীবনদর্শন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—ভারতের বৈদিক যুগে এই পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শনের বাণীই একদল প্রতিভাশালী মহামানব উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ইঁহারাই ঋষি, পূর্ণ সত্যের দ্রষ্টা। ভারতের শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শনে, পুরাণে এই পূর্ণ সত্যের বাণীই নানা ছন্দে পাওয়া যায়। বৈদিক ভারতের শ্রুতিমন্ত্র বিদ্যা ও অবিদ্যার সমন্বয় ঘোষণা করিয়াছিল। শুধু বিদ্যার উপাসনা, শুধু অবিদ্যার উপাসনা কোনটাই শ্রেয়ঃফলপ্রদ বিবেচিত হয় নাই।

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥

ইহা বিদ্যা ও অবিদ্যার জোড়াতাড়া নহে, ইহা যথার্থ পরা ও অপরা জ্ঞানবিজ্ঞানের সমন্বয়—ইহা একটা সম্পূর্ণ জীবন-দর্শনেরই বীজমন্ত্র। যাহা দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, শুধু তাহাই নয়, যাহা দ্বারা অমৃতত্বকে সম্ভোগ করা যায়—তাহাই তো জীবনের সিদ্ধি ও পূর্ণতা। আর্য ভারত এই সিদ্ধ দর্শন, পূর্ণ জীবনেরই আদর্শবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিল—আর এই আদর্শের উপরই ভারতে জাতি-সংগঠনের সূচনাও সুসিদ্ধ হইয়াছে।

মধ্যযুগের ভারতে এই আদর্শের অপলাপ ঘটিয়াছিল। তাই বুদ্ধ ও শঙ্করের শূন্যবাদ, মোক্ষবাদ—তাই ভারতে একান্ত আধ্যাত্মিকতাই ক্রমে ধর্ম্ম-শব্দবাচ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ধর্ম্ম ক্রমে জীবন হইতে বিযুক্ত হইল; যাহা ইহবিমুখ, পরলোকসর্ব্বস্ব, তাহাই ধর্ম্মের চূড়ান্ত সিদ্ধি ও লক্ষণ—এই ধারণা বুদ্ধ-শঙ্কর-পরবর্ত্তী যুগের ভারতচিত্তকে ধীরে ধীরে অভিভূত করিয়া ফেলিল। এক্ষণে আমরা যখনই ধর্ম্ম লইয়া গৌরব করি, তাহা আর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, দিগ্বিজয়ী পূর্ণাঙ্গ জীবন-ধর্ম্ম নয়, তাহা একদেশদর্শী খণ্ড ধর্ম্মই—ইহার প্রমাণ বা দৃষ্টান্ত উদ্ধার করার নিশ্চয়ই প্রয়োজন হইবে না। আমাদের বর্ত্তমান ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনই তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাক্ষ্য ও প্রমাণ।

"প্রবর্ত্তক" এই খণ্ড দর্শন, খণ্ড ধর্ম্ম অস্বীকার করিয়াছে। সে অন্তর দিয়া বরণ করিয়াছে সেই আর্য অনুভূতি, সেই পরিপূর্ণ জীবনদর্শন, যাহার মধ্যে বিদ্যা ও অবিদ্যা, পরা ও অপরা, লীলা ও নির্ব্বাণ উভয়েরই সমন্বয় মিলিয়াছিল। যাহা একদিন সত্যই মিলিয়াছিল, তাহা হারাইব কেন? পূর্ণকে, অখণ্ডকে বিভক্ত, খণ্ড করিয়া আমরা ধর্ম্মকে সঙ্কীর্ণ, জীবনকে তাহার যথার্থ মহিমাবর্জ্জিত করিব কেন? এই পূর্ণদৃষ্টি, এই সিদ্ধ আদর্শানুভূতি অন্তরে লইয়াই আমরা উদীয়মান নব জাতিকে জীবনের জয়যাত্রায় বাহির হইতে চিরদিন আহ্বান করিয়াছি। আমাদের আহ্বান যুগেরও অনুকূল, জাতির শ্রেয়ঃ-পথেরই উত্তম সঙ্কেত বলিয়া যিনি একটু গভীর চিত্তে তলাইয়া ভাবিবেন, তাঁহারই নিকট সহজেই প্রতিপন্ন হইবে।

বাংলার আশাস্বরূপ তরুণ-তরুণীদের এই পূর্ণজীবন-দর্শনের চিন্তাসূত্র অধিগত করিতে হইবে। তাঁহাদের মস্তিষ্কে ইহার মূল তত্ত্ব ও তথ্যগুলি গভীরভাবে [illegible] করিয়া লইতে হইবে। যুগের শিক্ষায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দুই প্রস্থ যে দার্শনিক চিন্তার পরিচয় দিতেছে, তাহার অসম্পূর্ণতা কোথায় তাহা বুঝিয়া, অনুভূতির গভীরে উভয়োত্তর যে পরম সত্য নিহিত, তাহারই সন্ধান লইতে হইবে। এই অনুভবের সঙ্কেত পাই উপনিষদের শ্রুতিমন্ত্রে, ষড়দর্শনে, পুরাণে—তাহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্তও পাই ভারতের প্রাক্-বুদ্ধ-যুগের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে। বুদ্ধের পর, আচার্য্য শঙ্কর অবৈদিক শূন্যবাদ ধ্বংস করিতে গিয়া স্বয়ং কথঞ্চিৎ অভিভূত হইয়া পড়িলেও, তিনি বৈদিক কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মূল বেদীরক্ষার দুঃসহ প্রয়াস ও তাহাতে বিপুল সাফল্যলাভও করিয়াছিলেন। তাই শঙ্কর-পরবর্ত্তী ভারতের ইতিহাসেও অতীত ভারতের রাষ্ট্র-গৌরব ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় পুনঃ পুনঃ আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করিয়াছে দেখিতে পাই; কিন্তু পরিপূর্ণ জীবনধর্ম্ম বা ধর্ম্মজীবন তখন অনেকটা খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে; শঙ্করের বেদান্ত বা ব্রহ্মসূত্রের মায়াবাদী ব্যাখ্যা শূন্যবাদের বিরাট্ গহ্বরপূরণে সমুচিত দার্শনিক সেতু-রচনায় সমর্থ হয় নাই। পুরাণে ও তন্ত্রে যে জীবনবাদ-পূরণের প্রয়াস, তাহা খাঁটি দার্শনিক চিন্তাপ্রতিষ্ঠিত নহে। এ যুগের ভারতের সাধ্য হইবে—সে অসম্পূর্ণ প্রয়াস পূর্ণ করা, আর্য ভারতের পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন যুগের আলোকে ও সাধনায় জাতিজীবনে সর্ব্বতোভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। বাংলার চিন্তাক্ষেত্রে আচার্য্য বলদেব বিদ্যাভূষণ ও ধর্ম্মক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য এই জ্ঞান ও সাধনার শক্তিপূর্ণ বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন। নবীন বাঙালী প্রতিভা ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ ও তৎপরে শ্রীঅরবিন্দকে আশ্রয় করিয়া এই প্রয়াস আরও অগ্রবর্ত্তী করিয়াছে। ভবিষ্যৎ তরুণ জাতি এই কর্ম্মই সর্ব্বপ্রথমে সিদ্ধ করিবে।

নিখিল বঙ্গ প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের অধিবেশন

আগামী ডিসেম্বর মাসে নিখিল বঙ্গ প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন কলিকাতায় হইবে। ইহার জন্য আয়োজন চলিতেছে। সঙ্ঘের আদর্শবাদ ও কর্ম্ম জাতির নিকট একান্ত অপরিচিত না হইলেও, তাহা যুগ ও জাতির জীবন-সাধনায় ঠিক কোন দিক্ দিয়া আলো ও শক্তি সঞ্চার করিতে পারে, তাহা এখনও সুস্পষ্ট নয়। সঙ্ঘের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিমূলক আদর্শ ও নীতি এখনও জাতির চক্ষে অনেকখানি ধূমাচ্ছন্ন হেঁয়ালীর মত। জাতির মস্তিষ্কস্বরূপ রাজনগরীর বুকে তাহার কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান খ্যাতি ও গৌরব অর্জ্জন করিলেও, সেই কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের মূলে যে ভাব ও

আদর্শ, যে দার্শনিক চিন্তা ও সাধনা, তাহার সহিত অনেকেরই অধিক পরিচয় নাই। তাই এবার এই কলিকাতা অধিবেশন জাতির চিন্তাক্ষেত্রে সঙ্ঘের পরিচয়-স্থাপনের একটা সুবর্ণ সুযোগ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমরা শুনিয়া সুখী হইয়াছি যে, মহানগরীর নাগরিক-শ্রেষ্ঠ মাননীয় মেয়র মহোদয়ের নেতৃত্বাধীনে খ্যাতিমান্ মনীষী ও সুধীবৃন্দকে লইয়া ইহার জন্য একটী শক্তিশালী সমিতি গঠিত হইয়াছে। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সহিত সহযোগিতায় আমরা আশা করি, এই সমিতি জাতি-জীবনের এই যুগসন্ধিক্ষণে ভারতীয় অনুশীলনমূলক সঙ্ঘের সংগঠন-সাধনার পরিচয়ে ও প্রয়োগে জাতীয় চিন্তা ও সাধনাকেই সমধিক পরিপুষ্ট করিয়া তুলিবে।

এই অধিবেশনে সঙ্ঘের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে প্রতিনিধিবৃন্দ আসিয়া তাঁহাদের জাতিগঠনের পরিকল্পনা ও কর্ম্মনীতি লইয়া আলোচনা ও নির্দ্ধারণ করিবেন। সঙ্ঘের শুভানুধ্যায়ী, সংগঠনকামী সুহৃদ্গণও এই আলোচনায় যোগদান করিবেন। দেশের বরেণ্য নেতৃগণের শুভাগম ও আশীর্ব্বাদ হইতেও অধিবেশন বঞ্চিত হইবে না। দুই দিবসব্যাপী সম্মেলনের সহিত যে কৃষ্টি ও সংস্কৃতিমূলক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইতেছে, তাহারও বিশেষ গুরুত্ব এই প্রসঙ্গে বলিবার বিষয়। এই প্রদর্শনী সঙ্ঘের বিশিষ্ট সংস্কৃতি ও সাধনাকেই সমধিক পরিস্ফুট করিয়া তুলিবে। বলা বাহুল্য, এই প্রদর্শনী শুধু মেলা নয়, ইহা জাতীয় জীবন-গঠনেরই একটা ক্ষুদ্র প্রয়াস। যে হেতু আশ্রয় করিয়া এ জাতি বাঁচিবে, সেই হেতুর সন্ধান ভুলিয়া জাতির সাধনাই ব্যর্থ হয়—তাই সম্মেলনের চিন্তা ও আলোচনার সহিত এই প্রদর্শনীতে পরিদর্শিত মূর্ত্তি ও চিত্র প্রভৃতির মধ্য দিয়া জাতির এই মৌলিক জীবন-হেতুর পরিচয় স্পষ্টতর হইলে, তাহা জাতির শুভ বিধানই করিবে—তাহার ভবিষ্য জয়যাত্রায় অভিনব শক্তি সঞ্চার করিবে, ইহাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। আমরা তাই এই পুণ্যানুষ্ঠানে প্রত্যেক সহ নাগরিকের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সকল প্রকার সহায়তা একান্ত মনে কামনা করিতেছি।

শ্রেষ্ঠ লাভ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বিফল জীবন—জীবনে জেনেছি তবু
তোমারে যে ডাকা—বিফলে যায় না কভু।
কাতর-ব্যাকুল কণ্ঠে তোমারে ডাকা,
ছলছল চোখে উপরে তাকায়ে থাকা,
তুলসীর তলে ব্যথায় লুটানো মাথা,
সিক্ত বুকেতে তোমার আসন পাতা,
যায়না বিফল, বিফলে যাবার নয়,
পেয়েছি প্রমাণ পাইয়াছি পরিচয়।

এ জগতে নাই কিছুই অসম্ভব,
আঁধারেতে রাজে আলোকের উৎসব,
তোমার দয়ায়—ভক্ত প্রহরীবৎ
অভেদ্য গিরি নিজে করে দেয় পথ।
যাহা ভাবি হত—যাহা ভাবি মোরা গত—
ফিরে' আসে তারা গৃহেতে ফেরার মত।
যেখানে আমরা ভাবি হয়ে গেছে শেষ
সেথা দেখি নব শক্তির উন্মেষ।

শ্রদ্ধা হেলায় যখন যেখানে ডাকি,
নিজেই বুঝিনে কি ধন জমায়ে রাখি।
ভগ্ন হৃদয়—একেবারে নাহি বুঝি,
কি মণি করি যে কাল-ভাণ্ডারে পুঁজি।
যেই অঙ্কুর অজ্ঞাতে রাখি গাড়ি'
ফুটে পারিজাত—অশ্রু রোধিতে নারি।
রাজ্য ও রাজা ওলট পালট হয়,
হরিনাম শুধু বিফলে যাবার নয়।

তুচ্ছ জীবনে করেছি বৃহৎ লাভ
হেরেছি ডাকেতে হরির আবির্ভাব।
ভগবানে ডাকা, ডাকাই যে সফলতা,
সেই সম্পদ্—এ বড় সত্য কথা।
যে ধ্রুব তারকা নিভিয়াও নাহি নিভে,
সে কল্পতরু মরুতে মুঞ্জরিবে।
হও তন্ময়—ডাকো তাঁরে ডাক, ডাক,
তাঁহারি উপরে নির্ভর করে থাক।

অদায়ের ইতিহাস

শ্রীমানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

চার

ঠিক এই অবস্থাতে ত্রিষ্টুপের দিন কাটিতে লাগিল। জীবনটা মনে হইতে লাগিল একঘেয়ে। একটি দিনকে অবিকল আর একটি দিনের মত মনে করা নয়, কতকগুলি দিনের সমষ্টিগত পরিবর্ত্তনহীনতা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া। একান্ত একঘেয়ে জীবন যার, নিছক পুনরাবৃত্তি মাত্র, তার কাছেও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রত্যেকটি দিন একরকম হয় না। কালের ঘুম ভাঙ্গা আর আজের ঘুম ভাঙ্গা কারও এক নয়, এক নয় কালের ভোঁতা আনন্দ ও বিষাদ আজ আবার অনুভব করা। মানুষ হিসাব না ধরুক, খুঁটিনাটি বৈচিত্র্য প্রতিদিনই আসে অজস্র। একটি পিঁপড়ে যে আজ আমার পা বাহিয়া উঠিতেছে, সে কি নূতন কিছু নয়? কাল তো পিঁপড়ে ছিল না'!

কয়েকটা মাস কাটিয়া গেল, কোন দিক্ দিয়া অবস্থার প্রত্যাশিত কোন পরিবর্ত্তন ঘটিল না, জিভে খারাপ লিভারের স্বাদের মত ত্রিষ্টুপের মনে লাগিয়া রহিল ভয়ার্ত্ত ব্যাকুলতার বদ গ্লানি। নিজের আলস্য, অকর্ম্মণ্যতা, অপদার্থতা বা অক্ষমতার জন্য অনুতাপের জ্বালা হইলে তার এতটা কষ্ট হইত না। নিজে সে কিছু করিতেছে না, তা' যেন নয়। কিছু করিতে পারিতেছে না, তা'ও নয়। কিছু হইতেছে না। কোন এক অজ্ঞাত অকারণে, জীবনের কোন এক অনির্দ্দিষ্ট অনিয়মে, ব্যর্থতা না ঘটিয়াও সার্থকতার অভাবটা স্থায়ী হইয়া যাইতেছে।

আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয় নাই। নষ্ট হইলে বোধ হয় ভালই হইত—কিছুদিনের জন্য নষ্ট হইলে। আগুনে লোহা পোড়ানোর মত এ বিপদ্ ছাড়া মানুষের চলে না। ত্রিষ্টুপ যে জানে একদিন সে সাফল্য লাভ করিবেই করিবে, এই জানাটাই তাকে ঠাণ্ডা লোহার মত কঠিন করিয়া রাখিয়াছে, নূতন অবস্থার উপযোগী পরিবর্ত্তনের জন্য প্রয়োজনীয় নমনীয়তা সঞ্চয় করিতে দিতেছে না। আগে নিজেকে নূতন জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়ার উপযোগী করিতে না পারিলে, নিজের চেষ্টায় নূতন জীবন সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে কে? কিছু ঘটিবে না, এ ভয় ত্রিষ্টুপের নাই। কিছু ঘটিতেছে না বলিয়া ভয়ার্ত্ত ব্যাকুলতার বিশ্রী অনুভূতিটাই শুধু সে বোধ করিতেছে, পথ খুঁজিবার তাগিদ পাইতেছে না। এ তো মনের বিলাস ছাড়া কিছু নয়। রাজকন্যা ও রাজকুমারের মিলনে রূপকথার শেষ জানিয়াও কাহিনীর মাঝখানে কুমারের বিপদের পর বিপদ্ ঘটার সময়ে অসহায় ক্ষোভে কাতর হওয়া চলে। নিজের মনের রূপকথার নিজের এখনকার দুরবস্থায় ত্রিষ্টুপ অনায়াসে উদ্বিগ্ন হইতে পারিয়াছে।

বেতনের সমস্ত টাকাই ত্রিষ্টুপ বাপের হাতে তুলিয়া দেয়, অবিনাশ পঞ্চাশ টাকা রাখিয়া তাকে পঁচিশ টাকা ফেরত দেন। এটা প্রায় নিয়ম দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ত্রিষ্টুপের মনটা একটু খুঁৎ খুঁৎ করে। হাতখরচের জন্য অবিনাশ তাকে পঁচিশ টাকা সঙ্গে সঙ্গে ফিরাইয়া দিবেন, কিন্তু সে জানে ওই টাকাটা কাটিয়া রাখিয়া বাকী বেতনটা সে যদি অবিনাশের হাতে দেয়, একটু তিনি ক্ষুণ্ণ হইবেন। টাকার পরিমাণের জন্য নয়, তার দরকার আছে জানিলে সব টাকাই তিনি তাকে অনায়াসেই দিয়া দিবেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রথমে টাকাগুলি তার হাতে তুলিয়া দেওয়া চাই। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের এই ধরণের তুচ্ছ খুঁৎগুলি চিরদিন ত্রিষ্টুপকে পীড়া দেয়।

টাকা-পয়সা সম্পর্কে আর একটা পীড়াদায়ক অভিজ্ঞতা ত্রিষ্টুপ সঞ্চয় করিয়াছে। চাকরী পাওয়ার পর রমেশ বার তিনেক তার কাছে টাকা ধার করিয়াছে। সাহায্য নয়, ঋণ—পরে শোধ করিবে। শেষবার সে যখন কুড়িটি টাকা ঋণ চাহিল, ত্রিষ্টুপের হাতে একেবারেই টাকা ছিল না।

'বাবার কাছ থেকে চেয়ে দিচ্ছি।'

'বাবার কাছ থেকে? তা'—আমার নাম ক'রো না কিন্তু তাই।'

'বাবা তো জিজ্ঞাসা করবেন কি জন্য টাকা চাই?'

'ব'লো তোমার নিজের দরকার। নয় তো ব'লো কোন বন্ধু ধার চেয়েছে। আমার নাম ক'রো না, সে ভারি বিশ্রী ব্যাপার হবে।'

রমেশের বেকার অবস্থার জন্য ত্রিষ্টুপের বিশেষ সহানুভূতি ছিল না। নিজে সে হাতে পাওয়া চাকরী ছাড়িয়া দেওয়ার কথা ভাবে, সে বিশ্বাস করিতে পারে না যে চেষ্টা করিলে কোন মানুষের পক্ষে দিন চলার মত সামান্য উপার্জ্জন করা অসম্ভব। রমেশের অবস্থার জন্য রমেশকেই দায়ী করিয়া রাখিয়াছে। তবু প্রভার স্বামী টাকা যখন চাহিয়াছে, না দিলে চলিবে না। বিরক্তিতে মন ভরিয়া অবিনাশের কাছে টাকা চাহিতে গেল।

অবিনাশ বলিলেন, 'কুড়ি টাকা? কি করবি কুড়ি টাকা দিয়ে?'

ত্রিষ্টুপ বলিল, 'দরকার আছে।'

মা বলিলেন, 'অত খরচে হ'স্‌নে তিষ্টু।'

অবিনাশ বলিলেন, 'দরকার আছে জানি। কি দরকার শুনি না?'

ত্রিষ্টুপ বলিল, 'কি দরকার না শুনলে টাকা দেবে না?'

অবিনাশের মুখ গম্ভীর হইয়া গেল। আহত বিস্ময়ে তিনি ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মার হাতের কাজ বন্ধ হইয়া গেল।

'টাকা দেব না বলিনি তো তিষ্টু। টাকা দিয়ে কি করবি তাই শুধু জিজ্ঞাসা করছিলাম।'

ত্রিষ্টুপও তা' জানে। অবিনাশের শুধু জিজ্ঞাসা, আর কিছু নয়। কুড়ি টাকার বদলে কুড়িটি পয়সা চাহিলেও, অবিনাশ এমনিভাবে জানিতে চাহিতেন পয়সাটা কি কাজে লাগিবে। বাড়ীর বাহিরে যাইতে দেখিলে যেমন জিজ্ঞাসা করেন সে কোথায় যাইতেছে, এও তেমনি জিজ্ঞাসা।

তার সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত ছোট-বড় সব খবরই ওরা রাখিয়াছেন; প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না, এমন প্রয়োজন তার জীবনে উপস্থিত হইয়াছে, এ ধারণাই ওদের নাই। ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝিতে পারিয়া মনটা ত্রিষ্টুপের বড় খারাপ হইয়া গেল। টাকা সে নিক, খরচ সে করুক, সেটা ভিন্ন কথা। কিসে টাকা খরচ করিবে, একটু জানিবার অধিকার তার বাপ-মা দাবী করেন। টাকা যদি সে নষ্ট করিতে চায়, তাও সে করুক। কিছু না বলার চেয়ে সে অনেক ভাল। এ গোপনতার মানেই স্পষ্ট ভাষায় তার ঘোষণা করা যে, এতদিন যা করিয়াছ করিয়াছ, এখন হইতে আমার সমস্ত বিষয়ে তোমরা মাথা ঘামাইতে আসিও না।' শুধু অবিনাশের একটি প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করায় আজ মতের অমিল, অবাধ্যতা আর কলহের চেয়েও বিশ্রী ব্যাপার ঘটিয়া গেল।

হাতে দেওয়ার বদলে টাকাটা ত্রিষ্টুপ রমেশের সামনে ফেলিয়া দিল। ইচ্ছা করিয়া নয়, মনে অশ্রদ্ধা থাকিলে সময়বিশেষে আপনা হইতেই সেটা প্রকাশ হইয়া যায়।

রমেশ বলিল, 'শীগ্‌গির তোমার টাকা ফিরিয়ে দেব ভাই, দু' এক মাসের মধ্যে। কত যেন হ'ল সব শুদ্ধ?'

টাকাটা ওভাবে ছুঁড়িয়া দিয়া ত্রিষ্টুপ একটু অনুতাপ বোধ করিয়াছিল, রমেশের অমায়িকতা দিয়া অপমান চাপা দিবার এই চেষ্টায় আবার তার পিত্ত জ্বলিয়া গেল।

'আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে।'

তখন উদ্ধত ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া চোখ পাকাইয়া রমেশ বলিল, 'তার মানে? ও রকম বাঁকা করে কথা বলছ যে?'

'বাঁকা করে কি বললাম?'

'বুঝি, বুঝি। আমরা ওসব বুঝি। ভাবছ যে ধার বলে নিচ্ছে, তার মানেই তাই। কাজ নেই ভাই তোমার টাকা নিয়ে আমার, বরং কাবলীওলাকে খত লিখে দেব।'

দিন সাতেক পরে ত্রিষ্টুপ আপিস হইতে বাড়ী ফেরা মাত্র প্রভা একতাড়া নোট হাতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। [illegible]কে দেখাইয়া নোটের তাড়া হইতে পঁচিশ টাকার নোট বাছিয়া সামনে ফেলিয়া দিল।

'তোমার টাকা।'

'সুদ কই?' ত্রিষ্টুপ হাসিবার চেষ্টা করিল। এদের বিকৃত অভিমানের পরিচয় তো সে জানে, কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা পাইল না।

নোটের তাড়াগুলি আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে প্রভা নিজেই বলিল, 'চিরকাল কারো সমান যায় না। দু'দিন

অবস্থা একটু খারাপ হলে কি রকম যে করে সবাই! সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে যেন ফতুর করে দিল।' প্রভার চোখ জলে ভরিয়া যায়, 'মনে থাকবে সব, কত লাথি ঝাঁটা অপমান জুটেছে। এতদিন চুপ করে সব সয়েছি, আর তো চুপ করে থাকব না।'

লাথি ঝাঁটা অপমান! চুপচাপ সব সহ্য করা! হাসিবে না কাঁদিবে, ত্রিষ্টুপ বুঝিতে পারিল না। সারাদিন প্রভা সকলের সঙ্গে ঝগড়া করিল, বাপ-মাকে কাঁদাইল এবং নিজেও কাঁদিল। ' সকলকে সে আঘাত করিতে চায় না, প্রমাণ করিতে চায় যে, এতদিন সকলের কাছে তার শুধু অনাদর আর অপমানই জুটিয়াছে। রমেশের চাকরী থাকিলে বাপের বাড়ীতে দিন কাটাবার সময়ে সকলের যে কথা ও ব্যবহার তার কাছে সহজ ও স্বাভাবিক ঠেকিত, রমেশের চাকরী ছিল না বলিয়া সেই কথা ও ব্যবহারের মধ্যেই এতকাল কত কিছু আবিষ্কার করিয়া অভিমান করিয়াছে। নিজের এই বিকারকে সে সমর্থন করিতে চায়। সেই চেষ্টায় একেবারে হুলস্থূল কাণ্ড বাধাইয়া দিয়া রমেশের সঙ্গে চলিয়া গেল।

রওনা হওয়ার আগে রমেশ অবিনাশকে বলিল, 'আপনার খুব টাকার টানাটানি চলেছে শুনছিলাম?'

অবিনাশ বলিলেন, 'কই না? চলে' যাচ্ছে এক রকম। ত্রিষ্টুর চাকরীটা হয়ে—'

'আমি কিছু টাকা দিলে কি আপনার অপমান হবে? আমি তো আপনার ছেলের মত।'

অবিনাশের মনে ছিল না; কিন্তু ত্রিষ্টুপের এখন মনে পড়িয়া গেল, রমেশ টাকা ধার চাহিতে আসিলে, তিনি টাকা ধার দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, 'ধার দিতে পারব না বাবা। ধার চাওয়াটাও [illegible] উচিত হয়নি। তুমি এমনি টাকা নাও। আমার কাছে টাকা নিতে তোমার অপমান কি? তুমি তো আমার ছেলের মত।' ছেলের মত বলিয়া তাকে টাকা ধার দেওয়ার বদলে একেবারে দান করিতে চাওয়ায় রমেশের সেদিন রাগ হইয়াছিল। এতদিন সেই রাগ মনে পুষিয়া রাখিয়াছে, আজ সেই ঋণ মিটাইতে চায়।

ত্রিষ্টুপের যেন ধাঁধা লাগিয়া গেল। এক বিষয়ে এত তীক্ষ্ণ মান অপমান জ্ঞান, এত তেজ, অথচ সবটাই বিকার। কতগুলি বিষয়ে মানুষটা সুস্থ ও স্বাভাবিক, আবার কতগুলি বিষয়ে এমন খাপছাড়া বলিবার নয়। বেকার জীবন কি এমনি সব মানসিক রোগের সৃষ্টি করে?

অবিনাশ আনন্দ ও আবেগে রমেশের হাত চাপিয়া ধরিলেন।—'না বাবা না, অপমান কিসের! এখন তো দরকার থাকলে তোমার কাছ থেকে নিতাম বৈকি। নিজে চেয়ে নিতাম।'

খোঁচাটা বিঁধিল না দেখিয়া রমেশ বোধ হয় একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াই চলিয়া গেল।

কোথায় কি কাজ সে পাইয়াছে, এত টাকা হঠাৎ সে কোথা হইতে পাইল, এসব স্পষ্ট করিয়া কিছুই তার কাছে জানা গেল না। প্রশ্ন করিয়া পাওয়া গেল শুধু ভাল ভাল জবাব। ঠিক চাকরী নয়, এজেন্সীর মত কি যেন তার একটা জুটিয়াছে।

ত্রিষ্টুপের মনে আঘাত লাগিল বৈকি! স্বামীর ধার-করা পঁচিশটা টাকা তার গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া প্রভা তাকে যে ভাবে আঘাত করিতে চাহিয়াছিল, সে ভাবে নয়। রমেশের অবস্থার আকস্মিক পরিবর্ত্তনটাই তাকে যেন ঝাঁকি দিয়া গেল। রমেশ অপদার্থ, জীবনে কোনদিন তার অভাব ঘুচিবে না, এই ছিল মানুষটা সম্বন্ধে তার ধারণা। কেবল পরিবর্ত্তন নয়, নিজের অবস্থার খুব ভাল রকম পরিবর্ত্তনই সেই রমেশ করিয়াছে। তার কাছে মনে হইতেছে আকস্মিক, কিন্তু এ উন্নতি হয়তো রমেশের অনেকদিনের চেষ্টার ফল। স্বামীর সঙ্গে বিদায় হইয়া যাওয়ার তিন চার দিন পরেই প্রভা একবার এ বাড়ীতে আসিয়াছিল, যাওয়ার দিন যে কাণ্ড করিয়া গিয়াছিল সেজন্য সকলের হাতে পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিতে।

ক'দিনের মধ্যে গায়ে গয়না চাপানোর সুযোগ সে পায় নাই, তবে নূতন সে কাপড়খানা পরিয়া আসিয়াছে তার দাম অনেক। তাকে পৌঁছিয়া দিতে গেল ত্রিষ্টুপ। প্রভাই একরকম জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। রমেশ একটি সুশ্রী নূতন বাড়ী ভাড়া করিয়াছে, ইতিমধ্যেই

কয়েকটি আসবাব কিনিয়াছে দামী দামী। এতদিনের পুরাণো জিনিষপত্রের গায়ে আঁটা দারিদ্র্যের পরিচয়ের মধ্যে স্বচ্ছলতার আরও অনেক চিহ্ন দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

প্রভার কপাল ফিরিয়াছে ভাবিয়া এক দিকে ত্রিষ্টুপের বুকটা যেমন হাল্কা হইয়া গেল, অন্য দিকে রমেশের মত মানুষ যা পারিয়াছে নিজে সে তার চেষ্টা পর্য্যন্ত সুরু করিতে পারিল না ভাবিয়া মন তার ভারি হইয়া রহিল। মনে হইতে লাগিল, তার দ্বারা বোধ হয় কিছু হইবে না। সে শুধু কল্পনা করিতে জানে, তার শুধু স্বপ্ন দেখা। নিজে সে অক্ষম, অপদার্থ। নিজের সম্বন্ধে ধারণাটাই শুধু তার বড়।

আত্মবিশ্বাস ভাঙ্গিয়া পড়ার আগুনে পুড়িতে পুড়িতে তার দিন কাটিতেছিল, এক সপ্তাহ পরে রমেশকে পুলিশে ধরিয়া নিয়া গেল এবং প্রভা কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিল বাপের বাড়ী। ত্রিষ্টুপের মনে হইল, একটা চোখে যেন এতদিন তার দৃষ্টি ছিল না, হঠাৎ সেই পুরাতন অন্ধ চোখে নূতন দৃষ্টি আসিয়াছে

(ক্রমশঃ)

ভারত-দেবতা—শ্রীকৃষ্ণত্রয়

শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের অখণ্ড সংস্কৃতি ও সভ্যতার বনিয়াদ রচনা ব্যাপারে তিন কৃষ্ণের প্রধান স্থান,—বাসুদেব কৃষ্ণ, পারাশর কৃষ্ণ (ব্যাসদেব) এবং পাণ্ডব কৃষ্ণ (অর্জ্জুন)। ভারতীয় ইতিহাসে বাসুদেব ও অর্জ্জুন নারায়ণাবতার ও নরাবতার রূপে গৃহীত হইয়াছেন এবং ব্যাসদেব ভগবানের জ্ঞানাবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ব্যাসদেব স্বয়ং গীতায় লিখিয়াছেন,—"যত্র যোগেশ্বরঃ যত্র পার্থ ধনুর্দ্ধরঃ তত্র শ্রীর্বিজয়োভূতি ধ্রুবা নীতির্ম্মতি র্মম।" শ্রীকৃষ্ণের যোগশক্তি ও বিরাট্ আদর্শ, তাঁহার সার্ব্বভৌম অনন্যসাধারণ 'Organising genius and creative idealism' তাঁহার 'national-ism'-এর ভিত্তির উপরে 'universalism'-এর সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা সমগ্র ভারতকে একসূত্রে গ্রথিত, এক আধ্যাত্মিক আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত, এক সামাজিক চেতনা দ্বারা সঞ্জীবিত করিবার বনিয়াদ রচনা করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের আনুগত্যে অর্জ্জুনের 'military power' (অর্জ্জুনেরও এক নাম কৃষ্ণ) অখণ্ড ভারত-প্রতিষ্ঠার সমস্ত প্রতিকূল শক্তিকে পরাভূত করিয়া এক মহাসাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত করিতে শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ হস্তের ন্যায় কার্য্য করিয়াছে। যদিও অর্জ্জুন নিজের সত্তাকে শ্রীকৃষ্ণের সত্তা হইতে ও অখণ্ড সাম্রাজ্যের symbol স্বরূপ যুধিষ্ঠিরের সত্তা হইতে পৃথক্‌ভাবে কখনও assert করেন নাই, তথাপি মহাভারতে তাঁহার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। বাসুদেবার্জ্জুনের সম্বন্ধের ভিতরেই ভারতের জাতীয় জীবনের আদর্শ নিহিত। ধনুর্দ্ধর পার্থ যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত প্রাণ হইয়াই স্বীয় পুরুষকারকে সার্থকতামণ্ডিত করিয়াছে এবং বহুধাবিভক্ত এই মহাদেশকে এক 'মহাভারতে' উন্নীত করিয়াছে। যে culture-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ এই মহাদেশের বহু জাতির একীকরণ পূর্ব্বক এক অনন্যসাধারণ অমর জাতির সংগঠন ও অমর [illegible]র প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, পারাশর কৃষ্ণ বেদব্যাস সেই culture-এর মহান্ আচার্য্য, তিনিই ইহাকে ভাষায় স্থায়ী রূপ প্রদান করিয়াছেন এবং সমাজের সকল স্তরে ইহাকে প্রচার করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের জীবনসাধনা ও আদর্শ শিক্ষা মহাভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত।

বাসুদেব-পাণ্ডব মহাভারতপ্রতিষ্ঠাতা এবং বাদরায়ণ মহাভারতের ঋষি। মহাভারতীয় যুগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আর্য্যজাতির আত্মরক্ষা, আত্মপ্রসার ও আত্মসংগঠনের

ইতিহাস। ভারতীয় অনার্য্যগণ অসুর, দৈত্য, দানব, যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতি পরাক্রমশালী জাতিসমূহ বৈদিক আর্য্যগণ অপেক্ষা ঐহিক অভ্যুদয়ের সাধনায়, অর্থকামের সাধনায়, অনেকাংশে উন্নততর ছিলেন। তাঁহারা 'world-conquerors and empire-builders' ছিলেন; 'town-planning architecture', 'bridge-construction, military science, political tactics' ইত্যাদি অনেক বিষয়ে আর্য্যগ্রন্থকারগণ তাঁহাদের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদিতে ইহার প্রচুর নিদর্শন। কিন্তু আর্য্যগণ ক্রমশঃ জয়ী হইতেছিলেন তাঁদের জীবনাদর্শের শ্রেষ্ঠত্বে। তাঁদের 'outlook on life and the world' শ্রেষ্ঠতর ছিল। তাঁহারা 'বেদ' লাভ করিয়াছিলেন, বিশ্বের প্রাকৃতিক বিধানের মূলে ধর্ম্মের বিধান দর্শন করিয়াছিলেন, আধিভৌতিক নিয়মাবলীর অন্তরালে তাঁহারা আধিদৈবিক শক্তি ও বিধানের সন্ধান পাইয়াছিলেন, অর্থ ও কামের আদর্শ অপেক্ষা ধর্ম্মের আদর্শ—যজ্ঞের আদর্শ—তাঁহারা শ্রেষ্ঠতর বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। তাঁহাদের বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্য, রাজ্যভোগ-সুখের সাধনা ছিল যজ্ঞার্থে সব উৎসর্গ করিয়া দিয়া স্বর্গীয় জীবনের অধিকারলাভের উদ্দেশ্যে। যজ্ঞের মূল কথা 'collective welfare'-এর জন্য অর্থসম্পদাদি আহুতি প্রদান করিয়া 'individual life'-এর সার্থকতা সম্পাদন 'Fulfilment of individual life through self-sacrifice in social good.' তাঁহাদের সমাজগঠন ও রাষ্ট্রগঠনও সেই আদর্শের অনুবর্ত্তনে—সবই সমাজতান্ত্রিক; কিন্তু তাহাতে 'individual'এর কেবল 'sacrifice' নয়, কারণ 'individual'এর জীবনদেবতাই সমাজদেহে তাঁর পূজা গ্রহণ করেন ও সমাজশক্তির ভিতর দিয়া জীবন নিয়ন্ত্রিত ও সুব্যবস্থিত করেন। সমাজ আত্মা বা ব্রহ্মেরই বিরাট্ দেহ। 'জগদ্ধিতায়' জীবনের সর্ব্ববিধ সম্পদের আহুতি প্রদান দ্বারাই 'আত্মনোমোক্ষঃ'। একই ঈশ্বর সকলের জীবনদেবতা, সকল যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর, বিশ্বনিয়ন্তা ও কর্ম্মফলপ্রদাতা।

এইরূপ উন্নততর জীবনাদর্শ থাকাতেই বিশ্ববিধানে ক্রমশঃ আর্য্যজাতি জয়লাভ ও আত্মবিস্তার করিতেছিল। 'World conquerors and imperialistic powers' কালক্রমে ভগবদ্বিধানে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছিল। অনার্য্যগণ আর্য্যদের নিকট নতশির হইতেছিল। অনেক জাতি লুপ্ত ও অনেক জাতি দেশত্যাগী হইতেছিল। অনেকে আর্য্যসংস্কৃতির আনুগত্য স্বীকার করিতেছিল। শ্রীরামচন্দ্র সেই অনার্য্যদেরই একটা 'depressed section'কে অদ্ভুত ভাবে 'organise' করিয়া তাৎকালিক 'greatest imperialistic power'-এর ধ্বংস সাধনপূর্ব্বক আর্য্যসংস্কৃতির বিজয়-পতাকা ভারত মহাদেশের দক্ষিণতম প্রান্ত পর্য্যন্ত বহন করিয়া লইয়াছিলেন। সেইজন্যই রামচন্দ্র অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবতার। এই হেতুই এখন পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বত্র শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু আর্য্যানার্য্যের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমন্বয়ের ভিতর দিয়া মহাভারতের অভ্যুদয়ে এক অখণ্ড হিন্দু জাতি, হিন্দু সমাজ ও হিন্দু সভ্যতার সৃষ্টি হইতে তখনও অনেক বাকী ছিল; আর্য্যসংস্কৃতির মধ্যেই তৎসম্বন্ধে অনেক অন্তরায় ছিল। আর্য্যজাতির আধিপত্য ভারতে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিলেও, অনার্য্যদিগকে হজম করিয়া এক বিরাট্ সমাজ-সংগঠনের শক্তি ও প্রতিভা তৎপূর্ব্বে আবির্ভূত হয় নাই। তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব, অর্জ্জুনের শ্রীকৃষ্ণানুগত্য ও সংগ্রামশক্তি, ব্যাসের universityর আবশ্যকতা ছিল।

আর্য্যজাতির মধ্যেও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জটিলতা ও গোলমাল উপস্থিত হইয়াছিল। যথা বহু war lordএর উদ্ভব, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য লইয়া সংঘর্ষ, যজ্ঞবাদ মোক্ষবাদের ঝগড়া, অভ্যুদয়মূলক ও নিঃশ্রেয়সমূলক সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিবাদ ও জাতিবাদে প্রতিযোগিতা, ইত্যাদি। এই সব নিয়াই মহাভারতীয় যুদ্ধের পরিস্থিতির উদ্ভব। ইহার সমাধানকল্পেই শ্রীকৃষ্ণত্রয়ের আবির্ভাব।

মহাভারতের মধ্যে সমস্ত situationটীর পরিচয় পাওয়া যায়, সবগুলি সমস্যার আলোচনা দৃষ্ট হয়, এবং শ্রীকৃষ্ণের আদর্শানুসারে তাহার সমাধানের পথ প্রদর্শিত দেখা যায়। গীতার উপদেশ এই মহাভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থলে বিরাজমান—ইহা শ্রীকৃষ্ণের জীবনাদর্শ, যাবতীয় কর্ম্মপ্রচেষ্টা এবং মহাজাতিগঠনপরিকল্পনার সারসঙ্কলন।

পাণ্ডবগণ ও তদনুবর্ত্তীদের সাহায্যে ভারতের খণ্ড খণ্ড military powerএর ধ্বংসসাধন করিয়া যুধিষ্ঠিরের রাজ-চক্রবর্ত্তিত্ব স্থাপন দ্বারা সমস্ত ভারতের political unityর ব্যবস্থা হইল। বিভিন্ন ক্ষত্রিয় জাতিসমূহের মধ্যে এবং প্রধান প্রধান ক্ষাত্রবীর ও অনার্য্য রাজবংশের মধ্যে বন্ধুত্ব ও বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সামাজিক ঐক্যের ব্যবস্থা করা হইল। বেদ-উপনিষৎসমূহকে একত্র গ্রথিত ও সুসজ্জিত করিয়া তাহাকে সমগ্র জাতীয় সংস্কৃতির সনাতন ভিত্তিরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইল। তাহার অনুবর্ত্তী থাকিয়াই দেশকালাবস্থানুসারে সর্ব্বপ্রকার স্বাধীন চিন্তা, দার্শনিক গবেষণা, নূতন নূতন বিধি-ব্যবস্থা প্রভৃতি দ্বারা জাতি, সমাজ ও ব্যক্তির উৎকর্ষসাধনের পথ খোলা রাখা হইল। মহাভারত-রূপ পঞ্চম বেদ রচিত হইয়া ঐতিহাসিক কাঠামোর মধ্যে সকল প্রকার আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক প্রশ্নের মীমাংসার পথ প্রদর্শিত হইল। অনার্য্যগণের সাধনলব্ধ সব সম্পদ্ আর্য্য principle-এর সহিত মিশাইয়া ভারতীয় ধর্ম্মকে আর্য্যানার্য্য সকলে বিশ্বমানবের গ্রহণযোগ্য করা হইল। তাদের 'materalistic civilization'-এর সব বিদ্যাগুলি আর্য্য সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইল। যজ্ঞ, যোগ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, বর্ণাশ্রমবিভাগ প্রভৃতি আর্য্যসংস্কৃতির সব উপাদেয় বিষয়গুলির তাত্ত্বিক রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া সে সবকেই বিশ্বজনীন করিয়া তোলা হইল। 'Nationalism'-এর ভিত্তির উপর Cosmopolitism গড়িয়া তোলা হইল। 'অনুষ্ঠান' অপেক্ষা তত্ত্বের উপর বেশী জোর দিয়া এবং তত্ত্বোপলব্ধির জন্য অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়া, অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্য এবং দেশকালব্যবস্থানুসারে পরিবর্ত্তনের সুযোগ দেওয়া হইল, সকল অনুষ্ঠানেরই মূলতত্ত্ব ও উদ্দেশ্য যাহাতে অবিকৃত থাকে, তদনুকূল বিধিব্যবস্থা হইল। ভারতের যে কোন অংশে যে কোন গ্রহণযোগ্য মত ও পথ, সাধনপদ্ধতি, আচারপদ্ধতি—কাপালিক মত, নানাপ্রকার তান্ত্রিক পদ্ধতি—সবই আর্য্য সাধনার অঙ্গীকৃত হইল। পুরাণাদির ভিতর দিয়া এই বিশ্বজনীন সংস্কৃতি নানাভাবে মানবসমাজের নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইল। অসুর, দৈত্য, রাক্ষস, বানর প্রভৃতি ভেদনির্দ্দেশক উপাধি আর পরবর্ত্তী হিন্দুশাস্ত্রে স্থান পাইল না; তাহারা সব আর্য্য-সমাজের কুক্ষিগত হইয়া গিয়াছে। শুধু বাকী রহিল, কার্য্যতঃ জাতির সর্ব্বত্র সকল শ্রেণীকে ঐ বিশ্বজনীন আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত করা, সকল শ্রেণীর মধ্যে ভারতীয় শিক্ষা বিস্তার করা। এই কার্য্য এখনও বাকী রহিয়াছে। কিন্তু আদর্শ তাঁহারা যাহা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তদপেক্ষা নূতন কিছু বলিবার নাই। অবস্থানুসারে তার প্রয়োগবিধি জানাই আবশ্যক। নূতন নূতন অবস্থায় নূতন নূতন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিয়াছেন, নূতন নূতন formula দিয়াছেন, আবার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, আবার নূতন নূতন অন্তরায় সৃষ্টি হইয়াছে, আবার নূতন মহাপুরুষ আসিয়াছেন। বর্ত্তমান অবস্থায়ও সেই মহাভারতীয় সংস্কৃতির পুনরভ্যুত্থান হইলেই, শুধু ভারতের নয়, সমগ্র মানব সমাজের উপস্থিত সমস্যাসমূহের সমাধান হইতে পারে। সেই কৃষ্ণত্রয়কে মস্তকে লইয়া—সেই প্রাণশক্তি, সেই সংগ্রামশক্তি ও সেই জ্ঞানশক্তির উদ্বোধন করিয়া—ভারতের অনার্য্যকে মহাভারতীয় জাতিগঠন ও বিশ্বসভ্যতার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

৩০

যে স্বতন্ত্র বাড়ীখানিতে আমরা আশ্রয় লইলাম, তাহাই পণ্ডীচারী আশ্রমের বিস্তৃতির প্রথম পদক্ষেপ বলিতে হইবে। শ্রীঅরবিন্দ যে বাড়ীতে থাকিতেন, সেখানে আর তিলধারণের ঠাঁই ছিল না। আমার আগমন-সংবাদে শ্রীঅরবিন্দ এই নূতন বাড়ী ভাড়া লইয়াছিলেন। এখানে এই সময়ে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, "নারায়ণ" মাসিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক শ্রীনলিনী সরকার ও দুইজন মান্দ্রাজী বন্ধু পূর্ব্ব হইতেই আসন পাতিয়াছিলেন। আমরা চারি জন আসিয়া এইখানে একটী স্বতন্ত্র সংসার পাতিয়া বসিলাম। আমাকে শ্রীঅরবিন্দ অধ্যাত্মসাধনা হইতে কর্ম্মক্ষেত্রেও অল্লাধিক অভিজ্ঞ বলিয়া মনে করিতেন। আজিকার মত সেদিনও কর্ম্মদক্ষ বলিয়া আমার খ্যাতি ছিল। শ্রীঅরবিন্দ এই প্রত্যয়ে আমার হাতে এক তাড়া নোট গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন "চন্দননগরের ন্যায় এখানেও তোমায় ঐ নূতন সংসারের সকল ভারই গ্রহণ করিতে হইবে।" তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম। আমি নিশ্চয় জানিতাম—আমার জীবন-সঙ্গিনী এই ক্ষুদ্র সংসারটীকে অবলীলাক্রমে গুছাইয়া লইবেন। কিন্তু আমরা দুইজনই একদিক্ দিয়া খুবই কাঁচা ছিলাম। শ্রীঅরবিন্দ এ কথা জানিতেন না; এখনও অনেকে জানেন না—আমরা পতি-পত্নী দুইজনেই সেবার অধিকার পাইয়াছিলাম, কিন্তু আর্থিক সম্পর্ক দুই জনেরই ছিল না। অর্থের হিসাব আমরা কোনদিনই রাখি না[illegible] আমাদের স্পর্শ করিতে হয় নাই। আজ তিনি পরলোকে; আমার সেই একই অবস্থা এখনও। অতএব সেদিন শ্রীঅরবিন্দের এই নূতন সংসারের ভার লইলাম বটে, কিন্তু অর্থের হিসাব রাখা আমার পক্ষে দায় হইয়া উঠিল। তবে এক মান্দ্রাজী—পাচক ও ভৃত্য এই কার্য্য করার জন্য এ বাড়ীতে নিযুক্ত ছিল, সেই ব্যক্তিরই কিছু দিন বৃহস্পতির দশা চলিয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ রহিল না। সে বাজার-হাট করিয়া যাহা হিসাব দিত, তাহাই আমাদের গ্রাহ্য করিয়া লইতে হইত। যাহাই হউক, চন্দননগরের ন্যায় পাকশালায় মান্দ্রাজী পাচকের সাহায্যে আমার স্ত্রী দুই বেলা সারি সারি এক ঘরে পাতা পাতিতেন; চন্দননগরের মত তিনিই পরিবেশন করিয়া আমাদের পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইতেন।

দিন এমন করিয়াই চলিতেছিল। আমরা প্রতিদিন প্রভাতে শ্রীঅরবিন্দের নিকট উপস্থিত হইতাম। শ্রীঅরবিন্দ বাহিরের বারান্দায় সেই সুপরিচিত টেবিলের এক পাশে কোঁচার খুঁট গায়ে দিয়া বসিতেন, আর আমরা পতি-পত্নী দুই জনে টেবিলের পাশে দুইখানি চেয়ারে বসিতাম। তাঁহার সহিত আলাপ-আলোচনা চলিত। কোন কোন-দিন ধ্যানও বেশ জমিয়া উঠিত। সেখানে আমরা তিনজন ব্যতীত এই সময়ে অন্য কেহ থাকিত না।

অপরাহ্নেও এই একই কর্ম্ম ছিল। তবে এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দকে ঘিরিয়া শ্রীমতী মীরা ও তাঁহার সহকারিণী মিস্ হড্‌সন্ ব্যতীত তাৎকালীন পণ্ডিচারী আশ্রমের সকল অধিবাসী সমবেত হইতেন। হাসি ও কথার অন্ত থাকিত না। মহিলা সভ্যার মধ্যে আমার স্ত্রী ও নলিনীকান্তের নববধূ ইন্দু গুপ্তাও এই অধিবেশনে যোগদান করিতেন। এই দুই সময় ব্যতীত, অন্য কাহারও সহিত একত্র হওয়ার আমার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আমার অপর দুই জন সঙ্গী অন্যান্য বন্ধুদের সহিত আলাপ-আলোচনা করার প্রচুর সুযোগ পাইত।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমরা দুইজনে বিদায় লইয়া পথে বাহির হইতাম। কোনদিন পণ্ডিচারীর বড়বাজারের দিকে নানাবিধ বিপণিশ্রেণী ও পণ্ডিচারীবাসীদিগের চাল-চলন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমরা দুইজনেই কৌতুক অনুভব করিতাম; কোনদিন বা পীয়ারে সমুদ্রতীরের জেটীতে গিয়া বসিতাম; সম্মুখে তরঙ্গায়িত অসীম বারিধির বক্ষে

দুইজনেই অনিমিষে চাহিয়া থাকিতাম। কখনও কখনও দেখিতাম—নলিনী সরকার ও নলিনী গুপ্তের সহিত শ্রীমতী ইন্দুবালাকে। সেই প্রবাসে আমার পত্নীকে দেখিলেই 'দিদি' বলিয়া তাঁহার পাশে ইন্দু আসিয়া উপবেশন করিত। কত কথাই যে কহিত, তাহার ইয়ত্তা নাই। শ্রীমতী ইন্দুবালা আমাদের দুইজনেরই অকপট স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছিল।

শ্রীঅরবিন্দ ও আমার আবাসবাটীর মধ্যে যে দূরত্ব, তাহা দূর করিত আমাদের পরম স্নেহের ইন্দু। সে আমাদের খুঁটিয়া খুঁটিয়া ওবাড়ীর সংবাদ সরবরাহ করিত। এ বিষয়ে আমার কোনই কৌতূহল ছিল না। কিন্তু নারী-হৃদয়ের স্বভাবৌৎসুক্য বশতঃ আমার স্ত্রী ওবাড়ীর সকল সংবাদই তাহার নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতেন এবং স্বভাবতঃ সকল কথাই আমার কাণে তুলিয়া দিতেন। এই সকল কথার মধ্যে শ্রেয়ঃ বিষয় বিশেষ থাকিত না। আমাদের লইয়া ও-বাড়ীতে যে সকল আলোচনা হয়, সেই সকল কথাই বেশী থাকিত। শ্রীঅরবিন্দের সহিত ইহার কোনই সম্পর্ক ছিল না। আমারই সহযাত্রী একজন এই সকল আলোচনার সর্ব্বপ্রধান অগ্রণী হইয়াছিল।

একদিনের সংবাদ—শ্রীঅরবিন্দের নীচের ঘরে ফ্রয়েড প্রসঙ্গ লইয়া নাকি অনেক আলোচনা হইয়াছে। আমার স্ত্রী সেই যে প্রথম দিনে শ্রীঅরবিন্দের সাক্ষাৎমাত্র বহুক্ষণ চেতনাহারা হইয়াছিলেন, সেই সূত্র ধরিয়া আমার এই সহযাত্রী বন্ধু এই সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছেন যে, মতি-বাবুর স্ত্রী ফ্রয়েডের থিওরি অনুসারে উচ্চতম পুরুষের নিকট আত্মনিবেদনের প্রেরণা পাইয়াছেন। কথাটীর মধ্যে কোনই দোষ ছিল বলিয়া মনে হয় নাই; কিন্তু ইহার সঙ্গে আমার স্ত্রী যে সদম্ভে শ্রীঅরবিন্দের সংসর্গ ই চাহেন, মীরা দেবীর সম্পর্কে আসিতে ইচ্ছুক নহেন, এই অপ্রিয় আলোচনাই গুরুতর বলিয়া অনুভূত হইল। আমার স্ত্রীও এই কথায় একটু অস্বস্তি অনুভব করিলেন। এই বিদেশে তাঁহার মনে কোনরূপ দ্বন্দ্ব থাকিলে, শ্রীঅরবিন্দের অযাচিত দান-গ্রহণে তিনি সমর্থা হইবেন না, ইহা ভাবিয়া তাঁহার সহিত এই সকল বিষয় লইয়া কিছু আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার অন্তরের অভিব্যক্তি আমার অন্তরে আনন্দের সঙ্গে এক অজানা আশঙ্কার সঞ্চার করিল।

শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে তাঁহার কথা যে, তিনি যখন তাঁহার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনি দেখিলেন এক অনিন্দ্য দেবমূর্ত্তি। যখন আমি অবনত শিরে তাঁহার চরণে ভূনত হইলাম, তখন তিনি যেন আপনার অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলিলেন। তাঁহার সমস্ত দেহ-মন অবনত হইয়া পড়িল। আপনার পার্থক্যজ্ঞান তিরোহিত হইল—আমার সঙ্গে একীভূত হইয়া তিনি শ্রীঅরবিন্দের চরণে আছাড় খাইয়া পড়িলেন। এই সময়ে তিনি নিজের অথবা আমার কোন অস্তিত্বই অনুভব করিতে পারেন নাই। যেন একটা নতির প্রবাহই তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতেছিল। এই কথা তিনি যে ভাষায় সেদিন ব্যক্ত করিয়াছিলেন, উহাতে আমার অন্তরে এই অনুভূতিই দৃঢ় হইয়াছিল যে, আমার হৃদয়ের সহিত তাঁহার অভিন্নতার অনুভূতিই আমার আত্মনিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়কেও যুগপৎ অবনত করিয়াছিল। তিনি যেভাবে আমার সহিত একাত্ম হওয়ার দুর্জ্জয় তপস্যা করিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার জীবনের এইরূপ অনুভূতি শ্রীঅরবিন্দকে কেন্দ্র করিয়া সেদিন মূর্ত্তি লওয়া অসম্ভব ছিল না। মীরা দেবী সম্বন্ধে তাঁর মর্ম্মানুভূতি অন্যরূপে হইয়াছিল; উহা আমার নিকট বড় করুণ মর্ম্মন্তুদ মনে হইয়াছিল। সম্ভবতঃ সেই অভিব্যক্তির জন্য হিন্দু নারীর চিরাচরিত সংস্কারই দায়ী বলিব। সেদিন তাঁহার কথায় আমি প্রীত হইতে পারি নাই। বাল্যবিবাহের ফলে পতি-পত্নীর মধ্যে বর্ত্তমান যুগের মর্য্যাদা বা গৌরবরক্ষার দায় আমার ছিল না। আমি সেদিন কিছু ক্রুদ্ধ হইয়া এই পরিণতবয়স্কা [illegible] সামান্য আঘাত করিয়াছিলাম। তাঁহার সেই সজল-নয়ন, আরক্তিম মুখমণ্ডল, উন্নত গ্রীবা, গৌরবদীপ্ত মূর্ত্তি আজিও স্মরণে পড়ে। সেদিন সীঁথির সিন্দুর দেখাইয়া তিনি বলিয়াছিলেন "আমি তোমার জন্য সব করিতে পারি, বিধাতার দান এই গর্ব্বটুকুকে কোথাও ম্লান করিতে পারি না।"

এই দিনই বুঝিয়াছিলাম—আমার সাধন-প্রবাহ কোথায় আসিয়া আবর্ত্ত সৃজন করিল; আমি বুঝিয়াছিলাম

—এ-কূল ও-কূল দুকূল রাখার দায়ে পড়িয়াছি। সেই-দিন হইতে আমি হৃদয়ের ব্যথা হৃদয়ে চাপিয়া উদাসীনের ন্যায় দিনের পর দিন যাপন করিতেছিলাম। এইদিন হইতে আমার মনে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা যেন আর লুকাইতে পারিতেছিলাম না। এই সময়ে পর পর কয়েকটী তুচ্ছ ঘটনায় আমার আনন্দের হাটে আগুন ধরিল। কি জানি কোথায় কি হইতেছিল, বুকে যেন আমার ঢেঁকির পাড় পড়িতেছে, অস্বস্তিতে দিনরাত কাটিত। দুঃখে অশ্রু কতদিন চক্ষে উথলিয়া উঠিয়াছে। কি নিষ্ঠুর ঔদাসীন্যে তাঁহাকে সেই প্রবাসে ব্যথা দিয়াছি। আর আশ্চর্য্য, ব্যথাহারী শ্রীঅরবিন্দ আমার এই অজ্ঞাত হৃদয়ের ক্ষতে করুণার প্রলেপ মাখাইয়া এই অনতিক্রমনীয় পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার যত্ন করিয়াছেন। সে অপার্থিব করুণার দান ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া মনে করি না।

শ্রীঅরবিন্দের উপর আমার যেন একটা দাবী ছিল। সেই দাবী গুণান্বিত হইয়া আমার ধর্ম্ম-পত্নীকেও অভিভূত করিল। তিনি একদিন জিদ ধরিয়া বলিলেন, "১৯১০ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দকে আমি নির্ভয়ে পরিতোষসহকারে ভোজন করাইতে পারি নাই। সেদিন ছিল সঙ্কোচের দিন, সতর্কতার দিন। সে দিনের সেই ক্ষুন্নতার আজ নিরসন করার জন্য শ্রীঅরবিন্দকে আমি নিমন্ত্রণ করব। প্রায় ১১ বৎসর ধরে' এই সাধ আমার আছে; আমার ব্রত পূর্ণ হউক।"

নারী-হৃদয়ের এই অতুলনীয় অমৃতের উৎস অবস্থা-বিশেষে ফল্গু-প্রবাহের মতই বহে। শ্রীঅরবিন্দের অপরিতৃপ্ত ভোজনাদি ব্যাপার তাঁহার অন্তরে এই দীর্ঘদিন এমন করিয়া ক্ষোভের প্রবাহ সৃজন করিয়াছে, তাহা আমার জানা ছিল না। ব্যাপারটী খুব গুরুতর [illegible] মনে হইল না। আমি শ্রীঅরবিন্দকে আমার স্ত্রীর অনুযোগের কথা জানাইলাম। অবগুণ্ঠনবতী শ্রীমতী আমার পাশে নিরতিশয় উৎকণ্ঠার সহিত শ্রীঅরবিন্দের সম্মতির প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ বুঝি সেদিন সুবিমল গঙ্গোত্রীধারা অথবা বিগলিত তরল সুবর্ণের ন্যায় দ্রবণীয় ছিলেন। ভক্তির খাত কাটিয়া তাঁহাকে যথেচ্ছা আকর্ষণ করা শক্ত ছিল না। ছাঁচে ফেলিয়া মনের মত আভরণ নির্ম্মাণ করিয়া অঙ্গে ধারণ করার সৌভাগ্যও সুগম ছিল। শ্রীঅরবিন্দ প্রফুল্ল জ্যোৎস্নার ন্যায় হাস্যসুধা বিকীরণ করিয়া, আমার পত্নীর অবনত মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হবে, হবে, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।" অরবিন্দ চিরদিনই কল্পতরু। তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া আমার স্ত্রী বলিলেন, "কবে হবে বলুন?"

শ্রীঅরবিন্দ আনন্দে তাঁহার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ললাট কুঞ্চিত করিয়া, কণ্ঠ ও গ্রীবাদেশ দুলাইতে দুলাইতে বলিলেন, "হবে, হবে, কালই হবে।"

শ্রীঅরবিন্দের এইরূপ সম্মতি সেদিন আমার কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল না। এই অপূর্ব্ব আকাঙ্ক্ষা-পূর্ত্তির শুভ সুযোগ পাইয়া সোৎসাহে আমার স্ত্রী শ্রীঅরবিন্দের পদবন্দনা করিয়া বিদায় লইলেন। শ্রীঅরবিন্দকে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলে পর, তাঁহার অন্তরে অপূর্ব্ব উৎসবের সাড়া উঠিল।

তিনি সেইদিন সন্ধ্যাকাল হইতে শ্রীঅরবিন্দের ভোজনাদি ব্যবস্থা লইয়া উদ্যোগ আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। শ্রীঅরবিন্দ আসিবেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সকল অনুগত ভক্তেরাও আগমন করিবেন। পণ্ডিচারীর তাৎকালীন ক্ষুদ্র আশ্রমে আনন্দের সহিত বিস্ময়ের ঢেউ উঠিল। ইন্দুবালা গুপ্তারও উৎসাহের সীমা ছিল না। কিন্তু পরদিন প্রাতেই সদ্য প্রজ্বলিত উর্দ্ধমুখী হোমশিখার উপর প্রচুর বারিসেচনের ন্যায় আমার স্ত্রীর নিদারুণ রূপে মনোভঙ্গ হইল। তিনি বার্ত্তা পাইলেন—শ্রীঅরবিন্দের আগমন সম্ভব হইবে না, তিনি যেন এই কর্ম্ম হইতে নিরস্ত হন।

আনন্দের আতিশয্যে তাঁহার বদনে জ্যোতিশ্ছটা উদ্ভাসিত হইয়াছিল; এই সংবাদে তিনি মলিন মুখে আমার দিকে হতাশ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার সহকারিণীরূপে শ্রীমতী ইন্দু গুপ্তা শ্রীঅরবিন্দের এই নিষেধাজ্ঞার কারণ সম্বন্ধে যাহা বলিল, তাহা আমি শুনিয়াও শুনিলাম না; কিন্তু আমার স্ত্রীর জিদ আরও তাহাতে বাড়িয়া গেল। বাঙ্গালী ঘরের অন্তঃপুরচারিণী একজন সাধারণ মহিলা শ্রীঅরবিন্দকে যেমন করিয়া অতি আত্মীয়রূপে গ্রহণ করিয়া থাকে, অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত

সেইভাবেই তিনি তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দকে লইয়া চন্দননগরে যে সকল আলোচনা হইত, তাহাতে তাঁহার এইরূপ মনোভাব অসঙ্গত হয় নাই। শ্রীঅরবিন্দ হইতে আমরা নিজেদের পৃথক্ করিয়া দেখিতাম না। তিনি ছিলেন আমাদের নেতা ও উপদেষ্টা। আমার ছিলেন তিনি পরম আত্মীয় ইষ্টস্বরূপ অধ্যাত্মপিতা ও অভিভাবক। তিনি ছিলেন আমার অব্যভিচারী শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার আশ্রয়; আমি ছিলাম তাঁহার একান্ত আশ্রিত ও অনুগত সন্তান। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে আমার সহকর্ম্মীরা পণ্ডিচারী আসিয়া শ্রীঅরবিন্দের সাহচর্য্যে যে অপার্থিব আত্মীয়তার অনুভূতি লাভ করিয়াছিল, তাহা হইতেই তাহারা নিঃসঙ্কোচে চন্দননগরে গিয়া প্রচার করিয়াছিল শ্রীঅরবিন্দ তাহাদের অধ্যাত্মদাদামহাশয়ের ন্যায় একান্ত আপন জন—নিবিড় আত্মীয়; তাঁহার সেইরূপ স্নেহে ও আদরেই তাহারা ধন্য হইয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন আমাদের মাথার মণি, হৃদয়ের মণিকোটায় জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য। তাঁহাকে দূরে রাখিয়া আমরা স্বস্তি ও সুখ পাইতাম না। তাঁহাকে অতি নিকটে আনিয়া পরমাত্মীয়ের মতই তাঁহার সহিত আচরণ করিতাম। বাংলার সম্বন্ধ-সাধনার সুদৃঢ় সংস্কার জ্ঞানতঃ অজ্ঞানতঃ অপ্রাকৃত ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যের সেই বাণীর প্রতিধ্বনি তুলিয়া অন্তরে বাহিরে অনাহত রাগিণী বাজাইত—

আমারে ঈশ্বর বলি আপনারে হীন।
তার প্রেমে আমি কভু না হই অধীন।

এই ভাব তখন চন্দননগর সঙ্ঘের মনে দৃঢ় হইয়াছিল। আমার স্ত্রীও সঙ্ঘের বাহিরে ছিলেন না; কাজেই শ্রীঅরবিন্দকে সর্ব্বোচ্চ স্থানে রাখিয়া তিনি এইরূপ সম্বন্ধের অমৃতে আপনাকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের প্রত্যাখ্যান তাঁর ভক্তিপূত চিত্তে বেশ গুরুতর আঘাত দিয়াছিল। তিনি প্রতিদিনের ন্যায় সেদিন প্রাতঃকালেও শ্রীঅরবিন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া নীরব মৌন-মূর্ত্তির মধ্য দিয়াই আকারে ইঙ্গিতে নিবেদন জানাইলেন—"কেন তিনি তাঁহার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন?"

শ্রীঅরবিন্দ একটু বিচলিত হইয়াই বলিলেন, "হঠাৎ তোমার কথা স্বীকার করিয়াছি; কিন্তু আমার এই অবস্থায় নিমন্ত্রণগ্রহণের কিছু গোল আছে। আজ না হয়, দু'দিন পরে হবে।" শ্রীঅরবিন্দের কণ্ঠস্বর যেন অপরাধীর ন্যায় করুণ ও কম্পিত। কিন্তু কি স্নেহবিগলিত সুধাধারায় তাহা সিক্ত ছিল, তাহা স্মরণ করিলে আজিও সেদিনের শ্রীঅরবিন্দের সহিত আমাদের অভিন্ন হৃদয়ের অমৃতানুভূতি জাগিয়া উঠে। এই অপার্থিব অলক্ষ্য সম্বন্ধের গ্রন্থি মর্ত্ত্যের বাধায় বুঝি শিথিল হইবার নহে। আমার স্ত্রী সান্ত্বনা পাইলেন।

ইহার পর একদিন, দুইদিন করিয়া মে মাস শেষ হইল; জুন মাসেরও অর্দ্ধেক দিন অতিবাহিত হইল। সে একদিন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। পথে বিদ্যুৎ-বাতি জ্বলিয়াছে। জনাকীর্ণ পথে কিছু খাদ্যদ্রব্য খরিদ করিয়া বাসায় ফিরিতেছি; সম্মুখের একটী বিজলী বাতির আলোকচ্ছটায় পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইলাম। বর্ণকান্তি অধিকতর সমুজ্জল হইয়াছে। মাথার অবগুণ্ঠন তিনি অপসারিত করিয়াছেন। মুখশ্রী যেন পূর্ব্বাপেক্ষা শীর্ণ মনে হইল। পণ্ডিচারীর স্বাস্থ্য বাংলার চেয়ে উৎকৃষ্ট। তাঁহাকে আমি অধিকতর স্বাস্থ্যসম্পন্ন দেখিব মনে করিয়াছিলাম। এমন করিয়া অনেকদিন তাঁহার প্রতি চাহি নাই; পথ চলিতে চলিতেই তিনি বলিলেন, "ফিরে ফিরে কি দেখ্ছ আমার মুখের দিকে?"

চলিতে চলিতেই বলিলাম, "আমার প্রথম বিস্ময়—তুমি আজ অনবগুণ্ঠিতা। আমার দ্বিতীয় বিস্ময়—তোমার মুখখানি বড় সুন্দর ও পরিষ্কার দেখাইতেছে; কিন্তু তোমার মুখের ঘের পূর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র মনে হইতেছে, যেন কিছু ক্ষীণ হইয়াছ।"

তিনি একটু হাসিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় পথ চলিতে বলিলেন, "এ দেশের মেয়েরা মাথার কাপড় খুলে' থাকে, এ যে কত আরাম, বাংলার ঘোমটা-দেওয়া মেয়েরা তা' বুঝে না। মাথায় মিষ্টি হাওয়া লাগছে, যেন সর্ব্ব শরীর জুড়িয়ে যায়।"

প্রশস্ত রাজপথ। সোজাসুজি সফেণ তরঙ্গে সমুদ্র-নৃত্য, সাগরবারি সম্পৃক্ত মুক্ত বাতাস বহিতেছে ধীরে মন্থরে। সত্যই আরামের বিমল আভায় তাঁর অনবগুণ্ঠিত মুখখানি বড় পবিত্র ও সুন্দর দেখাইতেছিল। এমন

করিয়া দুই জনে বাংলাদেশে পথে বাহির হওয়া আমাদের সম্ভব ছিল না। এখানে মুক্ত বিহঙ্গিনীর মত আমার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অবাধ বিচরণ বড় সুখের হইয়াছিল। কথায় কথায় তাঁর বিশীর্ণ মুখখানির কথা আর জিজ্ঞাসা করা হইল না। বাসায় আসিয়া উপনীত হইলাম।

তিনি রেকাবীতে খাদ্যদ্রব্যগুলি যথারীতি সুসজ্জিত করিয়া আমার সম্মুখে ধরিলেন। আজ অসঙ্কোচে দুই-জনে এক সঙ্গে ভোজনের প্রবৃত্তি আমায় পাইয়া বসিল। এমন সুযোগ চন্দননগরে ঘটে না। বলিলাম, "এস খাই।"

তিনি আমার মুখের দিকে ভ্রূকুটির কটাক্ষ করিয়া হাসিলেন। তারপর বলিলেন, "এতদিন এ সাধতো জাগেনি? আজ হঠাৎ এ আবার কি ভাব?"

প্রায় দেড় মাস পণ্ডিচারী আসিয়াছি; প্রতি সন্ধ্যায় পরিতৃপ্তিসহকারে এমন করিয়াই আমার উদরপূর্ত্তি হয়; কিন্তু সত্যই তাঁহাকে কোনদিন জলযোগ করিতে তো দেখি নাই। আর দেখিবই বা কি প্রকারে? তাঁহার জন্য কোন ব্যবস্থাই করি নাই। নিজেকে বড় স্বার্থপর মনে হইল। পণ্ডিচারী চন্দননগর নহে। এই প্রবাসে তিনি সর্ব্ব বিষয়েই আমার মুখ চাহিয়াই থাকেন। অথচ আমি তাঁহার খাওয়াদাওয়া সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন। খাওয়ার ব্যবস্থাও এক্ষেত্রে বাঙ্গালী হিন্দু ঘরের মেয়েদের উপযোগী নহে। সকালে ফেরীওয়ালার কাছ থেকে কোনদিন "আপাম" অর্থাৎ আস্কে পিঠে খরিদ করা হয়, কোনদিন বা শুক্না পাউরুটীর টুকরা দুধে বা চায়ে ভিজাইয়া খাওয়া হয়। আর মধ্যাহ্নে হয়—ফাউল বা মটনকারীর সঙ্গে ভাত। রাত্রেও তথৈবচ। আজ মনে হইল—সত্যই তো লোকটা খায় কি? বাংলার ডাঁটা চিবাইয়া এক থালা ভাত খাওয়ার অসুবিধা [illegible] এই জন্যই তিনি বোধ হয় কিছু ক্ষীণা হইয়াছেন। মাথায় ব্যাপারটী প্রবেশ করিবামাত্র সান্ধ্যভোজনের জিদাজিদি সুরু হইল; আর কাল হইতে মাছের ঝোল, সুক্তুনি, ডাঁটা চচ্চড়ির ব্যবস্থা করিতে হইবে, স্থির করিলাম। তিনি আমার খাদ্য-প্রসঙ্গ শুনিয়া মনে মনে আমোদ অনুভব করিলেন, আবার শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিতেও ভুলিলেন না; বলিলেন, "দেড় মাস পরে হুঁস হ'ল বুঝি?"

আমার অশেষ পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তিনি সে সন্ধ্যায় কিছু মুখে দিলেন না, উপরন্তু কথায় কথায় তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত হওয়ায় আমিও তাঁহার অন্তর-বাণীর সহিত সায় দিলাম। শ্রীঅরবিন্দের মিলন-প্রত্যাখ্যানে শুধু জীবন-ধারণের প্রয়োজনানুযায়ী পরিমিত অন্নই তিনি গ্রহণ করিয়া থাকেন, কোন ভাল-মন্দ জিনিষ তিনি মুখে দিবেন না।

কে জানিত আমার এই হৃদয়ভেদ একদিন প্রমাদ আনিবে? এমন করিয়া দুই কূল রাখা চলিবে না! পরদিন প্রভাতে পত্নীর হৃদয়াবেগে আচ্ছন্ন হইয়া শ্রীঅরবিন্দকে জিদ ধরিয়া বলিলাম, "আপনি একবার ও বাড়ীতে যাইবেন কিনা বলুন?"

তিনি নারীকে ভাল চক্ষে দেখিতেন না! তাঁহার উপর কিছুর জিদ করিলে, তিনি ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি অনুভব করিতেন। নিজের জন্য নয়, অনুগত ভক্তের হিতকামনায় তাঁর হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিত। তাঁহার উৎসর্গের দাবী ছিল; কিন্তু অন্য পক্ষের দাবী রাখিয়া ইহা হইলে সে উৎসর্গের সাফল্য সম্বন্ধে তিনি খুব সংশয় পোষণ করিতেন। আমার কথা শুনিয়া তিনি কিছু ইতস্ততঃ করিলেন, তারপর বলিলেন, "আমি একদিন যাব, তোমাদের সাধন আরও জমিয়া উঠুক, তারপর যাব।"

তাঁহার সব কথাই এইরূপ সংক্ষিপ্ত ছিল। আমার স্ত্রী এই কথার উত্তরে আমাকে মধ্যস্থ রাখিয়া বলিলেন, "সে একদিন আপনার যখন ইচ্ছা হবে যাবেন। কিন্তু আপনাকে নিজের হাতে কিছু খাদ্যাখাদ্য প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইতে সাধ হইয়াছে, অনুমতি করিলে আমি আজই কিছু খাদ্য দ্রব্য পাঠাইয়া দিব।"

শ্রীঅরবিন্দের ন্যায় সহজ ও সরল মানুষ আমার চক্ষে পড়ে নাই। নিমন্ত্রণে যাওয়াটাও যেমন সহজভাবে 'হাঁ' বলিয়া তিনি সম্মতি দিয়াছিলেন, আমার স্ত্রীর এই অনুরোধও তেমনি সহজভাবে স্বীকার করিয়া লইলেন। তিনি সেদিন অতি আনন্দের সহিত সারাদিন ধরিয়া বিবিধ খাদ্য দ্রব্য রচনা করিলেন, সোৎসাহে সহকারিণী হইল শ্রীমতী ইন্দুগুপ্তা। সেদিন রন্ধনশালায় দুই জনের হাস্যমুখর কণ্ঠে আমাদের আবাসভবনটী পুলকিত হইয়া উঠিয়াছিল। (ক্রমশঃ)

বোমা ও বিষাক্ত গ্যাস

অধ্যাপক শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

আধুনিক যুদ্ধে শূন্য পথে বোমা বর্ষণ নিত্য হইতেছে। বোমা-বিধ্বস্ত গৃহাদির চিত্র বোমার অন্তর্নিহিত ধ্বংস-শক্তির পরিচয় দিতেছে। বোমার এই প্রলয়কারী উপাদান কি, জানিতে হইলে আমাদের বিস্ফোরকের বিষয় কিছু জানা দরকার। নাইট্রোজেন-ঘটিত কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ আছে, যাহা অগ্নি-সংযোগে, এমন কি আকস্মিক আঘাতে সশব্দে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উক্ত যৌগিক পদার্থটির অণুগুলি সশব্দে বিদীর্ণ হইয়া বিভিন্ন গ্যাসের সৃষ্টি করে। এইরূপ গুণ-সম্বলিত রাসায়নিক পদার্থকে বিস্ফোরক বলে। বিস্ফোরক কোন একটি যৌগিক পদার্থও হইতে পারে, কিম্বা দুই বা ততোধিক যৌগিক বা মৌলিক পদার্থেরও সংমিশ্রণ হইতে পারে। বহু প্রাচীন কাল হইতে বিস্ফোরকরূপে বারুদের ব্যবহার আমরা শুনিয়া আসিতেছি। সোরা (৬ ভাগ), অঙ্গার (১ ভাগ) আর গন্ধক (৬ ভাগ) মিশ্রিত করিলে বারুদ প্রস্তুত হয়। সর্বপ্রথমে চীনারা বারুদ প্রস্তুত করিয়া বাজীতে ও আগ্নেয় অস্ত্রে ব্যবহার করে। ইহার অনেক কাল পরে ইংরাজেরা ১৩৪৬ খৃঃ অব্দে ক্রেসীর যুদ্ধে বারুদ ব্যবহার করে। কয়লার স্তূপে গর্ত করিয়া বারুদ গাদিয়া অগ্নি-সংযোগ করিলে, স্তূপটি বারুদের বিস্ফোরণের ফলে বিদীর্ণ হইত। এইরূপে ভূগর্ভ হইতে কয়লার খনন ও উত্তোলন সহজ হইত।

এখন পর্ব্বতগাত্রে সুড়ঙ্গ কাটিবার জন্য, কয়লা বা লবণের পাহাড় বিদীর্ণ করিবার জন্য যে বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়, তাহার নাম ডিনামাইট। ইহা বারুদ অপেক্ষা অধিকতর তেজস্কর। গ্লিসারিনের সহিত নাইট্রিক এসিডের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে নাইট্রোগ্লিসারিন বলিয়া এক প্রকার তৈল প্রস্তুত হয়। স্বনামধন্য নোবেল সাহেব (যাঁহার নামে নোবেল পুরস্কার) নাইট্রোগ্লিসারিন বিস্ফোরক হিসাবে ব্যবহার করেন। এই তৈল অল্প ঝাঁকানিতেই সশব্দে ফাটিয়া যায়, ইহাতে অগ্নি-সংযোগ করিবারও দরকার হয় না। ইহার সহিত অতি সাবধানে করাতের গুঁড়া ও সোরা জাতীয় পদার্থ মিশাইলে ডিনামাইট প্রস্তুত হয়। তুলা নাইট্রিক ও সলফিউরিক এসিডে ভিজাইলে গান্-কটন তৈয়ারী হয়। গান্-কটন, নাইট্রোগ্লিসারিন ও ভ্যাসিলিনের সংমিশ্রণে করডাইট নামক বিস্ফোরক প্রস্তুত হয়। করডাইট সাধারণতঃ কামানের গোলা নিক্ষেপ করিতে ব্যবহৃত হয়। এই সব বিস্ফোরক কিন্তু বোমায় ব্যবহার করা হয় না। বোমার খোলে পুর দিবার জন্য অধিকতর তেজস্ক্রিয় বিস্ফোরকের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। সাধারণতঃ ট্রাইনাইট্রোটলুইন (T. N. T.) ও ট্রাইনাইট্রোফেনোল পিক্রিক এসিড (Trinitro-phenol or picric acid) নামক কঠিন পদার্থের পুর বোমায় থাকে। উক্ত বিস্ফোরক

নানাবিধ গঠনের করডাইট বিস্ফোরক :
ইহা সাধারণতঃ কামানে গোলা ছুঁড়িবার জন্য ব্যবহৃত হয়

দুইটি বিনা অগ্নিসংযোগে, কেবল মাত্র আকস্মিক ধাক্কার সাহায্যে প্রজ্জ্বলিত ও সশব্দে বিদীর্ণ হইয়া উত্তপ্ত গ্যাসে পরিণত হয়। গ্যাসের পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় বোমার খোলে বদ্ধ থাকিতে চাহে না। খোলের গাত্রে [illegible] চাপ পড়ে যে, খোলটা সশব্দে ফাটিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। বোমার সূচালো মুখে একটি পলিতা (fuse) লাগানো থাকে। শলাকা দিয়া আঘাত করিলেই পলিতাটা জ্বলিয়া উঠে ও অভ্যন্তরস্থিত লাল রঙের (ferric oxide) গুঁড়ার সহিত এল্যুমিনিয়ম চূর্ণের রাসায়নিক সংযুক্তি ঘটে; ফলে ৪০।৫০ সেকেণ্ডের ভিতর খোলের উত্তাপ এত বেশী বৃদ্ধি পায় যে, বোমার খোলটি গলিয়া গিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া চারিদিকে ছিটকাইয়া পড়ে।

খোলটা নির্ম্মিত হয় এল্যুমিনিয়ম মিশ্রিত ম্যাগনেসিয়ম ধাতু দিয়া। খোলটা সজোরে ফাটিয়া প্রায় ১০ গজ দূর পর্য্যন্ত অনায়াসে নিক্ষিপ্ত হয়। বোমাবিস্ফোরণে অনেক সময়ে কাল ধূমের সৃষ্টি হয়। T. N. T.-র বিস্ফোরণে ঘন কাল ধূম জন্মায়। আজকাল ১ ভাগ T. N. T.-র সহিত ৪ ভাগ এমোনিয়ম নাইট্রেট (Ammonium nitrate) মিশ্রিত করিয়া আরও সাংঘাতিক বিস্ফোরকের সৃষ্টি করা হইয়াছে, ইহার নাম এমাটল (Amatol)। ইহাতে কাল ধূম হয় না।

বিস্ফোরকগুলিকে দুই শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। যে সকল বিস্ফোরক সজোরে ও সশব্দে বিদীর্ণ হয়, যাহাতে

অতিমাত্রিক বিস্ফোরক
বোমার ভিতরকার চিত্র।

আধারটা খণ্ড খণ্ড হইয়া চূর্ণ হইয়া যায়, তাহাদিগকে অতিমাত্রিক বিস্ফোরক (high explosives) বলে হয়। আর যেগুলি কেবল সশব্দে জ্বলিতে থাকে, [illegible] বিদীর্ণ করে না, তাহাদিগকে স্বল্পমাত্রিক বিস্ফোরক (low exploisives) বলে। ইহারা বিস্ফোরকাক্রান্ত স্থানকে উৎক্ষিপ্ত করে, আর অতিমাত্রিক বিস্ফোরক আক্রান্ত স্থানকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, গান্-কটন (অতিমাত্রিক বিস্ফোরক) মোটা ইস্পাতের পাতে অনায়াসে বড় গর্ত্ত করিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু বারুদ (স্বল্পমাত্রিক বিস্ফোরক) যত বেশী পরিমাণেই হউক না কেন, গর্ত্ত করিতে পারে না, তবে পাতটা উত্তোলন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে পারে। বিস্ফোরকে নিহিত ক্ষমতার কথা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। আধুনিক বিমানপোতাক্রমণকারী দূর-পাল্লা কামানের সাহায্যে ২৭ মণ ওজনের ভারী গোলা ৩০ মাইল দূরে ছুঁড়িতে পারা যায়। করডাইটের বিস্ফোরণের সাহায্যে ভারী গোলা নিক্ষেপ করা হয়।

বোমা নানা রকমের আছে। অগ্নি-সংযোজক বোমা ৪০।৫০ সেকেণ্ডের মধ্যে ২৫০০° পর্য্যন্ত উত্তপ্ত হয়। প্রজ্জ্বলিত বোমার অগ্নি নির্ব্বাপিত করা যায় না। কেন না, উক্ত ডিগ্রী উত্তাপে জল নিক্ষেপ করিলে, তাহা তন্মুহূর্ত্তেই বাষ্পাকার ধারণ করে। জল বাষ্পাকার ধারণ করিতে মাত্র ১০০° উত্তাপের প্রয়োজন। বালু নিক্ষেপ করিলে, বোমার খোলের উত্তপ্ত ম্যাগনেসিয়ম ধাতু বালুর সহিত সংযুক্ত হয়, ফলে উত্তাপ কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। গলিত লৌহের উত্তাপ ১৫০০°। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, একটা প্রজ্জ্বলিত অগ্নি-সংযোজক বোমা কত বেশী তাপ দিতে পারে। একটি ক্ষুদ্র নগরীতে 'লঙ্কাকাণ্ড' করিতে একটি অগ্নিসংযোজক বোমাই যথেষ্ট নয় কি? ভারী খোলের বোমা ফাটিবার পূর্ব্বেই বাড়ীর ছাদ বা মেঝেয় গর্ত্ত করিয়া ফেলে, তারপর জমি বিদীর্ণ করিয়া চৌচির করিয়া ফেলে। ইহার ওজন ৩ হইতে ২৫ মণ পর্য্যন্ত। ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধ্বংসশীল। সেনাবাহিনীর উপর সাধারণতঃ এই প্রকার বোমা বর্ষণ করা হয়। মাঝারী খোলের বোমা, পর পর চার পাঁচটা মেঝেয় অনায়াসে গর্ত্ত করিতে পারে। ইহাদের ওজন অর্দ্ধ মণ হইতে ১৩ মণ পর্য্যন্ত। বিমানযোগে সহরের আক্রমণে সাধারণতঃ ৬।৭ মণ ওজনের বোমা নিক্ষেপ করা হয়। হাল্কা খোলের বোমা, বাড়ীঘর ফুটাফাটা করিতে ইহার জোড়া নাই। কভেন্ট্রি (Coventry) এই রকম বোমার ফলে বিধ্বস্ত হয়। উহা নিমেষে, এত জোরে বিদীর্ণ হইয়া বাড়ীর দেয়ালে বা থামে আঘাত করে যে, অনেক সময়ে দেয়াল বা থামগুলি নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। বার্সিলোনা (Barcelona) সহরের ঘরবাড়ী এই জাতীয় বোমাবর্ষণের ফলে ধ্বংস পাইয়াছিল।

বোমার আক্রমণে ঘরবাড়ী, জায়গাজমি দুই ভাবে

ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বড় বড় সুগভীর গহ্বর সৃষ্টি বা ভিত্তি পর্য্যন্ত ভূকম্পনের ফলে বিদীর্ণ হইয়া যায়, অথবা ফুটীফাটা হইয়া চার পাশে টুক্‌রাগুলি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। ১২।১৩ মণ ওজনের বোমার আঘাতে যে গহ্বর-রচনা হয়, তাহার ব্যাস প্রায় ১০০ ফুট। আক্রান্ত স্থলের কম্পন ও

মাত্র একটি ৮ মণ ওজনের ভারী খোলের বোমার ধ্বংসলীলার নিদর্শন। বিস্ফোরকের অপব্যবহারের নিদর্শন

আলোড়ন ৪০০ ফুট দূরে পর্য্যন্ত অনুভূত হয়। চূর্ণ খণ্ডগুলি ৫০০ ফুট হইতে ৩০০০ ফুট পর্য্যন্ত ছিট্‌কাইয়া যাইতে পারে। হাল্‌কা খোলের বোমা বিধ্বস্ত টুক্‌রা ইহাপেক্ষা দূরে ছিট্‌কাইতে পারে।

যুদ্ধে ব্যবহৃত বিষাক্ত গ্যাস অর্থে বিষাক্ত বা গাত্রত্বক্‌-প্রদাহক যে কোন কঠিন, তরল ও বাষ্পীয় পদার্থ বুঝায়। যে সমস্ত বিষাক্ত গ্যাস বিমানপথে নিক্ষিপ্ত হইতে পারে, তাহা গুণভেদে চারি প্রকার।

অশ্রু-সমুদ্গারক—Xylyl bromide, chlor-aceto-phenone (C. A. P.), Ethyl iodo-acetate (K. S. K.), Brom-benzyl-cyanide (B. B. C.).

নাসা-প্রদাহক—Diphenyl chlorarsine (D. A.), Diphenylamine chlora-arsine (D. M.), Diphenyl cyano-arsine (D. C.).

ফুসফুসপ্রদাহক—Chlorine, Phosgene, Diphosgene, chloropicrin.

ফোস্কা-সমুৎপাদক—Dichloro-dicthyl sulphide (mustard gas, ইহা তরল পদার্থ), B-chloro-vinyl-dichloro arsine (Lewisite).

যুদ্ধে ব্যবহৃত বিষাক্ত গ্যাসের লক্ষণ চিনিবার জন্য, যুদ্ধ-সংক্রামিত স্থানে গ্যাসাক্রমণনিবারণী কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। গ্যাস-মুখোস-ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। উক্ত গ্যাসগুলির বিশিষ্ট গন্ধ আছে। গন্ধের সাহায্যে গ্যাস চেনা যাইতে পারে। রাসায়নিক পরীক্ষাগারে যে সমস্ত প্রণালীতে এই সকল গ্যাসের লক্ষণাদি বুঝা যায়, তাহা রণক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। ঐ সকল পরীক্ষা সময়সাপেক্ষ। কেবল কতকগুলি সহজ রাসায়নিক পরীক্ষার সাহায্য রণক্ষেত্রে লওয়া যাইতে পারে। এই সকল রাসায়নিক পরীক্ষার বিশদ ব্যাখ্যা না করিয়া এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, ফসজিন গ্যাস, মাষ্টার্ড গ্যাস, ও ক্লোরিণ গ্যাস ইত্যাদি সহজ উপায়ে চেনা যায়। গ্যাস দ্বারা আক্রান্ত হইলে ব্যবহার করিবার জন্য বিভিন্ন ঔষধ ও মলম আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইরূপ আক্রান্তের মৃত্যু যে

আতসবাজিক বিস্ফোরকের সাহায্যে সোনার স্তূপ বিদারণ। চার পাঁচটি গর্ত্তে বিস্ফোরক পূর্ণ করিয়া বিদ্যুতের সাহায্যে বিস্ফোরণ করা হয়। বিস্ফোরকের সদ্ব্যবহারের পরিচয়

কিরূপ কষ্টদায়ক, যন্ত্রণাদায়ক, তাহা H. G. Wells রচিত "Things to come" পুস্তকে বর্ণনা করা হইয়াছে। উক্ত বইটি চলচ্চিত্রেও দেখান হইতেছিল—ফুসফুসপ্রদাহে ও ফোস্কাক্রান্ত হইয়া ত্বকের ক্ষতের জ্বালায় তিলে তিলে মরণোন্মুখের দৃশ্য সত্যই মর্ম্মন্তুদ।

আমি এবং আমার

শ্রীজগদীশ গুপ্ত

আমার কথাই ভাবি আমি—
আমিই কেবল আমার ;
খুড়োর আমি ভাইপো নহি—
ভাগ্‌নে নহি মামার।
আমার উদর, আমারই দায়—
আমার কাছেই খোরাক্ সে চায় ;
আমার কাছেই দেহের দাবী
গামছা, কাপড়, জামার।
খারাপ কাজ যে করে' বসি—
তার জন্যে আমিই দোষী ;
আমাকেই ত' বলে লোকে
পাষণ্ড ও চামার।
পড়ার খরচ যুগিয়ে খুড়ো
ভঙ্গ দিলেন রণে—
তখন আমার আড় ভাঙে নাই
'ড়' উচ্চারণে........
বল্লেন হেঁকে' : "ওরে, রামা
মেরে' ফেল্‌লি, গলা থামা ;
খাওয়ার উপর পড়ার খরচ ?
শূন্য হ'ল খামার।
তিন খানা বই দিলাম কিনে—
ছিঁড়লি টেনে' তিনটা দিনে !
পয়সা ত' নয় খোলামকুচি !—
দাম আছে সে তামার।
তিন-আনা সেই বইয়ের দামে
হ'ত অনেক তামাক্ ;
লাভের মধ্যে বই পড়ে' তোর
বেড়ে' গেছে দেমাক্।"
তাহার পরই বল্‌লেন হেসে' :
"ভগবানের মা'র
এলে বাবা পুত্ররূপে
মুক্ত জ্যেষ্ঠ বামার।"

খুড়োর শালী নারায়ণী—
খুব ক্ষমতা তাঁর ;
সকল কথায় কথা বলার
আছে অধিকার ;
থাকেন তিনি বোনের বাড়ী—
তাঁহার হাতেই ভাতের হাঁড়ী,
চাল মেপে' নেন্ দু'বেলা রোজ...
উমার এবং শ্যামার ;
এবং সবার পেটের ওজন
জানেন তিনি, বোঝেনও মন,
কেবল তিনি পেলেন না খোঁজ
আমার পেটের সীমার।
মিছে কথায় লজ্জা পেয়ে
এলাম মামার বাড়ী...
মামা বল্‌লেন : 'ড়' ফোটে না
মুখে, ওরে ধাড়ি !
ভাগ্‌নে কভু নয় ত' আপন—
যতই পড়াও, করো যতন।
বই পড়লে শঙ্কা থাকে
কাজের ইচ্ছে কমার।—
শিকল কাটার দিকেই তাহার
চেষ্টা অবিরাম—
যতই খাওয়াও ঘৃত-দুগ্ধ,
যতই কর নাম।
মাতুলালয় খেয়ে আবার
গুণ গায় সে খুড়ো-বাবার—
মানুষের এই বেইমানীটা
যোগ্য নহে ক্ষমার।"
মামার মেয়ে 'জোছ্‌নাবালা'—
বয়স তাহার সাত ;
বেজায় মেয়ে, তোখোড় ; মুখ
চল্‌ছেই দিন-রাত...

মুড়কি, মুড়ি, নাড়ু, মোয়া,
তাহার জ্বালায় যায় না খোয়া ;
খেয়ে খেয়ে পেটের আকার
উপুড় করা ধামার…
আমার পেটে হাত দিয়ে সে
বলে অতি মিষ্ট হেসে' :
এই প্রকাণ্ড জ্বালা, দাদা,
গড়েছে কোন্ কুমার ?"

বুঝা গেল, হউন ওঁরা
যতই পূজনীয়—
যতই আপ্‌নার হউন ওঁরা,
আয়-ব্যয় সব স্বীয়।
মাথায় করে' বাজার টেনে'—
গরুর জাব্‌না ছেনে' ছেনে'
দেখেছি…তাও বলেন তাঁরা :
"বসে' খাওয়া রামার !"
খুড়ী বলেন আড়াল থেকে,
মামী বলেন রেখে' ঢেকে,
একই কথা : "নিত্যি অভাব
কে ঘুচা'বে তোমার ?
খাওয়াই যদি চাইতে কেবল—
দিতাম দু'টো দু'টো,
এক-সামিলে চলে' যেতে
বোঝার উপর কুটো।—
জামা-কাপড় গ্রীষ্মে শীতে
তোমায় বাছা, হবে দিতে…
ঐ খরচটাই সর্ব্বনেশে—
নাম করে না থামার।"
শুনে' আমি পিছিয়ে এলাম—
সত্যি কথাই ত' !
খরচ কর্‌তে হওয়াই উচিত
বিকল এবং ভীত ;—
কারণ, টাকা অশেষ নহে—
যত উজ্জ্বল, তত দহে ;
ওঁরা কেউই পান্‌নি' টাকা
বাপের জীবনবীমার।

এখন আমি পথে বেড়াই—
পথেই করি বাস ;
স্বাধীন আমি ; নইকো আমি
উপকারীর দাস।
কিসের লজ্জায়, শুদোবেন ত',
ওঁদের মাথা হ'চ্ছে নত—
আমায় যখন পথ দিয়েছেন
পক্কধামে নামার ?
অশিক্ষিত, অনাথ মানুষ,
মনের তেমন জন্মেনি' হুঁস ;
অল্প দামের নেশার জন্যেই
"রামা পকেটমার"।
চুল কাটাই নে, ময়লা নখে,
গন্ধ গায়ের জামায় ;
পাশ কাটিয়ে চলে মানুষ
সাম্‌নে দেখে' আমায় ;
ঘুরি, ফিরি ইতস্ততঃ…
ইতর শ্রেণীর সঙ্গী যত,
তার জন্যে কি কারণ আছে
আত্মীয়ের গা ঘামার ?
আমার দুঃখ কেবল আমার,
পাপ-পুণ্যও আমার একার,
আমিই দেব আমার হিসেব
খরচ এবং জমার।
বাপ মরেছেন ওলাউঠোয়,
মা মরেছেন ডুবে'—
নৌকো করে' গাঙ্ পেরুতে
তীর্থে যেতে পুবে।
যেহেতু আজ তাঁদের সুতে
চায় না মানুষ পায়ে ছুঁতে
মর্‌ব আমি আমার মত
পাঁকে নর্দ্দামার।

দিব্য দৃষ্টি

শ্রীসুকৃতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

উর্ম্মিলার সঙ্গে সম্পর্কটা আমার অনেক দূরের। কাজেই সেই দুর্ভেদ্য আত্মীয়তার প্রাচীর ভেদ করে', একদা আমরা শৈশবে যখন দু'জনে এসে প্রথম ধূলোবালীর খেলাঘরে দেখা দিলাম; সম-বয়সী ছেলেরা ঘোরতর বিবাদ বাধিয়ে তুলল। আত্মীয়েরা তখন থেকেই চোখে চোখে রেখে চলতে" লাগলেন। মাঝখানে কথাও উঠেছিল—উর্ম্মিলাকে অন্য কোথাও পাঠান যায় কিনা, শুধু জেঠিমা আপত্তি তুলে বলেছিলেন, থাক।

নিজের কথা বলতে বসেছি যখন, তখন অকপটেই বলি, আমি মানুষটি চিরকাল এমনি ভবঘুরে ও উচ্ছৃঙ্খল ছিলাম না। ছোট বেলায় মাটী দিয়ে খুব সুন্দর ঘর গড়তে পারতাম দেখে অনেকের অনুমান ছিল, উত্তর কালে আমি একজন পাকা সংসারী হব। কিন্তু তাঁদের সে কল্পনা এবং আশীর্ব্বাদ কোথাকার বেনোজলে যে ভেসে গেল তা' কে জানে! তবে আমার বৈরাগ্য ভাবটা যে উর্ম্মিলার বিয়ের পর থেকেই দাঁড়িয়ে গেছে, এবং এই একান্ত নির্ব্বাক ভাবটিকে যিনি লক্ষ্য করে' আমার নতুন নাম করেছিলেন, যোগী, তিনি আর কেউই নন্—তিনি আমার ছোট বৌদি।

আকাশের ঘনঘটা অবস্থা দেখে সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে বেরুব কিনা ভাবছিলাম, এমন সময়ে ছোট বৌদি দেখা দিলেন। যাচ্ছিলেন ঠাকুরদালানে। মাথার উপরে কাপড়ের খুঁটটা একটান তুলে দিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, শুনেছ?

ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম, কি?

একটু ম্লান হেসে বৌদি বললেন, তোমার উর্ম্মিলা ঠাক্‌রোণ যে শীগ্‌গিরই আসছেন। শুনেছ?

নিতান্ত উদাসীনের মত জবাব দিলাম, এলেই বা! আসুক, না আসুক, তাতে আমার কি?

বৌদি কটাক্ষে আমার পানে চেয়ে বললেন, কই আমার দিকে চেয়ে বলত শুনি! সত্যকে ঢাকতে তোমরা এতও পার!

বলে'ই বৌদি সাগুর বাটি দোর গোড়ায় নামিয়ে রেখে চলে' গেলেন। ভাবলুম, আসুক। অনেক দিন তাকে দেখিনি। এই জীবনের দু'পাশে কত লোক আনা গোনা করে' গেছে, কারু জন্য কোন উৎকণ্ঠা বা ব্যাকুলতা জাগেনি। কেউ যেচে চিঠি দিলে ইচ্ছে করে'ই জবাব দিইনি। কিন্তু তার উল্‌টোটা ফল্‌ত উর্ম্মিলার বেলায়। কত দিন আশা করতাম, এবার বিলাসপুরের ছাপমারা আমার নামে চিঠি আসবে। এবং খুলে দেখব যে লিখেছে, সে আর কেউ নয়—সে উর্ম্মিলা। চিঠির জবাবটা কি দেওয়া যায়, এই নিয়ে কত বিনিদ্র রজনী মাথার উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়ে গেছে। অথচ উর্ম্মিলার কাছ থেকে দুটি ছত্রের একখানা পোষ্টকার্ড আসাও সম্ভব হয়নি। কত বার ভেবেছি, নিজের এ দুর্ব্বলতাকে কারু কাছে প্রকাশ করব না। পৃথিবীর লোক যা' জানে, সে ভুল ভাঙিয়ে দেব। বলব, না, না, আমাকে কেউ আচ্ছন্ন করতে পারেনি। আমার এ বৈরাগ্য মন, আমার পরম উদাসীন চরিত্রের জন্য কোন নারী দায়ী নয়। যতই নিজেকে কঠিন ও মমত্বহীন করে' তোলবার চেষ্টা করেছি, অন্তরের কোন্ নিভৃত কোণ থেকে চিরন্তন শিশু মনটি আমার বিলাসপুরের পানে ধাবিত হয়েছে। তার বাড়ীর চার পাশে ঘুরে ঘুরে ভেবেছি, একটি বার যদি সে বেরুত, একটি বার যদি তার সঙ্গে দেখা হত! নিজের কাছে নিজের এই অসম্ভব রকমের পরাজয়ের কথা কিছুতেই সহ্য করতে পারিনি। অথচ না করে'ও পারিনি।

বছর পাঁচেক সে আসেনি। আর আসবেই বা কে! জেঠিমা অপ্রয়োজনে কাউকে আনা পছন্দ করেন না। আর আমাদের ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। সংসার আমাদের আছে বটে, কিন্তু কোথায় যে তার অস্তিত্ব তার দিশে মেলা ভার। বাইরে থেকে দেখলেই মনে হবে যেন এটা একটি সাধারণ হোটেল।

যতদিন মা ছিলেন, ততদিন সবার আনাগোনা ছিল। মা মারা যাবার পর থেকে এ বাড়ীর পথ বড় কেউ একটা

আর মাড়ায় না। একটি বোন—সেও মামার বাড়ীতে এসে থাকে। সংসারে স্ত্রীলোকও নেই, শ্রী-ছাঁদও নেই। বাবারও স্বভাব দাঁড়িয়েছে ঐ এক রকমের। নিয়মিত কোর্টে হাজিরা দিচ্ছেন প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, অর্থের জন্য। ঘরের হাঁড়ী বাঁধা আছে উড়ে ঠাকুরের হাতে। দু'ভাই কি রকম পড়াশোনা করছি, বাবার সে দিক থেকে নজর কখনও সরেনি। কাজে অকাজে চর্কির মতন ঘুরছেন। শীর্ণ বিবর্ণ মুখ। স্ত্রী মারা গেলে মানুষের বুকে যে কি আঘাত লাগে, এ আমার বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ বোঝা যায়! অত্যন্ত উদাসীন প্রকৃতির মানুষ। কে যেন বাবাকে বলেছিলেন, সংসারটা উচ্ছন্নে যাবে শশধর। তুমি আবার বিয়ে কর।

বাবা তার জবাবে বলেছিলেন, সংসার করে' মানুষ একবারই আর সং সাজে বহুবার, সং সাজতে আমার ইচ্ছে নেই মাসীমা। মেয়েটার বিয়ে দিয়েছি, ওদের একটা হিল্লে করে' দিতে পারলেই আমার ছুটি। তখন যে দিকে দু' চোখ যাবে, চলে যাব। সেই যখন আমাকে না বলে' চলে গেল, তখন আমি থাকব কার জন্যে?

ব'লতে ব'লতে তাঁর দু' চোখের কোণে জল দেখা দিত। সেবার বোন এসে বলল, মার গয়নাগুলো আমাকে দেবে বাবা, আমি ভেঙ্গে চুড়ি গড়িয়ে নেব।

বাবা চাবী ফেলে দিয়ে বললেন, শুধু ঐ চেলিখানা আর হাড়-ছড়াটা রেখে তুই সব নিয়ে যা। তোর মার একান্ত ইচ্ছে ছিল—তোর দাদার বৌকে ওগুলো দেবে।

শুনে' বোন বলল, দাদার বিয়ে দেবে বাবা? আমার শ্বশুরবাড়ীর পাশে একটি খাসা মেয়ে আছে। পাড়ব কথা? বাবা গম্ভীর ভাবে বললেন, আগে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখুক। তারপর ইচ্ছে হয়, করবে।

এই সামান্য কথাটা কি করে' উর্ম্মিলার কাণে পৌঁছেছিল। তখনও উর্ম্মিলার বিয়ে হয়নি। জেঠিমার সংসারে থেকে সে পড়াশোনা করে।

বিকেল বেলায় কলেজ থেকে ফিরেই দেখি—বাড়ীর পিছনে আমরুল গাছের তলায় দাঁড়িয়ে উর্ম্মিলা। কোঁচর তার আমরুলে ভর্ত্তি। দুটো আমরুল চাইতেই তার কাছ থেকে জবাব এল, আমরুল দেবার লোক আসুক—সে দেবে। আমি দেব না।

এই বলে' সে বিবর্ণ মুখে চলে' গেল। তার এ অভিমানের কি যে কারণ, বুঝতে পারিনি। পারিনি মানে, বোঝবার মত বয়স আমার হ'লেও, বুদ্ধি হয়নি। কথা বলতে শিখেছি আমি অনেক ছোট বেলায়; কিন্তু কথার গভীর তত্ত্ব বুঝতে শিখেছি অনেক দেরীতে। কাজেই তার এ অভিমান দেখে শুধু অবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম।

আষাঢ় মাস। কপাট খোলা। মাদুর পেতে দোরের কাছে বালিশ নিয়ে পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বাবা ছোট ভাইকে নিয়ে গেছেন পিসীমাদের বাড়ী দেখা করতে। অমানিশা—ঘোর অমাবস্যার রাত্রি। কে যেন পায়ে সরু সরু আঙ্গুল দিয়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগল। টিকটিকি কি ইঁদুর মনে করে' পাশ ফিরে শুলাম। হঠাৎ কার স্পর্শে চমকে চেয়ে হ্যারিকেনের বাতিটে উস্‌কে দিয়ে দেখি—পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে উর্ম্মিলা।

একটু সরে' শোও—সাংঘাতিক ঘুম তোমার বাবা! —বলে' উর্ম্মিলা পাশে শুয়ে পড়ল।

বললাম, জেঠিমা যদি জানতে পারেন, তা' হোলে—

কি আবার হবে? উর্ম্মিলা ত্রস্ত না হয়েই বলল, জেঠিমা আজ জ্যাঠামশায়ের ঘরে শুয়েছেন। বড় ঘরে ভুলু, মাণিক আর তুতু শুয়ে আছে। আলোটা নিভিয়ে দাওনা লক্ষ্মীটি। হাতখানা টেনে নিয়ে বলল, আমার উপর ভয়ানক রাগ করেছ না?

বললাম, করলেই বা! আমি রাগ করলে, তোমার কি হবে তাতে?

খুব যে কথা শিখেছ দেখছি—এই বলে' সে নাকটা [illegible]রে' বলল—বল আগে করনি।

হেসে বললাম, এমন জুলুম করে' অপরাধ স্বীকার করবার প্রণালীটা পুরাকালেও ছিল না।

এইবার হ'ল, বুঝেছ?

ভাবলাম—জবাব দেব না। সে তৎক্ষণাৎ ঘুরে শুয়ে বুকের উপর হাতখানা রেখে কি একটা প্রশ্নের অবতারণা করে'ই চুপ করে' গেল। এক সময়ে তার কথা শেষ হ'ল। আমার ধারণা ছিল, মানুষ না জানি কত কথাই

জানে। সে দিন বেশ বুঝলাম—তার কথা মাত্র একটি কি ‘দু’টি। সেটিকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার বলে’ যাচাই করে’ নেয়। দেহকে আমরা শাসন করেছি অনেক; কিন্তু মনকে শাসন কখনও করেছি বলে’ ত মনে হয় না। তাই মনের সঙ্গে না পেরে উঠবার ভয় ছিল প্রচুর। শুনেছি অনাঘ্রাতা কুসুমই দেবতার নির্ম্মাল্য হবার অধিকার পায়; তাই পাছে মানুষের স্পর্শে সে কলুষিত হ’য়ে যায়, তাকে দূরে সরিয়ে রাখাই ভাল। ধীরে ধীরে বারান্দায় বেরিয়ে এসে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে কলেজে যাব বলে’ বেরিয়েছি, দেখি, ঊর্ম্মিলা একটা প্রকাণ্ড গোলাপ ফুল এনে হাজির।

কোন্ কোটটা পরে’ কলেজ যাবে? এই কালো ছিটেরটা তো? বলে’ই সে এদিক্ ওদিক্ চেয়ে বলল, গোঁজা রইল। দেখো, দয়া করে’ যেন কলেজের কোন মেয়ের খোঁপায় গুঁজে দিয়ে এস না। স্কটিশের ছেলের অসাধ্য কিছুই নেই।

বললাম, তুমি তো জানই ওদিকটাতে আমার কোন প্রতিভা নেই।

সবাইই ঐ কথা বলে! বলে’ উর্ম্মিলা চলে’ গেল। সত্য কথাটা সে শুনে গেল না। মেয়েদের মনকে জয় করবার মত যতগুলি পদার্থ এবং গুণ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে তার কোনটাই আমার মধ্যে নেই। ছোট বেলায় চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বলে’ ঠিক দুরন্ত হতে পারিনি। গাছে চড়া, সাঁতার কাটা, দৌড়-ঝাঁপ কোনটাই আমার আয়ত্তাধীনে ছিল না। গুণ বলে’ যদি কিছু থাকে, সে ঐ কলেজের পরীক্ষা। বাড়ীর মধ্যে আমি ছিলাম এ বিষয়ে মডেল। কেউ ফেল হলেই জেঠিমা ব[illegible] দেবুর পায়ের ধুলো একটু নিয়ে আয়, যা!

সব চেয়ে আনন্দ হ’ত উর্ম্মিলার।

জেঠিমার ছেলেরা তার নামে দুর্নাম রটিয়ে এ বাড়ীতে আসবার পথ বন্ধ করে’ দিল। জেঠামশায়ও তার জন্য পাত্রের সন্ধানে এখানে ওখানে যাতায়াত সুরু করে’ দিলেন।

সেদিনও বাড়ীতে আমি একা। মনটা ভাল ছিল না বলে’ ঠাকুরকে ডেকে বললাম, তুমি যাও কেষ্ট। আমি কিছু আজ খাব না। শরীর ভাল নেই।

তারপর মাদুর পেতে শুয়ে পড়লাম। ঘণ্টাখানেক পরেই কাণে এল—উর্ম্মিলা কেষ্টকে জিজ্ঞেস করছে, বাবু কোথায় রে?

কেষ্ট বলল, বাবু গেছেন বরানগরে ওর বোনের বাড়ী।

—দাদা বাবুরা কোথায়?

—শুধু বড় দাদাবাবু আছেন।

উর্ম্মিলা জিজ্ঞেস করল, তুই রান্না করলি নে যে বড়?

কেষ্ট জবাব দিল, দাদাবাবু রান্না করতে মানা করলেন। শরীর ভাল নেই।

উর্ম্মিলা বলল, খোল শিকল। যাও ভাঁড়ার থেকে ময়দা আর ঘি বের করে’ আন। রোজ-রোজ একঘেয়ে খাবার লোকের ভাল লাগে! একটু তাড়াতাড়ি কর। এখুনি জেঠিমারা আবার এসে পড়বেন।

সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে বললাম, এত যখন ভয়, না এলেই তো পারতে! ময়দা মাখতে মাখতে উর্ম্মিলা জবাব দিল, পরের অন্নে যারা প্রতিপালিত হয়, তাদের সাহস থাকবে কি করে? ন্যায় অন্যায় সব তারা ভুলে যায়।

বললাম, যে চিঠি নিয়ে এত হট্টগোল, এত অপমান, তোমাকে আমি কিন্তু লিখিনি।

উর্ম্মিলা কটাক্ষ হেনে জবাব দিল, মেয়েদের বয়সকালে ও-রকম উড়ো চিঠি অনেকেই দেয়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কাউকেই খুঁজে পাওয়া যায় না, এইটেই যা’ আশ্চর্য্য!

নেমে এসে কপাটের চৌকাটের উপর বসে বললাম, ও শাশ্বত অপরাধটুকু আমাদের কাঁধে নাইবা চাপালে! নিজেদের অবস্থা পরের বলে’ চালাবার চেষ্টা কেন?

—তার মানে? উর্ম্মিলা লুচি বেলতে বেলতে জিজ্ঞেস করল। সহজ ভাবেই বললাম, একনিষ্ঠ প্রেমের ক্ষেত্রে তোমরাই বরঞ্চ পরাজিত। তোমার নিজের কথাই ধর না কেন? আজ তুমি কুমারী আছ, তাই এই অভাগার কথা মনে পড়ে। বিয়ে হবার পর কি আর দিনান্তেও মনে পড়বে ভেবেছ? ছাই! তখন কি মনে হবে জান?

—কি?

—মনে হবে যেন কোন্ মফঃস্বল ষ্টেশনের রেলওয়ে কোয়ার্টারের জানালায় বসে থাকতে দেখেছ কাকে, গাড়ী থেমেছিল, তাই চোখোচোখি হয়েছিল। ক্রমে, বিবর্দ্ধমান পথে ডিস্ট্যান্ট সিগ্‌ন্যালের মতই অস্পস্ট হতে হতে মন থেকে তাকে মুছে দিয়েছ।

ঊর্ম্মিলা বলল, থামলে কেন! বলে' যাও, আমি শুনি।

আর শুনে কাজ নেই।

উঠে আসছিলাম, ঊর্ম্মিলা খপ্ করে' হাতখানা ধরে' বলল, গরম গরম ভেজে দিই খাও। সর্দি শুকিয়ে যাবে।

বললাম, যদি উপরে এনে দিতে পার, তবেই খেতে পারি। আর নইলে—

ঊর্ম্মিলা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, বুঝেছি। তাই হবে। কিন্তু ঘুমিয়ো না যেন।

খাবারের থালা নামিয়ে রেখে ঊর্ম্মিলা বলল, দিনরাত পড়লে ব'য়ের পোকা হ'য়ে যাবে যে!

—গেলামই বা। তোমাকে তো আর কাটবনা।

—খুব কথা শিখেছ দেখছি!

বললাম, কেন, কথাটা কি তোমাদেরই একচেটে নাকি?

ওদিকে জেঠিমাদের গলা পাওয়া গেল। ঊর্ম্মিলার দিকে চেয়ে বললাম, আচ্ছা, আমি খাচ্ছি, তুমি যাও।

ঊর্ম্মিলা বলল, তা হবেনা। আগে খেতে বস দেখি।

—ওদিকে জজ্ সাহেবরা যে এসে পড়েছে।

ঠোঁট উল্‌টে ঊর্ম্মিলা জবাব দিল, এলেই বা! যে আসামী বারবার চুরির দায়ে ধরা পড়ে, তার কি আর জজ্ সাহেবের রায়-কে ভয় থাকে?

বলে'ই ঊর্ম্মিলা নেমে গেল। জেঠিমা জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় ছিলিস্‌রে?

—ও বাড়ীতে। একলা ভয় করছিল এখানে।

—বেশ করেছিস্। নেমন্তন্ন করে' এলাম দেবুর মামাদের। দেবুর দিদিমা পরশু গালুডি যাবে। তোকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়। তা, যা না। বিয়ে তো সেই অঘ্রাণে।

দিদিমার অম্বলের ব্যথার জন্ত আমরা গালুডি এলাম। সেজ মামীমা জোর করে' ঊর্ম্মিলাকে সঙ্গে নিলেন। চা খাওয়া অভ্যাস আমার কোন কালেই ছিল না। এই গালুডিতে এসে ঊর্ম্মিলার পাল্লায় পড়ে হল। বলতাম, চা আমার সহ্য হয় না।

ঊর্ম্মিলা বলত, অনেক কিছুই প্রথমে সয় না, আবার সওয়ালে সবই স'য়ে যায়। আমার হাতের চা খেলে ভুলতে পারবে না।

ভীত হয়ে বললাম, ভুলতেই তো আমি চাই। মনে রেখে লাভ কি?

চায়ের বাটিটা জানলার ধারে নামিয়ে ঊর্ম্মিলা জবাব দেয়, সব সময়ে নিজের লাভ-লোক্‌সানের কথা ভাবলে চলে না। খেয়ে নেও, মামীমা এখুনি এল বলে'। জাননা, আজ আমরা রঙ্কীলা পাহাড়ে বেড়াতে যাব?

চায়ের বাটিটা মুখ থেকে নামিয়ে রেখে বেরিয়ে পড়লাম। দল বেঁধে পাহাড়ের পথ ধরে চলতে সুরু করলাম। দিদিমা যান আর এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে বলেন, যাবার সময় বাজার থেকে ছুটো ভাল দেখে কপি নিয়ে যাব—কি বল বৌমা! মাছ তো হারুকে আনতেই বলেছি। ঝোল করে' দিলে ওরা ছু'জনে খেতে পারবে না! খুব পারবে।

মামীমা থমকে দাঁড়িয়ে বলেন, ওমা, ঐ দেখুন ঊর্ম্মিলা কোথায় নেমে গেছে!

পিছনে চেয়ে দেখি—পাহাড়ের পথ ডিঙিয়ে ঊর্ম্মিলা নেমে গেছে সুবর্ণরেখার ধারে। হাঁটু অবধিও জল নয়। অনায়াসে সেটুকু টপ্‌কে আসা যেতে পারে। কিন্তু যা পিছল আর যা স্রোত! একবার পড়লে আর রক্ষা নেই।

তর-তর করে' নেমে গিয়ে বললাম, ধর আমার হাত।

ঊর্ম্মিলা বলল, পায়ে জল লাগবে যে!

[illegible] উঠে বললাম, আলতার উপর এত তোমাদের মায়া?

ঊর্ম্মিলা বলল, তা' নয় মশাই। পায়ের নীচে কেটে গেছে। জল লাগলে জ্বালা করবে।

—কৈ দেখি!

—থাক, পায়ে হাত দিয়ে আর কাজ নেই।

বললাম, তবে শোও আমার হাতের উপর। পড়লে ছু'জনেই পড়ব। ভালই হবে। মরি যদি, প্রবাসী বাঙালীরা

গালুডির এই সুবর্ণরেখা নদীর ধারে আমাদের নামে একটি মন্দির করে' দেবে। অমর হয়ে থাকব দেশের তরুণদের কাছে। বলা যায় না, কোন কবি হয়তো আমাদের লক্ষ্য করে' দু'ছত্র কবিতাও রচনা করতে পারেন। কি বল?

উর্ম্মিলা চোখের উপর হাত চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ল। মুখে তার হাসির প্রচ্ছন্ন ভাব লুকান। পার হয়ে এলেই সে খিল-খিল করে' হেসে উঠল, বলল, সেরে গেছে আমার পায়ের কাটা—

তার এই অখণ্ড দুষ্টু বুদ্ধি দেখে সেদিন অবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম।

গালুডি থেকে ফিরে আসবার পর একটা দিন তাকে আর দেখিনি। দেখা হ'ল সেই বিয়ের দিন। দেখলাম বধূবেশে। গম্ভীর তার মুখ। আনন্দের চিহ্ন এক তিলও মুখে নেই। কি একটা কাজে নেমে আসছি, কে যেন ডাকলে, শোন—

চাইতেই দেখি—কপাটের পাশে দাঁড়িয়ে উর্ম্মিলা। কাছে সরে' এসে বলল, খেয়েছ? রাত এগারটা বেজে গেছে এর পর কখন খাবে? লোকজন তো সব চলে গেছে। এবার তুমি খাবে এস।

—যাচ্ছি।

উর্ম্মিলা বলল, তোমার খাবার আমি এখানে আনিয়ে রেখেছি। এস আমার সঙ্গে। এদিকে এখন কেউ আসবে না।

উর্ম্মিলা কলঘরের পাশ দিয়ে আমায় ডেকে নিয়ে গেল দক্ষিণের বারান্দায়। সেখানে কারু আসবার সম্ভাবনা ছিল না।

বললাম, সুধীর কি ভাববে বলত, ছিঃ!

উর্ম্মিলা নির্লিপ্তের মত বলল, সে ঘুমিয়ে [illegible] আর এই একটা দিনের জন্ত সে কৈফিয়ৎ চাচ্ছে কি-না! বস। যেদিন থেকে মৃণাল মাসীমা মারা গেছে, সেদিন থেকেই জানি, তোমার খাওয়াও ঘুচেছে। কেউ সামনে না বসিয়ে খাওয়ালে তোমার পেট ভরত না। এর পর শুনব তুমি উপোস করে দিন কাটাবে; ও লুচি ক'খানা খেয়ে নাও লক্ষীটি। আমার দিব্যি রইল। আজকের এই শেষ অনুরোধটুকু রাখবে।

বিস্ময়ে তার পানে চাইলাম। বললাম, বল! সে বলল, ভয় নেই, আমি গুরুগিরি করবনা। বলছি কি, ঐ গালুডির আতা গাছটা, কুন্দ ফুল, গিরিডির গোলাপ গাছটা আর ঐ আমরুল গাছের তলা—সব মিলিয়ে আমাকে একখানা কাউকে দিয়ে ছবি আঁকিয়ে দেবে? জীবনের এই একান্ত অবজ্ঞার দিন-গুলো যে আমার কাছে কি অমর হয়ে রইল! তা' যদি জানতে—

সে থামল না। বলে' চলল, কাছাকাছি এসেও দু'জনের ব্যবধানকে ভাঙতে পারিনি। ভেবেছিলাম তোমায় পাওয়া নির্ভয়ে চিরকাল থাকব। কেউ যদি সন্দেহ করে, অপবাদ রটায়, পৃথিবীর লোককে জোর গলায় শুনিয়ে বলব, কারু কটাক্ষকে ভয় উর্ম্মিলা করে না। কিন্তু—

বলতে বলতে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। তাকে দোর অবধি পৌছে দিয়ে, ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম।

সকালে উঠতে একটু দেরী হয়েছিল। উঠে শুনি—উর্ম্মিলা চলে গেছে। বালিশের নীচে কি একটা পদার্থ দেখে, তুলে দেখি—ছোট একটা সোয়েটার আর এক টুক্‌রো কাগজ। পড়ে' দেখি উর্ম্মিলা লিখেছে—'তোমার জন্ত তৈরী করে' ছিলাম। তাই তোমার কাছেই রেখে গেলাম। ঘুমুচ্ছ বলে' দেখা হ'ল না। কিন্তু দেখা আবার হ'বেই!'

এর পর অনেক দিন অতিবাহিত হ'য়ে গেছে। বছর চার হ'ল মাদ্রাজে গিয়েছিলাম। একটা সরকারী চাকরীও জুটেছিল। ছেড়ে দিয়ে চলে গেলাম কন্যাকুমারিকা। সেখান থেকে হিমালয় আসতে আসতে নামলাম অসংখ্য দেশে। পাথেয় দিতে দিতে যখন তহবিল ফুরিয়ে এল, তখন নিরুপায় হ'য়ে বাড়ী ফিরলাম।

ভ্রাম্যমাণ জীবনে উর্ম্মিলার কোন সংবাদ পাইনি! বাড়ী থেকে সেবার যখন মহেঞ্জোদাড়ো যাই, জেঠিমার ন' ছেলের কাছে শুনেছিলাম, উর্ম্মিলার নাকি একটি ছেলে হ'য়েছে! ছেলেটি ভয়ানক দুরন্ত। আর ভয়ানক না-কি বকতে পারে। মাঝখানে একটি মেয়ে সূতিকাঘরেই মারা গেছে। আবার সে নাকি সন্তান-

সম্ভবা। মাস খানেকের ভিতরেই সে এখানে আসছে। মাটির গুণে যদি তার ছেলে বাঁচে।

নারীজীবনের এই বৈচিত্র্যময় ইতিহাসকে কত দিন বুঝতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই পারিনি। সে যেন আরও রহস্যময়ী, আরও অপরিসীমা মনে হয়েছে! দিনের পর দিন—কত দিন কেটে গেছে। শ্রাবণের আকাশ ভেঙে বারিধারা নেমে এসে যখন ধরিত্রীকে মুখর করে' তোলে, তখন এক এক দিন হঠাৎ আমার গালুডির কথা মনে পড়ে যায়।

মনে হয় যেন, বছর সাতেক আগে এমনি বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় এক দল স্বাস্থ্যসন্ধানী বাঙ্গালী পরিবার গালুডির পথ দিয়ে চলেছেন। রঙ্কিনী পাহাড়ের আড়ালে নেমে গিয়ে যখন তারা সুবর্ণরেখা নদীর ধারে থামল, আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল।

ভিজে কাপড়ে, মাথার চুল ভিজিয়ে তারা এক সময়ে বাড়ী ফিরে আসে। এসেই জামা-কাপড় ছেড়ে, চিড়ে ভেজে, ঘি মাখিয়ে চায়ের বাটি নিয়ে একটি তরুণী এসে যার রুদ্ধ কপাটের দ্বারে ঘা দেয়—সে আর কেউ নয়—আমি। ইজি-চেয়ারের উপর বসে' বসে' ঘুমিয়ে পড়তাম। খোলা জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে ঘুম পাড়িয়ে যেত।

হঠাৎ কার অস্বচ্ছ কণ্ঠস্বরে ঘুম ভেঙে যায়। নিজের কাণকেও বিশ্বাস করতে সাহস হয় না। চুপ করে' পড়ে থাকি। আবার শুনতে পাই—উর্মিলা যেন বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকছে—দেবু দা—আ—আ

ধড়-মড়িয়ে উঠে যখন কপাট খুলে দিই, দেখি সমস্ত বা'রটা শূন্য। সেখানে কারু অপেক্ষা নেই। কারু মৃদু করাঘাত নেই। আকাশের মতই শূন্য ও নিথর।

আবার এসে বিছানায় শুই। শুয়ে শুয়ে ভাবি, আহা, বেচারি আসুক। কত দিন তাকে দেখি নে। অন্ততঃ আমাকে দেখে সে চিনতে পারে কি না, এইটুকু জানবার কৌতূহলই বেশী। শোনা গেল—জ্যাঠামশাই তাকে আনতে গেছেন।

দিন পনর পরে এক দিন দুপুরে বসে' বসে' গ্রীক মাইথলজির অনুবাদ পড়ছি, এমন সময়ে দেয়ালে একটা ছায়া এসে পড়ল।

—চিনতে পার?

মুখের পানে চেয়ে বললাম, গলার স্বরটা চেনা না থাকলে সত্যিই চিনতে কষ্ট হ'ত। ভয়ানক রোগা হ'য়ে গেছ। কবে এলে?

কোল থেকে ছেলেটাকে নামিয়ে রেখে উর্মিলা বলল, সেও ভাল! ভাবলুম বুঝি চিনতেই পারবে না। কেমন আছ?

বললাম, দেখতেই পারছ।

—পারছি আর কই! ছশো মাইল দূর থেকে কি আর এখানে নজর আসে! শরীর ভাল তো?

—হ্যাঁ ভালই, তুমি কেমন আছ?

—ভাল নয়। খোকাটার প্রায়ই অসুখ লেগে আছে। কলতলায় পড়ে' গিয়ে এইখানটা লেগেছিল। সেই থেকে ব্যথা আর কমছে না। মেয়েটা মারা যাবার পর থেকে যেন আমায় শনির দশায় ধরেছে।

ব'লেই সে কথার মোড় ফিরিয়ে নিয়ে বলল, লেখা-পড়া ছেড়ে দিলে কেন? তুমি যে বার এম, এ-তে ফার্ষ্ট হও, কাগজে তোমার ছবি দেখেছিলাম। উনিই এনেছিলেন। বললেন, এই দেখ, তোমাদের দেবুর ছবি কাগজে বেরিয়েছে। প্রথমটা আমি বিশ্বাসই করিনি। শেষে কাগজ পড়ে' দেখি সত্যিই তো। মৃণাল মাসীমা যদি আজ থাকত, কত যে তার আনন্দ হ'ত!

ছেলেটাকে কোলে নিয়ে বলল, যাক্। এবার বিয়ে-থা কর। চাকরী বাকরী কর। কেন ছেড়ে দিলে অমন কাজটা? একটি খুব ভাল মেয়ে আমার সন্ধানে আছে। বলত কথা বলে' দেখতে পারি। মেয়েটি বেশ, কাজে কর্ম্মে—তোমাদের কি যে গোত্র?

হাঁ করে' তার দিকে চেয়ে রইলাম।

[illegible] বলে চলল, এমন সুন্দর সূঁচের কাজ জানে—

বাধা দিয়ে বললাম, সূঁচের কাজটা আপাততঃ থাক। কি তোমাকে ঘটকালি দিতে হবে বলত?

তার মানে তুমি বিয়ে করবে না? কেমন? উর্মিলা অবাক্ হ'য়ে আমার পানে চাইল। বলল, কেন বিয়ে করবে না? সংসারের এই রীতিটাকে উল্টে দিতে চাও বুঝি?

একটু ঠাট্টা করে' বললাম, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় দেবতা শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ গোপিনী ছিল। আর আমার

বন্দর হইতে ভারতের দ্রব্যসামগ্রী লোহিত সাগরের তীরবর্ত্তী প্রদেশে উপস্থিত হইত। সেখান হইতে স্থলপথে এই সকল পণ্য দ্রব্য ভূমধ্য সাগরের নিকটস্থ বন্দরে এবং তথা হইতে ভূমধ্য সাগর দিয়া জলপথে ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন বাজারে গতি লাভ করিত।

রোম-সাম্রাজ্যের পতন হইলে, ভারতীয় রপ্তানী মালের ব্যবসায় আরব বণিক্‌দিগের হস্তগত হয়। তাহাদের বাণিজ্য-তরী ভারতের পশ্চিম উপকূল হইতে সুয়েজ বন্দরে এবং সেখান হইতে মিশরের ভিতর দিয়া আলেক্‌জান্দ্রিয়া বন্দরে নীত হইত। এখান হইতে জেনোয়া ও ভিনিসের বণিকেরা ভারতীয় দ্রব্য ক্রয় করিয়া য়ুরোপের বাজারে চালান দিত। কনষ্টান্টিনোপল ও এশিয়া মাইনরের বাজারেও ভারতীয় পণ্য প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হইত।

ক্রমে পশ্চিম ইউরোপের লোকেরা বুঝিতে পারিল যে, ইতালীয় বাজারে ভারতীয় পণ্য না কিনিয়া যদি ভারত হইতে কিনিতে পারা যায়, তাহা হইলে লভ্যাংশ অধিক হয়। কিন্তু ভূমধ্য সাগরের পথ ইতালীয় বণিক্‌দিগের অধিকারে এবং এসিয়া মাইনর ও লোহিত সাগরের পথ আরব বণিক্‌দিগের দখলে। সুতরাং পশ্চিম ইউরোপের লোকেরা নূতন পথের সন্ধানে নির্গত হইল।

চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই। ভারতের নূতন পথের সন্ধানে, আটলান্টিক পার হইয়া, কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করিলেন। কিন্তু ভারতে পৌছিবার প্রথম সৌভাগ্য লাভ করিলেন—ভাস্কো-দা-গামা নামক একজন পর্ত্তুগীজ নাবিক। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম উপকূল ঘুরিয়া পূর্ব্ব উপকূলের মালিন্দ নামক বন্দর হইতে ভারত মহাসাগরে পাড়ি দিয়া তিনি কালিকট বন্দরে উপনীত হইলেন। ক্রমে পর্ত্তুগীজদের প্রবল অতিক্রম করিয়া, অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির লোকেরাও ভারতের বাজারে আসিয়া পৌছিল।

আফ্রিকা ঘুরিয়া ভারতবর্ষে আসিতে দীর্ঘ সময় লাগিত। লিস্‌বন হইতে কালিকট পৌছিতে ভাস্কো-দা-গামার দশ মাস লাগিয়াছিল। এই পথ যথাসময়ে সুপরিচিত হইলেও, জলদস্যু হইতে আত্মরক্ষা করিয়া, পালের জাহাজে, লণ্ডন হইতে কলিকাতা আসিতে, অন্ততঃ ছয় মাস সময় লাগিত। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে একজন ফরাসী পূর্ত্তবিদ্যাবিৎ সুয়েজ খাল কাটিয়া, ভূমধ্য সাগর হইতে লোহিত সাগরের ব্যবধান দূর করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, দশ বৎসরের অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে প্রতীচী হইতে প্রাচ্যে পৌছিবার সংক্ষিপ্ত পথের ব্যবস্থা করেন। ইতিমধ্যে বাষ্পীয় পোত আবিষ্কৃত হয় এবং ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে আটলান্টিক মহাসাগরের পথে ভারতে আগত সর্ব্বপ্রথম বাষ্পীয় পোত ১১৩ দিনে লণ্ডন হইতে কলিকাতায় পৌছিয়াছিল। এখন উন্নত প্রণালীর অর্ণবযান এক পক্ষের মধ্যে ফরাসী বন্দর মার্সেইলস্ হইতে বোম্বাই বন্দরে পৌছিতেছে।

ইউরোপীয় বণিক্‌গণের শুভাগমনের পর মন্দভাগ্য স্থিতিশীল ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ধীরে ধীরে তাহাদের হাতে চলিয়া যায় এবং তাহারা ভারতীয় রঙ, নীল, রেশম, মসলা ও বস্ত্রাদি ইউরোপে বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করে।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে কৃষিকার্য্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। ধান, গম, যব, তুলা, পাট, নীল, তিসি প্রভৃতি শস্য ও উদ্ভিদ্ আমাদের দেশে আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে এবং বহু উদ্ভিদ্ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থের ব্যবহার বিদেশে প্রচলিত হইয়াছে। ভারতে স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, অভ্র, পাথুরিয়া কয়লা প্রভৃতির খনি থাকায় অতি প্রাচীন যুগ হইতে শিল্পকর্ম্ম ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছে।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ইউরোপীয় বণিক্‌গণ এদেশে আসিতে আরম্ভ করে। পর্ত্তুগীজেরা আসে সর্ব্বপ্রথমে (১৪৯৮ খৃঃ); তারপর ওলন্দাজেরা (১৬০২ খৃঃ); তৎপশ্চাতে আসেন ইংরাজ (১৬০৯ খৃঃ); দিনেমার (১৬১৬ খৃঃ); ফরাসী (১৬৬৪ খৃঃ। জার্ম্মাণীও চেষ্টার ত্রুটি করে নাই, কিন্তু বিশেষ কিছু করিতে পারে নাই। কালক্রমে পর্ত্তুগীজ ও ওলন্দাজদিগের নানা কারণে অবনতি ঘটে এবং ফরাসীরাই ইংরাজের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী থাকেন। বাণিজ্য, উপনিবেশ ও প্রাধান্য লইয়া এই দুই জাতির যুদ্ধ-বিগ্রহ চলে এবং ভাগ্যলক্ষ্মী ইংরাজকেই জয়মাল্য প্রদান করেন।

সাম্রাজ্য ও বাণিজ্যের অধিকারী হইয়া ইংরাজ এদেশে স্বীয় শিক্ষা ও সভ্যতা প্রচলিত করেন। ফলে, ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে। শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রসাদে ভারতবাসী অলস ও অপটু হইয়া নিজের শিল্প ও বাণিজ্য হইতে ধীরে ধীরে বঞ্চিত হইয়া পড়ে। কালক্রমে নিজের অন্নবস্ত্রের নিমিত্তও তাহাকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয়। তদবধি বিদেশী বণিকেরা ভারতের অর্থ শোষণ করিতেছে।

ইংরাজের অবাধ বাণিজ্য নীতির ফলে, ভারতের বহু শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্য লুপ্ত হইয়া যায়। ভারতের পোতশিল্প ও পোত-বাণিজ্যও তাহাদের মধ্যে অন্যতম। অনতিবিলম্বে শ্রীমন্ত ও চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য-তরীও বাণিজ্য-বৈভবের কাহিনী ঠাকুরমার রূপকথায় পর্য্যবসিত হয়।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের প্রবল অভিঘাতে বাঙ্গালার মারফতে সমগ্র ভারতের স্বদেশী চৈতন্য উদ্বুদ্ধ হয়। তদবধি এবং বিশেষ করিয়া বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে, ভারতবাসী বহু শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যে আত্ম-নির্ভরশীল আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে প্রয়াস পাইতেছে; কিন্তু পদে পদে বাধা, বিঘ্ন, বিরোধ ও বিপদ্। বৈদেশিক বাণিজ্য বহুকাল জাতীয় পোত ও জাতীয় যাত্রী ও মালবাহী প্রতিষ্ঠানের অর্থ-সামর্থ্যের বহির্ভূত হইয়া রহিয়াছে। আজ বিশ বৎসরের অধিক কাল আমরা ভারত, বর্মা এবং সিংহলের উপকূল বাণিজ্যে রুদ্ধ হইয়া আছি; কিন্তু সেখানেও বিপুল বাধা, বিঘ্ন ও বিরোধ। অতি সংক্ষেপে আমরা সে কাহিনী লিপিবদ্ধ করিব।

সর্ব্বদেশেই উপকূলবাণিজ্যে জাতীয় জাহাজের একাধিপত্য। একমাত্র ভারতেই ইহার ব্যতিক্রম; কারণ, ভারত পরাধীন। ভারতে জাতীয় মাল ও যাত্রীবাহী জাহাজপ্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে উপকূল-বাণিজ্য বৈদেশিক জাহাজ-কোম্পানীর অধিকৃত ছিল। স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাবের সঙ্গে এই বাণিজ্যে বৈদেশিক কোম্পানীর সহিত প্রবল প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। শাসনতন্ত্রের পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতার অন্তরালে অবস্থিত, অর্থ-সামর্থ্যে প্রবল পরাক্রান্ত বৈদেশিক জাহাজ প্রতিষ্ঠানের সহিত ক্ষীণজীবী স্বদেশী শিশুপ্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতা আত্মবিনাশের নামান্তর মাত্র। তথাপি স্বদেশী প্রতিষ্ঠান রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে নাই। পরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী তখন মাল ও যাত্রীবাহনের হার অতিমাত্রায় কমাইয়া স্বল্পশক্তি-সামর্থ্য-সম্পন্ন স্বদেশী কোম্পানীর কণ্ঠরোধ করিবার দৃঢ় চেষ্টা করিয়াছিল। এই অন্যায় প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রপরিষদে প্রবল আন্দোলন ও আলোচনার ফলে, গভর্ণমেণ্টের সক্রিয় প্রচেষ্টা ও মধ্যস্থতার গুণে বৈদেশিক মাল ও যাত্রীবাহী জাহাজপ্রতিষ্ঠানের সহিত স্বদেশী জাহাজপরিচালকবর্গের একটি আপোষ বন্দোবস্ত হয়। কিন্তু তাহাতেও স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের দুঃখের অবসান ঘটে নাই। অধ্যবসায়, অভিজ্ঞতা এবং দেশবাসীর আন্তরিক সহানুভূতি ও সমর্থনে শক্তি সঞ্চয় করিয়া স্বদেশী প্রতিষ্ঠান আত্মপ্রতিষ্ঠার বিপুল প্রচেষ্টা দ্বারা কোনরূপে আত্মরক্ষা করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছে। ইতিমধ্যে এই অন্যায় প্রতিযোগিতার ফলে আট কোটি টাকা মূলধনসম্পন্ন কুড়িটি ভারতীয় জাহাজ-প্রতিষ্ঠান এই ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত ও বহিষ্কৃত হইয়াছে। অর্থ-সামর্থ্য, সহায়-সম্পদ্ এবং প্রবল সঙ্ঘে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত বৈদেশিক স্বার্থের সংঘর্ষে জাতীয় প্রতিষ্ঠান আত্ম-নির্ভরশীল হইবার পূর্ব্বেই, যুদ্ধ বিঘোষিত হইয়া, তাহার কণ্টকাকীর্ণ পথকে অধিকতর বিঘ্ন-বিপত্তি-সঙ্কুল করিয়াছে।

যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে, সিন্ধিয়া জাহাজ কোম্পানী বিপুল চেষ্টার ফলে বৈদেশিক পরিচালকবর্গের হস্ত হইতে "বম্বে ষ্টীম কোম্পানীর" পরিচালনভার গ্রহণ করিয়া, বর্মা ও কচ্ছ উপকূলস্থ বাণিজ্য কিঞ্চিৎ নিরাপত্তার ব্যবস্থা [illegible]ছিল; কিন্তু যুদ্ধের অভিঘাতে তাহাদের শক্তি-সামর্থ্য বহুল পরিমাণে খর্ব্বীকৃত হইয়াছে। বহির্বাণিজ্যের কর্ম্মক্ষেত্রে যখন তাহারা প্রসারপরিকল্পনা ও প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত হইবার উদ্যোগ-পর্ব্বের সূচনা করিয়াছিল, তখন যুদ্ধপ্রয়োজনের তাগিদে তাহাদের স্বল্পাধিকৃত স্বত্ব ও স্বার্থ ব্যাহত হইয়াছে।

বিভিন্ন ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীর ত্রিশখানির অধিক জাহাজ গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধপ্রয়োজনে দখল ও নিয়োগ

করিয়াছেন। ফলে, বর্মা, বোম্বাই ও কচ্ছ উপকূলে "স্বদেশী বাণিজ্যের বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়াছে। মাল ও যাত্রীবাহী জাহাজের অভাবে জাতীয় জাহাজ প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের মুখের গ্রাস হইতে বঞ্চিত হইতেছে। পক্ষান্তরে, বৈদেশিক জাহাজপ্রতিষ্ঠানগুলি স্বাধীন শাসনতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতা এবং মিত্র ও নিরপেক্ষ জাতীয় জাহাজের সাহায্যে তাহাদের ব্যবসায়বৃদ্ধি করিতেছে। গৃহীত জাহাজগুলির ভাড়া কর ও ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি ব্যবস্থা কিছুদিন পূর্ব্বে পর্য্যন্ত" স্থিরীকৃত হয় নাই। অধিকন্তু, ভারতের তালিকাভুক্ত জাহাজগুলির প্রতি বিধি-নিষেধের অত্যাচার অন্ত নাই। তাহাদের গতিবিধি এবং মাল ও যাত্রীবহনের ভাড়া প্রভৃতিও সরকারী শাসনগণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বৈদেশিক ও স্বদেশী জাহাজের মধ্যে এই যে একদেশদর্শী প্রভেদ ও পার্থক্য, ইহাতে অসন্তোষের বীজ উপ্ত হইয়া কুফল প্রসব করিতে পারে। স্বাধীন দেশের শাসনতন্ত্রের স্বজাতীয় জাহাজের প্রতি যে দৃঢ় দরদী দৃষ্টি সদা বিদ্যমান, ভারতীয় জাহাজের প্রতি ভারত শাসনতন্ত্রের সেরূপ সদয় দৃষ্টির অভাব অনুভূত হয়। ব্রিটীশ শাসনতন্ত্র ব্রিটীশ জাহাজগুলিকে জাতীয় বৈভব বিবেচনা করিয়া সর্ব্বপ্রকার সাহায্য ও সমর্থন প্রদান করেন; কিন্তু ভারতে এ কল্যাণকর নীতির বিপর্য্যয় দৃষ্ট হয়। ভারতীয় জাহাজ প্রতিষ্ঠানগুলি যে বাঁচিয়া আছে এবং তাহাদের অতি সঙ্কীর্ণ অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিতেছে, সে সম্পূর্ণরূপে স্বাবলম্বননীতির ফলে। সুতরাং যতদিন ভারত গভর্ণমেণ্ট এই সকল ক্ষীণজীবী প্রতিষ্ঠানগুলিকে সক্রিয় সাহায্যে ও নিরঙ্কুশ সমর্থন দিতে সমর্থ না হন, ততদিন অন্ততঃ তাহাদিগকে প্রয়োজনাতিরিক্ত বিধি-নিষেধের পীড়ন হইতে মুক্ত রাখিতে [illegible] করা কর্ত্তব্য।

ভারতীয় জাহাজপ্রতিষ্ঠানের দুঃখদুর্দ্দশা ও বাধা-বিপত্তি অনেক। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটির আলোচনা সিন্ধিয়া কোম্পানীর গত বাৎসরিক অধিবেশনে হইয়াছিল। এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বালচাঁদ হীরাচাঁদ তাঁহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, স্বল্প সহায়-সম্পদ্-সম্পন্ন ভারতীয় বণিক্-পোতপ্রতিষ্ঠান কয়েকটির জাহাজ যুদ্ধার্থে নিয়োগ করিয়া গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগের স্বল্পপরিসর কর্ম্মক্ষেত্রে তাহাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। জাহাজের অনাটনে, কার্য্যতৎপরতার সঙ্কোচ হেতু, তাহাদের আয়ত্তীভূত ব্যবসায়ের সামান্য অংশ হইতেও তাহারা বঞ্চিত হইতেছে। কিন্তু প্রবলশক্তি-সামর্থ্যসম্বলিত ব্রিটীশ জাহাজ প্রতিষ্ঠানগুলির নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্র যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তৎপ্রতি ব্রিটীশ পোতমন্ত্রিবিভাগের সতর্ক দৃষ্টি আছে। যদিও সকল ব্রিটীশ জাহাজ সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে, তথাপি ভারতের উপকূলবাণিজ্যে বৈদেশিক জাহাজের কার্য্য-তৎপরতা অক্ষুণ্ণ আছে। এই বিষয়ে ভারতের জাতীয় পোতগুলির কর্ম্মতৎপরতা যাহাতে খর্ব্ব না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যথাসম্ভবমত তাহাদিগকে পরিহার করিলে ভাল হইত।

যুদ্ধার্থে গৃহীত পোত ব্যতীত, ভারত-তালিকাভুক্ত অন্যান্য জাহাজগুলির গতিবিধি কঠোররূপে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। মালের মাশুল এবং যাত্রীর ভাড়া নির্দ্ধারণ করিবার ক্ষমতাও তাহাদের অক্ষুণ্ণ নাই; কিন্তু বৈদেশিক পোতগুলির এ সম্বন্ধে কোন বাধা-নিষেধ নাই। বৈদেশিক জাহাজের, ভারতীয় জাহাজের প্রতি ব্যবহারের এই পার্থক্যই চরম নহে। ভারত-তালিকাভুক্ত জাহাজগুলির মধ্যে যেগুলি ভারতবাসীর তত্ত্বাবধানে, তাহাদের সহিত যেগুলি বৈদেশিক পরিচালকের অধীন, তাহাদের বিধি-বিধানের যথেষ্ট পার্থক্য দৃষ্ট হয়। বৈদেশিক পরিচালনাধীন মোগল লাইনের জাহাজগুলির সহিত ভারতবাসীর পরিচালিত পোতগুলির আচার-আচরণের যে বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছিল, পুনঃ পুনঃ আন্দোলনের ফলে সম্প্রতি তাহার কিঞ্চিৎ সমতা সাধিত হইয়াছে। এই জাহাজগুলি কলিকাতা, বোম্বাই, করাচী ও লোহিত সাগরস্থ বন্দরে যাতায়াত করে। তাহাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হয় নাই বটে, কিন্তু মাশুল ও ভাড়ানির্দ্ধারণের ক্ষমতা খর্ব্বীকৃত হইয়াছে। ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্ট তদধিকৃত ব্রিটীশ জাহাজগুলির এ বিষয়ে স্বাধীনতা খর্ব্ব করেন নাই।

হজযাত্রী বহনের নিমিত্ত মোগল ও সিন্ধিয়া প্রতিষ্ঠান দ্বয়ের মধ্যে যে প্রভেদ ও পার্থক্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি ঘটিয়াছে,

শ্রীযুক্ত বালচাঁদ হীরাচাঁদ তাহারও বিস্তৃত উল্লেখ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রবন্ধের কলেবরবৃদ্ধির ভয়ে আমরা সে প্রসঙ্গের আলোচনা করিব না।

জাতীয় পোত-প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকার ও প্রসারকল্পে শ্রীযুক্ত বালচাঁদ হীরাচাঁদ কয়েক বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন; কিন্তু তাঁহার প্রচেষ্টা ও প্রযত্ন এখনও ফলপ্রসূ হয় নাই। ভারতের উপকূল ব্যবসা ও বাণিজ্যে অক্ষুণ্ণ অধিকার ব্যতীত, জাতীয় পোত-প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতের বহির্বাণিজ্যেও একটি বিশিষ্ট অংশের দাবী করে। এই সম্পর্কে পূর্ব্বোক্ত ত্রিশক্তি চুক্তির (Tripartite Agreement) সংস্কারকল্পে শ্রীযুক্ত বালচাঁদ বৎসরাধিক কাল প্রচণ্ড প্রচেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু যুদ্ধ-সঙ্কট উপস্থিতি হেতু বিষম বিপত্তি ঘটিয়াছে।

সর্ব্ব দেশে জাতীয় পোত প্রকৃষ্ট জাতীয় সম্পদরূপে পরিগণিত। যুক্তরাজ্যে ও যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় পোত জাতীয় সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হয়; কিন্তু ভারতে ভারতীয় পোত সে সম্মান হইতে বঞ্চিত। ব্রিটিশ পোতপুঞ্জ যুদ্ধান্তে স্বস্ব অধিকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার নিমিত্ত উপযুক্ত রাষ্ট্র-সাহায্যের প্রগাঢ় প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু ভারতে সেরূপ প্রতিশ্রুতি দূরে থাকুক, অনুরূপ পৃষ্ঠপোষকতার আশ্বাসেরও অভাব।

জাতীয় পোত জাতীয় ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনপূর্ব্বক জাতীয় সম্পদের সৃষ্টি ও পুষ্টি বিধান ব্যতীত, জাতীয় স্বাতন্ত্র্যসংরক্ষণ সম্বন্ধে সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করে। রণতরী যেমন প্রথম ও প্রধান রক্ষীবাহিনী; বাণিজ্যতরীও তেমনি দ্বিতীয় রক্ষীবাহিনী। রণতরী যুদ্ধ করে; বাণিজ্যতরী রসদ যোগায়। একের সাহায্য ব্যতীত অপরটি নিরর্থক। এই নিমিত্তই, জাতীয় পোত জাতীয় সম্পত্তি।

ভারতের ভৌগোলিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে, তাহার স্থল এবং জল—উভয় পথেই দৃঢ় রক্ষীবাহিনীর প্রয়োজন অনুভূত হয়। স্থল অপেক্ষা জলই তাহার বিপুল বাণিজ্যের প্রশস্ত পথ। বাণিজ্য ব্যতীত জীবনযাত্রা দুর্ঘট। সুতরাং ভারতের একটি বিশাল বাণিজ্যতরী বহরের আশু প্রয়োজন। এই প্রয়োজন স্বায়ত্ত শাসনের একটি অত্যাবশ্যকীয় ও অপরিহার্য্য আনুষঙ্গিক অঙ্গ। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যখন ভারতকে স্বায়ত্তশাসনশীল করিবার আন্তরিক চেষ্টার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তখন সক্রিয় সাহায্য প্রদান পূর্ব্বক, অচিরে পোতনির্ম্মাণশিল্পের প্রতিষ্ঠা দ্বারা, ভারতে একটি বিপুলায়তন রণতরী ও বাণিজ্যতরী বহরের সৃষ্টি ও পুষ্টি প্রয়োজনীয়। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্টি রক্ষার ব্যবস্থা প্রয়োজন। সংরক্ষণ ব্যতীত সংগঠন, কিংবা সংগঠন ব্যতিরেকে সংরক্ষণ সম্ভব নহে। অতএব জাতীয় অভ্যুদয় ও জাতীয় নিরাপত্তা—উভয় প্রয়োজনেই পোতশিল্প ও পোত বাণিজ্যের সৃষ্টি, পুষ্টি ও প্রসারের বিশেষ আবশ্যক। যাহাতে এই দুইটির কোনটিই ব্যাহত না হয়, তৎপক্ষে সরকার ও শিল্পনিষ্ঠ ব্যক্তি মাত্রেরই দৃঢ় অধ্যবসায় প্রয়োজন।

আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতের মুষ্টিমেয় জাতীয় পোতকে এখনও দারুণ দুঃখ, দৈন্য ও দ্বন্দ্বের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া, স্বল্প মাত্রে সন্তুষ্ট হইয়া, আত্মপ্রতিষ্ঠা দূরে থাকুক, আত্মরক্ষার নিমিত্ত সচেষ্ট থাকিতে হইয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধের পর যেরূপ সাহায্য, ও পৃষ্ঠপোষকতা আমাদের অবশ্যপ্রাপ্য ছিল, তাহা আমরা পাই নাই। এখনও যতটুকু সাহায্য ও সহায়তা পাইলে, আমরা পোতশিল্প ও পোত-বাণিজ্যে অগ্রগতি লাভ করিতে পারি, তাহারও একান্ত অভাব। শুধু তাহাই নহে; পদে পদে বাধা, বিঘ্ন ও বিপত্তি। অদম্য উৎসাহ এবং বিপুল অধ্যবসায়ের সহিত আমাদের দেশের পোতশিল্প ও পোত-বাণিজ্য-নিষ্ঠ ব্যক্তিগণকে অগ্রসর হইতে হইবে। আশা করি, এই অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য্য অনুষ্ঠানে [illegible]র অবস্থানুযায়ী সাহায্য ও সমর্থনপ্রদানের সুমতি প্রতিশ্রুতির পর্য্যায় পরিত্যাগ করিয়া বাস্তবের পটভূমি আশ্রয় করিবে।

উপকূল বাণিজ্যে অন্যান্য দেশের ন্যায় একাধিপত্য, বহির্বাণিজ্যে যথোপযুক্ত ক্রমবর্দ্ধমান প্রসার ও প্রতিপত্তি এবং পোতনির্ম্মাণশিল্পের বিস্তৃত প্রতিষ্ঠা—ইহাই ভারতের ঐকান্তিক দাবী।

অবনীন্দ্রনাথ ও ভাবী ভারতীয় চিত্রশিল্পীর অভাব

শ্রীনীরদ গুপ্ত

বর্ত্তমান যুগে যুদ্ধবিগ্রহ সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশ্বব্যাপী যে দুর্নিবার অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, তার চাপে শুধু দেশীয় সমাজ-রাষ্ট্রেই নয়—কলা, কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত রাগরাগিণীগুলো পর্য্যন্ত আত্মহত্যা করতে বসেছে।

মোট কথায়, অন্তরাল থেকে প্রকাশ্য দরবারে এসে বিজ্ঞান যখনই তার মারণযন্ত্রের মুখোস পরে' কসরৎ দেখাবার প্রয়াসী হয়েছে, তখনই সমস্ত দুনিয়ার আর্টের মন্ত্র অকেজো এবং শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরবার উপক্রম করেছে। তার একমাত্র কারণ হয়তো এই যে, বিজ্ঞান সৃষ্টি-বিধ্বংসী। তার ক্ষমতা অসীম। পাঞ্চভৌতিক উপাদানে নিত্য উদ্ভাবিত হয়ে মানবের যতটা উপকার সাধন না করেছে, তার ঢের বেশী অপকার করেছে এই সামান্য বা বিজ্ঞান। অথচ সেই ভয়ে দূরে সরিয়ে রাখাও চলে না তাকে—কেন না, ক্ষণভঙ্গুর বাস্তব জীবনকে সত্যিকার উপভোগ করতে যদি হয় ত সেই হচ্ছে একমাত্র নির্লোভ বান্ধব। তাই বলে' আর্টকেও অস্বীকার করা যায় না,—কিন্তু সে হচ্ছে অবাস্তব বা কল্পনাজীবনের সহচর। বাস্তব জীবনক্ষেত্রে তার মূল্য নেই বল্লেই চলে,—এমনি ধারণা জনসাধারণের।

জনসাধারণ যদি বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের মূল্য দিতে জেনেও থাকে, ত তার হেতু, হয়তো তারা অতিমাত্রায় বাস্তবপন্থী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কল্পনার একঘেয়েমীতা তাদের আর বরদাস্ত হয় না। নয়তো এটাও হতে পারে, অর্থনৈতিক সমস্যার দিনে একমাত্র কল্পনা দ্বারা উদরান্ন যোগাড় হবার সম্ভাবনা নেই বুঝে অসময়ের বন্ধু বি[illegible] আশ্রয়ভুক্ত হয়ে বাস্তবের পথে অন্নসংস্থানের উপায়ান্বেষণ। অন্নচিন্তার সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য কোনরূপ চিন্তাকে পোষণ করা যায় না। কিন্তু বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের সাহায্যেও যে অন্নচিন্তার সমাধান হবেই, তারও ভরসা পাওয়া যাচ্ছে না। এখন কোথায় গিয়েই যে এ সমাধানের সমাপ্তি ঘটবে, কে বলতে পারে? সমাধানের সমাপ্তি নাই ঘটুক, মহাকাল কারও অপেক্ষায় বসে' থাকেন না। তার অনিবার্যতা সৃষ্টির অণুপরমাণুতে। যা পুরাণো, যা জীর্ণ, তার অবসান করে' সেই ধ্বংসের মাঝেই নূতনের বীজের যোগান দেওয়াই তার চলার ছন্দঃ আর আনন্দ। বিজ্ঞানের এক কাজ যদি সৃষ্টিকে ধ্বংস করাই হয়, সে হচ্ছে মহাকালের দোসর। আর্ট চলে সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে, আর ধ্বংসের মাঝ থেকে নূতনের করে আমদানী, দেয় জন্ম,—একাধারে তারা বিষ্ণু আর পরম পিতামহ ব্রহ্মা। কিন্তু এ দুয়ের ক্ষমতা একেশ্বর মহাকালের কাছে কতই না তুচ্ছ! তবু তাদের ক্ষমতা অনন্যসাধারণ—কেননা, মারণের কৌশল থেকে জীয়নের কৌশল জানা অনেক দুর্জ্ঞেয়; ধ্বংস করা সহজ, কিন্তু সেই ধ্বংস থেকে রক্ষা করা বা পুনরুৎপত্তিকরণে অনেক ক্ষমতার দরকার। আর্ট এমনি ক্ষমতার অধিকারী; শুধু অন্তর্লোক নয়, বাইরেও তার ক্ষমতার ব্যবহার চলে। বিজ্ঞান অন্তরের বিচার করে না, অন্তরদেবতাকে সে দু'পায়ে পিষ্ট করে' চলে। অপমানিত দেবতার অভিশাপ-বর্ষণ হয়—অন্তর পেয়েও অন্তরশূন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয় এ বিজ্ঞান।

এখানে আমার আর্ট আর বিজ্ঞানের ক্ষমতার তুলনা করা উদ্দেশ্য নয়, এবং তা' করাও হয়তো ভুল। শুধু জানতে চেয়েছিলাম, সমস্ত বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানের যে সংহারমূর্তি আজ ভীষণভাবে প্রকটিত হয়ে উঠেছে, সর্বপ্রকার সমস্যার সঙ্গে শান্তিকামী মানুষের দুর্বল আত্মা সেখানে ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে—যা দিয়ে মানুষ সত্যকার আনন্দকে পেয়ে বেঁচে উঠে, সেই সাহিত্য, কাব্য, কলা, সঙ্গীত—বিজ্ঞানের যূপকাষ্ঠে এদের রক্ষা করা মানবসভ্যতার আবশ্যক কিনা এবং সে কোন্ পথে?

দেখা গেছে, আজকাল যে কোন দেশ বা রাষ্ট্র যদি কোন বিপদের আবর্ত্তে গিয়ে পড়ে, তবে তাকে বাঁচাতে একটা যেন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। প্রত্যেক দেশেই সর্ববিষয়ে একটা প্রতিক্রিয়া বা আন্দোলনের সূচনা হয়। তার কারণ, আধুনিক সভ্যতার দৌলতে

দেশ-পরম্পরায় একটা অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ঘটেছে—মানবদেহের স্নায়ুতন্ত্রীর মত। দেহের কোন স্থান আঘাত-প্রাপ্ত হলে যেমন সমস্ত দেহের উপর তার ক্রিয়া চলে, এও যেন অনেকটা তেমনি।

সমস্ত ইউরোপে আজ যে যুদ্ধের তাণ্ডবলীলা চলেছে, তাতে সেখানে যে সব সমস্যার উদ্ভাবন হয়েছে, তার প্রতিক্রিয়া ও আন্দোলন চলেছে অপরাপর মহাদেশ-সমূহে। প্রত্যেক মহাদেশের ভেতর যাবতীয় সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র, সাহিত্য, কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ললিতকলা, সঙ্গীত—সর্ব বিষয়েই একটা বিপ্লবের সূচনা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। বিপ্লবের আবশ্যকতা তখনই, যখন কোন বস্তুবিশেষে বা নিয়মতান্ত্রিক ব্যাপারে জীর্ণতার কীটাণু প্রবেশ করে। এখন যদি দেশস্থ সমাজ, ধর্ম প্রভৃতির ভিত্তি জীর্ণ হয়ে যায় ত বিপ্লব দ্বারা তার সুসংস্কার করাই শ্রেয়ঃ। ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত থাকলে শত সহস্র বিপ্লবেও কোন জিনিষ নষ্ট হতে পারে না।

আমি আমাদের সর্বভারতীয় শিল্পকলার কথাই বলছিলাম। ঐতিহ্যের পৃষ্ঠা খোঁজ করলে দেখা যায় যে, বুদ্ধদেবের নির্বাণলাভের কয়েক বছর পরে আধ্যাত্মিক ভিত্তির ওপর যে ললিতকলা ভারত তথা চীন, জাপান, তিব্বত, নেপাল, শ্যাম, মালয়, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বোর্ণিও প্রভৃতি স্থানে বুদ্ধদেবের চেলা-চামুণ্ডাগণের দ্বারা বিশ্বসমক্ষে নূতন রূপে বর্ণ-বৈচিত্র্যে সুসজ্জিত হয়ে সমুদ্ঘাটিত হয়েছিল, তা' পরবর্তী শতাব্দীর মোগল ও রাজপুত বা রাজস্থানীয় চিত্রগুলোর কাছে স্থান না পেলেও, সেই সমস্ত বৌদ্ধযুগীয় শিল্পকলার প্রভাব কোন অংশে হীন হয়েছে বলে' শোনা যায় নি। তবে প্রভাব চাপা পড়েছিল, সে যুগধর্মেই হোক বা নানারূপ যুগবিপ্লবের দৌলতেই হোক।

মোগল রাজত্বের পতনের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অভ্যুদয়ে পাশ্চাত্য শিল্পের কায়েমী পত্তন হল। তিত্তপত্তন হয়েছিল মৌর্যবংশীয় রাজত্বের সমসাময়িকে—যখন গ্রীসিয়ান প্রভুত্ব ভারতের একপ্রান্ত গ্রাস করে বসেছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন ছল-বল-কৌশলে ধীরে ধীরে ভারতের সর্বপ্রান্ত অধীনস্থ করে' দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনল, তখন সেই সভ্য শ্বেতাঙ্গ জাতির একান্ত অনুগ্রহের ওপর আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান, ধর্ম, বিবেক, বুদ্ধি দিনে দিনে অভিনব প্রসারতা লাভ করলে। চোখ খুলে আমরা স্বদেশ ছেড়ে বিদেশকে দেখ্‌তে শিখ্‌লাম; স্বদেশ ভুললাম—বৈদেশিক হাবভাব, নিয়মকানুন আয়ত্ত হ'ল। দেশীয় ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়ে বসলাম জয়ী শ্বেতাঙ্গদের দোর-গোড়ায়। তারপর সর্বদিক্ রিক্ত হয়ে যখন আমরাই আমাদের দেশে বিদেশী শাসকবর্গের 'নোকর' হয়ে দুটি অন্নের জন্য হাপিত্যেশ করে বেড়াচ্ছি, তখন দেশীয় দু' একজন মানুষের দৃষ্টি আচম্বিতে ফিরে এল নিজেদের মধ্যে এবং তাঁরা সচেষ্ট হলেন হৃত গৌরব ফিরিয়ে আন্‌বার জন্য। তাঁরা বুঝ্‌লেন, অতীত ভারত সর্বসংস্কৃতির আদর্শস্থল ছিল।

ভারতসরকারকে তাঁরা চাপ দিলেন; ফলে দেশে কতকগুলো পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রতিষ্ঠা হল, পুরাতন ঐতিহাসিক স্থানসমূহে কাজ আরম্ভ হল। শতাব্দীর, যুগযুগান্তরের লুপ্ত জিনিষপত্র বেরিয়ে পড়তে লাগলো—জনসাধারণের কাছে তাদের মূল্য বাড়াতে কাগজে কলমে অনেক লেখা চলল। শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ এই সময়ে নানরূপ বৈদেশী চিত্র দেখে হাত মক্‌সো কর্‌তে ব্যস্ত ছিলেন—হঠাৎ এই দিকে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের প্রচেষ্টার ফলে হায়দ্রাবাদ, বোম্বাই, মহীশূর, রাজপুতনা, বেহার, উড়িষ্যা অঞ্চলে যে সমস্ত বৌদ্ধযুগীয় চিত্রসমূহের নমুনা বেরিয়ে পড়ল, সেই প্রাচীন ভিত্তির ওপর অভিনবত্বের চুণকাম করে' অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় চিত্রকলার একটা খস্‌ড়া তৈরী কর্‌লেন। তিনি ছাত্র হিসেবে পেলেন অসিত, নন্দলাল, মুকুল আর সমরেন্দ্রকে। ভারতীয় চিত্রকলার অভিযান সুরু হল। ছবি দিয়ে, প্রবন্ধ দিয়ে নানা দিক্-দেশে প্রচার কার্য চল্‌ল। পড়ে' দেখে জনসাধারণ আড়ালে হাস্‌ল—কেউবা কঠিন ব্যঙ্গোক্তি কর্‌তে কসুর কর্‌ল না। কেননা, তারা ছবির বাইরের আউট-লাইনটাই দেখ্‌তে লাগ্‌ল,—ভিতরের রসের সন্ধান কর্‌ল না। তারও হেতু আছে। ইউরোপ হ'তে আগত চিত্রকলায় ইতিমধ্যেই ঘর, বাজার ছেয়ে গেছে। এ চিত্রকলার এমনি গুণ যে, শুধু বাহিরটুকু দেখলেই দর্শকের মনে আনন্দের সঞ্চার করে। তার অর্থ এই,

প্রকৃতি থেকে বহু টাচি্ং ক'রে' অপূর্ব বর্ণবিন্যাসের জৌলুষ মাখিয়ে চিত্রগুলোকে এমন ভাবে সুশোভিত করা হয় যে, মনে ভ্রম জাগে, ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে রঙ্ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যেন। এর ভেতর আলোছায়ার (light and shade) খেলাটা আবার বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, একেই বলা হয়েছে ফাইন আর্টস্।

প্রথম দিকে অবনীন্দ্রনাথ এরই প্রভাবাপন্ন হ'য়ে পড়েছিলেন বলে' মনে হয়, তারপর হয় জাতীয় উন্নতি-বিধানকল্পে, নয়তো 'একটা নূতন কিছু করবার অভিপ্রায়ে পাশ্চাত্যপ্রভাব কাটিয়ে অজন্টা-ইলোরার ভাবগত চিত্রের কাঠামোর উপর নূতন রূপে ভারতীয় চিত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর্‌তে পেরেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ যাকে স্বীয় ক্ষমতা-বলে কাটিয়ে গেলেন, দর্শক বা জনসাধারণে তার হদিস পাবে কোথায়? সুতরাং তাদের মনে পাশ্চাত্য শিল্পের যে লীলাখেলা গভীর ভাবে অঙ্কিত হয়ে গেল, তাতে অবনীন্দ্রনাথের হঠাৎ এমনি 'উদ্ভট' পরিকল্পনাযুক্ত চিত্র-কলাকে মেনে লওয়া কঠিনসাধ্য হয়ে পড়ল। উদ্ভট এই জন্য যে, স্বভাবের (nature) মধ্যে থেকেও স্ব-চিন্তা-শক্তি দ্বারা তার বাইরে এমন একটা ব্যাপকতার সুর ভারতীয় চিত্ররাজ্যে তিনি ছড়িয়ে দিলেন, যার রসগ্রহণ সাধারণে সম্ভবে না। কোন চিত্র যদি শুধু বাহিক স্বভাবের (nature) মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে, তবে তার গণ্ডী সীমার মধ্যেই থেকে যায়—অন্তরের দিক্ থেকে কোন প্রকার তাগিদই সে স্থান থেকে আসে না—যদি না সে চিত্রের মধ্যে অসীমের ইঙ্গিত থাকে। এই অসীমই হচ্ছে ভাবলোক—অন্তরের অপ্রকাশিত ভাষা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সমস্ত বাক্য জগতের যে আদর্শের সন্ধান, সীমার মাঝে অসীম—ঠিক একই আদর্শে অনু[illegible] অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলা—রঙ-তুলি দিয়ে সীমাকে এঁকে নিয়ে তার ভেতর ব্যষ্টির প্রচার কর্‌বার চেষ্টা তিনি করেছেন।

অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলার ধারা স্ববৈশিষ্ট্য নিয়ে চল্‌ল। কতগুলো অঙ্কণ-কার্যের পদ্ধতিকে তিনি অনুসরণ কর্‌তেন, যেমন: প্রাচীন মিশরীয়, পার্শিয়ান্, মুঘল, রাজস্থানীয়, চায়নীজ ও জাপানীজ। এসব বাদে বৌদ্ধ-যুগীয় ও প্রাক্-ইউরোপীয় ঢঙের কিছুটাও ছিল।

অবনীন্দ্রনাথের প্রধান শিষ্য ও ছাত্র নন্দলাল আবার একটি বিশিষ্ট ধারার অভিনব চাতুর্য ও নিজস্বতা দেখালেন, সেটা হচ্ছে লাইন-ড্রইং। একদা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যাতে যে পটশিল্পের প্রবর্তন হয়েছিল, তার সার-বস্তু থেকেই তিনি এমন একটি সুন্দর জিনিষের জন্ম দিতে পেরেছিলেন। লাইন-ড্রইং ছাড়াও জল-রঙা চিত্রে সমপারদর্শী খুব অল্পই দেখা যায় বর্তমানে। ভারতীয় চিত্রের পরমায়ু প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের মত। জন্মদাতা অবনীন্দ্রনাথের পর হ'তে আজ অবধি শিষ্য-প্রশিষ্যের অভাব হয়তো আর নাই এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় চিত্রের প্রচার ও প্রসার যথেষ্ট পরিমাণেই হয়েছে—জনসাধারণও স্বেচ্ছায় বুঝবার চেষ্টা কর্‌ছে; তবু আবার একটি নূতন প্রশ্ন উঠেছে এই—অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখের নব সৃষ্টির পরবর্তী কালে তাদের শিষ্য-প্রশিষ্য অথবা এমন কোন নূতন শিল্পের জন্মগ্রহণ হল না, যার অসীম ক্ষমতা ভারতীয় শিল্পের কায়েমী এক ধারাকে বিনষ্ট ক'রে নূতন পথের সন্ধান দান ক'র্‌বে।

এই যে নূতন প্রশ্ন, তার উত্তর দেওয়া হয়তো খুবই কঠিন, তবু মনে হয়, এর সহজ উত্তর একদিন মিল্‌বেই এবং সে দিনেরও বোধ হয় বেশী দেরী নেই। কেন না, যুগসন্ধিক্ষণের বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক ভীড়ে সমস্ত পৃথিবীতে যে বিপ্লবের মহামারী লেগেছে, তার অবসানের সঙ্গে শান্তির কামনা করা যেমন অসম্ভব নয়, তেমনি এক-ঘেয়েমীর জীর্ণতাকে ভেঙ্গে-চুরে নূতন আদর্শ নিয়ে নূতন শিল্পীর আবির্ভাব ঘটা বর্তমানে খুবই স্বাভাবিক। তবু তার আবির্ভাবের দিকে চেয়ে দিন গুণ্‌লেই চলে না, তার জন্যে সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হয়। যার ভেতর যতটুকু নিজস্বতা আছে, একমাত্র অন্ধ অনুকরণ দ্বারা যার হাত দুষ্ট, আন্তঃপ্রাদেশিক, প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য চিত্রের ভাবানু-লিখনে যে সিদ্ধহস্ত—এমনি যাবতীয় নানা উপকরণীয় দ্বারা নূতনের প্রতীক্ষা ক'র্‌তে হয়, তবেই তাদের মাঝে আদর্শের আবির্ভাব ঘটে।

মেঘ ও সূর্য

শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মঞ্জুদি বল্লেন, "এখনি পালাবি নাকি রে গার্গী ?—ও-সব হ'বে টবে না—চল আমার ঘরে।" গার্গীর হাত ধ'রে মঞ্জুদি ওপরের তলায় উঠে এলেন। পিছনে মল্লিকা দেবী আর আভা। অনেকক্ষণ হল সভা ভেঙে গেছে—সংঘ-সভ্যারা সকলেই চ'লে গেছেন।

ওপরের ঘরে এসে গার্গী যেন একটু সুস্থবোধ করলে—বল্লে, "বাবা :—তোমার সভার মধ্যে থেকে এতক্ষণে একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম—আঃ, এখানে বেশ হাওয়া আছে মঞ্জুদি !"

"হ্যাঁ, অনেক দেখে শুনে শেষ পর্য্যন্ত এইখানেই ডেরা বাঁধলাম—ঘরটা নেহাৎ খারাপ নয়, কি বলিস্ ?" গার্গী হাসলে, বল্লে—"খারাপ তো নয়ই, বরং এত আলো আর এত হাওয়া, যেন চোখে লাগে।"

মল্লিকা ততক্ষণে মঞ্জুদির বড় আর সাদা ধব্‌ধবে বিছানাটার ওপরে টান হ'য়ে শুয়ে প'ড়েছে। বল্লে : "মঞ্জুদির সিলেক্‌শান্ তো ! নীচের হলটা দেখে কে বল্‌বে এর ওপরে দিদি আমার রাজরাণীর মত সুখে স্বচ্ছন্দে রাজত্ব ক'রছেন !"

আভা হেসে ফেল্‌ল, বল্লে, "তা' বটে, অনেক ভেবে চিন্তে আচ্ছা জায়গা বের ক'রেছ যা হোক ?—কেন পরাশর রোডের ও বাড়ীটা কি দোষ করলে হঠাৎ ?"

মঞ্জুদি হাসলেন, "সে আর বলিস্ না—একটা কাহিনী গ'ড়ে উঠেছিল আর কি—শেষ পর্য্যন্ত ভাঙ্‌তেই হ'ল আমাদের শিবির !"

আভা সোজা হ'য়ে বসল, বল্লে, "বল কি ?—আমাদের তো কিছুই জানাও নি ?"

মঞ্জুদি বল্লেন, "গার্গী তো জানে কিছু কিছু—বলিস্‌নি ওকে তুই ?" মঞ্জুদি গার্গীর দিকে চাইলেন।

"না—সময় আর পেলাম কোথায় ?" গার্গী বল্লে, "কলকাতায় এসেই বাবুরা চ'লে গেলেন ওয়ালটেয়ারে। এই তো দিন তিনেক হ'ল গিয়েছেন—সময়ই পাইনি মোটে।"

"ও"—মঞ্জুদি একটুখানি চুপ ক'রে রইলেন, তারপরে বল্লেন, "বস্ তোরা, আমি আস্‌ছি একটু নীচের থেকে" বলেই উঠে দাঁড়ালেন।

মল্লিকা আড়ামোড়া ভেঙে খাটের ওপরে উঠে বস্‌ল। আভা বলল : "ওঃ—ভাল কথা, আপনাকে কাঁধের ওপরে নিয়ে আমার নেচে বেড়াতে ইচ্ছে করছে দিদি।"

মল্লিকা হেসে ফেললে—বল্লে "উশ্‌—কেন এমন উৎকট সাধ ?"

"ওঃ—মারভেলাস্—মারভেলাস্ বলেছেন আপনি আজ—সত্যি আমাকে যদি একটু বক্তৃতা করাটা শিখিয়ে দিতেন—সত্যি—"

মঞ্জুদি বাইরে, চৌকাঠের ওদিকে পা ফেলেছিলেন, কথাটা শুনে ঘুরে দাঁড়ালেন, বল্লেন, "সত্যি ভারী চমৎকার আজ ব'লেছিস মল্লিকা, যাকে বলে আলাময়ী বাণী—সমস্ত প্রাণ দিয়ে, সমস্ত শক্তি দিয়ে তুই বলেছিস্, আজ আমাদের অধিবেশন সার্থক !"

মল্লিকা মাথা নীচু ক'রে রইল—মঞ্জুদি ধীরে ধীরে নীচে নেমে গেলেন, গার্গী বললে : "সত্যি দিদি, তোমার আজকের মত লেক্‌চার কোনদিনই শুনিনি।" মল্লিকা সামান্য একটু হাস্‌ল।

আভা বললে, "এইরকমই বলা দরকার। প্রত্যেকটী [illegible]র রক্তের সঙ্গে আমরা এই আবেদন মিশিয়ে দিতে চাই—মিশিয়ে দেওয়া উচিত। আমার মনে হয় আজকে দিদির লেক্‌চারটা যথেষ্ট কাজ করবে।"

গার্গী মাথা নাড়ল, বল্লে, "তাতে কোন সন্দেহই নেই। এখন যাতে আমাদের প্রচারটা আরও বেশী রকম অগ্রসর হয়, তার ভাল ব্যবস্থা করার দরকার।"

মল্লিকা আবার হাস্‌ল একটু, তারপরে বল্লে, "সেই প্রয়োজন তো আমরা সকলেই বোধ করছি এবং চেষ্টাও

হ'চ্ছে যথাসাধ্য—খালি তোমাদের কাছে নিবেদন যে, কেউ শিথিল হ'য়ে প'ড়োনা—তোমাদের উপরই সব কিছু নির্ভর করছে।"

গার্গী হাস্‌ল—বল্‌লে, "সে রকম সন্দেহ করার কোন কারণ তোমার চোখে ভেসেছে নাকি?"

"না—না, তা বল্‌ছি না আমি"—মল্লিকা নিজের কথাটাকে একটু ঘোরালে "মানে, আশঙ্কা করছি,—মানুষের মনকে আমার সব থেকে ভয় করে ভাই।"

গার্গী বল্‌লে, "তা ঠিকই—তবে আপাততঃ সে আশঙ্কাকে তুমি সত্যের মধ্যে চাবী দিয়ে রেখে দিতে পার—অবশ্য যদি বিশ্বাস কর আমাদের।"

"যাও—কি যে বল তোমরা?" মল্লিকার কথায় যেন একটু গাঢ় অভিযোগ ফুটে উঠল, আগের মত আবার একটু হেসে, কথাটাকে এবারে সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে ফেল্‌ল, আভার দিকে চেয়ে বললে, "তুমি কতদিন ফিরেছ কলকাতায়?"

"তা এক মাসের বেশীই হ'বে দিদি—কিন্তু সবই তো শুনেছেন—এসে পুরো ছুটো দিনও এখানে থাকতে পারলাম না" ব'লে আভা একটু হাস্‌লে, "ওঁর জ্বালায় আর পারলাম না—অনেকদিন থেকেই মাথায় ওয়ালটেয়ার বাসা বেঁধেছিল, এবারের ছুটীতে আর তর সইল না—কলকাতায় এসেই একেবারে দে ছুট—"

মল্লিকা হাস্‌ল, বললে, "তাই সে তোমার কথায় মোটেই বাধ্য নয়, কি বল?"

গার্গীও হেসে ফেল্‌লে, বল্‌লে, "না—তা ঠিক নয়—তবে শ্রীমতী আভারাণীরও যে মনে মনে ওয়ালটেয়ার ঘুরবার প্রথম ইচ্ছে ছিল—সেটা শুধু তোমার কাছে [illegible] ব'লে নিজে সাধুটী সেজে বসেছেন!"

সকলেই এক সঙ্গে হো-হো ক'রে হেসে উঠল। হাসি সাম্‌লে আভা বল্‌লে, "না দিদি, আমার খুব বেশী যাওয়ার ইচ্ছে মোটেই ছিল না—এসে আপনাদের কারও সঙ্গে দেখা করতে পারলুম না, কলকাতায় আমার তা ছাড়া অত কয়েকটা কাজও ছিল—কিন্তু কে শোনে! যে একরোখা লোক।"

"বাবাঃ—খুব ঝগড়া ক'রে বুঝি?" মল্লিকা বল্‌লে।

"না—না" আভা হেসে ফেল্‌লে, "একরোখা মানে ঝগড়াটে নয়—মানে যা করবে তা করবেই, সে যে যা-ই বলুক।"

"তোমার সঙ্গে আলাপ নেই; না দিদি?" গার্গী হঠাৎ প্রশ্ন করলে।

"না—আলাপ আর হ'ল কোথায়—বিয়ের পরেই তো ওরা দুজনে চ'লে গেল দিল্লী—সেই বছরেই আমি প্রথম তোমাদের এখানে এসেছি—সবই নতুন, দুদিন থাকলেও আলাপ-টালাপ হ'ত—আর তো এই বছর-খানেক পরে আবার দেখা!"

মঞ্জুদি এসে ঘরে ঢুকলেন, বল্‌লেন, "যে দিকে একটু না দেখ্‌ব, সে দিকেই একটা কাণ্ড ঘটে ব'সে থাক্‌বে—ওপরে আসার সময় রামভজনকে ব'লে এলাম, যে একটু লক্ষ্য রাখিস্‌ বাবা, আমার বড়িগুলোর দিকে—কে যেন কাকে ব'লছে—বাবাজীবন এমনই তুলসীদাসের মধ্যে ডুব দিয়েছেন যে, ওদের বাড়ীর গরুটা স্বচ্ছন্দেই আমার অমন সুন্দর বড়িগুলোর ওপর দয়া ক'রে গেছে।"

সকলেই হো-হো ক'রে আর একবার হেসে উঠ্‌ল। গার্গী বল্‌লে, "বড়িও তুমি দিচ্ছো নাকি আজকাল?"

"তা-দেবনা—একা মানুষ, নিজের সব কিছু ক'রে নেবার জন্যে কোন চাকর-ঠাকুর তো আর রাখ্‌তে পারিনি ভাই!" মঞ্জুদি এসে খাটের ওপরে বসলেন, "তোমাদের নিজেদের দৃষ্টি দিয়ে আমাকে দেখো না—আমি তোমাদের থেকে এখনে অনেক নীচুতে প'ড়ে আছি—দেখি একদিন আস্তে আস্তে যদি তোমাদের কাছে উঠ্‌তে পারি।"

এটা ঝড়ের পূর্ব লক্ষণ। গার্গী সহজেই তা ধরতে পারল—মুহূর্তে সে সঙ্কুচিত হ'য়ে গেল, বল্‌লে "ক্ষমা কর মঞ্জুদি—আমি তোমাকে ঠিক বুঝ্‌তে পারছি না, কিছু যদি অন্যায় ক'রে থাকি, আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দাও।"

মঞ্জুদি হাসলেন,—বল্‌লেন, "তুমি নিজের মধ্যেই এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবে গার্গী—একটু ভেবে দেখো—"। গার্গী হতবাক্‌ হ'য়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল—তারপরে বল্‌লে, "আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না,—আমাকে তুমি ক্ষমা কর মঞ্জুদি—"

মঞ্জুদি আবার হাসলেন, বললেন, "ক্ষমা আমি তোকে কোনদিন করিনি বল? কিন্তু আমার ক্ষমার ঝুলি কি অফুরন্ত রে?—চিরকালই আমি তার থেকে ক্ষমা বিতরণ ক'রে যাব?—আজ এই দীর্ঘ দুটো মাসের মধ্যে তুই কেন আমার ঘরে ঢুকিসনি, তার কোন ভাল উত্তর দিতে পারবি এখন?"

গার্গী মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। উত্তর দিল না।

মঞ্জুদি বললেন, "আমি আর এই মল্লিকা—দু'জনে সমস্ত কাজই প্রাণপণে করে' চলেছি—ও না থাকলে অনেকদিন আগেই আমার এই 'কুমারীকল্যাণ' থেকে অবসর নিতে হত—তোর এই আকস্মিক অনুপস্থিতির মূলে কোন দৃঢ় যুক্তি দেখাতে পারবি আমাকে?"

গার্গী চুপ ক'রে রইল। চারদিক নিস্তব্ধ! ঘরের ঘড়িটা শব্দ ক'রে চলেছে। মনে হয় সময়-সমুদ্রে ওর দাঁড় পড়ছে যেন সমান তালে।

"আমি জানি—" মঞ্জুদি আবার বলতে আরম্ভ করলেন, "বিদ্যুৎ তোর সর্বনাশ ক'রে গেছে—তোকে ভেঙে চুরে একটা মৃত মৃৎপিণ্ডের মত ফেলে গেছে, তোর সমস্ত সত্তা আজ লুপ্ত—জানলার ধারে ব'সে সমস্ত রাত তারা দেখার অর্থ আমি বুঝি গার্গী!"

একটা অসহ্য বেদনায় গার্গীর সমস্ত মুখ পাণ্ডুর হ'য়ে এল, চোখ দুটো যেন অসহ্য রকম জ্বালা করছে, গার্গী আর পারলো না, মঞ্জুদির পায়ের কাছে ভেঙে পড়ল, অস্ফুট কণ্ঠে কি যে বললে বোঝা গেল না, শুধু থেকে থেকে তার সমস্ত শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। সমস্ত ঘরটা সমাধিভূমির মত নিস্তব্ধ!

অনেকটা দীর্ঘ সময় কাটল।

অনেকক্ষণ পরে মঞ্জুদি কথা কইলেন, বললেন, "ওঠ—কাঁদিস না—শুধু কাঁদতেই শিখেছি ব'লে আজ আমাদের এই অমানুষিক অধঃপতন,—মনটাকে পাথরের মত কঠিন করবার মন্ত্রও শিখে রাখতে হয়—আমাদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় ওটা অবশ্যপ্রয়োজনীয়, ভালবাসতে হ'লে ভালভাবে পথ হাঁটার কৌশলটাও করায়ত্ত করা দরকার—নইলে জেনে রাখিস অবশ্যম্ভাবী পদস্খলন থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না"—একটু থেমে বললেন, "আমাদের জীবনে সব থেকে বড় ট্র্যাজিডি আমরা বিচার করতে জানি না—আমরা বুদ্ধি দিয়ে তাকে বাজিয়ে নিতে পারি না—পাত্র আর অপাত্র আমাদের চোখে এক হ'য়ে যায়।"

এতক্ষণে গার্গী মাথা তুলল, বললে, "আমার দৃষ্টি যে অ-পাত্রকেই কেন্দ্র ক'রে ঘন হ'য়ে উঠেছে, সে কথা আজও আমি ভাবতে পারি না—বরং মনে হয় আমার মধ্যেই কোথায় যেন কোন ত্রুটি গভীর হ'য়ে উঠেছিল, ধীরে ধীরে আমারই অজ্ঞাতসারে, আজ তার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হ'য়েছে!"

"ওটাই ভুল—" মঞ্জুদি বললেন, "আত্মবিশ্বাসের ওপরে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রেছিস ব'লেই আজ একথা ভাবতে পারলি, যেটুকু মোহ তোর এখনও আছে—সেইটুকু যেদিন দূর হ'বে, সেদিন বুঝবি মঞ্জুদি ভুল বলেনি—মঞ্জুদি ভুল বলে না।"

গার্গী চুপ ক'রে রইল। জানলার ওপারে শরতের এক টুকরো নীল আকাশ—খণ্ড-খণ্ড, ছোট-ছোট সাদা মেঘ ভেসে চ'লেছে, সমস্ত আকাশে এক দিক হ'তে অন্য দিগন্তরে সেই আলোর পরম প্রকাশ।

আবার মঞ্জুদি বলতে আরম্ভ করলেন, "আমার জীবনে অনেকগুলো মরুভূমি পার হ'তে হ'য়েছে, অনেকগুলো বড় বড় মাথার ওপর দিয়ে চ'লে গেছে—তাদেরই স্নেহ-করস্পর্শের বোধ হয় দু' একটা পাকা চুল আমার মাথা থেকে তোমরা সময়ে সময়ে আবিষ্কার কর। আজ একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে, অনেক ঘাটের জল খেয়ে তোমাদের থেকে কিছুটা অগ্রসর হ'য়েছি, সেই অগ্রসর হওয়ার দাবী থেকে, সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি—সাবধান হও—ওদের প্রতি ঘৃণা না থাকুক, শ্রদ্ধাও যেন এক কণা তোমাদের মধ্যে অবশিষ্ট না থাকে, যারা আমার মন্ত্রশিষ্যা, যারা আমাকে ভালবাসে, ভগিনীর সম্মান দেয়, তাদের প্রতিই আমার এই আন্তরিক অনুরোধ, —অবশ্য" মঞ্জুদি আভার দিকে চেয়ে একবার হাসলেন, "যারা নিতান্তই সংসারী হ'য়েছে, তাদের আমি কিছু বলছি না—"

আভা মুখ নীচু ক'রে একবার হাসলো শুধু।

একটু থেমে মজুদি বল্লেন, "আজ পরাশর রোড ছেড়ে দিয়ে কেন এখানে উঠে এলাম, এই কথা তোকে একটু আগে বল্‌ব বলেছিলাম" বলে' আভার দিকে মজুদি চাইলেন, "বুঝ্‌তে পারবি এর থেকে পুরুষের বিরুদ্ধে আমার এ নিদারুণ বিতৃষ্ণার উৎসসৃষ্টি কেন হল?—এর যুক্তিপূর্ণ কারণ নিজেরাই অনুধাবন করতে পারবি সহজে!"

"এ বছরের চারটে অধিবেশন ওই বাড়ীতেই হয়েছিল" মজুদি বল্‌তে আরম্ভ করলেন, "আমাদের বাড়ীর ঠিক অপোজিটে একটা হল্‌দে রঙের তেতালা বাড়ী আছে লক্ষ্য ক'রেছিস্ বোধ হয়! প্রথম প্রথম আমরা বিশেষ কিছু বুঝ্‌তে পারিনি—মাঝে মাঝে খুব চীৎকার আর গোলমাল ভেসে আস্‌ত বাড়ীটা থেকে, এমন কি একদিন রাত্ত বারটা হ'বে তখন—অসম্ভব চীৎকারে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল।

"পরের দিন খোঁজ নিয়ে জান্‌লাম—কতগুলি কলেজ ষ্টুডেণ্ট এবং কেরাণী মিলে ওখানে একটা প্রাইভেট্ মেস্ ক'রেছে। আমাদের ও বাড়ীতে যাওয়ার যে একটী মাত্র পথ, তা ওদেরি জান্‌লার নীচ দিয়ে। ফলে সব সময়েই যাতায়াত ওদেরি মেসের নীচ দিয়ে করতে হত।

"আমরা ওখানে মোট দু' মাস ছিলাম—ক্রমশঃ বুঝ্‌তে পারলাম যে, আমাদের স্থাননির্বাচনে ভুল হ'য়েছে। লক্ষ্য করলাম প্রত্যেক অধিবেশনের দিনে ওদের জান্‌লায় অনেকগুলি ছেলে ভীড় ক'রে দাঁড়িয়ে থাকত—আর নীচে ওই অপ্রশস্ত গলিটার মধ্যে সেই দিনই তাদেরও যাতায়াতের যেন একটা বিশেষ প্রয়োজন হত। সামান্য একটু অঙ্গস্পর্শ—একটু আঁচলের ছোঁয়া অথবা গায়ে গা লাগানোর জন্যে তাদের সে কি নীচতম, হীনতম প্রয়াস!

"তাও সহ্য করলাম—ভাবলাম এই সমস্ত হাঙ্গাম ক'রে আবার বাসা বদল করা বড় ক্লান্তিকর, এই সামান্য দৃষ্টির এবং গায়ে আঁচল লাগানোর লোলুপতাকে বিশেষ গ্রাহ্য করলাম না—কিন্তু শ্যেনদৃষ্টিতে প্রত্যেকটী ঘটনাই লক্ষ্য ক'রে চল্লাম।

"একদিন আমার কাছে একটী মেয়ে এসে ওদের বিরুদ্ধে গুরু অভিযোগ করলে। মেয়েটী আমাদের সঙ্ঘ-সভ্যা। সেদিন আমাদের সঙ্ঘের পঞ্চদশ অধিবেশন। সভা আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছিল, মেয়েটীর আস্‌তে একটু দেরী হ'য়ে গিয়েছিল,—সন্ধ্যার পরে এদিকের এই রাস্তাটা একটু নির্জন হ'য়ে পড়ে।

"ট্রাম থেকে নেমে সে একটু তাড়াতাড়িই পথটা পার হ'য়ে আসছিল—চারদিকে অন্ধকার তখন বেশ ঘন হ'য়ে নেমেছে, দূরে দূরে কয়েকটা গ্যাসপোষ্ট—তখন সেগুলো জ্বালা হয়নি। এমন সময়ে জন চারেক ছেলে মেয়েটীকে এক রকম পথরোধ ক'রে দাঁড়াল।

"তার মধ্যে একজন মেয়েটীর সাম্‌নের দিকে এগিয়ে এসে একটা কথা বল্‌ল—যা তোমাদেরও সামনে আমার উচ্চারণ করতে বাধছে—তার পরে সেই বীরপুরুষটা যে ইঙ্গিত করেছিল তা-ও এখানে অনুক্ত থাকুক—তা কোন সভ্য মানুষেই সহ্য করতে পারে না। তবে সেটা মুহূর্তের জন্যে—মেয়েটী পরে চীৎকার ক'রে উঠেছিল, এবং সেই চারজনেই মুহূর্তে কোথায় যে অন্তর্হিত হল, তার ঠিকানা আজও পাওয়া যায় নি—অন্ততঃ সে মেস যে ত্যাগ করেছিল, একথা প্রমাণ হ'য়েছিলো পরে।

"সব শুনে আমি মেসের ম্যানেজারকে সমস্ত কিছু পরিষ্কার ভাবে বিবৃত ক'রে খুলে লিখ্‌লাম—অল্প অল্প আলাপ ছিল তাঁর সঙ্গে। জানালাম, এভাবে কোন সভ্য সমাজেই বাস করা সম্ভব নয়—আপনারা যদি ব্যবস্থা না করেন, তাহ'লে আমরা অন্য ব্যবস্থা করতে বাধ্য হ'ব।

"এর প্রত্যুত্তরে কি পেয়েছিলাম শোন। সেই মেসের ম্যানেজার ভদ্রলোক পরের দিনই এক অনতিদীর্ঘ পত্র পাঠালেন আমাকে; এই ঘটনার জন্যে তিনি যে মর্মান্তিক আহত হ'য়েছেন, তা বিশেষ ভাবে লিপিবদ্ধ ক'রে পরে লিখেছেন যে, এই সব দুর্বিনীত ছেলেদের শাসন করা তাঁর আয়ত্তের বাইরে। তিনি সামান্য হোটেলওয়ালা; যারা খরচ দিয়ে এখানে থাকে, তাদেরই তিনি সাদরে অভ্যর্থনা করেন। তাদের নৈতিক চরিত্রের অবনতি অথবা উন্নতির জন্যে তিনি দায়ী নন—তবে তিনি সেই সব দুর্বিনীতদের নাম জানতে পারলে মেস থেকে চ'লে যেতে বল্‌তে পারেন, এই পর্য্যন্ত!

"বুঝলাম, আমার অভিযোগের উপযুক্ত বিচার এদের কাছ থেকে আশা করাই অন্যায় হ'য়েছে, ঠিক করলাম

এই মাসেই স্থান পরিবর্তন করা অত্যাবশ্যক, বিলম্বে হয়তো নতুনতর কোন বিপদ ঘটবে। অনেক ধনী ঘরের মেয়ে আমার এই সঙ্ঘের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন, অপবাদ আমার নামেই রটবে—আমার দায়িত্ব গুরু। একটু চিন্তায় পড়লাম।

"আমাদের সেই অধিবেশনের কয়েকটা দিন পরের কথা।"—মঞ্জুদি একটু থেমে বল্‌তে আরম্ভ করলেন। "অন্য একটা সভায় গিয়েছিলাম—ফিরতে একটু রাত হল। ট্রাম থেকে নেমে সেই রাস্তাটার মধ্যে দিয়ে চ'লেছি। সেদিন বোধ হয় পূর্ণিমা ছিল—গলিটার অন্ধকার অনেকটা ফিকে। চারদিক নিস্তব্ধ। রাত প্রায় ১১টা বেজে গেছে। হঠাৎ মেসের দরজার কাছাকাছি এসে আমি পেছন থেকে একটা আকর্ষণ অনুভব করলাম—মনে হ'ল আমার আঁচল ধ'রে কে টান্‌ছে—মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়ালাম—একটু শুধু সময় পেলাম—দেখ্‌লাম একটা লোক আমাকে সবলে তার বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধ'রেছে, তারপর তার লোলুপ চোখ দুটো আর মুখটা আমার মুখের দিকে অদম্য লালসায় নেমে আস্‌ছে—দেখ্‌লাম লোকটা সেই মেসের ম্যানেজার!—মুহূর্তের মধ্যে যে কি হ'য়ে গেল—ভীষণ চীৎকার ক'রে উঠ্‌লাম, লোকটা ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি আমাকে ছেড়ে দিলে, তারপরে এদিক্ ওদিক্ থেকে অনেক লোক বেরিয়ে এল, ম্যানেজার পালাতে পারল না, শেষ পর্য্যন্ত ধরা প'ড়ে সেদিন যা মার খেল তা মর্মান্তিক—শুনলাম পরের দিন তার সমস্ত শরীর ফুলে গিয়েছিল।" মঞ্জুদি একটু থেমে বল্‌লেন, "পরে অবশ্য সে মেসটা উঠে গিয়েছিল ওখান থেকে।"

মঞ্জুদি চুপ করলেন। ঘরের ঘড়িটা সেই ভাবেই টিক্-টিক্ ক'রে চ'লেছে। মল্লিকা মাথা নীচু ক'রে রইল—গার্গী, আভা দু'জনেই স্থাণুর মত নিশ্চল। অনেকটা সময় এইভাবে কাট্‌ল।

অনেকক্ষণ পরে মঞ্জুদি বল্‌লেন, "এই আমাদের সভ্য সমাজ গার্গী—ওপরে পাঞ্জাবী আর কাপড়ে নিজের দেহটাকে আবৃত ক'রে ওরা রাস্তা দিয়ে হাঁটে, এদের স্বরূপ ওদের ওই জামার তলা থেকে আমাদের চোখে পড়ে না—ওদের এই সর্ব্বগ্রাসী ভীষণ লোলুপতাকে আমরা আবরণ দিই—বলি প্রেম, বলি স্বাভাবিক মনোবৃত্তি! বলি এটা পশ্চাচার নয়—বয়স-কালের ধর্ম! এ কথা জেনে রেখো—ওদের মধ্যে কারুর সঙ্গে কারুরই কোন প্রভেদ নেই। বড় বিশ্ববিখ্যাত সার্থকনামা পণ্ডিত থেকে আমাদের সেই হোটেলের ম্যানেজার, প্রায়-সকলেই জানালার ফাঁক থেকে আমাদের দিকে তাকায় ঐ একই পাশবিক লোলুপতার দৃষ্টি মেলে, ঐ একই কামনায়—একেই ভ্রমে তোমরা বলছ সভ্যতা-কৃষ্টি-সংস্কৃতি! ওদের স্বরূপ তোমাদের চোখের সাম্‌নে আরও নির্মম ভাবে উদ্ঘাটিত হোক—যদি ঈশ্বর থাকেন, তাহ'লে তাঁর কাছে আমার এই প্রার্থনা রইল।"

উত্তেজনায় মঞ্জুদির সমস্ত মুখ চোখ লাল হ'য়ে উঠল। তিনি চুপ করলেন।

(ক্রমশঃ)

বেদনার পূর্ণতা

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ রায়

ব্যথা কহে, "আমি থাকি তব প্রতীক্ষায়
হে চির পথিক!
যৌবন তবু কি হ'বে মোর ব্যর্থতায়
মৃত্যুর অধিক?
প্রাণের সান্ত্বনা নাই, আসক্তি-শিখায়
নাহিকো প্রত্যয়;
দুর্ব্বোধ সত্যেরে নিয়ে জরার পর্য্যায়
তবু সব ক্ষয়?

হায় মোর জীবনের অভিযানে তাই
নাহি জয়-স্পৃহা—
অশ্রুর ঐশ্বর্য্য শুধু চলিছে সদাই
পথ বিসর্পিয়া।
মুক্তি নাই? না থাকুক্!—তবু আছে মোহ
জীবন-বিনাশে
আমারই পূর্ণতা তাই শান্তি-সমারোহ
আবেশ, উচ্ছ্বাসে।—"

মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া যুদ্ধের আলোচনা

ডাঃ সরসীলাল সরকার

প্রাণীর উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধেরও উৎপত্তি হইয়াছে। নিম্ন প্রাণীদের জীবন ও যুদ্ধ একত্র জড়িত। কেন না 'আহারসংগ্রহ ও আত্মরক্ষা' এই উভয় কারণে তাহাদের সর্ব্বদাই যুদ্ধের প্রয়োজন হয়।

প্রাণী হইতে ক্রমশঃ মানুষের বিকাশ হইল এবং মনুষ্য-সমাজ গড়িয়া উঠিল।

অনেক বৈজ্ঞানিকের মতে মানবসমাজগঠনের মূলে আছে মানুষের পরস্পরের সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু ডাঃ ফ্রয়েড মানবসভ্যতা কি ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, সে সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

"We may add to this that the process proves to be in the service of Eros, which aims at binding together single human individuals, then families, then tribes, races, nations, into one great unity, that of humanity. Why this has to be done we do not know; it is simply the work of Eros. These masses of men must be bound to one another libidenally; necessity alone, the advantages of common work, would not hold them together."

—*"Civilization and its discontents"*

ইহার ভাবার্থ এই যে "কেবল প্রয়োজন বা সাধারণ কার্য্যের সুবিধা মনুষ্যকে কখনই সংঘবদ্ধ করিতে পারিত না। মানবকৃষ্টি প্রমাণিত করে যে, কামজ আকর্ষণের প্রভাবেই একক ব্যক্তি অপরের সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহা হইতে ক্রমশঃ পরিবার, সমাজ, শ্রেণী, জাতি ও অবশেষে একটি বৃহৎ একত্বের বন্ধনে সমস্ত মানুষ এক হইয়াছে, তাহা মনুষ্যত্বের বন্ধন। এরূপ কেন করিতে হইয়াছে, তাহা আমরা জানি না, তবে সোজাসুজি বলা যায়, এই যে সমাজগঠন ইহা কামজ আকর্ষণেরই কাজ। মানুষ আসঙ্গ-লিপ্সায় নিশ্চয়ই একে অন্যের সহিত মিলিত হইবে।"

ফ্রয়েড বলিয়াছেন—Eros বা আসঙ্গ-লিপ্সা যেমন সহজাত সংস্কার-রূপে প্রাণীর ভিতর আছে, সেইরূপ ঠিক ইহার একটি বিরুদ্ধ ভাবের সহজাত সংস্কার জীবদেহ-ধারীদিগের ভিতর থাকে। ইহাকে ফ্রয়েড "Death Instinct" আখ্যা দিয়াছেন।

ফ্রয়েড বলিয়াছেন, এই যে সঙ্গের আকর্ষণ-রূপ সহজাত সংস্কার Eros, যাহা জীবদেহের রক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকে এবং তাহাদের বৃহত্তর ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করে, ইহা যেমন আছে, সেইরূপ ইহার বিপরীত একটি সহজাত সংস্কার নিশ্চয়ই আছে, যাহা এইগুলি ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে কার্য্য করে এবং যে জড় উপাদান হইতে ইহারা সৃষ্ট হইয়াছিল, সেই জড় পদার্থেই (পঞ্চভূতে) পুনরায় ইহাদের পরিণত করিবার উদ্দেশ্যেই কার্য্য করে। অর্থাৎ যেমন সৃষ্টিকারী কামজ আকর্ষণ Eros রহিয়াছে—সেইরূপ ধ্বংসকারী মৃত্যুর সহজাত সংস্কার (Death Instinct)-ও রহিয়াছে। পরে ফ্রয়েড বলিয়াছেন যে, জীবন সৃষ্টি ও ধ্বংসেরই লীলা।

ধ্বংসকারী সহজাত সংস্কারের পরের ধ্বংস এবং নিজের ধ্বংস উভয় দিকেই ক্রিয়া আছে। মরিতে ও মারিতে কোনটিতে যোদ্ধা পশ্চাৎপদ নয়। নিম্ন প্রাণিজগতে প্রাণীদিগকে পদে পদে মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে হয়। যখন বিপদ আসে, স্বভাবানুসারে কতকগুলি প্রাণী শত্রুর সম্মুখে সাহসের সহিত অগ্রসর হয় ও তাহাকে আক্রমণ করে; আর অন্য কতকগুলি প্রাণী ভয়ে পলায়ন করে বা লুক্কায়িত হইয়া আত্মরক্ষা করিতে চাহে। আক্রমণকারী পশুদের কার্য্যে কোন বিশেষ জটিলতা নাই; কিন্তু যাহারা পলাইয়া বাঁচিতে চাহে, তাহাদের নানা কৌশল আছে। হরিণজাতীয় দ্রুতগামী প্রাণীর দ্রুত গমনের উপরই নির্ভরতা; বিপদ উপস্থিত হইলে, তাহারা প্রাণপণ শক্তিতে দৌড় দিয়া আত্মরক্ষা করে। বেজি জাতীয় কোন প্রাণী নরম মাটি পাইলে, গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহার ভিতর আত্মগোপন করে। অনেক প্রাণী মৃত্যুর ভাণ করিয়া রক্ষা পাইবার চেষ্টা করে। বহুরূপী রং বদলায়। কাটল্ ফিশ্ (cuttle fish) নামক মৎস্য শরীর হইতে একরূপ কালী বাহির করিয়া জল এমন ঘোলা করে যে, আততায়ী আর তাহাকে দেখিতে পায় না। ছুঁচা জাতীয় কতকগুলি প্রাণী গাত্র হইতে এমন দুর্গন্ধ পদার্থ নিষ্কাশণ করে যে, সহজে কেহ তাহার কাছে যায় না। ডেভিলস্ হর্স (Devil's Horse) প্রভৃতি কতকগুলি নিরীহ পতঙ্গ চেহারা এমন করে যে,

বিষাক্ত পতঙ্গ মনে করিয়া শত্রু আর তাহাদের কাছে ঘেঁসে না।

নিম্ন প্রাণীদের এই দুই শ্রেণী হইতে আমরা দেখিতে পাই—যোদ্ধা প্রাণী যত ক্ষুদ্রই হউক না কেন, তাদের ভিতর একটি শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। পিপীলিকা ও মৌমাছির ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাণীও আততায়ী যতই শক্তিশালী হউক, তাহাকে দংশন করিয়া বিব্রত করিয়া তুলে।

মানুষের ভিতরও নিম্ন প্রাণীদিগের ন্যায় দুই শ্রেণীর মনুষ্য দেখা যায়। যাহারা ভীরু শ্রেণীর মনুষ্য, তাহাদের ভিতরও নানারূপ ফন্দী-ফিকির তাহাদের জ্ঞানতঃ অথবা অজ্ঞানতঃ প্রকাশ পায়। ভীরুশ্রেণীর বহু ব্যক্তি ধার্ম্মিকতার ভাণ করে। এই ভাণ কেবল পরের নিকট নয়, তাহার নিজের সঙ্গেও সে ছলনা করিয়া বিশ্বাস করে যে, যথার্থই সে ধার্ম্মিক—সে যে পথে চলিতেছে, সেইটিই প্রকৃত ধর্ম্মের পথ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথমেই আমরা যুদ্ধ-পরাঙ্মুখ অর্জ্জুন এবং যুদ্ধে প্রবৃত্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার পাই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সর্ব্ব উপনিষদ্-গ্রন্থের সারস্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়াও গীতা একখানি অতুলনীয় গ্রন্থ। প্রকৃত ধর্ম্ম-তত্ত্ব মনস্তত্ত্ব না হইয়া পারে না।

যুদ্ধে পরাঙ্মুখ অর্জ্জুন যুদ্ধ করা যে কত বড় অধর্ম্মের কাজ হইবে, তাহা নানাভাবে ব্যাখ্যা করিতেছেন এবং পরিশেষে বলিতেছেন, যদি যুদ্ধ না করিয়া আমাকে ভিক্ষান্ন ভোজন করিতে হয় কিম্বা আমাকে নিরস্ত্র দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্র পুত্রেরা বধ করে, সেও ভাল, তবুও আমি আত্মীয় ও গুরুজনকে বধ করিয়া যুদ্ধে জয়ী হইতে চাহি না। ইহা অতি বড় স্বার্থত্যাগ ও মহাধার্ম্মিকতার কথা বটে। কিন্তু দেখা যাইতেছে—অর্জ্জুনের তখন যুদ্ধ করিবার ক্ষমতাই নাই। তাঁহার তখন এমন অবস্থা হইয়াছে যে, গাণ্ডীব হাত হইতে খসিয়া পড়িতেছে, যুদ্ধ করিতে চাহিলেও সামর্থ্য তাঁহার নাই।

শ্রীভগবান এই অবস্থাকে "ধার্ম্মিকতা" বা "আত্মত্যাগ" বলিয়া মানিয়া লন নাই, তিনি ইহাকে বলিয়াছেন, "ক্লৈব্য" এবং "ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য"। আরও বলিয়াছেন "নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে"—ইহা তোমার উপযুক্ত নয়। "ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ"—হে পরন্তপ, এই ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থে উত্থিত হও।"

গীতার অর্জ্জুনকে সমগ্র মানবজাতির প্রতিনিধি বলা হইয়াছে, অর্থাৎ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া গীতার বাণী সমগ্র মানবজাতিকে উপদেশস্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে, এইরূপ বলা হয়। সেই উপদেশের প্রথম কথা—প্রকৃত ধর্ম্ম যাহা, তাহা "ক্লৈব্য" অর্থাৎ সাহসহীনতা নয়। আমরা দেখিতে পাই, ভীরু শ্রেণীর অধিকাংশ লোকই ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু সেই ধর্ম্মের ভিতর লোকাচার ও বাহিরের অনুষ্ঠানই থাকে পনের আনা; প্রকৃত যাহা আধ্যাত্মিকতা, তাহা এই অনুষ্ঠান, সংস্কার ও লোকাচারের ভিতর তলাইয়া কোথায় যে ডুবিয়া যায়, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না।

মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া দেখিলে—ভীরু নিম্ন প্রাণীর সহিত ভীরু মানুষের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। "যঃ পলায়তে স জীবতি"—এই উক্তি হরিণজাতীয় মানুষের পক্ষে খাটে। আবার নিম্ন প্রাণীর গর্ত্তে আশ্রয়ের ন্যায় অনেকে নিজের অকার্য্যসমর্থনের জন্য শাস্ত্রবচন, লোকাচার প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। অনেকে কাটল্ মৎস্যের (cuttle-fish) মত বড় বড় শাস্ত্রের ব্যাখ্যা দ্বারা জল ঘোলা করিয়া অন্যের চক্ষে ধাঁধা লাগাইয়া নিজের অজ্ঞতা গোপন করেন, এই ভাবে তাঁহাদের কোনরূপে জীবিকার সংস্থান হইয়া যায়। অনেক ধর্ম্মের মুখোসধারী "ডেভিল-হর্সের" (Devil's Horse) মত চেহারাটা এমন করিয়া তুলেন যে, সাধারণে সভয়ে সসম্ভ্রমে দূরে থাকিয়া তাঁহাকে প্রণাম করে। আবার যেমন অনেক ভীরু প্রাণী বিপদে পড়িয়া মৃত্যুর ভাণ করে, সেইরূপ বহু দুর্ব্বলপ্রকৃতি নরনারী হিষ্টিরিয়া (Hysteria)-গ্রস্ত হয়।

"Instinct of Aggressiveness" নামে আর একটি সহজাত সংস্কারের কথা ফ্রয়েড উল্লেখ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—

"This instinct of aggression is the derivative and main representative of the death instinct we have

found along side of Eros, sharing his rule over the earth. And now, it seems to me, the meaning of the evolution of culture is no longer a riddle to us. It must present to us the struggle between Eros and Death, between the instincts of life and the instincts of destruction, as it works itself out in the human species."

—"*Civilization and its discontents.*"

ভাবার্থ এই যে, "Instinct of Aggressiveness" অর্থাৎ আক্রমণের সহজাত প্রবৃত্তি "Death Instinct" হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। "Eros" এবং "Death Instinct" এই দুইটি সহজাত সংস্কার পৃথিবীতে রাজত্ব করিতেছে। "Eros"টি সঙ্গের আকর্ষণের সংস্কার; "Instinct of Aggressiveness"টি আক্রমণে প্রবৃত্তিরূপ সংস্কার। "Eros"-কে রিরংসা ও Death instinct"-কে জিগীষা বলা যাইতে পারে। ক্রমবিকাশে কৃষ্টি যে কোন পথে বিকশিত হইতেছে, তাহা আর আমাদের নিকট সমস্যা নহে। জীবন ও মৃত্যুর দ্বন্দ্ব অর্থাৎ জীবন সৃষ্টি ও রক্ষার সহজাত সংস্কার ও ধ্বংসানয়নকারী সহজাত সংস্কার, ইহাদের দ্বন্দ্বে যে ক্রিয়া হইতেছে, তাহার দ্বারাই মনুষ্যজাতির ক্রমবিকাশ হইতেছে।

কিন্তু এই আক্রমণের প্রবৃত্তি যদি সব সময়ে মানুষের মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকে, তবে কেমন করিয়া সমাজ ও মানবসভ্যতা গড়িয়া উঠিবে? এই প্রশ্নের উত্তরে ফ্রয়েড বলিয়াছেন—

"Another question concerns us more closely now. What means does civilization make use to hold in check the aggressiveness that opposes it, to make it harmless, perhaps to get rid of it?......

What happens in the individual to render his craving inocuous? Something very curious, that we should never have guessed and that yet simple enough. The aggressiveness is introspected "internalized" in fact, it is sent back where it came from, that is directed against the ego. It is there taken over by a part of the ego that distinguishes itself from the rest as super-ego and now in the form of 'consceince' exercises the same propensity to harsh aggressiveness against the ego that the ego would have liked to enjoy against others."

ইহার ভাবার্থ এই যে, মানুষের সহজাত আক্রমণ-প্রবৃত্তি নিশ্চয়ই মানবকৃষ্টির পক্ষে ক্ষতিকর হইত, যদি ইহা এক আশ্চর্য্য উপায়ে সংযত না হইত। এই আক্রমণের প্রবৃত্তি মোড় ফিরিয়া বহির্ম্মুখী গতি হইতে অন্তর্ম্মুখী হয়; সে যেখান হইতে আসিয়াছিল, সেইখানেই তাহাকে ফিরিয়া পাঠান হয়; অর্থাৎ তাহাকে অহং-এর বিরুদ্ধেই পাঠান হয়। সেখানে অহং-এর যে একটি অংশ তাহাকে গ্রহণ করে, সেটি অহং-এর অন্য অংশ অপেক্ষা ভিন্ন ভাবের। অহং-এর এই অংশের নাম Super-Ego বা শ্রেষ্ঠ অহং। এই শ্রেষ্ঠ অহং মানুষের বিবেকবুদ্ধির কাজ করে। অহং পূর্ব্বে তাহার যে আক্রমণ-প্রবৃত্তি দ্বারা অন্যকে শাসন করিয়া আনন্দ লাভ করিত, এখন সেই আক্রমণ-প্রবৃত্তি বিবেকবুদ্ধির অনুগত হইয়া অহং-এর দোষগুণবিচার ও তাহাকে শাসন করে।

মানুষের মনে কি ভাবে বিবেকবুদ্ধির বিকাশ হইয়া আত্মশাসনের ভাব জাগ্রত হয়, ফ্রয়েড এই ভাবে তাহা বুঝাইয়াছেন। এই ব্যাখ্যার ভিতর হইতে আমরা যে সিদ্ধান্তটি পাই, তাহা এই যে:—"মানুষের মনে নানা প্রকার প্রবল সহজাত সংস্কার আছে, এই সহজাত সংস্কারগুলির শক্তি হইতেই আমাদের মানসিক ক্রিয়ার বিকাশ হইতেছে। মানবমনোগঠনের এইগুলিই প্রাথমিক উপাদান। কিন্তু অনেক সময়ে এই সমস্ত সহজাত প্রবৃত্তি নীতিবিরুদ্ধ পথে ধাবিত হয়, তখন এই প্রবৃত্তিগুলিই মোড় ফিরাইয়া ভিন্ন পথে চালনার দ্বারা তাহাদের বিভিন্ন রূপ হইয়া যায়। তখন তাহারা সমাজ-গঠনের প্রতিকূল না হইয়া বরং সমাজ-গঠনের সাহায্যকারী হয়।

মানুষের মধ্যে পরস্পর মিলনের প্রবৃত্তি রহিয়াছে, আবার আক্রমণের প্রবৃত্তিও রহিয়াছে। প্রত্যেক মানুষের ভিতরেই কম-বেশী পরিমাণ যুযুৎসুপ্রবৃত্তি আছে। একদিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, এই যুযুৎসুপ্রবৃত্তি সমাজ-ধ্বংসকর প্রবৃত্তি; আবার অপরদিক্ দিয়া সমাজকে বাঁচাইতে হইলে, যুযুৎসুপ্রবৃত্তির একান্ত প্রয়োজন। অর্থাৎ সহজাত যুযুৎসুপ্রবৃত্তির শক্তি এমন ভাবে নিয়োজিত করা প্রয়োজন, যাহাতে ইহা অবাঞ্ছিত বা

অনিষ্টকর না হইয়া ব্যক্তির ও সমাজের প্রকৃত কল্যাণ ও প্রয়োজনে লাগে।

যদি ধর্মের অনুশাসন বা রাজশাসন দ্বারা যুদ্ধ করা একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে মানবসমাজের পক্ষে তাহা কখনই কল্যাণকর হইবে না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সব সময়ে যদি non-violent না হইয়া কখনও কখনও violent হয়, তাহাতে নৈতিক দোষ হয় না। গীতায় এ সম্বন্ধে স্পষ্ট ভাবেই বলা হইয়াছে।

"যস্য নাহংকৃতোভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাঽপি স ইমাল্লোকান ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥"

নিজের স্বার্থের জন্য মারামারি, খুনা-খুনি হইতে আরম্ভ করিয়া কি ভাবে মানুষের সামাজিক জীবনে সেই সংগ্রাম, সমাজরক্ষা, দেশরক্ষা রূপ ধর্ম-সংগ্রামে পরিণত হইল, মানুষের ইতিহাসে তাহার বিশেষ বিবরণ আছে। যুদ্ধের প্রবৃত্তি হইতেই মানুষের মনে ত্যাগ-বৈরাগ্য, পরোপকার প্রবৃত্তি প্রভৃতির বিকাশ হইতেছে, কেননা তাহার যুদ্ধ-প্রবৃত্তি অন্তর্মুখী হইয়া অহং-এর স্বভাব-প্রবল স্বার্থবুদ্ধি ও আত্ম-ভোগকামনা প্রভৃতির সহিত নিয়ত যুদ্ধ করিতেছে বলিয়াই এই সকল উচ্চ প্রবৃত্তির বিকাশ সম্ভবপর হইতেছে। মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া ফ্রয়েড এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আর এই সিদ্ধান্তের সহিত গীতার সিদ্ধান্তেরও মিল রহিয়াছে। যদি তুমি নিরীহ ভাল মানুষটি হও, সাতেও নাই, পাঁচেও নাই, অর্থাৎ বাহিরের কোন গোলমালে যাইতে চাও না, সর্বদা নিজকে লইয়াই রহিয়াছ; কিসে নিজের পরকালে মঙ্গল হয়, পৃথিবীর এই আসা-যাওয়ার চক্র হইতে কিসে মুক্তিলাভ করিতে পার, সেই চিন্তা লইয়াই আছ, তাহা হইলে মানসিক দৌর্বল্যগ্রস্ত স্নায়ুরোগী হইয়া কোনরূপে জীবন কাটাইয়া দেওয়া ভিন্ন তোমার জীবনে আর বিশেষ কিছু কাজ থাকিবে না। পরে তোমা হইতেই ক্রমশঃ এক স্নায়ুরোগ-গ্রস্ত পরিবার ও জাতির সৃষ্টি হইবে। "যুদ্ধ-বিমুখতা"-কে শ্রীভগবান "ক্লৈব্যং" বলিয়াছেন, "ক্লৈব্য" কথাটিকে যদি "Neurotic" অর্থাৎ স্নায়ুরোগগ্রস্ত বলিয়া অনুবাদ করা হয়, তাহা হইলে অনুবাদ ভুল হয় না। ভারতবর্ষে অধিকাংশ লোকই আজ Neurotic বা ক্লীবতা-গ্রস্ত। যুদ্ধহীনতা কি বিশেষ করিয়া ইহার কারণ নয়?

ভগবদ্গীতায় আমরা দেখি, যুদ্ধের আলোচনার মধ্যে ভগবান অর্জুনকে আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিয়াছেন, "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ" ইত্যাদি।

বকরূপী ধর্মও প্রশ্নচ্ছলে যুধিষ্ঠিরকে বুঝাইয়াছিলেন যে, এই পৃথিবীর মধ্যে ইহা একটি অতি আশ্চর্য ব্যাপার যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রত্যহ মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে—এরূপ বহু ব্যক্তিকে দেখিতেছে অথচ যাহারা সেই মৃত্যু প্রত্যক্ষ করিতেছে, তাহাদের মনে এই চিন্তা কচিৎ উদয় হয় যে, তাহাদেরও মরিতে হইবে। ডাঃ ফ্রয়েড মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া এই ভাবে ইহার উত্তর দিয়াছেন—

"In the unconscious every one of us is convinced of his own immortality.'

—"*Our attitude towards death.*"

অর্থাৎ "আমাদের অবচেতন মনে আমাদের নিশ্চয় প্রতীতি হইয়াছে যে, আমরা অমর।" এই বিশ্বাস হইতে আমাদের পরকালে আত্মার অস্তিত্ব, পুনর্জন্ম প্রভৃতির বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছে। মানুষ যে সাহস করিয়া মৃত্যুর সম্মুখীন হয়, সে সাহসের মূলে আছে মানুষের গভীর মনে নিজের অমরত্ব-বোধ।

মানুষ অসহায়, ভীরু ও দুর্বল, আবার মানুষের ন্যায় অসমসাহসী, অসাধারণ কর্মসাধনে সমর্থ অপর কোন জীবই নয়। মানুষের এই সাহসের উৎসের এক দিক্ অবচেতন মনের নিজের অমরত্ববোধ; অর্থাৎ "যত কিছু বিপদেই আমি যাই না কেন, আমার কিছুই হইবে না" এই গূঢ় বিশ্বাস। আর, আর এক দিক্ মহৎ কার্যে জীবনোৎসর্গের প্রেরণা। কোন একটি বড় আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া যখন মানুষ দুরূহ কার্যে অগ্রসর হয়, তখন সেই আদর্শের তুলনায় তাহার ব্যক্তিগত জীবন, তাহার বাঁচা-মরা তাহার কাছে তুচ্ছ হইয়া যায়। তাহার মনে এই ভাব হয়, "প্রাণ থাক বা যাক, তাহাতে কি আসে যায়?"

এই উচ্চ আদর্শের প্রেরণায় এইরূপ বিপদ-বরণের দুঃসাহস যদি মানুষের মনে না থাকিত, তবে সমাজ ও সভ্যতা কিছুই গড়িয়া উঠিত না।

ফ্রয়েড বলিয়াছেন—

"Life is impoverished, it loses in interest, when the highest stake in the game of living, life itself may not be risked. * * * * *

"Our ties of affection, the unbearable intensity of our grief, make us disinclined to court danger for ourselves and for those who belong to us. * * *

And yet the motto of the Hanseatic League declared; It is necessary to sail the seas, it is not necessary to live. * * * * * * * * * * *

We remember the old saying: If you desire peace, prepare for war. It would be timely thus to paraphrase it. 'If you would endure life, be prepared for death.' —"*Our Attitude towards death.*"

ইহার ভাবার্থ এই যে, যখন আমরা মৃত্যু-ভয়ের প্রভাবের অধীন হই, জীবনের জুয়াখেলায় আমরা যখন ক্ষতি হইবার ভয়ে আমাদের জীবনের মহামূল্য শ্রেষ্ঠ দ্রব্যগুলি দানস্বরূপ ধরিতে পারি না এবং আমাদের এই জীবন, যাহা আমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা দুর্লভ, সাহস করিয়া জুয়াখেলার সর্ব্বস্ব পণে ধরিতে পারি না, আমাদের ভালবাসার ধনগুলির উপর দুঃখের অসহ্য আঘাত হইবে বলিয়া তাহাদের বিপদের সম্মুখে দিতে অনিচ্ছুক হই এবং নিজেও বিপদের সম্মুখীন হইতে চাহি না, তখনই জীবনের রসানুভূতি হারাই এবং আমাদের জীবন দরিদ্র হইয়া যায়। Hanseatic League-এর Motto (আদর্শ) ঘোষণা করিয়াছিল—"সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া প্রয়োজন, বাঁচিয়া থাকাই প্রয়োজন নয়।"

* * * *

আমাদের সেই পুরাতন কথা স্মরণ করিতে হইবে। "যদি তুমি শান্তি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক।"

ফ্রয়েডের এই উক্তির ভিতর "Pleasure-Principle"-এর একটি গূঢ় তথ্য আছে। মানুষের জীবন সরসতা চায়, কেবল বাঁচিয়া থাকিতে চায় না। এই রসাস্বাদনের কতকগুলি নিম্ন স্তর আছে এবং অতি উচ্চ স্তর আছে। ফ্রয়েডের মতে, "জীবনে আমরা প্রকৃত সরসতার আস্বাদ তখনই পাই, যখন জীবনের জুয়াখেলার পণে নিজের জীবন ও অতিপ্রিয় যাহা কিছু সর্ব্বস্বই বাজি-স্বরূপ ধরিতে ভয় না পাই। যদি কৃপণের মত কেবল জীবন আঁকড়াইয়া থাকিতে চাই, তবে হয়তো বাঁচিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু সে বাঁচিয়া থাকা কেবল বাঁচিয়া থাকাই হয়, তাহাতে জীবনের ঐশ্বর্য্যও থাকে না, সরসতাও থাকে না।"

যুদ্ধের রক্তপাত, নরহত্যা, নিষ্ঠুরতা ও বর্ব্বরতা শান্তিপূর্ণ সভ্যতাশ্রীমণ্ডিত সামাজিক জীবনে দারুণ প্রলয়-ঝটিকা-স্বরূপ। ফ্রয়েড "The Disillusionment of war" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

"We are constrained to believe that never has any event been destructive of so much that is valuable in the commonwealth of humanity, nor so misleading to many of the clearest intelligences nor so debasing to the highest that we know."

ভাবার্থ এই যে "যুদ্ধ দেখিয়া আমরা এই বিশ্বাসে উপনীত হই যে, মনুষ্যজাতির মূল্যবান্ সম্পদের এরূপ ভাবে ধ্বংস করা সর্ব্বাপেক্ষা বিচারবুদ্ধিশালী ব্যক্তিগণকে ভ্রান্তপথে লইয়া যাওয়া, যাহাদিগকে আমরা অতি উন্নতমনা বলিয়া জানি তাঁহাদের নীচ প্রবৃত্তিতে লইয়া যাওয়া, যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুতে ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।"

কিন্তু ফ্রয়েড এই প্রবন্ধে ইহাও দেখাইয়াছেন যে, সভ্যতার যে পরিবর্ত্তন আমরা দেখিতে পাই, তাহা অনেক স্থলে কেবল মানুষের বাহিরের আচারব্যবহারের পরিবর্ত্তন মাত্র। সভ্যতার বিধানে 'Reward' ও 'Punishment' আছে। এই পুরস্কার ও তিরস্কার-প্রভাবের অধীন থাকার জন্যই মানুষের বাহিরের আবরণ সংযত ও ভদ্র ভাবাপন্ন হয়। ফ্রয়েড বলিয়াছেন:—

"We also employ another kind of premium system, namely reward and punishment. In this way their effect may turn out to be that he who is subjected to their enfluence will choose to "behave well" in the civilized sense of the phrase, although no ennoblement of instinct, no transformation of egoistic, into altruistic inclination has taken place within."

—"*The Distrillusionment of the war.*"

পুরস্কার এবং শাস্তির বিধান করিয়া যে সভ্যতার বিকাশ হয়, সেই সভ্যতার জ্ঞানের প্রভাবে যে কোন লোক ব্যবহারের দিক্ দিয়া বেশ ভাল ব্যবহারই করিয়া যাইবে, যদিও তাহার সহজাত সংস্কার ও তাহার ভিতরে অহংপ্রবৃত্তি এমন পরিবর্ত্তিত হয় নাই, যাহাতে সে বিশ্বের হিতার্থে আত্মনিয়োগ করিতে পারে।"

ক্রমেড আরও বলিয়াছেন যে—

"In reality our fellow citizens have not sunk so low as we feared, because they had never risen so high, as we believed."

"যুদ্ধে মানুষের মনোবৃত্তির অবনতির কথা বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু বাস্তব পক্ষে আমাদের সঙ্গী নাগরিকগণ (যাহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল) তাহারা ততটা অবনতিতে নামিয়া যায় নাই, কারণ তাহারা ততটা উচ্চে আদৌ উঠে নাই, তাহাদের সম্বন্ধে যেরূপ আমরা বিশ্বাস করি"। এ কথার ভাবার্থ এই যে, যুদ্ধে গিয়াই যে, তাঁহাদের অবনতি হইয়াছিল তাহা ঠিক নয়, তাহাদের ভিতরে যে সহজাত সংস্কার এবং অহং-এর যে নীচ প্রবৃত্তিগুলি বাহিরের সভ্যতার আবরণে চাপা ছিল, যুদ্ধের সংঘাতে সেইগুলিই নগ্নভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল মাত্র।

ক্রমবিকাশে উদ্বর্ত্তন সম্বন্ধে আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল একটি মন্তব্য করিয়াছিলেন, পূর্ব্ব বর্ষের ভাদ্র সংখ্যা "প্রবাসী" পত্রিকায় "আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের স্মৃতি" নামক প্রবন্ধে এই মন্তব্যটি আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহার কিছু এখানে উদ্ধৃত করিলাম—

"ক্রমবিকাশে উদ্বর্তনের একটা নির্দ্দিষ্ট দিকে গতি চলছে এক নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে। কিন্তু তার মধ্যে যেমন সফলতা আছে, বিফলতাও তেমনিই আছে। * * * এই সফলতা ও বিফলতার মধ্য দিয়া উদ্বর্তন চলছে। নিষ্ঠুরতার অভাব তো দুনিয়ায় নাই। * * * কিন্তু এই দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়া উদ্বর্তনের গতিটি নির্দ্দিষ্ট দিকে ঠিক আছে। সেই নির্দ্দিষ্ট দিকে গতিটিই তাঁর মঙ্গলময়ত্বের পরিচায়ক।"

শান্তিময় নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার মধ্যে যুদ্ধ ও বিপ্লব অতি দুঃখদায়ক বটে, কিন্তু আচার্য্য শীলের এই মন্তব্যানুসারে ইহা বলা যায় যে, যুদ্ধের দুঃখ-দুর্দ্দশাও মানবজাতিকে ক্রমবিকাশের এক নির্দ্দিষ্ট পথেই লইয়া যাইতেছে।

সম্প্রতি ইউরোপে যুদ্ধানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, ইহা পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধে পরিণত হইয়াছে। হয়ত সমগ্র পৃথিবীতে এমন এক মহাবিপ্লব উপস্থিত হইবে, যাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। এই যুদ্ধের ভাবী ফল কল্পনা করিতে গেলে আমাদের গীতার একাদশ অধ্যায়ের বিশ্বরূপদর্শনে স্তম্ভিত অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ-বর্ণনা মনে আসে,

"যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথাতবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি।"

—নদী যেমন অম্বুবেগে বর্দ্ধিত হইয়া সমুদ্রের অভিমুখে ছুটে, সেইরূপ নরলোকের যোদ্ধৃগণ যেন সেই মহামৃত্যুর মুখে প্রবল বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।

মহাযুদ্ধের এই দৃশ্যে আমরা দেখিতে পাই—জাতির সহিত জাতির জীবনপণ সংগ্রাম, জাতির স্বার্থের জন্য ব্যক্তিগণের মৃত্যুর সর্ব্বগ্রাসী অনলে আত্মবিসর্জ্জন। জাতির জন্য এই আত্মবিসর্জ্জন নিম্ন প্রাণি-জগতে পিপীলিকা ও মৌমাছির ভিতর সহজাত সংস্কারে প্রাথমিকভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল; মানুষের জাতীয় স্বার্থের জন্য আত্মদান তাহারই পূর্ণ বিকাশ। ইহার ফলে ধ্বংসের ভিতর হইতে যুগে যুগে নব সভ্যতার বিকাশ হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধকে এই জন্য ধর্ম্মযুদ্ধ নাম দেওয়া হইয়াছে।

যুদ্ধ যতই নিষ্ঠুরতা ও সমাজধ্বংসকারী হউক না কেন, যুদ্ধের যে বিশেষ প্রয়োজন আছে, মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া তাহা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। যুদ্ধের প্রয়োজন না থাকিলে, আক্রমণের প্রবৃত্তিও সহজাত সংস্কাররূপে মানুষের মনে থাকিত না।

মহাচীনে যুদ্ধের উৎপাত ছিল না; চীন অহিফেন-নেশার আরামনিদ্রায় দীর্ঘ দিন অভিভূত ছিল, সেই চীন আজ যুদ্ধের সংঘাতে জাগিয়াছে। আজ চীনের মহা-দুর্দ্দিনেও পরম সুদিন, কেননা চীন আজ আর অহিফেন-নেশার "ক্লৈব্যে" অভিভূত চীন নয়, সকল দুর্ব্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া চীন আজ ধর্ম্মযুদ্ধের বীরযোদ্ধারূপে সগৌরবে জগতের সম্মুখে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। জাতিতে জাতিতে স্বার্থ-সংঘর্ষের ভাব একেবারে দূর হইয়া সমস্ত জগতে প্রকৃত অহিংসা ও মৈত্রীর রাজত্ব যদি স্থাপিত হয়, তাহা হইলে যুদ্ধ ও তাহার প্রয়োজন হয়তো একেবারে মিটিয়া যাইতে পারে। সেরূপ দিন কখনও সম্ভব হইবে কিনা, আমরা জানি না। বর্ত্তমানে, অন্যায়ের প্রতিবাদ, পুরাতন ভাঙ্গিয়া নব সভ্যতাগঠন, ক্লৈব্য ও বিকাশের পথে জাতিকে পরিচালনের পন্থাস্বরূপ যুদ্ধকে মানিয়া লইতেই হইবে।

কলিকাতা অর্থ-কেন্দ্রঃ প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ অমিশ্র গঠনব্রতী। সঙ্ঘের সংগঠন-সাধনা দুইটী মৌলিক বিশিষ্ট বিভাগকে অবলম্বন করিয়া সুনির্দ্দিষ্ট ছন্দে অগ্রসর হইতেছে। একটী—জাতির মৌলিক কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পুনরাবিষ্কারে দেশের তরুণ জীবনকে ভাগবতভাবে অনুপ্রাণিত ও তাহাদের জাতি-চেতনা ও বিশুদ্ধ কর্ম্মশক্তি জাগ্রত করা; অন্য—এই সকল তরুণের সৃজনশীল তপস্যায় দেশের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য সমৃদ্ধ, সুপ্রতিষ্ঠ করিয়া জাতিকে ঋদ্ধিশালী ও শক্তিশালী করিয়া তোলা। সঙ্ঘের এই যুগল কর্ম্মস্রোতঃ দেশের ও সমাজের সেবায় প্রবাহিত হইয়া, জাতির অন্তরে নূতন আশা ও আলোর রেখাপাত করিয়া জাতীয় জীবন-গঠনকল্পে কতটুকু কার্য্যকরী হইয়াছে, তাহা দেশবাসীই বিচার করিবেন। আমরা বিশ্বাস করি, বাঙ্গালী, তাহার বাঁচিবার দৃঢ়মূল ও বস্তুতন্ত্র সঙ্কেত এইরূপ কর্ম্মপ্রবাহের মধ্যেই খুঁজিয়া পাইবে।

দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর অতিক্রম করিয়া বিশ্বগ্রাসী ইউরোপীয় যুদ্ধ তৃতীয় বৎসরে পদার্পণ করিল। রুশিয়া যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ায় আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি জটিল হইতে জটিলতর সমস্যাই সৃষ্টি করিয়াছে। ইউরোপের সমর জাতীয়তার নামে ধনতান্ত্রিক নেতৃত্বেরই অভিযান। গণতন্ত্রবাদী ইংরাজ ও আমেরিকা বিশ্ববাসীর অভিভাবকত্বের দুশ্চিন্তায় সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে। কিন্তু চার্চ্চিল-রুজভেল্টের সাম্প্রতিক ঘোষণায় গণতন্ত্রের মুক্তিবার্ত্তা বিশ্বময় প্রচারিত হইলেও, ভারতের স্থান তাহার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। ভারতের রাষ্ট্রীয় অধিকার এতটুকুও তাহাতে স্বীকৃত হয় নাই।

দুই বৎসর যুদ্ধের পরও অর্থনীতিক ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থা স্থায়ী উন্নতির পথে কতটুকু অগ্রসর হইয়াছে, তাহা বিবেচ্য। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশ—অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশগুলি যুদ্ধসংক্রান্ত বড় বড় প্রয়োজন মিটাইবার সুযোগে স্ব স্ব অর্থনীতিক ক্ষেত্রে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হওয়ার অবস্থা লাভ করিয়াছে, পরাধীন ভারতের ভাগ্যে শুধু তাহাদের উপকরণ যোগাইবার ব্যবস্থা ছাড়া অন্য বিশেষ অধিকার পাওয়ার সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় নাই। যুদ্ধের ফলে, আন্তর্জ্জাতিক অবরোধে দেশে শিল্পোন্নতির আশা স্বভাবতই জাগিয়াছিল। যুদ্ধোপকরণ-নির্ম্মাণের দিকে শাসন-কর্ত্তৃপক্ষ অবহিত হওয়ায় ভারতের কয়েকটী প্রধান শিল্প খানিকটা উন্নতির পথে অগ্রসর হইলেও, দেশের ধন-সম্পদ্-বৃদ্ধি-কল্পে ছোট ও মাঝারি শিল্পের স্থায়ী প্রসারতা লক্ষ্যে পড়ে না। বরং সামরিক ব্যয়-সঙ্কুলানের জন্য ভারত সরকার ইতিপূর্ব্বেই দেশবাসীর উপর যে কোটী কোটী টাকার নূতন করভার চাপাইয়াছেন, তাহাতে সকল প্রকার শিল্প ও বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলি বহুবিধভাবে বিপর্য্যস্তই হইয়াছে। তদুপরি এ দেশের মূলগত অভাব ও অসুবিধার কথা জানিয়াও, শাসনকর্ত্তৃপক্ষ এমন কতকগুলি জিনিষের আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন, যাহাদের উপযুক্ত যোগান ছাড়া এদেশে কোন কোন ধরণের শিল্প-কারখানা পরিচালনা করাই কঠিন হইয়াছে। যাহা কিছু মালপত্র পাওয়া যাইতেছে, তাহার মূল্যও খুব চড়া বলিয়া এ দেশের কল-কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যাদির পড়তা দাম যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে দেশের পণ্য-ব্যবহারকারীরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। রপ্তানী বাণিজ্যের সঙ্কোচনের সঙ্গে সঙ্গে দেশোৎপন্ন কাঁচা মাল দেশেই রাখিয়া উহা শিল্প-সম্ভারে পরিণত করা এবং সেই পরিণত পণ্য দেশেই সম্পূর্ণ নিয়োজিত করিবার প্রচেষ্টা হইলে, শিল্পোন্নতির আশু-সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু শাসন-কর্ত্তৃপক্ষের স্বার্থ দেশের স্বার্থ হইতে মূলতঃ বিভিন্ন হওয়ায়, এদিকেও তাঁহাদের সময়োচিত সহযোগিতার অভাব রহিয়াছে। নিরস্ত্র ভারতবাসী দেশের উপর সামরিক বিপদ্ ঘনাইয়া আসা সত্ত্বেও আত্ম-রক্ষায় যেমন অসহায়, তেমনি বাণিজ্যক্ষেত্রেও ধনাগমের সুস্পষ্ট পথ না পাওয়ায়, আমরা নিয়ত আর্থিক নিরুপায়তার কথাই চিন্তা করিতে পারি। গত যুদ্ধে ভারতের শিল্প উল্লেখযোগ্য উন্নতি লাভ না করিতে পারিলেও, বাণিজ্যব্যাপারে অর্থোপার্জ্জনের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা পাওয়া গিয়াছিল। গত যুদ্ধে জাপান ভারতের শিল্পের চাহিদা কিয়ৎপরিমাণে মিটাইয়া কাঁচা মাল রপ্তানীর সাহায্য করিয়াছিল। এবার জাপান এক্সিস শক্তিবর্গের সহযোগী হওয়ায়, তাহার সহিত ভারতের সমস্ত বাণিজ্যই একরূপ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দেশ-বাসীর আয়বৃদ্ধির পথ সুগম করিয়া জাতীয় জীবনকে পুষ্ট না করিয়া, নিত্য নূতন নূতন করভারে সরকার ইহাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতেছেন।

অর্থ-নৈতিক সংগ্রামে ভারতের অবস্থার কথা কিছু বলিয়াছি। এইবার বাংলার দিকে দৃষ্টি দিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারত সরকার নিজেদের ও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে যে কোটি কোটি টাকা যুদ্ধ সরঞ্জাম-ক্রয়ের জন্য ব্যয় করিতেছেন, বাংলা দেশ তাহার অংশ গ্রহণ করিতে পারে নাই। যুদ্ধের জন্য পণ্যদ্রব্যবিক্রয়ের যে বিপুল সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, বাংলার চটকল ব্যতীত অন্য প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানই তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। উপযুক্ত কলকব্জার অভাব, মূলধনের অপ্রাচুর্য্য ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিবার অক্ষমতা হেতুই বাংলা অন্যান্য প্রদেশের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। ইহাতে বাংলা দেশের অবস্থা অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অধিকতর শোচনীয় হইয়াছে। বাংলায় প্রধানতঃ পাটের মারফতেই বাহির হইতে প্রচুর অর্থাগম হইতে পারে। গত বৎসর পাটের দরুণ কৃষকের আয় যথেষ্ট কমিয়াছিল। সরিষা, তুলা, কাঁচা চামড়া প্রভৃতি পণ্যের মূল্য হ্রাস হেতুও কৃষকের হাতে অনেক কম অর্থাগম হইয়াছে। ইহার উপর, বাংলায় অনেক কম পরিমাণ চাউল উৎপন্ন হওয়ায় এবং বিদেশে রপ্তানী হওয়ায়, দেশে চাউলের মূল্যও অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। আবার যুদ্ধ ও করভার হেতু দেশবাসীকে জীবনধারণের পক্ষে নিত্য

প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অধিক মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হইতেছে। অতএব আয়ের অনুপাতে ব্যয়ের মাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায়, বাংলার দুর্দ্দশা যথেষ্ট বাড়িয়াছে। ভারতের অন্যান্য স্থানের অধিবাসিগণের মধ্যে সহস্র সহস্র ব্যক্তি সামরিক ও আধা সামরিক বিভাগে চাকুরী পাইয়াছে; ঐ সব অঞ্চলের শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহও সমরসরবরাহ করিতে সমর্থ হইয়াছে। উহার ফলে তৎ-তৎ স্থানের অধিবাসীদের আর্থিক অবস্থার খানিকটা স্বাচ্ছল্য আসিয়াছে। বাংলার অধিবাসিগণ এই সব সুযোগ তেমনভাবে গ্রহণ করিতে পারে ত' নাই-ই, অদূর ভবিষ্যতে এরূপ অবস্থার উন্নতি-লক্ষণও এখন পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না।

তারপর, বাংলা দেশের সহিত ব্রহ্মদেশের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বহুকাল হইতেই ছিল। অতীতে উভয়ের জীবন-যাত্রার প্রয়োজন মিটাইতে উভয়েই যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছে। এবার ব্রহ্ম-চুক্তিতে সে পথও বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। ব্রহ্মদেশ বাংলার প্রতিবেশী হইলেও, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সুবিধার জন্য বিজাতীয় বহির্দ্দেশের ন্যায় অসহযোগনীতির দ্বারাই উহা বর্ত্তমানে পরিচালিত।

বাংলা দেশে সাম্প্রদায়িক সমস্যা জাতীয় জীবন-বিকাশের সর্ব্ববিধ ক্ষেত্রে যে অসহনীয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতেও আমরা কতদূর বিপন্ন, তাহাও অনুধাবনীয়। জাতির স্বাধিকারের অটুট ভিত্তি-স্বরূপ সমগ্র দেশের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া একটী পূর্ণাঙ্গ আর্থিক পরিকল্পনা-গঠন এবং উক্ত পরিকল্পনানুযায়ী দৃঢ় স্থায়ী কৃষি-শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠানের সৃষ্টিতে সহায়তা করা মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রধান অর্থ-নৈতিক লক্ষ্য হওয়া একান্ত বিধেয় ছিল। ইহাতে তাঁহারা সমগ্র দেশের পূর্ণ সহযোগিতা আশা করিতে পারিতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি এখনও পড়ে নাই।

জনসাধারণ কি চায়? তাহারা চায় যথেষ্ট খাদ্যশস্য, চায় পরিধানের সস্তা বস্ত্র, চায় জীবনের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় অপরিহার্য্য উপকরণ। যুদ্ধ প্রয়োজন মিটাইবার সঙ্গে সঙ্গে এই সকলের সুব্যবস্থাও কি ভাবে হইতে পারে, তাহার সুচিন্তিত পরিকল্পনা করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হওয়া রাজশক্তির উপরই মূলতঃ ও মুখ্যতঃ নির্ভর করে। কিন্তু রাজশক্তির এদিকে উদাসীনতা অসহনীয় ও অশোভনীয়।

দেশের চরম সাধ্য প্রয়োগ করিয়াই এদিকে আমাদের উদ্যোগী হইতে হইবে, নতুবা মাথা তুলিয়া বাঁচিয়া থাকার মত অবস্থা আমাদের হারাইতে হইবে। ইহার জন্য আমরা মনে করি সামাজিক, আর্থিক ও শিক্ষানৈতিক সংগঠনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া একটা প্রকৃষ্ট সংহতি-নীতিই অনুসরণ করিতে হইবে। এই সংহতির লক্ষ্য হওয়া চাই— ব্যক্তি বা পরিবারগত স্বার্থ নহে, জাতীয় দুর্গতির প্রতিকার। জাতির অন্তর্নিহিত সৃষ্টিশক্তির আবিষ্কার করিয়াই আমাদের বিশুদ্ধ সংগঠন-কর্ম্মে আত্মনিয়োগপূর্ব্বক জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হইতে হইবে।

ব্যক্তিত্ব-প্রধান বাঙ্গালীচরিত্রের প্রতিকূল আবহাওয়ায় প্রতি-মুহূর্ত্তে বাধা ও বিপদের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে এইরূপ সংহতিরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়া যে কত কঠিন ও তপঃসাধ্য, তাহা আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছি। কিন্তু এই তপস্যার ভিতর দিয়াই জাতির ভার ও দায়িত্ব বহন করার যোগ্যতা আমাদের অর্জ্জন করিতে হইবে।

মুক্তিকামী জাতির চাই প্রচুর ধনবল। ধনসৃষ্টি করিতে হইলে, ধনিকের মূলধন ও শ্রমিকের শ্রম, দুই-ই প্রয়োজনীয়। এখানে একটী সুসমঞ্জস নীতি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে; কারণ ধনে-শ্রমে ভেদ-বিবাদ গৃহ-বিবাদেরই লক্ষণ। জাতির পূর্ণ সংগঠন ইহাতে ব্যাহত হইতেছে। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ শ্রমসাধ্য কর্ম্মেই আত্মনিয়োগ করিয়াছে। সঙ্ঘের প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে যে সব উৎসর্গীকৃত কর্ম্মী সম্যক্ আত্মদান করিয়া স্রষ্টারূপে উহাকে গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহাতে আজ প্রায় ২৫০০ পরিবারের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। শ্রমশিল্প হিসাবে কৃষি ও খাদি, কুটীরশিল্প হিসাবে খাঁটি সরিষার তৈল ও তিল তৈল উৎপাদন করিতে সুষ্ঠু চালিত কাঠের ঘানিতে বৈদ্যুতিক যন্ত্রের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। যুদ্ধের প্রতিকূল আবহাওয়ায় বৃহৎ শিল্পের প্রতিষ্ঠা এখন সম্ভব নহে। অথচ বিদেশী পণ্যের আমদানী না হওয়ায়, দেশের চাহিদাও মিটিতেছে না। আমাদের মনে হয়, কুটীরশিল্প এই ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহযোগিতা করিতে পারে। মিলের কাপড় দুর্মূল্য হইলেও, খাদির মূল্য যথেষ্ট বাড়ে নাই। চন্দননগরে প্রবর্ত্তক নারী-মন্দিরের অন্যান্য কর্ম্মের মধ্যে নারীকর্ম্মীদের দ্বারা খাদিবস্ত্রবয়নের নিমিত্ত কয়েকটি তাঁত ইতিমধ্যেই চালান হইতেছে। মুদ্রণ-কর্ম্মেও সঙ্ঘের নারীশক্তি আত্মনিয়োগ করিয়া কয়েকটি নারীর অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আমরা গত বর্ষের বিবরণীতে আমাদের বিশুদ্ধ খাদি, খাঁটি ঘৃত, তিল ও সরিষা তৈলের কলিকাতায়, বালিগঞ্জে ও হাতিবাগানে, দুইটি বিক্রয়কেন্দ্র-পরিচালনার বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলাম। এ বৎসর কুমিল্লায় ও মৈমনসিংহে আরও দুইটী বিক্রয়কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। ইহার দ্বারাও কয়েকটী বেকার যুবকের ঐ সকল ক্ষেত্রে অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

সঙ্ঘের আর্থিক পরিস্থিতি ও প্রচেষ্টার বিরাট্ সাফল্য প্রবর্ত্তক জুট মিলের কার্য্যারম্ভ। গত ১০ই ফেব্রুয়ারী বেলঘরিয়ায় উক্ত মিলের উদ্বোধনক্রিয়া সম্পন্ন করেন বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ ৺বিজয়-চাঁদ মহাতাব বাহাদুর। অসংখ্য বাধা বিপত্তি, সর্ব্বোপরি ইউরোপীয় যুদ্ধজনিত অপ্রত্যাশিত বাধা অতিক্রম করিয়া, শ্রীভগবানের অশেষ কৃপায় অর্থক্ষেত্রে সঙ্ঘের এই বিপুল প্রচেষ্টার সাফল্য সমগ্র বাঙ্গালী জাতিরই জয়গৌরব বলিয়া আমরা মনে করি। আমরা শুধু আশা করি, আর্থিক সংগঠনের বহুতর পরিকল্পনা লইয়া বাস্তব ক্ষেত্রে কেহ অগ্রসর হইলে, দেশের বিত্তবানের সহযোগিতার দ্বার যেন চিরদিন উন্মুক্ত থাকে। আরম্ভ ক্ষুদ্র হইলেও ইতিমধ্যেই এই বাণিজ্যে অর্থাগমের

সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া গিয়াছে। এরূপভাবে চলিলে, আমরা ভরসা দিতে পারি—আগামী বৎসরেই অংশীদারদের লভ্যাংশ দেওয়া সম্ভব হইবে।

অতঃপর প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্কের কথা। গত ২০শে জানুয়ারী ফরাসী চন্দননগরে প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্কের একটী শাখা খোলা হয়। উক্ত শাখার উদ্বোধন করেন চন্দননগরেরই শাসনকর্ত্তা মাননীয় মাহুভিরে ও উদ্বোধন সভার পৌরোহিত্য করেন বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের শিল্পবিভাগের সুযোগ্য ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত এস. সি. মিত্র মহোদয়। প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক চন্দননগরের একমাত্র ব্যাঙ্ক হওয়ায়, জনসেবায় একটী নূতন ক্ষেত্র আমাদের সম্মুখে প্রসারিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে জনসাধারণের যেটুকু সহযোগিতা আমরা ব্যাঙ্কের কার্য্যে পাইয়াছি, তাহাতে আমরা আশান্বিত। চন্দননগরবাসী স্থানীয় ধন-সমৃদ্ধি ও শিল্পোন্নতিকল্পে, আমাদের ব্যাঙ্কের সর্ব্বপ্রকার সহায়তা যাহাতে পান, তাহার জন্য ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ সচেষ্ট আছেন। এ বৎসরেও ব্যাঙ্কের অংশীদারগণ সাধারণ শেয়ারে শতকরা ৫৲ টাকা ও প্রেফারেন্স শেয়ারে ৬৲ টাকা বিনা-কর লভ্যাংশ পাইয়াছেন।

আপনারা জানেন গত বৎসর হইতে "প্রবর্ত্তক ফার্ণিশার্স" প্রতিষ্ঠানটিকে পাব্লিক লিমিটেড কোম্পানী রূপে গঠন করিয়া চালান হইতেছে। সঙ্ঘের এই বিভাগের বিপুল কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যাদি অভিনব ডিজাইনের বৈশিষ্ট্যে দেশবাসী ও বাংলা সরকারের বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। আপনারা শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, প্রথম বৎসরেই উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবর্গ অংশীদারগণকে সাধারণ শেয়ারের উপর ৮৲ টাকা ও প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর ৬৲ টাকা শতকরা লভ্যাংশ দিতে সক্ষম হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

জার্ম্মাণ ও জাপানের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় "প্রবর্ত্তক মেশিনারী ট্রেডিং"-এর কার্য্য বিশেষভাবে ব্যাহত হইয়াছে।

এ বৎসর "প্রবর্ত্তক ট্রাষ্ট লিমিটেডের" পরিচালনাধীনে সঙ্ঘ রপ্তানী বাণিজ্য সুরু করিয়াছে। ইতিমধ্যেই আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায়, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের পথ সুগম হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্ঘের অনেকগুলি অর্থপ্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রবদ্ধ করিয়া এই ট্রাষ্ট লিমিটেডই প্রবর্ত্তক জুট মিল লিঃ ও প্রবর্ত্তক ফার্ণিশার্স লিঃ-এর ম্যানেজিং এজেণ্টরূপে কার্য্য করিতেছে। ইহা ব্যতীত সত্বাধিকারী হিসাবে প্রিন্টিং, হাফটোন, পাব্লিশিং, মেশিনারী ট্রেডিং, হোশিয়ারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, এগ্রিকালচার, জুট এজেন্সী, সঙ্ঘ প্রেস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলিকেও উহা পরিচালনা করিতেছে।

সঙ্ঘ-পরিচালিত 'প্রবর্ত্তক' মাসিক ও 'নবসঙ্ঘ' পাক্ষিক পত্রিকা এই দারুণ দুর্য্যোগের দিনেও নিরপেক্ষতার সহিত এই সৃষ্টিকরী নির্ম্মাণ-নীতিই দেশবাসীর নিকট পরিবেশন করিয়াছে। সঙ্ঘের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গ্রামোন্নতিকর কর্ম্মগুলি সঙ্ঘ কর্ত্তৃক পরিচালিত অর্থ প্রতিষ্ঠানগুলির আয় হইতেই বহুলাংশে পরিচালিত হইতেছে। দেশের এই দুর্দ্দিনে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের ন্যায় একটী বিপুল সংহতির মর্য্যাদার সহিত বাঁচিয়া থাকাই কতখানি তপঃসাধ্য, সে বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সঙ্ঘ আপনাদের সহযোগিতায় যে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে, তাহা উত্তরোত্তর দৃঢ় ভিত্তির উপর জাতির কল্যাণ লক্ষ্যে অগ্রসর হউক, ইহাই শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা। সঙ্ঘের উপার্জ্জন কাহারও ব্যক্তিগত স্বার্থকে লক্ষ্যে রাখিয়া নয়, ইহা জাতিরই নানাবিধ সংগঠন-কর্ম্মে নিয়োজিত। সঙ্ঘের জাতীয় জীবন-সংগ্রামে দেশবাসীর অধিকতর সহযোগিতা একান্ত কাম্য।*

* প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ কলিকাতা অর্থকেন্দ্রের দশম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী ৩০শে ভাদ্র কলিকাতা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে সঙ্ঘের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পঠিত।

গান

শ্রীঅরূপ ভট্টাচার্য্য

আজকে আমি ঝরিতে চাই
ধূলার আসন 'পরে
একটি সুরে বেঁধে পরাণখানি,
একটি গানের একটি নির্ঝরে।
চাঁদের সাথে চাই গো মিশাতে
জ্যোছ্‌না ঢালা অধীর নিশাতে
ঝরার পথে রবে না কেউ মোর
ওগো, একটি দিনের তরে।

মন যে আমায় টান্‌ছে আজি গো
বইছে যেথায় কল কল তান
মিল্‌ব আমি সেথায় গিয়ে আজি
চল্‌ছে যেথায় ঝরণাধারার গান।
সুখের ভেলা চাই গো ভাসাতে
নীরব হয়ে রঙীন্ আশাতে
বাঁধন আমায় দিও না কেউ
ওগো একটি দিনের তরে।

সন্তরণে আমার অভিজ্ঞতা

শ্রীবাণী বসু (ঘোষ)

৩

জয়ের যে একটা নেশা আছে, তা' ভাল করে' অনুভব করলাম কটক থেকে কলকাতায় ফেরবার পর। দিন কতক যেতে-না-যেতেই মনটা উতলা হয়ে উঠলো দিগ্বিজয়ে বের হবার জন্য। শুধু সন্তরণ আর ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা বা প্রদর্শনই নয়, সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশ ও মানুষেরও পরিচয় লাভ করা। স্থির হ'ল এবার আসাম সফরে বের হতে হবে।

১৯৩৭ সালের মে মাস। গ্রীষ্মের দীর্ঘ ছুটীতে পূর্ব্ব বন্দোবস্ত-মত আমরা গৌহাটীতে রওনা হলাম। সঙ্গে রইলেন বাবা শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র ঘোষ, শিক্ষাগুরু প্রফুল্ল ঘোষ এবং ছোট ভাই জগদীশ। আমিনগাঁও—পাণ্ডুঘাট হয়ে গৌহাটী পৌঁছলাম। ষ্টেশনে স্থানীয় 'সঙ্কটসহায় সমিতির' সভ্যগণ ও বিশিষ্ট কয়েক জন আমাদের সাদর অভ্যর্থনা করে' নিয়ে গেলেন।

দিন দুই পরে। ২৩শে মে পুলিশ রিজার্ভ গ্রাউণ্ডে প্রথম লাঠি, ছোরা ইত্যাদি খেলা দেখানোর পর রিজার্ভ ট্যাঙ্কে বিচিত্র সন্তরণ-কৌশল প্রদর্শিত হল। উপস্থিত দর্শকবৃন্দ বিশেষ বিস্ময়মুগ্ধ হলেন। সঙ্কট-সহায় সমিতির সভ্যবৃন্দ অসমীয়া ভাষায় একখানি মানপত্রের দ্বারা আমায় সম্মানিতা করলেন:

"মৰমৰ ভণিটী!

তোমাৰ প্ৰথম আগমনত আমি তোমাক সাদৰে আশীৰ্ব্বাদ দি অভিনন্দিত কৰি কও

"স্বাগতম্"

তোমাৰ চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হওক। গুৱাহাটীবাসী আৰু সমিতিৰ পক্ষৰ পৰা শ্ৰেষ্ঠা সন্তৰণকাৰিণী মৰমৰ ভণিটীক আমাৰ স্নেহাশীৰ্ব্বাদ জনাইছোঁ।"

—কিন্তু ব্যাপারটা 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' হল না। সমাপ্ত হল একটা গুরুতর কঠিনতম দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপিয়ে। ঘটনাটা এই:

ট্যাঙ্কে সাঁতার কাটার সময়ে সর্ব্বত্র যেমন, এখানেও স্থানীয় সাঁতারুদের আহ্বান করা হয়। পারস্পরিক আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে সন্তরণবিদ্যার উৎকর্ষসাধন একটা উদ্দেশ্য এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে এই বিশেষ ক্রীড়াটির উপর সর্ব্বসাধারণের ঘনীভূত দৃষ্টি আকর্ষণ করা। আজকাল সর্ব্বত্রই সন্তরণ-শিক্ষা সমাদৃত

উপবিষ্ট: দেবেশচন্দ্র ঘোষ ও প্রফুল্ল ঘোষ
দণ্ডায়মান: জগদীশ ঘোষ ও বাণী ঘোষ

হতে সুরু করলেও, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে নিখুঁত বিজ্ঞানসম্মতভাবে শিক্ষা খুব কমই হয়ে থাকে। এই কারণেই এখানকার স্থানীয় সাঁতারুরা অসহায়ভাবেই সন্তরণপ্রতিযোগিতায় আমার সঙ্গে পরাজিত হল। পরাজয়ের গ্লানি অবচেতনা হতে সহজে বুঝি মুছে না। তাঁরা প্রস্তাব করে' বসলেন, "হ্যাঁ যদি সাঁতরিয়ে ব্রহ্মপুত্র পেরোনো সম্ভব হয়, তবেই সন্তরণপটুতার সার্থকতা প্রমাণিত হবে।" প্রফুল্লবাবু উত্তর দিলেন "আমি কেন, আমার ছাত্রী অনায়াসেই ব্রহ্মপুত্র পার হতে পারবে।"

বাবা তার উপর সুর চড়িয়ে বলে ফেললেন, "ইংলিশ চ্যানেল পার হবার যে স্পর্দ্ধা রাখে, তার কাছে এ আর এমন শক্ত কি? এ তো আমাদের কলকাতার মারহাট্টা ডিচ্!"

বাবার এ মন্তব্য নিছক উত্তেজনার মুখে করা। ব্রহ্মপুত্র যে মারহাট্টা ডিচ্ নয় বা পুরীর সমুদ্রের চেয়েও কত ভয়ঙ্কর, তা' আমি পরে হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছি। আমিনগাঁ-পাণ্ডু ফেরী পার হবার সময়েই নবাগত বর্ষায় ব্রহ্মপুত্র নদের যে যৌবনতরঙ্গ দেখেছি, তা' আদৌ অভিনন্দনীয় নয়। কিন্তু পিছিয়ে আসা আর চলে না। সাঁতারের দিন স্থির হল খুব সম্ভব ২৪শে তারিখ।

সমগ্র সহর ও সহরতলীতে এই সংবাদ ঢেঁরা পিটিয়ে বিঘোষিত হল।

সে দিন কি বার ছিল, আজ আর তা' ঠিক মনে নেই। শুধু স্মরণে আছে—মেঘঢাকা আকাশ আর ঝিরঝিরে বৃষ্টি। ওপার থেকে আমাকে সহরের পারে আসতে হবে। গৌহাটীর কাছারী ঘাট থেকে নৌকাযোগে যাত্রা করলাম। সঙ্গে আরও খানকয়েক স্টীম্প্। উমানন্দ পাহাড় বামে রেখে স্টীম্পগুলি সারি সারি চল্‌লো। এখানে ব্রহ্মপুত্র অনেকটা চওড়া—তিন মাইলের কম নয়। পারে পারে বনাকীর্ণ পাহাড়গুলো দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে ব্রহ্মপুত্র নদকে আরও ভীষণতম ও বিভীষিকাময় করে' তুলেছে। ওপারে পৌঁছে দেখলাম, আমি ছাড়া আরও কয়েক জন অসমীয়া তরুণ সাঁতারু ব্রহ্মপুত্র পার হবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। সহরের ঘাটের উপরকার আর্য্য নাট্যমন্দিরটি শ্বেত কপোতের মত দেখাচ্ছিল এবং উহাই ছিল আমার লক্ষ্যস্থল (finishing point)। এ-পারের আরম্ভ আর ও-পারের শেষ পয়েন্ট প্রায় সোজাসুজি। প্রবল বেগবান্ নদে সোজা পাড়ি—প্রাণটা একটু কেঁপে উঠলো।

মধ্যাহ্নগগন হতে সূর্য্য ঢলে পড়েছে। বন্দুকের আওয়াজ করে ষ্টার্ট দিলেন মিউনিসিপ্যাল কমিশনার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সরস্বতী। নির্দ্দেশ পাওয়া মাত্র আমি কিনারে ভিড়ানো নৌকা থেকে টুপ্ করে' জলে নেমে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে ঝুপ্‌ঝাপ্ শব্দে লাফিয়ে পড়লো অন্যান্য সাঁতারুরা। এখানে কোন প্রতিযোগিতা নেই। সখের সাঁতারু এঁরা আমার জলপথের সাথী। প্রথমটা বেশ কৌতুক বোধ হতে লাগলো। নিঃশঙ্ক চিত্তে সাঁতার কাটতে লাগলাম।

কিন্তু কতক্ষণ!

যেমন হিমশীতল জল, তেমনি খরস্রোতঃ। ঠাণ্ডায় সারা অঙ্গ কন্‌কনিয়ে উঠলো। শিরার মধ্যে রক্ত-প্রবাহ যেন শিথিল হয়ে আসতে চায়। হাত-পা অবশ হয়ে চলচ্ছক্তি হারিয়ে ফেলার উপক্রম হ'ল। একটা দুর্ব্বার জলস্রোতঃ যেন নদীর উপর দিয়ে হু-হু করে' ছুটে চলেছে। মনে হল যেন সদ্য হিমাদ্রি-বিগলিত বরফের চাঁইগুলো বুকের নীচ দিয়ে দ্রুতবেগে দৌড়ে ছুটেছে। তরল সলিলের এমন ধারালো আলিঙ্গন আর ছুঁচালো স্পর্শের অভিজ্ঞতা ইতিপূর্ব্বে আর কখনও হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মপুত্রের কত স্মৃতি চলচ্চিত্রের মত মনের পটে ভেসে উঠতে লাগলো। কত জীবন্ত মৃত্যু—কত নৌকা-ডুবি! এই সেদিন গৌহাটীর এক অধ্যাপক এই ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যেই প্রাণ হারিয়েছেন। সংবাদপত্রে-পড়া সে স্মৃতি মনের দ্বারে কালো বিভীষিকার ছায়া ঘনিয়ে তুল্‌লো। প্রায় মাঝামাঝি —সামনেই উমানন্দ পাহাড় দানবের মত মাথা উঁচু করে' দাঁড়িয়ে। ভরসার সাথী ছিল যে সাঁতারুর দল, তাঁরাও এবার নৌকায় উঠে' পড়লেন।

পাহাড়ের পাশ কাটিয়ে লক্ষ্য ধরে' আমায় সাঁতার কাটতে হচ্ছে। নদীর সহজ স্রোতঃ পর্ব্বতগাত্রে ধাক্কা খেয়ে গ্রহণ করেছে এক বিপজ্জনক বঙ্কিম পথ। পার্ব্বত্য দেশের নদীর ঢালু এত বেশী যে, মনে হতে লাগলো জল-প্রপাতের মতই জল যেন উপর থেকে নীচে গড়িয়ে পড়ছে। এই বিশাল জলরাশির বেগনিয়ন্ত্রণ ক্ষুদ্র মানুষের অসাধ্য। পাহাড়ের যত নিকটবর্ত্তী হতে লাগলাম, ততই ঘূর্ণাবর্ত্ত এবং চোরা স্রোত (undercurrent) সবেগে আমায় নীচের দিকে টানতে লাগলো। কল্-কল্ শব্দে সমস্ত জলরাশিকে আলোড়ন করে' স্থানে স্থানে নীচের ঠাণ্ডা জল উথ্‌লিয়ে উঠে আমার হাল্‌কা দেহটাকে যেন তৃণখণ্ডের মত ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগলো। আবার পর মুহূর্ত্তে জলের পাক ঘুরে ঘুরে করাল বদন বিস্তার করে' যেন আমায় গ্রাস করতে উদ্যত হ'ল। এ অবস্থায় শূন্যে

উৎক্ষিপ্ত হয়ে নৌকা বা ষ্টীমার 'হালে পানি' পায় না বলে'ই অনবরত ঘুরতে থাকে, ফলে অনেক সময়ে ডুবেও যায়। আমারও ঠিক ঐ একই দশা। শুধু পার্থক্য এই যে, আমার মন, ইচ্ছাশক্তি ও শরীর সম্মিলিত হয়ে যে সামঞ্জস্যের সৃষ্টি করলো, সে সজীবতা মাঝি ও নৌকার মধ্যে সম্ভব হয় না। নদীর উপরিভাগে ঘন ঘূর্ণাবর্ত্ত এবং অভ্যন্তরে এলোমেলো স্রোতের (currents and cross-currents) দাপাদাপি স্পষ্ট কাণে বাজ্‌তে লাগলো। সলিল-সমাধি-গর্ত্তের নীরব আহ্বান আমার প্রতি রক্ত-বিন্দুর মধ্যে মুখর হয়ে উঠতে লাগলো। নাঃ—আর পারি না! ইচ্ছা (will) ও দেহের শক্তির একটা সীমা আছে। সন্তরণ-বিজ্ঞান ও কৌশল এখানে অপারগ। প্রায় আধ ঘণ্টা ধ্বস্তাধ্বস্তি করছি—না এদিক্, না সেদিক্। জয়ের দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা দমন করে' এক একবার মনে হল জীবনরক্ষী লঞ্চে উঠে পড়ি। কিন্তু একটা অত্যাশ্চর্য্য ও অপ্রত্যাশিত ঘটনায় আমার বিপত্তি কেটে গেল। একটানা একটা স্রোতঃ আকস্মিক আমার অসহায়প্রায় দেহ-তরণী-খানিকে এক টানে যেন অনেকটা দূর এগিয়ে নিয়ে ফেললো। জলস্রোতঃ একটানা যতই ক্ষুরধার হোক, তেমন বিপজ্জনক নয়। অনেকটা আশ্বস্ত হলাম।

পশ্চাতে উমানন্দ পাহাড়। সামনে ঐ দূরে গৌহাটীর ঘাটে অগণিত উৎসুক জনমণ্ডলী চোখের উপর সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। বিজলীস্পর্শের মত তাদের শুভ-কামনা আমার নিস্তেজ শরীর-মনকে উৎফুল্ল ও সঞ্জীবিত করে' তুললো। লুপ্ত শক্তিবেগ ফিরে আসতে লাগলো। সমস্ত চেতনা গিয়ে কেন্দ্রীভূত হল ঐ নাট্যমন্দির লক্ষ্যে। শ্বেত বসনাঞ্চলের মত মন্দিরটি যেন বাতাসে দুলছিল। যত কিনারে ভিড়তে লাগলাম, ততই স্রোতের বেগও বাড়্‌তে লাগলো। স্রোতের সঙ্গে আপ্রাণ লড়াই করা সত্ত্বেও স্রোতঃ কাটিয়ে সোজাসুজি লক্ষ্যস্থলে পৌঁছুতে পারলাম না। একে তো বরফের মত দুঃসহনীয় ঠাণ্ডা জল, তাতে বাঁকের পুঞ্জীভূত জলরাশির একটানা প্রখর স্রোতোবেগ। উজানো দূরে থাকুক, এক জায়গায় স্থির থাকাও শক্ত হস্তীর শক্তির পক্ষে অসম্ভব। অনর্থক চেষ্টা না করে' লক্ষ্যস্থলের একটু ভাটিতেই পাড়ে উঠে পড়লাম। শিক্ষাগুরু প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ আমার হাত ধরে' পারে উঠার সাহায্য করলেন। বাবা যেন অনেক ক্ষণ পরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। এত জীবন-সঙ্কট বিপদের মাঝে একটিবারও তিনি আমায় পিছনে হঠার দুর্ব্বলতা দেখাননি।

প্রফুল্ল ঘোষ বাণী ঘোষের হাত ধরে' পারে উঠার সাহায্য করছেন

আকাশ ছেয়ে তখনও সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসেনি। ঘাটে এসে দেখলাম—ওঃ, সে কি ভীড়! কয়েক জন প্রবীণ ভদ্রলোক কাছে এগিয়ে এসে বললেন, তাঁদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় গৌহাটীর ঘাটে এত দর্শক-সমাগম ইতিপূর্ব্বে কখনও দৃষ্টিগোচর হয়নি। আশীর্ব্বাদ করে' তাঁরা বললেন, "মানুষের পক্ষে এ বর্ষার ব্রহ্মপুত্র পার হওয়া সত্যই অভূতপূর্ব্ব—অকল্পনীয়। তুমি দীর্ঘজীবিনী হয়ে দেশের মুখোজ্জ্বল কর।"

পরদিন স্থানীয় কার্জ্জন হলে আমাকে গৌহাটীবাসীর তরফ হ'তে অভিনন্দন দেওয়া হল। একটি প্রকাণ্ড কাপ দিয়ে আমাকে পুরস্কৃতও করা হল।

গৌহাটীতে কয়েকদিন থাকবার পর তেজপুরের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র বোস মহাশয় টেলিগ্রাম যোগে আমাদের নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠালেন। তেজপুরের আব্‌হাওয়া বড় স্যাঁৎসেতে—গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি লেগেই আছে। স্থানীয় পুষ্করিণীতে আমার সাঁতার ও

গৌহাটীবাসীর প্রদত্ত প্রকাণ্ড রৌপ্য কাপ্ সহ বাণী ঘোষ

থিয়েটার হলে একটি খয়রাতী খেলায় আমার ও জগদীশের লাঠি-ছোরাখেলা প্রদর্শিত হ'ল। এখান থেকে গৌহাটী হ'য়ে আবার আমরা সিলেটের দিকে রওনা হলাম। গাড়ী লামডিঙ, বদরপুর হ'য়ে সিলেটে যাবে। লামডিঙ থেকে বেশ অনুভব কর'লাম গাড়ী ক্রমশঃ এঁকে বেঁকে ওপরের দিকে উঠছে—গতিও শ্লথ হ'য়ে এল। দূরে জয়ন্তী পর্ব্বতমালা মেঘের মত আকাশের দিগন্তে থরে থরে সাজানো। সবুজ প্রকৃতি; স্তব্ধ, শান্ত অরণ্য। আসামের জঙ্গলকে আরও গম্ভীর করে' তুলেছে—এ নীরব শান্তি। কোথাও বা নির্ঝরিণীর সবেমাত্র স্বপ্নভঙ্গ হ'য়ে সুদূর শৈল হ'তে নেমে এসে মন্থর গতিতে আপনার বেগে গান গেয়ে চলেছে। কোথাও বা প্রশস্ত জলরাশি ছোট ছোট শিলাখণ্ডে হোঁচট্ খেয়ে ট'লে পড়বার উপক্রম ক'রছে, আবার কোথাও বা বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে শতধা মাতালের মত ভেঙ্গে পড়ছে লহরীর পর লহরী তুলে', আঘাতের পর আঘাত করে'। ট্রেণ মাঝে মাঝে দীর্ঘ টানেলের ভেতর দিয়ে ছুটেছে, দম বন্ধ করে' যেন পাতালপুরীতে প্রবেশ ক'রছে। কিছু পরেই আবার উন্মুক্ত আলো-বাতাসের মাঝে এসে প্রাণটাকে তাজা ক'রে নিলাম। বিশ্বের এ আলো অন্ধকারের খেলার মাঝে সেদিন এক অপূর্ব্ব অননুভূত প্রেরণা লাভ ক'রলাম। আমার কেবলই মনে হতে লাগল, ভারতীয় নারীদেরও টানেল-জীবনই এই মহাজাতির মৃত্যুর কারণ।

সিলেটে আমরা শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মুখার্জ্জী (খাজাঞ্চী বাড়ী) এম. এল. এ. মহাশয়ের আতিথেয়তা গ্রহণ করলাম। শুনেছিলাম এখানে নাকি বিখ্যাত মুসলমান লাঠিয়াল আছে। তাই সাঁতারের পরদিন স্কুল কম্পাউণ্ডে আমার লাঠী ও ছোরা খেলা প্রদর্শিত হবার সময়ে স্থানীয় লাঠিয়ালদের লাঠি খেলায় আহ্বান করলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ যে বিশেষ খেলায় (বেনেটী শো) আহ্বান করা হয়েছিল, তারা সেরূপ দেখাতে অক্ষমতা প্রকাশ করলে। এর পর শিলচরের শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত দাশ মহাশয়ের বাড়ীতে ক'দিন থেকে বিবিধ সন্তরণ ও ক্রীড়া-কৌশল দেখিয়ে আমরা সদলবলে কলকাতায় ফিরে' এলাম।

ক'লকাতা ছেড়ে কত দূরদূরান্তরে গিয়েছি, বম্বে থেকে সুদূর আসাম অবধি ভ্রমণ করেছি—কত সহরে নগরে আমার সাঁতারের প্রদর্শনী দেখিয়েছি, কত নদী, পুষ্করিণী ও সাগরের জল মথিত করেছি! কিন্তু আজকের দিনে আমার সার্থকতা হবে সেইখানেই, যদি দেশবাসীর মনে—বিশেষ ক'রে ভারতীয় নারীদের প্রাণে নারীর মান-সম্মান রক্ষার মত এই খেলাধূলাপ্রিয়তাটুকু জাগিয়ে দিতে পারি, তাদের বদ্ধ জীবনের রুদ্ধ দুয়ার ভাঙতে পেরে' থাকি। আর দেশ-বিদেশে যাঁরা আমাদের অভ্যর্থনা করেছেন, তাঁদের সহৃদয় আতিথেয়তার কথা আমার স্মৃতিকে চির সবুজ করে' রাখবে।

মূক-বধির

শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার

অপরাপর ইন্দ্রিয়বৃত্তির পূর্ণ প্রখরতা সত্ত্বেও মূক ও বধির যাহারা, তাহারা সমাজে সেদিন পর্য্যন্তও বিধাতার অভিশাপগ্রস্ত হইয়া অসহায় জীবন যাপন করিত। মূক যে মুখর হইতে পারে, এ ধারণা সেদিনের মানুষ কল্পনাও করিতে পারিত না। অলঙ্ঘ্য দৈব বিধান বলিয়াই মানুষের এই আঙ্গিক অপরিণতি মানুষ সন্তুষ্টচিত্তে মাথা পাতিয়া লইয়াছিল। এই দুর্দ্দৈব নিরুপায়তার মাঝে অসহায় অন্ধ, মূক ও বধির যাহারা, তাহারা সমাজে উপেক্ষিত ও দয়ার পাত্র হইয়াই শতাব্দীর পর শতাব্দী বাস করিয়া আসিয়াছে।

শ্রীনৃপেন্দ্রমোহন মজুমদার:
ইনি পূর্ব্ব-ভারতীয় মূক-বধির শিক্ষা-সম্মেলনের কার্য্যাধ্যক্ষ

পাশ্চাত্য দেশে নব জাগরণের জোয়ার যখন আসিল, তখনই মানুষের মনে প্রথম প্রশ্ন জাগিল এই অসহায় অকেজোদের সম্বন্ধে। জ্ঞান-প্রসার ও বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে মূক-বধিরের যে শিক্ষার সুব্যবস্থা হইল, তাহার ফলে সমাজের বিকল একাংশ আজ সফল হইতে পারিয়াছে! ইউরোপে মূক-বধিরের জীবন-ধারায় যে রূপান্তর আসিয়াছে, তাহা আজও এদেশে সম্ভব হয় নাই। ওদেশে মূক-বধির বর্ত্তমানে তার সমাজের গলগ্রহ নয়, শিক্ষার গুণে স্বাবলম্বী হইয়া তারা জীবনের দাবী আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছে। পাশ্চাত্যে মূক-বধির শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি বর্ত্তমানে বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে সুনিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

শ্রীহট্ট মূক-বধির বিদ্যালয়ের কর্ম্মরত ছাত্রছাত্রীগণ

আজ আমাদের দেশে যখন শিক্ষার সর্ব্বাঙ্গীন প্রসার হইতেছে, তখন মূক-বধিরদের কথা ভুলিলে চলিবে কেন?

দেশের ও সমাজের মঙ্গলের জন্য মূক বধিরদের শিক্ষার দাবী উপেক্ষা করা যায় না। তাহারাও সমাজের কাছে, দেশের কাছে চায় তাহাদের উপযুক্ত শিক্ষা।

এই অসহায় মূক-বধিরদের মর্ম্মান্তিক দুঃখে বাংলার কয়েক জন নগণ্য যুবকের প্রাণ একদিন কাঁদিয়াছিল, তাই তাঁহাদের অক্লান্ত চেষ্টা ও যত্নের ফলে বাংলা দেশে কলিকাতা নগরীতে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম মূক-বধির বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্ম্মবীর ধর্ম্মপ্রাণ সাধকদের মধ্যে

৺ভোলানাথ ঘটক : শিক্ষিত মূক-বধির :
ইনি চট্টগ্রাম ও রাজসাহীতে মূক-বধির বিদ্যালয় স্থাপন করেন

এখন বাঁচিয়া আছেন শুধু শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন মজুমদার। তিনি আজও বৃদ্ধ বয়সে এই অসহায়দের উন্নতিকল্পে নানাভাবে চিন্তা করিয়া থাকেন। তিনিই ভারতে প্রথম মূক-বধিরদের শিক্ষা সম্বন্ধে "মূক-শিক্ষা" নামক একমাত্র পুস্তক প্রণয়ন করেন।

কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয় ব্যতীত বাংলা দেশে অধুনা আরও ১০টী, বিহারে ২টী, উড়িষ্যায় ১টী এবং আসামে ১টী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতার বিদ্যালয়টী বাদ দিলে অন্যগুলির অবস্থা নিম্নে প্রদত্ত তালিকা হইতেই বোঝা যায় ইহাদের অবস্থা কতদূর শোচনীয়। মূক-বধিরদের শিক্ষা অত্যন্ত ব্যয়-সাপেক্ষ।

গভর্ণমেণ্ট, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি ও জনসাধারণের বিশেষ দৃষ্টি না থাকিলে, ইহাদের উন্নতির আশা সুদূরপরাহত।

নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের মূক-বধির আন্দোলনের প্রসার সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যাইবে।

স্কুল	স্থাপিত	ছাত্র সংখ্যা	গভর্ণমেণ্টের দান বৎসরের	ডিঃ বোর্ড দান মাসিক	মিঃ দানঃ বৎসর	মূকবধির সং
বাংলা						
কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়	১৮৯৩	২৪০	১৮,০০০	×	১০,০০০	৫০০
বরিশাল	১৯১১	৩১	১,২১০	২৫২	৯৬	১৫৮৩
ঢাকা	১৯১৬	৩০	৬০৯	×	২৪০	১৪৩০
চট্টগ্রাম	১৯২৩	২২	৭৩০	২৪০	৩৬০	১৪০০
মৈমনসিংহ	১৯২৫	১৫	৭২০	৫৪০	১৮০	৯৩০
রাজসাহী	১৯৩১	১৪	৩০০	২৪০	৩৬০	১০০০
মুর্শিদাবাদ	১৯৩৪	১২	৩০০	২৪০	১৮০	৮২৪
খুলনা	১৯৩৪	৭	×	১৮০	×	৭৫০
বীরভূম	১৯৩৬	৮	×	×	×	৭২০
বগুড়া	১৯৩৯	১৩	×	×	×	৭৭৩
কুমিল্লা	১৯৩৯	৮	×	×	১২০	১৫০০
বিহার						
পাটনা	১৯৩৬	২২	১৮০০	×	৩০০	১৬,৮৪১
রাঁচি	১৯৩৭	৩০	৬০০	৯০০	×	৪৪৯২
কটক	১৯৩৮		৫০০			২৬৭০
আসাম						
শ্রীহট্ট	১৯৩৮	১৪	১৫০০		৩০০	২৪৪৩

উপরোক্ত তালিকা দৃষ্টে বুঝা যাইবে, মূক-বধিরের সংখ্যার তুলনায় শিক্ষার ব্যবস্থা কত অপ্রচুর। শিক্ষার সুব্যবস্থা হইলে, ইহারা সমাজের প্রকৃত শক্তি ও সম্পদ্ বৃদ্ধি করিতে পারিত। দেশের এই সমস্যার প্রতি দরদী দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

ব্রহ্মসূত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

(দ্বিতীয় পাদ)

শ্রীমতিলাল রায়

অনুস্মৃতেশ্চ ॥২৫॥

অনুস্মৃতেশ্চ (অনুভব জন্য যে স্মৃতি, তাহাতেই অনুভব-কর্ত্তার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়।)

বৈনাশিকেরা যে বলেন, সমস্ত বস্তুর ন্যায় আত্মাও ক্ষণিক, বেদব্যাস তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন—যখন অনুস্মৃতির প্রবাহ বিদ্যমান থাকে, তখন অনুভব-কর্ত্তার অসদ্ভাব কেমন করিয়া সম্ভব হইবে? দুই দশ বৎসর পূর্ব্বের যে অনুভূতি, তাহার অনুস্মৃতি আজিও উদয় হয়। আত্মা যদি ক্ষণিক হইবে, অর্থাৎ পূর্ব্বের আত্মা আজিকার আত্মা হইতে যদি ভিন্ন হইবে, তবে পূর্ব্বানুভূত বস্তুর স্মরণ করিবে কে? পূর্ব্বে যে অনুভব করিয়াছিল, আজ অন্য জন তাহা স্মরণ করিতেছে—ইহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত কথা। অনুভবকারী এক ব্যক্তি, স্মরণকারী অন্য ব্যক্তি এরূপ হইতেই পারে না; অতএব বৈনাশিকের ক্ষণিকবাদ ভিত্তিহীন। যাহা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ, তাহা স্বীকার না করিয়া স্বমত-স্থাপনের ঐরূপ যুক্তি অপচেষ্টা মাত্র।

বৈনাশিকেরা সৃষ্ট বস্তুর কোনরূপ পশ্চাৎ-কারণ স্বীকার করেন না। সৃষ্টির হেতুবাদ অস্বীকার করিলে, অভাব হইতে উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহারা আরও বলেন 'নানুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ'—বিনাশ ব্যতীত কিছু প্রাদুর্ভূত হয় না। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত যেমন বীজের বিনষ্টিতে এবং দুগ্ধের বিকৃতিতে ও মৃৎপিণ্ডের বিনাশে অঙ্কুর, দধি ও ঘটের জন্ম হয়, সেইরূপ বিকার বা বিনাশরূপ বিকার ব্যতীত কিছুই জন্মে না। অতএব অভাব ভাবের উৎপাদক বলিতে আপত্তি কি? তদুত্তরে পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা করা হইতেছে।

নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ ॥২৬॥

অসতঃ (অভাব হইতে) ন (ভাবের উৎপত্তি হয় না) [illegible]াৎ (ইহা প্রত্যক্ষীভূত হয়, এই হেতু)।

অভাব হইতে সৃষ্টি সম্ভব হইলে, আকাশ-কুসুম বা শশশৃঙ্গ হইতে অঙ্কুরাদি উৎপন্ন হইতে পারিত। বলা বাহুল্য, শশশৃঙ্গ বা আকাশকুসুম কেহ কখনও দেখে নাই, কাজেই উহারা অভাবের সমতুল্য। কিন্তু এইরূপ সৃষ্ট্যাদি কেহ কখন কল্পনা করে না। অভাব ভাবের হেতু কোনদিন হইতে পারে না। মৃত্তিকায় ঘট হয়, মৃত্তিকার বিনাশ তাহাতে হয় না। ঘটে মৃত্তিকার অনুবর্ত্তন আছে। দধিতে দুগ্ধ অনুস্যুত থাকে। বৈনাশিকেরা বলিবেন—স্বরূপের বিনাশ না হইলে, ঘট বা দধি জন্মে না। ঘটে মৃত্তিকা বা দধিতে দুগ্ধাদি অনুস্যূত থাকে, তাহা দুগ্ধ বা মৃত্তিকার স্বরূপনাশ বা বিকৃতি বলিতে হইবে। অতএব অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি অযুক্ত কথা নহে। ভাল, ভাবের বিকার সৃষ্টির উৎপত্তি-হেতু; কিন্তু তাহা অভাব হইতে নহে। বিকার যদি বিনাশ হয়, তাহা হইলেও বলিতে হইবে, এই বিকার বীজের বিনাশ-রূপ বৃক্ষসৃষ্টির প্রকরণ। বস্তুতঃ ইহা বিনাশ বা বিকৃতি নহে। স্বর্ণের দ্বারা অলঙ্কারের সৃষ্টি হয়, তাহাতে আসলে কি স্বর্ণের অস্তিত্ব লোপ পায়, না স্বর্ণ বিকৃত হয়? বীজের অবস্থান্তরে উত্তরকালে অঙ্কুর সৃষ্টি হয়, বীজের ইহাতে বিনাশ হয় না। বীজানুগত অবিনশ্বর বীজাবয়বই অঙ্কুর ও বৃক্ষাদি-রূপে প্রকাশ পায়। এইহেতু অভাব হইতে ভাব উৎপন্ন হওয়ার যুক্তি স্বীকার্য্য নহে। অভাবের অন্বয়ে অভাবের সৃষ্টি হয়, ভাবের সৃষ্টি হয় না।

উদাসীনানামপি চ এবং সিদ্ধিঃ ॥২৭॥

উদাসীনানাম্ অপি চ (উদাসীন পুরুষদেরও) এবং সিদ্ধিঃ (অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে পারিত)।

অর্থাৎ অভাব হইতে সৃষ্টি যদি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে এই সুলভ অভাবের দ্বারাই অর্থাৎ বিনাশ্রমে কৃষকের ক্ষেত্রকর্ষণ কর্ম্ম সিদ্ধ হইত, তন্তুবায়েরা বিনা

শক্তিপ্রয়োগেই বস্ত্রবয়ন করিত, কুম্ভকারও বিনা আয়াসে ঘটাদি নির্ম্মাণ করিত, ধর্ম্ম-কর্ম্মও মানুষের বিনা যত্নে সিদ্ধ হইত। কিন্তু তাহা হয় না, ইহা প্রত্যক্ষ। এই কারণে অভাব ভাবের কারণ, ইহা অযুক্ত।

নাভাব উপলব্ধেঃ ॥২৮॥

অভাব ন (বাহ্যতঃ কিছুই সত্য নহে, এ কথাও বলিতে পার না। কেন বলিতে পার না?) উপলব্ধেঃ (সকল বস্তুই উপলব্ধিগম্য হয়)।

চক্ষের সম্মুখে প্রতিনিয়ত যাহা ভাসিতেছে, তাহা অভাবেরই মূর্ত্তি, এরূপ বলা সঙ্গত নহে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা বাহ্যাভ্যন্তর পদার্থ স্বীকার করেন, তাঁহাদেরই মতবাদের সমালোচনা পূর্ব্বে করা হইয়াছে। অন্য এক বৌদ্ধ সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা বিজ্ঞানবাদী। তাঁহারা বলেন—বাহিরে যে পরিদৃশ্যমান সৃষ্টি, তাহা অন্তরেরই প্রতিচ্ছবি। প্রমাণ, প্রমাণের বিষয় অর্থাৎ প্রমেয় ও ফল আদৌ বাহ্য বিষয় নহে। সবই বুদ্ধ্যারূঢ় হইয়া বাহিরে প্রতিভাত হয়। বিজ্ঞানের সৃষ্টিকল্পনা বাহিরের বস্তু নহে। সবই অন্তঃস্থ। বাহ্য ভ্রান্তি মাত্র। তাঁহারা বলেন—সম্মুখে যে মর্ম্মর-প্রসাদ, তাহার কারণ যদি হয় পরমাণু, তাহা হইলে উহার দর্শনে পরমাণু-জ্ঞানই জন্মিবে। মর্ম্মর-প্রাসাদের জ্ঞান হইবে, এ যুক্তি অত্যদ্ভুত। ইহাদের মতে, জ্ঞানের প্রকারভেদে বাহ্য বস্তুর প্রকার-ভেদ হয়। বিষয় ব্যতীত যেমন জ্ঞান জন্মে না, তেমনই জ্ঞান ব্যতীত বিষয় অনুভূত হয় না। অতএব দুইই এক বস্তু। বিজ্ঞানই সৃষ্টি। সৃষ্টিই বিজ্ঞান। স্বপ্নদর্শনের মতই সৃষ্টি অন্তরের কল্পনা। মরুতে জলদর্শন যেমন সত্য নয়, আকাশে নগরদর্শন যেমন মিথ্যা, তদ্রূপ বস্তু না থাকিলেও ঐ সকল স্বপ্নের মত অন্তরগ্রাহ্য হইয়া বাহিরে প্রকাশ হয়। এই দৃশ্যমান জগৎ মায়া-মরীচিকা, মনের বিরাট্ কল্পনা। যদি কেহ বলেন—বাহ্য বিষয় নাই, অথচ বিচিত্র বিষয়ের জ্ঞান হয়, এ কেমন কথা? এইরূপ সংশয় অকারণ। কেননা, বাসনার সংঘাতে অন্তরে যে বিচিত্র জ্ঞানের তরঙ্গ উত্থিত হয়, তাহাই সৃষ্টিচাতুর্য্য সৃষ্টি করে। অন্বয় ও ব্যতিরেক যুক্তিতে বাসনাই যে জ্ঞান-বৈচিত্র্যের কারণ, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। বিষয় নাই অথচ বিষয়জ্ঞান হয়, তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আছে। মরুতে মরীচিকা, স্বপ্নে ঘট-পটাদি দর্শন, ঐন্দ্রজালিকের হস্তকৌশলে নানাবিধ দ্রব্যসৃষ্টি বস্তুর আশ্রয় না লইয়াই পরিলক্ষিত হয়; বিষয় নাই অথচ বিষয়জ্ঞান ঠিক এই নিয়মেই হয়, ইহাতে সন্দেহের কি আছে? বিষয়বৈচিত্র্য, তাহার কারণ বাসনা—এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এই যুক্তির খণ্ডনের জন্য উপরোক্ত সূত্র উক্ত হইয়াছে। ভোজনে পরিতৃপ্তি পাইয়াও বা সম্মুখে হস্তী দর্শন করিয়াও যদি বলিতে হয় বাহিরে কিছু নাই, এই সব অন্তর-দর্শন, স্বপ্নের ন্যায় বস্তুহীন, মায়াচিত্র, তাহা এক প্রকার জোর করিয়া বলা ছাড়া আর কিছু নহে। বাহ্যবস্তু জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞান বস্তু, যথা হস্তী বা প্রাসাদ-রূপে পরিণত হইতে পারে না। বাহ্য সৃষ্টি প্রত্যাখ্যান করার যুক্তি অত্যন্ত অসার। বাহ্য বস্তুই যদি নাই, তবে বহির্জ্জগৎ বলার অর্থ কি? কাহাকেও যদি বলা হয়—তুমি বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায়, ইহা হইতেই পুত্রও স্বীকার্য্য হয়। বহির্জ্জগতের তুলনা করিতে গিয়া বিজ্ঞানবাদী বাহ্য বিষয়কে একপ্রকার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। অনুভবের অনুরূপ বস্তু স্বীকার করিয়া সেই বস্তুর অস্বীকার একপ্রকার জিদ্ বলা যায়। যদি বলা হয় বহির্ব্বস্তু নাই, ইহা প্রমাণসৌকর্য্যে বহির্বৎ বলা হইয়াছে, তদুত্তরে বলিতে হয়—বহির্ব্বিষয় থাকার সম্ভব অসম্ভবের কথা প্রমাণসাপেক্ষ হইবে। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ। যাহা প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই সম্ভব। বরং অপ্রত্যক্ষ যাহা, তাহা প্রমাণ নহে। তাহাই অসম্ভব। বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ। অতএব বাহ্যবস্তু অসম্ভব হয় না। বহির্ব্বিষয় জ্ঞান হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন, এই বিচার উপলব্ধির। ব্যতিরেক ও অব্যতিরেক এই দুই বিকল্পের দ্বারা জ্ঞানের আকারের সহিত বহির্ব্বিষয়ের আকারসাদৃশ্য এক হওয়া হেতু, বিষয় নাই, বলিতে আপত্তি কি? আপত্তি আছে। প্রথম কথা—বৈকল্পিক সিদ্ধান্ত যুক্তিসিদ্ধ নহে। দ্বিতীয়তঃ, জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞেয়ের সহোপলব্ধি নিয়ম আছে বলিয়া জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের মধ্যে সৌসাদৃশ্য থাকিতে পারে, বস্তুতঃ এই নিয়ম অভেদ-মূলক নহে। জ্ঞান—সাধ্য। জ্ঞেয় বিষয়—সাধক। জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের মধ্যে সাধ্য-সাধক ভাব আছে। বিষয়ের বৈচিত্র্য-

জ্ঞান বিষয়ের ভিন্নতাবশতঃই হয়। শ্বেত বস্ত্র বা পীত বস্ত্রের জ্ঞানে শ্বেত ও পীত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণজ্ঞান জন্মায়, কিন্তু বস্ত্রজ্ঞান অভিন্ন থাকে। ইহা হইতেই প্রমাণ হয়—বস্তু ও বস্তুবিষয়ক জ্ঞান পরস্পর ভিন্ন হয়। জ্ঞান কিন্তু সতত অভিন্নই। জ্ঞানের বিকার হয় না। ঘটের দর্শন ও স্মরণ, এই দুই ক্রিয়া পরস্পর বিভিন্ন; কিন্তু ঘট-বস্তুটার জ্ঞান তাহাতে ভিন্ন হয় না। কোন এক বস্তুর রস ও গন্ধ পরস্পর ভিন্ন, কিন্তু বিশেষণীভূত বস্তুর জ্ঞান অভেদ। বৌদ্ধরা বলেন—পূর্ব্ব ও পরের বিজ্ঞানদ্বয়ের গ্রাহ্য ও গ্রাহক এক নহে। তাহার কারণ দেখাইয়া তাঁহারা বলেন—ঘট-দর্শনের জ্ঞান ঘটরূপে প্রকাশিত হইয়া বিনষ্ট হয়, ইহার পরেও তদ্বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহাও ক্ষণ-ধ্বংসী। অতএব পূর্ব্বের বিজ্ঞান আর পরবর্ত্তী কালের বিজ্ঞানের সংযোগ নাই। বিজ্ঞান যদি এমনই অস্থায়ী হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধমতবাদীদের ক্ষণিকত্ব সলক্ষণ সামান্য, বাস্য-বাসকত্ব, সদসৎ ধর্ম্ম, বন্ধ-মোক্ষ, এই সকল পদার্থ কেমন করিয়া স্বীকার করা যায়? সলক্ষণ অর্থে, সম-লক্ষণযুক্ত বহু ব্যক্তির মধ্যে একের অস্তিত্ব। সামান্য অর্থে অনেকে অনুগত, কিন্তু প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্নরূপে জ্ঞেয় হয়। গো সলক্ষণ, বহু গরুর মধ্যে 'গো'র অস্তিত্ব অস্বীকার্য্য নহে। গোত্ব তৎসামান্য। বৌদ্ধ বিজ্ঞানের এইরূপ পদার্থনির্ব্বাচন অযৌক্তিক; কেননা, যে ক্ষেত্রে জ্ঞাতার অস্তিত্বই অস্বীকৃত, সেখানে এই সমস্ত জ্ঞান সিদ্ধ হয় কোন আশ্রয়ে? বৌদ্ধ বিজ্ঞানে বাস্যবাসকত্ব পদার্থও ভিত্তিহীন। বস্তুর পূর্ব্বজ্ঞান বাসক। পরবর্ত্তী জ্ঞান বাস্য। জ্ঞাতার অস্তিত্ব নিরবচ্ছিন্ন নহে বলিয়া এই প্রতিজ্ঞাও অযুক্ত হয়। এইরূপ সৎ-অসৎ বন্ধন-মুক্তি, অবিদ্যা-সম্বন্ধ এই সকলই স্থায়ী জ্ঞান। বৌদ্ধমতে স্থায়ী বোদ্ধা না থাকায়, বৌদ্ধদের পদার্থনির্ণয় অসমঞ্জস। বৌদ্ধেরা বিজ্ঞান স্বীকার করেন, তাহা অনুভব্য। তাঁহারা দৃশ্যমান জগৎ স্বীকার করেন না, উহা অনুভূতি-গ্রাহ্য বিজ্ঞানের ছায়া-মূর্ত্তি। বেদান্তবাদী বলিতে পারেন—দৃশ্যমান জগৎও অনুভব্য। অতএব বাহ্যবস্তু অস্বীকার করিব কেন? বিজ্ঞানবাদী তদুত্তরে বলিবেন—বিজ্ঞান স্বয়ং প্রকাশমান, বহির্ব্বস্তু তদ্রূপ নহে, উহা বিজ্ঞানের দ্বারাই অনুভূত হয়; এই গৌণ বহির্ব্বস্তু বিজ্ঞানের অবভাস মাত্র। অতএব বিজ্ঞানই সত্য। বৈদান্তিকেরা বলিবেন—অগ্নি অগ্নিকে দগ্ধ করে বলার ন্যায় বিজ্ঞান স্বয়ং অনুভূত হয় বলা একই কথা; পরন্তু বস্তু ভিন্ন বিজ্ঞানও যখন অনুভূত হয় না, তখন বস্তুকে অস্বীকার করার হেতু কি আছে? বৌদ্ধেরা আশঙ্কা করিতে পারেন—বস্তু স্বীকার করিলে অর্থাৎ বিজ্ঞানানুভূতির জন্য বস্তুর অপেক্ষা আছে বলিলে একের দ্বারা অন্য গ্রাহ্য হয়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ হইলে, পর পর এক হইতে অন্য, আবার অন্য হইতে এক, এইরূপ ক্রমানুসরণ-নীতিই আশ্রয় করিতে হইবে; ইহাতে অনবস্থা দোষ আসিবে। এক জ্ঞানের জন্য জ্ঞানান্তরের কল্পনা করিতে হইবে। ইহাতে প্রকাশ্য ও প্রকাশক ভাব অনুপপন্ন হয়। কিন্তু এই আশঙ্কা অনর্থক। যেহেতু বিজ্ঞানগ্রহণকারী ও বিজ্ঞান-সাক্ষী, এই দুই জ্ঞান পরস্পর বিষম-স্বভাব-সম্পন্ন। সাক্ষী স্বয়ংসিদ্ধ অবিনাশী। কিন্তু জন্য জ্ঞানের জন্ম-বিনাশ আছে। ঘটাদির দৃষ্টান্তে উহা বুঝা যাইবে। ঘট নিজের জন্ম-বিনাশ জানে না, কিন্তু তৎগ্রাহক যে জ্ঞান, তাহার সে আকাঙ্ক্ষা আছে। এই গ্রহণকারী জ্ঞান—ইহা জন্য জ্ঞান। ইহা উৎপন্ন হয় ও বিনষ্ট হয়। কিন্তু আত্মচৈতন্যরূপ সাক্ষী আপনার অস্তিত্বে ও প্রকাশে সতত অনপেক্ষ অর্থাৎ সিদ্ধ। এই হেতু সাক্ষী ও জন্য জ্ঞান এক নহে। এক নহে, এইজন্যই দৃষ্ট বস্তু জ্ঞানোৎপত্তির কারণ হইলেও, মূল তত্ত্বনিরূপণে এই নীতি যুক্ত নহে। বৌদ্ধের বিজ্ঞান-বাদ স্বতঃপ্রকাশ—উহা সাক্ষী-শূন্য ও সাক্ষি-বর্জ্জিত বলা হইয়াছে। বৈদান্তিকেরা ইহা স্বীকার করেন না। বিজ্ঞানও প্রদীপাদির ন্যায় কোন এক অলক্ষ্য বস্তুর প্রকাশ। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর-বস্তুই তাহার সাক্ষী। বৌদ্ধের বিজ্ঞানও সাক্ষি-বেদ্য, অতএব উহা আদ্যতত্ত্ব নহে।

বৈধর্ম্ম্যাৎ চ ন স্বপ্নাদিবৎ ॥২৯॥

বৈধর্ম্ম্যাৎ (জাগ্রত অবস্থা, স্বপ্নাবস্থা ও ইন্দ্রজাল অবস্থায় বিষয়ানুভবের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে অতএব) 'ন স্বপ্নাদি বৎ' (বাহ্য বস্তু স্বপ্নের ন্যায় অলীক নহে)।

বৌদ্ধবাদীরা যে বলেন, বাহ্যবস্তু ইন্দ্রজাল বা স্বপ্নাদির ন্যায় বিনা অবলম্বনে পরিদৃষ্ট হয়, এই কথার প্রতিবাদে

বলা হইতেছে যে, স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তি স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সত্য নহে বলিয়া অনুভব করে। ইন্দ্রজালও যে মিথ্যা দর্শন, ইহা জানিয়াই মানুষ দেখিয়া থাকে। জাগ্রত দৃষ্টি এইরূপ মিথ্যার বিষয় হয় না। স্বপ্ন স্মৃতিগ্রাহ্য জাগ্রত উপলব্ধি-গম্য। স্মৃতি ও উপলব্ধি এক নহে। উপলব্ধি বিদ্যমান বিষয়ে উৎপন্ন হয়, স্মৃতি অবিদ্যমানবিষয়ক। শোকার্ত্ত পিতা পুত্রকে স্মরণ করে, পুত্রের অবিদ্যমানতাবশতঃ তাহাকে উপলব্ধি করিতে পারে না। স্বপ্ন ও জাগ্রত পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মসম্পন্ন। এই হেতু বৌদ্ধদের এই দৃষ্টান্ত যুক্তিযুক্ত নহে

ন ভাবঃ অনুপলব্ধেঃ ॥৩০॥

ভাবঃ (সত্তা বা অস্তিত্ব) ন (সম্ভব হয় না, কেন সম্ভব হয় না ? যে হেতু) অনুপলব্ধেঃ (অনুপলব্ধি বস্তুর বাসনা জন্মিতে পারে না)।

বৌদ্ধেরা আরও বলেন—দৃশ্যবস্তু নাই, কিন্তু বাসনা-বৈচিত্র্য হেতু বিচিত্র জ্ঞান উপপন্ন হয়। উপরোক্ত সূত্রে তাই বলা হইয়াছে যে, বৌদ্ধমতে বাহ্য বস্তুর অস্তিত্বই যখন অস্বীকার্য্য, তখন বাসনা কি জন্য জন্মিবে ? যদি বলা যায়—বাসনা বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনাদি যুগ বর্ত্তমান আছে, তাহা বলিলেও অনবস্থা দোষ আসিবে, অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না। বৌদ্ধেরা বলেন যে, বাসনামূলক জ্ঞান বাহ্যবস্তুমূলক নহে, যে হেতু বিনা বাসনায় জ্ঞানোৎপত্তি হয় না, এই উক্তির ভিত্তি নাই। কেননা, বাসনা একপ্রকার সংস্কার। সংস্কার বিষয় আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয় ও বিদ্যমান থাকে। বাসনার আশ্রয় নাই, অথচ বাসনাই বিচিত্র জ্ঞানোৎপত্তির হেতু—এইরূপ কথা কেমন করিয়া সঙ্গত হইবে ? যদি বলা হয়—

ক্ষণিকত্বাচ্চ ॥৩১॥

ক্ষণিক বলিয়া বাসনার আশ্রয় নাই।

বৌদ্ধবাদীরা বলেন—বাসনার আশ্রয় আলয়বিজ্ঞান; কিন্তু তাঁহাদেরই মতে, তাহারও স্বরূপ বিজ্ঞানের ন্যায় ক্ষণিক। যাহা ক্ষণিক, নিশ্চয় তাহার পূর্ব্ব, মধ্য ও পর নাই, যাহা ধ্বংসাদিপরিশূন্য, তাহা বাসনার আশ্রয় হইতেই পারে না। দেশকালাদিঘটিত বাসনা, স্মৃতি ও প্রতিসন্ধানাদি সবই অসম্ভব হইয়া পড়ে। আলয়বিজ্ঞান অক্ষণিকও বলিতে পারা যায় না। ইহা বলিলে ক্ষণিকবাদের অপলাপ হয়। বাহ্যার্থবাদী ও বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের মতবাদ খণ্ডন করা হইল। শূন্যবাদীর মতবাদ সর্ব্বপ্রমাণবিরুদ্ধ; অতএব উহা নগণ্য বোধেই নিরাকৃত করার প্রযত্ন ব্যাসদেব করিলেন না।

সর্ব্বথা অনুপপত্তেঃ চ ॥৩২॥

সর্ব্বথা অনুপপত্তেঃ চ (যুক্তিত্বের অভাবে বৈনাশিকের মতবাদ অনাদরণীয়)।

বৌদ্ধমতের খণ্ডন করিয়া এইবার বিবসন অর্থাৎ দিগম্বর জৈনদের মতবাদ খণ্ডনের জন্য পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা করা হইতেছে।

ন একস্মিন্ অসম্ভবাৎ ॥৩৩॥

ন (যুক্তিসিদ্ধ নহে) [কি যুক্তিসিদ্ধ নহে ?] একস্মিন্ অসম্ভবাৎ (একধর্ম্মে যুগপৎ বহু বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ সম্ভব হয় না)।

জৈন সম্প্রদায় দুই ভাগে বিভক্ত। এক শ্বেতাম্বর জৈন, অন্য দিগম্বর জৈন। দিগম্বর জৈনদের বিবসন বলা হয়। বিবসন জৈনেরা সাতটী পদার্থ স্বীকার করেন। এই সাত পদার্থের নাম জীব, অজীব, আস্রব, সম্বর, নির্জ্জর, বন্ধ ও মোক্ষ। ইহাদের মধ্যে জীব ও অজীব পদার্থই প্রধান। অপর পাঁচটী পদার্থ এই দুয়েরই বিস্তার বলিয়া স্বীকৃত হয়। জৈনদের যুক্তিশাস্ত্রের নাম সপ্তভঙ্গী নয়। অর্থাৎ সাত প্রকার ভঙ্গ অথবা বিভাগ আছে। নয় শব্দের অর্থ ন্যায় বা যুক্তি। এই বিভাগগুলির নাম স্যাদস্তি, স্যান্নাস্তি, স্যাদবক্তব্য, স্যাদস্তি চ নাস্তি চ, স্যাদস্তি চ বক্তব্য, স্যান্নাস্তিচাবক্তব্য, স্যাদস্তি চ নাস্তিচাবক্তব্য। স্যাদ অর্থে কথঞ্চিৎ। বা কোন এক প্রকার। অস্তি শব্দের অর্থ 'আছে'। স্যাদস্তি বলিলে বুঝায়—এক প্রকারে আছে। স্যান্নাস্তি বলিলে বুঝাইবে বস্তু এক প্রকারে আছে বটে, কিন্তু অন্য প্রকারে নাই বলাও চলে। যেমন ঘট আছে, কিন্তু প্রাপ্যরূপে নাই। ঘটরূপে থাকা সদস্তি; ঘট যখন প্রাপ্যরূপে নাই অর্থাৎ তাহা পাওয়ার জন্য যখন চেষ্টা করিতে হয়, তখন তাহা

াস্নাস্তি। ঘট থাকিলেও প্রাপ্যরূপে যখন নাই, তখন ইহা একরূপে নাই বলাও চলে। অস্তি ও নাস্তি অর্থাৎ আছেও বটে, নাইও বটে, এইরূপ প্রশ্ন পূর্ব্বাপর উপস্থিত হইলে, স্যাদস্তি চ নাস্তি চ, এই তৃতীয় ন্যায়সূত্র প্রযুজ্য হইবে। আর এককালে যদি উক্ত উভয় প্রশ্ন উত্থিত হয়, তাহা স্যাদবক্তব্য যুক্তির দ্বারা প্রত্যুত্তর দিতে হইবে। অর্থাৎ বস্তু একরূপে আছে বলিবার যোগ্য, অন্যরূপে নাই বলিবারও যোগ্য। প্রথম ও চতুর্থ ভঙ্গ বিষয়ের উত্তর স্যাদস্তি চ অব্যক্তব্য এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ ভঙ্গ বিষয়ে স্যান্নাস্তি চ অবক্তব্য এবং তৃতীয় ও চতুর্থ ভঙ্গের উপর অস্তি নাস্তিচাবক্তব্য এই সপ্তম ন্যায়যোজিত হয়। জৈন মতে, বস্তুর এইরূপে নানারূপ প্রদর্শিত হয়। সর্ব্বাংশে বস্তু একরূপ হইলে, তাহার প্রাপ্তি ও পরিহারের আকাঙ্ক্ষা অসঙ্গত হয়। বস্তু নানারূপ বলিয়াই তাহার ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার চলিতে পারে। জৈনের সপ্তভঙ্গী নয়ের যুক্তিতে বস্তু একরূপে এক, অন্য রূপে বহু, এক রূপে নিত্য, অন্য রূপে অনিত্য বলিয়া স্বীকার করেন। বেদান্ত-মতে, ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ। কোন বস্তুকে যদি একরূপে শীতল, অন্যরূপে উষ্ণ বলা হয়, সেইরূপ কোন পদার্থই যুগপৎ এক ও বহু, নিত্য ও অনিত্য হইতে পারে না। জৈনদের যে সপ্ত পদার্থ, তাহা স্যাদস্তি যুক্তিতে এক প্রকারে আছে, অন্য প্রকারে নাই, এইরূপ হইলে পদার্থ সম্বন্ধে নিশ্চয় জ্ঞান জন্মিতে পারে না। যদি বলা যায়—পদার্থ মাত্রই এক প্রকারে একরূপ, অন্য প্রকারে বহুরূপ, এইরূপ জ্ঞান অনিশ্চিত হইবে কেন? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, পদার্থ মাত্রেই জৈনমতে স্যাদ্বাদে যুগপৎ বিরুদ্ধ-দ্বয়ের সমাবেশে তাহা এক প্রকারে আছে, অন্য প্রকারে নাই, এই অনির্দ্ধারিত রূপের নিশ্চয়জ্ঞান কোন মতেই সম্ভব নহে। পদার্থজ্ঞানে মানুষের ঐকান্তিকতা তখনই সম্ভব হয়, যখন সেই পদার্থ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা ভাব দূর হইয়া তদ্বিষয়ে নিশ্চয়প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়। জৈন মতে যে পাঁচটী অস্তিকার কথা আছে, তাহাতে আছে ও নাই, এই দুই ভাব বিদ্যমান থাকায়, পদার্থের না থাকা এবং থাকা, এই দুই দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। বিষয়বস্তুর অবধারণ সম্যক্ জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু নহে। প্রত্যেক বিষয় যদি অস্তি-নাস্তিগ্রস্ত হয়; স্বর্গ অপবর্গ, নিত্য অনিত্য সবই অনিশ্চিত হইয়া পড়ে। যদি বলা হয়, বস্তু এক প্রকারে আছে, অন্য প্রকারে নাই, এক প্রকারে নিত্য, অন্য প্রকারে অনিত্য—তাহাতেও বস্তুর নিশ্চয়জ্ঞান সম্ভব নহে। বস্তু এক প্রকারে সৎ, অন্য প্রকারে অসৎ, ইহা বলিলে এই পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্ম যুগপৎ সম্ভব হয় না, এক ধর্ম্ম থাকা কালে অন্য ধর্ম্মের সমাবেশ অতিশয় অসঙ্গত কথা। পরবর্ত্তী সূত্রে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

এবঞ্চ আত্মা-অকার্ৎস্ন্যম্ ॥৩৪॥

এবঞ্চ (এরূপ হইলে) আত্মা অকার্ৎস্ন্যম্ (আত্মার অনিত্যাদি দোষ উপস্থিত হয়)।

জৈনেরা আত্মাকে মধ্যম পরিমাণ বলেন। কোন এক পদার্থে যুগপৎ বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের সমাবেশ হইলে, তাঁহাদের এই মধ্যমপরিমাণতা মত রক্ষা পায় না। কেন, তাহা বলা হইতেছে।

জৈনেরা আত্মাকে শরীরপরিমাণ মনে করেন। আত্মা যদি শরীরপরিমিত হন, তবে তাহা পরিচ্ছিন্ন। যাহা পরিচ্ছিন্ন, তাহা নিত্য নহে। আত্মা জীবপরিমিত হইলে, আত্মা যখন হস্তী অথবা কীট-জন্ম লাভ করিবে, তখন এক শরীরপরিমিত আত্মা অন্য শরীরপরিমিত কি প্রকারে হইবে? যদি জন্মান্তর স্বীকার নাও করা হয়, তাহা হইলেও একই জন্মে বাল্য-যৌবন-বার্দ্ধক্যে জীব-পরিমিত আত্মা-শরীরের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা-বিশেষে সঙ্কুচিত ও বিস্তারিত হইবে। এইরূপ হইলে, সঙ্কুচিত হওয়ার কালে আত্মার কতকাংশ পরিত্যাগ করিতে হইবে। আর যদি বিস্ফারিত হয়, আত্মাকে বর্দ্ধিত হইতে হইবে। এইরূপ আত্মার মধ্যমপরিমাণতারূপ মতবাদ প্রলাপের মতই শুনায়। আত্মার সর্ব্বব্যাপিত্ব সর্ব্বজনস্বীকৃত। জীবপরিমাণ তাহার অস্তিত্ব কোন মতে স্বীকার্য্য নহে। অতএব আত্মার হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে অণুত্বই সিদ্ধ হয়। বৃহৎ শরীরে আত্মা তদনুযায়ী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, অল্পশরীরপ্রাপ্তিকালে তাহা তদনুযায়ী ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তাহার প্রতিবাদে বলা হইতেছে—

ন চ পর্য্যায়াৎ অপি অবিরোধঃবিকারাদিভ্যঃ ॥ ৩৫

অবিরোধঃ ন (বিরোধের নিরসন হয় না) [কুতঃ?]

বিকারাদিভ্যঃ (বিকারিত্বদোষপ্রসঙ্গ থাকা হেতু) পর্য্যায়াদপি (অবয়বের হ্রাসবৃদ্ধি স্বীকার করিলেও) ন অবিরোধঃ (জীবের দেহপরিমাণত্ব সিদ্ধ হইবে না)।

অর্থাৎ জৈনদের জীবদেহ পরিমিত, এই মতে, বৃহৎ দেহে উপচয় ও ক্ষুদ্র দেহে জীবের অপচয়, এই মত বিনা বিরোধে সিদ্ধ হয় না। জীবের হ্রাস-বৃদ্ধি থাকায় তাহা নির্ব্বিকার নহে, তাহা নিত্যও নহে; অতএব জৈন মতের বন্ধ-মোক্ষের প্রতিজ্ঞা ইহাতে কি ভাবে রক্ষিত হয়? শরীরের উপচয় অপচয়ও থাকা হেতু উহা যেমন আত্মা নহে, জীবের হ্রাস-বৃদ্ধি স্বীকার করিলে তাহাও তদ্রূপ অনাত্ম বস্তু হয়। এই দোষ পরিহার করার জন্য জৈন সম্প্রদায় যদি বলেন, স্রোত-সন্তানের ন্যায়ে জীবের হ্রাস-বৃদ্ধি থাকিলেও, উহা নিত্য। স্রোতঃ কি? না প্রবাহ। স্রোত-সন্তান অর্থে অহং-বুদ্ধির অবিচ্ছেদ প্রবাহ। বৌদ্ধদের এই মত পূর্ব্বেই খণ্ডন করা হইয়াছে। সন্তান যদি বস্তু হয়, তবে তাহা বিকারী হইবে। আর যদি অবস্তু হয়, তবে তাহা অনাত্ম হইবে। এই উভয় অবস্থাতেই জৈনের জীবমতবাদ অগ্রাহ্য হইতেছে।

অন্ত্য-অবস্থিতেঃ চ উভয়নিত্যত্বাৎ অবিশেষঃ ॥৩৬

অন্ত্য (শেষ বা মোক্ষ) অবস্থিতে চ (অবস্থায়ও) উভয়নিত্যত্বাৎ (আদি ও মধ্য অবস্থায় নিত্যত্ব হেতু) অবিশেষঃ (বিশেষরহিত হয়) অর্থাৎ জৈনেরা মোক্ষা-বস্থায় জীব-পরিমাণকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করে। যদি তাহাই হয়, আদ্য ও মধ্য অবস্থায় জীব-পরিমাণ নিত্য না হইবে কেন? এমন হইলে, সকল অবস্থাতেই জীব-পরিমাণ একই প্রকার হইল। জৈনেরা তাহা স্বীকার করেন না, জীব-পরিমাণের এক কালে নিত্যত্ব, অন্য কালে হ্রাসবৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকায়, জৈন মতে জীব-পরিমাণ মতবাদ অসঙ্গত বলিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

ক্ষ্যাপা বাউল

শ্রীক্ষীরোদবিহারী ভট্টাচার্য্য এম. এ.

একতারা আর মন্দিরাতে
সঞ্চারে সুর চমৎকার
গোবিন্দজীর মন্দিরে আজ
গাইছে বাউল ভজন সার।

বাউল ক্ষ্যাপা, নয় সে পাগল
সুর-মদিরায় দিল্ ভোলা;
ভক্তি রসাল সুর-সায়রে
যেন বেহাল তরী পাল তোলে।

ওরে, কার দরদের পরশ লাগি'
তোর চিত্ত-চকোর নৃত্যমাতাল?
সব-সাধনার মিট্‌ল কি সাধ
ওরে পাগল, ওরে কাঙাল।

সেই মধুর মিলন পরশ লাগি'
বধুর পায়ে সব বিলালি;
তোর উপ্‌চে পড়া চিত্ত মধু
নৃত্যগীতের অর্ঘ্য-ডালি।

বৃন্দাবনের অন্তরে আজ
সুর-বরষার মূর্চ্ছনায়—
প্রেম-বারিধি উথলে উঠে
বাউল ক্ষ্যাপার বন্দনায়।

রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চ

শ্রীতারাকিশোর বর্দ্ধন

হিটলারের সাফল্যের উৎস—

অবিরাম প্রচারকার্য্যের দ্বারা শত্রুপক্ষীয় জনসাধারণের চিত্ত বিভ্রান্ত করিয়া জার্ম্মাণবাহিনীর কর্ণধারগণ এত সুকৌশলে রণনীতির পরিচালনা করেন যে, বিশ্বের সামরিক ইতিহাসে আর উহার তুলনা পাওয়া যায় না। কিন্তু কোন্ সুক্ষ্মদর্শী রাষ্ট্রনীতিবিদের অত্যদ্ভুত সংগঠন-শক্তির বলে আজ হিটলারের দুর্জ্জয় রথচক্র ইউরোপের পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব্ব প্রান্ত পর্য্যন্ত যাবতীয় বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অবহেলায় অবিরাম গতিতে প্রধাবিত হইতেছে, তাহার খবর হয়ত অনেকেই অবগত নহেন। এই অদ্ভুতকর্ম্মা মনীষির নাম প্রফেসার, ডাক্তার কার্ল হাউসফার এবং উঁহার প্রতিষ্ঠানটীর নাম হইতেছে জিও-পলিটিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট। বিগত মহাসমরের পর হিটলার যখন রাজনীতিতে পদার্পণ করিবার সঙ্কল্প করেন, সেই সময়ে হিটলারের পার্শ্বচর হেস্ (Hess) উক্ত প্রফেসারের বক্তৃতায় আকৃষ্ট হন। হেসের মধ্যস্থতায় হিটলার তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় উঁহারা উভয়ে একমত হন। হিটলারের আর্য্যরক্তের বিশুদ্ধিতা-সম্পাদনমূলক নাৎসী মতবাদ এই প্রফেসারের নিকটে বহুল পরিমাণে ঋণী। মেইন্-ক্যাম্প নামক গ্রন্থে ইহা হিট্‌লারও একরূপ স্বীকার করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের ষোড়শ অধ্যায়টী (রাষ্ট্রীয় কূটনীতিবিষয়ক অধ্যায়) নাকি উক্ত প্রফেসারেরই উক্তি হইতে লিখিত হইয়াছে। প্রফেসার হাউসফারের জিও-পলিটিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট একটী বিরাট্ প্রতিষ্ঠান। উহাতে প্রফেসারের এক সহস্র শিষ্য আছে। উঁহাদের কেহ প্রাণিতত্ত্ববিদ্, কেহ ভূতত্ত্ববিদ, কেহ আবহবিদ, কেহ কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ বিশেষজ্ঞ আর কেহ বা গুপ্তচর। এই প্রতিষ্ঠানের উপর জার্ম্মাণপুলিশ বা সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ কোনও প্রকার প্রভাব খাটাইতে পারে না। পরন্তু উঁহারা এই প্রতিষ্ঠানটীর সর্ব্বতোভাবে সহযোগিতা করে। পৃথিবীর উপর জার্ম্মাণ প্রাধান্য কায়েম করাই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। শুধু সৈন্যবিভাগের দ্বারা এই কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না। সৈন্যবাহিনীকে কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক যত উপায়ে সাহায্য করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত, তাহা যথাসময়ে যথারীতি করিবার জন্যই প্রফেসার এই প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া তুলিয়াছেন এবং প্রফেসারের পরামর্শে জার্ম্মাণ সৈন্যদল উপকৃত হইতেছে বলিয়াই হিটলারও আজ এই প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত হইতে বাধ্য হইয়াছেন।

১৯৩৮ সালে যখন সুদেতেনল্যাণ্ডের ব্যাপারে পৃথিবীর চারিধারে সাজ-সাজ রব পড়িয়া যায়, তখন জার্ম্মাণ সৈন্যবিভাগের বড় কর্ত্তাগণ হিটলারের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের ভয় ছিল যে, এই ব্যাপারে ফরাসী সৈন্যদল জার্ম্মাণী আক্রমণ করিয়া বসিবে। কিন্তু প্রফেসার বলিয়াছিলেন যে, ফ্রান্স এখন যুদ্ধে ইচ্ছুকও নয়, সমর্থও নয়! প্রফেসারের উক্তি যথার্থ বলিয়া পরে প্রমাণিত হইয়াছিল। এবারের যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন যে, ১৮ দিনে পোল্যাণ্ড দখল হইয়া যাইবে। জার্ম্মাণ সেনাপতি ব্রাউসিচ্ সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন যে, এ সময়ে বৃষ্টি হইবে এবং পোল্যাণ্ডের কর্দ্দমের মধ্যে ট্যাঙ্ক আটকাইয়া যাইবে। কিন্তু প্রফেসার জোর করিয়া বলিয়াছিলেন, যে ১৮।২০ দিনের মধ্যে পোল্যাণ্ডে বৃষ্টি হইতে পারে না। আবহবিদ্যার সাহায্যে প্রফেসার একথা বলিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার উভয় উক্তিই সত্য হইয়াছিল, পাঠকেরা তাহা জানেন। নরওয়ের যুদ্ধ ব্যাপারে বড় বড় সেনাপতিগণ বৃটিশ নৌবহরের ভয়ে বড়ই ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। কিন্তু প্রফেসার বলিলেন—"ভয় নাই, উহা দু'দিনের ব্যাপার।" পোল্যাণ্ডের পতনের পরই সেনাপতি ব্রাউসিচ্ ফ্রান্স আক্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন; কিন্তু প্রফেসার বলিলেন—"সবুর কর, আমার প্রচারবিভাগের ক্রমাগত চেষ্টায় ফরাসীর শক্তিসৌধে আগে ঘুণ ধরুক, তারপর তোমরা আক্রমণ করিবে।" পাঠক জানেন যে, উহার আট মাস পরে জার্ম্মাণরা ফ্রান্স আক্রমণ করে।

উহাতে ফরাসী দেশের পতনের একটী কারণের সন্ধান আমরা এখানে পাইতেছি। তাঁহার নির্দ্দেশানুসারেই আফ্রিকা ও বল্‌কানের যুদ্ধ আরম্ভ করা হইয়াছিল।

প্রত্যেক দেশের দুর্ব্বলতা কোথায়, সবলতা কোথায়, উহার অর্থনৈতিক সামর্থ্য কত দূর, জনসাধারণের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মতিগতি ও চরিত্র এবং ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিমূলক যাবতীয় তথ্যই এই প্রতিষ্ঠানের করতলগত। গুপ্তচর বিদ্যা, অর্থনীতি, রণনীতি, রাজনীতি, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও দর্শন এই সমস্ত শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ সহস্র শিষ্যে পরিবৃত হইয়া প্রফেসার হাউসফার এত বড় এক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন—পৃথিবীতে যাহার তুলনা নাই। প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক খুঁটিনাটি খবর সংগ্রহ করিয়া যে ভাবে সাজাইয়া রাখা হয়, তাহাকে strategic index বলে। কোথায় দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, কোথায় নূতন রাষ্ট্রীয় দল গড়িয়া উঠিয়াছে, কোথাও বা ধর্ম্মমতের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইয়াছে—কোথায় বা একজন বিশিষ্ট নেতার আবির্ভাব বা তিরোভাব ঘটিয়াছে, অমুক দেশের অমুক নেতার রুচি কি প্রকার, অথবা অমুক দেশের অমুক বিভাগের কর্ম্মচারী দল অত্যন্ত ঘুষখোর ইত্যাদি—এই প্রকারের বিষয় লইয়াই প্রফেসর তাঁহার গবেষণাকার্য্য চালাইয়া থাকেন। এবং এই সব বিষয়গুলিকে তিনি শত্রুদেশের কামানের সংস্থান মূলক খবর হইতে কম মূল্যবান্ মনে করেন না। কখন এবং কোথায় হিট্‌লার তাঁহার গুপ্তচরবাহিনী লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিবেন, কখন এবং কোথায় সেনাপতিগণ সৈন্য-বাহিনী পরিচালনা করিবেন অথবা রিবেনট্রপ কখন এবং কোথায় তাঁহার কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করিবেন, তিনি তাহার পথনির্দ্দেশ করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি জার্ম্মাণীর মস্তিষ্ক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নেপোলিয়ন, সিজার, আলেকজেণ্ডার বা পৃথিবীর অন্য কোনও দিগ্বিজয়ী এই প্রকারের প্রতিষ্ঠানের সহায়তা প্রাপ্ত হন নাই।

ফরাসীর পতনের কারণ—

বর্ত্তমান শতাব্দীর ভীষণতম সময়ের জটিলতার মধ্য হইতে ফরাসী দেশের পতনের সমগ্র কারণ খুঁজিয়া বাহির করিবার সময় এখনও আসে নাই। এ পর্য্যন্ত বিভিন্ন দেশের মারফতে যতটুকু খবর আমরা পাইতেছি, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই এ বিষয়ে একটু আলোচনা করিব। ফরাসীর পতনের একটী কারণের সন্ধান উপরে বর্ণিত জিও-পলিটিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের কার্য্যপদ্ধতির মধ্যে পাওয়া যাইবে। তাহা ছাড়া আমরা সাংগ্রামিক কারণগুলিরই এখানে আলোচনা করিব। ফ্রান্স জয় করিতে জার্ম্মাণী বিমান বহরের অপেক্ষা ট্যাঙ্কের উপরে বেশী নির্ভর করিয়াছিল। ইংরাজ ও ফরাসীর ট্যাঙ্কের ওজন পঁচিশ টনের বেশী ছিল না। কিন্তু জার্ম্মাণী ৮০ টন ওজনের ভারী ট্যাঙ্কের ব্যবহার করিয়াছিল এবং তাহা আবার প্রভূত পরিমাণে। বিমানসংগ্রামে ফরাসীরা কোনও প্রকার ন্যূনতা প্রকাশ করে নাই। একজন ফরাসী বৈমানিক এবং একজন জার্ম্মাণ বৈমানিকের মধ্যে যুদ্ধ হইলে, ফরাসী বৈমানিক কখনও পরাস্ত হয় নাই। কিন্তু ফরাসী বিমানবহরের সংখ্যা যেখানে দুই হাজার, সেখানে জার্ম্মাণীর বিমানসংখ্যা সাড়ে নয় হাজার। ফ্রান্স ইংলণ্ডের সাহায্য পাইতেছিল, একথা সত্য। কিন্তু ইংলণ্ড ও ফরাসী একত্র হইয়া যেখানে তিনটী বিমান আনিতে পারিয়াছিল, সেখানে জার্ম্মাণী পাঁচটী বিমান ব্যবহার করিয়াছিল। এভাবে বিমানবহর ও ট্যাঙ্কবাহিনীর স্বতন্ত্রতার কারণ নির্ণয় করিতে হইলে যুদ্ধের পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের ফরাসী ও জার্ম্মাণীর অর্থনৈতিক অবস্থা এবং উভয় দেশের রণনীতির পরিকল্পনা অধ্যয়ন করিতে হয়। তাহাতে আমরা স্থূলতঃ তিনটী কারণের সন্ধান পাইতে পারি। প্রথমতঃ, যুদ্ধপূর্ব্বের পাঁচ বৎসরে ফরাসী দেশে উৎপাদিত পণ্যের তুলনায় জার্ম্মাণীর উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ ৭ গুণ বেশী। দ্বিতীয়তঃ, এক দিকে কৃষিজীবি চারি কোটী ফরাসী, অন্য দিকে শ্রমশিল্পজীবি ৮ কোটী জার্ম্মাণ। সুতরাং কলকব্জার উৎপাদন-ক্ষমতা জার্ম্মাণীর অনেক বেশী এবং ঠিক এই জন্যই জার্ম্মানীর ট্যাঙ্কবাহিনী ও বিমান-বহরের সংখ্যাধিক্য। বিংশ শতাব্দীর কৃষি-জীবিকার উপরে শ্রমশিল্পের প্রাধান্য স্বাভাবিক। তৃতীয়তঃ, ফরাসীর সামরিক পরিকল্পনা স্থিতিশীল। চীন দেশের সুবৃহৎ প্রাচীরনির্ম্মাণের পিছনে যে মনোবৃত্তি কার্য্য করিতেছিল, ফরাসীর ম্যাজিনো লাইনও সেই প্রকার

মনোবৃত্তির পরিণাম ফল। ম্যাজিনো লাইনের পেছনে দাঁড়াইয়া আত্মরক্ষা করিব—বেশী নড়চড় করিতে হইবে না; একদিকে এই প্রকার মনোভাব, ইহাকে বলে স্থিতিশীল যুদ্ধ (war of position)। অপর দিকে জার্ম্মাণীর সমর-পরিকল্পনা সর্ব্বাংশে গতিশীল (dynamic)। ফরাসীর ষ্ট্রাটেজির মূলে কল্পনাশক্তির অভাব এবং স্থির সঙ্কল্পের অভাব বর্ত্তমান থাকিয়া ফরাসীর যুদ্ধকে একটী war of attrition-এ পরিণত করিয়াছিল। অন্যদিকে জার্ম্মাণ ষ্ট্রাটেজির মূলে সুদূরপ্রসারী কল্পনা-শক্তির সঙ্গে সঙ্গে নব যৌবনের উদ্ধত তেজস্বিতা বর্ত্তমান থাকিয়া উহাকে তাহারা 'war of decision'-এ পরিণত করে।

এবারে ফরাসীর পরাজয়কে শুধু সামরিক পরাজয়ের সংজ্ঞায় অভিহিত করা যাইবে না। সামরিক পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক, এই চতুর্ব্বিধ পরাজয়ও ফরাসীর ঘটিয়াছে।

আটলাণ্টিকের জলযুদ্ধ—

রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধের প্রচণ্ড উন্মাদনায় আটলান্টিকের জলযুদ্ধের প্রতি জনসাধারণের তেমন মনোযোগ আকৃষ্ট হইতেছে না। কিন্তু পৃথিবীর জলযুদ্ধের ইতিহাসে ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ফ্রান্সের পতনের পূর্ব্বে জার্ম্মাণীর সাবমেরিণ শুধু উত্তর সাগরে ঘুরিয়া বেড়াইত। সময়ে সময়ে ২।৪টা সাবমেরিণ আটলান্টিক মহাসাগরে উপস্থিত হইয়া দস্যুবৃত্তি করিত। তখন জার্ম্মাণ বিমানবহর সাবমেরিণের সাহায্য বিশেষভাবে করিতে পারিত না। কারণ নরওয়ের উপকূলে অবস্থিতি বিমানবহরের পক্ষে এত দূরত্ব অতিক্রম করিয়া জাহাজের উপর বোমা-বর্ষণ করার অসুবিধা ছিল বিস্তর। আবার ইংলণ্ডও আত্মরক্ষার জন্য সমগ্র পূর্ব্ব উপকূলে মাইন দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছিল এবং তাহার বেলুন ব্যারেজ ব্যবস্থার জন্যও জার্ম্মাণ বিমান-বহরের পক্ষে ইংলণ্ডের উপকূলে রাত্রিতে হানা দেওয়া যথেষ্ট বিপৎসঙ্কুল ছিল। ইংলণ্ডের পশ্চিম উপকূলে কোনও মাইন ছিল না এবং সেদিকে নিরাপদেই জাহাজের গতি-বিধি চলিতে পারিত।

কিন্তু ফরাসীর পতনের পর হইতে আটলান্টিকের ঝাঁক এবারের নূতন পর্ব্ব। নৌযুদ্ধের একটী বিশেষ সঙ্কটপূর্ণ পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইয়াছে। বৃটেন আর ফরাসীর নিকট হইতে কোনও সাহায্য পাইতেছে না, অপর পক্ষে জার্ম্মাণী তখন হইতেই ইটালীয় নৌবহরের সহায়তা লাভ করিয়াছে। ফরাসী বিমানঘাঁটিগুলি জার্ম্মাণীর দখলে আসায় জার্ম্মাণী তাহার সাবমেরিণ ও নৌবিমানের সহায়তায় আটলান্টিকে বিরাট তাণ্ডব আরম্ভ করিয়াছে। তাহার ফলে ইংলণ্ডের চারিদিকেই জাহাজ-ডুবি হইতেছে। পূর্ব্বে কেবল উত্তর সাগরে জাহাজ-ডুবি হইতেছিল; এখন আটলান্টিকের বিরাট্ বক্ষের সর্ব্বত্রই জাহাজ-ডুবি হইতেছে।

ফরাসীর ফ্যাক্টরী-শিল্প জার্ম্মাণীর নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হওয়ায়, এখন প্রতি মাসে ২৫টী করিয়া সাবমেরিণ উৎপন্ন হইতেছে। ছোট ছোট সাবমেরিণ কতকগুলি দলবদ্ধ-ভাবে একটী বড় সাবমেরিণের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হইয়া থাকে। ঐ বড় সাবমেরিণটী দূরবর্ত্তী বিমান-ঘাঁটির সঙ্গে বেতার সম্বন্ধ বজায় রাখিতে পারে। সুতরাং এই ব্যবস্থায় তাহারা প্রত্যেকটী কন্ভয়ের গতিপথ লক্ষ্য করিতে পারে। পূর্ব্বের ব্যবস্থায় এক একটী সাবমেরিণ স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিত। কিন্তু বর্ত্তমান ব্যবস্থায় এক ঝাঁক সাবমেরিণ পেরিস্কোপ ভাসাইয়া জলের নীচে আত্ম-গোপন করিয়া থাকে এবং বিমান-দূতের নিকট হইতে বেতারযোগে শীকারের খবর পাওয়া মাত্রই চারিদিক্ হইতে উহার উপর আক্রমণ করিতে থাকে। সওদাগরী জাহাজের প্রহরী কার্য্যের যেরূপ ব্যবস্থাই করা হউক না কেন, এই প্রকার চোরাগুপ্তার আক্রমণ হইতে সহজে নিস্তার পাওয়া যায় না।

বর্ত্তমান সময়ে আইসল্যাণ্ডের পশ্চিমে ৭০০ মাইল পর্য্যন্ত স্থানটুকু জাহাজের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। ঐ অঞ্চলে কন্ভয় প্রবেশ করা মাত্রই বোমারু বিমান-গুলি বোমা বর্ষণ করিতে থাকে; তার উপর সাবমেরিণের ঝাঁক তো আছেই। জার্ম্মাণীর বৃহত্তর সাবমেরিণগুলি তাহাদের রণতরীর সহায়তায় আটলান্টিকের সর্ব্বত্রই ঘুরিয়া বেড়ায়। এই ব্যবস্থা অবশ্য তাহারা বিগত মহা-সমরে অবলম্বন করিয়াছিল। কিন্তু ছোট সাবমেরিণের

আটলান্টিকের এই ভীষণ বিপদের প্রতিকারার্থ আমেরিকা তাহার নৌবহরের উপরে উপযুক্ত দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে, তাহাতে আশা করা যায় যে, আটলান্টিকে নাৎসীদলের জলদস্যুতার উপশম ঘটিবে।

রুশ-জার্ম্মান সংগ্রাম—

রুশ-জার্ম্মাণ মহাসমরের আজ পাঁচ মাস অতিক্রান্ত হইয়াছে। ইতিমধ্যে কিয়েভ ও ওডেসার পতন ঘটিয়াছে। লেনিনগ্রাড চারিদিক্ হইতে অবরুদ্ধ হইয়াছে। মধ্য রণাঙ্গনে জার্ম্মাণবাহিনী মস্কো নগরীর ৩৫ মাইলের মধ্যে উপনীত হইয়া উহাকেও চারিদিক্ হইতে ঘিরিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে। দক্ষিণ রণাঙ্গনে রোষ্টভ ও খারকভ্ নগরীদ্বয়ের উপরে প্রচণ্ড আক্রমণ চলিয়াছে। দুই হাজার মাইল দীর্ঘ রণাঙ্গনের সর্ব্বত্রই উভয় পক্ষ ভীম পরাক্রমে বল পরীক্ষায় প্রবৃত্ত আছে। ইতিমধ্যে রুশিয়ার যতটুকু স্থান জার্ম্মাণীর করায়ত্ত হইয়াছে, তাহার পরিমাণ ১৯৩৯ সালের জার্ম্মাণীর দ্বিগুণ। ঐ অধিকৃত অঞ্চল জনপূর্ণ ও শস্যপূর্ণ; তাহা ছাড়া সোভিয়েট রুশিয়ার উৎপন্ন শিল্পজাত দ্রব্যের শতকরা সত্তর (৭০%) ভাগ ঐ অধিকৃত অঞ্চল হইতে সরবরাহ করা হইত। সুতরাং বিবদমান পক্ষদ্বয়ের সীমারেখা যদি আজিকার মতই থাকে, তথাপি একথা বলা যাইতে পারে যে, যুদ্ধ যতই দীর্ঘদিন স্থায়ী হইবে, রসদ সরবরাহের অভাবে রুশপক্ষ ততই দুর্ব্বল হইতে বাধ্য। তবে ইরানের মধ্য দিয়া যদি ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রচুর দ্রব্যসম্ভার রুশিয়াকে সরবরাহ করিতে পারে—তবেই রুশিয়ার প্রতিরোধ-ক্ষমতা বাড়িবার সম্ভাবনা।

নাৎসী জগৎপ্রাধান্যের বিপক্ষে একমাত্র রুশিয়াই বিরাট্ দুর্গপ্রাকারের ন্যায় সগর্ব্বে এখনও দণ্ডায়মান। এ সময়ে ইংলণ্ড ও আমেরিকার সাহায্যপ্রদানের প্রাচুর্য্যের উপরেই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ইতিহাস নির্ভর করিতেছে।

সাময়িক সাহিত্য

শূলপাণি

বঙ্গশ্রী—কার্ত্তিক, ১৩৪৮ঃ

একটি সুস্থ ও সবল ভাবধারার অনুবর্ত্তী হইয়া 'প্রবর্ত্তক'-এর পৃষ্ঠায় 'সাময়িক সাহিত্যে'র অবতারণা হইয়াছে—কোন বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া নহে। এই বিভাগটি পরিচালনা করিতে গিয়া আমরা নিন্দা ও প্রশংসা সমভাবে কুড়াইয়াছি, সমালোচনা করিতে বসিলে নিন্দা-স্তুতির এই বাঁধা বরাদ্দ সমালোচককে অবিচলিতভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, উপায় নাই! নিন্দা করিলেই যাঁহারা উগ্র হইয়া ওঠেন এবং প্রশংসায় যাঁহারা বিগলিত হইয়া পড়েন, তাঁহাদের নিন্দা-প্রশংসার মূল্য খুব বেশী নয়। ইহা সত্ত্বেও আমরা দেখিয়াছি—কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের সমালোচনা করিতে বসিয়া আমাদের বক্তব্যটুকু বুঝিতেও [illegible] স্বীকার করেন না। সম্প্রতি কার্ত্তিকের [illegible] আমরা এই ধরণের ভুল বোঝার পরিচয় পাইয়াছি। ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, সমালোচক মহাশয় আমাদের বক্তব্যের মূল সুরটুকু ধরিতে পারেন নাই। একটু রহস্যের আবরণ দিয়া যে সরল কথাগুলি বলা হইয়াছিল, তাহাকে নিরলঙ্কৃত করিয়া প্রকাশ করিলেই যে সমালোচনার বাহাদুরী প্রকাশ পাইত, তাহা আমরা মনে করি না। এবং এই না-বুঝার ফলে সমালোচক আমাদের প্রতি যে দোষারোপ করিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রাপ্য নয়! 'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং'—এই প্রাচীন বাক্যটি যে নিরর্থক নয়, তাহা বুঝিবার সুযোগ দিয়াছেন বলিয়া বঙ্গশ্রীর সমালোচক মহাশয় আমাদের অশেষ ধন্যবাদের পাত্র। আসল কথা—শ্রাবণের বঙ্গশ্রী পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীব্রজেন্দ্রসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙালী মুসলমান' ও শ্রীযোগেশরঞ্জন চক্রবর্ত্তী লিখিত 'প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে [illegible] ও [illegible]'

নামক গ্রন্থ আমরা উপভোগই করিয়াছিলাম। সমালোচক মহাশয় সুস্থমস্তিষ্কে আমাদের মন্তব্যগুলি পড়িলে ইহা বুঝিতে পারিবেন। অন্যান্য অভিযোগ সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল, একটি কাল্পনিক অভিযোগের উত্তর দিতে বসিয়া যে এতখানি সময়ক্ষেপ করিতে হইল, সেজন্য আমরা সত্যই দুঃখিত।

জাতীয় মহাসমিতির ইতিহাস।—ডাঃ শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। প্রবন্ধটি ধারাবাহিক। ইহাতে সে যুগের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের বহু তথ্য প্রকাশিত হইতেছে। বাঙ্গলা ভাষায় ভারতীয় মহাসমিতির একটি তথ্যপূর্ণ নিরপেক্ষ ইতিহাসের প্রয়োজন আছে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে বাঙ্গলার দান কতখানি, তাহা সম্প্রতি অবাঙ্গালীদের নিকট তুচ্ছ প্রতিপন্ন হইতে চলিয়াছে। জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস-রচয়িতা ডাঃ সীতারামিয়ার পুস্তক একদেশদর্শী, ইহাতে বাঙ্গালীদের প্রতি সুবিচার করা হয় নাই। লেখক 'Sedition' আইনের যে ধারাবাহিক ইতিহাস দিয়াছেন, তাহা সুন্দর। প্রবন্ধটির প্রতি আমরা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

আত্মহত্যা—শ্রীমোহিনী চৌধুরী। গল্পটি ভাল হইয়াছে। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার সহিত পল্লীসভ্যতার যে সনাতন বিরোধ, তাহা লেখক গল্পের মধ্য দিয়া পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। তবে আমাদের মনে হয়—শেষের দিকে ক্ষ্যাপা খুড়ো অত্যধিক ক্ষ্যাপামি করিয়া ছাড়িয়াছে, তাহার মুখে ঐ ধরণের সভা-সমিতি-মার্কা বুলি মোটেই মানায় নাই। মিলে অগ্নিকাণ্ডের পর গল্প যতটুকু অগ্রসর হইয়াছে, তাহা আমাদের নিকট অতিরিক্ত মনে হয়।

বিদ্যাপতি।—কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়, বি, এ। বিরহ, মিলন, পূর্ব্বরাগ, অভিসার প্রভৃতি বিদ্যাপতি ও অন্যান্য বাঙ্গালী পদকর্ত্তাগণ কিরূপে কি ভাবে রূপায়িত করিয়াছেন তাহার সৌন্দর্য্য ও আখ্যাত্মরসবিচার লেখক করিয়াছেন। রচনাটির ভিতর সাহিত্যরসের পরিচয় সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে।

সেতু।—শ্রীমতী প্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায়। লেখিকার বলিবার ভঙ্গীটি ভাল। মাঝে মাঝে বেশ একটু বিরাগিতার আমেজ আছে। হিন্দু-বঙ্গ-সমাজের অন্তরালবর্তী... প্রদর্শনে লেখিকা যে পরিমাণে সফল হইয়াছেন, গল্পটি সে পরিমাণে ভাল হইয়া ওঠে নাই।

রচনা-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র।—অধ্যাপক ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত এম-এ, পি-আর-এস, পি,এইচ,-ডি। লেখক কমলাকান্তের দপ্তরের বিভিন্ন দপ্তরগুলি বিশ্লেষণ করিয়া তাহার পরিহাস ও বিদ্রূপের মর্ম্মস্থলে কোন বেদনাবোধ জাগ্রত ছিল, তাহা উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। এ সম্পর্কে লেখক যাহা বলিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। "আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের সহিত আলাপ-আলোচনা আমরা সাধারণতঃ চপল হাস্য পরিহাসের ভিতর দিয়াই জমাইয়া তুলি, একটু একটু করিয়া হাস্যপরিহাসের পাতলা যবনিকা টানিয়া আমরা মনের অজ্ঞাতেই যেন হৃদয়ের গভীরে চলিয়া যাই; আমরা নিজেরাই বুঝিতে পারি না, একটু একটু করিয়া কখন যে আমরা গম্ভীর হইয়া উঠি। 'কমলাকান্তের দপ্তর'গুলি বিশ্লেষণ করিলেও আমরা ঠিক এই রীতিটিই আবিষ্কার করিতে পারিব।"

পরাজয়।—ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। গল্পটি ভাল হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙ্গালী মুসলমান।—শ্রীব্রজেন্দ্রসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়। চলিতেছে।

বীরত্বে বঙ্গনারী।—আলোচনাটি আকর্ষণীয়। বাঙ্গলার প্রাচীন সাহিত্য হইতে লেখক দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়াছেন।

কবিতাগুলির কোনটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে হইল না।

পরিচয়—কার্ত্তিক, ১৩৪৮ঃ

বিশ্বনাথের জ্যামিতিকী—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। একটি বৈজ্ঞানিক আলোচনা।

মোহানা—শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। উপন্যাসটি কয়েক সংখ্যা হইতে ধারাবাহিকভাবে বাহির হইতেছে। বেশ উপভোগ্য রচনা, রমলার মনোজগতের বিভিন্ন ধারাগুলি লেখকের জোরাল ভাষায় বেশ ফুটিয়া উঠিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রটিও। 'রাতে ডাকলে মুখে উত্তর না দিলেও দেহে সাড়া দেয়—এই আদিম প্রাথমিক দৈহিক দুর্ব্বলতাকে নিজেদের কাজে লাগান কি নীচ নয়! মেয়েরা পারে না থাকতে, এইটাই পুরুষের শক্তি।' রমলার

পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া লেখক যাহা খাড়া করিয়াছেন, তাহার সহিত রমলার এই উক্তি বোধ হয় ঠিক খাপ খায় না, তাহা ছাড়া সত্য হিসাবেও এই উক্তির মূল্য খুব বেশী আছে বলা চলে না।

ভারতীয় রাজনীতি ও বাংলার নেতৃত্ব—শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ। প্রবন্ধটিতে চিন্তার খোরাক আছে। বাংলাদেশের রাজনীতির বাক্‌সর্ব্বস্ব মুখরতা জাতির গভীরতর অন্তরের জিনিষ নয়, তার রাষ্ট্রচেতনা এক অগভীর খাতে প্রবাহিত হইতেছে। ইহা লক্ষ্য করিয়া লেখক বলিয়াছেন—"আমাদের আন্দোলনের মূল বুদ্ধির প্যাঁচে খেলানোতে আটকে গেছে, তার শিকড় গভীরে প্রবেশ করতে পারছে না।"

ভারতীয় সমাজপদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। একটি অনুসন্ধানমূলক রচনা, ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাসের পাঠক যাঁহারা, তাঁহাদের নিকট লেখকের এই প্রবন্ধ অত্যন্ত মূল্যবান্ বিবেচিত হইবে।

পুস্তকপরিচয়ে 'পরিচয়'-এর বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ আছে।

ছায়াপথ—শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪৮ঃ

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের দুইখানি অপ্রকাশিত পত্র আলোচ্য সংখ্যার গৌরববৃদ্ধি করিয়াছে। বর্ত্তমানে কবির বহু অপ্রকাশিত পত্রাবলী সাময়িক পত্রের মধ্য দিয়া বাহির হইতেছে, এখনও নানা ব্যক্তির নিকট কবির লিখিত বহু পত্র আত্মপ্রকাশ করে নাই, এ বিষয়ে তাঁহাদেরও একটা কর্ত্তব্য আছে। অসম্ভব না হইলে এ সম্পর্কে তাঁহাদের কর্ত্তব্য সুস্পষ্ট, এই মূল্যবান্ পত্রগুলি সাময়িকের মারফৎ প্রকাশ ব্যবস্থা করা। এই ভাবে বাংলা ভাষায় কবি-লিখিত এক সুবৃহৎ পত্র-সাহিত্যের সৃষ্টি হইতে পারে। তা' ছাড়া জীবনীরচনার উপকরণ হিসাবেও এগুলি যথেষ্ট মূল্যবান্।

বলাকার গতিবাদ—অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য্য। বলাকার তত্ত্বের সহিত লেখক বার্গস-এর গতিবাদের তুলনা করিয়াছেন এবং এই সম্পর্কে এই দুই মনীষির দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য কোথায়, তাহাও আলোচনা করা হইয়াছে।

বংশপরিচয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন কৌলিক পরিচয় ও সমসাময়িক কালে তাহার বিশিষ্টতা লইয়া আলোচনা।

লোকটা—শ্রীনীতীশচন্দ্র মজুমদার। একটি পতিতা পল্লীর ছবি লেখক ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। অত্যধিক বস্তুতান্ত্রিক বর্ণনা দিতে গিয়া রচনাটি স্থানে স্থানে শ্লীলতার সীমারেখা ছাড়াইয়াছে। এই ধরণের রচনার একটা Photographic মূল্য হয়তো থাকিতে পারে; কিন্তু ভাবের ব্যঞ্জনায় ও ভাষার কারুকার্য্যে একটা 'অসুন্দর, অশ্লীল' বিষয়বস্তুও যে সুন্দরের পর্য্যায়ে উঠিতে পারে, তাহার পরিচয় এখানে পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। তবে রচনাটির যে একটি সুন্দর সম্ভাবনা ছিল, একথা আমরা স্বীকার করি।

শাড়ী—শ্রীশশাঙ্কশেখর চট্টোপাধ্যায়। গল্পটি ভাল, একটি বিশেষ ভাববস্তুকে রূপায়িত করা হইয়াছে।

রবীন্দ্র-সম্বন্ধীয় 'সিরিয়াস' রচনাবলীর মধ্যে অতর্কিতে একটি সিনেমা অভিনেত্রীর ছবি দিয়া সম্পাদক মহাশয় আমাদের তাক লাগাইয়া দিয়াছেন।

নব-ভারতী—কার্ত্তিক, ১৩৪৮ঃ

লোকশিক্ষার উদ্দেশ্য লইয়া আলোচ্য পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে; এ যুগে এই ধরণের পত্রিকার যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। পত্রিকাটির প্রথম অংশ 'লোকভারতী'—ইহাতে সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতব্য বহু রচনার সমাবেশ দেখা যায়; অপর দুইটি অংশ 'কিশোরভারতী' ও 'শিশুভারতী', ইহাতে কিশোর ও শিশুসমাজের উপযোগী রচনা পরিবেশন করা হইয়াছে। সাময়িক পত্রিকার গতানুগতিক ক্ষেত্রে 'নবভারতী'র কর্ত্তৃপক্ষ জাতিগঠনের যে সুষ্ঠু পথ বাছিয়া লইয়াছেন, তাহা বিশেষ সময়োপযোগী হইয়াছে। শুধু নিরর্থক কতগুলি গল্প, কবিতা, ছড়া ও গানে পত্রিকাটির পৃষ্ঠা ভরিয়া ওঠে নাই। দেখিয়া সুখী হইলাম, পাঠকের মধ্যে জ্ঞান ও অনুসন্ধানের স্পৃহা বর্দ্ধিত করিবার আনন্দপরিবেশনের ভার কর্ত্তৃপক্ষ লইয়াছেন। আমরা পত্রিকাটির শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

শক্তি সাধনায় ভারতের স্থান

জগৎ জুড়িয়া শক্তি-সাধনা চলিয়াছে। আমরা ভারত-বাসী অবস্থাচক্রে এক রকম নিশ্চেষ্ট বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই জাগ্রত শক্তিসাধনায় যেন আমাদের সচেতন ভাব নাই। অবস্থার জটিলতা আমাদের অদৃষ্ট ও কর্ম্ম উভয় দোষেই ঘটিয়াছে, এইরূপ বলিতে হয়। আমরা বলিব—বুদ্ধিদোষই প্রধান কারণ। সেই জন্ম অবস্থার পাকচক্রে পড়িয়া যদি বুদ্ধির স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতা না থাকে, তাহা বড়ই দুর্লক্ষণ, সন্দেহ নাই। ভারতের বর্ত্তমান নিশ্চেষ্টতার মূলে আমাদের বুদ্ধি-মোহ লক্ষ্য করিবার বিষয়। যে বুদ্ধি জীবন-সঙ্কটের সন্ধিক্ষণে আপনার ভিতরের দিকে তাকায় না, শক্তির উৎসের সন্ধান করে না, সে বহির্ম্মুখী বুদ্ধির চিন্তা ও বিচার সবই পরমুখাপেক্ষী, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। আবার আপনার দিকে তির্য্যক্ ভাবে দৃষ্টি দিতে গিয়া বাহিরের শক্তি-সন্নিবেশের প্রতি যদি আমরা যথেষ্ট পরিমাণে সজাগ থাকিতে ও তজ্জাত সুযোগ-সুবিধার উপযোগ করিতে না পারি, তাহাও আরও ঘোরতর সঙ্কট-সৃষ্টির পথ পরিষ্কার যে না করিতে পারে, তাহা কে বলিবে? আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষভাবে রাষ্ট্রনৈতিক শক্তি-সাধনার ক্ষেত্রে ঠিক এই উভয় প্রকার বুদ্ধির বিপাকে পড়িয়া আমরা তটস্থ জীবন যাপন করিতেছি। কোনও স্বচ্ছ, স্থির সুসিদ্ধান্ত বা বীর্য্যময় গতি নিরূপণ করিতে পারিতেছি না। একটা জাতির এরূপ নিষ্ক্রিয় কালহরণ বড়ই দুঃসহ দুঃখময় ও অশেষ বিড়ম্বনারই আকর হওয়ার সম্ভাবনাপূর্ণ।

বুদ্ধিমোহের দৃষ্টান্ত—অতলান্তের সনদে আস্থা

এই জাতীয় বুদ্ধিমোহের এখানে দুই একটি দৃষ্টান্ত উত্থাপন করিতেছি। প্রথম—যথা, আটলান্টিকের ঘোষণা। বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল ও মার্কিণ রাষ্ট্রপতি মিঃ রুজভেল্ট—উভয়ের মধ্যে যে আটলান্টিক সাক্ষাৎকার, তাহার ফলস্বরূপ ১৪ই আগষ্ট উভয়ের একটি সংযুক্ত ঘোষণা-বাণী রেডিওযোগে ইংরাজ লর্ড প্রিভিসীল মিঃ এটলী প্রচার করেন। এই ঘোষণায় ইঙ্গ-মার্কিণ উভয় জাতির প্রতিভূস্বরূপ তাঁহারা জগতের ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত ৮টী নীতি-সূত্র প্রকাশ করেন। সেই আটটি নীতি-সূত্র এই :—

১। বৃটন ও আমেরিকা রাজ্যবৃদ্ধির কামনা করে না।

২। তাঁহারা কোনও জাতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও রাজ্য পরিবর্ত্তন দেখিতে চাহে না।

৩। তাহারা প্রত্যেক জাতির স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী রাষ্ট্রীয় শাসনের অধিকারকে মর্য্যাদা দান করে ও যাহারা এই অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহাদিগকে সেই অধিকারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহে।

৪। তাহারা বর্ত্তমান দায়-দায়িত্বের ভিত্তির উপর ক্ষুদ্র-বৃহৎ, বিজয়ী-বিজিত, সকল রাষ্ট্র যাহাতে তাহাদের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির উপায়-স্বরূপ বিশ্বের বাণিজ্য ও কাঁচামালসংগ্রহে সমান সুযোগ পায়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিবে।

৫। তাহারা অর্থক্ষেত্রে সকল জাতি যাহাতে উন্নততর শ্রম-নীতি, আর্থিক উৎকর্ষ ও সামাজিক নিরাপত্তার অধিকারী হয়, তদ্বিষয়ে পরিপূর্ণ পারস্পরিক সহযোগিতাসৃষ্টির প্রয়াস করিবে।

৬। তাহারা নাজী অত্যাচার সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হওয়ার পর, এরূপ শান্তির প্রতিষ্ঠা কামনা করে, যাহার ফলে সকল জাতি স্ব-স্ব সীমানার মধ্যে নিরাপদে বাস ও সকল দেশে সকল মানুষ নির্ভয়ে, নির্ভাবনায় জীবন যাপন করিতে পারে।

৭। এরূপ শান্তিপ্রতিষ্ঠার ফলে সকল মানব মহাসমুদ্রের বাধাহীন নির্বাধার সঞ্চরণ করিতে পারিবে।

৮। তাহারা বিশ্বাস করে যে, বস্তুতন্ত্র ও আধ্যাত্মিক উভয় কারণেই সকল জাতিকে পশুবলের বর্জ্জনে উপনীত হইতে হইবে। যে হেতু জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে শস্ত্রসজ্জা করিয়া কোন জাতি যদি তাহার স্বক্ষেত্রের বাহিরে জিগীষায় প্রবৃত্ত হয়, তবে ভবিষ্যতের কোন প্রকার শান্তি রক্ষা অসম্ভব হইবে, অতএব সাধারণ নিরাপত্তার উপযোগী কোন ব্যাপক স্থায়ী সুব্যবস্থা হওয়ার পূর্ব্বে এরূপ নিরস্ত্রীকরণ অবশ্য প্রয়োজনীয়। এইভাবে এবং অন্য সকল প্রকার কার্যকরী উপায়ে শান্তিপ্রিয় জাতিসমূহের অস্ত্রসজ্জার গুরুভার লাঘব করিতে তাহারা সাহায্য করিতে উৎসাহ দান করিবে।

পুস্তক-পরিচয়

ধনুর্বাণ-চালনা ও নির্ম্মাণ শিক্ষা—শ্রীললিতমোহন হড় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—রিষড়া ব্যায়াম সমিতি, রিষড়া, জেঃ হুগলী। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

ধনুর্ব্বেদ এ জাতির উপবেদ, প্রাচীন সমরশাস্ত্র। ইহার সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধার কালসাপেক্ষ এবং তপঃসাপেক্ষ। রিষড়া ব্যায়ামসমিতির ফিজিক্যাল ডিরেক্টর ললিতবাবু তাঁহার শিক্ষাগুরু বাঙালী ব্রাহ্মণবীর শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় ও স্বীয় সাধনায় ধনুর্ব্বাণ-নির্ম্মাণ ও চালনার যেটুকু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার পরিচয় এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় পাওয়া যাইবে। ইহা সঙ্কেত মাত্র হইলেও, সঙ্কেতগুলি অনুসন্ধিৎসুর বিশেষ উপকারে লাগিবে বলিয়াই আমাদের ধারণা। ধনুর্বিদ্যা আমাদের স্কুলে, কলেজে বহুক্ষেত্রেই বালক-বালিকা ও তরুণদের অন্যান্য প্রাথমিক আত্মরক্ষামূলক ব্যায়াম ও অস্ত্রশিক্ষারই মধ্যে অন্যতম উৎকৃষ্ট উপকরণরূপে গ্রহণ ও প্রচলন করা যাইতে পারে। আমরা এদিকে শিক্ষা-কর্ত্তৃপক্ষগণেরও এই উপলক্ষে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। গ্রন্থপ্রণেতা ললিতবাবুকে এ বিষয়ের একজন উদ্যোক্তারূপে আমরা অভিনন্দন করি।

দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্-এ, বি-এল্, বেদান্তরত্ন প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীকনকেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৯ বি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃঃ সংখ্যা ২৩৪, দাম দেড় টাকা।

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-সাহিত্যের অন্তর্লোকে আধ্যাত্মিকতা ও আদর্শবাদের যে অনুভূতি, তাহা বঙ্কিমসাহিত্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। ইহা ছাড়াও বহু প্রবন্ধ ও আলোচনার মধ্য দিয়া তিনি দার্শনিক তত্ত্ব ও ধর্ম্মপ্রসঙ্গের আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান দার্শনিক গ্রন্থ 'ধর্ম্মতত্ত্ব-অনুশীলন', ইহার পরেই 'কৃষ্ণচরিত্র'। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন'-এ ও পরে 'প্রচারে' নানা সামাজিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সকল প্রবন্ধের অধিকাংশ পরে 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার বঙ্কিমচন্দ্রের ধার্ম্মিক ও দার্শনিক মতবাদগুলি বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া স্থানবিশেষে ইহার সংপূর্ত্তি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং ইহাতে সফল হইয়াছেন। লেখকের সরল অথচ পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্ম ও দার্শনিক মতবাদের অনেকস্থলে নূতন আলোকপাত হইয়াছে। বাঙ্গলা সাহিত্যের সভাকারের রসপিপাসু যাঁহারা, তাঁহারা এই গ্রন্থের মধ্য দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধ মতবাদের পরিচয় পাইবেন, ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির প্রতি পাঠক অধিকতর সুবিচার করিতে পারিবেন বলিয়া মনে করি। পুস্তকটির ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই সাধারণ।

শতাব্দীর সূর্য্য—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—এ, মুখার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স, ৬, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃঃ সংখ্যা ১৯২, দাম দুই টাকা।

কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার সূর্য্যালোকিত মধ্যাহ্নে বর্ত্তমান শতাব্দী জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সাহিত্যের বহু দিক্ দিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের এই যুগ শ্রীসম্পন্ন। আলোচ্য পুস্তকটি রবীন্দ্র-সাহিত্য ও জীবনীর যে পরিচয় দিয়াছে, পূর্ণাঙ্গ না হইলেও আমরা তাহার মধ্যে লেখকের দৃষ্টি-ভঙ্গীর একটি সমগ্রতা লক্ষ্য করিয়াছি। বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিকোণ লইয়া তিনি কবির জীবনী ও সাহিত্য আলোচনা করেন নাই। 'রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প' নামক অধ্যায়টি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইয়াছে, দীর্ঘতর হইলে ভাল হইত। পুস্তকটি পাঠকসাধারণের নিকট রবীন্দ্রনাথের জীবনী ও সৃষ্টির কতকগুলি দিক্ আলোকিত করিয়া তুলিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। গঠন-পারিপাট্য মনোরম, প্রচ্ছদপট আকর্ষণীয়।

দাবী (চিত্রনাট্য)—শ্রীতড়িৎকুমার বসু, এম্-এ, বি-এস, এইচ-এম-ডি প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীঅনিলকৃষ্ণ রায়চৌধুরী, ১৩০।২, রাসবিহারী এভিনিউ, বালিগঞ্জ, দক্ষিণ কলিকাতা। পৃঃ সংখ্যা ১৮৫, দাম এক টাকা আট আনা।

লেখক আলোচ্য চিত্রনাট্যে এক অভিনব প্রকাশভঙ্গী অবলম্বন করিয়াছেন; ফলে টেক্‌নিকের দিক্ দিয়া ইহার গতি অধিকতর দ্রুত হইয়াছে, ইহা আমরা স্বীকার করি। নাটকের বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গীর ধারায় এই যে ব্যতিক্রম করা হইয়াছে, ইহার ফলে আমাদের মনে হয় চিত্রগুলি সুষ্ঠু ভাবে সমাবেশ করিবার পথে অনর্থক খানিকটা জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। বিবিধ সঙ্কেত ও নির্দ্দেশের আওতায় পড়িয়া পাঠকের নির্বিঘ্ন রসবোধে আঘাত লাগিবে বলিয়া মনে হয়। ইহা সত্ত্বেও লেখকের চিত্রণকৌশলে কয়েকটি চরিত্র জীবন্ত হইয়া ধরা পড়িয়াছে। মমতা, সমর, নন্দা প্রভৃতি কয়েকটি চিত্র মনে রেখাপাত করে, বিষয়বস্তু ও নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাত পাঠকের কৌতুহল আগাগোড়া সজাগ রাখে। পুস্তকটির গঠন-পারিপাট্য চিত্তাকর্ষক।

দশভুজা—(পুরাণ মঙ্গল-সিরিজ ১০) শ্রীসাহাজী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃঃ সংখ্যা ১০০, মূল্য বারো আনা।

পুরাণ-মঙ্গল সিরিজের দশম খণ্ড পাঠ করিয়া আমরা লেখকের তথ্যানুসন্ধানের গভীরতায় আনন্দলাভ করিয়াছি। পুরাতত্ত্বাদির বিশ্লেষণমূলক আলোচনায় শ্রীযুত সাহাজী ইতিমধ্যেই খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, এই শ্রেণীর আলোচনায় বাংলা সাহিত্যের অনতিপুষ্ট ধর্ম্ম ও পুরাতত্ত্বের দিকটি সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে, সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া ভারতের পুরাণ ও ধর্ম্মগ্রন্থের অভ্যন্তরে পরস্পরবিরোধিতা ও অসামঞ্জস্যের যে বিবদমান সুরটি মাঝে মাঝে শুনিতে পাওয়া যায়, লেখকের তথ্যানুসন্ধানের আলোকপাতে তাহা অনেকাংশে দূর হইয়া যাইবে। চর্বিত-চর্বণ ও গতানুগতিক আলোচনায় মন যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন এই ধরণের আলোচনা সত্যই তৃপ্তি দেয়। পুরাণের মূল অনুসরণ করিয়া দশভুজা সম্বন্ধে এই আলোচনা তথ্যানুরাগীর নিকট যথেষ্ট আদৃত হইবে। মূল্যও যথেষ্ট সুলভ করা হইয়াছে।

বৈদেশিক সংবাদ

ইজারা ও ঋণ আইনে আমেরিকার সাহায্য :

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কংগ্রেসের নিকট এক রিপোর্টে জানান যে, ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ ইজারা ও ঋণ আইন অনুযায়ী ১৯,০৪,৪৭,৬৭০ ডলার মূল্যের সমরোপকরণ রপ্তানি করা হইয়াছে, আরও ৩,৫৯,৪৬,৭০১ ডলার মূল্যের সমরোপকরণ হস্তান্তরিত করা হইয়াছে ; জাহাজ মেরামত বাবদ ৭,৮১,৬৯,৩৭৭ ডলার ব্যয় হইয়াছে। যে সকল জিনিষের কাজ শেষ হয় নাই সেগুলি বাবদ খরচ হইয়াছে প্রায় ১৬,২০,০০,০০০ ডলার। অধিকাংশ সাহায্য বৃটেনে গেলেও মোট বারটি জাতি ইহাতে সাহায্য পাইয়াছে।

বিমান আক্রমণে গ্রন্থাগারের ক্ষতি :

সম্প্রতি টাইমস্ লিটারারী সাপ্লিমেণ্ট পত্রিকায় প্রকাশ, বিমান আক্রমণে ইংলণ্ডের জাতীয় গ্রন্থ পরিষদের প্রায় ত্রিশ সহস্রাধিক সংখ্যক মূল্যবান পুস্তক তালিকা বিনষ্ট হইয়াছে এবং ইংরাজী ক্লাসিকগুলির নূতন বিশ হাজার সংখ্যক তালিকাও ধ্বংস হইয়াছে। এই সম্পর্কে বলা হইয়াছে, এই পুস্তক তালিকাগুলি অত্যন্ত মূল্যবান এবং ইহাতে ১৭২টী বিভিন্ন বিষয় তালিকাভুক্ত হইয়াছিল।

'বাকিংহাম প্রাসাদ ট্যাঙ্ক' :

যুদ্ধের উপকরণ সরবরাহ করিবার জন্য ইংলণ্ডে ঘর বাড়ী হইতে লোহার রেলিংসমূহ খুলিয়া লওয়া হইতেছে। রাজবংশের আবাসস্থল বাকিংহাম প্রাসাদের বাহিরের রেলিং হইতে যে পরিমাণ লোহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে নাকি একটা গোটা ট্যাঙ্কই প্রস্তুত হইবে এবং তাহার নাম দেওয়া হইবে "বাকিংহাম প্রাসাদ ট্যাঙ্ক"।

স্বাদেশিক সংবাদ

নিখিল বঙ্গ প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ সম্মেলন :

আগামী বড়দিনের অবকাশে কলিকাতায় নিখিল বঙ্গ প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের অষ্টম বার্ষিক সম্মেলন হইবে। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই উপলক্ষে একটি কৃষ্টি ও সংস্কৃতিমূলক প্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হইবে। আত্মজীবনে পরীক্ষিত ও সাফল্যমণ্ডিত সঙ্ঘের গঠনমূলক নীতি জাতীয় জীবনে ব্যাপকতররূপে প্রয়োগ করাই ইহার উদ্দেশ্য। এই বিরাট অনুষ্ঠানের যথারীতি ব্যবস্থা ও আয়োজনাদির জন্য গত ৮ই নভেম্বর কলিকাতা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল রায়ের পৌরোহিত্যে সঙ্ঘের শুভানুধ্যায়ী ও সুহৃদ্বর্গকে লইয়া একটি পরামর্শ সভা হয়। উক্ত সভায় সঙ্ঘগুরু তাঁহার জীবনানুভূতির আলোকে সংগঠন সাধনার মর্ম্মকথা ও প্রেরণা প্রকাশ করেন। স্বাধীন ভারতের বৈদিক সভ্যতার উপর ভিত্তি করিয়া যুগোপযোগী একমত ও এক বুদ্ধিবিশিষ্ট একটি শক্তিশালী জাতিগঠনের ইঙ্গিত তিনি তাঁহার বক্তৃতায় দেন।

ডাঃ ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী, কবিরাজ অনাথনাথ রায়, শ্রীযুত জগদ্বন্ধুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুত চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত অরুণচন্দ্র দত্ত, স্বামী অমৃতানন্দজী এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় সম্মেলন ও প্রদর্শনীর মর্ম্ম সম্বন্ধে সভায় অভিব্যক্তি প্রদান করেন। এই সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে ত্রিশজন সভ্য লইয়া একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয় এবং এই সমিতিকে সভ্যসংযোগের ক্ষমতাও দেওয়া হয়। এই সম্মেলন ও প্রদর্শনীর স্থান ওয়েলিংটন স্কোয়ার স্থির হইয়াছে।

অতঃপর ১২ই নবেম্বর তারিখে অভ্যর্থনা সমিতির এক অধিবেশনে কার্য্যনির্ব্বাহকমণ্ডলী গঠিত হয়। কলিকাতার প্রধান নাগরিক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম এম-এ, বি-এল মহোদয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ৫২।২, বহুবাজার ষ্ট্রীটে সম্মেলন ও প্রদর্শনীর কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

সন্তরণ প্রতিযোগিতা :

গত ৪ঠা আশ্বিন রবিবার অপরাহ্ণ চার ঘটিকায় রিষড়া ব্যায়াম সমিতির প্রথম বার্ষিক সন্তরণ প্রতিযোগিতা প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ফলাফল : বালিকাদের ৫০ গজ ফ্রী ষ্টাইলে কুমারী পদ্ম ঘোষ প্রথম, কুমারী সরযূ ঘোষ দ্বিতীয় এবং কুমারী ছবি দাস তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। বালকদের ৫০ গজ ফ্রী ষ্টাইল প্রতিযোগিতায়

সন্তরণ প্রতিযোগিতা—রিষড়া : সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ দে প্রথম, শ্রীপশুপতি ঘোষ দ্বিতীয় এবং শ্রীতারকচন্দ্র দে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ওয়াটার পোলো প্রীতি সম্মেলনে রিষড়া ব্যায়াম সমিতির সহিত শ্রীরামপুর আই. ভি. এস. ক্লাবের সহিত এক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতার পর কুমারী কমলার সমাপ্তি সঙ্গীতের সহিত সভা সমাপ্ত হয়।

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে বিশিষ্ট অতিথিগণ :

সম্প্রতি বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় আই-সি-এস মহোদয় চন্দননগর প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে আগমন করেন। তাঁহার সম্মানার্থে একটি সভ্য-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

চট্টল গোলপাহাড় প্রবর্ত্তক আশ্রমবাসীগণ ময়মনসিংহের মহারাজা মাননীয় শ্রীযুক্ত শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী মহোদয়কে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে অতিথিরূপে পাইয়া বিশেষ আপ্যায়িত হন। মহারাজা বাহাদুর আশ্রমের মনোহর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে আশ্রম-বাসিগণের নিবিড় অথচ অনাড়ম্বর আতিথেয়তায় বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। মিঃ এস্, এন্, মিত্রও এই উপলক্ষে আশ্রমে আগমন করেন।

বিগত ৩রা নভেম্বর বর্দ্ধমানের নূতন মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত উদয়চাঁদ মহাতব বাহাদুর চট্টল প্রবর্ত্তক আশ্রমে আগমন করেন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিক্রমণ করিয়া বিশেষ প্রীত হন।

প্রবর্ত্তক বিদ্যাপীঠের পুরস্কার বিতরণ :

১লা নভেম্বর প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের চট্টল কেন্দ্রের আশ্রম প্রাঙ্গণে স্থানীয় ডিষ্ট্রীক্ট জজ শ্রীযুত এস, এন, গুহ রায়ের পৌরোহিত্যে এবং ময়মনসিংহ মহারাজা বাহাদুরের উপস্থিতিতে চট্টল বিদ্যাপীঠের পারিতোষিক বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চট্টগ্রামের প্রায় বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দই উপস্থিত ছিলেন। এইরূপ মহতী সভা ইতিপূর্ব্বে চট্টলে খুব কমই হইয়াছে। শ্রীমতী প্রভা গুহ রায় পুরস্কার বিতরণ করেন। সভাপতি মহোদয় বলেন যে, সঙ্ঘের এই সংগঠনপথে জাতির অভ্যুদয় ও কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী।

রেলওয়ের আর্থিক স্বচ্ছলতা :

সম্প্রতি পাবলিক একাউণ্টস্ কমিটির এক বৈঠকে বলা হইয়াছে যে, ১৯৪০-৪১ সালে রেলওয়ে সমূহের প্রায় ১৮ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে; তন্মধ্যে ১২ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা সাধারণ রাজস্ব তহবিলে দেওয়া হইবে। রেলওয়ে সমূহের ১৯৩৯-৪০ সালে ৪ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে ১ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছিল।

বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ মঞ্জুর :

কেন্দ্রীয় সরকার বর্ত্তমান বৎসরের বাজেটে বিশ্বভারতীর জন্য পচিশ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পূর্ব্বে স্যার গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী উক্ত খবর কবিকে জানাইয়াছিলেন।

শিল্পী ভবানীচরণ গুঁই :

আজমীরের মেয়ো চীফস্ কলেজের খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীযুত ভবানীচরণ গুঁই আর, ডি, এস্, (লণ্ডন) গত মহীশূর প্রদর্শনীর সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া রৌপ্য পদক লাভ করিয়াছেন। শ্রীযুত গুঁই আমেরিকা ও ইংলণ্ডে চিত্র ও শিল্পকলায়

শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ গুঁই

বিশিষ্ট গৌরবের অধিকারী হইয়াছেন। মহীশূর শিল্প প্রতিযোগিতায় তাঁহার প্যাষ্টেল চিত্র 'শেষ-রশ্মি' (The last glow) ও 'তাণ্ডব' বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। শিল্প-জগতে ভবানীবাবুর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা বিশেষ আশান্বিত।

কলিকাতায় বিমান আক্রমণ আশঙ্কা :

কলিকাতায় বিমান আক্রমণ হইলে সেই আক্রমণে গৃহহীনদের সাহায্যের জন্ত বাংলা সরকার একটী পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ২,৮০,০০০ টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ করা হইয়াছে ও অনুমান ২১০০০ লোকের (সহরের জনসংখ্যার শতকরা একজন) এক সপ্তাহের জন্ত বিনা ব্যয়ে খাদ্য ও আশ্রয় দানের ব্যবস্থা করা হইবে।

কলিকাতা হইতে লোক অপসারণ :

শত্রুপক্ষের কার্য্যের ফলে সহরের কতক লোককে স্থানান্তরিত করার প্রয়োজন হইলে সেই জরুরী অবস্থায় সহরের দুই প্রান্তে অবস্থিত দুই রেলওয়ে ষ্টেশনে—হাওড়া ও শিয়ালদহে কিরূপ অতিরিক্ত ব্যবস্থা করা হইবে তাহার একটি সরকারী পরিকল্পনা সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে তদনুসারে হাওড়া ষ্টেশন হইতে প্রত্যহ প্রায় এক লক্ষ লোককে চলিয়া যাইতে দেওয়া হইবে এবং কর্তৃপক্ষ এমনভাবে ব্যবস্থা করিবেন যে প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর আনুমানিক ২০০০ হাজার জন লোক ষ্টেশন হইতে যাত্রা করিতে পারিবে।

ছাত্রের কৃতিত্ব :

বর্তমান বৎসরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত রণজিৎকুমার দে মনোবিজ্ঞানে এম, এস্‌সি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণ পদক লাভ করিয়াছেন। ইনি

শ্রীযুক্ত রণজিৎকুমার দে

বিদ্যাসাগর কলেজের ভূতপূর্ব্ব রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হৃদয়কৃষ্ণ দে মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বি. এস্‌সি পরীক্ষায়ও মনোবিজ্ঞান বিষয়ে ইনি প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া জুবিলী বৃত্তি লাভ করেন

সঙ্গীতে বালিকার কৃতিত্ব :

সম্প্রতি জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় কুমারী মায়া মিত্র ও কুমারী মিনতি মিত্র বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। উচ্চ শ্রেণীর ভারতীয় সঙ্গীতে (classical) ও আধুনিক সঙ্গীতে ইঁহাদের কলা-নৈপুণ্য সাধারণের বিশেষ প্রশংসা লাভ করে এবং ইঁহারা রৌপ্য পদক লাভ করেন। বালিকাদ্বয় জলপাইগুড়ির খ্যাতনামা গায়ক শ্রীসতীন্দ্রকুমার বসুর ছাত্রী।

কুমারী মায়া মিত্র (উপবিষ্টা) ও কুমারী মিনতি মিত্র

বাংলা সাহিত্য-সঙ্ঘ :

গত ১লা নভেম্বর রসা রোডস্থ দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয়ে সাহিত্যিক শ্রীযুত সরোজনাথ ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি সাহিত্য সভার অনুষ্ঠান হয়। এই সভায় 'বাংলা সাহিত্য সঙ্ঘ' নামক একটি স্থায়ী সাহিত্য সভা গঠিত হয়। বর্ত্তমানে নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণকে লইয়া একটি কর্ম্মপরিষদ গঠিত হইয়াছে। সভাপতি শ্রীযুত সরোজনাথ ঘোষ, সহঃ সভাপতি ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীযুত রাধারমণ চৌধুরী, সম্পাদক—শ্রীযুত কুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সহঃ সঃ শ্রীযুত সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়, ডাঃ জিতেন বসু। অফিস ১১৪।২ বি, হাজরা রোড, কলিকাতা।

পরলোকে নন্দরাণী মৈত্র (গীতশ্রী) :

সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার মৈত্র মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা নন্দরাণী মৈত্র গত ২রা অক্টোবর পরলোক-গমন করিয়াছেন। গৃহের কর্ম্মময় জীবনের শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও ইনি শিক্ষায় ও সঙ্গীতে নিজের সাংসারিক জীবনকে আনন্দময় করিয়া তুলিয়াছিলেন। ১৯৪০ সালে ইনি কণ্ঠ-সঙ্গীতে গীতশ্রী উপাধি পরীক্ষায় ১ম স্থান লাভ করেন।

৺নন্দরাণী মৈত্র, গীতশ্রী

ভারতীয় সৈন্যদের জন্য পুস্তকাদি প্রেরণ :

বর্ত্তমানে বিভিন্ন রণাঙ্গনে ভারতীয় সৈন্যদল যে বীরত্বের পরিচয় দিতেছে তাহা সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। যুদ্ধের ভীষণতার ফাঁকে তাহাদের ক্ষণস্থায়ী অবসরগুলিকে পূর্ণ করিয়া তুলিতে হইলে দেশবাসীকে আজ প্রচুর পরিমাণে পুস্তক প্রেরণ করিতে হইবে। এ সম্পর্কে বাংলা অথবা ইংরাজী ভাষায় পুস্তক বা পত্রিকাদি স্থানীয় যুদ্ধ কমিটিগুলি কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইবে।

যুগ্ম সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী
[illegible] প্রিন্টিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ কর্ত্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত

প্রান্তর-পথে

ষড়বিংশ বর্ষ
১৩৪৮ সাল

পৌষ

দ্বিতীয় খণ্ড
৩য় সংখ্যা

মুক্তির সন্ধান

প্রকৃতির অগ্নি-পরীক্ষায় মানবজাতির শোধন সাধন চলিয়াছে। পরিণাম ক্ষয় নয়, যে সকল জাতি এই বিশ্বব্যাপী আহবে যোগদান করিয়াছে বা করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহাদের অন্তঃপ্রকৃতি অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ হইয়া উঠিবে।

ভারত স্বেচ্ছায় এই মহাহবে ঝাঁপ দেওয়ার অধিকার পায় নাই। ইহার হেতু যাহাই হউক, বিধাতার বিধান বলিয়াই আমাদের স্বীকার করিয়া চলিতে হইবে। ভারত যতদিন না প্রকৃতির অগ্নি-পরীক্ষায় আপনাকে যাচাই করিয়া লইবার সুযোগ পায়, ততদিন তাহাকে আপনার অন্তরের মণি-কোটায় সমাহিত চিত্তে বসিয়াই অন্তর্দেবতার নির্দ্দেশের প্রতীক্ষা করিতে হইবে।

"যখন তোমার ইচ্ছা হবে, এই ভাবেতে বসে' থাকা"

কিন্তু এই সঙ্গে চাই—

"আমার জীবন তোমার তরে, এই কথাটী মনে রাখো।
আমার চোখের জ্যোতিঃ-রেখা, সে যে তোমার তুলির লেখা—
আমার শুধু চেয়ে থাকা, কখন তোমার পাব দেখা।"

আমাদের আসল সাধনা—এই মুক্তির সাধনা, আত্মাকে জানা ও পাওয়ার তপস্যা। বিশ্বাস রাখিতে হইবে—সেই অন্তরের গভীরেই আছে অমৃতময় উৎস, যাহার অনন্তধারা চিরদিন সঞ্জীবিত রাখিয়াছে ভারতের জীবন, ভারতের জাতিকে। আঘাত নয়, প্রতিবাদ নয়, প্রতিবিধিৎসা নয়—চাই ভগবানের বাণী, তাঁহারই করুণা। আর কাহারও দ্বারে আমরা মুক্তির জন্য ভিখারী হইব না। আমাদের মুক্তিদাতা ভগবান্ স্বয়ং—এই অটুট বিশ্বাসই জ্ঞানের জ্যোতির্ঘন রূপ লইয়া আমাদের বুদ্ধি উদ্ভাসিত, আমাদের জীবনের অব্যর্থ পথ নির্দ্দেশ করুক। আমরা এই পথেই পাইব আমাদের মুক্তির সন্ধান।

ভারত-সংস্কৃতির বাণী

গতবারে সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল রায় যখন ময়মনসিংহে গমন করেন, সেই সময়ে স্থানীয় সূর্য্যকান্ত হলে ভারত-সংস্কৃতি বিষয়ক বক্তৃতার জন্য দুইদিন সভার আয়োজন হইয়াছিল। প্রথম দিন পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন কালীপুরের জমিদার মিঃ ডি, কে, লাহিড়ী, এম, এল, এ। দ্বিতীয় দিনের সভায় পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন আনন্দ-মোহন কলেজের দর্শনশাখার প্রধান অধ্যাপক সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ময়মনসিংহ টাউনে প্রায় আড়াই শত তরুণের উপর কোন সভায় যোগদান না করার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিষেধ থাকা সত্ত্বেও, সভায় তিলধারণের স্থান ছিল না। বাংলা দেশের মধ্যে ময়মনসিংহ আভিজাত্যে ও সংস্কৃতিতে আজিও বরণীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে।

সভার সাফল্য সম্বন্ধে বলিবার জন্য এই সন্দর্ভের অবতারণা নয়। উক্ত সভায় ভারত সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে গভীর আলোচনা হইয়াছিল, তাহা বিশেষ অনুধাবনীয়। মনীষী অক্ষয়কুমার সভাপতির আসনে বসিয়া বেশী কথা বলেন নাই। ময়মনসিংহে সঙ্ঘগুরুর সকল সভায়ই এই প্রবীণ শাস্ত্রবিৎ অধ্যাপককে শ্রদ্ধালুচিত্তে উপস্থিত হইতে দেখিয়াছি। তিনি সভার পরদিন প্রভাতে সঙ্ঘগুরুর নিকট আসিয়া বলিলেন, "বাংলার ন্যায় এই বক্তৃতার দেশে আপনার বক্তৃতার প্রশংসা করিতে আসি নাই। আপনি যে অনুভূতির স্তর হইতে ভারতীয় শাস্ত্র ও সাধননীতির ভিত্তির উপর নূতন ব্যাখ্যা আত্মিক শক্তির সহিত দিয়াছেন, ময়মনসিংহবাসী তাহার জন্য আপনার প্রতি চির কৃতজ্ঞ থাকিবে। কিন্তু আমার একটা কথা বলিবার আছে; তাহা হইতেছে এই যে, সভায় লোকসমাগম প্রচুর হওয়া সত্ত্বেও এবং আপনার বক্তৃতার শেষে তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া বসিয়া থাকিলেও, আপনার বাণীর স্পর্শেই তাঁহারা অভিষিক্ত হইয়াছে; অর্থবোধ করিয়াছে দুই-চারি জন।"

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকের মন্তব্য অতিরঞ্জিত নহে; কিন্তু তাহার পর এই সুবিজ্ঞ অধ্যাপক যাহা বলিলেন, তাহা অধিকতর চিন্তনীয়। তিনি বলিলেন "ভারতসংস্কৃতি সম্বন্ধে আপনার বাণী অবধারণ করার অধিকার যে শ্রেণীর মানুষের ছিল, সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের স্মৃতি লোপ পাইয়াছে। তাঁহারা নানা কারণে অনুভূতির ক্ষেত্র হইতে চ্যুত হওয়ায়, শাস্ত্রবাণীটুকুই আঁকড়াইয়া আছেন, শাস্ত্রমর্ম্ম উপলব্ধি করেন নাই। আত্মদৈন্যে তাহার স্পষ্ট পরিচয়। আর যে শ্রেণীর লোক বর্ত্তমান যুগে চিন্তাশীল, তাঁহাদের মস্তিষ্কবৃত্তি বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের যাঁতায় পিষিয়া একেবারে হাল্কা হইয়া পড়িয়াছে; তাঁহারা আর ভারতের গভীর অধ্যাত্ম-সংস্কৃতির রসাস্বাদে সমর্থ নহেন, এবং প্রয়োজনও বোধ করেন না। তাই—"

তাঁহাকে একটু নীরব থাকিতে দেখিয়া তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া সঙ্ঘগুরু বলিলেন, "তাই অরণ্যে রোদনের ন্যায় আমার এই নিষ্ফল প্রয়াসের জন্য আপনার এই অকৃত্রিম সহানুভূতি!"

তিনি হাসিয়া বলিলেন "তাহাও সম্পূর্ণরূপে বলিতে পারি না। আপনার থিয়োরী কার্য্যকরী হইয়াছে; এই আশা। কিন্তু ইহা দেশে ব্যাপক মূর্ত্তি লইবে কিনা, এইরূপ চিন্তা হয়।"

অক্ষয় বাবুর পরিচয় যাঁহারা জনেন, তাঁহারা এই সাধু-চরিত্র চিন্তাশীল অধ্যাপকের কথার মূল্য অবধারণ করিতে পারিবেন। সঙ্ঘগুরু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভারত-সংস্কৃতি লইয়া যে জাগ্রত জীবন-সাধনা, ইহার জন্য যথার্থ অধিকারী যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতসমাজ, তাঁহারা যে এই ক্ষেত্রে পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন, ইহা প্রত্যক্ষ। আর ইহাও প্রত্যক্ষ যে, যে সকল মনীষী আজ চিন্তাশীল বলিয়া লোক-সমাজে প্রখ্যাত, তাঁহারা ভারত-সংস্কৃতির শক্তি ও মহিমা সম্বন্ধে খুবই সংশয়ী; তাঁহারা যে সকল গভীর চিন্তার

পরিচয় প্রদান করেন, তাহা ভারত-সংস্কৃতির তুলনায় অতিশয় লঘু ও সঙ্কীর্ণ। আপনি কি বলিতে পারেন— বর্ত্তমান যুগের এই সকল মনীষীদের চিন্তায় ও কর্ম্মে ভারতের মুক্তি ও অভ্যুত্থান সম্ভব হইবে ?"

অক্ষয়বাবু আন্তরিকতার সহিত প্রত্যুত্তর করিলেন, "না, কিছুতেই না, ভারত বিকৃতির পথে, বিপথে।"

তারপর এই দুই জন দরদী মনীষীর মধ্যে অনেক ক্ষণ গভীর অন্তরঙ্গ আলোচনা চলিল। সদ্গুরু এক্ষেত্রে যে অভিব্যক্তি দিলেন, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ :

ভারতের মুক্তি ও অভ্যুত্থান, ভারত-ভারতীর মন্দিরে দীক্ষা না লইয়া সম্ভব, ইহা যদি কেহ মনে করেন, উহা বুদ্ধিহীন চঞ্চল-চিত্ত জনসাধারণের পক্ষেই সম্ভব। ভারত বাঁচিলে, তবেই তাহার মুক্তিলক্ষ্য সিদ্ধ হইতে পারে। ভারতীয়তাকে বিসর্জ্জন দিয়া যে ভারত, তাহা আর খাঁটি ভারত নহে। আমাদের রক্তের ইতিহাসকে অস্বীকার করিয়া যে জাতীয় জাগরণ, তাহা বিশুদ্ধ ভারতের জাগরণ নহে, ভারতের প্রেত-নৃত্য।

ইউরোপের সংগ্রামে সংস্কৃতির সংঘর্ষই চলিয়াছে। সংস্কৃতি জাতিকে শক্তি ও সাম্রাজ্য দেয়। ভারতের আত্মিক সংস্কৃতি বিসর্জ্জন দিয়া সে যদি অনাত্ম-সংস্কৃতিতে প্রলুব্ধ হয়, তাহার যে শক্তি ও স্বাধীনতা, তাহা কখনও ভারত-সংস্কৃতিমূলক জাতীয় মুক্তি নহে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভারত-সংস্কৃতি যদি শক্তি-বীর্য্যের উৎস না হয়, তবে তাহার আশ্রয়ে আর কতদিন আমরা ক্লীব হইয়া থাকিব ? ইহার একমাত্র সদুত্তর—ভারত-সংস্কৃতি নির্ব্বীর্য্য নহে। আমরা অনাত্ম আদর্শ ও সভ্যতার মোহে খড়ের আগুনের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনার আগুন জ্বালিতেছি। উৎসাহের অমৃত-প্রবাহ সৃষ্টি করিতে পারি নাই।

ভারতের সংস্কৃতি বিশ্বমানবেরই শক্তি-বীর্য্য। কবি তাই বিশ্বভারতীর স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। এই সংস্কৃতি কোন পুরুষবাদও নহে, অপৌরুষেয় পরম তত্ত্ব। বেদ ইহার আশ্রয়। বৈদিক সভ্যতাই নানা আকৃতিতে বিশ্ব-মানবকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। ভারতেই তাহার সুদৃঢ় মূল প্রতিষ্ঠিত। ভারত যদি অপৌরুষেয় বেদবাদে অবহিত না হইয়া পুরুষ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, সমাজবিষয়ক নানা মতবাদে অভিভূত হয়, তাহা যেমন বিগত সহস্র বৎসর আমাদের শ্রেয়ঃ দেয় নাই, তেমনি ভবিষ্যতেও দিবে না।

এই ভারত সংস্কৃতির মূলে যে বেদের কথা আছে, তাহা গ্রন্থমাত্র নহে। তাহা মানবের জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রতীক। যে জ্ঞান আমাদের অমৃত, যে কর্ম্ম আমাদের শাশ্বত আশ্রয়, সেই কর্ম্ম ও জ্ঞানের তীর্থই ভারত। তাই বেদপ্রতিষ্ঠ জাতির সম্মুখে কর্ম্ম শক্তির মন্দিরে নিত্য মূর্ত্তি ধরে; আর জ্ঞান মুক্তি ও ত্যাগের বিগ্রহ ধরিয়া, জাতির শ্রেয়ঃপথ নির্দ্দেশ করে। যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ তাই প্রস্থানত্রয়ের সন্ধান দিতে মুখর কণ্ঠ হইয়াছিলেন। ভারতে শক্তি, মুক্তি ও ত্যাগের বিধানই জগতে নূতন বিধান প্রবর্ত্তন করিতে পারে। কয় জন আমরা এই বিধান মাথা পাতিয়া লইতে পারি ? এক জন হইতে দশ জন, পঞ্চাশ জন করিয়া, শত জনের চক্রসৃষ্টি যদি হয়, কয়েক কোটী মানুষের প্রাণ-শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য এই আত্মসংস্কৃতিসম্পন্ন কয়েক সহস্র মানুষই যথেষ্ট হইবে। আমরা তাই মুক্তিকামী জাতিকে বলিব—ভারতের জাতি-গঠনচক্রে এক অপৌরুষেয় মতবাদে দীক্ষিত, এক-বুদ্ধি, এক-বাক্য, এক-কর্ম্মবিশিষ্ট সহস্র নারী-পুরুষের সমষ্টি বাংলায় নূতন জাতীয় জীবনের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে। বাঙ্গালীই বর্ত্তমান যুগে জাতীয় জীবনের অগ্রণী। বাঙ্গালী জাতি-গঠনের এই সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা অবশ্যই আশ্রয় করিবে। সম্মুখের অনন্তকাল তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। আমাদের চাই সাহস, ধৈর্য্য ও বিশ্বাস।

আত্মপ্রত্যয়ী জাতি

ঘটনার দায়ে যে জীবন, তাহা বিড়ম্বনাপূর্ণ। অবস্থাধীন প্রত্যয় মহিমাহীন। মানুষ বরং প্রত্যয়-গঠনের পূর্ব্বে ভাঙ্গিয়া গড়িবে, আপনার চিন্তা ও দর্শনযন্ত্র পুনঃ পুনঃ সংস্কৃত ও পরিমার্জ্জিত করিয়া লইবে; কিন্তু যে প্রত্যয়

ঘটনার স্রোতে শৈবালের মত ভাসিয়া চলার জন্ম মানবের চিন্তা ও জীবন নয়। মানুষের জীবনদেবতার ইচ্ছায় ঘটনা ও অবস্থাই নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে। সেই অন্তরের ঠাকুরই তাহার জীবনসাধনার প্রভু। এই চৈতন্য যাহার আছে, সে কখনও ঘটনা ও অবস্থার দাস হইতে পারে না।

আজ আমাদের এমনই চৈতন্যের সূত্র ধরিয়াই ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষেত্রে দাঁড়াইতে হইবে। বীরবক্ষে যাহা কিছু ঘটিতেছে, তাহার সম্মুখীন হইতে হইবে; ঘটনার বিভীষিকায় আতঙ্কিত হওয়া পুরুষসিংহের লক্ষণ নহে, তাহা সাধারণ পুরুষকারও নহে। একটা জাতি তাহার আত্মভাগ্যের দায় পরের উপর নির্ভর করিয়া যেমন চলিতে পারে না, তেমনি এই আত্মভাগ্যনিয়ন্ত্রণের দায়িত্বও নিজের ইচ্ছা ভিন্ন অপরে হরণ করিয়া রাখিতেও পারে না। পরাধীন যে, সে খুঁজিয়া দেখিলেই বুঝিবে—তাহার এই পরাধীনতার মূল দায়িত্ব তাহারই, অন্যের নহে; অন্য কেহ যাহাকে তাহার স্বাধীনতার অপহারক বলিয়া আপাততঃ মনে হয়, সে বস্তু পক্ষে সেই স্বাধীনতা-ক্ষয়ের উপলক্ষ মাত্র, মূল কারণ নয়। শৃঙ্খলের সূত্র ভিতর হইতেই আসিয়াছে, প্রশ্রয় পাইয়াছে আগে সেইখানেই, তবেই না বাহির হইতে অবস্থা ও ঘটনা উপযোগী পাত্র আবিষ্কার করিয়া তাহার হাত দিয়া শৃঙ্খলের বোঝা চাপাইয়াছে। এই নিগূঢ় আত্ম-বিজ্ঞানের রহস্য আজ আর উপেক্ষার নহে। কি সামাজিক, কি আর্থিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতি, সর্ব্বক্ষেত্রে এমনই একটি গভীর দৃষ্টি ও তল-স্পর্শী চিন্তাশক্তি লইয়াই আমাদের সর্ব্ব সমস্যার কার্য্যকারণ নিরূপণ ও প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে।

আমরা পরাধীন নিরস্ত্র জাতি। এই বাস্তব সত্য অস্বীকরণীয় নহে। অথচ বিশ্বযুদ্ধের প্রবাহ আমাদের দ্বার প্রান্তে উপস্থিত। সীমান্তে বীরজাতি হানা দিতেছে। অস্ত্র নাই, রণশিক্ষা নাই, আত্মরক্ষার কোনও নীতি ও বিধানই নাই। এই সঙ্গীন অবস্থায় আমরা কি করিব? শাসক জাতির প্রস্তুতির ডাকে আমরা সমধিক বিহ্বল ও বিব্রত হইয়াই পড়িতেছি। আতঙ্কে ও বিভীষিকায় যাহা নয় তাহা ভাবিতেছি। ক্ষুব্ধ, ক্ষুণ্ণ চিত্তে গালি পাড়িতেছি, নয় হতাশ চিত্তে মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছি—কি করিব, কোথায় যাইব ইত্যাদি। এই নিরুপায়ের নিষ্ফল ব্যাকুলতা আমাদেরই অন্তরদেবতা লক্ষ্য করিয়া হাসিতেছেন ও অলক্ষ্যে রঙ্গমঞ্চের নাট্যলীলা আরও ঘোরাল করিয়াই তুলিতেছেন। এই আচরণ বীরের ধর্ম্ম নয়, মানুষেরও নয়। আমরা কি অবস্থা ও ঘটনারই যন্ত্র-পুত্তলিকা মাত্র? অবস্থা ও ঘটনার বর্ত্তমান পটভূমিকা কি আমাদেরই পুরুষকারে ও সাধনায় পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না?

অবশ্য সাধনার বিধি আছে। পুরুষকারের প্রয়োগও নীতি ও প্রকরণসাপেক্ষ। পুরুষকার হঠকারিতা নহে; তাহা জ্ঞানেরই কর্ম্মবীর্য্য। এই জ্ঞানদৃষ্টি জাগাইয়াই আমাদের অবস্থা ও ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। ধীর, অবিচলিত, রাগদ্বেষে অনুদ্বেগ চিত্তেই স্বচ্ছ জ্ঞান-জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়। জ্ঞান অন্ধকারকে আলোকিত করে, যাহা জটিল তাহাকে সরল করিয়া তুলে। জ্ঞানীর জিদ নাই, আছে সমদৃষ্টি। যেখানে অন্য পক্ষের জিদ ও সঙ্কীর্ণতা, সেখানেও ধীমান রাষ্ট্রযোগী স্বকীয় জিদ ও সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া অপর পক্ষের দৃষ্টির অন্ধতা-মোচনে সহায়তা করে, বাধা দূর করে। কংগ্রেসরই দৃষ্টান্ত দিতেছি। ইংরেজজাতি ঠিক যে মুহূর্ত্তে স্বীয় জাতীয় অস্তিত্বরক্ষায় মহাসংগ্রামে সংলিপ্ত হইল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই কি মহাত্মা ও তাঁহার অনুচালিত কংগ্রেস স্বাধীনতা লক্ষ্যে ধরিয়া যুদ্ধবিরোধী ধ্বনি তোলার আন্দোলন শ্রেয়ঃ মনে করিলেন? ইহাতে কি ইংরাজের সহিত বুঝাপড়া সত্যই ব্যাহত হয় না? অথচ এইরূপ বুঝাপড়া ছাড়া কংগ্রেসের আর কোনও লক্ষ্য আছে তাহা তো মনে হয় না! একটা জাতির বাস্তব অস্তিত্বরক্ষার সাধনার সহিত আর একটা জাতির সঙ্কীর্ণ আদর্শমূলক প্রেরণার সংঘাতে যাঁহারা বৈপ্লবিক অগ্ন্যুৎপাতের আশা করেন, তাঁহারা অন্য দেশের অবস্থার ইতিহাস তির্য্যক্‌ভাবে আমাদের দেশের অবস্থার উপর আরোপ করিয়া ভ্রান্ত গণনাই করিতেছেন। কংগ্রেসের এই ব্যক্তিগত সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স কোনও দিন গণান্দোলনে পরিণত হইতে পারে না; কারণ ইহার ভিত্তি দুই বাস্তব সাধনার সে সংঘর্ষ নহে, যাহা লেনিনের রুষিয়ায় বা অন্যত্র ঘটিয়াছিল।

যুদ্ধের সময়ে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন ভারতের বর্ত্তমান নিরস্ত্র আত্মরক্ষাহীন অবস্থায় শুধু নিরর্থক নয়, ভুল্লক্ষণ পূর্ণ। ইহার মধ্যে জাতির সত্য কল্যাণবুদ্ধির পরিচয় আমরা পাই না। ইহা একটা নিছক আদর্শবাদ, যাহা রাষ্ট্রক্ষেত্রে অপ্রযুজ্য; শুধু অপ্রযুজ্য নয়, অনর্থকর। কংগ্রেস কি ইংরাজের চৈতন্যদায়ক অথবা তাহার শুভবুদ্ধির পরিমাপক আর কোনও বাস্তব "ইসু" পাইলেন না? তাঁহারা কি ভারত-জাতীয়তার মূর্ত্তিমান্ অনিষ্টস্বরূপ সাম্প্রদায়িক রোয়দাদ নাকচ করা বা তৎপরিবর্ত্তে যুক্ত নির্ব্বাচননীতিপ্রবর্ত্তনের জন্য "স্লোগ্যান" লইয়া আন্দোলন চালনা করিতে পারিতেন না? এইরূপ দেশব্যাপী সামরিক শিক্ষার প্রবর্ত্তনের দাবীও আজ রাষ্ট্রনীতির অধিক অনুকূল হইত। কোন সঙ্কীর্ণ আদর্শবাদ বা জিদের প্রেরণায় যে কর্ম্মনীতি, তাহা রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি জটিলই করিবে, আমাদের মুক্তিপথ প্রশস্ত করিবে না।

জাতিকে আত্মপ্রত্যয়ী হইতে হইবে। আমাদের শাস্ত্র বলে—এই আত্মপ্রত্যয়ের সত্য মূল শ্রীভগবান। তাঁহার পরিচয়, তাঁহার সহিত সম্বন্ধ ও ইচ্ছার সংযোগ আজ কর্ম্মজীবনেই প্রয়োজনীয়। রাষ্ট্রে, সমাজে, শিক্ষায় সর্ব্বত্র আজ এই যুক্তির সাধনাই প্রবর্ত্তিত হউক। মানুষ আজ যেন সঙ্কট হইতে পলাইয়া বাঁচার শৃগালবৃত্তি গ্রহণ না করে, বীরের ন্যায় বিপদের সম্মুখীন হয়। এই বীর্য্য দিবেন ভগবান। তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আমরা জাগ্রত করিব পুরুষকার—পুরুষোচিত নীতি ও সাধনা বরণ করিব। ভারতের স্বাধীনতা আমাদের লক্ষ্য; তাহার উপায়ও তাঁহারই বিধান। সেই বিধান আমরা শুদ্ধ বুদ্ধিযোগে অবধারণ করিব ও আচার-শোধিত নির্ম্মল তনু-মন দিয়া অনুসরণ করিয়া চলিব। ভারতের বাঁচিবার পথই আমরা আশ্রয় করিব—কাপুরুষের, শৃগাল-কুক্কুরের পথ নয়। যাহারা স্বাধীনতার সাধনায় অন্য বীর জাতির আশ্রয়প্রার্থী, তাহারা ভ্রান্ত, বিপথচারী। আমরা জাতির ভবিষ্যৎকে আত্মসাধনারই অমোঘ সূত্র আবিষ্কার করিতে বলি। আপনাকে জান, অন্তরের ঠাকুরকে আশ্রয় কর—শুভ ও সিদ্ধ পথ মিলিবেই, ইহা অবধারিত।

চতুষ্পাদ ধর্ম্ম

সঙ্কট-যুগে ধর্ম্মই আমাদের আশ্রয়ণীয়: এই ধর্ম্ম চতুষ্পাদ—যোগ, ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্ম। যোগ—আত্মসমর্পণ। ভক্তির আশ্রয়ক্ষেত্র সঙ্ঘ। ভগবদাশ্রিত বুদ্ধিই বিদ্যাবিদ্যা ময় বিজ্ঞানজ্যোতিঃ। কর্ম্ম—আমাদের সম্মুখে জাতিগঠন।

ক্ষুদ্র অহমিকাকে আশ্রয় করিয়া এ যুগে আর কিছুই বাঁচিবে না। আত্মার যুক্তি চাই ভগবানে; তাহাই তো আত্মসমর্পণযোগ। এই যোগের মধ্য দিয়াই জীব পায় ব্রহ্মসত্তার সন্ধান। সত্তের সহিত সম্বন্ধে সে পায় নূতন জীবন।

এই সম্বন্ধের রসই ভক্তি। ইহা অমৃত-রসায়ন। ভক্তি রূপ পায় সঙ্ঘে। এই সঙ্ঘ বহু'র মিলন নয়, পরন্তু একেরই অভিব্যক্তি বহুরূপে। সঙ্ঘই জাতিকে কেন্দ্রবীর্য্যরূপে রক্ষা করিবে।

ভক্তি মুক্তি পায় জ্ঞানে। জ্ঞান—বিদ্যা ও অবিদ্যা দ্বিধাবিভক্ত ধারায় প্রকাশ পায়। উভয়ের সমন্বয়ই বিজ্ঞানঘন মহাশক্তি। এই মহাশক্তি ভিত্তি করিয়া যে জীবনপ্রবাহ, তাহাই অনাহত কর্ম্মমূর্ত্তি।

আমাদের কর্ম্মের লক্ষ্য জাতিগঠন। তাহার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ, মানুষ, সুনীতি ও সুচিন্তিত গতি। এই চারিটী উপকরণসংগ্রহ নির্ভর করে বিজ্ঞানেরই আলোকে, উৎসর্গসিদ্ধ সমষ্টিপ্রাণ আশ্রয় করিয়া।

উৎসর্গ, সঙ্ঘবীর্য্য, বিজ্ঞান ও কর্ম্ম—এই চতুষ্পাদ ধর্ম্মসাধন মুক্তি লক্ষ্যে প্রয়োগ করিয়া শুধু বর্ত্তমান সঙ্কট-যুগে আমরা বাঁচিব না, মানবজাতিকে প্রলয় হইতে উদ্ধার করিব। ভারতের ধর্ম্মবীর্য্য নিখিল জগৎকে রক্ষা করিবে।

৩১

শ্রীমতী ইন্দু গুপ্তা ও আমার স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া অতিশয় শ্রদ্ধা ও যত্ন সহকারে বিবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া যথাসময়ে শ্রীঅরবিন্দের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার অন্তরের এই অকপট আকুতি কিন্তু নিদারুণরূপে ক্ষুণ্ণ হইল। আমার স্ত্রী শ্রীমতী ইন্দুর মুখে যখন শুনিলেন—তাঁহার প্রদত্ত খাদ্যাদি শ্রীঅরবিন্দকে স্পর্শ করিতে দেওয়া হয় নাই; সব ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তখন তাঁর হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল; তিনি ঊর্দ্ধফণা ভুজঙ্গিনীর ন্যায় উদ্দীপিত অথচ রুদ্ধ কণ্ঠে কেবল একবার মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন?"

তদুত্তরে তিনি যাহা শুনিলেন, তাহা প্রত্যয়গ্রাহ্য করিতে ইচ্ছা হইল না। একান্ত অসহায়ার ন্যায় তিনি আমার মুখের দিকে চাহিলেন, তাঁহার মুখকান্তি বিষণ্ণ ও বিবর্ণ দেখাইতেছিল। ইন্দুবালার কথা বিশ্বাস করিতে হইলে, একদিকে শ্রীঅরবিন্দের সত্যদৃষ্টি অস্বীকার করিতে হয়; নয় তাঁর দীর্ঘদিনের আত্মসাধনার মূল্য অস্বীকার করিতে হয়। নারীমহিমার মর্য্যাদাজ্ঞান আত্মানুভূতির কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়াই তিনি তাহা সশ্রদ্ধায় রক্ষা করিতেন; ইন্দুবালার কথায় সেইখানেই আঘাত পড়িয়াছিল। আমার প্রবোধবাক্য কোন কাজেরই হইল না। তিনি শ্রীঅরবিন্দের নিকট এই বিষয় জানিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন। যথাসময়ে শ্রীঅরবিন্দের নিকটও এই প্রশ্নের উত্তর মিলিল না। তিনি অসহায়ার ন্যায় নীরবে বসিয়া রহিলেন। আমার মনে হইল—যে নিঃসংশয় সরল ব্যবহারে তিনি আমাদের বাঁধিয়াছিলেন, তাহা যেন কোন এক অজ্ঞাত হস্তের পরশে শিথিল হইয়া গিয়াছে। আমি সকল অবস্থাই বরণ করিয়া লওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। সাধনার পথে সংশয় ও আঘাত ইষ্টের সহিত যুক্তির পরীক্ষা বলিয়াই গ্রহণ করিলাম, কিন্তু আমার স্ত্রী এই ঘটনা কিছু নহে বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলেন না।

বাংলার পলিমাটীতে যে হৃদয়-বৃত্তি গড়িয়া উঠে, তাহা তরল ও নমনীয় বটে। মুখের ফল মিষ্ট হইলে বাঙ্গালী উহা উচ্ছিষ্ট মনে করে না; প্রিয়তমের মুখে তুলিয়া দেয়। শ্রীঅরবিন্দের এই আচরণ আমার কাছে পরীক্ষার ন্যায় মনে হইল। কিন্তু আমার স্ত্রীর নিকট তাঁহার স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হৃদয়ের উপর ইহা সংশয়ের কশাঘাত করিল। আমার চক্ষু ঝাপ্সা হইয়া উঠিল এই মনে করিয়া যে, শ্রীঅরবিন্দ আমায় আজ অজ্ঞাত আগন্তুকের স্থানে রাখিয়া উৎসর্গের পরীক্ষা করিতেছেন। আমার স্ত্রীর নয়ন অশ্রুসিক্ত হইল—তাঁহার শ্রদ্ধার্ঘ্য অস্পৃশ্য বোধেই শ্রীঅরবিন্দের নিকট পরিত্যক্ত হইয়াছে, এই হেতু।

দুই জনে দুই দিক্ হইতে আঘাত পাওয়ায় আমাদের মিলিত চক্ষের জলে শ্রীঅরবিন্দকেও বিব্রত করিল। তিনি এক দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

আমার স্ত্রীর প্রকৃতি আমি জানিতাম। তিনি সহজ ও সরল অন্তঃকরণে যে পথ ধরিতেন, সে পথ হইতে কোনদিন বিমুখ হইতেন না। যদি কোন অভাবনীয় বাধায় সে পথ হইতে বিমুখ হইতেন, তবে সে পথে আর কখনও তাঁহাকে পা বাড়াইতে দেখি নাই। যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন, তাহা অনপেক্ষ হইলে তাঁহার গতি নিরাপদ্ হইত! কিন্তু যে সত্য অপরের অপেক্ষা করিত, সেখানে তিনি আঘাত পাইলে চিরদিনের জন্য মুখ ফিরাইতেন। এখানে তিনি শ্রীঅরবিন্দকে যেভাবে আপনার মনে করিয়া হৃদয় গড়িতে-ছিলেন, তাঁহার হস্ত-প্রস্তুত খাদ্যাদি প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় তিনি মুষড়িয়া পড়িলেন। তিনি কাঁদিতেছিলেন আপনাকে সামলাইয়া লওয়ার জন্য। আমি কাঁদিতেছিলাম আমার ও শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে সুদূর ব্যবধান দেখিয়া। দুইজনে শ্রীঅরবিন্দের নিকট এই ভাবে বসিয়া থাকা

সঙ্গত মনে হইল না। সজল নয়নে দুইজনে উঠিলাম। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। আমার স্ত্রী পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। শ্রীঅরবিন্দ আমার চক্ষে কোনদিন হৃদয়হীন নহেন। তিনি আমাদের বেদনার অনুভূতি উপেক্ষা করিলেন না। আমি প্রণাম শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই শ্রীঅরবিন্দ প্রসারিত বাহু দুটী দিয়া আমাকে হৃদয়ে টানিয়া লইলেন। তাঁর করুণ নয়ন দুটী প্রসন্নতাময়, তিনি অজস্র চুম্বনে অন্তরব্যথা এক নিমিষে দূর করিয়া দিলেন। বাসায় আসিয়া অরুণকে লিখিলাম "আজ প্রাতে অপূর্ব্ব লীলা, অনির্ব্বচনীয় তত্ত্ব; অপ্রকাশই রহিল…… কেবল চুম্বন আর চুম্বন! হায় অরো! এ কেবল তুমি আর আমি"—হৃদয়-মল তিরোহিত হইল।

মানুষ সম-প্রকৃতির নয়। প্রকৃতি-ভেদে তার প্রকাশ-ভেদও হয়; তাহার জন্য ভিন্ন ভিন্ন রূপ আবহাওয়ারও প্রয়োজন হয়। শ্রীঅরবিন্দ এই বিজ্ঞান জানিতেন, অন্ততঃ আমার ক্ষেত্রে তাঁর আচরণ-বৈশিষ্ট্য আমি চিরদিন লক্ষ্য করিয়াছি। সেদিনের সেই অতি তুচ্ছ ঘটনা আশ্রয় করিয়া শ্রীঅরবিন্দ যে অমৃত পরিবেশন করিলেন, তাহা আমায় উদ্বুদ্ধ করিল। কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্য করার সুযোগ হইল না। যেখানে আঘাত গিয়া পৌঁছিয়াছিল, সেখানে সান্ত্বনার প্রলেপ পড়ে নাই। নারীমহিমার লাঘব নারী সহজে স্বীকার করে না। আমার স্ত্রী এই ঘটনার পর হইতে কেমন উদাসীন হইয়া পড়িলেন, আমার পথও অলক্ষিতে জটিল হইয়া পড়িল। সে খেয়াল সেদিন হয় নাই। আমার পালে হাওয়া লাগিতেছিল, জীবন-তরীও উজানে ছুটিল। আমার উৎসাহ ও আনন্দ দেখিয়া আমার স্ত্রী প্রফুল্ল ভাবেই দিনযাপন করিতে লাগিলেন। সকল কাজেই তাঁহার সহায়তা পাইয়াছি; কিন্তু আজ মনে পড়ে ইহার পর আর একদিনও তাঁহার মুখে শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে একটী কথাও বাহির হয় নাই। তিনি আমার কায়ার সহিত ছায়ার ন্যায় নিঃসঙ্গ অনুসরণ করিতেছিলেন।

চন্দননগরের কথাই এ সময়ে বড় হইয়া উঠিল। সঙ্ঘকে স্বাবলম্বী করার সাধনা সুরু করিয়াই চলিয়া আসিয়াছিলাম। আমার অনুপস্থিতিতে এই ক্ষেত্রে নানা সমস্যার কথা অরুণের পত্রে অবগত হইতেছিলাম। আমার স্ত্রীর ভাবান্তর লক্ষ্য ছিল না। আমি শ্রীঅরবিন্দের সহিত যুক্তি করিয়া সমস্যা সকলের নিরাকরণে ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। মানুষ যে অবস্থায় উপনীত হইলে দিব্যকর্ম্ম স্বসিদ্ধ করে, সে অবস্থা আমাদের কেহ লাভ করে নাই; অথচ দিব্যদৃষ্টিই ছিল আমার লক্ষ্য। ইহা ব্যতীত এ কর্ম্মে আরও বড় বিঘ্ন ছিল এই যে, যাহাদের অর্থক্ষেত্রে আগাইয়া দিয়াছিলাম, তাহারা কেহই সঙ্ঘের ভাব ও আদর্শ ভাল করিয়া বুঝে নাই, এমন কি তাহাদের ভবিষ্যতে সঙ্ঘগত হওয়ার কোনই সম্ভাবনাই ছিল না। এই অবস্থায় উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ারই কথা; হইয়াছিলও তাহাই। আমার এক প্রস্থ কাজ এক প্রকার নাকে খৎ দিয়া শেষ করিতে হইয়াছিল।

মানুষের কর্ম্ম স্বভাবতঃ আপনাকে কেন্দ্র করিয়া হয়; আত্মস্বার্থের পুষ্টি না হইলে, মানুষ কর্ম্মক্ষেত্রে যথেষ্ট শক্তিপ্রয়োগ করিতে পারে না। আমি চাহিতেছিলাম নিঃস্বার্থ, নিষ্কাম কর্ম্ম। যে যাহা নয়, সে তাহা করিবে কি প্রকারে? আমার অভিনব কর্ম্মনীতি সকলের কাছেই দুর্বোধ্য ও অসাধ্য মনে হইত। সব লইয়াই মানুষ আসিয়াছিল আমার কর্ম্মে অথচ আমার উপদেশ ছিল আমাদের কেহ থাকিবে না। পিতা নয়, মাতা নয়, আত্মীয়-স্বজন কেহ নয়। কর্ম্মীর প্রয়োজন হইবে শুধু তার পরিধানের বস্ত্র আর জীবনধারণের দুই মুঠা অন্ন। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই প্রকৃতির মানুষকেই অসুরের ন্যায় শ্রম দিতে হইবে। অর্থের দায়িত্ব আমার, অভিজ্ঞতার্জ্জনের সুযোগ অন্যের। এই অবস্থায় যাহা হওয়া স্বাভাবিক, চন্দননগরে তাহাই ঘটিতেছিল। কাজেই আমার ঋণকৃত অর্থে অন্যে অবাধ অধিকার পাইয়া যতই কর্ম্ম করিতে থাকে, ক্ষয় ও অপচয়ের অঙ্ক ততই বাড়িয়া চলে। কর্ম্মক্ষেত্রের দুঃসংবাদ যতই আসিতেছিল, আমি বাহ্যতঃ চঞ্চল হইলেও, অন্তরে নৈরাশ্যের অন্ধকার জমিতে দিই নাই। আমার বিশ্বাস ছিল—আগুন জ্বালাইতে হইলে, ধূমের ভয় থাকিলে চলিবে না। অনেক ক্ষয় ও অপচয়ের ভিতর দিয়াই

সিদ্ধকর্ম্ম প্রকাশ পাইবে। ভগবানের মানুষ হইতে হইলে তাহার অনেক গলদ প্রকাশ পায়। এই সব সহিবার শক্তি না রাখিয়া বৃহৎ কর্ম্ম করা যায় না। অন্তহীন ব্যর্থতার বিভীষিকা বিদীর্ণ করিয়া মানবাত্মার অফুরন্ত শক্তিপ্রকাশ সম্ভব হইবেই। আজিকার মানুষ ব্যর্থ হইতে পারে; কিন্তু কর্ম্ম তাহাতে ব্যর্থ হইবে না। অনধিকারী যাহারা, তাহারা স্বভাবতঃ কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইবে। অরুণকে তাই ভরসা দিয়া লিখিতাম। "অর্থসমস্যার নিরাকরণের উপায় আজিকার হিসাবের অঙ্কে ক্ষয়ের পরিমাণ দেখিয়া নিরাকরণ করা যাইবে না। কর্ম্মপ্রবাহেই আত্মিক শক্তির জাগরণ হইবে। সৃষ্টি করিতে গিয়া আমাদের মধ্যে আজ ক্ষয়ের প্রভাব যতই বীভৎস বলিয়া মনে হউক, উজান পথেই চলিতে হইবে। ক্ষয় একদিন পশ্চাতে পড়িবে, পূরণের অঙ্কই পুরোভাগে দাঁড়াইয়া নির্ম্মাণের জয় দিবে।" এই সময়ে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের জন্য এক কোটী টাকা সংগ্রহ করিতেছিলেন। অন্ধ্র প্রদেশ ছাড়া মাদ্রাজ হইতে তিনি ৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা সংগ্রহ করার প্রতিশ্রুতি লইয়াছিলেন, কিন্তু জুন মাসের শেষেও ৩০ হাজার টাকার অধিক সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। এই টাকা তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য দানস্বরূপই লইতেছিলেন; আর আমরা চাহিতেছিলাম শুধু জাতিগঠনের জন্য স্বার্থহারা সজ্ঞসন্তানদের শ্রম ও শক্তির অনুবাদে বিপুল অর্থসৃষ্টি। শ্রীঅরবিন্দ এই স্বপ্ন কর্ম্মে অনুবাদিত হইতেছে দেখিয়াই উৎসাহ দিতেন। তবে বলিতেন—"এখন সব ভেঙ্গে চুরে যাচ্ছে; এই সময়ে এই রকম সৃষ্টি বড় সহজ নয়। আত্মরক্ষার জন্য যাহা দরকার, সেইটুকুও যদি এই ভাবে করে' তুলতে পার, একটা বড় কাজ হ'ল বলে' মেনে নিতে হবে।"

আমার সমস্ত দৃষ্টিটাই ছিল প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের মধ্য দিয়াই জাতিগঠনের প্রচুর অর্থসৃষ্টির দিকে। সেদিন চারিদিকেই ক্ষয়, অপচয়, অবিশ্বাস আমাদের ঘিরিয়া ধরিয়াছিল। মহাত্মা গান্ধির সংগৃহীত অর্থের ব্যর্থ ব্যয় হইবে বলিয়া সকলেই সংশয় করিতেন। গোড়া হইতেই অর্থের ব্যর্থ ব্যয় না হয়, সেদিকে ছিল আমার প্রখর দৃষ্টি; পশ্চাতে ছিল না এক বিন্দু স্বার্থের আকর্ষণ। কাজেই অন্তহীন ভরসাই সকল প্রকার পরাজয়ের দুর্ভাবনা হইতে আমায় দূরেই রাখিত।

শ্রীঅরবিন্দের নিকট হইতে যতই আলো ও আনন্দ, উৎসাহ ও শক্তি পাইতেছিলাম, ততই তাহা চন্দননগরের দিকে অকুণ্ঠে বিতরণ করিতাম। এক এক সময়ে মনে হইত আমার শরীরটা বেতার-বার্ত্তা ধরার একটা দণ্ড-স্বরূপ পণ্ডিচারীতে খাড়া আছে মাত্র। আমার আত্মা চন্দননগর হইতে গুটাইয়া আনিতে পারি নাই। আমার মনে হয় শ্রীঅরবিন্দ ইহা বুঝিতেছিলেন। তিনি আমায় নিঃসঙ্গ করিয়া তাঁহার মানুষরূপে গড়িতে চাহিতেছিলেন। আমি তাঁহাকে বৎসের ন্যায় দোহন করিয়া চন্দননগরের পুষ্টিই দেখিতেছিলাম। শ্রীঅরবিন্দের চাওয়া পূর্ণ করার আকুলতা ছিল; কিন্তু চন্দননগরের আকর্ষণ তাহা সফল হইতে দেয় নাই। এই সময়ের অন্তরদ্বন্দ্বের কথা আমার তাৎকালীন পত্রের মধ্যে আজও সুস্পষ্ট হইয়া আছে। আমি তাহার কিছু কিছু অংশ এইখানে উদ্ধৃত করিলাম। অরুণকে লেখা এক পত্রের মধ্যে এইরূপ আছে—"তোমাদের কয়েক জনের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি আমার অন্তরে সর্ব্বদাই ভেসে উঠে। বার বার তা' মুছে ফেলার চেষ্টা করি। বার বার তারা আবির্ভূত হয়। পুনঃ পুনঃ মুছি, পুনঃ পুনঃ জাগে, এই সংগ্রামই চলেছে আমার মধ্যে। জানি না এ সংগ্রাম শেষ হবে কি না? কিন্তু যতদিন তা' না হয়, আমি আর ফিরব না।"

শ্রীঅরবিন্দের সহিত একাত্ম হওয়ার পথে চন্দননগরের সৃষ্টি কিরূপ বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল এবং তাহা অকপট চিত্তে দূর করার চেষ্টাও যে আমার মধ্যে ছিল, উপরোক্ত লেখাটুকু তাহার সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু এই অধ্যবসায়ের তলে তলে ফল্গুধারার ন্যায় সৃজনের এক একটী প্রেরণা প্রবাহ আজ ধরা পড়ে। চন্দননগরে দিব্য সৃষ্টি আমার কল্পবিধৃত সত্য; তাই উক্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধের মধ্যেই প্রবর্ত্তক সঙ্ঘকে সহস্রভাবে বীর্য্যদান করিয়াছি—শ্রীঅরবিন্দের মন্দিরে বসিয়াই। তাহাদের ভরসা দিয়া লিখিয়াছি "অতীতের ক্ষুদ্র সংসার তোমাদের আর বাঁধিতে পারিবে না। শ্রীঅরবিন্দের নিকট বসিয়া দেখিতেছি—তোমরা

ছোট ছোট সংসারের মানুষ নও। এক বৃহৎ সংসারের অন্তর্বর্ত্তী হইতেছ। তাই বলিয়া ছোট সংসারগুলি এই বৃহৎ হইতে ভিন্ন নহে। বৃহৎ পারিবারিক জীবন-সাধনার সিদ্ধিতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংসারের পরিতৃপ্তি নির্ভর করে, তাই বৃহৎ সৃষ্টির জন্য আমাদের নির্মম হইতে হইবে; এই বৃহৎ সৃষ্টি সার্থক না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের চতুর্দ্দিকে জ্বলিয়া উঠিবে অশান্তির আগুন। আর্থিক ক্ষয়ে ও অপচয়ে এমন কি দৈনিক জীবনযাপনের ভিত্তিও ভূ-কম্পনে কাঁপিয়া উঠিবে। প্রতি পদেই বাধার সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ করিতে হইবে দিবা রাত্রি প্রতি রক্তবিন্দু দিয়া। আমাদের আজ যাহারা সহকর্ম্মী, এমন কি আমারই দেশবাসী, সমাজ, ধর্ম্ম, এমন কি সমস্ত জগৎও আমাদের পথ আগুলিয়া ধরিবে। এই ঘনীভূত অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া দিব্য উষার আলোকচ্ছটা অচিরেই দেখা দিবে, এমনও মনে করিও না। আমি জানি না এই নব জাতিসৃষ্টির জন্য যে সংগ্রাম, তাহার জন্য কয় জন আমাদের সঙ্গে থাকিবে! আমি তাই গোড়া হইতেই মহাশক্তিমান্ যোদ্ধাদেরই আহ্বান করিয়াছি।"

শ্রীঅরবিন্দ চাহিতেছিলেন—আমার এই সত্য প্রেরণাকেও সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিয়া আমাকে নিঃস্ব করিতে, তাঁহার মধ্যে আমার জন্ম সফল করিতে। আমি কিন্তু এই সময়েই কোন এক অজ্ঞাত শক্তির প্রেরণায় অতি অকপটেই তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ নতি রাখিয়াই চাহিতেছিলাম চন্দননগরের উৎসর্গীকৃত সাধকদের নব জন্ম। চিন্তাশীল ব্যক্তিই আমার অবস্থার কথা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। শ্রীঅরবিন্দ ও আমি, এই দুইয়ের মধ্যে সার্ব্বজনীন বিশ্বহিতকরী প্রেরণার ভিন্নতা অতি সূক্ষ্মতত্ত্বরূপে আমাদের মধ্যে প্রতিদিন ব্যবধান সৃষ্টি করিতেছিল—আমার জীবন-স্রোতঃ কোন এক অমোঘ অব্যর্থ লক্ষ্যে এই সময় হইতেই পরিচালিত করিতেছিল। আমার লেখনীমুখে চন্দননগরের প্রতি অজস্র অগ্নি-নির্দ্দেশ বাহির হইতেছিল। অরুণকে লিখিতাম "একটা গমগমে আব্‌হাওয়ার মধ্যে আমরা বেশ থাকি। এইটা আমাদের পতনযুগের জাতীয় স্বভাব। আমাদের সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম্ম, এমন কি এই আত্ম-সমর্পণ যোগের মধ্যেও এই স্বভাবেরই সবের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। আজ আমাদের সংকল্প হইবে এই স্বভাব থেকে দূরে দাঁড়াইয়া নিজেদের তাজা আবহাওয়া যাহাতে সৃষ্টি করিতে পারে, সেই আয়োজন কর, উহা আর কিছু নহে—সত্যকে অতি নির্মম হইয়াই ফুটাইয়া তোলা। এইখানে ক্ষতি-বৃদ্ধির হিসাব রাখিও না, সুনাম-কুনামের পাতলা কাগ লইয়া কোন ক্ষেত্রে মনোভঙ্গের প্রয়োজন নাই। এই সব পথের কণ্টক সরাইয়া সরাইয়া আমাদের আগাইতে হইবে। যে মন লইয়া আমরা যাত্রা সুরু করিয়াছি, সে মনের আমূল পরিবর্ত্তন চাই, নতুবা ভাগবত সৃষ্টি সম্ভব হইবে না। পুরাতন মনকে বাঁচাইয়া রাখিলে, এই মনের ধর্ম্ম নূতনের সবখানিকে দাঁড়াতে দেয় না। সৃষ্টি অপূর্ণ হয়, তাই মনকে উপরে তোল। আত্মার প্রদীপ্ত পাবকে বিগলিত স্বর্ণের ন্যায় নূতন মন লইয়া তোমাদের যাত্রা সুরু হউক।"

পুনঃ হইতেই যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যাত্রা সুরু হইয়াছিল, তাহা "প্রবর্ত্তকের" মধ্য দিয়াও যেমন প্রকাশিত হইত, এই সময়ের পত্রাদিতেও তাহার অভাব হয় নাই। প্রাচীনযুগের মানুষের লক্ষ্য ছিল কামে ও অর্থে। পরবর্ত্তী যুগে উহাই ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া নূতন সংস্কৃতির প্রবর্ত্তন করেন আর্য্য ঋষিরা। তাই কর্ম্ম যোগেরই অভিব্যক্তিস্বরূপ যাহাতে হয়, সেই দিকেই আমি সজ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতাম। আমার লিখিত পত্রাংশে আজও তাই দেখি "তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ সিদ্ধিলক্ষ্য রাখিয়া নহে, উহা যোগের অভিব্যক্তি। যাহারা যোগী, তাহাদের হস্তেই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার দিতে হইবে। অন্যথা হইলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াই স্বাভাবিক। সাধনার সময়ে অপচয় অবশ্যম্ভাবী। অভিজ্ঞতার্জ্জনের জন্যও শক্তি ও সময়ের অপব্যয় হয়; কিন্তু যোগের প্রতিষ্ঠা যত সুদৃঢ় হইবে, এ সবই পূরণ হইয়া যাইবে। অযোগীর জীবনক্ষেত্রে এইরূপ হওয়া সম্ভব নহে। যে তিনটী বস্তু যোগের অন্তরায়, আমাদের যোগ এই তিনের মধ্যেই আরম্ভ হইয়াছিল। অর্থ, নারী আর কর্ত্তৃত্ব আমরা ছাড়ি নাই। কিন্তু এই তিনই আমাদের সাধনায় দিব্যরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। যোগশক্তি ইহার কারণ। তাপে-

গোলে খিচুড়ি পাকাইয়া আমরা চলিতে চাহি নাই। ব্যবসার সঙ্গে স্বদেশী, স্বরাজ, সেবাধর্ম্ম জড়াইয়া থাকিলে ব্যবসার উন্নতি নাই; ব্যবসায় দেশের ধনশক্তি বৃদ্ধি করারই অব্যর্থ প্রণালী। যারা ব্যবসার ক্ষেত্রে আত্মদান করিয়াছে, কমলাকে মূর্ত্তিমতী করিয়া তোলাই তাদের সৃষ্টির সাফল্য·····" শ্রীঅরবিন্দ এই কথার সমর্থন করিয়া বলিতেন "অর্থের অনাবশ্যক ব্যয় কোনমতেই উচিত নয়। বর্ত্তমান অবস্থায় খরচ নয়, সঞ্চয় করাই কর্ত্তব্য। বাঙ্গালী অনেকদিন লক্ষ্মীছাড়া। বাঙ্গালীকে লক্ষ্মীমন্ত করতে হবে। তাই ব্যবসাক্ষেত্রে অধ্যবসায় ও মিতব্যয়িতার প্রয়োজন আছে।"

সঙ্ঘের অর্থপ্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে তখন হইতেই এই নির্দ্দেশ দিতাম—"অর্থক্ষেত্রে হিসাব রাখিয়া না চলিলে, প্রচুর শক্তি থাকা সত্ত্বেও পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়। সঙ্ঘের অর্থপ্রতিষ্ঠান সঙ্ঘের আত্মরক্ষার জন্য; যদি ইহার উপর সঞ্চয় হয়, তবে দেশের ব্যাপক কর্ম্মে তাহার নিয়োগে বাধা নাই। এখন যদি দেশের ব্যাপক কর্ম্মে হাত দিতে হয়, তার জন্য দেশের দানই মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। আমাদের শিক্ষা ও অর্থ-প্রতিষ্ঠান শুধু স্বরাজ-সাধনার জন্য নয়; তাই বলিয়া স্বরাজ চাই না তাহা নহে, মানবজাতির কল্যাণ ও মুক্তির জন্যই ভারতের স্বরাজ যেমন একটা উপায় মাত্র, সেইরূপ আমাদের শিক্ষা ও অর্থ প্রতিষ্ঠান মানবজাতির শ্রেয়ঃ-সাধনেরই জন্য। সেই জন্যই আমাদের ক্লান্তিহীন বিরামহীন অভিযান। এই জন্যই আমরা অমৃতের পুত্র; মৃত্যুকে বার বার অতিক্রম করিয়াই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে।"

আশ্চর্য্য, শ্রীঅরবিন্দের প্রসন্নমূর্ত্তি আমার প্রাণে জন্মগত প্রেরণার উপরই অজস্র আলোকবর্ষণ করিত। আমি উন্মাদ হইয়া কর্ম্মোদ্যত হইতাম। সকলে যখন আত্ম-শুদ্ধি ও মুক্তির জন্য শ্রীঅরবিন্দের যোগশক্তিতে অবগাহিত হওয়ার আয়োজন করিতেছে, আমি তখন শ্রীঅরবিন্দের প্রসাদ সঞ্চয় করিয়া আত্মপ্রকাশের পথেই দ্রুত চলিতে চাহিতেছি। আমার এই দুর্জ্জয় গতি অহঙ্কারজনিত অথবা কর্ম্মপ্রবণ অশুদ্ধ প্রাণশক্তির অভিব্যক্তি, এ বিচার করিতে বসিলে আত্মবিশ্বাসের প্রতি অনাস্থার কালো মেঘ আমায় বিমূঢ় করিয়া তুলিত। সে আজ ২০।২৫ বৎসরের কথা। আমার এই আত্মবিশ্বাস আজও অমলিন রহিয়াছে, আমার জীবনে সাধনার রেখাপাত সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিত। আমাকে চিরদিন যেন কে পাইয়া আছে, অধিকার করিয়া আছে—তাহার নির্দ্দেশ অমান্য করার সাধ্য আমার ছিল না। সেই অন্তর্য্যামী পুরুষেরই প্রতীকস্বরূপ শ্রীঅরবিন্দকে পাইয়াছিলাম। প্রতীক—পুরুষের সবখানি নহে, উহা তাহার সাঙ্কেতিক চিহ্ন মাত্র। এই সঙ্কেতও লক্ষ্যপথে চলার অনিবার্য্য সহায়। সে দিন এই শাস্ত্র ও অনুভূতিগত জ্ঞানের উদয় হয় নাই। শ্রীঅরবিন্দই ছিলেন আমার কাণ্ডারী, তাঁর সান্নিধ্যে আমার কর্ম্মপ্রেরণার গোমুখীধারা অজস্র স্রোতে চন্দননগর ভাসাইয়া দিতেছিল। মানুষের স্বভাব ও স্বধর্ম্ম সর্ব্বজয়ী। শ্রীঅরবিন্দের পদপ্রান্তে বসিয়া আমি হৃদয়বীণার আঘাতে মূর্চ্ছনা তুলিয়া চন্দননগরকে সঞ্জীবিত করিতেছিলাম। সেদিন লেখনীমুখে পত্রের ছত্রে ছত্রে যে বাণী উদ্গীত হইতেছিল, তার আরও কিছু অংশ এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি—"বাঙ্গালী জাতি উত্তেজনাপ্রিয়। তাহাদের খোরাক যোগাইতে যোগাইতে কেবল অনেক মহাকর্ম্মীই নয়, অনেক মহাপুরুষ দেউলিয়া হইয়া গিয়াছেন। আমাদের জাতি শুধু পরাভূত নহে, সম্মোহন-মুগ্ধ। এই জাতির মতামতের উপর নির্ভরতা রাখিলে চলিবে না। অতি অল্প করিয়াই ১০০ জন আত্মস্থ ভাগবত কর্ম্মীর মধ্যে সত্য, প্রেম ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা কর। কালের কঠোর অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া ইহারাই জাতির জন্ম দিবে। এই জাতিরই অভ্যুত্থান আমি চাহিতেছি।

যে জাতি আজ বাঁচিয়া আছে, তাহারা চাহে না পূর্ণাঙ্গ জীবন। সর্ব্বদাই এই জাতি খণ্ড আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়, একটা নির্দ্দিষ্ট রেখা ধরিয়া চলিতে চাহে। দীর্ঘ দিনের পরাধীনতায় জাতি ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণচিত্ত হওয়ার ফলেই এইরূপ হইয়াছে। এইরূপ কোন এক খণ্ড আদর্শের অনুগত করিয়া আমাদের জীবনকে সীমাবদ্ধ করিব না। দেশে স্বাধীনতার আদর্শই আজ সর্ব্বাপেক্ষা বড় আদর্শ।

আর এই জন্যই জাতির সবখানি প্রাণকে আমরা নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহি। ইহাতে যোগের প্রয়োজন উড়িয়া যায়। আমাদের যে কাজ শুধুই ভারতের নয়, ভূমাই আমাদের লক্ষ্য। সৃষ্টির সূচনায় যতই আমরা ক্ষুদ্র হই, নিখুঁত বৃহতের সাধনাই আমাদের আশ্রয় হইবে। স্বরাজ এই বৃহতেরই অন্তবর্তী।"

শ্রীঅরবিন্দের নিকট প্রতিদিন প্রাতে ধ্যানে বসিতাম। তিনি অনিমিষে চাহিয়া থাকিতেন আমাদের দিকে, এ ছিল তাঁর দেওয়ার খেলা। তাঁর এই দানের লক্ষ্য হয়তো ছিল অন্য কিছু; কিন্তু আমি পাইতাম জাতিগঠনেরই মৌলিক প্রেরণা। তাই বাঁশী আমার ফুকারিয়া উঠিত গানের মূর্চ্ছনায়, এই সঙ্গীতের ধ্বনিমায় চন্দননগরে গড়িয়া উঠিতেছিল এক শক্তিশালী সংহতি। আমার কথা ছিল—"যতই বলি, যতই লিখি, দেশের লোক এই মহান্ আদর্শের মর্ম্মকথা উপলব্ধি করিবে না। এই জন্যই আমরা চাহিতেছি এক মুঠা মানুষ, যারা আত্মায় নবজন্ম লইয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইবে। যোগ ভিত্তি, সঙ্ঘ ইমারৎ। অসংখ্য লোকের মধ্যে যোগের বীজ যদি নিক্ষিপ্ত হয়, তবেই শত জন মানুষ অনন্তকাল যোগকেই মূর্ত্তি দিয়া যাইবে জীবনে। সঙ্ঘসৃষ্টির পর বিজ্ঞানের ক্ষুধা প্রবল হয়। কেননা সঙ্ঘের গতিপথে পদে পদে সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্ব, সেখানে একমাত্র সান্ত্বনা বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠা হইলেই মিলে। এই কথায় কেহ যেন মনে না করে, সঙ্ঘ না হইলে বিজ্ঞান মিলে না; তবে সঙ্ঘের এই অভাব অতিশয় তীব্রভাবে অনুভূত হওয়ায়, ইহা শীঘ্র আয়ত্তে আনার প্রবল আয়াস সঙ্ঘের পক্ষেই সম্ভব। ব্যষ্টি-আত্মার অপেক্ষা সমষ্টি-আত্মার শক্তিবেগের গুণাধিক্য কে অস্বীকার করিবে?"

১৯১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের অজ্ঞাতে ও দূরে থাকিয়াই চন্দননগরে যে সৃষ্টিচক্র গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা মনের সৃষ্টি হইলে আমি মুক্তির পথ বাহির করিতে পারিতাম। চন্দননগরের আত্মপ্রতিষ্ঠ সৃষ্টি আমরাই স্বীকার করিতাম তাহা নহে, শ্রীঅরবিন্দও সমর্থন করিতেন। কিন্তু আর কাহারও নিকট আমল পাইতাম না। প্রকাশ্যে, অপ্রকাশ্যে সঙ্ঘের প্রতি উপেক্ষাই আমার অন্নের ভূষণ হইয়াছিল; কিন্তু আমার চিত্ত তাহাতে বিচলিত হইত না। পণ্ডিচারীতে অবস্থানকালে শ্রীঅরবিন্দের সান্নিধ্যে আমার আত্মা বিজ্ঞানময় আলোকে পুলকিত হইয়া উঠিত। চন্দননগর হইতে দূরে থাকিয়া সৃষ্টি বিশ্লেষণ করিয়া লিখিতাম "সমষ্টি চন্দননগরে কিছু অলৌকিক ধরণের হইয়াছে। সাধারণতঃ হয় ব্যষ্টির পরিপুষ্টির ক্ষেত্রেই। কিন্তু চন্দননগরের ক্ষেত্রে সমষ্টি আত্মাই প্রকাশিত হইতেছে ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে। ব্যষ্টি যেমন আপনাকে পরিপূর্ণ করিয়া তোলার সাধনা করে, এখানে সেইরূপ সমষ্টি-আত্মাই ব্যষ্টির ন্যায় তপস্যা করিয়া চলিয়াছে আপনাকে নিখুঁত করিয়া তোলার জন্য। আমাদের অবস্থা বুঝাইবার নহে; অতি কঠোর অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া ভগবানই এই অভিনব সত্যকে প্রকাশ করিতে চাহেন। পরীক্ষা যত কঠোর হইবে, সঙ্ঘের সত্যমূর্ত্তি খাঁটী সোণার ন্যায় ততই উজ্জ্বল হইবে। বৃহতের সম্ভাবনা এই ক্ষুদ্র সংস্থার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। আগুনের একটি ক্ষুদ্র কণিকাও প্রলয়সৃষ্টির শক্তি ধারণ করে।" সৃষ্টির স্বপ্ন আমায় বোধহয় নিবিড়ভাবেই ঘিরিয়া ধরিয়াছিল। ইহার উপর আমার কোনই হাত ছিল না। মন্ত্রের ন্যায় চলার অভ্যাস দৃঢ় হওয়ায়, ঠিক নিয়মিত ভাবে প্রতিদিন প্রভাতে শ্রীঅরবিন্দের নিকট আসিয়া বসিতাম। কিছুক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া চক্ষু মুদিত হইত; আর অন্তরে ফুটিয়া উঠিত চিরন্তনের সৃষ্টিস্বপ্ন। এইরূপ কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, বুঝিলাম আমার মধ্যে স্বপ্ন-সৃষ্টি তাঁহার অভীষ্ট পূর্ত্তির বিঘ্ন করিতেছে। কিছুদিন পরেই অনুভূত হইল—তাঁহার আত্মিক সংযোগ আর কোন স্পর্শ দিতেছে না। চাহিয়া দেখিতাম, তিনি উদাসীন-ভাবে আকাশের দিকে চাহিয়া আছেন, তাঁহার দিকে দৃষ্টি দিতে গিয়াই তৎক্ষণাৎ এই সময়ে প্রতিহত হইয়াছি। এই সময়ে তিনি হঠাৎ বলিতেন, "আজ বেশীক্ষণ বসিতে পারিব না, শরীর একটু ক্লান্ত আছে।" তিনি আসন ছাড়িয়া উঠিতেন; আমরাও দুইজনে তাঁহার ক্লান্তির মাত্রা বৃদ্ধি না করিয়া, প্রসন্ন মনেই বাড়ী ফিরিতাম।

শ্রীঅরবিন্দ ও আমার মধ্যে কোথায় ভেদ সৃষ্টি হইল, সেই তত্ত্বের বিশ্লেষণ করার জন্যই আমি আজ অতীতের পাঁজী-পুঁথি লইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি। তিনি আমায় যাহা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার জন্য দিয়াছিলেন সকল প্রকার সুযোগ। আমার পত্নীকে দূরে রাখিলে যদি আমার চিত্ত চঞ্চল হয়, এই জন্য তিনি এবার আমায় সস্ত্রীক আসার নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। আমার অর্থের প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু তবুও তিনি আমার প্রয়োজন-পূরণের জন্য আমার হাতে প্রচুর অর্থ দিয়াছিলেন। কিন্তু আমার জন্মগত প্রেরণার দাবী লঙ্ঘন করার উপায় আমার ছিল না। শ্রীঅরবিন্দ আমায় কিছুদিন পণ্ডিচারী-বাসের পর ইহা যেন বুঝিতেছিলেন, এবং তাহার জন্য যে দান দিলে আমি ধন্য হই, সার্থক হই, তাহারও সন্ধান করিতেছিলেন। দীর্ঘ দিনের পর্য্যবেক্ষণ আজ এই সকল বিষয় বোধগম্য হইতেছে। সেদিন ছিল যন্ত্রযোগের সাধনা। যন্ত্রীরূপে দেখিতাম শ্রীঅরবিন্দকে, সুতরাং আমি নিশ্চিন্ত মনে যাহা আহুত হইতেছিল, তাহা প্রত্যাখ্যান করি নাই। যাহা আমার অনাবশ্যক মনে হইত, সে বিষয়ে উদাসীন থাকিতাম। আমার সাধনা বেশ জমিয়া উঠিতেছিল। এই সাধনা আমার নিজস্ব বস্তু। আমি তখন একরূপ আত্মস্থ হইয়া উঠিতেছি। আমার স্ত্রীও তখন বেশ সুস্থ ও প্রফুল্লচিত্ত হইয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করিতেছেন। কিন্তু অতি তুচ্ছ উপলক্ষ আশ্রয় করিয়া শ্রীঅরবিন্দ ও আমার চাওয়ার মধ্যে যে পার্থক্য ছিল, তাহা অভাবনীয়রূপে বড় করুণ মূর্ত্তিতে দেখা দিল। উপলক্ষস্বরূপ যাহা, তাহা যতই অপ্রিয় হউক, সত্যকেই সে মুক্তি দান করে।

(ক্রমশঃ)

তর্জমা (একটি উর্দু 'শের')

শ্রীশান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

(ছন্নছাড়া সৈনিক-জীবনে বৈচিত্র্যের অভাব ঘটে না। এরি আওতায় একদা এক ব্যর্থ প্রেমিক মুসলমান বৃদ্ধের সংস্পর্শে এসেছিলাম: তার জীবনের অনেক কাহিনীই সে আমায় শুনিয়েছিল; কিন্তু তা নেহাৎই চিরন্তনী। কয়েকটি উর্দু 'শের' সে আমায় শোনায়—নিরক্ষর গ্রাম্য বৃদ্ধ কবির নাম বলতে পারেনি! বর্তমান তর্জমা সেই স্মৃতিরই ভগ্নাংশ থেকে—)

"উমরে দরাজ মাঙ্ কর্ লায়থা চারদিন্ ও
দো আরজুমে কাট গ্যায়া, দো এন্তেজার্‌মে।"

জীবনের ভূমিকায় চারদিন মিলিল মেয়াদ:
প্রাণকল্প প্রার্থনায় অর্দ্ধ তার নিঃশেষিত প্রায়;
আর অর্দ্ধ কেটে গেল বন্ধ্যাফল ব্যর্থ প্রতীক্ষায়:
বিফল বাসক-রাতি—বিধাতার শেষ আশীর্ব্বাদ!

ব্যাধি

শ্রীনীতীশচন্দ্র মজুমদার

আমাদের বক্ষে আজ প্রেম এল ব্যাধির আকারে;
সে ব্যাধিরে পূজা করি, পূজা করি পাশব আহ্বান;
নাগরিক কঠিন জীবন উন্মাদ অস্থির,
আবরণ খ'সে যায় জেগে ওঠে আদিম মানব।
প্রেমের কঙ্কালস্তূপ বিভীষিকায় সত্য শিহরায়,
আত্মাদের ব্যভিচারে ঝঙ্ক' ওঠে স্নায়ুর সেতার।
কোথা প্রেম, কোথা স্বপ্ন, অমৃতের মেলে না সন্ধান-
কামনার শয্যাপার্শ্বে তারে দেখি সঙ্গিনীর রূপে।
রাতের আকাশে আর নাহি শুনি তারকার গান
বিশীর্ণ প্রাণের মাঝে যেন তারা শবের মতন।

লালসার মূর্ত্তি ধরি' চুপি চুপি অতি লঘু পায়,
আমাদের চারিপাশে ঘোরে প্রেম প্রেতের মতন
ক্ষণিকের অবসরে বদ্ধ করি দৃঢ় আলিঙ্গনে—,
অধর পাণ্ডুর করে তাহার সে নিবিড় চুম্বনে।

নয়নের চারিধারে আসে যেন ঘুমের বারতা
আমরা ঘুমায়ে পড়ি, বক্ষে জাগে ব্যাধির বীজাণু॥

বিশ্বব্যাপী সংগ্রাম

শ্রীতারাকিশোর বর্দ্ধন

১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর জগতের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ঐ তারিখে জাপান পৃথিবীর প্রবলতম নৌশক্তিদ্বয়ের বিপক্ষে সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান ইউরোপীয় মহাসমরকে বিশ্বময় [illegible] দিয়াছে। অতলান্তিক মহাসাগরের প্রলয়-ঝঞ্ঝা আজ প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষে ভীমবেগে প্রবাহিত 'টাইফুন' ঘূর্ণিবাত্যার মত উহা দেখিতে দেখিতে হাওয়াই, গুয়াম, ফিলিপাইন, হংকং, সাংহাই আচ্ছন্ন করিয়া উহার ভীষণ বেগ মালয় উপদ্বীপে আসিয়া প্রতিহত হইতেছে। প্রশান্ত মহাসাগরের সে প্রশান্ত মূর্ত্তি আর নাই। ক্ষুধিত শার্দ্দূলের মত এখন তাহার প্রকৃতি। "প্রিন্স অব ওয়েলস্", "রিপাল্‌স্", "হারুনা" প্রভৃতি রণতরণী তাহার স্পর্শে [illegible] ডুবিয়াছে; কিন্তু এ রাক্ষসী ক্ষুধা এত সহজে মিটিবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না।

জাপানের যুদ্ধ ঘোষণা

১৯৪২ সাল অতিক্রান্ত হইলে, ইংলণ্ড ও আমেরিকার নৌবহরনির্ম্মাণের পরিকল্পনা রূপ পরিগ্রহ করিত। সুতরাং জাপানও আর বিলম্ব করিতে না পারিয়া উভয় রাষ্ট্রশক্তির বিপক্ষে প্রবল আঘাত হানিয়াছে। জাপানের উহা জীবন মরণের যুদ্ধ। এশিয়ায় জাপানের নববিধানপ্রচেষ্টার বিপক্ষে সর্ব্বদাই ইংলণ্ড ও আমেরিকা নীতি পরিচালনা করিয়া থাকে। জার্ম্মাণীর প্রচণ্ড ভুজবলে ইংলণ্ড ও আমেরিকা উভয়েই বিব্রত থাকায়, উহারা সহসা সামরিকভাবে জাপানের বিরুদ্ধাচরণ করে নাই। কিন্তু উহারা রাষ্ট্রীয় কূটনীতিতে সর্ব্বদাই জাপানের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে। কারণ জাপানের নববিধানপ্রতিষ্ঠার অর্থই হইতেছে এশিয়া হইতে ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রভাব বিলুপ্ত করা। এ প্রকারের পারিপার্শ্বিক অবস্থায় যুদ্ধ অনিবার্য্য। সুতরাং পূর্ব্ব এশিয়ায় মহাদাবানলের প্রসার খুব অপ্রত্যাশিত নয়। জাপানের নববিধানপ্রতিষ্ঠার দুরাকাঙ্ক্ষা দর্শন করিয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকা জাপানের বিপক্ষে সম্মুখ-সংগ্রামের জন্য সর্ব্বপ্রকারে তৈরী হইতেছিল। সুতরাং যে সব ঘটনাপুঞ্জের যোগসাধনে এই তাণ্ডবলীলার অনুষ্ঠান হইতেছে, তাহার অনুধাবন করিলে উহার আকস্মিকতায় বিস্মিত হইবার অবকাশ থাকে না।

ইংলণ্ড, আমেরিকা, রুশিয়া ও ফ্রান্স, উহাদের প্রত্যেকেই পৃথিবীর ধনসম্পত্তি প্রচুর পরিমাণে ভোগ করিতেছিল। পক্ষান্তরে ইটালী, জার্ম্মাণী ও জাপান, এই প্রবল শক্তিনিচয় ভোগের উপযুক্ত উপকরণের অভাবে পৃথিবীর আধিপত্যপ্রয়াসী এবং উহারা শক্তিমান্। সুতরাং এই অনিবার্য্য সংঘর্ষের মধ্যে একদিকে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা ও রুশিয়া এবং অপর পক্ষে ইটালী,

জার্ম্মাণী ও জাপান থাকিতে বাধ্য। পাঠকগণ জানেন যে, অনুরূপভাবেই পক্ষদ্বয় বিভক্ত হইয়াছে। অবশ্য ফরাসীর পতন হওয়ায়, এখন ইংলণ্ডের পক্ষে আর তাহাকে ধরা যাইতেছে না। গত মাসের 'প্রবর্ত্তকে' আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, ফ্রান্সের কেবল সামরিক পরাজয়ই হয় নাই—উহার নীতিগত ও কৃষ্টিগত পরাজয়ও হইয়াছে। এ কারণেই ফরাসীর সম্পদ্ আজ জার্ম্মাণীর স্বার্থসিদ্ধিতে নিয়োজিত হইতেছে। এ ভাবে আলোচনা করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, সাম্রাজ্য-লোভী ও সাম্রাজ্যভোগীর মধ্যে প্রবল সংগ্রাম বাধিয়াছে এবং উহাই ছিল অনিবার্য্য। উভয় পক্ষের বলবীর্য্য ও পরাক্রম লক্ষ্য করিয়া এ-কথা সচ্ছন্দেই বলা যায় যে, এ যুদ্ধ প্রভূত রক্তস্রাবী ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে। এ অনল দশ বৎসরেও নির্ব্বাপিত হইবে কিনা সন্দেহ।

জাপান যে ভাবে তাহার রণনীতি পরিচালনা করিতেছে, তাহার মধ্যে একটা শৃঙ্খলার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তাহার প্রধান ষ্ট্রাটেজি হইতেছে আমেরিকা ও বৃটেনের নৌবহর যাহাতে সম্মিলিত হইতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করা। এই জন্য সে প্রশান্ত মহাসাগরস্থ আমেরিকার যাবতীয় ঘাঁটি, যথা—হাওয়াই, গুয়াম, ওয়েক, ফিলিপাইন ও সাংহাই যুগপৎ আক্রমণ করিয়াছে এবং তাহার উপর হংকং, শ্যাম ও মালয় আক্রমণ করিয়া বৃটিশের প্রধান নৌ-ঘাঁটির শঙ্কার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রাষ্ট্রীয় কূটনীতিতে শ্যাম রাজ্য নিরপেক্ষতা বজায় রাখিলেও, তাহার নিরপেক্ষতা জাপানেরই উপকারে লাগিয়াছে। এখন মালয় উপদ্বীপে জাপানের হানা দিবার উদ্দেশ্য কি, তাহার আলোচনায় দুইটী সম্ভাবনার কথাই মনে জাগরিত হয়। প্রথমতঃ, সে সিঙ্গাপুর দখল করিতে অভিলাষ করিয়াছে, এরূপ অনুমান করিবার সঙ্গত কারণ আছে। কিন্তু এ কথাও অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, মালয়ের উত্তরাংশ দখল করিয়া সিঙ্গাপুরের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া সে পরে ব্রহ্মদেশের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ হানিবে। অথবা এমনও হইতে পারে যে, সে ব্রহ্মদেশ ও সিঙ্গাপুরে যুগপৎ আক্রমণ চালাইবে। জাপানের নিকট ব্রহ্মদেশের অফুরন্ত তৈলসম্পদ্ একান্ত লোভনীয়।

যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ ঘোষণা

আমেরিকা ও বৃটিশ নৌবহরকে বিচ্ছিন্ন রাখাই হইতেছে জাপানের বর্ত্তমান ষ্ট্রাটেজি। উহাতে সে আকস্মিক আঘাত হানিয়া প্রাথমিক সাফল্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু তার পরবর্ত্তী কার্য্য তাহার পক্ষে সহজ হইবে না।

ব্রহ্মদেশ ও সিঙ্গাপুর রক্ষার জন্য বৃটিশ বাহিনী প্রস্তুত। ভারতীয় সৈন্যগণের বিপুল বিক্রম এক্ষণে পৃথিবী বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছে। এ ক্ষেত্রে জাপানী সৈন্যগণের অবস্থা লিবিয়াতে ইটালীয় বাহিনীর মত হইয়া পড়াও বিচিত্র নহে। জলযুদ্ধে জাপানের যে নিপুণতা আছে, চীনদেশের স্থলযুদ্ধে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। অবশ্য বিগত ১৯০৫ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধের সময়ে স্থলযুদ্ধেও জাপানী সৈন্য অসাধারণ নিপুণতা প্রকাশ করে।

সংহত করিবার উদ্দেশে (consolidation of position) হিটলার সর্ব্বদাই কিছু সময় লইয়া থাকেন। পোলাণ্ড-দখলের পর ৮ মাস সময় তিনি অতিবাহিত করেন। ফ্রান্স দখলের পরও এক বৎসর অবসর নিয়াছিলেন। ঐ অবসর কালটায় তিনি অধিকৃত দেশের সংগঠনে ব্যাপৃত থাকেন। রাশিয়ার যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জার্ম্মাণীর দখলে আছে, উহার লোকসংখ্যা দশ বার কোটী হইবে এবং উহাই রুশিয়ার মধ্যে সমৃদ্ধিশালী অঞ্চল। সুতরাং

বর্ত্তমান রণক্ষেত্র : প্রশান্ত মহাসাগর

এবার তাহার স্থলযুদ্ধের নমুনা দেখিবার জন্য বিশ্ববাসী আজ উৎসুক।

ইউরোপের রণক্ষেত্রে জার্ম্মাণ অগ্রগতি সম্প্রতি রুদ্ধ আছে এবং রুশসৈন্য প্রায় রণাঙ্গনের সর্ব্বত্রই পাল্টা আক্রমণে সাফল্য লাভ করিতেছে। রুশসৈন্যের বীরত্ব অসাধারণ এবং ইতিমধ্যে ইংলণ্ড ও আমেরিকার সাহায্যে তাহারা পুষ্ট হইয়াছে। সংগ্রামক্ষেত্রের বর্ত্তমান অচল অবস্থার উহাই কারণ বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু উহার অন্য কারণও থাকিতে পারে। যুদ্ধে জয়ী হইয়া কিছু জমি লাভ করিবার পর অধিকৃত দেশে নিজের শক্তি

এখানে শাসনশৃঙ্খলা ও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা সুগঠিত করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। এতদুদ্দেশ্যেই হিটলার হয়তো সময় লইতেছেন এবং এই হেতুই আত্মরক্ষার পক্ষে সুবিধাজনক স্থানে জার্ম্মাণ সৈন্য হটিয়া আসিতেছে। ইতিমধ্যে রুশিয়ার দুরন্ত শীতে আত্মরক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া তাহার প্যাঞ্জার বাহিনী আবার অন্য কোন রণক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়ে, তাহাও ভাবিবার বিষয়। হিটলার এক্ষণে ইংলণ্ড আক্রমণ করিবেন, না তুরস্কের মধ্য দিয়া মধ্য প্রাচ্য অভিযান করিবেন, অথবা মার্শাল পেত্যার সহযোগে আফ্রিকায় সৈন্য পরিচালনা করিবেন, সে বিষয়ে সমরবিদ্-

গণের গবেষণার অন্ত নাই। আর এক মাসের ভিতরেই উহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। আগামী নব বর্ষের প্রারম্ভেই হিটলারের নববিধান ইউরোপে রূপ পরিগ্রহ

ব্রিটেনের দুর্ভেদ্য নৌঘাঁটি: সিঙ্গাপুর

করিবে বলিয়া হিটলার তাঁহার বক্তৃতায় ইঙ্গিত দিয়াছেন। এই নববিধানের ফলে ইউরোপ নব কলেবর পরিগ্রহ করিবে কি না, তাহা দেখিবার বিষয়। বর্ত্তমান বিশ্বব্যাপী সংগ্রামে জয়-পরাজয় যে পক্ষেরই হউক, ইহাতে যে ধ্বংসলীলা সংঘটিত হইবে, তাহাতে জয়ের সার্থকতা অনেকখানি পরিশেষে কমিয়া যাইবে। রাষ্ট্র ও জাতি সম্বন্ধীয় নূতন চিন্তা ও দৃষ্টিকোণ যদি এই আবর্ত্ত বিদীর্ণ করিয়া উত্থিত হয়, তবেই ভবিষ্য যুগের মানুষের কাছে মহাসমরের সার্থকতা প্রতিপন্ন হইবে।

সর্ব্বহারা

— শ্রীধীরেন্দ্রকুমার সরকার

উত্তাল জলধি-বুকে এ তরী আমার
লক্ষ্যহীন চলিয়াছে মধ্যাহ্নবেলায়;
প্রকৃতির রুদ্র বাণে জীর্ণ হৃদি-কায়,
সহিতেছি বেদনার তরঙ্গ অপার।

ছন্দোবদ্ধ ছিল মোর জীবনের ধারা
এ বিশ্ব মাঝে; কূলে কূলে প্রভাত কালে
তরীখানি নেচেছিল নৃত্য তালে তালে
সে কথা ভোলেনি আজো দেখেছিল যারা।

সহসা প্রচণ্ড ঘাতে আমি ছন্দহারা,
ভেসে গেনু অকূলের অশান্ত দোলায়
বেদনার পারাবারে, অসহ ব্যথায়,
সেই হ'তে মৃত্যুপন্থী আমি সর্ব্বহারা।

অলক্ষ্যে যেথা মোর অস্তাচল ছাওয়া
তার লাগি' শুধু আজ এ তরী বাওয়া।

শিকার

শ্রীসুশীল জানা

শ্রীহর্ষের জীবনে একটি সকাল এলো। একটি স্মরণীয় সকাল। বিগত বিশ বছর ধরে অবিশ্যি অনেক সকালই এসেছিল। কিন্তু সেগুলি ছিল যেন কোনো বিদ্যুচ্চালিত যন্ত্রবিশেষের সুইচ। ভোর হ'য়েছে দিনের পর দিন—আর শ্রীহর্ষ তার অসংখ্য কাজের মধ্যে বিরামহীন—বিশ্রামহীন চাকার মতো গড়িয়ে গড়িয়ে এসেছে বিশ বছর ধরে'। দীর্ঘ কয়েক বছরের একটানা এই যান্ত্রিক ইতিহাস। আর এই ইতিহাসের জঠরে গড়ে' উঠেছে বিরাট কারখানা। ব্যবসা ফেঁপে উঠেছে নানা দিকে। বিত্ত এসেছে প্রচুর। কিন্তু চিত্ত ছিল না—একটি সচেতন উপভোগী চিত্ত! ত্রিশ বছরে পৌঁছাবার পূর্ব্বেই স্ত্রী গেল মারা—দারিদ্র্যপীড়িত, ঔষধবিহীন—পথ্যহীন। সৌভাগ্যের বিষয়—সেই অবস্থায় স্বর্গত স্ত্রীলোকটি কোনো শিশুসন্তান রেখে যায়নি। অতএব মাথা উঁচু ক'রে জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াতে শ্রীহর্ষের কোনো পরোয়া ছিল না সেদিন। সেদিন থেকে শ্রীহর্ষ পেরিয়ে চলে এসেছে তার পঞ্চাশ বছর বয়সের পরপারে।

তারপর আজ একটি সকাল এলো—একটি শ্রাবণবর্ষণ সকাল। শ্রীহর্ষ চোখ মেলে তাকালো তার পিছনের ফেলে আসা জীবনের দিকে নয়, নয় তার সুমুখের কয়েকটা বাকী বছরের দিকে। মানুষের অনুভূতির মধ্যে যে চোখটা অসংখ্য দিন আর রাত্রি ধরে' চেয়ে থাকে—সেই চোখ দিয়ে শ্রীহর্ষ তাকালো একটা অখণ্ড জীবনের দিকে।

কলকাতার ক্লান্ত আকাশ মৌসুমী মেঘে ভরে' আছে ক'দিন। শেষ রাত্রির দিক থেকে বর্ষা সুরু হয়েছে। বর্ষা-ভেজা ভোরের আলোয় অপরিচ্ছন্ন বিষণ্ণ নাগরিক দিন চেয়ে আছে ঘোলাটে চোখে।

চোখের উপর থেকে খবরের কাগজখানি নামিয়ে হাই তুললো শ্রীহর্ষ। অসুস্থ সে—এবং ভয়ানক ক্লান্ত। বিগত বিশ বছরের মধ্যে কখনো এরকমটা হয়নি তার। এই মাত্র সপ্তাহ তিন আগে দিব্যি কর্ম্মঠ দেহ আর মন নিয়ে একটু বাইরে গিয়েছিল সে ব্যবসার নানা প্রয়োজনে। এখানে-ওখানে ক'দিন খুব ঘুরেছে। হঠাৎ বোম্বেতে গিয়ে অসুস্থ হ'য়ে পড়লো। ডাক্তার ব'ললে বিশ্রাম নিতে। অসুখ, ব্লাড-প্রেসার। গত দুটো সপ্তাহ ভয়ানক অসুস্থ হ'য়ে ছিল সে। সপ্তাহ দুই বাইরে কাটিয়ে ক'লকাতায় ফিরেছে সে মাত্র কাল রাত্রিতে। আজ ভোরের ক'লকাতার দিকে তাকিয়ে ভালো লাগছে না তার। কেমন একটা অপরিচিত বিতৃষ্ণা অনুভব ক'রছে সে। পাড়ার কোনো বাড়ীতে বোনকার বিয়ে—সানাই বাজছে। বর্ষণক্লান্ত বিষণ্ণ ভোরের মতো একটা করুণ অস্পষ্ট সুর নিঃশব্দে মাঝে মাঝে ছুঁয়ে যাচ্ছে তার চেতনাকে। কিছুই ভালো লাগছে না শ্রীহর্ষের—শুধু মনে হচ্ছে তার, ভয়ানক ক্লান্ত সে।

শ্রীহর্ষ খবরের কাগজখানি চোখের সুমুখে আবার তুলে ধরলো। মনে হ'লো, এখন আর তার কিছুই ক'রবার নেই। না, কিছুই ক'রবার নেই—কিন্তু কিছু একটা সে ক'রতে চায়। কোথাও একটু নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে পারলে যেন বাঁচে। তবু এত ক্লান্ত সে—আর কোথায় যেন কতকগুলো ছেলে-মেয়ে ভয়ানক চেঁচামেচি ক'রছে।

বিরক্ত হ'য়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলো শ্রীহর্ষ। তারই আশ্রিত কয়েকটি ছেলে-মেয়ে বৃষ্টিতে ভিজে ছুটো-ছুটি ক'রছে। অকারণ আনন্দ-উচ্ছল হল্লা। অসহ্য মনে হ'লো শ্রীহর্ষের। ধম্‌কে উঠলো সে: এই—

একটি ছোট ছেলে ছুটতে ছুটতে এসে থম্‌কে দাঁড়ালো শ্রীহর্ষের সুমুখে—আরগুলি উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালালো।

—লেখা-পড়া নেই! বিরক্তিতে ফেটে পড়লো শ্রীহর্ষ।

ছেলেটি ভয়ে ভয়ে ব'ললে, আজ ছুটি।—

—ছুটি! নিজের উপরেই যেন মহাবিরক্ত হ'য়ে উঠলো শ্রীহর্ষ—ধম্‌কে ব'ললে, তাতে হ'য়েছে কি!

ধমকানি খেয়ে চলে গেল ছেলেটি। শ্রীহর্ষ ফিরে এলো ঘরে। খবর কাগজখানি তুলে নিলে আবার চোখের উপরে। তারপর তক্ষুণি নামিয়ে রেখে দিলে। চোখ পড়লো টেবলের উপরে। ক্যালেণ্ডার ষ্ট্যাণ্ডে মোটা মোটা অক্ষরে একুশ তারিখটা লাল টক্‌টক্‌ ক'রছে। আজকের দিনটা। ছুটি না থাকলেই যেন ভালো হ'তো

শ্রীহর্ষের পক্ষে। আজ তার কিছু ক'রবার নেই। ইজি-চেয়ারে চুপ ক'রে শুয়ে রইলো শ্রীহর্ষ। বাইরের ক্ষান্ত বর্ষণ অপরিচ্ছন্ন সকালের মতো একটা ঠাণ্ডা বিষণ্ণতা তার মনের মধ্যে ঘনঘোর হ'য়ে এলো। শানাইটা সেই যে কখন থেকে বিনিয়ে বিনিয়ে বাজছে কোথায়। অবসর শান্ত ছুটির একটি দিন বাইরের জগৎ থেকে নিঃশব্দে শ্রীহর্ষের মনের মধ্যে প্রবেশ ক'রলে। মুমূর্ষে খবর কাগজটা পড়ে রইলো। বিরাট্ জগৎ—অনেক কাজ—অনেক লোক—আর অত্যন্ত পরিচিত ক'লকাতা থেকে শ্রীহর্ষ যেন অনেক দূরে কোথাও সরে গিয়েচে। ডাক্তারের উপদেশ, আজ সকালের ধমক্-খাওয়া কচি ছেলেটির কণ্ঠস্বর, বর্ষণ-কাতর ক'লকাতার আকাশ—সবগুলো মিলে যেন কোনো রিফ্রিজেরেটর থেকে নিঃশব্দে ঠাণ্ডা গলায় কাণের কাছে, ক্লান্ত দেহে—মনের গভীরে ব'লচে : ছুটি—অবসর।

শ্রীহর্ষ সিগারেট ধরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো।

বিরাট্ বাড়ীটার একপাশ ঘেঁষে গ্যারেজ। সেদিকে হঠাৎ চোখ পড়লো শ্রীহর্ষর। গ্যারেজের পাশে ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো তখনও জলে ভিজে ভিজে খেলছে। ওদের মধ্যে একটি বড়ো মেয়ে—বছর চৌদ্দ বয়স হবে বোধ করি, সাড়ীর আঁচলে তার চোখ বাঁধা। তাকে ঘিরে এক গাদা ছেলে-মেয়ের হল্লা। শ্রীহর্ষ তাকিয়ে রইলো সেই দিকে—আশ্চর্য, অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো সে। সিগারেট শেষ হ'য়ে গেল। শ্রীহর্ষ তাকিয়ে রইলো : বড়ো মেয়েটি কারুকেই ধরতে পারছে না। পরিশ্রমে পাকা বিলেতী বেগুনের মতো টুক্‌টুক্ ক'রছে মেয়েটির মুখ। টমি কুকুরটাও লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছে ছেলেমেয়েগুলির সঙ্গে—মাঝে মাঝে এসে বড়ো মেয়েটির সাড়ী কামড়ে ধরছে। শ্রীহর্ষ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো। মোটর মোছা ছেড়ে অবিনাশও তাকিয়ে আছে ওদের খেলার দিকে।

পায়ে শাড়ী জড়িয়ে হঠাৎ ধুপ ক'রে প'ড়ে গেল সেই মেয়েটি। টমি ছুটে এসে তার লম্বা বেণীটা কামড়ে ধ'রে টানতে লাগলো।

মেয়েটি খিল্ খিল্ ক'রে হাসতে হাসতে ব'ললে, এই।—উঃ, লাগচে। ধরেচি, তিমির—ওঠ—

টমিকে জড়িয়ে ধরেছে মেয়েটি—টমি কামড়ে দিয়েছে হাতে। সকলে হাত তালি দিয়ে হেসে উঠলো, অবিনাশও হাসলো। আর আশ্চর্য, শ্রীহর্ষও হেসে উঠলো।

এমন সময়ে হঠাৎ চোখ পড়লো অবিনাশের : শ্রীহর্ষ তাকিয়ে আছে। অবিনাশ ঝুঁকে ঝুঁকে মোটর মুছতে লাগলো জোরে হাত চালিয়ে। ছেলেমেয়েগুলি ছুটে পালালো।

ভয়ানক বিরক্ত হ'লো শ্রীহর্ষ, ফিরে এলো আবার তার বসবার ঘরে। ইজি-চেয়ারে এলিয়ে দিলে নিজেকে।

মেঘম্লান সকালের আলো ভেঙে ভেঙে সানাইয়ের অস্পষ্ট স্বরটি তখনও ভেসে ভেসে আসছে। ক্লান্ত দেহ মনের নিষ্পলক এক জোড়া চোখ মিলে শ্রীহর্ষ মেঘলা আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো—অনেক ক্ষণ। পৃথিবীকে আকাশকে সে যেন আজ এক নতুন দৃষ্টি দিয়ে দেখছে ভালো লাগছে তার—ভালো লাগছে না তার। ক'লকাতার বাইরের অবসর শান্ত লক্ষ্যহারা কোন একটা পরিবেশ তার অসুস্থ দেহের মস্ত বড় একটা আলস্যলোভী মনকে যেন আস্তে আস্তে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ জয়ার নাম মনে পড়লো তার। ইচ্ছে হ'লো, নিজের ঘরে গিয়ে বিছানার আশ্রয় নেয়। বড়ো ক্লান্ত সে।

এমন সময়ে সোফার এসে জানালো, গাড়ী তৈরী।

লেকের দিকে বাড়ী উঠছে। প্ল্যানের সামান্য একটু অদলবদল হবে। তার নিজের যাওয়া প্রয়োজন যাওয়ার কথাও ছিল, সোফারের দিকে তাকিয়ে শ্রীহর্ষ কিন্তু মনে মনে ব'ললে, না—সে যাবে না।

কিন্তু পরক্ষণেই সচেতন হ'য়ে উঠলো : আজ বিশ বছরের মধ্যে যা হয়নি—তা' কেমন ক'রে হবে! ক্লান্ত সে সত্যি, কিন্তু এই সকাল নটায় শোয়ার ঘরে ঢোকা তার পক্ষে একটা ভীষণ শক্ত কাজ ব'লে মনে হ'লো। সোফারের ওপরেই বিরক্ত হ'য়ে উঠলো শ্রীহর্ষ, তারপর বিশ বছরের কর্ম্মাভ্যস্ত উদ্যত মাথা উঁচু ক'রে সাজ-পোষাক প'রে বেরিয়ে পড়'লো শ্রীহর্ষ। ভেঙে পড়েনি সে, অসুস্থ নয়। ভারী পা ফেলে ফেলে মোটরে গিয়ে উঠলো শ্রীহর্ষ একটি মুখ উঁকি মারলো দোতলার জানালা থেকে—জয়ার মুখ। শ্রীহর্ষ দেখে চোখ নামিয়ে নিলে। মন ব'লে তার, এই বৃষ্টি বাদ্‌লায় না বেরোলেই হ'তো। দী

বেশ বছরের কর্ম্মক্লান্ত সে। মনে মনে হিসাব ক'রলে শ্রীহর্ষ, বিশটি বছর সে ছুটি কাকে ব'লে—জানে না। একদিন কিছুই যদি না করে সে—কি এমন তাতে এসে যায়। মন তার নিঃশব্দে কলরব ক'রে উঠলো: সোফার, গাড়ী ফেরাও।

কিন্তু গাড়ী হু-হু ক'রে ছুটে চলেছে। শ্রীহর্ষ এক কোণে চুপ ক'রে ব'সে রইলো। আর অশান্ত মন নিজের অসংখ্য অতৃপ্তির মাঝখানে ঘুরপাক খেতে লাগলো। আজ তার প্রথম মনে হ'লো, কোনো ছেলে মেয়ে নেই তার। বয়স হয়েছে। এতদিন শুধু সে কাজের মধ্যে ডুবে ছিল—অসংখ্য কাজ। অর্থ, সমাজ, প্রতিপত্তি উঁচু হয়ে উঠেছে তার চার পাশে। এরই ফাঁকে একদিন সে দ্বিতীয়বার বিয়ে ক'রেছিল জয়াকে, যেমন অনেকে ক'রে থাকে আত্মীয় বন্ধুর অনুরোধের চাপে; তারপর?—তারপর সারা দিন এবং প্রথম রাত্রির অনেকখানি সময় শুধু কাজ আর কাজ। রাত বারোটার পর অগাধ ঘুমের মধ্যে ক্লান্ত মস্তিষ্কের অবসর। এর মাঝে মাঝে বাইরের সফর। এর মধ্যে জয়া নেই। জয়ার স্পর্শ-করা একটি দিন রাত্রিও নেই—যা' স্মরণীয়। ধনী শ্রীহর্ষ তাকে বিয়ে ক'রে উদ্ধার ক'রেছে—সম্মান দিয়েছে, যেন এই-ই যথেষ্ট।

অন্যায় ক'রেছে সে, শ্রীহর্ষের আজ প্রথম মনে হ'লো, ছুটি নেবে সে—অন্ততঃ একটি দিন সব কাজ দূরে সরিয়ে রাখবে। ডাক্তারের উপদেশের উপরে জোর দিয়ে নিজেকেই যেন সে মনে মনে শুধোলে—কেন নেবে না সে ছুটি!

কিন্তু সোফার গাড়ী এনে থামালে লেকের ধারে, যেখানে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাড়ী উঠছে শ্রীহর্ষের। কি ক'রবে শ্রীহর্ষ! যন্ত্রের মতো নেমে পড়লো সে মোটর থেকে। দেখলো; ছুতোর মিস্ত্রী ধরণী চোখ বুজে নির্বিকারভাবে বিড়ি টানছে। সুরকি, মশলা আনতে সে আঁটসাঁট গড়নের একটি মজুরণী আড়ালে দাঁড়িয়ে হেডমিস্ত্রী কানাইলালের সঙ্গে চোখে মুখে চাপা হাসি নিয়ে কি যেন কথা কইছে। কুলি-মজুরদের অলস-মন্থর হাঁক-ডাক—হঠাৎ এক-আধ কলি গান।

শ্রীহর্ষের দীর্ঘ চেহারার সুমুখে সব থেমে গেল হঠাৎ। ধরণী মিস্ত্রী চমকে উঠে তৎপর হাতে অকারণে কাঠের ওপরে এক ঘা হাতুড়ি ঠুক ক'রে বসিয়ে দিলে, কানাইলাল ফুট নিয়ে সুমুখের দেয়াল মাপতে লেগে গেল। ইঞ্জিনীয়ার ছোকরা হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে এলো। আগে শ্রীহর্ষের আসবার কথা ছিল তার—একটু পরেই এসেছে। ছোকরা সপ্রতিভ কণ্ঠে বল'লে, একটু দেরী হ'য়ে গেল মিঃ রায়। প্ল্যানের কি গোলমাল হয়েছে নাকি—

শ্রীহর্ষ আস্তে আস্তে ব'ললে, আজ আর না যেন।

ইঞ্জিনীয়ার ছোকরার মুখ শুকনো হ'য়ে গেল। সে ভালো ক'রেই জানে, এই শ্রীহর্ষ লোকটা ঘড়ি ধ'রে কাঁটায় কাঁটায় কাজ করে—সময় সম্বন্ধে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতিকে ক্ষমা করে না। আম্‌তা-আম্‌তা ক'রে ব'ললে সে, এমন বেখাপ্পা কাজে আটকে গেলুম—দেরী হ'য়ে গেল একটু।—

শ্রীহর্ষ শুধু বিরক্তিভরা কঠিন দৃষ্টিতে তাকালো একবার, তারপর গম্ভীর মুখে গাড়ীতে উঠে ব'সলো। সোফার গাড়ীতে ষ্টার্ট দিলে।

এত বড়ো কাজ, এত টাকা, গেল বুঝি সব। ইঞ্জিনীয়ার ছোকরার কান্না পেল। শ্রীহর্ষ মুখ ঘুরিয়ে ব'সে রইলো। কাজ, কাজ—শুধু কাজ, কাজের মধ্যেই যেন ডুবে থাকতে হবে তাকে চিরদিন, এবং একা, হাঁ, শ্রীহর্ষের আজ প্রথম মনে হ'লো সে একা—অসংখ্য কাজের মধ্যে, অনেক লোক-জনের মধ্যে। সকলে তাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। সকলে যেন তার সুমুখে না আসতে পারলেই বাঁচে। শ্রীহর্ষ অতো বড়ো বাড়ীটার প্রত্যেকটি খুপরি আশ্রিত আত্মীয়-পরিজনে পরিপূর্ণ—তাদের সন্দেহ অন্তরঙ্গতা এতটুকুও মনে পড়লো না তার। আশ্চর্য্য, জয়ার নামটাও এই সূত্রে মনে পড়লো না শ্রীহর্ষের। মনে পড়লো সকালের সেই চোখ-বাঁধা বড়ো মেয়েটিকে, তার সুন্দর মুখের ভীরু পাণ্ডুরতাটি, তার নাম কোনো রকমে মনে ক'রে উঠতে পারলো না শ্রীহর্ষ। তবু তাকে ঘিরে তার এতদিনকার সমস্ত স্বপ্ন দুর্ব্বলতা বুকের মধ্যে উছলে উঠলো। তার লক্ষ্যহারা অতৃপ্ত মনের মাঝখানে সুধু যাকে পেল—তাকেই খুসী ক'রে দিতে ইচ্ছে হ'লো। নিজের খেয়াল-খুসী-মতো সোণা-রূপো নানা জিনিষে পকেট ভর্ত্তি ক'রে বাড়ী ফিরলো শ্রীহর্ষ। বাড়ীর কাছাকাছি এসে শ্রীহর্ষের মোটর

হঠাৎ থামলো রাস্তার একপাশে। বাক্স, বিছানা, স্যুটকেসে বোঝাই খান ছুই ট্যাক্সী রাস্তাটা জুড়ে দাঁড়িয়েছে।

একটি বৃদ্ধ লোক ব'লছে ; গিয়েই চিঠি দেবে—

বোধ করি, কেউ বাইরে যাচ্ছে। সুমুখে দীর্ঘ ছুটি। সে-ও তো বাইরে কোথাও যেতে পারে। মনে মনে ভাবলে শ্রীহর্ষ, মনে মনে ব'ললে, ক'লকাতার বাইরেই কোথাও যাবে সে। ক'লকাতায় বিশ্রী লাগছে তার।

গেটের মধ্যে মোটর ঢুকলো। শ্রীহর্ষ মোটর থেকে নেমে সিঁড়ি বেয়ে সোজা চলে এলো তার ঘরে।

পেছনে পেছনে বেয়ারাও এলো—শ্রীহর্ষের সুমুখে একখানি কার্ড তুলে ধরলো। শ্রীহর্ষ কার্ডের ওপরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে মহাবিরক্ত হ'য়ে উঠলো, চন্দ্রপুরার সেই অভ্রখনির ব্যাপারে ভদ্রলোকটি এসেছে—আসবার কথা ছিল তার, মনের তিক্ততা চেপে রাখতে পারলে না শ্রীহর্ষ—চেঁচিয়ে ব'লে ফেললে, ব'লে দে—আজ কোনো কথা হবে না।

অকারণে ধমক খেয়ে বেয়ারাটা যেন পাথর হয়ে গেল।

শ্রীহর্ষ আবার চীৎকার ক'রে উঠলো, যা—

বেয়ারা চ'লে গেল।

ঘরে শ্রীহর্ষ একা, আর ঘরের বাইরে জয়া নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো। শ্রীহর্ষর অভ্যাস-বিরুদ্ধ এই চেঁচামেচি, অসময়ে হঠাৎ শোয়ার ঘরে ঢোকা সবগুলো আজ কেমন যেন ছুর্ব্বোধ্য লাগলো জয়ার। হয়তো লোকটার খুব মোটা টাকাই কোথাও মার খেয়েছে। ভাবলো জয়া। সপ্তাহ ছুই আগে বোম্বেতে শ্রীহর্ষ বিশেষ অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিল, এখবর বাড়ীর কেউই জানে না। জয়াও জানে না। কোনো খবর কারুকে দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেনি শ্রীহর্ষ—মনেও হয়নি তার, এই বিত্তশালী সম্মান প্রতিপত্তি-শালী মস্ত লোকটার চারদিকে দীর্ঘদিন ধ'রে অনেক ব্যবধান গ'ড়ে উঠেছে আস্তে আস্তে।

ভয়ে ভয়ে জয়া ঘরে ঢুকলো—যেমন ক'রে অনেক গভীর রাতে নিঃশব্দে সে তার পাশের ঘর থেকে শ্রীহর্ষের ঘরে ঢুকেছে এসে। ঘুমে আত্মহারা শ্রীহর্ষ, জয়ার কোনোদিন কোনো কান্নার আওয়াজই তাকে জাগিয়ে

শ্রীহর্ষ হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে বিছানায়।

জয়া মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস ক'রলে, তোমার কি শরীর অসুস্থ ?

একটি নারী কণ্ঠের দরদ ভালো লাগলো শ্রীহর্ষের—কিন্তু অসুস্থ কথাটায় সর্ব্বাঙ্গ তার জ্বলে উঠলো। শুধু কাজের মধ্যেই ডুবে থাকতে হবে তাকে—তার কোনো ছুটি নেই যেন !

শ্রীহর্ষ জয়ার দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলে ; অসুখ করেনি—তবে ভালো লাগে না আর অতো ঝঞ্ঝাট। ভালো লাগছে না এখানে। বাইরে কোথাও যাবে জয়া ?

শ্রীহর্ষ আজ ভয়ানক ছুর্ব্বোধ্য। জয়া কি উত্তর দেবে, ভেবে পেল না। এ যেন হঠাৎ কোনো একজন স্বল্প-পরিচিত পুরুষ-বন্ধু তার কাছে প্রেম-নিবেদন ক'রে ব'সলো !

শ্রীহর্ষ তাকিয়ে রইলো জয়ার দিকে। জয়ার মসৃণ ছুটি বাহুতে, কণ্ঠে, মুখে—সর্ব্বদেহে কমনীয় যৌবনের উদ্ধত বিকাশ। এখনও বয়স তার ত্রিশ পেরোয়নি। জয়াকে আজ নতুন ক'রে ভালো লাগলো শ্রীহর্ষের।

জয়া আস্তে আস্তে ব'ললে, বেশতো—কোথায় যাবে ?

শ্রীহর্ষের সমস্ত আবার গোলমাল হ'য়ে গেল। চন্দ্রপুরা নামটা মনে এলো শুধু। ব'লে ফেললে, কেন—চন্দ্রপুরা—

ব'লবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়লো শ্রীহর্ষের : চন্দ্রপুরায় তার নতুন কেনা অভ্রখনি আছে—কিন্তু থাকবার জায়গা নেই, অধিকন্তু বাঘ-ভালুক আছে। বিব্রত শ্রীহর্ষ বললে, তুমিই ঠিক করো কোথায় যাওয়া যায়। কালই বেরিয়ে পড়বো।

তারপর রাঁচী এসে পৌছুলো ওরা।

একদিন হুনড্রু প্রপাত দেখতে গিয়ে দেখা হ'য়ে গেল সস্ত্রীক রবীন চৌধুরীর সঙ্গে।

রবীন ব'ললে, জয়া তুমি ! উঃ, কতোদিন পরে দেখা ভালো আছো ?

রবিনের সাগ্রহ প্রশ্ন আর জয়ার সলজ্জ সপ্রতিভ উত্ত ভালো লাগলো না শ্রীহর্ষের। পরস্পরের আলাপ-পরিচ হলো ওদের। শ্রীহর্ষের মতো কৃতকর্ম্মা বিরাট্ একটি

লোকের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সস্ত্রীক রবীন চৌধুরী ভারী খুসী হ'লো।

কথায় কথায় রবীন তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ব'ললে, জানো—আমার গানের প্রথম সার্টিফিকেট পাই জয়ার কাছ থেকে। আর ওইটেই শেষ। তারপর জয়ার দিকে তাকিয়ে হেসে ব'ললে, তোমার মতো সমঝদার আর পাইনি।

কি আর ব'লবে জয়া—নিঃশব্দে একটু হাসতে পারে শুধু। কিন্তু হঠাৎ শ্রীহর্ষের উদ্যত সন্দিগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে কুঁকড়ে গেল।

শ্রীহর্ষ ব'ললে, আচ্ছা—চলি এবার—

জয়া রবীনের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে সস্মিত মুখে ব'ললে, আমাদের ওখানে আসবেন একদিন।

তারপর ওরা বিদায় নিলে।

সারাটা পথ শ্রীহর্ষ শুধু ভাবতে ভাবতে এলো: রবীন লোকটা কে! জয়ার সঙ্গে আলাপটাই বা তার কি রকমের! অনেকবার ইচ্ছে হ'লো জিজ্ঞেস করে জয়াকে। কিন্তু পারলো না সে। সহস্র প্রশ্ন তার উষ্ণ মস্তিষ্কে ঘুরতে লাগলো।

সারাটা রাত্রি বিশ্রী এক অস্বস্তির মধ্যে ছটফট্ ক'রতে লাগলো শ্রীহর্ষ। ক'লকাতায় থাকতে ক'লকাতার বাইরেটা দুর্নিবার বেগে টানছিল শ্রীহর্ষকে। ছুটে এসেছিল জয়াকে নিয়ে নতুন ক'রে জীবনের অধ্যায় সুরু ক'রবার জন্যে। কিন্তু সমস্ত নতুনত্বের মোহ ছুটে গেল শ্রীহর্ষের। রবীনের উপস্থিতিতে রাঁচীর আকাশ-বাতাস বিষাক্ত হ'য়ে উঠেছে যেন তার কাছে। বিশ্রী একটা উত্তাপের জ্বালা আস্তে আস্তে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হ'য়ে গেল। শ্রীহর্ষের হঠাৎ এক সময়ে মনে হ'লো, জয়াও যেন জেগে আছে।

শ্রীহর্ষ নীরস কণ্ঠে শুধালো, ঘুমাওনি জয়া!

না, জয়ারও ঘুম আসছে না। ঘুমোতে পারছে না সে।

কেন ঘুমোতে পারছে না সে—কি ভাবছে সে! গভীর অন্ধকারে জয়ার দিকে একাগ্র দৃষ্টি মেলে দিয়ে অসহায়ের মতো চেয়ে রইলো শ্রীহর্ষ। রবীনকে হয়তো ভালোবাসতো

দেহ-মনের অপরিমিত অবসাদ আর মাথার দুঃসহ যন্ত্রণা নিয়ে শ্রীহর্ষের ভোর এলো। রাত জাগাবের রোগী। উত্তরহীন অসংখ্য জটিল প্রশ্ন আর সারা রাত্রি অনিদ্রা। শ্রীহর্ষ অসুস্থ হ'য়ে পড়লো।

ক্লান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে জয়া জিজ্ঞেস ক'রলো, তোমার শরীর কি খারাপ?

বেশ অসুস্থ শ্রীহর্ষ। কিন্তু কি উত্তর দেবে সে! একবার ইচ্ছে হ'লো, বোম্বেতে গিয়ে বিশেষভাবে সে যে অসুস্থ হ'য়ে প'ড়েছিল—বলে সে কথা। বলে: ভয়ানক দুর্বল সে। কিন্তু তার মনের মধ্যে যে বাসাহীন ভালো-বাসাটা নতুন নীড় বেঁধেছে, সে যেন সহস্র কণ্ঠে কলরব ক'রে উঠতে চাইলো, না—সে দুর্বল নয়, সে অসুস্থ নয়।

শ্রীহর্ষ সোজা হ'য়ে উঠে ব'সলো। জয়ার একটি হাত ধ'রে টেনে নিয়ে এলো কাছে। সমস্ত দুর্বলতাকে জোর ক'রে দূরে ঠেলে দিয়ে হাসলো শ্রীহর্ষ। ব'ললে, কেন,—বেড়াতে যাবে?

অনেক জিজ্ঞাসা চোখে নিয়ে জয়া ভয়ে ভয়ে তাকালো শ্রীহর্ষের দিকে। মনে মনে ভাবলো সে: কি ইঙ্গিত ক'রছে লোকটা? জয়ার মুখ দিয়ে শুধু একটি কথা খসে পড়লো, না—

মনে মনে ক্ষুণ্ণ হ'লো শ্রীহর্ষ। না—অসুস্থ নয় সে। আদর ক'রে ব'ললে, কেন—চলো না—জনচুর দিকে—

জয়াকে যেন চাবুক কষালো কথাগুলো। কান্না পেল তার।

বিকেলের দিকে সস্ত্রীক রবীন চৌধুরী এলো।

জয়া তাদের অভ্যর্থনা ক'রলে।

শ্রীহর্ষ নিজের ঘরে ইজি-চেয়ারে চুপচাপ পড়ে রইলো। ওদের সঙ্গে দেখা করার কোনো ইচ্ছে নেই তার—শরীরও দুর্বল। ওদের আলাপ-আলোচনা, ছেঁড়া-টুকরো উচ্ছল হাসি, রবীনের ভারী গলার স্বাস্থ্যকর উল্লাস যেন দমকা ঝড়ের মতো শ্রীহর্ষের নির্জন ঘরে এসে সমস্ত তচ্-নচ্ ক'রে দিলে।

শ্রীহর্ষ শুনতে পেল—রবীন ব'লছে, মিষ্টার রায় কোথায়?

জয়া মৃদু কণ্ঠে কি ব'ললো—শুনতে পেল না শ্রীহর্ষ ঠিক। তবু যেন সে স্পষ্ট শুনতে পেলো জয়ার গলা: অসুস্থ।

অসুস্থ! রবীন কি জোরে হাসে! শ্রীহর্ষ সোজা উঠে দাঁড়ালো। সুমুখের দরজা দেখতে পেল না সে। ঘরের আসবাবপত্র,.বাঁচির দিগন্তবিসারী প্রান্তর, পরিচ্ছন্ন আকাশ—সব যেন ঘুরছে। শ্রীহর্ষ ইজি-চেয়ার ধ'রে ব'সে পড়লো। অসহায়ের মতো অনেকক্ষণ ব'সে রইলো সে।

অবশেষে অর্গ্যানের সঙ্গে রবিনের সুন্দর কণ্ঠ যখন সমস্ত বাড়ীটার মাঝখানে ছড়িয়ে পড়লো—শ্রীহর্ষ তখন ব'সে থাকতে পারলো না। নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো নীচে।

বিরস হাসিতে সশব্দে হেসে শ্রীহর্ষ ব'ললে, এই যে—আপনারা এসেছেন। ভারী খুসী হ'লুম—ভারী খুসী হলুম।

মিসেস্ চৌধুরী সপ্রতিভ হাস্যে ব'ললে, বেড়াতে বেড়াতে এসে পড়লুম।

—বেশ, বেশ।

তারপর চুপ ক'রে ব'সে রইলো শ্রীহর্ষ। রবীন অনেক কথা কইলে, রবীনের স্ত্রী অনেক কথা কইলে। জয়া যেন কেমন জড়োসড়ো হ'য়ে রইলো। ভালো লাগলো না শ্রীহর্ষের। নিজে সে একটি কথাও কইতে পারলে না। ওদের আলাপ-আলোচনার ঝড়ের মাঝখানে ওরা যেন খড়-কুটোর মতো উড়ছে—শ্রীহর্ষ প'ড়ে আছে যেন অনড় অচল পাথর একখানা, নিঃশব্দ—প্রাণহীন। বার বার সে রবীনের দিকে তাকালো—আর জয়ার দিকে তাকালো। ওদের জয়োদ্ধত দেহ, ওদের মসৃণ উজ্জ্বল মুখ ভয় করে শ্রীহর্ষ। রবীনকে ভয় করে—জয়াকে ভয় করে—যৌবনকে ভয় করে শ্রীহর্ষ। বরং ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ঘৃণা করে—ওদের সকলকে সে ঘৃণা করে। রবীনের ছোট ছেলেটিকে কোলে টেনে নিয়ে সশব্দে চুমু খেলে শ্রীহর্ষ। ভারী সুন্দর ছেলেটা!

শ্রীহর্ষ মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা ক'রলে, এর বয়স কতো হ'লো মিসেস্ চৌধুরী?

ওর কাকা ওকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। এত দুষ্ট, সব মনে ক'রে রেখেছে!

—বটে! শ্রীহর্ষ আদর ক'রে আবার চুমু খেলে।

—শুনবেন? মিসেস্ চৌধুরী ছেলের দিকে তাকিয়ে ব'ললে, এই খোকা, পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর জিনিষ কিরে?

খোকা তোতাপাখীর মতো ব'ললে, মেয়ে—

—সব চেয়ে বড়ো কবি কে?

—খৈয়াম।

—সব চেয়ে ভালো জিনিস কি?

—মদ।

সকলরবে সকলে হাসতে লাগলো—শ্রীহর্ষও হাসলো—একেবারে স্বাভাবিক হাসি। ছেলেটিকে তার ভারী ভালো লাগছে।

রবীন শুধোলে, তোমার বয়স কতো খোকা?

—এক শ'—

সকলে হাসলো আবার। শুধু হাসতে গিয়ে শ্রীহর্ষের মুখটা বিকৃত হ'য়ে গেল। তার আর কিছুই ভালো লাগলো না। রবীন লোকটাকে এতটুকুও পছন্দ করে না সে।

তবু রবীন এলো তারপর দিন—একা।

শ্রীহর্ষ ব'সে রইলো নিজের ঘরে পাথরের মতো। আকাশে বিকেলের ছায়া কালো হ'য়ে এলো। সন্ধ্যার অন্ধকার আকাশ বেয়ে, সুমুখের প্রান্তর বেয়ে শ্রীহর্ষের ঘরে ঘন হ'য়ে এলো। অদম্য কৌতূহল হলো—নীচে নেমে যেতে। কি কথা কইছে রবীন আর জয়া, কতো পুরাতন দিনের কথা কইছে তারা! ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল! কি ক'রছে ওরা এখনো। এখান থেকে পালাবে সে—এখানে আর একটুও ভালো লাগছে না তার। বহু দূরে কোথাও পালাবে—যেখানে রবীন নেই। জয়াকে একা পেতে চায় সে। সেখানে কোথাও জীবনের দিনগুলি কাটিয়ে দেবে তারা। বর্ষা সন্ধ্যার ঘনান্ধকারে নিজেকে বড়ো একা মনে হ'লো তার—বড় উপেক্ষিত ব'লে মনে হ'লো। আর বড়ো দুর্ব্বল সে। বোম্বের সেই ডাক্তারের কথা মনে হ'লো: চলে যান না সুইজারল্যাণ্ড। অর্থ, সম্মান,

প্রতিপত্তি কি অভাব আপনার! এবার অবসর নিন। অবসর।—

জয়া যখন ঘরে ঢুকলো—অমনি ব'লে ফেললে শ্রীহর্ষ, সুইজারল্যাণ্ড যাবে জয়া?

শ্রীহর্ষের রক্তহীন ফ্যাকাসে মুখের দিকে নীরবে চেয়ে রইলো জয়া।

শ্রীহর্ষ অপ্রতিভ হ'য়ে ব'ললে, এখানে আর ভালো লাগছে না। চলো—কালই বোম্বে রওয়ানা হই। তারপর ওখান থেকে যতো শীগ্‌গির পারি—দেবো পাড়ি।

জয়া চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। শ্রীহর্ষ একেবারে নতুন তার কাছে। কর্মচঞ্চল—চলোর্মি। তাকে শুধু দেখে যাওয়া—শুধু শুনে যাওয়া।

শ্রীহর্ষ দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌লে। বললে, আমার স্বাস্থ্য বড়ো খারাপ, ডাক্তার বলেছিলো—গেলে ভাল হয়।

শ্রীহর্ষ শুধু এইটুকু ব'ললে—জয়ার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে। ব'ললে, এখানে এসে ব'সো একটু।

জয়া শ্রীহর্ষের পাশে এসে ব'সলো।

শ্রীহর্ষ নিজের অবসন্ন হাতের মধ্যে জয়ার একটি হাত টেনে নিলে। আর ব'ললে, অনেক কাজ ক'রেছি—এবার নির্ভাবনায় দিনগুলো কাটিয়ে দিতে চাই। খানিক থেমে তারপর ব'ললে, সে ভার তোমার। এখান থেকে কালই রওয়ানা হবো। কি বলো?

পরিপূর্ণ সম্মতির জন্যে জয়ার মুখের দিকে সাগ্রহে শ্রীহর্ষ চেয়ে রইলো।

ভোর হ'লো। ক'লকাতা থেকে শ্রীহর্ষের ম্যানেজার সদানন্দ এসে পৌঁছলো।

সদানন্দ ব'ললে, কবে ফিরবেন কোলকাতায়?

শ্রীহর্ষ হেসে ব'ললে, পালাও সদানন্দ। কবে ফিরবো আর না ফিরবো—ওসব খবর আর আমার কাছে জানতে চেয়ো না। তোমাদের Her Highness যদি শুনতে পায় একবার—আমাকে ফের ক'লকাতায় নিয়ে যেতে এসেছো, তা' হ'লে আর রক্ষে নেই হে। চাকরী যাবে—পালাও।

দীর্ঘ কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় শ্রীহর্ষের এই হাল্‌কা কথাবার্ত্তা একেবারে নতুন সদানন্দের কাছে। সে একেবারে জড়োসড়ো হ'য়ে মুখ নীচু ক'রে রইলো। শ্রীহর্ষের মনে কিন্তু কোনো অতীত নেই আজ—সে আজ একেবারে নতুন মানুষ, একেবারে সাধারণ। কাল রাতে জয়ার কাছে নিজের সমস্ত দুর্বলতাকে মেলে দিয়েছে সে—দিয়ে খুশী সে। সকলের মতো জয়াও তাকে ভয়ে, শ্রদ্ধায়, সম্ভ্রমে দূরে সরিয়ে রাখবে—এ সে চায় না। আজ কারো কাছেই সেটা চায় না শ্রীহর্ষ। সহজ হ'তে চায় সে। আজ ভোরে অনেক উঁচু থেকে নেমে এসে সহজ হ'য়ে গিয়েছে, সে একেবারে স্বাভাবিক। আজ এতটুকু প্রচেষ্টা নেই তার জন্যে। শ্রীহর্ষ নিশ্চিন্তে হাসিমুখে চেয়ে রইলো সদানন্দের দিকে। জয়া ওদিকে বোম্বে যাওয়ার তোড়জোড় ক'রছে।

শ্রীহর্ষ হেসে ব'ললে, অমন মুখ গোঁজ ক'রে ব'সে থেকো না বাপু। কথা কও। আমি কি বাঘ না ভালুক, তোমরা অমন ক'রে থাকো! কথা কও।

সদানন্দ মাথা চুলকে ব'ললে, কবে যাবেন তা' হ'লে?—

—যাবো কিসে! পালাও। শোক পালাও।

—মানে—

—মানে?—

অনেকগুলি দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছে সদানন্দ। একটা ব্যাঙ্ক ফেল্ মেরেছে শ্রীহর্ষের মাথায় ছাপান্ন হাজার ঋণ চাপিয়ে। দুঃসময় নাকি একা আসে না। শ্রীহর্ষের সেন্ট্রালেড ফার্মে আগুন লেগে অনেক ক্ষতি হ'য়েছে। এর ওপর কালিয়ারীর মজুররা তো অনেক দিন থেকেই ধর্মঘট নিয়ে আন্দোলন ক'রছে। সেটা এসেছে একটু সুরাহার পথে। শ্রীহর্ষ—কর্মাভিজ্ঞ শ্রীহর্ষের অনেক প্রয়োজন।

একটা বাষ্পীয় উত্তাপ শ্রীহর্ষের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো। শ্রীহর্ষ পাগলের মতো ঘরময় ছুটোছুটি ক'রতে লাগলো।

—সর্বনাশ করেছ সদানন্দ—এ্যাঁ, সব গেল যে! সদানন্দ—মোটরে যাবো—এক্ষুনি যাবো। সোফার—সোফার—রঘুবীর—

তর্-তর্ ক'রে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলো শ্রীহর্ষ। এক ধাপ, দু' ধাপ, তিন ধাপ। টল্‌তে টল্‌তে পড়ে গেল শ্রীহর্ষ।

সদানন্দ চীৎকার ক'রে উঠলো। এই রঘুবীর—ডাক্তার—

পৃথিবীটা শুধু ঘুরছে শ্রীহর্ষের নিষ্প্রভ চোখের সুমুখে। অবিচ্ছিন্ন—বিরামহীন—পৃথিবীটা ঘুরছে!

ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথ

শ্রীকালাচরণ মিত্র

আলোয় আলো হইয়া যায় সারা বিশ্ব রবির কিরণে। শুধু তাহাই নয়। যত ক্লেদ, যত পঙ্ক, যত দুর্গন্ধ উবিয়া যায় তপনতাপে।

সূর্য্যদেবের সঙ্গে ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথের তুলনা এদিক দিয়া অত্যুক্তি, কে বলিল? জীবৎকালে বিশ্বকবি বলিয়া যে খ্যাতি তিনি অর্জ্জন করেন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সর্ব্বত্র তাহা অভূতপূর্ব্ব। সত্যই আমরা—

"জগৎকবি সভার মাঝে তোমার করি গর্ব্ব—
বাঙ্গালী আজি গানের রাজা, বাঙ্গালী নহে খর্ব্ব।"

তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন এবং উহার সদ্ব্যবহারও করিয়া গিয়াছেন ষোলআনা। এমন কোন বিষয় নাই, যাহাতে তিনি জার্ম্মাণ কবি গেটের ন্যায় আলোক-সম্পাত না করিয়াছেন কোমলকান্ত ভাষায় ও অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে। পুণ্যগন্ধবাসিত করিয়া গেলেন তিনি বসুন্ধরার বায়ুমণ্ডল, সঙ্গেও লইলেন সেই সৌরভ অমরধামে।

আকস্মিক না হইলেও, তাঁহার মহাপ্রস্থানে আমরা শোকবিহ্বল, জগদ্বাসী মুহ্যমান। তিনি কিন্তু অনেকদিন হইতেই প্রস্তুত হইতেছিলেন:

"একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে
সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক মহামরণপারে।"

কারণ—

"যা দিয়েছ আমার এ প্রাণ ভরি
খেদ রবে না, এখন যদি মরি।"

তখন অনুভব করিলেন—

"ঐ যে সন্ধ্যা নামে সাগর-তীরে।"

সুতরাং—

"কখন তুমি আসবে ঘাটের পরে
বাঁধনটুকু কেটে দেবার তরে?"

কাল যেমনই পূর্ণ হইল—

'শ্রাবণ অন্ধকারে মেঘের রথে
সে যে আসে, আসে, আসে।'

তখনই নিবেদন জানাইলেন:

"এবার নীরব ক'রে দাও হে তোমার মুখর কবিরে।"

"একদিন যে গেয়েছে গান
আজকে তারি হোক্ অবসান!"

তবুও একটু ত্রাস ছিল পূর্ব্বে—

"পুরাণো আবাস ছেড়ে যাই যবে,
মনে ভেবে মরি কি জানি কি হবে!"

কিন্তু শঙ্কা অহৈতুকী, যে হেতু—

"নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন।"

এবং—

"তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর,
নাহি কোন মানা, নাহি কোন ডর।"

আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে চির-পরিচিতের হাতে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া ধন্য হইয়াছি। তিনি ত বহুপূর্ব্বেই গাহিয়াছেন—

"রাজার বেশে চল্‌বে হেসে
মৃত্যুপারের সে উৎসবে।"

তজ্জন্য সকল আয়োজন তিনিই পূর্ণ করিয়াছেন—

"যা কিছু মোর সঞ্চিত ধন
এতদিনের সব আয়োজন
চরম দিনে সাজিয়ে দেব উহারে
মরণ যেদিন আসবে আমার দুয়ারে।"

সত্যই মরণ যেদিন আসিল, কবি জীবনের পরিপূর্ণ সম্পদ্ লইয়া রাজার বেশেই পরপারে গমন করিলেন।

চিত্রকর্মে নূতন যুগ

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ

ইউরোপের চিত্রকলায় ১২৯০ সাল থেকে অর্থাৎ যে সময় থেকে ইতালীর চিত্রকর জিয়াত্তো (Giatto) বাস্তব ধরণের ছবি আঁকা শুরু করলেন, সেই সময় থেকে প্রায় ১৮৫০ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ ৫.৬ শত বৎসর ধরে যত চিত্রশিল্পী ছবি এঁকেছিলেন সকলেই প্রায় বস্তুবাদী। তাঁদের চিত্রগুলি রূপবাহী বা ভাববাহী হলেও, মুখ্যতঃ উহার বিষয়-বস্তুর ঠিক বাস্তব আকৃতিটিকেই আঁকা হত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দুইটি জিনিষ এই একঘেয়ে রিয়ালিষ্ট বা বাস্তব পদ্ধতির প্রতি চিত্রকলারসিক-সমাজের বীতরাগ এনে দেয়। প্রথম হ'ল ফটোগ্রাফির সৃষ্টি, আর দ্বিতীয় হ'ল নূতন নূতন তৈল রং বা জল রঙের আবিষ্কার এবং বৈজ্ঞানিক উন্নতি।

১৫০৫ সাল থেকে বাস্তব চিত্রকলাবিদ্ মনীষি সাঞ্জিও র‍্যাফেলের চিত্রাঙ্কনধারা প্রকৃতপক্ষে সারা পাশ্চাত্য জগতের চিত্রকলাক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রসার লাভ করেছিল। র‍্যাফেল স্কুলের পদ্ধতি অনুসরণে বাস্তবের সঙ্গে সৌসাদৃশ করে এবং ভাবপূর্ণ করে ফ্রান্সে একদল চিত্রকর ছবি আঁকতে সুরু করেন। এঁরাই পরে ক্লাসিষ্ট বলে পরিচিত হন। ফ্রান্সেই যত কিছু নূতন নূতন পন্থার উদ্ভব হয়েছিল যেমন—ক্লাসিষ্ট, রোমান্টিষ্ট, ইম্প্রেশনিষ্ট, পোষ্ট ইমপ্রেশনিষ্ট, কিউবিষ্ট, ফভিষ্ট প্রভৃতি।

ইংলণ্ডে র‍্যাফেল স্কুলের গতানুগতিকতায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে ১৮৪৮ সালে একদল চিত্রকর র‍্যাফেলের পূর্ববর্তী যুগের অঙ্কনরীতি পুনরুদ্ধারণে প্রয়াসী হলেন। তাঁরা প্রাক্-র‍্যাফেলাইট বলে খ্যাতি লাভ করেন। এই পুনর্জাগরণের নেতৃত্ব করলেন যশস্বী চিত্রকলাবিদ্ হাণ্ট (Hoenan Hunt), মিলায়ে (Everet Millais) এবং রসেটী (Dante Gabriel Rosetti)। ফ্রান্সেও এই গতানুগতিকতার প্রতিক্রিয়ার ফলে ইম্প্রেশনিজ্‌ম্ (Impressionism)-এর উদ্ভব হ'ল। বিখ্যাত ফরাসী চিত্রকর 'পিসারো' এই নূতন ঢং-এর অগ্রগামী।

এডওয়ার্ড মানে (১৮৩৩-৮৩), এডগার দেগা, ক্লড্ মনে, স্কুলের চিত্রকলাবিদ্, কিন্তু এঁরাই ইম্প্রেশনিজ্‌মের উদ্যোক্তা। বাংলায় এই ধারাকে সমগ্র দৃষ্টিবাদ শব্দে অভিহিত করা যেতে পারে। শিল্পী রঙের কেরামতিতে এবং ছবির বিশেষ অঙ্কন রীতির (ট্রিটমেণ্ট) সাহায্যে দ্রষ্টার কল্পনায় প্রতিফলিত বস্তুর অখণ্ড রূপটির ধারণা ছবিতে ছাপ (ইম্প্রেশন) রেখে বস্তুর গঠন সংস্থানের (অ্যানাটমির) দিকে এঁরা মন দেন না।

আত্মচিত্র

শিল্পী: প্যাবলো পিকাসো—কিউবিজমের প্রবর্তক

হুইষ্টলার, মানে এবং মনে প্রভৃতি ফরাসী চিত্রবিদ্‌গণ সমগ্র ইউরোপে পূর্বেকার অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তাকে দূরীভূত করে একটা নূতন আদর্শ সমসাময়িক চিত্রকরদের সামনে ধরলেন।

এডওয়ার্ড মানেকে সমগ্র দৃষ্টিবাদের সত্যিকার প্রতিষ্ঠাতা বলা চলে। তাঁর এবং রেনয়ের ছবি ফরাসী চিত্রকলা ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে এক আন্দোলনের সৃষ্টি করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এঁরা এই নব বিক্ষেপণের প্রতিষ্ঠা

(Corot—১৭৯৬-১৮৭৫) কতকগুলি ছবি থেকে পাই। তারপর কোরোর সুযোগ্য ছাত্র পিসারো এই নব ধারা প্রচলনের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু উত্তরকালে পিসারো অপেক্ষা মানে, মনে, রেনয়র এবং সিস্‌লে এঁরাই সফল হয়েছিলেন এই আধুনিক ধারা প্রবর্তনে।

ইংলণ্ডে কেহ কেহ বলেন, হোগার্থ এবং গেইনসবরোর এক একটা ছবিতে ইম্প্রেশনিজমের ছোঁয়াচ পাওয়া যায়। হোগার্থের বিখ্যাত শ্রিমপ্ (Shrimp) গার্ল ছবিটী ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ। এই চিত্রে শিল্পী হোগার্থ দেখাচ্ছেন প্রাণের বা সজীবতার প্রাচুর্য (Life more abundant in her face)।

উৎকেন্দ্র শক্তি : Centrifugal force — শিল্পী : Giacoma Balla

২

ক্যামিল্‌এ পিসারো (১৮৩০-১৯৩০) ছিলেন প্যারীর শতবর্ষব্যাপী চিত্রকলার উৎসবিশেষ। তাঁর দু'টী সুযোগ্য শিষ্য পল গগিন ও ভ্যানগগ্‌ এবং তাঁদের অগ্রগণ্য খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী পল সেজাঁ—এই ত্রয়ী মিলে সমগ্র দৃষ্টিবাদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আর এক নব বিক্ষেপণের অবতারণা করলেন যার যথার্থ নাম হওয়া উচিৎ ছিল এক্সপ্রেশনিজম্ (Expressioism), যে নামে জার্মাণীতে একদল প্রভাবান্বিত চিত্রশিল্পী নূতন পদ্ধতিতে ছবি আঁকেন। কিন্তু এই নব ধারাকে ইম্প্রেশনিজমের পরে জন্মাল বলে' চিত্রকলা-সমালোচক রজার ফ্রাই নাম দিয়েছিলেন পোষ্ট ইম্প্রেশনিজম।

বলেছি এই নূতন দলের অগ্রণী ছিলেন পল সেজাঁ (১৮৩৯-১৯০৬) এবং এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েছিলেন সেজাঁ, ভ্যানগগ এবং পল গগিন। সেজাঁ মূলতঃ ইম্প্রেশনিষ্ট, কিন্তু প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তাঁরই কাছ থেকে জন্মগ্রহণ করল পোষ্ট ইম্প্রেশনিজম। তাঁর মত শক্তিশালী এবং প্রতিভাবান্ চিত্রকরের অভ্যুদয় ফরাসী দেশে কমই হয়েছিল। এই নূতন মতবাদে উপরোক্ত ত্রয়ী পোষ্ট ইম্প্রেশনিষ্ট চিত্রকরগণ ছবিতে ড্রয়িং বা অঙ্কনকে গৌণ মনে করিতেন, কিন্তু বেশী নজর দিতেন রং ছাপাবার দিকে। রংএর তুলির উপরই অধিক নির্ভর করে' রঙের কারিকরিতে ছবির সৌন্দর্য ফোটাবার চেষ্টা করতেন—রঙের ঔজ্জ্বল্যে ও আলো দ্বারায় (শেড-এ) দ্রষ্টার মনে পরভাবকে পূর্ণ প্রকাশ করবার চেষ্টা করতেন।

এঁদের আর একটী উদ্দেশ্য ছিল তৃতীয় আয়তিকে (Third Dimension) যতটা ছবিতে ফোটান সম্ভব সেই ভাবে তুলি চালান এবং ছবির ভলুম ও ওয়েট্ যতটা সম্ভব তার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া। পলসেজাঁ অর্থ উপার্জনের জন্য পোষ্ট ইম্প্রেশনিজমের সৃষ্টি করেন নি, করেছিলেন প্রকৃতিকে তাঁর নিজস্ব দর্শন-ভঙ্গীতে দর্শকের চক্ষে সহজবোধ্যভাবে রূপায়িত করে' ইউরোপের চিত্রকলায় নূতন কিছু অথচ ভাব ও রসপূর্ণ উচ্চ ধরণের এক নব পদ্ধতির প্রচলন করার উদ্দেশ্যে।

"His Endeavour was to accentuate volume and weight to make the 3rd. dimension, more clearly and immediately perceptible to the beholder's eye than it is in actual nature, when we are left to guess by experience and by memory of touch." —*Orpen.*

পল সেজাঁ ছবিতে তৃতীয় আয়তি এবং গভীরতা বা ছবির ওয়েটকে বিশেষভাবে প্রস্ফুটিত করতে চেষ্টা করতেন যাহাতে দ্রষ্টার চক্ষের সম্মুখে বিষয়বস্তুর বাস্তব

রূপটির হুবহু নকল প্রতিচ্ছবি না থেকে বরঞ্চ অন্তর্নিহিত একটা অর্থের সন্ধান রয়ে যায়—এবং সেই অর্থ তখন আমরা ধারণা করব, আমাদের অভিজ্ঞতা এবং স্পর্শের স্মৃতিতে।

দৈনিক কাজ শিল্পী : উইলিয়ম রবার্টস্

এই জিনিষটা সেজ্বার পোর্ট্রেটে, মানব মূর্তির প্রতিকৃতির অঙ্কনে, কি ল্যাণ্ডস্কেপ বা প্রকৃতির সৌন্দর্যাঙ্কনে বেশ লক্ষ্যণীয়—চিত্রের গভীরতা (depths) এবং পারস্পেক্টিভ দিকটা তিনি বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করতেন। কাণকাটা ভ্যান গগ্ (১৮৫৩-৯০) তিন জনের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। খ্যাপাটে গোছের লোক। জাতিতে ওলন্দাজ এবং পেশায় ছিলেন মিশনারী পাদরী। কিন্তু পরে তিনি হয়ে উঠলেন একজন স্বনামধন্য পোষ্ট ইম্প্রেশনিষ্ট চিত্রকর। ভ্যান গগের ছবির টেক্‌নিক্ ছিল অদ্ভুত, অথচ সে ছবিগুলি লোকের মনোহারী। তাঁর নূতন টেক্‌নিকে বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ছবিতে সামান্য জিনিষের মধ্য থেকেও গভীর চিন্তার খোরাক থাকৃত। 'He was a visionary who founded a deep meaning in the humblest objects, which his art invested.

—*Orben.*

অতি তুচ্ছ পদার্থ তাঁর চিত্রকলায় স্থান পেত এবং তাহার মধ্যেও তিনি গভীর অর্থ পেতেন—তিনি ছিলেন বহুদর্শী বা দূরদর্শী।

মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখে ভ্যান গগ্ প্রায় বিচলিত হতেন এবং তারই প্যাথেটিক বা ক্লেশময় রূপ দেবার চেষ্টা করতেন। বাহিরে তিনি গর্বিত এবং বদমেজাজী ছিলেন, কিন্তু অন্তরে মনুষ্যজীবনের ক্লান্তিকে গভীর অনুভব করতেন, সেইগুলিই তাঁর ছবিতে ফুটে উঠত। কিন্তু ক্রমশঃ তাঁর মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার ফলে কাণটা খোয়া যায়। একদিন একটা কাফেতে বসে তাঁর এক প্রণয়ীর সঙ্গে গল্প করছিলেন। মেয়েটা তাঁর কাছে এটা দাও, ওটা দাও বলে আবদার করছিল—কথায় কথায় বোধ হয় তাঁকে গরবাজী দেখে বলেছিল "কিছু না দিতে পার ত তোমার একটা বড় কাণ দিও।" গগের কাণ দুটা সম্ভবতঃ বড় গোছের ছিল। বড়দিনের পূর্বে সেই মেয়েটা যে সমস্ত উপহার পেয়েছিল তার মধ্যে দেখ্‌ল ভ্যান গগের

পিকাসোর প্রতিচিত্র শিল্পী : Juan Griz

কাছ থেকে এক বড় প্যাকেট এসেছে—খুব আনন্দসহকারে সে খুলে দেখ্‌ল একটা কাণ—শিউরে উঠ্‌ল মেয়েটা। অনুসন্ধানে জানা গেল উন্মাদগ্রস্ত শিল্পী ডাক্তারের বাড়ী

গিয়ে একটা কাণ কেটে এমনিভাবে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কাণ কেটে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা অবস্থায় তাঁর মনে যে একটা রোমান্স জেগে উঠেছিল, তার পরিচয় পাওয়া গেছল ওই অবস্থায় অঙ্কিত কতকগুলি তাঁর নিজের হাতের ছবি থেকে।

পিসারোর ছাত্র হিসাবে পল গগিন (১৮৪৮-১৯০৩) ছিলেন ভ্যান গগের বন্ধু এবং পরে হয়েছিলেন সমপন্থী। গগিনের ধারণা ছিল য়ুরোপের সভ্যতা অতি দূষিত—

অতি আধুনিক চিত্র—ক্রুশবাহী খৃষ্ট   শিল্পী : ষ্টানলি স্পেনসার

সমাজ তাতে সুস্থ থাকতে পারে না। কৃত্রিম সামাজিকতা তাঁর অত্যন্ত কটু লাগত, এই জন্য তিনি দেশ ত্যাগ করে সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণে তাহিতী দ্বীপে গিয়ে আদিম জাতিদের মধ্যে আদিম সরল রীতিতে বাস করতে থাকেন। সে সময় শিল্পী কতগুলি ভারী সুন্দর ছবি এঁকে-ছিলেন—নূতন রকমের তাহিতী জীবন-যাত্রার তাহিতী মেয়েপুরুষের—পোষ্ট ইম্প্রেশনিজমের বিক্ষেপণে।

৩

গগিন প্যারিসের চিত্রবিদ্যার ফভিষ্ট আন্দোলনের সূচনা আরম্ভ করেন—যার পূর্ণতা লাভ ঘটে প্রকৃতপক্ষে সেজানী ম্যাটিসের ছবিতে। ম্যাটিসের জন্ম ১৮৬৯ সালে, তিনি (Matisse), পিকাসো (Pablo Picasso), জর্জ ব্রাক্, ক্যান্দিস্কি (Kandisky—German exponent of Expressionism) দেরাএঁ এবং লেজার প্রভৃতি চিত্রকলায় এক নূতন বিক্ষেপণের সৃষ্টি করলেন—কিউবিজ্‌ম্ বা ত্রিকোণিকতা। সেজাঁর প্রবীন বয়সের ছবিগুলি ভাল করে বিচার করলে বোঝা যায় তখন থেকেই সত্য কিউবিজ্‌মের ক্রমবিকাশ আরম্ভ হয়েছিল। সেজাঁ ক্যানভাসের উপর রং চাপাতেন ব্লক ফর্মে—কারণ তাতে তিনি ছবির অন্যান্য দ্রব্যের মাপ অনুযায়ী (ব্যালেন্সে) বিষয়বস্তুকে অধিকতর বাস্তব করে অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশ করতেন।

প্যারিসে অতি শীঘ্রই 'আদিম আন্দোলন' (fauviste movements) চাপা পড়ে গিয়ে কিউবিজ্‌ম বিস্তার লাভ করতে থাকে। জিনিষের আয়তনকে বোঝাতে প্যারো পিকাসো, ব্রাক্, দেরাঁএ প্রভৃতি চিত্রবিদ্‌দের মনে হল ত্রিকোণাকারে ছবি আঁকাটা নূতন রকমের এবং সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিকর। কিন্তু সত্য কথা বল্‌তে কি, আমাদের এই ছবি তেমন ভাল লাগে না—বড় বেশী জটিল মনে হয়; পল গগিন্ ফবিষ্ট হলেও, প্রিমিটিভ মতবাদ-এর আর এক ধাপ এগিয়ে সেজাঁর মত বল্লেন, ক্রীষ্টাল (crystal) হল সমস্ত জিনিষের আদি রূপ—অতএব কোন বস্তুর বা বিষয়ের আদি রূপ দিতে হলে সোজা লাইনে (সরল রেখায়) ছবিতে তাদের ত্রিকোণাকারে আঁকতে হবে। বাঁকা লাইনে (curved line) এতদিন ধরে যে ছবি আঁকার ধরণ চলে আসছে তাকে বর্জন করে খণ্ড খণ্ড সরল রেখায় বিষয়বস্তুর রূপ দিয়ে এক অদ্ভুত অথচ নূতন ধারার প্রবর্তনা তিনি করলেন। বক্ররেখা যে এঁদের ছবিতে নেই এমন নহে, তবে ত্রিকোণিকতা বা কিউবিজ্‌মের প্রথম বৈচিত্র্য দেখি রেখার ব্যতিক্রমে।

এই নূতন দলের অঙ্কন-পদ্ধতি দুইটী ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। প্রথম হ'ল 'শক্তিই সৌন্দর্য' (strength is beauty) আর দ্বিতীয় হ'ল 'বক্র রেখা' অপেক্ষা সরল রেখা বলীয়ান।' কিউবিজ্‌মের

জন্ম দিয়েছিলেন প্রকৃতপক্ষে পিকাসো। ইনি জাতিতে স্প্যানিস্—গোড়ার দিকে তিনি ছিলেন পোষ্ট ইম্প্রেশনিষ্ট, কারণ তখনকার ছবিগুলিতে কিউবিজ্‌মের অস্বাভাবিকতা ছিল না। অত্র প্রকাশিত শিল্পীর আত্মচিত্রখানি এই সমস্ত ছবির পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু পিকাসোর ছাত্র বা শিষ্য জোয়ান্ গ্রীজ্‌এর গুরুর চিত্রখানি একটা খাঁটী কিউবিজ্‌মের অন্তর্ভুক্ত ছবি। এরকম একখানি বিখ্যাত ছবি এঁকেছিলেন পিকাসো 'Lady in a mantilla'—ঘোমটা পরা মেয়ে। এই সমস্ত মুখাবয়ব চিত্রগুলি দেখলে মনে হবে কাষ্ঠখোদিত চিত্রের প্রতিলিপি বিশেষ, যাতে বাঁকা বাটালী চলেনি—জ্যামিতিক আকারে সোজা রেখার টানে জটিল এক চিত্রের মাঝে, শিল্পী ভাবের উপাদানকে এমন অদ্ভুতভাবে বিকাশ করতেন যে কিউবিজ্‌মকে লোকে তুচ্ছ করে যেতে পারত না। এঁদের অনুসরণ করে সুদক্ষ ভাস্কর শিল্পী জেকব্ এপষ্টাইন ত্রিকোণাকারে ছবি আঁকেন—তাঁর রকড্রিল্—পাথর খোদাই করা ছবিখানি এখানে দেওয়া গেল।

এমনি আর এক নব বিশ্লেষণের সৃষ্টি হয়েছে পাশ্চাত্যের চিত্রকলা ক্ষেত্রে—যার নাম ফিউচারিজ্‌ম (futurism)। এর উৎপত্তি ইটালীতে—যেখান থেকে একদিন চিত্রকলার উন্নতি সারা য়ুরোপে ছড়িয়েছিল। চিত্রবিদ্যার এই যে নূতন কৌশল এর হোতা হলেন সিনর ম্যারিনেট্টি এবং এই ফিউচারিষ্ট দলের সভ্য হলেন গিওকম্বো বালা (Giocombo Balla) ব্রকসিওনি, সিভেরিনি, কারা, রুসলো প্রভৃতি। এঁদের ধারণা হ'ল চিত্রের মধ্যে শাশ্বত গতির আঁক না দিলে ছবির পরিপূর্ণতা লাভ হয় না। "Universal dynamism must be rendered as a dynamic sensations." এই জন্য ফিউচারিজ্‌মের বৈশিষ্ট্য হ'ল ছবিতে বিষয়-বস্তুর চাঞ্চল্য এবং গতিকে আংশিকভাবে রূপায়িত করা।

এই প্রবন্ধে বাল্লার উৎকেন্দ্র শক্তি (centrifugal force) ছবিখানি দেওয়া গেল। ছবিটা যেন গোত্র ছাড়া—কতকগুলি ঘূর্ণায়মান বৃত্ত থেকে নীলাভ ছটা বিক্ষিপ্ত হচ্ছে, যার অর্থ হচ্ছে শাশ্বত গতির রূপকে চিত্রায়িত করে' কি ভাবে আলঙ্কারিক ছবি আঁকা সম্ভব তাহাই দেখানো। ইহা পৃথিবীর গতির একটা চিত্ররূপ,

রক ড্রিল শিল্পী : জ্যাকব এপষ্টেন

যাহা সাধারণের সহজ-বোধগম্য নয়, অথচ তারও একটা অন্তরঙ্গ ভাব ও অর্থ আছে। এ সম্বন্ধে অর্পেন বলেছেন —"An abstract painting, that succeeds in expressing an abstract idea, is a clearly legitimate art, but pictures of this calibre are unfortunately the exception among abstract paintings."

জলধর-কথা

শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনী লেখা

জলধরদা তাঁর জীবন কথা যখন প্রথম বর্ণনা সুরু করেন, তখন তা লিখতেন নরেন বোস। তাঁর 'ক্যালকাটা হোটেলে'। তারপর বদলী সূত্রে (১৯৩২) আমি কলকাতায় আসার কিছুকালের মধ্যেই দাদা আমার বালীগঞ্জের মনোহরপুকুরের বাড়ীতে সন্ধ্যায় নিত্য আসতেন। এ আসা তাঁর তিরোধানের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল। তাঁকে উপলক্ষ করে আরও অনেকে অনেক সময় আসতেন। শরৎচন্দ্র ও আসতেন। তাঁর বাড়ী ছিল আমাদের অনেকটা সামনা-সামনি। মাঝখানে ছিল খানিকটা খেলার মাঠ। ও-রাস্তায় বাড়ীঘর তখন অল্পই ছিল।

স্বর্গীয় জলধর সেন

জলধরদা ছিলেন অজ্ঞাত-শত্রু ও সকলেরই 'দাদা'। এমন 'দাদা' হওয়া যে-কেউ হতে পারে না। বহুবার বহুস্থানে তিনি বলেছেন—সরকার বাহাদুর তাকে রায়বাহাদুরিতে সম্মানিত করেছেন। এ সম্মান তাঁর মারফতে দেওয়া হয়েছে বাংলা সাহিত্যকে। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড় সম্মান দেশ তাকে দিয়েছে তাঁকে সর্ব্বসাধারণের 'দাদা' করে'। যার কাছে 'বাহাদুরী' সম্মান দাঁড়াতেও পারে না।

কেন জানি না—সকলেরই যেমন তাঁর প্রতি একটা বিশেষ শ্রদ্ধা ও টান ছিল—আমারও তেমনি ছিল। হয়তো বা বেশীই ছিল। বহুকাল আগে লৌহ অথবা ধাতু-বিষয়ক প্রবন্ধাদির আলোচনায়, দাদা অধ্যাপক [illegible] মারফত তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় ও পরে বহু বহুবার লৌহতীর্থ জামসেদপুরে উভয়ের সাক্ষাতের ফলে বন্ধুপ্রীতির ঘনিষ্টতর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। কলকাতার সেই সম্বন্ধ 'তর' থেকে 'তম'য় এসে—কনিষ্ঠ ভ্রাতার অধিক স্নেহ বর্ত্তমান লেখক লাভ করেন ও অন্তরঙ্গভাবে মেশবার সুযোগ ও অধিকার আপনিই এসে পড়ে। তাই তাঁর জীবনের শেষ ১৮ বৎসর প্রায় ছায়ার মতই তাঁর সঙ্গে নানাস্থানে, সভা-সমিতিতে, হাটে-ঘাটে, বাটে-মাঠে, বাসে-ট্রামে, ট্রেনে-মোটরে, গোশকটে, ঐতিহাসিক ভগ্নস্তূপে, প্রাচীন মন্দিরাদিতে আমরা একসঙ্গে শহরে-বাহিরে—পাহাড়-জঙ্গলে-পল্লীতে একত্র বাস ও ভ্রমণ করেছি। কথাচ্ছলে দাদার অজ্ঞাত জীবনের অনেক পরিচয়ও সংগ্রহ করি। ক্রমে তাঁকে ধরে বসি যে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে একমাত্র তিনিই বাংলা সাহিত্যের গত পঞ্চাশ বৎসর একটা ইতিহাস আমাদের দিতে পারেন। সেটা আমাদের চাইই।*

জলধর দা বললেন, "নরেন বোস তাঁর জীবনী খানিকটা লিখেছেন"। আমি বললাম, "বাকীটাই বা বাকী থাকে কেন? আমিই কেন তা লিখি না? দ্রুত লিখতে আমিও হয়ত পারি—অবশ্য নরেন বোসের ওপর ঈর্ষ্যান্বিত হয়ে নয়"।

* জীবনী লেখা অনেক দূর এগিয়ে—"স্মৃতি-তর্পণ"-এর মাঝখান দিয়ে এই দিকে একবার চেষ্টা হয়। তার পরেই নানা কারণে এ প্রচেষ্টা তিনি ছেড়ে দেন ও বলেন যে ওটা ভবিষ্যৎ লেখকগণ প্রয়োজন বোধ করেন তো করবেন।

সুতরাং আমার লেখা সুরু হ'ল, ডিক্‌টেশন তাঁর। সেই থেকে তাঁর শেষ-জীবনের অনেক লেখাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়, তার অধিকাংশই আমার গৌরব—আমার হাতের লেখায়। তিনি ও বহু বন্ধু বান্ধব এই জন্য আমার নাম দেন "দাদার গণেশ।" এটা বড় সোজা সার্টিফিকেট নয়।

এই যে তাঁর জীবনী-লেখা সুরু হলো—এতে, সর্বথা যেমন হয়ে থাকে,—কথার পৃষ্ঠে কথা, আলোচনার পর আলোচনা, গল্পের ওপর গল্প চলতে থাকলো। যখনি কোন জিজ্ঞাস্য বিষয় বা ঔৎসুক্য কিছু উপস্থিত হতো—সেদিন সেইখানেই কলম থামতো—সেটা হতো আমাদের সেদিনের "ব্যাস-কূট"।

একদিন এমনি এক "ব্যাস-কূটের" পাল্লায় পড়া গেল—চা পান করতে করতে পাহাড়ে শীতের প্রসঙ্গে। সেদিন কালটা ছিল শীতকাল। দাদা ছিলেন চা ও চুরুটের নিষ্ঠিত সাধক।

সুতরাং প্রশ্নটা করে ফেললাম—"দাদা, হিমালয়ে যখন গৈরিকবেশী তখন চা আসতো কোথা থেকে?" দাদা চিরপরিচিত সুরে অতি পরিচিত উত্তর দিলেন—"হুঁ"।

"হুঁ"তে যে আমি নিরস্ত হব না, তা তিনি বিলক্ষণ জানতেন। সুতরাং কথার পৃষ্ঠে কথার মধ্যে দিয়ে যে সব কথা সেদিন হলো সেই একদিনের কথার কিছু কিঞ্চিৎ ক্রমশঃ লিপিবদ্ধ করবো।

মাষ্টারী

তিনি তখন ডেরাডুনে। ফাঁক পেলেই এখানে ওখানে চলে যান। নৈলে তথাকার ইংরিজি স্কুলে অঙ্কের মাষ্টারী করেন। বৈরাগ্যের নেশায় বেশ মশগুল; তাঁর সঙ্গে স্কুল কর্তৃপক্ষের বন্দোবস্ত ছিল যে, তিনি প্রবেশিকার অঙ্ক-শাস্ত্র যতটুকু প্রয়োজন সবটুকুই পড়িয়ে দেবেন, তবে বিধি-ব্যবস্থার কড়াকড়ি বাধ্য-বাধকতা তাঁর প্রতি প্রযোজ্য হবে না।

ছুটি-ছাটায় তো কথাই নেই, এমনিও শনিবার রবিবার উপলক্ষে কয়েক দিবস ব্যাপী অদর্শন সকলেরই গা-সহা হয়ে গেলো। সবাই ধরে নিলেন যে, ওটা পাগড়ী পড়া সাধু মাষ্টারজীর নিতান্তই স্বাভাবিক এবং তিনি নিশ্চয়ই কোন নির্জন পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছেন ও দু' একদিনের মধ্যেই ফিরবেন। অনেক শনিবারেই এমন হোতো যে, স্কুল থেকে তিনি তাঁর কুটীরে ফিরতেন না। বরাবর কোথাও চলে যেতেন। যাঁরা সন্ধ্যায় বা অন্য কোন সময়ে তাঁর আবাসে উপস্থিত হতেন, দেখতেন ঘরে তিনি নেই। তাঁরাও বুঝে নিতেন।

ঘর অনেক সময় বাইরে থেকে শিকল দেওয়া থাকতো, তালা দেওয়া থাকতো না, দরকার হ'ত না। চোরের উপদ্রবও হোত না। চোরেরা বোধ হয় জানতো—নেবার মত সেখানে কিছু নেই।

এমনি একদিন—স্কুল থেকে বেরিয়ে সোজা ষ্টেশন ও তারপর একখানা রিটার্ন টিকিট একেবারে হরিদ্বার। পরের দিন খেয়াল হোলো ফেরবার। টিকিটখানা বের ক'রলেন, কিন্তু দেখা গেল একটা অঘটন ঘটেছে। যে অংশটা তাঁর কাছে রয়েছে তা ডেরাডুনে ফেরবারটুকু নয়, হরিদ্বারে আসবারটুকু। অর্থাৎ হরিদ্বার ষ্টেশনে টিকিট যখন তিনি দেন তখন টিকিট কলেক্টর মশায়ের ভুলবশতঃ ঐরূপ হোয়েছে। সুতরাং ষ্টেশনে গেলেই ঠিক হবে।

ষ্টেশনে এসে তিনি টিকিট দেখালেন। তাঁরাও সহানুভূতি দেখালেন। টিকিট কিন্তু পাওয়া গেল না। বললেন সে সব টিকিট যথাস্থানে চলে গ্যাছে। পাবার উপায় নেই।

প্রতিবন্ধকতায় দাদা স্থির করলেন সেদিন আর গিয়ে কাজ নেই।—আর পয়সাও ট্যাঁকে নেই।

* * * *

বিবেকানন্দের অপ্রত্যাশিত দর্শন

আবার ফিরলেন দেড় ক্রোশ খানেক দূরে, তাঁর সেই নির্জন পাহাড়ে। একটু চিন্তিত যে হননি তা নয়। হঠাৎ অপ্রত্যাশিত দর্শন পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দের।

অপরিচিত নন। বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছাত্রজীবনেই ছিল। কুশল সম্ভাষণাদির পর স্বামীজীর প্রশ্নোত্তরে দাদা বললেন যে, তিনি এখন হরিদ্বার ষ্টেশন থেকে আসছেন এবং ঘটনা এইরূপ। ষ্টেশনে যাবার অর্থ এই যে, সঙ্গে আর অর্থ নেই। বিবেকানন্দ উত্তর

দেন যে, অর্থের ভরসা যখনই করা যায় তখন দেখা যায় 'একফল'। আর অর্থের ভরসা না কোরে যখন 'তাঁর' ভরসা করা যায় তখন দেখা যায় আর এক ফল। সঙ্গে পাঁচ গণ্ডা পয়সা থাকা সত্ত্বেও অনেকদিনই পেটে কিছু পড়েনি, কারণ ঐ পয়সার ভরসাটাই হয় প্রকট, আর সঙ্গে কানাকড়িও নেই আর তার ভরসাও নেই এমন অনেকদিন কাকে নির্ভর ক'রে জানিনে—কোন কষ্টই পেতে হয়নি।

ফেরবার সময় দাদাকে কোন অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি। ষ্টেশনে এসে রেলবাবুদের জানাবার জন্য এগিয়ে যেতেই এবং কিছু বলবার আগেই অপর এক রেলবাবু তাঁকে মাষ্টারজী সম্বোধনে জানিয়ে দেন যে, সেদিন তাঁর টিকিট বিভ্রাটের কথা তিনি শুনেছেন—কিছু ভাবনা নেই। তিনিও ডেরাডুনে যাচ্ছেন। সুতরাং একই সঙ্গে যাওয়া যাবে। (ক্রমশঃ)

স্কট্‌ল্যাণ্ডে কয়েকদিন

শ্রীমতিলাল দাশ

৯ই সেপ্টেম্বর, বুধবার। সকালে উঠিয়া মিঃ ক্লার্কের আফিসে গেলাম—তখনও মিঃ ক্লার্ক আসেন নাই, কাজেই আমি পাশের একটী গির্জা দেখিয়া সম্মুখের স্কোয়ারে খানিক বেড়াইয়া লইলাম। ফিরিতেই মিঃ ক্লার্ক আদর করিয়া ডাকিয়া তাঁহার আফিসের কাজকর্ম্ম দেখাইলেন। স্কচ আইনের তিনখানি বই বাছিয়া লইলাম, সেগুলি তিনি ভদ্রতা করিয়া আমার বাসায় পাঠাইয়া দিলেন। এখান হইতে পুলিশ কোর্টে গেলাম। একজন লোক পুলিশের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছিল। জজ তাহাকে একমাস জেল দিলেন, পুলিসের সুখ্যাতিও করিলেন। ওদেশের পুলিশ সত্যই সুখ্যাতির পাত্র—তাহারা নিজেদিগকে জনসেবক মনে করে। নিরাপত্তা রক্ষায় তাহাদের সহযোগিতা সত্যই প্রশংসনীয়। আমাদের দেশের পুলিস জনপ্রিয় নহে, লোকে তাহাদিগকে রক্ষক মনে না করিয়া ভক্ষক মনে করে, ইহার কারণ তাহাদের মধ্যে প্রভুত্বের যে স্পর্দ্ধা আছে, সেবার তদনুরূপ চেষ্টা নাই। তাহারা জনভৃত্য মানিবার গৌরব অনুভব করে না।

এখান হইতে শেরিফ কোর্টে চলিলাম। সেখানে কোনও আমোদজনক মোকদ্দমা ছিল না। সেখান হইতে দুর্গ ও হলিরুড প্রাসাদ দেখিতে চলিলাম। ইহা পুরাতন সহরে। প্রাচীন কাহিনী এই যে, ১০০৪ খৃষ্টাব্দে রাজা [illegible] একটী [illegible] স্থাপন করেন। তাহার একশত বৎসর পরে এখানে দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। এখানেই ১০৯০ খৃষ্টাব্দে সেণ্ট মার্গারেট তাঁহার স্বামী ম্যালকম ক্যান মোর ও জ্যেষ্ঠ পুত্রের রণক্ষেত্রে পতনের সংবাদ শুনিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। পরে তাঁহার পুত্র প্রথম ডেভিড হলিরুডে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। দুর্গের মধ্যে প্রায় দুই হাজার সৈন্য থাকিতে পারে—এখানকার সেণ্ট মার্গারেট চ্যাপেল রাণী মার্গারেটের ভক্তির নিদর্শনরূপে আজিও বিদ্যমান। স্যাক্সন-দুহিতা মার্গারেট অতিশয় ভক্তিমতী ও সাধুচরিত্রা ছিলেন।

তাহার সম্মুখে Bomb-Battery নামক স্থানে একটী প্রকাণ্ড কামান আছে। কামানটীর নাম Mow-Meg। জনশ্রুতি যে ইহা পঞ্চদশ শতাব্দীতে ফ্লাণ্ডার্সের মসন নামক স্থানে নির্ম্মিত হয়। কিন্তু স্যার ওয়াল্টার স্কট বলেন যে, ইহা ডগলাস দুর্গেই নির্ম্মিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে কামানের গোলায় ইহার প্রথম চূড়াগুলি ধূলিসাৎ হইয়া যায়। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত পালিয়ামেণ্ট হল এবং প্রাসাদ কিছু কিছু বাঁচিয়া যায়।

এই প্রাসাদে অতীতে অনেক আনন্দ সমারোহ হইয়াছিল—অনেক নৃত্যগীত হাস্য ও পরিহাস ইহার দেওয়ালে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, তাহাদের চিহ্নমাত্র আজ নাই। আজ রহিয়াছে তাহাদের দুঃখকরুণ বিষাদ-মলিন শোক-গাথাগুলি। যে ক্ষুদ্র কক্ষে মেরী

কুইন অব স্কটস্ ষষ্ঠ জেমসকে প্রসব করেন, সেই কক্ষ আজও দর্শককে লুব্ধ করে। ষষ্ঠ জেমস্‌ই ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডকে একই ছত্রচ্ছায়ায় আনয়ন করেন। রাণী এলিজাবেথ বিবাহ না করায়, ষষ্ঠ জেমস্ প্রথম জেমস্ নাম গ্রহণ করিয়া বিবদমান ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডকে যুক্ত করিলেন। এই কক্ষের নিকটই স্কটল্যাণ্ডের রাজাদের মণিমাণিক্যখচিত আভরণ রাখা হইয়াছে। এই রাজাভরণ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে একটী পুরাতন ওক কাষ্ঠের সিন্দুকে পাওয়া যায়। দুর্গ হইতে হলিরুড এক মাইল, ইহাকে Royal mile বলে—এই এক মাইলের মধ্যে নানা রাজা ও রাণীর, নানা সৈন্য ও রাজনৈতিকের, নানা পুরোহিত ও ধর্ম্মযাজকের, নানা মহৎ ও দুষ্ট লোকের কাহিনীতে সমৃদ্ধ। পথে হলিরুড এবি পড়ে—বারংবার ধ্বংসের মধ্য দিয়া ইহা আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে।

হলিরুডও ধ্বংস ও আঘাত পাইয়াছে। কিন্তু এডিনবরায় যখন বর্ত্তমান রাজা ও রাণী আসেন, তখন তাঁহারা এখানে বাস করেন বলিয়া ইহাকে সুরক্ষিত ও সুসজ্জিত রাখা হইয়াছে। চতুর্থ জেমস্ এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন বলিয়া প্রিন্স চার্লি এখানকার চিত্রশালিকায় নৃত্যোৎসবের আয়োজন করেন। কিন্তু এই প্রাসাদের কক্ষগুলির মধ্যে যে কক্ষে রাণী মেরী বাস করিতেন, তাহা আজিও প্রায় সেই অবস্থায় রাখা হইয়াছে।

রাণী মেরীর জীবনের ঘটনা বিয়োগান্ত নাটকের মত দুঃখবহুল। স্বামীর সঙ্গে ফরাসী দেশ হইতে আসিয়া হলিরুডে আনন্দ ও উল্লাসে দিন কাটিতেছিল, সঙ্গে স্বামীর মৃত্যুর খবর শুনিলেন—জন নকস তাঁহাকে এই প্রাসাদেই বক্তৃতায় কাঁদাইয়া দেন, এইখানেই তাঁহার প্রিয় পাত্র রিজিওকে স্কটল্যাণ্ডের অভিজাত নায়কগণ হত্যা করেন এবং এখান হইতে বন্দিনী হইয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করেন।

এই প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে বিচরণ করিতে করিতে, এখানকার রাজকীয় আসবাবপত্র দেখিতে মানুষের ঐশ্বর্য্যের এই ক্ষণভঙ্গুর দশার কথা মনে পড়িল। শঙ্করাচার্য্যের কথা মনে পড়িল—মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বম্। হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্॥

এখান হইতে Hauntley Musium দেখিতে গেলাম। এই কলা ও শিল্পভবন দেখিয়া Lyceium নামক ইহাদের প্রধান রঙ্গগৃহে গেলাম। সেখানে সেদিন দুপুরে কোনও থিয়েটার ছিল না, তাই King's Theatre নামক স্থানে 'The Wandering Jew" নামক নাটকটী দেখিলাম। যীশুকে প্রতারিত করিবার জন্য ইহুদী জাতির উপর চিরন্তন অভিশাপে যে গৃহহীন হইয়া দেশদেশান্তরে কেবল দুঃখ ও বেদনা পাইতেছে—এই মূল ভাবকে কেন্দ্র করিয়া আখ্যায়িকা রচিত। এইখান হইতে বাহির হইলে একটী বৃদ্ধ সকাতর প্রার্থনা করায়, তাহাকে খাইবার জন্য কিছু দিলাম। সে আমাকে পুষ্পপ্রদর্শনী পর্য্যন্ত আগাইয়া দিল। ওয়েভার্লি নামক স্থানে পুষ্পের প্রদর্শনী চলিতেছিল, নানাবিধ বর্ণ ও গন্ধের সমাহার—সুরভি কুসুম খুবই কম—অধিকাংশই বর্ণবিচিত্র ঋতুপুষ্প। ডালিয়া ও চন্দ্রমল্লিকা ফুল লইয়া প্রদর্শকেরা নৈপুণ্য দেখাইয়াছে। এক ঘণ্টা খুব আনন্দে কাটিল—নিত্য দিনের ধূলিধূসর নগ্নতা হইতে ক্ষণিকের জন্য যেন অমরার দিব্য মাধুর্য্যে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশমূল্য কিছু অধিক ছিল। একজন লোক ফুলের জন্য এক প্রকার নূতন সার প্রস্তুত করিয়াছে—তাহার সহিত আলাপ হইল। বাসায় ফিরিয়া স্কচ আইনের পুস্তকগুলি নাড়াচাড়া করিলাম। এখানে একটী বাঙ্গালী ছাত্রের সহিত আলাপ হইয়াছিল। তাহার নাম ভুলিয়া গিয়াছি। ছাত্রটির বাংলাসাহিত্যে যথেষ্ট অনুরাগ। আর একজন ডাক্তারের সহিতও আলাপ হইল। তিনি এফ, আর, সি, পি, পড়িতেছেন। বলিলেন—'এখন পরীক্ষা পাস করাই মুস্কিল—এরা আর সহজে ডিপ্লোমা দিতে চায় না।'

দান-প্রতিদান

শ্রীনমিত মজুমদার

আমাদের ঘরে মাঝে মাঝেই একটা গোলমাল উঠিত। কথাটা খোলাখুলি না বলিলে ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা। কোলাহলটা ঠিক্ আমাদের ঘরে নয়—আমার মালীর অন্তঃপুরে সূত্রপাত ঘটিয়া বাহিরে সজোরে প্রকাশিত হইয়া পড়িত। যদিচ, এই মালীদম্পতীর কলহ করিবার কারণটা অতি তুচ্ছ, তবুও এই তুচ্ছ কারণেই তাহাদের কণ্ঠ উচ্চ গ্রামে চড়িয়া বসিত। বসে বসুক্—যদি শুধু তাহাই হইত তো বলিবার কিছুই থাকিত না, কিন্তু কণ্ঠ জিনিষটি আপন আয়ত্তে না থাকিলে শ্রুতি সুখকর তো হয়ই না এবং ভদ্রজনোচিতও নয়। তাই মাঝে মাঝে রাগ করিতে হইত।

এই লইয়া স্ত্রীকে অভিযোগ করিলে তিনি বলিতেন, তোমার ঘরে কোন গোলমাল নাই বলিয়াই তুমি এই গোলমালকেই এত বড় করিয়া তুলিতেছ।

বাদানুবাদ করিয়া ক্ষোভের কারণ না ঘটাইয়া নির্ব্বাক্ হইয়া থাকাই ভাল মনে করিতাম। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, বিবাদপরায়ণ এই দম্পতীকে তিনি ঠিক্ ইহার উল্টা-সুরে উল্টা-কথা শুনাইয়া আসিতেন, বলিতেন, এমন করিয়া ঝগড়া করিয়া মরিলে আর জায়গা মিলিবে না। তোমাদের বাবু যারপর নাই ভাল মানুষ, তাই সহ্য করিয়া চুপ্ করিয়া আছেন। অন্য কেহ হইলে, কোন্‌দিন দূর করিয়া দিয়া নিঃশ্বাস লইয়া বাঁচিত।

তাহারাও নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিত—যাক্, বাঁচিয়া গেছি! দূর করিয়া দিবার সম্ভাবনা সুদূর ভবিষ্যতেও আর রহিল না। সত্য বলিতে কি, এই পরিবারটির-উপর আমার স্ত্রীর কোনখানে মায়া ছিল।

আমি অনুযোগ করিয়া ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিতাম, তুমি দুই জায়গায় দুই কথা বলিয়া আসিলে!

তিনি হাসিয়া কহিতেন—ওগো, কোন দোষ করি নাই—অপরাধ লইও না।

এই হাসি, এই কণ্ঠস্বরেও খুশী হইতে পারিতাম না। এমনতর উল্টা বলাকে কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারা যায় না। তর্ক করিয়া বলিতাম—এ ঠিক্ হইল না, কি করিয়া হইবে?

তিনি বলিতেন—আমরা মেয়ে, পুরুষ নই। তাই তোমাদের মত বিচারবুদ্ধি লইয়া কোন এক জায়গায় আসিয়া পৌঁছাইতে পারি নাই। ভেদাভেদজ্ঞানশূন্য নির্ব্বিকার হইয়া উঠিতে আজও আমরা পারিলাম না, একজনের সহিত আর একজনকে একেবারে মিলাইয়া ফেলিতে হয়তো তাই পারি না। ঘরের লোক লইয়া যদি পরের সঙ্গে ঘর করিতে হইত তো জানিতে পারিতে খাঁটি সত্য বলা কি করিয়া চলিতে পারে। বিধাতা আমাদের হাতে সংসারকে সত্য করিয়া তুলিবার ভার দিয়াছেন, সত্য বলিতে দেন নাই।

আশ্চর্য্য এই যুক্তি। ইহার কতটা বা বুদ্ধির আলোকে আলোকিত, কতটা বা হৃদয়াবেগের ছায়ায় ছায়া ঘনানো। ইহার পরে আর তর্ক করা কিছুতেই ঘটিয়া উঠিতে পারে না।

বৈশাখের দুপুর বেলা। মেঘমুক্ত আকাশে রৌদ্র একেবারে কাণায় কাণায় ভরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে শ্রাবণধারার মত; যেন হিসাবহীন হাতের বেহিসাবী খেয়াল! আমি এই নিঃস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে অজস্র কর্ম্মের অবকাশে রৌদ্রস্নাতা শ্যামলা ধরণীর শুচিহস্তের নির্ম্মললীলা ভঙ্গীটি দেখিবার আশায় বারান্দায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। তাঁর হস্তালোড়িত রৌদ্রধারার কিছু কিছু আমার অঙ্গেও আসিয়া ছিটাইয়া পড়িতেছে, কিছুটা এই কপালে, কিছুটা খোলা পায়ে, কিছু আমার হাতের আঙুলে। আর আমি এই দীপ্ত বৈশাখের মধ্যাহ্নে এমন পরিবেশের মাঝখানে আরামকেদারা টানিয়া তাহাতে দেহটা ডুবাইয়া দিয়া বসিয়া বসিয়া দিবানিদ্রা ত্যাগ করিয়া ইংরেজী বইএর নোট্ লিখিতেছিলাম, ইহার উদ্দেশ্য অত্যন্ত সাধু—উপাধিলোভার্থী ছাত্রদের পাস করানো।

এমন সময়ে মনে হইল—মধ্যাহ্নে অবকাশপ্রাপ্ত আমার ধরণীলক্ষ্মীটির স্নানলীলায় ব্যাঘাত ঘটিয়াছে, তিনি সচকিত হইয়া উঠিয়াছেন।

তখন আমার অন্তঃপুরে মিলিত কণ্ঠের উচ্চরব উঠিয়াছে।

যাঁহাদের রাগরাগিণীর সঙ্গে আন্তরিক পরিচয় আছে, তাঁহারা জানেন, অর্থহীন, ভাষাহীন আলাপ গানের শুধুমাত্র ধ্বনিময় ও সুরময় প্রকাশের বিকাশ কতখানি। সেখানে বাক্যের প্রয়োজন বেশী নয়। আমারও বুঝিতে বাধিল না যে, এই রস মালীদম্পতীর রৌদ্ররস।

আর কলম চলিল না।

তাহাদের এই তীব্র কোলাহল যাহাকে লইয়া সে আর কেহ নয়, তাদের একমাত্র শিশুকন্যা মুনিয়া। বোধ করি কোন কারণে মুনিয়ার বাপ তার মেয়েটিকে শাসন করিতে গিয়া অকস্মাৎ নিজেই শাসিত হইতে বসিয়াছে। স্ত্রীর নিকট গাল খাইয়া সেও যে গাল না দিয়া চুপ করিয়া থাকিবে, এমন সহবৎ শিক্ষা আশা করি, তাহার কাছ হইতে কেহই আশা করিবেন না। তাই কোলাহলটা কলহে আসিয়া ঠেকিয়াছে।

এমন সময়ে আমার স্ত্রীর উচ্চকণ্ঠ শোনা গেল, তাহাতে রোষের আভাষ ছিল না, হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, মুনিয়ার মা, মা বলিয়া যদি তোর মেয়েকে মারিবার অধিকার থাকে, বাপ বলিয়া কি ওর সে অধিকারও নাই!

মুনিয়ার মা বোধ করি একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল, হয়তো দুই চোখ বড় বড় করিয়া বলিয়া উঠিল—বাপ বলিয়া! তুমি কি বল মা! আমার মত এমন কষ্ট করিয়া দশ মাস ধরিয়া কি ও টানিয়াছে? এমন মরণ-বাঁচন পণ করিয়া কি জন্ম দিয়াছে!"

বুঝিতে পারিতেছি, মুনিয়ার মার মতেই আদর করিবার অধিকার যদিচ সকলের হাতেই আছে, তবু যাহার জন্য দুঃখ যে সহে নাই, তাহাকে দুঃখ দিবার অধিকার তাহার কখনই নাই।

এইখানেই সব চুপ্ হইয়া গেল। আমার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর আর শুনিতে পাইলাম না, এমন কি কাণ খাড়া করিয়াও না।

কলম হাতে বসিয়া আছি, ঠিক্ এমনি সময়ে চেনা [illegible] চেনা মাদলের আওয়াজ পাইলাম। আজিকার এই দাম্পত্য কোলাহলে যে সুর আমার কাটিয়া গেছে, সেই সুরটিকে ভরিয়া লইবার জন্য এই সময়টিতে তাঁর এই আসাটি বড় আন্তরিকতার সঙ্গে সময়োচিত বলিয়া মনে হইল। খুশী হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিতে গিয়া স্তব্ধ হইয়া গেলাম। বেদনায় বিবর্ণ হইয়া আছে তাঁর মুখের রঙ; মৃত্যুপথ-যাত্রিণীর মত এই নীল নিবিড় বেদনাকে বৈশাখের এই দীপ্ত আকাশের ভরা রৌদ্রের মাঝে কামনা করি নাই।

অকস্মাৎ আমার মুখ নত হইয়া গেল।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি এক সময়ে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—আচ্ছা, আমরা যে এই না-পাওয়াকেই বড় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতেছি—সে কি সত্যই তাই, না, আমরা এই না-পাওয়ার দুঃখ হইতে ত্রাণ পাইবার জন্যই কেবলি আপনাদের ফাঁকি দিয়া চলিতেছি!

কথাটা বড় বাজিল।

এই পাওয়া না পাওয়া লইয়া বন্ধুমহলে অনেক তর্ক করিয়াছি—হার মানি নাই। কিন্তু যে কথা কেবলমাত্র জয়ী হইবার কথা নয়, যাহা মত নয়, যাহা হৃদয়ের বেদনা হইতে উদ্ভূত, তাহার কথায় সহজে কথা আসে না। আমি চুপ্ হইয়া গেলাম। তাঁর বেদনা যে কোথায়, তাহা তো জানি। ডান হাতে তাঁর হাত ধরিয়া খুব আস্তে বলিলাম—নলিনী, তাহা তো ঠিক্ করিয়া বলিতে পারিব না, কেবলমাত্র এই কথাটি বলিতে পারি যে, যেন কখনও হার না মানি, যেন আমরা বৃহৎ দুঃখেও ভাঙ্গিয়া না পড়ি।

তাঁর দুই চোখ ছলছল্ করিয়া আসিল। এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, আমরা নিঃসন্তান।

আমার আহারে যদিচ কোথাও পূর্ব্ববঙ্গিগণের সহিত মিল ছিল না, বোধকরি, তবুও এক জায়গায় আমার রস মিলিত—সেটি কীর্ত্তন ও ভজনের রস। তবে তাহাও কিছু নূতন রকমের।

সেদিন আমাদের এক বন্ধুর বাড়ীতে কীর্ত্তন গান চলিয়াছে। যিনি গাহিতেছিলেন, তাঁর নামটা উর্দ্ধে

উঠিতে উঠিতে এত ঊর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে যে, শ্রোতৃসংখ্যা ভীড় করিয়া আসিয়া জুটে নাই। মাত্র আমরা জনকয়েক বন্ধু মিলিয়া তাঁর সম্মুখে খুব কাছাকাছি জায়গা করিয়া লইয়াছি। যাহারা ভীড় না জমাইয়া ফিরিয়া গিয়াছে, সেই ধৈর্য্যহীনের দল আপন রুচি ও রসজ্ঞানের পরিচয় না দিয়াও সমালোচনা করিতে ছাড়িতেছে না, বলিতেছে—তাইত হে, কোথায় যেন বিদেশী সুরের আভাস পাইতেছি—ঠিক্ সনাতন রসটি তো টিকিল না। অর্থাৎ ইহারা গোলাপকে গোলাপ বলিয়া মানিতেই চাহেন না, যেহেতু, এরা নাকি কোন্ আদিকালে বিদেশের মাটি হইতে আসিয়াছিল।

তাই বলিয়া কোথাও তো ফাঁক্ রহিল না।

গান গাহিতে গাহিতে এক জায়গায় বড় জমিয়া উঠিল। ভাবাবেগে দু'চোখ মুদিয়া তিনি গাহিতেছিলেন :—

অবহু কাঁদব কতখন
যশোমতী তুঁহু বিয়াকুলারে
ন আওয়ব অব কানদন॥

*   *   *

জগত ধন আসে ব্যাকুল পরাণি হাসে
ভাবত আপনার ধন;
আপন বক্ষে ধরি বৈঠত মরি মরি
ভাসত ভাবনায় মন॥

গানটি শেষ চরণে ঠেকিয়া একেবারে কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিল। আমার স্ত্রীর দু'হাত জোড় করিয়া কোলের উপর ফেলিয়া রাখা, তাঁর দুই চোখ বাহিয়া নামিয়াছে জলের ধারা।

ইহার পর কিছুদিন কাটিয়া গিয়াছে। আমার স্ত্রীর মুখে একটা কালো ভাবনার অন্ধকার ঘনাইয়া আছে। মুনিয়ার মা থাকিয়া থাকিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে। মুনিয়ার আজ দশ দিন হইল বড় অসুখ। ডাক্তার বৈদ্যের কিছুই বাকি থাকিল না। আমার স্ত্রী মুনিয়ার মাথা কোলে টানিয়া লইয়া দু'চোখ তাহার মুখে মেলিয়া বসিয়া থাকিলেন, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত উৎকণ্ঠা, সমস্ত কান্নার বাঁধন কিছুই টিকিল না। মুনিয়া দু'চোখ বড় বড় করিয়া ধরিয়া একদিন স্থির হইয়া গেল। মুনিয়ার মা একেবারে আছাড় খাইয়া তীব্রস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। আমার স্ত্রী ঠিক্ মুনিয়ার মতই বড় বড় চোখ স্থির করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

আমার সংসারে যেন একটি সমস্ত সামঞ্জস্যের যোগসূত্র ছিঁড়িয়া গেল। মাঝে মাঝে মালীর ঘর হইতে একটা বুক ফাটা করুণ কান্নার সুর আসিয়া পৌঁছে; আর নলিনীকে চাহিয়া দেখি, তার মধ্যে জীবন-যাত্রার কোনও বেগ নাই। তাঁর ভাঁড়ারের নাড়ুর কৌটাগুলি অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে, তাঁর সেলাইয়ের আলমারীতে এককোণে ভাঁজ করা কতকগুলি রঙীন ছিটের টুক্‌রা, দু'একটি ছোটো মাপের কাটা জামা—তাহাতে সেলাই পড়ে নাই।

হঠাৎ একদিন তিনি বলিয়া বসিলেন—আরতো উহাদের রাখা চলে না।

অবাক্ হইয়া বলিলাম—সে কি, সে যে অন্যায় হইবে!

জিদ করিয়া বলিলেন—না, হইবে না।

যাইবার দিনে মুনিয়ার মা হেঁট হইয়া প্রণাম করিতে আসিল। আমি তাহার হাতে পথ খরচার জন্য দু'খানি দশ টাকার নোট দিতে গেলাম, মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। সে লক্ষ্য করিয়া বলিল—বাবু, তুমি লজ্জা করিও না। মা ঠিকই বুঝিয়াছেন, আমিও আর এখানে থাকিতে পারিব না বলিয়াই চলিয়া যাইতেছি।

এই বলিয়া চোখ মুছিয়া, হাত পাতিয়া নোট লইয়া চলিয়া গেল।

এইখানে আমার স্ত্রীকে লুকাইয়া একটা কাজ করিতে লাগিলাম—অর্থাৎ চুপি চুপি মাসান্তে উহাদের নামে কিছু টাকা পাঠানো। একদিন ধরা পড়িয়া গেলাম। রসিদটা ফিরিয়া তার হাতে পড়িয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম রাগ করিবেন, কিন্তু রাগ করিলেন না। খোঁজ লইয়া জানিলাম—তিনিও প্রতি মাসে এমনি টাকা পাঠাইয়া আসিতেছেন।

বড় আশ্চর্য্য লাগিল। ইহার কোন অর্থ আমি খুঁজিয়া পাই না। এত দীর্ঘ কাল এক সঙ্গে আছি, তবু তাঁহাকে সবটা চিনিতে পারিলাম না। হয়তো ইহাই

আপন বুদ্ধি লইয়া যত অহংকারই করি না কেন, এই সন্তানহীনার সন্তানবতীর শূন্য কোল দেখিবার যে বেদনা তাহা বুদ্ধির ওজনে ওজন করিয়া কোন নাগালই পাই না।

এতকাল পরে একটা আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়া গেল। আমাদের দীর্ঘ সতের বৎসরের বিবাহিত জীবনের অনিশ্চয়তাকে রহস্য করিয়া বিধাতা খবর পাঠাইলেন, নলিনী সন্তান-সম্ভাবিতা। তাঁর চোখের পাতা নামিয়া আসিতেছে—তাঁর গায়ের রঙ পাণ্ডুর হইয়া উঠিল—যেন কোনও অনাগতকে রূপ দিবার জন্য তাঁর কৃচ্ছ্র সাধনা চলিয়াছে। এক পূর্ণিমা-তিথিতে আকাশ যখন স্তরে স্তরে জ্যোৎস্নায় ভরিয়া উঠিয়াছে তখন নলিনী যেন জীবন-মরণের শেষ সীমান্তে আসিয়া একটী মেয়ের জন্ম দিলেন। ডাক্তার বৈদ্যের ভীড় হাল্কা হইয়া গেলে তিন দিনের পর তিনি আমার সহিত প্রথম কথা কহিলেন – মুনিয়ার মাকে আনাইতে হইবে।

আমি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া ফেলিলাম—নলিনী, একদিন খুসী লাগে নাই বলিয়াই যাহাকে রাখিতে পার নাই, আজ তাহাকেই ফিরাইয়া আনিতে চাও কেন?

নলিনী বলিলেন—তোমাকে কি করিয়া বোঝাই যে খুসী লাগা-না-লাগার কথা সে নয়, সে তাহার চেয়ে অনেক বড় কথা।

তাঁর গলা কাঁপিতে লাগিল।

আমি বলিলাম—যাহাই হোক্, তুমি এ চেষ্টা আর করিও না।

নলিনী আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন—ওগো, তাকে যে আমার বড় দরকার!

কণ্ঠস্বরের বেদনায় কিছুটা বুঝিলাম, কিছু বুঝিলাম না। এই ক্লান্ত অবস্থায় কথার মোড় ফিরাইবার জন্য তাঁর হাতে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিলাম—নলিনী, আমি একটা নাম ঠিক করিয়াছি।

উদাসকণ্ঠে বলিলেন—কি বল।

—লাবণ্যলক্ষ্মী। বলিয়াই বলিলাম— পছন্দ হইল না?

নলিনী বলিলেন—খুব হইয়াছে। তবে ডাকনামটা আমি খুব খুসী হইয়া বলিলাম—নিশ্চয়ই। তুমি কি ঠিক করিয়াছ বল।

এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, মঙ্গু।

একেবারে চমকিয়া উঠিলাম।

এর মধ্যে আমার স্ত্রী মুনিয়ার মাকে পত্রযোগে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে জবাব দিল—এখন যাইতে পারিবে না, মা যেন তাহাকে মাপ করেন।

এর পরে মাসিক দক্ষিণা অত্যধিক করিয়া দিবার লোভ দেখানো হইল। মুনিয়ার মা শুধু চোখ বড় করিয়া কহিল—আমি যাইব না। স্ত্রীর এই উত্তর বাপের কাছে ভাল লাগিল না, রাগ করিয়া বলিল—এত টাকা মাঠে মারা যাইবে। সে কহিল—যাক্। আমি কষ্ট করিয়া থাকিব। তখন মুনিয়ার বাপ হুঙ্কার দিয়া স্ত্রীর চুলের মুঠি শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া, জোর গলায় বলিল—চল্।

বিকালে নলিনী শিশুকন্যাটিকে কোলে লইয়া বসিয়াছিলেন—এমন সময়ে মুনিয়ার মা আসিয়া দাঁড়াইল। শোকে দুঃখে হইয়া শীর্ণ হইয়া গেছে তার দেহ। নলিনীর কোলের দিকে চাহিয়া তার সেই দেহ কাঁপিতে লাগিল। মাটিতে বসিয়া পড়িয়া, মেঝেতে মুখ চাপিয়া ধরিয়া সে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। অকস্মাৎ এক সময়ে মুখ তুলিয়া বসিয়া, দুই হাত মুখে চাপা দিয়া, ভাঙ্গা গলায় বলিয়া উঠিল—মা, তুমিই আমার মুনিয়াকে লইয়াছ।

নলিনীর চোখ ছল্ ছল্ করিয়া আসিল। আপন কোল হইতে দুই হাত দিয়া মেয়েটাকে তুলিয়া ধরিয়া মুনিয়ার মার কোলের কাছে আসিয়া বলিলেন—মুনিয়ার মা, সেই জন্যইতো তোকে ডাকিয়া আনাইয়াছি।

মুনিয়ার মা অত বুঝিল না। তার দুই ব্যগ্র বাহু বাড়ানো, মুখ তুলিয়া ধরা।—শীর্ণ দেহের সমস্ত বাঁকা ভঙ্গীতে বুভুক্ষিতার একটা ক্ষুধা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ঠিক্ এমনি সময়েই আমার বন্ধুর পত্রবাহক ভৃত্যটি একখানি চিঠি আনিয়া হাজির করিল। চিঠি খুলিয়া পড়িয়া বলিলাম—নলিনী, আমাদের সেই কীর্ত্তনীয়া বন্ধুটি আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

ভৌম-উৎপাত

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, জ্যোতিষসিদ্ধান্তাচার্য্য

উৎপাত শব্দের অর্থ উপদ্রব। উৎপাত তিন প্রকার। যথা—দৈব, অন্তরীক্ষ এবং ভৌম। ভৌম উৎপাত অর্থে ভূমি সম্বন্ধীয় উপদ্রব। ভূমিকম্প এই ভৌম উৎপাতের অন্তর্গত এবং এ সম্বন্ধে যে নয় প্রকার কারণ আছে, তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

১। বারাহী সংহিতাদি গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, পূর্ব্বকালে একদা পৃথিবী পর্ব্বতসমূহের পতন ও উৎপতনে অধীর হইয়া কম্পিত অবস্থায় অবনত মস্তকে সাশ্রুপূর্ণ নয়নে লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন—আপনি আমার অচলা যে নাম দিয়াছেন তাহা রক্ষা করুন;—এই বলিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনাপূর্ব্বক স্থিরত্বের প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মা পর্ব্বতসমূহের দ্বারা পৃথিবীর অস্থিরত্বের কথা শুনিয়া পুত্র ইন্দ্রকে পর্ব্বতের পক্ষ সকল ছেদন করিতে আদেশ করিয়া পৃথিবীকে বলিলেন—আর তোমাকে পর্ব্বতের জন্য কম্পিত হইতে হইবে না। কিন্তু বায়ু, অগ্নি, ইন্দ্র ও বরুণ ইহারা যথাক্রমে দিবা রাত্রির চারিভাগে তোমাকে কম্পিত করিবে।

২। দিক্‌হস্তী পৃথিবীর ভার বহনে ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামার্থ মস্তক চালনা করে; সেই জন্য ভূমিকম্প হইয়া থাকে।

৩। পৃথিবী বৃষের শৃঙ্গোপরি অবস্থিত এবং ঐ বৃষ পৃথিবীর ভার বহনে ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামার্থ মস্তক পরিচালনা করায় ভূমিকম্প হয়।

৪। পৃথিবী সহস্রফণাবিশিষ্ট শেষনাগের (বাসুকীর) মস্তকে অবস্থিত থাকায় যে সময়ে ঐ নাগ ভার বহনে ক্লান্ত হইয়া এক একটী শির পরিবর্ত্তন করে; সেই সময়ে ভূমিকম্প হয়।

৫। সমুদ্রের অভ্যন্তরে যে বৃহৎ জন্তু অবস্থিতি করে, তদ্দ্বারাই ভূমিকম্প হয়।

৬। বায়ু পরস্পর আহত হইয়া সশব্দে ধরাতলে পতিত হওয়াতেই ভূমিকম্প হয়।

৭। বৈজ্ঞানিকদের মতে পৃথিবী দ্রব অবস্থা হইতে কঠিন অবস্থায় পরিণত হওয়ার সঙ্গে ভূগর্ভে যে সকল স্তর পড়িতে থাকে, ঐ স্তরের নিম্নে শূন্যস্থান থাকে; যে সময়ে কোন কারণে ঐ স্তর কিম্বা কোন পর্ব্বত নীচে বসিয়া যায়, সেই সময়ে ভূমিকম্প হইয়া থাকে।

৮। যে ভূমির নিম্নে অধিক পরিমাণে গন্ধক বা সলফর প্রভৃতি তেজস্কর দ্রব্য থাকে, কালে সেই সকল স্থান বিদীর্ণ হইয়া অগ্ন্যুৎপাত এবং ভূমিকম্প ঘটিয়া থাকে। আগ্নেয়গিরির সমীপবর্ত্তী স্থানে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়।

৯। ভূনিম্নস্থ বাষ্প পুঞ্জীভূত হইয়া যে সময়ে সবেগে ঊর্দ্ধে গমন করে, সেই সময়ে ভূমিকম্প হয়।

ইহা নিশ্চয় যে, ভূমিকম্প সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্তের অভাবেই এইরূপ ব্যক্তিগত মত মতান্তরের প্রকাশ হইয়াছে। কারণ, যেখানে ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তার অনুমোদন সেইখানেই সত্যের অন্তরায় স্বরূপ মতমতান্তরের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

ভূমিকম্প বিষয়ে যে নয়টী কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; ঐ সকল কারণ ভূমিকম্পের সময়-নির্দ্দেশের পক্ষে অকারণ হয়। যেহেতু স্তর বসিয়া হোক্ কিম্বা বাষ্পাদির জন্যই হোক্—ঠিক্ ঐ সময়ে স্তর কিম্বা বাষ্পাদির বিপর্য্যয় ঘটিবার কারণ কি?

পক্ষান্তরে ভূমিকম্প হয় বলিয়াই ভূগর্ভস্থ স্তর কিম্বা পর্ব্বতাদি বসিয়া যায় এবং ভূগর্ভস্থ বাষ্প ভূমির স্পন্দনে আলোড়িত হইয়া যে বেগ উপস্থিত হয়—সেই বেগ দ্বারা ভূনিম্ন হইতে উদ্গীর্ণ হইয়া থাকে;—ইহাকেই ঐ সকলের কারণ বলা যায়।

"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরোযং পৃথিবীন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং" (বৃহঃ ৩।৭।৩) এবং 'সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ" (ঋক্ ১।১১৫।১ সাম ৪।৬।৫।৩ যজু ৭.৪২) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে—এই অধিদৈব ও স্থাবরজঙ্গমাত্মক অধিলোকাদিতে যে অন্তর্য্যামী আত্মার (চৈতন্যের) উল্লেখ আছে, তদ্দ্বারাই এই পৃথিবীর অভ্যন্তরেও ঐ চৈতন্যশক্তি থাকায় ইহার একটী স্বাভাবিক স্পন্দন প্রতীয়মান হয়। কিন্তু ঐ স্পন্দন অত্যন্ত স্থির এবং বিলম্বিত।

বরাহমিহিরের বারাহী সংহিতাদি গ্রন্থে "নোৎপাত-পরিত্যক্তঃ কদাচিদপি চন্দ্রেজো ব্রজত্যুদয়ম্" অর্থাৎ বুধ উৎপাত ভিন্ন উদিত হয় না" ইত্যাদি অবাস্তব বাক্যের পূর্ণভাবে সমাবেশ থাকায়, ঐ গ্রন্থ দ্বারা কোন উৎপাতই নির্দ্দেশ করা যায় না।

ভূমিকম্প সম্বন্ধে যে নয়টী কারণ লিখিত হইয়াছে, শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা সেই সকল কারণের অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, প্রথমটীকে গল্পবিশেষ বলিলেও অত্যুক্তি

হয় না। কারণ, পূর্ব্বে পৃথিবী একমাত্র পর্ব্বতের পতন ও উৎপতনে কম্পিত হইত। কিন্তু ব্রহ্মার বিচারানুসারে অপর চারিটী কম্পনের কারণ নির্দ্দেশ হইল এবং ইহা দ্বারাই তিনি পৃথিবীর অচলা নাম রক্ষা করিয়া তাহাকে দুঃখ হইতে মুক্ত করিলেন;—একেই বলে জ্বালার উপর জ্বালা। চারি বেদ এবং সৃষ্টি বিদ্যার জ্ঞাতা ব্রহ্মার উক্ত প্রকার বিচারকে দেবতার বিচার বলিয়া স্বীকার করা অপেক্ষা লেখকের বিচার বলিয়া স্বীকার করাই যুক্তিসঙ্গত।

পক্ষান্তরে—বাষ্প দ্বারা ভূমিকম্প হইলে বায়ু; বায়ু পরস্পর আহত হইয়া সশব্দে ধরাতলে পতিত জন্য হইলে ইন্দ্র; আগ্নেয় পদার্থ দ্বারা হইলে অগ্নি এবং দ্রব পদার্থ দ্বারা হইলে বরুণ—এইরূপে চারিটী কারণ ধরা যায়; তাহা হইলেও দিবারাত্রির চারি প্রহরে ইহারা যথাক্রমে ভূমি অধিকৃত করিয়া কম্পন করিবে—একথা একবারে অযৌক্তিক, কারণ, ১ম প্রহরে বায়ু কম্পন করিবে ২য় প্রহরে করিবে না—ইহা সম্ভব নহে।

২য়, ৩য় এবং ৪র্থ বাক্যের প্রথম আপত্তি এই যে, যদি হস্তী, বৃষ কিম্বা সর্পাদি জীবের মস্তকে পৃথিবী অবস্থিত থাকিত; তাহা হইলে সৃষ্টি কাল হইতে লয় কাল পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘকাল কোন জীবেরই ধারণ করিয়া রাখা সম্ভব হইত না; ঐ সকল জীবের মস্তকচালনায় ভূমিকম্প হইলে, এক সময়ে সমুদয় পৃথিবীর সমানভাবে কম্পন হইত।

২য় আপত্তি এই যে, "পশ্চাৎ ভূমি অথঃ পুরঃ (ঋক্ ১০.৯০।৫ সাম ৪।৬।৪।৭ যজু ৩১।৫) এই বেদবাক্যে পরমেশ্বর প্রথমে জীবের আশ্রয় রূপ পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া পরে জীব-শরীরের রচনা করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণিত হয়। আর পঞ্চভূত উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে ঐ সকল জীব-শরীরের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব নহে। যদি হস্তী প্রভৃতি জীবের দ্বারা এই ভূগোল অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে ঐ দিক্-হস্তী প্রভৃতির মাতাপিতার জন্মসময়ে পৃথিবী কাহার উপর থাকিবে? তদ্ভিন্ন নাগ কশ্যপ ও কদ্রুর সন্তান; সুতরাং কশ্যপ মরীচির পুত্র, মরীচি মনুর পুত্র, মনু বিরাটের পুত্র, বিরাট ব্রহ্মার পুত্র এবং ব্রহ্মা আদি স্রষ্টা। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কশ্যপের জন্ম হইবার পূর্ব্বে পাঁচপুরুষ বিদ্যমান ছিল; তখন পৃথিবী কাহার উপর থাকা সম্ভব? এবং বৃষ গাভীর সন্তান; সুতরাং উক্ত গাভীর সময়েও পৃথিবীর ধারণ-কর্ত্তার অভাব হইয়া পড়ে।

"অং এমিশ্রাং পঞ্চতং মহাপুরুষেণ বাজিন পর্বনাশ্চকতি" ঋক ১।১০।৬, ১।৬।১০, ১।৭।১০ বং ৮।৭০।৫ সাম ৩।৫।৪।৬ ইত্যাদি মাত্র ইন্দ্র ও বং শব্দের উল্লেখ আছে এবং মহতুং বজ্রমুদাহং ইত্যাদি কঠ ২।৬।২১ শ্রুতিতেও উল্লেখ আছে বেদান্ত দর্শনে ১।৩।৩৯ "কম্পনাৎ" এইরূপ একটি সূত্র দেখা যায়।

৩য় আপত্তি এই যে, যাহাকে আর খণ্ড করা যায় না সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম তাহার নাম পরমাণু; এইরূপ তিনদ্ব্যণুক হইতে অগ্নি; চারিদ্ব্যণুক হইতে জল এবং পাঁচ দ্ব্যণুক হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ তিন দ্ব্যণুকে ত্রসরেণু বা ত্রুটী এবং দুই ত্রসরেণুতে পৃথিব্যাদি স্থূল পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ ক্রমানুসারে অণু মিশ্রিত করিয়া ঈশ্বর ভূগোলের নির্ম্মাণ করিয়াছেন; এই ভূগোল কি কখন দিক্‌হস্তী, বৃষ কিম্বা সহস্রফণাবিশিষ্ট সর্পের মস্তকে ধৃত থাকিতে পারে?

পৃথিবীর প্রথমাবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, "আপো বা অর্কঃ" (বৃহঃ ১।২।২) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জল তেজ হইতে উৎপন্ন বলিয়া অর্ক নামে অভিহিত হইয়াছে; ঐ জলের উপর দুগ্ধের সরের ন্যায় গাড়িয়া যে ঘনতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, উহাই অগ্ন্যাকৃতি ও অগ্নিগর্ভা পৃথিবী; এই জন্য পৃথিবীকে অগ্নির সহচরী বলে। বস্তুতঃই ভূগর্ভ সর্ব্বদা উষ্ণ দেখা যায়। "ইয়ত্যগ্রে আসীন্মগর্জ্জ" (যজু ৩৭.৫) এবং "পৃথিবী অপ্রথেতাম্" (যজু ১৭.২৫) ইত্যাদি বেদবাক্যে পৃথিবীর অল্পতা ক্রমশঃ পুষ্ট হইয়া বৃহদবয়ব হইতেছে বলিয়া প্রমাণ হয়। সুতরাং এতাদৃশ পৃথিবীর কখন হস্তী, বৃষ ও সর্পাদি প্রাণিগণের ধারণ করা সম্ভব নহে।

লর্ড কেলভিন, রদারফোর্ড এবং জার্ম্মাণ পণ্ডিত এলষ্টের ও গাইটেল প্রভৃতি পাশ্চাত্য ভূতত্ত্ববিদ্‌গণও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পূর্ব্বে পৃথিবী উষ্ণ ও দ্রব পদার্থ ছিল; ক্রমে তাপবিকিরণ দ্বারা জল, স্থল ও কঙ্করের সৃষ্টি এবং ভূগর্ভ কঠিন হইয়াছে।

৫ম বাক্যের আপত্তি এই যে, জলের অভ্যন্তরস্থ জন্তু দ্বারা ভূমিকম্প হইলে, ইংলণ্ডের ন্যায় সমুদ্রতীরবর্ত্তী দেশ

ভিন্ন অন্যত্র সিদ্ধি হয় না এবং একদিনে বহুদূরবর্ত্তী দুই বা ততোধিক স্থানে ভূমিকম্প দ্বারা ভূমি বিদীর্ণ হইয়া ভূগর্ভের বহু নিম্নস্থ দ্রব্যের কিম্বা অগ্ন্যুৎপাতের সম্ভাবনা থাকে না।

৬ষ্ঠ বাক্যের আপত্তি এই যে, ভূপৃষ্ঠে বায়ুর আঘাত দ্বারা ভূকম্পন হইলেও, ভূমি বিদীর্ণ হওয়া এবং ভূনিম্নস্থ মৃত্তিকাদির ভূপৃষ্ঠে উত্থিত হওয়াকে সুষ্ঠু যুক্তি বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

৭ম বাক্যের আপত্তি এই যে, ভূগর্ভস্থ স্তর বসিয়া ভূকম্পন হইলে—প্রচণ্ড ও সাধারণ ভূমিকম্পের অনুপাতে তত্রস্থ ভূমির বিস্তৃত অংশ নীচে চলিয়া যাইত।

৮ম এবং ৯ম কারণদ্বয় মাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করে। বরং ৭ম, ৮ম এবং ৯ম—এই তিনটী কারণ ভূমিকম্পের পরিণাম বলিয়াই স্বীকার করা যায়।

স্কন্দ পুরাণের কাশীখণ্ডে—কাশী শিবের ত্রিশূলের উপর অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ আছে; সেইজন্য অন্যত্র ভূমিকম্প হইলেও, কাশীতে হয় না—এই প্রবাদ বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং তথাকার অধিবাসীদিগের মধ্যে অনেকেরই এরূপ দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছে যে, কাশীতে ভূমিকম্প হইলে—কাশীকম্প বলে; কিন্তু পাপের আশঙ্কা করিয়া ভূমিকম্প এই শব্দ উচ্চারণ করে না। এতদনুসারে অন্যান্য স্থানেও ভূমিকম্প হইলে, কাশীকম্পের ন্যায় কলিকাতা কম্প, মেদিনীপুর কম্প, ইত্যাদিরূপে সেই সেই স্থানের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক কম্পনের উল্লেখ করিলে, প্রকারান্তরে ভূমিকম্পের সিদ্ধি হইতে পারে; সুতরাং ভূমিকম্প শব্দ পরিত্যাগ করিলেও, ভাবার্থের হানি আশঙ্কা করা যায় না।

উল্লিখিত অনির্দ্দিষ্ট কালের জ্ঞাপক-কারণ সমূহের দ্বারা অধিকাংশ ব্যক্তিই মনে করেন যে, ভূমিকম্পের কালাকাল নির্দ্দেশ করা যায় না। কিন্তু যদি এরূপ কোন সত্য অনুমান থাকে—যাহা দ্বারা ভূমিকম্পের কালাকাল নির্দ্দেশ করা যায়; তাহা হইলে ঐ সকল কারণ ভিত্তিহীন হইবে। কারণ প্রত্যক্ষ বস্তুর কেহ অপলাপ করিতে পারে না।

দর্শন শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে—সকল কাজেরই কারণ প্রকাশ পায়। কাজের পূর্ব্বে কারণ এবং পরে ফ[illegible] প্রকাশ পায়; সুতরাং কারণ ও কার্য্য এই উভয়ই কালকে আশ্রয় করিয়া উৎপত্তি এবং বিলয় প্রাপ্ত হয়। ভূমিকম্প সম্বন্ধেও ঠিক এই প্রকার নিয়ম হইয়া থাকে; এইজন্য পূর্ব্বোক্ত কারণ সকল কার্য্য বিষয়ে অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জ্ঞাপক জন্য অসিদ্ধ হইতেছে। কারণ, যাহা জানিয়া কোন ফল নাই; তাহা জানিয়া লাভ কি?

কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এক বিষয়ে গবেষণা করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত মত প্রকাশ করিলে উহাকেই যে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে তাহার কোন কারণ নাই। কারণ উহার পরে ক্রমশঃ অপরাপর বৈজ্ঞানিকের ঐ বিষয় লইয়া গবেষণা করিতে করিতে এমন অবস্থায় আসিতে পারে, যেখানে পূর্ব্ববর্ত্তী বৈজ্ঞানিকের মত খণ্ডন হইতে পারে। যতক্ষণ না বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি হয়, ততক্ষণ সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নহে; এইজন্য প্রকৃত সিদ্ধান্ত না হওয়ার পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন মতের প্রচার হওয়া স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। কারণ এক বিষয়ে নানাপ্রকার মত হইলে, প্রকৃত কারণ খুঁজিয়া বাহির করা কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে।

ভূমিকম্পের প্রত্যক্ষ প্রমাণ কি? ইহার যথার্থ সিদ্ধান্ত এই যে, "উক্ষাসম্ভাবা পৃথিবী বিভর্ত্তি" ইত্যাদি ঋগ্বেদ বচনের উক্ষা শব্দে বৃষ অর্থ প্রচারিত হওয়ায় অনর্থ ঘটিয়াছে। কিন্তু বর্ষা দ্বারা ভূগোলের সেচন করে বলিয়া সূর্য্যের নাম উক্ষা। এই সূর্য্যই পৃথিবী প্রভৃতি লোক লোকোত্তরের ধারণকর্ত্তা। কারণ—"আকৃষ্ণেণ রজসা" (ঋক্ ১। ৩৫। ২ যজু ৩৩। ৪৩) ইত্যাদি বেদমন্ত্রে সূর্য্য সমস্ত লোকের সহিত আকর্ষণ গুণবিশিষ্ট শক্তি দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছে বলিয়া প্রমাণিত হয়। "আদিত্যেন বাব সর্ব্বে লোকামহীয়ন্তে" এবং "পৃথিব্যামাকাশাঃ প্রতিষ্ঠিতঃ" ইত্যাদি তৈত্তিরীয় শ্রুতি ও ঐ ভাবের দ্যোতক। তদ্ভিন্ন—"সত্যেনোত্তভিতা-ভূমিঃ" (অথর্ব্ব ১৪। ১। ১) এই বেদমন্ত্রে এবং "পৃথ্বীত্বয়াধৃতালোকা দেবীত্বং বিষ্ণুনাধৃতা" ইত্যাদি প্রচলিত আসনশুদ্ধির মন্ত্রেও পৃথিবী—হস্তী, বৃষ, কূর্ম্ম, সর্প, ত্রিশূল প্রভৃতি দ্বারা ধৃত রহিয়াছে—এরূপ প্রমাণ হয় না।

উল্লিখিত বেদ প্রমাণ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সূর্য্যাদি গ্রহের ভূগোলের সহিত সম্বন্ধ বিশেষেই ভূগোলের স্থান বিশেষে ভূমিকম্প হইয়া থাকে এবং ইহাই শাস্ত্র ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া নিশ্চিত হয়। কারণ পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, ইংরাজী ১৯৩৮ সালে আরণা এবং ধুবড়ীতে ভূমিকম্প হয়, ঐ সময়ে ভূগোলের সহিত খগোলের ঐরূপ সম্বন্ধ ঘটে। এ সম্বন্ধে ১৯৩৮ সালের ২৭শে নবেম্বর "অবতার" পত্রিকায় ভবিষ্যদ্বাণীরূপে প্রকাশ করা হইয়াছিল। কিন্তু এই যোগের ফল শেষভাগে হওয়ায় নির্দ্দিষ্ট দিনের ৮ দিন পরে আরণা এবং ৯ দিন পরে ধুবড়ীতে হয়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দৃষ্টান্ত আসাম এবং তুরস্কের ভূমিকম্প; এই ভূমিকম্প সম্বন্ধে ইংরাজী ১৯৩৯ সালের ২২শে মে অবতার পত্রিকায় প্রকাশ করা হইয়াছিল এবং ঐ দুই ভূমিকম্প ইংরাজী ১৯৫০ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী এবং ১৫ই এপ্রিল দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উক্ত দুইটি ভূমিকম্পই নির্দ্দিষ্ট সময়ে হইয়াছিল।

চতুর্থ দৃষ্টান্ত—ইংরাজী ১৯৫০ সালের ৮ই জুন অবতার পত্রিকায় প্রকাশ করা হইয়াছিল; এবং প্রথম ভূমিকম্পটী পাঞ্জাব প্রদেশে হয়। (স্থান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া রাখা হয় নাই) তৎপরে ৭ হইতে ১০ দিনের মধ্যে রোমানিয়া, জুনাগড়, রাজসাহী, গাইবান্ধা, শিবসাগর ও দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে ভূমিকম্প হয় এবং এই যোগে বোম্বাই ঢাকায় প্রচণ্ড ঝড়, স্পেনে প্লাবন এবং অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি উপদ্রব ঘটিয়াছিল। সুতরাং চারিটী ভূমিকম্প ঘটনার মধ্যে কোনটী ব্যর্থ হয় নাই; কিন্তু কোন ঘটনা নির্দ্দিষ্ট সময় হইতে কয়েক দিনের মাত্র প্রভেদ হইলেও, ঐ প্রভেদটুকু সংশোধন করা খুবই সহজ।

আমাদের দেশে এই সকল জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ে পরস্পরের সহানুভূতি কিম্বা যোগ্য ব্যক্তিগণের আনুকূল্যের অভাব না হইলে, অপর দেশের তুলনায় এক এক মাসে এক বৎসরের সমান অগ্রসর হওয়া অসম্ভব নহে।

শতাব্দীর শব

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়, বি.এ.

অমাবস্যার স্থবির রাত,
হন্যে কুকুরের মত ধুঁকছে।
অন্ধকার যবনিকার গায়ে সরু সরু ছায়া—
যেন গোণা যাচ্ছে ওর পাঁজরা।
পাশের নিম গাছ থেকে পেঁচার ডাক ভেসে আসে,
প্রেতের উলঙ্গ চীৎকারের মত।
মাথার উপর দিয়ে বাদুড় উড়ে গেল—
পিশাচের ছোঁড়া ঢিল।
ঝিঁঝিঁদের একটানা কান্না—শিবাদের উল্লাস,
অমাবস্যার স্থবির রাত
হন্যে কুকুরের মত ধুঁকছে

শব পড়ে রয়েছে;
তার উপর বসে আছে কাপালিক।
নর-কপালে পড়ে রয়েছে আসব।
চারিদিকে প্রেতের নাচ,
শোণিতের উৎসব।
দেবতা-পুতুলে একাকার—
শুধু চেয়ে থাকা;
অমাবস্যার স্থবির রাত,
হন্যে কুকুরের মত ধুঁকছে।

* *

নিত্যানন্দের প্রচার

শ্রীজনরঞ্জন রায়

"প্রভু বলে শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি॥"
—চৈতন্য ভাগবত, অন্ত্য, ৫ম অধ্যায়।

রথের সময়ে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবকে দেখিবার জন্য গৌড়ের ভক্তগণ পুরীতে আসিয়াছেন এবং বর্ষার পর ফিরিয়া যাইবেন। সন্ন্যাসের পর ৫ম বর্ষে তিনি যে সেই শেষ বার নবদ্বীপ(১) গিয়াছিলেন, পুরীতে না আসিলে আর তো তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যাইবে না। কয় বৎসর তো তিনি রথের সময়েও ছিলেন না(২)। আবার যে কখন কোথায় চলিয়া যাইবেন, তাহাই বা কে বলিবে?

চাতুর্মাস্য সমাধা হইয়াছে, শরৎ আসিয়াছে, এইবার যাইবার আয়োজন করিতে হইবে। বর্ষার দিনে তখন হাঁটা পথের কষ্ট অসহনীয় ছিল। তীর্থযাত্রীগণ প্রায়ই সকলে বয়স্ক ব্যক্তি। তাই বর্ষার সময়টা তাঁহারা পুরীতেই অতিবাহিত করিতেন। ফিরিবার দিন নিকট হইতেই সকলের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। আবার যে এক বৎসর গৌরসুন্দরকে দেখিতে পাওয়া যাইবে না। অভিন্নপ্রাণ শ্রীনিত্যানন্দের পক্ষে গৌর-বিরহ যে অসহ্যপ্রায়। যদিও গৌরাঙ্গদেব নিত্যানন্দকে কোন তীর্থভ্রমণাদি কালে সঙ্গে লইতেন না, তথাপি নিত্যানন্দ পুরীতেই থাকিতে চাহিতেন। গৌরাঙ্গ ফিরিয়া আসিলে আবার দর্শন সম্ভব হইবে এই আশায়। অথচ এবার যাত্রীগণের সঙ্গে নিত্যানন্দকেও ফিরিয়া যাইবার জন্য গৌরাঙ্গদেব আদেশ করিলেন। এই আদেশপ্রাপ্তির পর নিত্যানন্দ প্রভু নবদ্বীপকে কেন্দ্র করিয়া যে প্রচার কার্য্য করেন, তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা।

একমাত্র পুরীধামই সর্ব্ব সম্প্রদায় হিন্দুর মিলনক্ষেত্র। গৌরাঙ্গ তখন সেখানে জগন্নাথদেবের দ্বিতীয় কলেবর বলিয়া মান্য পাইতেছেন। তাঁহার নিষ্ঠাচার ও কঠোর সন্ন্যাসব্রত সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে। পুরীরাজ তাঁহার চরণ ধরিয়া কৃপা প্রার্থনা করিতেছেন—

"শ্রীহস্ত পরশে রাজা পাইল চেতন।
প্রভুর চরণ ধরি করেন ক্রন্দন॥
ত্রাহি, ত্রাহি কৃপাসিন্ধু সর্ব্ব জীবনাথ।
মুঞি পাতকীরে কর শুভ দৃষ্টিপাত॥"—ঐ

আদর্শস্থাপনের জন্য গৌরাঙ্গদেব তাঁহার প্রিয় শিষ্যদের সামান্য সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতিও সহ্য করিতেছেন না এবং আত্মপ্রচার তিনি একেবারেই অপছন্দ করিতেছেন। এমন-কি নিত্যানন্দকে আদেশের অব্যবহিত পূর্ব্বেই প্রতাপরুদ্রকে তিনি বলিতেছেন—

"সবে একবাক্য মাত্র পালিবা আমার।
মোরে না করিবা তুমি কোথাও প্রচার॥
এবে যদি আমারে প্রচার কর তুমি।
তবে এথা ছাড়ি সত্য চলিবাঙ আমি॥"—ঐ

এইরূপ নির্দ্দেশ পাইয়া প্রতাপরুদ্র গৌরাঙ্গদেবের প্রচারে আত্মনিয়োগ না করিয়া গৌরাঙ্গের ধ্যানপূজায় মনোনিবেশ করেন(৩)—

"প্রভু দেখি নৃপতি হইয়া পূর্ণকাম।
নিরবধি করেন চৈতন্যচন্দ্র ধ্যান॥"—ঐ

আমরা মনে করি নিত্যানন্দের প্রতি গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশের মূলে হয়তো অনেকগুলি কারণ ছিল। যখন গৌরাঙ্গদেব সদাচার-পালনের জন্য প্রিয় পার্ষদগণকে শাসন করিতেছেন, সেই সময়ে অবধূত নিত্যানন্দের আচার-নিষ্ঠার অভাবে গৌরাঙ্গদেব কুণ্ঠিত হইতেছেন। নিত্যানন্দের প্রেম গৌরাঙ্গ প্রভু অন্তরের সহিত অনুভব করিলেও, নিত্যানন্দ বিরোধী দল বাড়িয়া যাইতেছিল। অথচ নিত্যানন্দ প্রভুর উদ্দাম ভাব সংযত করা একান্ত সুকঠিন। তাহা ছাড়া পুরীতে গৌরাঙ্গদেব যখন নিজ নাম প্রচার চাহিতেছেন না, তখনও যে স্বপ্নেও নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গের নাম ছাড়া অন্য নাম কীর্ত্তন করিতেন না—

"নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম উদ্দাম।
সর্ব্ব নীলাচলে ভ্রমে মহাজ্যোতির্দ্ধাম॥
সদাই জপেন নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
স্বপ্নেও নাহিক নিত্যানন্দ মুখে অন্য॥"—ঐ

ইহাতেও হয়তো গৌরাঙ্গদেব সঙ্কুচিত হইতেছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার মনে তখন বৈষ্ণব দর্শনাদি লিখাইবার ইচ্ছা উদ্রেক হইয়াছে দেখা যায়। যাহার জন্য নিজে আসিয়া রূপ সনাতনকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। নিত্যানন্দের উদ্দামতা এই কার্য্যে বিপর্য্যয় আনিতে পারে। কিম্বা 'কর্ত্তব্যো লোকসংগ্রহঃ' গীতার এই নীতি অনুসরণ করিয়া গৌড়ে

১। "মায়ের বচনে পুনঃ গেলা নবদ্বীপ।
বারকোণাঘাট নিজ বাড়ীর সমীপ॥
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারি ঘরে ভিক্ষা কৈল। মায়ে নমস্কারি প্রভু প্রভাতে চলিল॥" লোচন দাসের চৈতন্য মঙ্গলে ইহা পাওয়া যায়। তবে চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য, চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত বা জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলে এই সংবাদ নাই। যদিও মুরারীর কড়চায় "প্রকাশ রূপেন" আগমনের সংবাদ আছে।

২। চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য মতে ১৪৩২, ১৪৩৩ ও ১৪৩৪ [illegible] রথের সময়ে গৌরাঙ্গদেব পুরীতে ছিলেন না।

৩। উড়িয়া কবি ঈশ্বর দাসের মতে জগন্নাথ দেবের প্রত্যাদেশে রাজ্ঞীসহ প্রতাপরুদ্র গৌরাঙ্গের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

নিজ সম্প্রদায় বৃদ্ধির জন্য গৌরাঙ্গদেব এরূপ আদেশ দিয়া থাকিবেন। পুরীতে তিনি তখন সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও, সে তুলনায় গৌড়ে তাঁহার প্রতিষ্ঠা যথেষ্ট ছিল না। অথবা চৈতন্য ভাগবতের উক্তিই প্রধান কারণ হইবে—

"প্রভু বলে শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি।
প্রতিজ্ঞা করেছ আমি আপনার মুখে।
মূর্খ নীচ দরিদ্রে ভাসাব প্রেম সুখে।
তুমিও থাকিলে যদি মুনিধর্ম্ম করি।
আপন উদ্দামভাব সব পরিহরি।
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বল দেখি আর কেবা করিবে উদ্ধার।
ভক্তি রসদাতা তুমি, তুমি সম্বরিলে।
তবে অবতার কিবা নিমিত্তে করিলে।
এতেক আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও।"—ঐ

এইভাবে আমরা দেখিতে পাই চৈতন্যভাগবতকার একই অধ্যায়ে দুইটি পরস্পরবিরোধী সংবাদ দিতেছেন(৪)। গৌরাঙ্গদেব প্রথম অদ্বৈতকে প্রচার করিতে নিষেধ করিতেছেন অথচ নিত্যানন্দকে প্রচার করিতে আদেশ করিতেছেন। গৌরাঙ্গদেব যেন বলিতেছেন—আমাকে অবতার বলিয়া প্রচার কর, উদ্দাম ভাবেই তাহা প্রচার কর। তবে প্রচার করিবার পাত্র ঠিক করিয়া দিতেছেন—মূর্খ, নীচ, দরিদ্র। ইহা দ্বারা উচ্চ শ্রেণীর বর্ণাশ্রমিদের বোঝায় না। বোঝায় শূদ্রদের, পতিতদের—সমাজ যাহাদের কোনদিন চাহে নাই, কোন প্রতিষ্ঠা দেয় নাই। তাহাদের কোল দাও, উদ্ধার কর—ইহাই গৌরাঙ্গদেবের উদ্দেশ্য। ইহা সম্ভব করিতে নিত্যানন্দ প্রভুই একমাত্র উপযুক্ত। তিনি সর্ব্ব সংস্কারমুক্ত, কোন বাঁধাধরা নিয়মে আবদ্ধ নহেন। উদ্দাম উদ্দীপনাময় তেজস্বী পুরুষ। যৌবনে বিশ বৎসর কাল ভারতের তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া তিনি অশেষ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা তিনি এই প্রচার কার্য্য কতদূর সফল করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। তাঁহার রূপও ছিল অপরূপ। এই সময়ে তাঁহার বয়স ৪৪ বৎসর হইয়াছিল বোধ হয়।

আমাদের বিবেচনায় চৈতন্য ভাগবতের এইরূপ ভাষার মধ্যে যেন গৌরাঙ্গদেবের একটা প্রচ্ছন্ন অভিমানও ব্যক্ত হইতেছে। গৌরাঙ্গ যেন বলিতেছেন—আমায় যখন "অবতারত্ব"(৫) (নেতৃত্ব ?) দিলে, তখন নিজে যে কাজের ভার লইয়াছিলে, তাহা ভুলিয়া আছ কেন?

ইহা হইতে অনুমান হয় তিন প্রভু একযোগে একই উদ্দেশ্য লইয়া কোন একটা কাজ সম্পন্ন করিবার সিদ্ধান্ত করেন। কাজটা অবশ্য জীবোদ্ধার (৬)। তাহার তত্ত্ব ও দর্শনরচনার ভার পড়িল নায়ক গৌরাঙ্গের উপরে, দলগঠনের ভার নিলেন নিত্যানন্দ এবং সাধনপ্রণালী নির্দ্দেশের ভার অদ্বৈতাচার্য্যের উপরে পড়িল। তিন প্রভুর কার্য্য হইতেও আমাদের অনুমানের সমর্থন পাওয়া যায়।

মনে হয় শেষ বার গৌড় হইতে প্রত্যাবর্তনের বৎসরেই হয়তো নিত্যানন্দের প্রতি এই আদেশ হয় নাই, তাহার পর বৎসর এই আদেশ হয়। সুতরাং ১৪৩৮ শকের (১৫১৭ খ্রীঃ) শরৎকালে গৌরাঙ্গদেবের আদেশে নিত্যানন্দ প্রভু পুরী হইতে যাত্রা করেন। তাঁহার সঙ্গে যে দ্বাদশটি ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁহাদের দ্বাদশ গোপাল বলা হয়। এই দ্বাদশটি পার্ষদের পরিচয়ের মধ্যে নিত্যানন্দ প্রভুর প্রচারে সফলতার বীজ নিহিত ছিল। উপযুক্ত সহযোগী ব্যতীত কখনও কোন কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা মতে এই দ্বাদশ গোপালের পরিচয় দিতেছি। [২১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য] (৭)—

ইঁহাদের মধ্যে শ্রীধর পণ্ডিত ব্যতীত সকলেই নিত্যানন্দ শাখা অন্তর্গত। শ্রীধর চৈতন্য শাখা অন্তর্গত।

এই দ্বাদশ গোপালের সকলেই পরম পণ্ডিত, পরম সুন্দর কান্তি ও দেহে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব ছিল—

নিরবধি সবার শরীরে কৃষ্ণভাব।
অশ্রু কম্প পুলক যত অনুরাগ॥
সবার সৌন্দর্য্য যেন অভিন্ন মদন।
নিরবধি সবে করেন সংকীর্ত্তন॥" চৈঃ ভাঃ ঐ

—ইঁহাদের সকলেরই গোপাল ভাব। সকলেরই হাতে বেত্র-বাঁশী শিঙ্গা ছাঁদদড়ি, বক্ষে গুঞ্জাহার ধড়াচূড়, পায়ে নূপুর

৪। চৈতন্য ভাগবতে ক্রমভঙ্গদোষ বহু স্থানে আছে। এখানেও আছে কিনা বলা যায় না।

৫। গৌরাঙ্গদেবকে ১৯ বৎসর বয়সে অদ্বৈতাচার্য্য গঙ্গাজল তুলসী দিয়া শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া ঘোষণা করেন (১৫০৫ খ্রীঃ)

৬। চৈতন্যচরিতামৃতের মতে "আস্বাদিতে নিজ মাধুরী" নহে, ইহা চৈতন্যভাগবতের মতে জীবোদ্ধার—মূর্খ নীচ দরিদ্রদিগকে প্রেম বিতরণ দ্বারা।

৭। অনন্তসংহিতাধৃত ১২শ গোপালের যে পরিচয় গৌরগণোদ্দেশ মতে আছে, তাহাই দিলাম, ১৩শ গোপালের পরিচয় দিলাম না। চৈতন্য ভাগবত এই দ্বাদশ গোপালের পূর্ব্ব পরিচয় দিলেন না, বলিলেন—"নিত্যানন্দ স্বরূপের নিষেধ লাগিয়া। পূর্ব্ব নাম না লিখিল বিদিত করিয়া। (চৈঃ ভাঃ অন্ত ৫ অঃ)।" কিন্তু গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় তাহা পাওয়া গেল। চৈতন্যভাগবতের রচনাকাল যদি ১৪৭১ শক হয়, তবে তাহার ২৭ বৎসর পরে ১৪৯৮ শকে গৌরগণোদ্দেশ লিখিত হইয়াছে। এই দীর্ঘ সময় মধ্যে দ্বাদশ গোপালের পরিচয় নির্দ্ধারিত হইয়া থাকিবে। দ্বাদশ গোপালকে এখন অত্যন্ত সম্মান দেওয়া হয়। এবং পঞ্চতত্ত্বের ভোগের বামে পূর্ব্বদিকে দ্বাদশ গোপালের ভোগ সাজানো হয় (রেণুকার ভোগ-বিবরণ)।

।	অভিরাম ঠাকুর	কৃষ্ণলীলায়	যিনি	শ্রীদাম	গোপাল	এক্ষণে	জাতিতে	ব্রাহ্মণ	শ্রীপাট(৮) খানাকুল-কৃষ্ণনগর (হুগলী)
২।	সুন্দরানন্দ ঠাকুর	„	„	সুদাম	„	„	„	ঐ	„ মহেশপুর (যশোহর)
৩।	ধনঞ্জয় পণ্ডিত	„	„	বসুদাম	„	„	„	ঐ	শীতলাগ্রাম (বর্দ্ধমান)
৪।	গৌরীদাস পণ্ডিত	„	„	সুবল	„	„	„	ঐ	অম্বিকা (কালনা) ঐ
৫।	কমলাকর পিপলাই	„	„	মহাবল	„	„	„	ঐ	মাহেশ (হুগলী)
৬।	উদ্ধারণ দত্ত	„	„	সুবাহু	„	„	„	সুবর্ণ বণিক	সপ্তগ্রাম (ঐ)
৭।	মহেশ পণ্ডিত	„	„	মহাবাহু	„	„	„	ব্রাহ্মণ	পালপাড়া (নদীয়া)
৮।	পুরুষোত্তম ঠাকুর	„	„	স্তোককৃষ্ণ		„	„	ঐ (বৈদ্যশাখা)	বোধখানা চান্দুর (ঐ)
৯।	পরমেশ্বর দাস	„	„	অর্জ্জুন		„	„	ঐ ঐ	আটপুর (হুগলী)
১০।	কালা কৃষ্ণদাস ঠাকুর		„	লবঙ্গ		„	„	ব্রাহ্মণ	আকাইহাট (বর্দ্ধমান)
১১।	শ্রীধর পণ্ডিত(৯)	„	„	মধুমঙ্গল		„	„	ঐ	নবদ্বীপ মালঞ্চপাড়া
১২।	হলায়ুধ ঠাকুর(৯)	„	„	বলরামসখা-প্রবল		„	„	ঐ	নবদ্বীপ রামচন্দ্রপুর

(চৈঃ ভাঃ ঐ)। পুরীতে ইঁহাদের দেখিয়া গৌরাঙ্গদেব নিত্যানন্দকে বলিয়াছিলেন—

"যতেক বালক দেখি তোমার সংহতি।
শ্রীদাম সুদাম প্রায় লয় মোর মতি।
বৃন্দাবন ক্রীড়ার যতেক শিশুগণ।
সকল তোমার সঙ্গে লয় মোর মন॥
সেই ভাব সেই কান্তি সেই সর্ব্বশক্তি।
সর্ব্বদেহে দেখি সেই নন্দগোষ্ঠী ভক্তি॥
একেকে যে তোমারে তোমার সেবকেরে।
প্রীতি করে, সত্য সত্য সে করে আমারে॥" ঐ অন্ত্য ৮ম।

চৈতন্যভাগবতকার এই দ্বাদশটি ভক্তচরিত্র সর্ব্বত্র অতি উদ্দাম-ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। যেন নিত্যানন্দের উদ্দাম ভাব তাঁহাদের উপর আরোপিত হইয়াছে। অনুসন্ধান দ্বারা এই দ্বাদশ গোপালের জন্ম সময়াদি যাহা পাওয়া যায় তাহা বিশ্বাসযোগ্য হইলে, আমরা দেখিতে পাই এই সময়ে দুইজন ব্যতীত কেহই যুবক ছিলেন না। অভিরামের বয়স তখন ৩৮ বৎসর। তিনি অত্যন্ত দীর্ঘাকৃতি ছিলেন। বত্রিশ-জনের বোঝা একখানি কাঠ বাঁশীর মত করিয়া ধারণ করিতেন (গৌর-গণোদ্দেশ মতে)। (জয়-মঙ্গল) চাবুক মারিয়া লোকের ভক্তি পরীক্ষা করিতেন। তাঁহার প্রণামের তেজে বীরভদ্র ব্যতীত নিত্যানন্দ প্রভুর সাত পুত্রই মারা যান। সুন্দরানন্দের বয়স তখন ৪০ বৎসর। তিনি যাহাবি গাছে কদম ফুল ফুটাইয়া-ছিলেন এবং সাঁতার দিয়া কুম্ভীর ধরিয়া আনিতেন। ধনঞ্জয় পণ্ডিতের বয়স ২২ বৎসর। গৌরীদাস পণ্ডিতের বয়স ৩২ বৎসর। তিনি নিতাই গৌরের দারু মূর্ত্তি নিজেই প্রস্তুত করেন (অদ্বৈত প্রকাশ ২২২ পৃঃ)। কমলাকরের বয়স তখন ২৪ বৎসর। উদ্ধারণ দত্ত যিনি নিত্যানন্দের তীর্থসঙ্গী ছিলেন (১০) এবং যিনি অন্ন পাক করিলে নিত্যানন্দ তাহা আহার করিতেন(১১) বলা হয়, তিনি তখন ৩৫ বৎসরের ব্যক্তি। মহেশ পণ্ডিতের বয়সও কমলাকরের ন্যায় ২৪ বৎসর। এই মহেশের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগদীশের স্ত্রী দুখিনী দেবী শচীমাতার সখী ছিলেন। পুরুষোত্তম, পরমেশ্বর ও কালাকৃষ্ণ এই তিন জনেরই বয়স তখন ৩৮ বৎসর করিয়া। ইঁহাদের মধ্যে পরমেশ্বর দাস হৈ-হৈ করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি মৃত শৃগালকে বাঁচাইয়া কীর্ত্তন শুনাইয়াছেন, নিজে চতুর্ভুজ হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে খোলা বেচা শ্রীধরই সকলের জ্যেষ্ঠ। তাঁহার বয়স ৪২ বৎসর। হলায়ুধের কোন বিবরণই জানা যায় না। যদিও গ্রন্থে দেখিতেছি আমাদের বাড়ীর দুয়ারে রামচন্দ্রপুরে তিনি থাকিতেন। যাহা হোক, ইঁহারাই নিত্যানন্দের সঙ্গী দ্বাদশ গোপাল। ইঁহাদের মধ্যে কালাকৃষ্ণদাস ও শ্রীধরকে গৌরলীলায় পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে। গৌরাঙ্গদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের একমাত্র সঙ্গী এই কালাকৃষ্ণদাস।

৮। গৌরমণ্ডলে ৫টি ধাম ও ২৯টি পাট আছে। যথা—

"শ্রীনবদ্বীপধামে প্রভুর জন্ম হয়।
কাটোয়া প্রভুর ধাম জানিবা নিশ্চয়॥
একচাকা জন্মভূমি খড়দহে বাস।
শ্রীনিত্যানন্দের দুই ধাম জানিবা নির্য্যাস॥
শ্রীঅদ্বৈতের ধাম শান্তিপুরে হয়।
এই পঞ্চ ধাম সবে জানিবা নিশ্চয়॥
পঞ্চ ধাম দ্বাদশ পাট সপ্তদশ হয়।
ভক্তগণের সপ্তদশ সহ চৌত্রিশ হয়॥"—পাট পর্য্যটন।

৯। শ্রীধর ও হলায়ুধের পরিবর্ত্তে কেহ কেহ মুকুন্দ দত্ত ও শিশু-কৃষ্ণদাসের নাম উল্লেখ করেন। আমরা কিন্তু প্রাচীনতম গ্রন্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ 'অনন্তসংহিতা'রই অনুসরণ করিয়াছি।

১০। 'বৈষ্ণববন্দনা'গুলি দ্রষ্টব্য।

১১। বিবাহের পর নিত্যানন্দকে ব্রাহ্মণবর্গ জিজ্ঞাসা করেন—আপনার পাচক কে? তাহার উত্তরে—"প্রভু কহে কখন বা আমি পাক করি, না পারিলে উদ্ধারণ রাখয়ে উতারি।"—নিত্যানন্দবংশ-বিস্তার, ৮ পৃঃ।

তাঁহাকে তথায় ছদ্মবেশী বামাচারীরা লুকাইয়া রাখে ও গৌরাঙ্গ প্রভু উদ্ধার করেন। পুরীতে ফিরিয়া পরে ইঁহার দ্বারাই শচীমাতাকে পৌঁছানো সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। আর এই ঈশ্বর—যিনি গৌরাঙ্গ প্রদত্ত অষ্টসিদ্ধি লন নাই, লইয়াছিলেন গৌরাঙ্গের প্রতি আন্তরিক প্রেম—ইনি সেই খোলা বেচা ঈশ্বর।

"এই মত নিত্যানন্দ শ্রীঅনন্ত ধাম।
সবারে দিলেন ভাব পরম উদ্দাম।"

নিত্যানন্দের ভাবে ভাবিত হইয়া সকলে পুরী হইতে ফিরিতেছেন। এখানে 'শ্রীঅনন্ত' কি নিত্যানন্দের একটি নাম—না, অনন্ত তত্ত্ব? নিত্যানন্দ যে তাঁহার নাম নয়, এ কথা বলিতেছি না। কিন্তু নামে ও কাজে অনেক নামীরই একটা মিল হয় না, আমরা নিজের দিয়া তাহা অনুভব করি।

ফিরিবার পথে দ্বাদশ গোপালের প্রত্যেকের দেহেই বিভিন্ন শক্তির উন্মেষ হইয়াছে। প্রেমে সকলেই বাহ্যজ্ঞানহীন। পরম বৈষ্ণব রামদাস গোপালভাবে ত্রিভঙ্গ হইয়া তিন প্রহরকাল পথের মাঝে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দাস গদাধর রাধিকাভাবে, রঘুনাথ বৈদ্য উদ্ধবাবেশ রেবতী ভাবে, কৃষ্ণদাস ও পরমেশ্বর দাস গোপালভাবে নাচিতেছেন। পুরন্দর পণ্ডিত অঙ্গদভাবে গাছে চড়িয়া লাফালাফি করিতেছেন। এখনও তাঁহারা এমন ছুটিতেছেন যে, "দণ্ডে পথ চলে সবে ক্রোশ দুই চারি।" যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—গঙ্গার ধারে কোন পথে যাইব? লোকে বলে তোমরা পথ ভুলিয়াছ। আবার দুই দণ্ড যায় ঠিক পথে ফিরিয়া আসিতে। তাহার পর বহুদূর গিয়া পথের সন্ধান লইয়া জানিলেন—"পথ রহে দশ ক্রোশ বামে।" যাহা হোক, এইভাবে কোনক্রমে "আইলেন গঙ্গাতীরে পানিহাটী গ্রামে।" কিন্তু ইহার মধ্যে "যত দেহধর্ম-ক্ষুধাতৃষ্ণা-ভয়-দুঃখে, কাহার নাহিক পাই পরানন্দ সুখে" (চৈঃ ভাঃ)। ছত্রভোগ হইতে পানিহাটী—একটানা এইভাবে কবি বৃন্দাবন দাস ইঁহাদের আনিয়া ফেলিলেন। দূরত্ব বড় কম নয়। কবি বুঝি নিত্যানন্দের নিকট শোনা কথাই লিখিয়াছেন। নিত্যানন্দের তখন বাহ্যজ্ঞান ছিল না। সুতরাং পথের কোন বিস্তারিত বিবরণ কবিও জানেন না। তাই তিনি লিখিয়াছেন—'পথে যত লীলা করিলেন নিত্যানন্দ, কে বা জানে, সকল অনন্ত' (ঐ)।

কিন্তু আমরা নিত্যানন্দের সঙ্গে শুধু দ্বাদশ গোপালকেই দেখিতেছি না। রামদাস ও গদাধর(১২) আছেন এবং রঘুনাথ পুরন্দর প্রভৃতি প্রধান প্রধান গৌড়ীয় ভক্তগণও সঙ্গে আসিতেছেন। পুরীতে গৌড়ের যত ভক্ত ছিলেন গৌরাঙ্গদেব সকলকেই বুঝি নিত্যানন্দের প্রচারে সহায়তা করিতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

পানিহাটিতে আসিয়া নিত্যানন্দ প্রভুর প্রথম কার্য হইল নিজের 'অভিষেক', ইহা কি গৌড়ে তাঁহার আধিকারপ্রাপ্তি?—অবশ্য আপনগণ মধ্যে। কারণ গৌরাঙ্গদেব যে তাঁহাকে গৌড়দেশ দান করিয়াছেন। ইহাকে 'প্রেম শক্তির-বিকার' না বলিয়া বেশ একটা সুচিন্তিত কার্যপন্থা বলা চলে। নিত্যানন্দ প্রচারের পূর্বে এইভাবে নিজ নায়কত্বের ঘোষণা প্রদান করিলেন। বিরোধীদের নিরসন কল্পও ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য হইতে পারে। বিরোধী দল ছিল। নিত্যানন্দ তিন প্রভুর অন্যতম হইলেও, গৌরাঙ্গ লীলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকার কবি কর্ণপুর—যিনি বাংলায় বসিয়া বহু প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা দ্বারা বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর সহিত তুলনীয় হইয়াছেন—তাঁহার কোন গ্রন্থে নিত্যানন্দ প্রভুর বিশেষ কোন উপদেশাদির উল্লেখ করেন নাই। এবং দেখা যায় অদ্বৈত সম্প্রদায়, গৌর নাগর উপাসক সম্প্রদায় ও গদাধর সম্প্রদায় নিত্যানন্দ সম্প্রদায়ের বিরোধী ভাব প্রকাশ করিতেন।

পানিহাটিতে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে নিত্যানন্দের অভিষেক হইল। যখন রাঘব পণ্ডিত ও পরিষদগণ অঞ্জলি গঙ্গাজল দিয়া নিত্যানন্দকে স্নান করাইবার সময়ে অভিষেক মন্ত্র পাঠ করিলেন। "সবেই পড়েন অভিষেক মন্ত্রগীত" (চৈঃ ভাঃ)। তৎপরে নব বস্ত্র ও তুলসীযুক্ত মালা পরাইয়া "দিব্য খাট্টা স্বর্ণে করিয়া ভূমিক সম্মুখে আনিয়া করিলেন উপনীত; খট্টায় বসিলা মহাপ্রভু নিত্যানন্দ, ছত্র ধরিলেন শিরে শ্রীরাঘবানন্দ" (ঐ)।

ইহা একটা রাজসিক অনুষ্ঠান। কবি এই লীলাকে গৌরবময় করিতে ইহার পরই তাহাতে অলৌকিকত্ব মিশাইয়া দিলেন। রাঘবানন্দের বাড়ীর জেবুর গাছে নিত্যানন্দের ইচ্ছায় কদম ফুল ফুটিল। আবার এই কদম ফুলের মালা গাঁথিয়া যখন নিত্যানন্দের গলায় পরাইয়া দেওয়া হইল, তখন দোণ ফুলের গন্ধে চারিদিক পূর্ণ হইল। নিত্যানন্দ বলিলেন—এখানে কীর্তন শুনিতে স্বয়ং গৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা "সেই শ্রীঅঙ্গের দমনক গন্ধ।" এক্ষেত্রে তোমরা সর্বকার্য পরিহরি, নিরবধি কৃষ্ণ গাও আপনা পাসরি; নিরবধি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচন্দ্র যশে, সবার শরীর পূর্ণ হউক প্রেম-রসে।" নিত্যানন্দপ্রভু সেখানে তিন মাসকাল "নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংকীর্তন করায়েন, করেন লইয়া ভক্তগণ।" সঙ্গে আছেন প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া ও পদকর্তা মাধব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ ও বাসুদেব ঘোষ তিন ভাই। এই অপূর্ব কীর্তনে তাই বুঝি গৌরাঙ্গদেব আকৃষ্ট না হইয়া পারেন নাই।

এই সময়ে নিত্যানন্দের বেশভূষাধারণের ইচ্ছা হইল। এবং "ইচ্ছামাত্র সর্ব অলঙ্কার সেই ক্ষণে, উপসন্ন আসিয়া হইল বিদ্যমানে" (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫ম)। নিত্যানন্দ প্রভু স্বর্ণবলয়, রত্নযুক্ত আংটি, মুক্তার হার, কুণ্ডল, রূপার নূপুর, সোণাবাঁধানো লোহার ছড়ি, নীল রঙের

১২। "শ্রীরামদাস আর শ্রীগদাধরদাস।
চৈতন্য গোসাঞির ভক্ত রহে তাঁর পাশ॥
নিত্যানন্দের আজ্ঞা যবে হৈল গৌড় যাইতে।
মহাপ্রভু এই দুই দিলা তাঁর সাথে॥"—চৈঃ চঃ।

আনিয়াছিলেন। তাহাদের সকলকে বোধ হয় একই মন্ত্র দিয়াছিলেন—ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ নাম রে……। তাহাদের বিবাহ দিলেন শুধু মালা বদল করাইয়া। পরস্পরের মন ভাঙ্গিলে মালা ছিঁড়িয়া ফেলিলেই চুকিয়া গেল, আর এই মালার বাঁধনে আবদ্ধ যাযাবর প্রচারকেরা প্রাণের আবেগে বীরচন্দ্রের নির্দ্দেশে বাংলার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটিতে লাগিল গৌর নাম প্রচার করিতে করিতে নবদ্বীপের কুম্ভকারের নির্ম্মিত এক একটি গৌর বিগ্রহ ঝোলার মধ্যে লইয়া। আমার এই কল্পনা ঐতিহাসিকের আনুবীক্ষণিক পরীক্ষায় সবটা বাস্তব বলিয়া টিকিবে না, কারণ নির্ভরযোগ্য বিশেষ দলিল উপস্থিত করা যায় না। কিন্তু এ কথা ধ্রুব সত্য যে, বাংলার প্রায় ষোল আনা শূদ্র ও নবশাখই বৈষ্ণব, অন্ত্যজ সম্প্রদায় সকলেই বৈষ্ণব। এই অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের ক্রিয়াকর্ম্ম ব্রাহ্মণে করে না, করে গোঁসাইরা। গোঁসাই হয় তাহাদের জাতির কোন ব্যক্তি। তাহাকে প্রায়ই কোন শাস্ত্রের ধার ধারিতে হয় না। তবে গৌর ভজে, তিলক মালা করে। অথচ এই সব নিরক্ষর ব্যক্তিদের বৈষ্ণবতা দেখিবার জিনিষ। বীরভদ্র গোঁসাইয়ের কৃপা না থাকিলে, তাহারা আজ নিশ্চয় বাংলার সংখ্যা-গরিষ্ঠগণের দলপুষ্টি করিত। ইহাদের নেড়ানেড়ী, সহজিয়া প্রভৃতি বলিয়া নাসা কুঞ্চন করা মানে ইতিহাসকে অবজ্ঞা করা। কারণ নিত্যানন্দ-পরিবারের প্রধানভাবে কারবার ছিল যাহাদের লইয়া, তাহারা বড় একটা কোন স্মৃতিরই ধার ধারিত না। রঘুনন্দনের সমাজ-শাসন তখন সবেমাত্র সুরু হইতেছে। ছয় গোস্বামীর দর্শন ও তত্ত্বকথা তখন বৃন্দাবন হইতে আসেই নাই। তাহা আসে অনেক পরে—খেতরীতে। এমনিতর সমাজ তখন বৈষ্ণব হইল। এতদিন গেলেও তাহার রূপ যে বেশী বদলাইয়াছে, তাহা তো মনে হয় না।

জাহ্নবা ও বীরভদ্র তাঁহাদের শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের দ্বারা গৌড় হইতে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত যে ভাবধারা ও যোগাযোগ সংরক্ষণ করিয়া-ছিলেন, তাহা নিত্যানন্দপরিবারের একটি গৌরবময় কাহিনী। এমনকি ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে মনে হয় না যে, ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে (কেহ কেহ ১৫১৫ খ্রীঃ বলেন) গৌরাঙ্গদেব কর্ত্তৃক নিত্যানন্দকে প্রচারের আদেশের পর হইতে প্রায় এক শতাব্দী অর্থাৎ চৈতন্যচরিতামৃতের রচনা কাল (১৬১৫ অথবা ১৬১২ খ্রীঃ) পর্য্যন্ত গৌড় দেশে নিত্যানন্দের যুগ। এই দীর্ঘ এক শতাব্দী কাল নিত্যানন্দের সখ্যরসের উপাসনা গৌড়দেশকে তন্ময় করিয়া রাখিয়াছিল। এই অধ্যায়ের গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ইতিহাসে নিত্যানন্দের প্রভাব পরিপূর্ণ ভাবে অনুভূত হইবে। যদিও ইতিমধ্যে তিন প্রভুর তিন 'দ্বিতীয় কলেবর' শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু নিত্যানন্দের, জাহ্নবার ও বীরভদ্রের প্রভাব তদ্দ্বারা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল কিনা, তাহা দেখিলেই আমাদের যুক্তি কতটা ভারসহ, তাহা প্রমাণিত হইবে। আমরা বলিতে চাই—তাহার পর প্রায় এক শতাব্দী পর্য্যন্ত—(সংশোধন সাপেক্ষভাবে যাহার তারিখ ধরিতেছি ১৬১৫ খ্রীঃ হইতে ১৭১৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত) বাঙলায় বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের মত মাধুর্য্যরসের উপাসনা প্রচলিত ছিল। ১৭১৫ বলিলাম, তাহার কারণ তখন ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছে, ঘনরাম সহদেব প্রভৃতি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সহজীয়া বিরোধী এই বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মকে অনেকটা মানিয়া চলিতেছিল ও শেষে শক্তি-উপাসনায় পর্য্যবসিত হয়—যাহার নিদর্শন ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ প্রভৃতির রচনা।

নিত্যানন্দের প্রচারের মধ্যে আমরা দেখিলাম গৌরলীলার আদিস্থান নবদ্বীপকে কেন্দ্র করিয়া তিনি দ্বিধাশূন্যভাবে সর্ব্বজাতির হিন্দুদের ঘরে ঘরে গৌরনাম প্রচার করিলেন এবং অস্পৃশ্যতাকে যতটা পারা যায় ঠেলিয়া রাখিয়া সকলের সঙ্গে পানভোজন, মহোৎসবাদি দ্বারা মিলনের পথ মুক্ত করিলেন। গৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাস লওয়ার পর সে ধারা সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ একেতো ইহা উচ্চবর্ণীয়গণের বিরোধী ধর্ম্ম, তাহাতে রাজভয় বিলক্ষণ ছিল। তখন দিল্লীর সিংহাসনে ইব্রাহিম লোদী (১৫১৭-২৬ খ্রীঃ) বাংলায় আলাউদ্দিন হুসেন সাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ)।

সমাজপীড়িত হিন্দুগণ তাহাদের নিত্যানন্দকে এখনও ভুলে নাই—কখনই ভুলিবে বলিয়া তো মনে হয় না। নিত্যানন্দ যে তাহাদের মুমূর্ষু প্রাণে প্রাণ দিয়াছিলেন, সমাজ দিয়াছিলেন, ধর্ম্ম দিয়াছিলেন, কোল দিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ তাহাদের ইষ্টদেবতা হইলেও, তাহারা গাহিবে—'নিতাই ভজিলে গৌর পাবে'। অন্তরের সমস্ত ভালবাসা দিয়া তাহারা ইহা আজও গায়। নিত্যানন্দের প্রচারের ইহাই শ্রেষ্ঠ অংশ।*

* নবদ্বীপ ৭ম এডোয়ার্ড এংগ্লো-সংস্কৃত লাইব্রেরীর ২৬তম প্রতিষ্ঠা-দিবস বার্ষিকী উপলক্ষে গত ৬ই জুলাই, ১৯৪১ তারিখে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র-নাথ মজুমদারের সভাপতিত্বে যে সংস্কৃতি-সম্মেলন হয়, তাহাতে লাইব্রেরী-সম্পাদক লেখক কর্ত্তৃক পঠিত প্রবন্ধ।

গান ও স্বরলিপি

মিশ্র খাম্বাজ—কাহারবা

বসন্ত এলো আজি বাদল দিনে।
এলো বন-বীথিকা, এলো নব মাধবিকা
মৃদু ছন্দ এলো আজি নীরব বীণে।

মূর্চ্ছনা জাগে আজি মন-মৃদঙ্গে
একি লাস্য ভাসিয়া ওঠে নবীন রঙ্গে—
কিসে মত্ত করিল বল বন হরিণে।

কথা—শ্রীনরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র

+ 0 + 0
II {সা গা -মা পা I -া -া -া -া | সা গা -মা পদা I
ব স ন্ ০ | ব স ন্ ত

+ 0 + 0
পা মা জ্ঞমা -জ্ঞরা | মজ্ঞা -া -রা -সা I সা গা মা পদা | পা মা জ্ঞমজ্ঞরা সনা I
এ লো আ০ ০০ | জি ০ ০ ০ এ লো আ জি০ | বা দ ল০০০ দি০

+ 0 + 0
সা -া -া -া} | -া -া গা মা I মা মা পা পা | পা -ধপা মগা মা I
নে ০ ০ ০ | ০ ০ এ লো ব ন বী থি | কা ০০ এ০ লো

0
[পধা ণর্সা]
পা ধা ণা র্সা ণধা -পধা পা -া I -া -া মগা মা | পা -র্সা ণা পা I
ন ব মা ধ বি০ ০০ কা ০ ০ ০ মৃ০ দু | ছ ন্ দ এ

মা -পা মা গা র্সা গা মা পদা I মপা -া -া -দা পা মা জ্ঞমজ্ঞরা সনা I
লো ০ আ জি নী র ব বী০ ণে০ ০ ০ ০ বা দ ল০০০ দি০

সা -া -া -া II
নে ০ ০ ০

II + o মা -পা পা পা I + মধা পা মজ্ঞা মা | o ণা পা র্সা না I
মূ র্ ছ না জা০ গে আ০ জি | ম ন মৃ দ

+ র্সা -া -া -া | o -া -া পা ণা I + পণা -র্সর্রা র্সা ণা | o পমা পা মা গা I
ঙ্গে ০ ০ ০ | ০ ০ এ কি লা০ ০০ সু ভা | সি০ য়া ও ঠে

+ সা -গা মদা পা | o জ্ঞমা -জ্ঞরা সা -া I + -া -া মগা মা | o [পণা র্সর্রা র্সণা] পা -র্সা ণা পা I
ন ০ বী০ ন | র০ ০ঙ্ গে ০ ০ ০ কি সে | ম ০ ত্ত ক

+ মা ধপা মা গা | o সা গা মা পদা I + মপা -া -া -দা | o পা মা জ্ঞমজ্ঞরা সন্া I
রি ল্ ব ল | ব ন হ রি০ গে০ ০ ০ ০ | বা দ ল০০০ দি০

+ সা -া -া -া II II
নে ০ ০ ০

সংশয়

শ্রীমন্টুরাণী ঘোষ

মিথ্যা মনে হয়—
তোমার অস্তিত্ব প্রভু! জেগেছে সংশয়।
প্রথম শৈশব হতে একান্ত বিশ্বাস—
তুমি আছো জেনে যতো পেয়েছি আশ্বাস—
সন্দেহের দ্বন্দ্বাঘাতে ক্ষুব্ধ আজি। জানি,
তোমার সৃজিত বিশ্ব; স্রষ্টা তুমি মানি।
এই শশী, এই রবি লক্ষ তারা রাশি,
উদার অসীম শূন্যে আলোকের হাসি,
দুর্গম কান্তার গিরি সমুদ্র গহনে
রয়েছ নিভৃত তুমি; তবু জাগে মনে:

সুন্দরের সভাতলে রাজসিংহাসন
যারে তুমি শ্রেষ্ঠ ব'লে ক'রেছ অর্পণ—
শুনিতে কি পাও তার নিঃশব্দ গুঞ্জনে
অসহায় ব্যথাখানি! করুণ ক্রন্দনে
অতৃপ্ত আত্মার বীণে কাঁপে ধরাভূমি—
সর্ব্বহারা, লোভাতুর। শুনেছ কি তুমি
সুকঠিন মর্ম্মতলে?—করেনি চঞ্চল
এত ব্যথা, এত কান্না—এত অশ্রুজল!
আমার দুঃখের চেয়ে কতো বড় তুমি!
উদ্দেশ পাবে না তব মোর ধরাভূমি
বেদনাক্ত বিদীর্ণ ব্যাকুল!

মেঘ ও সূর্য

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সাত

অতীত ইতিহাসের বেশ কয়েকটা পুরাণো দিনে ফিরে গিয়ে আমরা যেটুকু ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করতে পেরেছি, তা' থেকে জানা গেছে যে, মঞ্জুদি বহু পূর্বে বিয়ে করেছিলেন। আজ অবশ্য তাঁর শরীরে কোন জায়গাতেই সেই বিবাহের সামান্যতম স্বীকৃতিও পাওয়া যায় না—অথচ বিধবাও যে তিনি নন, একথাও আমরা জানি। বয়ঃস্থা কুমারীর মধ্যেই তাঁর বর্তমান দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা। কাব্য ক'রে তাঁকে রহস্যময়ী ব'লে অভিহিত করা যেতে পারে—কিন্তু তারও গভীরে—তারও নিবিড়তম অন্তরে যে কাহিনী একদা রূপ নিয়েছিল, তা' আজ বর্ণনা করলে হয়তো উপন্যাস ব'লে মনে হ'বে।

সে কাহিনী বর্ণনা করার আগে মঞ্জুদির শারীরিক বর্ণনা কিছু করা দরকার, না হ'লে ঠিক তাঁকে অনুধাবন করা যাবে না—যে দৃঢ়তায়, যে গাম্ভীর্য্যে তাঁর সমস্ত শরীর গঠিত, তা' যেন একমাত্র মঞ্জুদির মধ্যেই সম্ভব হ'য়েছিলো—অন্য যে কোনো মানবীর পক্ষে এটা অতিরিক্ত বোধ হ'ত—মনে হ'তে পারতো অস্বাভাবিক।

দীর্ঘ, ঋজু চেহারা, চোখ দুটীতে আকাশের সমস্ত বিদ্যুৎ-শক্তি যেন আত্মগোপন ক'রে আছে, বয়স ত্রিশের মধ্যেই—সমস্ত মাথায় কালো চুলের অজস্র বন্যা! তবু তার মধ্যে যখন হঠাৎই কয়েকটা সাদা চুলের আবিষ্কার ঘটে, তখন সেই ভাবে আকস্মিক হেসেই মঞ্জুদি উত্তর দেন, "ওটা আমার অভিজ্ঞতা—ওর—জন্যে সত্যিই আমি গর্বিত।"

সমস্ত মুখে চোখে কঠিন গাম্ভীর্য্য যেন সর্বদাই একটা আবরণ দিয়ে ঘিরে রেখেছে। খুব কম হাসেন। কথা বলেন আরো অল্প। কিন্তু একবার যদি কোনো বিষয়ে—কোনো কারণে উত্তেজিত হ'য়ে ওঠেন, তাহ'লে যে অবস্থা ঘটে—তা' আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি।

তবু যেন মঞ্জুদিকে ভালো লাগে—সব থেকে মুগ্ধ করে তাঁর ব্যবহার—যাকে তিনি স্নেহ করেন, সেই শুধু মন দিয়ে, চেতনা দিয়ে এই জিনিষটাকে উপলব্ধি করতে পেরেছে—বাইরের লোকের কাছে তিনি চিরকালই দুর্বোধ্য! তবু মঞ্জুদিকে ভালো লাগে—দৃঢ়তায় গম্ভীর—ভাব-গাম্ভীর্য্যে অটল মুখের দিকে চেয়ে মঞ্জুদির ওপরে শ্রদ্ধাই আসে, সব থেকে ভালো লাগে যখন তিনি কথা বলেন—অতি ধীরে, অতি সংযত ভাবে।

অতীত ইতিহাসের সেই কয়েকটা পুরাণো দিনে যদি ফিরে যাওয়া যায়, তাহ'লে দেখা যায় যে, তখন মঞ্জুদির সমস্ত শরীর ঘিরে এই দুর্বোধ্যতার কঠিন আবরণ নামেনি। তখন তিনি ছিলেন বাংলা দেশেরই অতি-সাধারণ একটী বধূ মাত্র। অভিভাবকদের সন্তুষ্টিসাধনায় তাঁর সমস্ত দিন-রাত্রির অধিকাংশ সময় উৎসর্গীকৃত। কিন্তু মঞ্জুদির সেই শান্ত সংহত জীবন-যাত্রার গতিপথ হঠাৎ পরিবর্তিত হ'ল—হঠাৎ একদিন দেখা গেল—পরিবর্তন এসেছে। বন্যার মতো সেই তীর-জনপদ-প্লাবী প্লাবন!

মঞ্জুদির শ্বশ্রুমাতা একদিন অতি সহজেই আবিষ্কার করলেন যে, মঞ্জুদিকে নিয়ে সংসার করা আর সমস্ত সংসারকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করা একই কথা! আবিষ্কার করলেন—এই কাল-সাপ এতোদিন তিনি দুধকলা দিয়েই পুষে এসেছেন—আজ তাঁকে সেই কৃতঘ্ন দংশন করেছে—আবিষ্কার করলেন অবিলম্বে তাঁকে চিরজীবনের মতো সেই বাড়ী থেকে না নামিয়ে দিলে, তাঁর নিজেরই মৃত্যু অনিবার্য্য!

কিন্তু আর একটা কথা তিনি ভাবলেন। মঞ্জুদির স্বামীর সংগে পরামর্শ ক'রে ঠিক করলেন, যে, মঞ্জুদির স্বভাবটাকে সংশোধন করার জন্যে তাঁদের পক্ষ থেকে কোনো চেষ্টাই করা হয়নি!—একবার অন্ততঃ সেই চেষ্টা ক'রে দেখা হোক—যদি সেরে যায়!

মঞ্জুদির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ গঠিত হ'য়েছিলো তার গুরুত্ব বাংলা দেশের পক্ষে অস্বীকার্য্য নয়। যে-কোনো হিন্দু নারীর পক্ষে সে অভিযোগ মর্মান্তিক!

প্রথম দিন মঞ্জুদি শুনে আশ্চর্য্য হ'য়েছিলেন, প্রতিবাদ ক'রেছিলেন—জানিয়েছিলেন, তাঁদের সন্দেহ ভিত্তিহীন, এ-ভাবে সন্দেহ করায় তাঁদের নীচ মনের আত্ম-প্রকাশ ঘটছে!

এর পরে মঞ্জুদিকে সংশোধন করার জন্যে শ্বশ্রূমাতা আর এক মুহূর্ত সময় অপব্যয় করেননি—সেইদিনই জননী এবং পুত্রের সম্মিলিত চেষ্টায় মঞ্জুদিকে ছাদের একটা ছোট ঘরে আবদ্ধ রাখা হোল—সমস্ত দিন এবং সমস্ত রাত্রির মধ্যে সামান্য আহার্য্যও পাঠানো হোল না।

সেই তাঁর প্রথম দিনের সংশোধনপ্রক্রিয়া! মঞ্জুদির বয়েস তখন পনেরো ছাড়ায় নি। সমস্ত রাত মঞ্জুদি কেঁদেছিলেন; তাঁর সব থেকে বেশী দুঃখ হ'য়েছিলো—স্বামীর বুদ্ধিহীনতার দৈন্যে—কেঁদেছিলেন এই মানুষের সংগেই তাঁকে বাকী সমস্তটা জীবন একই সাথে অতিবাহিত করতে হ'বে এই কথা ভেবে!

সেই ভাবে দুদিন কেটেছিলো। সেই দুটো দিন সম্পূর্ণ উপবাসের মধ্যে দিয়ে গেল। দু'দিনের মধ্যে দরজা একবারের জন্যেও খোলা হয়নি, তৃতীয় দিনে আহার্য্য এলো—কিন্তু তা' যে কোনো শুদ্ধাচারিণী বিধবার উপযুক্ত। জানানো হোল মঞ্জুদির যে চরিত্র-বিকৃতি ঘটেছে, তার সংশোধনকল্পে শ্বশ্রূমাতার এই কল্যাণময় আয়োজন—মঞ্জুদি হিন্দু ঘরের বধূ হ'য়ে জন্মেছে—যে কোনো বার-নারীর কদর্য্যতা তাঁর সমস্ত শরীর থেকে মুছে ফেলবার এই একমাত্র উপায়—প্রয়োজন হ'লে যে, কঠিনতম প্রক্রিয়া প্রয়োজন করতে শ্বশ্রূমাতার কোনো রকম দ্বিধাই আসবে না, সে কথা তিনি সেদিন স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন!

সেইদিন! —সেইদিন থেকেই মঞ্জুদি সংশোধিত হ'তে থাক্‌লেন। তাঁকে বিধবার মতো কাপড় পরিয়ে রাখা হোত, জান্‌লার ধারে এসে দাঁড়িয়েছেন দেখ্‌লে স্বামী নিজেই শঙ্কর মাছের লেজ দিয়ে প্রস্তুত চাবুক ব্যবহার করতেন, মঞ্জুদি মাথা নীচু ক'রে কাঁদতেন। কোনো কোনো রাত কাঁদতে কাঁদতেই ভোর হ'য়ে যেত। দেখ্‌তেন পূর্বদিকে দিনের আলো ফুটে উঠছে ধীরে ধীরে। জান্‌লার ধারে ব'সেই সমস্তটা দিন কাট্‌তো এবং বলা বাহুল্য, অনাহারেই কাট্‌তো!

মনে পড়ে, স্বামীর এবং স্বামি-জননীর পদাঘাত মঞ্জুদিকে একাধিক বার দিনে সহ্য করতে হোত—মঞ্জুদির মনে পড়ে—যতদিন স্বামিগৃহে ছিলেন, তার মধ্যে মাত্র দু'দিন কেউ লাথি মারেন নি—কি কারণে সেই দুটো দিন যে বাদ গিয়েছিলো—আজ মঞ্জুদির সে ঘটনা কেমন অস্পষ্ট লাগে। সব মনে পড়ে না।

অবশেষে একদা চরম দিন এলো। কোর্টের মধ্যে প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে স্বামী স্বীকার করলেন, তাঁর স্ত্রী ব্যভিচারিণী এবং সে সাধারণ্যে নিজের দেহকে বিলিয়ে দেবার জন্যেই লালায়িতা—এখন ধর্মাবতারের কাছে তাঁর একান্ত প্রার্থনা—এই রাক্ষসী স্ত্রীর হাত থেকে তাঁর ন্যায় বিচার তাঁকে রক্ষা করুক, এই পরমা অলক্ষীর কবল থেকে নিষ্কৃতি পাওয়াই এখন তার বর্ত্তমান জীবনের একমাত্র আশীর্বাদ!

প্রকাশ্য বিচারালয়ে মঞ্জুদির যেদিন বিচার হ'য়েছিলো —এরকম ভ্রষ্টা নারীকে বিয়ে ক'রে অমন সোণার চেহারা রাজপুত্রের মতো ভদ্রলোকের দুরবস্থার কথা ভেবে জনসাধারণ সমবেদনায় ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিলো—প্রকাশ্য বিচারালয়ে মঞ্জুদি সেদিন শুধু মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়েছিলেন।

গার্গী উঠে দাঁড়ালো, বললে, "চলি মঞ্জুদি—আভার আবার দুপুরের ট্রেণ ধরতে হ'বে।"

মঞ্জুদি মাথা তুল্‌লেন—বল্‌লেন, "ও আচ্ছা, দিল্লী পৌঁছে চিঠি দিস্ আভা!"

আভা মঞ্জুদিকে এসে প্রণাম করলো—গার্গীও পিছনে পিছনে এসে মঞ্জুদির পায়ে হাত ছোঁয়ালে—উঠবার সময়ে বললে, "আশীর্ব্বাদ করো, তোমাকে কোনোদিনও যেন আমরা না ভুলি—তোমার দুটো জ্বালাময়ী চোখ যেন আমাদের চোখের সামনে দিনরাতই ভাসে।"

মঞ্জুদি হাস্‌লেন, বল্‌লেন, "আমার অন্তরের সেই তো একমাত্র আশীর্ব্বাদ রে!"

দু'জনে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল।

বিছানার ওপরে মল্লিকা আরো একটু প্রসারিত হ'ল—মঞ্জুদি হাসলেন, বল্‌লেন, "কিরে, আজকে বাড়ী যাওয়ার গুরুতর ভাবনাটাকে একেবারে কোথাও ফেলে দিয়ে এসেছিস নাকি?"

মল্লিকা উপুড় হ'য়ে শুলো, বল্‌লে "আজ যদি আমাকে এই বিছানাটা ছেড়ে উঠতে না হোত—"

"কি হোত তা' হ'লে?" মঞ্জুদি বল্‌লেন।

"তা' হলে?—নাঃ, সে শুনে কাজ নেই।" একটু থেমে তারপরে অনুনয়ের ভঙ্গীতে মল্লিকা বললে, "সত্যি মঞ্জুদি, তোমার পায়ে একটু স্থান দাও না—আর ভালো লাগে না, বাড়ী-বাড়ী ক'রে তোমার কাছ থেকে কথা শোনার হাত থেকে অন্ততঃ রেহাই পাই!"

"কেন, এতো সহজেই বৈরাগ্য?"

মল্লিকা হাসলো একটু, বললে, "যা' মনে করেছো, তাই যদি হোত, তা'হলে তোমার এই 'কুমারীকল্যাণে' গলা ফাটিয়ে চীৎকার করবার জন্যে আসতাম ভেবেছো?" তুমি বড়ো বেশী সাবধানী মঞ্জুদি—তবে শেষ পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত থাকতে পারো—সম্পূর্ণ অভয় দিচ্ছি।"

মঞ্জুদি হাস্‌লেন, বললেন, "হিতাকাঙ্ক্ষিনী কি না, অমংগলের কথাই সব থেকে আগে মনে আসে।"

"তা' বটে—কোনো ইসারা, কোনো ইংগিত পেয়েছো নাকি আভাসে?—দেখো, আমাকে তা'হলে জেরা ক'রে বিপদে ফেল না মঞ্জুদি—সোজাভাবেই বরং আক্রমণ করো—রাজী আছি।"

মঞ্জুদি হাস্‌লেন, বললেন, "আক্রমণ আর কি—নলিনীকান্তর সংগে কোনোদিন দেখা হয় না?"

"কেন? প্রায়ই হয় তো!"

"বেচারী বড়ো বেশী আশান্বিত কিন্তু তোর সম্বন্ধে।"

"অনেকটা আন্দাজ আগেই ক'রেছিলাম—সংপ্রতি দ্বিতীয়া স্ত্রী-বিয়োগের পর একটু বেশী রকম আমার সংগে সৌহার্দ্যস্থাপনের প্রয়াসী লক্ষ্য করছি।"

মঞ্জুদি হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন, বললেন, "তা'হলে লক্ষ্য রাখছিস্ বল?"

"বিলক্ষণ—"

"আমার কিন্তু ভারী ভালো লাগে লোকটাকে, দেখলে এতো দয়া হয়—এতোই নিদারুণ চেহারা বেচারীর" মঞ্জুদি মল্লিকার মুখের দিকে চাইলেন।

মল্লিকা হাস্‌লো, "তা সত্যি, দয়া করবার মতো চেহারাই বটে।"

এক মিনিট মঞ্জুদি চুপ ক'রে রইলেন, তারপরে বল্‌লেন, "কোনো লিপিকা, কোনো প্রেমপত্র-টত্র পাস্‌নি এখনো?"

"না—বোধহয় সাহস পাচ্ছে না—তবে দু-এক দিনের মধ্যে আস্‌বার আশঙ্কা করছি অবশ্য" একটু থেমে মল্লিকা বল্‌লে, "সেদিন গলির মোড়েই দেখা হ'য়েছিলো, হেসে নমস্কার করলে, বল্‌লে খুব বড়ো নাকি একটা বিপদে প'ড়েছে—শীগ্‌গীর আমার কাছে পরামর্শের জন্যে আসবে।

"বটে—"

"হ্যাঁ, তবে আসেনি এখনো—"

"সাবধান থাকিস্—" মঞ্জুদি অনুজ্জ্বল হাস্‌লেন, "বিপদে পড়েছে এখন, কিছুই বলা যায় না তো!"

মল্লিকাও হাস্‌লো, বল্‌লে "যা' বলেছো"।

অনেকটা বেলা হ'য়েছে—জান্‌লা দিয়ে খানিকটা রোদ্দুর মেঝের ওপরে ছড়িয়ে প'ড়েছে—মল্লিকা উঠে বস্‌লো, বল্‌লে, "সত্যি, আমার কথায় তো আর কাণই দিলে না, তোমার পাশেই একটা ঘর খালি পাওয়া যায় না? ওখানে আর ভাল লাগছে না—একটু চেষ্টা করলেই হ'বে কিন্তু।"

"আবার এই টানাটানি হাঙ্গাম ক'রে আস্‌বি এখানে?—ঘর-সংসার ছেড়ে"।

"ওঃ—ভারীতো আমার ঘর-সংসার—তার আবার টানাটানি" মল্লিকা একটা অভিনব ভংগী করলে, "যেন পনেরো গণ্ডা ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি আকুল হ'য়ে মাঠে ঘাটে ভেসে বেড়াচ্ছি—ঘর সংসার!—ঘর-সংসারটা আবার দেখলে কোথায় তুমি?

মঞ্জুদি হাস্‌লেন একটু, বল্‌লেন, "আচ্ছা—দেখবো, তোর একান্তই যখন ইচ্ছে! কিন্তু শোন্, আমি আর

একটা জিনিষ ঠিক করেছি মনে মনে- সেটা হ'চ্ছে তোর বাড়ী যাওয়া বন্ধ—আমি আজ অনেক বেশী ভাত রেঁধে ফেলেছি।"

"সে আমি অনেক আগেই বুঝেছি—কিন্তু বাড়ীতে তো কিছু ব'লে আসিনি—বাড়ীর খাবারটাও তুমি চাও যে নষ্ট হোক্—"

"যদি বলি, হাঁ, তাই-ই চাই ?"

"বেশ, তা'হ'লে তাই হোক" ব'লে মল্লিকা হাস্‌লো একটু!

আট

অল্প অল্প শীত প'ড়েছিলো। শেষ রাত্রির দিকে অন্ততঃ একটা চাদর না গায়ে দিলে কষ্টই হয়, এ-কথা বলা যেতে পারে। তবু গার্গী ঘেমে উঠলো। সমস্ত দেহে তার তখন ভয়ের একটা রোমাঞ্চিত শিহরণ প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে। গার্গী ছু' চোখ ভাল করে রগড়ে নিলো, নাঃ—সে ভালো ক'রেই চেয়ে দেখলে, মোটেই সে ভুল দেখছে না!

মা এসেছেন! মার শরীর বেয়ে সেই সুন্দর জ্যোতির্ম্ময়তা যেন ঝ'রে ঝ'রে পড়ছে। মার চোখ ছুটি যেন নিদারুণ ছুঃখে ম্লান হ'য়ে এসেছে। মা আস্তে আস্তে গার্গীর কাছে এগিয়ে এলেন।

গার্গী উঠে বস্‌লো—মাকে প্রণাম করবার জন্যে তারপরে মাটীর ওপরে নত হ'ল। কিন্তু গার্গী বেশ স্পষ্ট লক্ষ্য করলে, মা পা ছুটি তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিলেন, শুধু বল্‌লেন, "বোস্ খুকী, অনেক কথা আছে তোর সঙ্গে খুকী।—গার্গীর কাণে যেন কোন্ দূর-দুরান্তর থেকে ডাক্‌টা ভেসে এলো, কখনো কখনো মা তাকে এই ব'লে ডাকতেন—সেই স্বর—সেই অপূর্ব্ব ভংগী! গার্গী তাড়াতাড়ি খাটের এক পাশে বস্‌লো, ইচ্ছে হোল মাকে সে বলে, "তুমিও বস মা" ; কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না—গার্গীর সমস্ত দেহে যেন একটা অশরীরী ভয় ছড়িয়ে পড়েছে।

"আমাকে তুই ভুলে' গেছিস্, গার্গি"—মা সোজা হ'য়ে দাঁড়ালেন—বহুদিন তুই আমাকে মনে করিস্ না, ভেবে দেখ—অথচ আমি ছটফট্ করছি সব সময়ে, কখন তুই আমাকে ডাক্‌বি—কখন তুই আমার কাছে আস্‌বি—"

গার্গী মাথা নীচু ক'রে রইলো, সমস্ত দেহ তার ভ'য়ে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে।

মা এগিয়ে এলেন, গার্গীর পাশে এসে আস্তে আস্তে বস্‌লেন, "আমার কাছে তোর লজ্জা কি খুকী, কি হয়েছে বল, কেন তুই এ রকম হলি ?" গার্গী কি যে উত্তর দেবে ভেবে পেলো না, শুধু মাথা নীচু ক'রে রইলো,—বুকটা তার তখনও ঢিপ ঢিপ করছে! "আমি জানি, তুই মরেছিস্"—মা আবার আস্তে আস্তে বল্‌তে আরম্ভ করলেন, "সেই হতভাগাটা তোর সমস্ত কিছুকে ভেঙ্গে দিয়েছে—নইলে—নইলে তুই আমাকে ভু'লে যাস্ ?"

"কে ?—কে মা সে ?" গার্গী হঠাৎ যেন কান্নার স্বরে ব'সে পড়লো—"আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না"।

"হাঁ, আজ তো বুঝতেই পারবি না মোটে, আজ তো তুই আমাকেই বুঝতে পারছিস না—চিন্‌তে পারছিস্ না।" মা একটু ক্রূর হাস্‌লেন।

"কি যে বল্‌ছো তুমি' গার্গী এগিয়ে এলো, "তোমাকে এখনো আমার প্রণাম করা হয় নি মা—"

"থাক—দরকার নেই! আমি যা বল্‌ছি, তার উত্তর দে আগে, আমাকে পরিষ্কার ক'রে বল, তোর চোখে আজ বিছ্যুৎ বড়ো, না আমার—সেই আমার, যে তোকে তিলে তিলে রক্ত দিয়ে গ'ড়েছিলো গার্গি—সেই মা যে তোকে সৃষ্টি করবার অসহ্য যন্ত্রণায় তিলে তিলে মৃত্যুবন্ধুর পথের ওপর দিয়ে হেঁটেছিলো—সেই মা—সেই মা বড়ো ?"

"উঃ—মাগো!"—

ঠিক্ এই সময়েই হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিলো। গার্গীর সমস্ত দেহ ততক্ষণে ঘামে ভিজে উঠেছে—জান্‌লাটা খোলা—আকাশের গায়ে তারাগুলো ঝিক্‌মিক্ করছে—বিরাট্ কালপুরুষের দেহটাকে জান্‌লার ভেতর দিয়ে পরিষ্কার দেখা যায়—চাঁদটা ঢ'লে পড়েছে পশ্চিম আকাশে,—তারই ম্লান, পাণ্ডুর আলো এসে ঘরের মধ্যে প'ড়েছে খানিকটা!

গার্গী উঠে বস্‌লো—বুকটা তার তখনো ঢিপ্ ঢিপ

রছে—আশ্চর্য্য, অদ্ভুত ভাবে সে মাকে দেখ্‌লো আজ। অবচেতন মন! আস্তে আস্তে গার্গী কথা বল্‌লে; তারপরে চুপ ক'রে' জান্‌লার দিকে চেয়ে ব'সে রইলো। যখন সে মাকে হয়তো এই ভাবেই ভেবেছিলো—ঠিক এই রুদ্রমূর্ত্তিতে—তারই প্রতিক্রিয়া হ'য়ে গেলো একটু আগে। কখন যে ভেবেছিলো, আজ আর তা' মনে পড়ে না। অবচেতন মনের প্রতিক্রিয়াই—গার্গী আবার কথাটাকে আস্তে আস্তে উচ্চারণ করলো।

অবশিষ্ট রাত্রিটা তার জান্‌লার ধারেই শেষ হোল। আর ঘুম আস্‌ছে না। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসটা বেশ লাগ্‌ছে—গার্গী জান্‌লার শিকের ওপরে মাথাটা এগিয়ে দিলে।

আশ্চর্য্য, তবু তন্দ্রার মধ্যে গার্গী খানিকটা ডুবে গেলো—মনে হ'ল: বিদ্যুৎই এসেছে—তার বিদ্যুৎ! জান্‌লার ধারে এসে সে বস্‌লো। বল্‌লে, "গার্গি, আমার জন্যেই তোমার এতো দুঃখ?"

গার্গী বড়ো বড়ো ক'রে তার দিকে চাইলে—কথার উত্তর দিতে পারলে না।

বিদ্যুৎ আস্তে আস্তে গার্গীর মাথাটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলে, বল্‌লে, "আমি সত্যিই দুঃখিত গার্গি, তোমার ওপরে যে অন্যায় ক'রেছি তার শেষ নেই, তোমার কাছে ক্ষমা চাওয়ারো অধিকার আজ আমার কোথায়?"

গার্গী তবু কথা বল্‌তে পারলো না। বিদ্যুৎ ধীরে ধীরে কথা কইলে, "ভেবেছিলাম তোমাকে অনায়াসে এড়িয়ে যাবো—এড়িয়ে যাবো আমার সাধনার গভীরে—জ্ঞানের নির্জ্জনতায়—সেখানে তুমি নেই—কেউ নেই—শুধু আমি,—আমি আর আমার লেখা, আমরা দু'জনে সেখানে সযত্নে লালিত হ'য়ে পুষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ছি! "কিন্তু"—বিদ্যুৎ একটু থেমে বল্‌লে "কিন্তু পারলাম কই?—লেখার মধ্যেই ভালো ক'রে চেয়ে দেখি: তোমার এই দুটী চোখ জেগে র'য়েছে—এই দুটী নীল আর অদ্ভুত সুন্দর চোখ গার্গি" বলে বিদ্যুৎ তার চোখের ওপরে ঈষৎ ঝুঁকে পড়লো।

সামান্য একটু শব্দ!—কিন্তু তাই যথেষ্ট, গার্গী সোজা হ'য়ে উঠে বস্‌লো। বাইরে, দরজায় দিদিমা এসেছেন, বললেন, "গার্গি, ওঠ—বেলা হোল যে—"

"উঠেছি দিদা—"

"কে একজন এসেছে, তোর সংগে দেখা করতে—"

"কে? —নাম কি তাঁর?" গার্গী দরজাটা খুলে দিলে।

"তা' জানি না বাপু—ভদ্রলোক একজন!"

"ও, আচ্ছা বস্‌তে বলো—যাচ্ছি" গার্গী শাড়ীর আঁচলটাকে গুছিয়ে নিলে।

দিদিমা নেমে গেলেন।

নীচে এসে গার্গী একটু আশ্চর্য্য হোল, নলিনীকান্ত এসেছেন। গার্গী দু'হাত তুলে নমস্কার করলে, বল্‌লে, "একি? —আপনি যে মাষ্টারমশাই?"

নলিনীকান্ত সামান্য হাস্‌লেন, বল্‌লেন, "বড়ো বিপদে প'ড়েছি গার্গি—তোমার কাছে না এসে আমার আর উপায় ছিলো না।"

"তাই নাকি?—কি ব্যাপার?"

"আর বোলো না—তোমরা যে একটা সঙ্ঘ গড়েছো, তার সম্পাদিকা—ঐ যে মল্লিকা দেবী—"

"হ্যাঁ—" গার্গী রুদ্ধশ্বাসে সমস্ত কথা শুনে চ'লেছে। "ঐ মল্লিকা দেবীর সংগে আমার একবার দেখা করতে হ'বে—ভদ্রমহিলা বড়োই কষ্ট দিচ্ছেন আমাকে—"

"তার মানে?" গার্গী বিস্ময়ে দু'লে উঠ্‌লো, "কি হ'য়েছে বলুন তো?"

"আর বোলো না—একটা দামী ম্যানুস্ক্রিপ্‌ট্‌ ওঁর কাছে র'য়েছে আজ প্রায় এক বছর—আজ দেবেন, কাল দেবেন ক'রে আর ফেরৎই দিচ্ছেন না—আগে আগে চাইলেই বল্‌তেন: আর দু'দিন যাক্‌—এখন মাস দুয়েক তাঁর কোনো ঠিকানাই পাচ্ছি না—কোথায় যে উঠে গেছেন কে জানে—" এক নিঃশ্বাসে এতোগুলো কথা বলে নলিনীকান্ত একটু হাঁপাতে লাগ্‌লেন, "শেষে শুন্‌লুম তোমার কাছে ঠিকানা পাওয়া যেতে পারে।"

"ও, এই ব্যাপার?" গার্গী কথা কইলে।

"হ্যাঁ, আমার এখন পাণ্ডুলিপিটার যে কি ভীষণ দরকার!"

"বেশ, আমি ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি—দশটার মধ্যেই যাবেন।"

"আচ্ছা—আচ্ছা, বেশ, তুমি বাঁচালে গার্গি! আমার যে কী উপকার করলে তুমি"—নলিনীকান্ত খুসীতে টলমল্ ক'রে উঠ্লেন, একটা নতুন নাটক লিখেছি গার্গী, যদি যাও, তাহ'লে তোমাকে খানিকটা শুনিয়ে দিই—ওঃ এটা স্প্লেন্‌ডিড্ হ'য়েছে—মানুষের জীবনকে আমি যে কি বিচিত্রভাবে রূপ দিয়েছি—তা দেখে তুমি আশ্চর্য্য হ'য়ে যাবে—যেও, সত্যি আনন্দ পাবে তুমি!"

গার্গী এবার সত্যিই আশ্চর্য্য হোল, বল্লে "সত্যি? —আবার একটা লিখেছেন নাকি এর মধ্যে? —আশ্চর্য্য, কি ক'রে যে লেখেন এতো!"

নলিনীকান্ত সামান্ত একটু হাস্‌লেন, বল্লেন, "বেগ যখন আসে, তখন আর তাকে রোধ করা যায় না গার্গি; অনেকদিন থেকেই এই রকম একটা নাটকের অভাব বোধ করছিলাম—বহু চিন্তা ক'রে স্থির করলাম, আমি নিজেই চেষ্টা করবো—অবশ্য এ-রকম ড্রামা এদেশে কোথাও একটা সাক্‌সেস্‌ফুল হয়নি" একটু থেমে, কেশে নিলেন, "রঙ্‌মহলে ওঁরা নিতে রাজী হ'য়েছেন।"

"বলেন কি?" গার্গী এক রকম উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌লো "এতো ভীষণ সুখবর—যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত একটা পাস্‌টাস্ দয়া ক'রে দেবেন মাষ্টারমশাই—"

নলিনীকান্ত মাথা নাড়লেন—সে কি কথা?—"দয়া-টয়া আমার কি? তুমি তো যাবেই—সকলে যাবে, তোমার বন্ধু ওই মল্লিকা দেবীকেও নিয়ে যাবে—বাঃ, কি যে বলো তোমরা!" নলিনীকান্ত আবার হাস্‌লেন, "তার আগে—এই ম্যানুস্ক্রিপ্‌ট অবস্থায় তোমাকে একবার শুনিয়ে দেবো—দেখ্‌বে, সত্যি কি মার্‌ভেলাস্ হ'য়েছে—সত্যি, কি সব অদ্ভুত ব্যঞ্জনা আছে এর মধ্যে!"

গার্গী মাথা নাড়লো, বল্লে, বেশ, তা'হলে এর মধ্যে আপনার ওখানে একদিন যাবো মাষ্টারমশাই, খুব বিরক্ত ক'রে আস্‌বো—"

"নাঃ—তোমরা সব কি যে বলো—নিশ্চয়ই যাবে—নিশ্চয়ই যাবে—হ্যাঁ, বার্ণাড্‌শ' যখন 'ম্যান এ্যাণ্ড সুপারম্যান' লেখেন, তখন কি বলেছিলেন জানো,—বলেছিলেন; 'এটা আমার চিন্তার একটী শ্রেষ্ঠ দান হ'য়ে পৃথিবীর সাহিত্যে'—দেখো কী বিরাট্ আত্ম-বিশ্বাস নিজের ওপরে, কী অসীম শ্রদ্ধা! তবেই না আজ এতো বড়ো হ'তে পেরেছেন—একটা ইন্‌টার-ন্যাশ্‌ন্যাল ফিগার—একটা গ্রেট জিনিয়াস্—একটা—একটা—" খুব বেশী উত্তেজিত হ'লে নলিনীকান্ত একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন।

অতি কষ্টে গার্গী হাসি চাপ্‌লে, বল্লে, "সত্যি, ঠিকই বলেছেন মাষ্টারমশাই—।"

নলিনীকান্ত উঠে দাঁড়ালেন, "তা'হলে তোমাদের সেই মল্লিকা দেবীর ঠিকানাটা দাও—আর পারি না—ভদ্রমহিলা, মহিলা আমায়—"

গার্গী একটা ছোটো কাগজে ঠিকানাটা লিখে দিলে, বল্লে "তা'হলে আর দেরী করবেন না,—তাড়াতাড়ি চ'লে যান—"

নলিনীকান্ত কাগজটা নিয়ে বাইরের দিকে পা বাড়ালেন, "আচ্ছা, চলি গার্গি—তুমি এসো কিন্তু,—এই দু'একদিনের মধ্যেই, কি বলো?"

গার্গী মাথা নেড়ে বল্লে, "ঠিক যাবো মাষ্টারমশাই।"

নলিনীকান্ত আস্তে আস্তে পথের ওপরে নেমে গেলেন।

গার্গী জান্‌লার কাছ থেকে স'রে এলো—বড়ো ভালো লোক নলিনীকান্তবাবু—হঠাৎ মাঝে মাঝে এক একটা খেয়াল চাপে ওঁর—কিছুদিন আগে—বেশ কিছুদিন আগে উনি চিত্রকর হ'বার জন্মে সাধনা আরম্ভ ক'রেছিলেন। মাইকেল এঞ্জেলোর মতো তিনি চিত্র সৃষ্টি করতে পারবেন, এ রকম ধারণাও ছিলো; কিন্তু সংপ্রতি তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীবিয়োগ হওয়ার পর অত্যন্ত ভেঙে প'ড়েছেন, এবার ইচ্ছে হ'য়েছে তিনি নাট্যকার হ'বেন—বাঙ্‌লা দেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যকার—বার্ণাড্‌শ'র সংগে তাঁর প্রতিভার অনেক মিল আছে। বার্ণাড্‌শও নাকি মাইকেল এঞ্জেলোর মতো বড়ো চিত্রকর হ'তে চেয়েছিলেন প্রথমে। গার্গীর হাসি পেল।

(ক্রমশঃ)

পেট্রলের অভিযান

শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

ভূগর্ভ থেকে তৈল উত্তোলন প্রণালী

আধুনিক সভ্যতার যুগে বিদ্যুৎ, কয়লা আর তেল যানবাহনের গতি বৃদ্ধি করেছে। পদব্রজে, অশ্বপৃষ্ঠে, গোযানে বা অশ্বযানে যাতায়াত প্রাচীনকালে প্রশস্ত ছিল। ক্রমশঃ বিজ্ঞানের নব নব উদ্ভাবনীর সঙ্গে যান-বাহনের রূপ বদলাল। তাদের গতি বৃদ্ধি পেল। স্থলে লোহার পথে বাষ্পীয় ও বৈদ্যুতিক রথ, পেট্রল-চালিত বিমান বিস্ময়ের সঞ্চার করল। স্থল, জল ও আকাশ সর্বত্রই শকটের গতি ও চালনার অন্যতম উপাদান হল পেট্রল। আজকাল সংগ্রাম-সংকটিত সংসারে, পেট্রল-ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয়েছে—যুদ্ধে নিযুক্ত বিমানপোতে ও বারিপোতে পেট্রল সংকুলান করবার জন্যে। পেট্রল, আমাদের গৃহে নিত্য ব্যবহৃত কেরোসিনের মতই খনিজ তেল। ভূগর্ভের গভীরতম প্রদেশ হতে তেল উত্তোলন করে' বিবিধ রাসায়নিক উপায়ে চোলাই ও শোধন করে' পেট্রল, কেরোসিন প্রভৃতি বিভিন্ন তেল, ভ্যাসিলিন; মোম প্রভৃতি নিত্যব্যবহৃত জিনিস পাওয়া যায়। আমেরিকা ও রাশিয়া থেকে সব চেয়ে বেশী পরিমাণ খনিজ তেল সরবরাহ হয়। তেলকূপ নির্গত দাহ্য গ্যাস-প্রজ্জলিত অগ্নি জরথুষ্ট্রীয় মন্দিরের অনির্ব্বাপিত অগ্নি বলে' কথিত হয়েছে। রাশিয়ার বাকু প্রদেশে প্রজ্জলিত পবিত্র অগ্নিও খনিজ তেল ও গ্যাস সমিধে পুষ্ট হয়ে আবহমান কাল ধরে' জ্বলতে থাকত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত দেশভ্রমণকারী মার্কোপোলো এরূপ তেল-উৎসারী কূপের কথা বলেছেন। দ্বিতীয় জর্জের রাজত্বকালে যোনাস হানওয়ে নামে একজন বণিক্ কাস্পিয়ান সমুদ্রে বাণিজ্য করতে যান। তিনি ফিরে এসে ১৭৫৪ সালে এক বই

প্রকাশ করেন। তাতে দীর্ঘ শতাব্দীকাল ধরে ভারতবর্ষ ও পারস্য থেকে অগ্ন্যুপাসকেরা "অনির্ব্বাপিত অগ্নি" তীর্থ করতে যেতেন বলে উল্লেখ করেছেন। ১৮২০ সালে বাকুর খনিজ তৈল কূপ থেকে তৈল উত্তোলন করা আরম্ভ হয়েছে। আমেরিকার পেনসিলভেনিয়ায় সর্ব প্রথম ১৮৫৯ সালে তৈলকূপ খনন করা হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যখন বাকু প্রদেশ পারস্য দেশ থেকে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হল, তখন থেকে খনিজ তেলের ব্যবসা সূত্রপাত হল। রাশিয়ায় ব্যবসার প্রসার অত্যন্ত মন্দগতিতে চলল, ইতিমধ্যে আমেরিকার খনিজ তেল সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল। স্বনামধন্য ডিনামাইট-প্রচারক আলফ্রেড নোবলের দুই ভাই রবার্ট ও লুডভিগ নোবলের প্রচেষ্টায় বাকুর তৈল-ব্যবসায়ের প্রসার হতে লাগল। তাঁদের সময়ে বড় বড় পিপায় করে সদ্য উত্তোলিত তেল শোধনের জন্যে শোধনাগারে (Refinery) নিয়ে যাওয়া হত। রবার্ট আর লুগাভিগ পরবর্ত্তী কালে, তেল-সরবরাহের সহজ পন্থার ব্যবস্থা করেন। আধুনিক উপায়ে পাইপ বা নল চালিত হয়ে তৈলখনি থেকে সোজাসুজি দূরে স্থাপিত শোধনাগারে আনবার ব্যবস্থা হল। তা'ছাড়া তেল জমা রাখবার উপযুক্ত ট্যাঙ্ক ইত্যাদির ব্যবস্থাও তাঁরা করলেন। তারপর

মৃত্তিকা ভেদকারী ড্রিলের মুখ। দাঁতগুলি এত শক্ত যে কঠিন পাথর অনায়াসে ভেদ করতে পারে। ঘর্ষণজনিত উত্তাপে দাঁতগুলির গলে যাবার সম্ভাবনা আছে; তাই ঠাণ্ডা রাখবার জন্যে মাঝখানের ফাঁপা নল দিয়ে কাদা-গোলা জল ঢালা হয়।

[আমার ছাত্র জেরার্ড ফক অঙ্কিত]

থেকে রাশিয়ায় পেট্রল শিল্পের যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ হল কার্পেথিয়ান পার্ব্বত্য দেশের পর উত্তর দেশ গ্যালিশিয়ায়, রুমানিয়ায় ও হাঙ্গারীতে তৈলের খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। গত ১৮৮১ সাল থেকে আধুনিক উপায়ে ঐ সব খনি থেকে তৈল উত্তোলন করা হচ্ছে। আজ পর্য্যন্ত রুমানিয়ার খনি থেকে আশী লক্ষ টন (১ টন=২৭০ গ্যালন) তৈল তোলা হয়েছে।

কালচক্রের অবিশ্রাম পরিবর্ত্তনে, ভূগর্ভে প্রোথিত মাছ ও অপরাপর জীবজন্তু, উদ্ভিদ্ প্রভৃতির রাসায়নিক রূপান্তরে তেলের উদ্ভব হয়েছে বলে' বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন। ভূগর্ভে সুগভীর নলকূপ খনন করে' তেল তোলা হয়। কিন্তু কি করে' জানা যাবে যে, ঠিক কোন জায়গায় নলকূপ নামাতে হবে। পৃথিবীর উপরিভাগে জমাতে তেলের সন্ধান পাবার মত এমন কি নিদর্শন আছে? আগেকার দিনে, মাটির অল্প একটু নীচে হঠাৎ খনন করে' তেলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। শোনা যায় ১৮২৯ সালে, বার্কসভিলে কেন্টকী বলে' একজন সমুদ্রের জল থেকে নুন তৈরী করবার জন্যে খানিকটা জমীতে গর্ত্ত খুঁড়েছিল; ভাগ্যক্রমে সেই সব গর্ত্ত থেকে তেল বেরিয়ে আসে আর তাতে কেমন করে যেন আগুন লেগে যায়। গর্ত্ত থেকে এত বেগে তেল নির্গত হতে থাকে যে, জলন্ত তেল বেশ কয়েক ক্রোশ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হতে থাকে। এখনকার দিনে আর হঠাৎ খুঁজে তেলের খনি আবিষ্কার করা অত সহজ নয়। বৈজ্ঞানিকেরা ভূগর্ভস্থ তেলের খনির সন্ধান পাওয়ার জন্যে নব নব প্রণালী উদ্ভাবন করেছেন। তার দ্বারা তেলের খনি সঠিক আছে কিনা নির্ণয় না হলেও, থাকার সম্ভাবনা অন্ততঃ আন্দাজ করা যায়। ভূকম্পন নির্দ্ধারণ করার যন্ত্রের নাম ভূকম্পনীমান (Seismograph). মাটিতে গর্ত্ত করে', ডিনামাইট বিস্ফোরিত করলে যে ভূকম্পনের সৃষ্টি হয়, উক্ত যন্ত্রে তার কম্পনপ্রণালী মাপা হয়। তার থেকে কুশলী বৈজ্ঞানিক কত দূরে ভূগর্ভের কোন স্তরে তৈল থাকার সম্ভাবনা, তা' অনুমান করতে পারেন। অবশ্য এই বিশেষ নির্দ্ধারণপদ্ধতি সাধারণ-গ্রাহ্য নয়। তৈল-ভাণ্ডারানুসন্ধানী আর এক প্রণালী

এ ভূগর্ভে গভীর ড্রিল নামিয়ে দেওয়া। ড্রিলটি যতই নীচে নামান হ'ল, ততই তার গায়ে বিভিন্ন রকমের মাটি ইত্যাদি লাগল। সেই বিভিন্ন জাতীয় মাটি, পঙ্ক ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে', ভূতত্ত্ববিদেরা কোনখানে তৈল পাওয়া যাবে, তা' ধারণা করতে পারেন। এই রকম বিবিধ অনুসন্ধানের ফলে, প্রত্যেক বছরে বিশ-পঁচিশ হাজার তৈলকূপ-খনন আর তৈলোত্তোলন ব্যবস্থা করা হয়।

যাঁদের নলকূপ খননের ধারণা আছে, তাঁরা সহজে বুঝতে পারবেন— ভূগর্ভে কি করে' পাইপ বা নল নামান হয়। ফাঁপা নলকে ড্রিল দিয়ে খুঁড়ে খনন করতে করতে নামিয়ে দেওয়া হয়। সুগভীর কূপগুলিতে ফাঁপা নলের দৈর্ঘ্য প্রায় দু'মাইল পর্য্যন্ত হয়। এ রকম খনন-কাজে বিপদও আছে। ভূগর্ভের গভীরপ্রদেশস্থ তেল ও গ্যাস নির্গমপথ পাওয়াতে সজোরে ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চায়, তাতে অনেক সময়ে প্রোথিত ফাঁপা নল বিক্ষিপ্ত হয়। এমনি এক ঘটনা ১৯০৮ সালে মেক্সিকোতে হয়েছিল। মাটির ভেতরে তেলের ও গ্যাসের চাপ এত বেশী ছিল যে, ১৮০০ ফুট পর্য্যন্ত ফাঁপা নলটি নামতে না নামতেই প্রবল ভূমিকম্পের সৃষ্টি হ'ল, আর তার পাশের মাটি ফেটে তেল ও গ্যাস বেরিয়ে এল। সে ফাটলের গভীরতাও কম নয়, ২৫০ ফুট। শুধু তাই নয়। জানেনই ত কেরোসিন, পেট্রল তেল সব কি রকম দাহ্য পদার্থ! দুর্ভাগ্যক্রমে ফাটলের নির্গত তেলে আগুন লেগে যাওয়াতে, লেলিহমান অগ্নিশিখা প্রায় সিকি মাইল উঁচু হয়ে দু'মাস ধরে' সমানে জ্বলেছিল। আর সে শিখার আলোর তেজ কি! গভীর রাত্রে চার মাইল দূরের গ্রামে লোকেরা সে আলোতে বই পড়তে পেরেছিল। শুধু ত তেল নয়, তার সাথে দু'লক্ষ টন (১ টন = ২৭ মণ) দলা-দলা মাটি শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল।

আবার অনেক সময়ে, মাটির সঙ্গে ড্রিলের কঠিন ইস্পাতের ঘর্ষণে, এত উত্তাপ জন্মায় যে, ইস্পাত গলে' যায়। সেই জন্যে যাতে ড্রিল ঘর্ষণের ফলে উত্তপ্ত না হয়ে ওঠে, তার ব্যবস্থা করতে হয়। কাদাগোলা জল পাম্প করে' নল দিয়ে চালান হয়, আর তাতে ড্রিলটা সব সময়ে ভিজে থাকে বলে' সহজে অত গরম হয়ে উঠতে পারে না।

নল নামান হলেও, হয়ত তেলের সন্ধান পাওয়া গেল না। তাতেও কুশলী বৈজ্ঞানিক হতাশ হন না। নলের ভিতরে সাংঘাতিক বিস্ফোরক নাইট্রোগ্লিসারিন তেল সাবধানে ঢেলে দেওয়া হয়। অনেক সময়ে তলার দিকে গড়িয়ে যেতে যেতেই নাইট্রোগ্লিসারিন আপনাআপনি বিস্ফোরিত হয়, ভূগর্ভের সুগভীর প্রদেশে ফাটলের সৃষ্টি করে, আর সেই ফাটলের সান্নিহিত তৈলাধার

খনিজ তৈল চোলাই পদ্ধতি

থাকলে তার থেকে তেল নল পথে উপরে উঠে আসে। নল নামাবার কাজেতেও সাবধান হতে হয়। নল ঠিক সোজা হয়ে না নামলে মুস্কিল। খানিক দূর নামার পর নল বাঁকা দিকে গেলে, ড্রিল করার খুব অসুবিধা। ড্রিলের কক্ষ পথ সঠিক নির্দ্ধারণ করবার জন্যে দিঙ্-নির্ণয়-যন্ত্র ও ফটো তোলা ক্যামেরার সাহায্য নেওয়া হয়। এ সত্বেও মাঝে মাঝে যে দিক্‌ভ্রম হয় না, তা' নয়। পেট্রলোত্তোলনের এক ব্যঙ্গচিত্র আছে। ঐ রকম ড্রিল করবার সময়ে দিক্ ভুল হ'য়ে, ড্রিলটা যেন একটা মদের পিপা ছেঁদা করে' ফেলেছে আর তার থেকে সফেন মদ্য প্রবাহিত হচ্ছে। অন্যান্য শ্রমিকেরা কাজ ভুলে, বালতী নিয়ে ছুটেছে মদ ধরতে।

এক একটা তৈলকূপখননে পঞ্চাশ হাজার থেকে ছ'লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় হয়ে থাকে। ভূগর্ভ থেকে আহৃত তেলে মাটি, কাঁকর ইত্যাদি নানা জাতীয় আবর্জ্জনা থাকে। তার জন্যে সদ্য-উত্তোলিত তেল কাল ঘোলাটে গোছ দেখতে হয়। বাতিতে জ্বালাবার জন্যে এ তেলের ব্যবহারও তেমন ভাল ভাবে করা চলে না। তেলকে তাই চোলাই করে' শোধন করে' নিতে হয়। চোলাই করবার সময়ে পেট্রল কেরোসিন, মেটে তেল, ল্যুব্রিকেটিং তেল (Lubricating oil) ইত্যাদি পৃথক্‌ভূত হয়। ল্যুব্রিকেটিং তেলের অংশ থেকে মোম, ভেসিলিন ইত্যাদিও পৃথক্ করা যায়। শোধনাগারে আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে চোলাইয়ের ব্যবস্থা থাকে। তেলের খনি থেকে বেশ খানিক দূরে শোধনাগার স্থাপিত হয়। আজকাল নলের সাহায্যে তেল শোধনাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। আগে পিপায় ভর্ত্তি করে', গাড়ী করে' আনা হত। এই সব নলের দৈর্ঘ্যও কম নয়। প্যালাস্তাইনের অন্তর্ভুক্ত কিরুক তৈল খনি থেকে সিরিয়ায় যে নলে তেল বাহিত করা হয়, তার দৈর্ঘ্য ১১০০০ মাইল।

তেলের সঙ্গে উত্তপ্ত জলের বাষ্প মিশ্রিত করে' চোলাই করা হয়। এভাবে চোলাই করলে, খনিজ তেলের বিভিন্ন অংশ পৃথক হয়ে আসে। নিম্নে পৃথক্ অংশগুলির তালিকা দেওয়া হল :—

পেট্রল	শতকরা	৪২ ভাগ
কেরোসিন [মেটে তেল নিয়ে]	,,	৫ ভাগ
গ্যাস তেল	,,	৪০ ভাগ
ঘন তেল [Lubricating oil তার সাথে ভ্যাসিলিন, মোম ইত্যাদি]	,,	৩১/২ ভাগ

পূর্ব্বোক্ত গ্যাস তেল থেকে আজকাল রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে পেট্রল তৈরীর ব্যবস্থা হয়েছে। সারা পৃথিবীর পেট্রল খরচের পরিমাণের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পেট্রল গ্যাস তেল থেকে প্রস্তুত হচ্ছে।

খনিজ তেলের বিভিন্ন ব্যবহারের কথা শুনলে অবাক্ হতে হয়। প্রথমে ধরা যাক—কেরোসিনের কুপি, হ্যারিকেনের আলো, টেবিল-আলো, তারপর মোমবাতি। মুখে মাখবার স্নো, ক্রীম ইত্যাদির মেটে তেল হল অন্যতম উপাদান। ঠোঁটের সিঁদুরের চটপটে ভাবটি মেটে তেলের জন্যে হয়। ভ্যাসিলিন পমেড ত সবার চেনা মলম জাতীয় ওষুধের জন্যে ভ্যাসিলিন ব্যবহার করা হয়। আজকাল, খনিজ তেল থেকে এমোনিয়া তৈরি করা হচ্ছে। তা' থেকে জমীর সার তৈরী হয়। ফলের বাগানে, পোকা উচ্ছেদ করবার জন্যে খনিজ তেলে কীট নাশক বিষ মিশ্রিত করে' পিচকারীর সাহায্যে গাছকে ধারাস্নান করিয়ে দেওয়া হয়। মোটর, বিমান, রণপোত প্রভৃতি পেট্রল-চালিত যানের পুনরুক্তি অনাবশ্যক। গরম কাপড় চোপড় হলে না কেচে, পেট্রল দ্বারা পরিষ্কার করা হয়। পোকা-মাকড় মারার জন্যে ফ্লিট বা নিস্কীটেও খনিজ তেলে ওষুধ গোলা হয়। তেল থেকে কৃত্রিম রবার তৈরী প্রণালীও উদ্ভাবিত হয়েছে।

রাশিয়ার বাকু প্রদেশের তেলের খনির আদিম অবস্থার কথা গোর্কি বেশ বর্ণনা করেছেন :—"চারপাশের আব্‌হাওয়ায় কেমন যেন দম আটকে যাচ্ছিল। পথ চলতে কতকগুলো তৈলসিক্ত স্তম্ভ দেখতে পেলাম। আমার আশে-পাশে, শেওলা-ছাতা-পড়া গোছের তেলের ডোবা রয়েছে। রাস্তা, জমী সব স্যাঁত-স্যাঁতে, ভেজা-ভেজা।" তখনকার দিনে তৈলব্যবসায়ী আজকালকার ব্যবসায়ীদের মত অত বৈজ্ঞানিক উপায় ব্যবহার করতে শেখেননি। তেল উবে যাওয়ায় লোকসান হওয়ার ধার তাঁরা বড় ধারতেন না। তৈলকূপও অত গভীর প্রদেশ পর্য্যন্ত খনন করা হত না। এমনি সাধারণ জলকূপের মত অল্প হাত কুড়ি পঁচিশ খুঁড়ে, বালতী করে' জল তোলার মত তেল তোলা হ'ত। এখন অবশ্য এই ভাবে খনির তেলকে অকারণ নষ্ট হতে দেওয়া হয় না। আমাদের দেশে আসাম অঞ্চলে ডিগ্‌বয়ে আর পাঞ্জাবের আটক প্রদেশে তেলের খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। গত ১৯৩৮ সালে ডিগ্‌বয়ে ৬৬০ লক্ষ গ্যালন আর আটকে ২৭০ লক্ষ গ্যালন তেল উত্তোলন করা হয়েছে। ডিগ্‌বয়ের তেল মোমের পরিমাণ বেশী।

ব্রহ্মদেশের তৈলখনিও বেশ বড়। ইনানজঙ জেলা থেকে প্রচুর তেল তোলা হয়। বছরে প্রায় ৩০ কোটি গ্যালন তেল তোলা হয়ে থাকে। বহুকাল আগে থেকে

সে জেলার অধিবাসীরা রাশিয়ার বাকু প্রদেশবাসীর মত, স্বল্প গভীর কূপ খনন করে' বালতী ও দড়ির সাহায্যে তেল তুলত। এটা এক রকম তাদের জন্মগত পেশা হয়েছিল। ব্রহ্মদেশ বৃটিশাধিকৃত হবার পরও সরকার তৈল-ব্যবসায়ীদের জাতীয় পেশায় হস্তক্ষেপ করেন নি। সরকার থেকে তৈল খনি তাদের বিলি করে' দেওয়া হয়। পরে ঐ সব ব্যবসায়ীরা আধুনিক বর্মা অয়েল কোম্পানীকে সেই সব তৈলজ জমী বিলি বা বিক্রয় করে' দেয়। ইনানজঙ্গ থেকে রেঙ্গুন সহরের উপকণ্ঠে সিরিয়ামে স্থাপিত শোধনাগারে নল প্রবাহিত সদ্য উত্তোলিত তৈল শোধন করা হয়। ব্রহ্মদেশের তেলেও মোমের পরিমাণ খুব বেশী।

বোর্ণিওর কোয়েটাই জেলাতে পেট্রলের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। আজকাল সমরপোতে, বিমানে, মোটর গাড়ীতে পেট্রল ব্যবহার হওয়াতে, সারা জগতে পেট্রলের চাহিদা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। নানা জায়গায় তৈলখনির অনুসন্ধানে বৈজ্ঞানিকেরা প্রবৃত্ত হয়েছেন। দক্ষিণ আমেরিকায়, ইরাক ও ইরাণে সুবৃহৎ তৈল খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। গত ১৯৩৪ সালে বিভিন্ন দেশে উৎপন্ন তেলের পরিমাণ দেওয়া গেল। (১ টন = ২৭০ গ্যালন)

আমেরিকা	১৩০,০০০,০০০	টন
রাশিয়া	২৬,০০০,০০০	,,
ভেনিজুয়েলা	১৯,৪০০,০০০	,,
রুমেনিয়া	৮,৩০০,০০০	,,
পারস্য (ইরান)	৭,৮০০,০০০	,,
প্রাচ্য ওলন্দাজ উপনিবেশ	৬,০০০,০০০	,,
মেক্সিকো	৫,০০০,০০০	,,
কলাম্বিয়া	২,৩৫০,০০০	,,
আর্জেন্টাইন	২,০০০,০০০	,,
পেরু	২,০০০,০০০	,,
ট্রিনিডাড	১,১৫০,০০০	,,
ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ	১,২৫০,০০০	,,

তালিকাটি থেকে আমেরিকাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ তেল সরবরাহ করে, তা' খুবই ভাল বোঝা যায়। ভারতবর্ষে ও ব্রহ্মদেশে তেল পাওয়া গেলেও, তার পরিমাণ সব চেয়ে কম। বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত পেট্রলের পরিমাণ পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায়, আমেরিকাতেই সব চেয়ে বেশী পেট্রল ব্যয় করা হয়।

আমেরিকা	১২৪,০০০,০০০	টন
রাশিয়া	১৭,৩০০,০০০	,,
ইংলণ্ড	১০,৪০০,০০০	,,
ফ্রান্স	৫,২০০,০০০	,,
কানাডা	৪,৮০০,০০০	,,
জার্মানী	৩,৯০০,০০০	,,
ভারতবর্ষ	৫৭০,০০০	,,

আজকাল যুদ্ধ-সম্পৃক্ত সময়ে পেট্রলনিয়ন্ত্রণের ফলে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, তা'র নিবারণে বৈজ্ঞানিকেরা প্রবৃত্ত হয়েছেন। পেট্রলের পরিবর্ত্তে মোটর ইত্যাদিতে ব্যবহারোপযোগী তেলের অনুসন্ধান চলেছে। কয়লা থেকে পেট্রল জাতীয় তেল তৈরী করা হচ্ছে। কয়লা থেকে রাসায়নিক উপায়ে জার্ম্মাণীতে বছরে প্রায় ৫০ কোটি গ্যালন, ইংলণ্ডে ৯ কোটি গ্যালন তেল প্রস্তুত করা হয়। আমাদের দেশেও কয়লা থেকে মোটরগাড়ীর তেল তৈরী করবার কথা হচ্ছে। কয়লার খনি এদেশে রয়েছে। কয়লা তাই এদেশে সস্তা। তাই এদেশে তৈল তৈরী খুব শক্ত নয়। এক টন কয়লা থেকে প্রায় ৪ চার গ্যালন তেল পাওয়া যায়। আরও বিশেষ রাসায়নিক সতর্কতা অবলম্বন করলে বাইশ গ্যালন পর্য্যন্ত একটন কয়লা থেকে তৈরী হওয়া সম্ভাবনা।

বছর পঁচিশ আগেও 'হাওয়া গাড়ী' বড় রাস্তায় এসে দাঁড়ালে, চারপাশে ভীড় জমে' যেত। কলকাতা সহরে এখনও ঘোড়ার গাড়ী, গরু বা মোষের গাড়ী দেখা গেলেও, মোটরগাড়ীর সংখ্যার তুলনায় তা' অনেক কম। আরও কিছুদিন পরে হয়ত যানবাহনের এমন অবস্থাই হবে যে, পঁচিশ বছর আগে মোটরের ভেঁপু শুনলে যেমন গলি ছেড়ে বিস্মিত জনতা মাঝ রাস্তায় এসে দাঁড়াত, তেমনি ঘোড়ার গাড়ীর ঘণ্টি শুনলে ছুটে আসবে। সেইদিনই পেট্রলের অভিযান সম্পূর্ণ জয়যুক্ত হবে।

ব্রহ্মসূত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

(দ্বিতীয় পাদ)

শ্রীমতিলাল রায়

পত্যুঃ অসমঞ্জস্যাৎ ॥৩৭॥

পত্যুঃ (ঈশ্বরের জগৎকারণতা) অসমঞ্জস্যাৎ (অসমঞ্জস্য হওয়া হেতু এই মতও সঙ্গত নহে)।

জৈনমতখণ্ডনের পর যে সকল দার্শনিকেরা ঈশ্বরকে শুধুই নিমিত্ত কারণ বলেন, যেমন সেশ্বর সাংখ্যমতে ঈশ্বর প্রকৃতি-পুরুষের অধিষ্ঠাতা। এই ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ। নিরীশ্বর সাংখ্যের কথা এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নহে। সেশ্বর সাংখ্য ব্যতীত শৈব মতে পাঁচটী পদার্থের কথা স্বীকৃত হয়; যথা কার্য্য, কারণ, যোগ, বিধি ও দুঃখান্ত। পশুপতি শিবই এই পঞ্চ পদার্থময় জগতের নিমিত্ত কারণ। শৈব সম্প্রদায় চারি ভাগে বিভক্ত। তাহাদের নাম শৈব, পাশুপত, কারুণিক সিদ্ধান্ত ও কাপালিক। ইহাদেরও মতে সৃষ্টির উপাদান কারণ প্রধান বা প্রকৃতি; ঈশ্বরই নিমিত্ত কারণ। বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকগণও ঈশ্বরকে একমাত্র নিমিত্ত কারণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। উপরোক্ত সূত্রে তাই বলা হইয়াছে, এইরূপ ঈশ্বরের জগৎকারণতা অযুক্ত। তিনি সৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া কাহাকেও উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট, এইরূপ অসমান সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাতে প্রমাণিত হয়—তাঁর মধ্যে পক্ষপাতিত্ব আছে। যদি বলা হয় কর্ম্মানুসারে উত্তম, অধম প্রাণীর সৃষ্টি, তাহা হইলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বই অসিদ্ধ হয়। ঈশ্বরেচ্ছায় উত্তমাধম সৃষ্টি হয় না, কর্ম্মই তাহার কারণ হয়, তাহা হইলে কর্ম্মকে আমরা জড় বলিতে পারি না। ঈশ্বরের মত কর্ম্মও প্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কর্ম্মের প্রবর্ত্তক ঈশ্বর? না ঈশ্বরের প্রবর্ত্তক কর্ম্ম? এই তর্কের সমাধান হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। যদি তদুত্তরে বলা যায় যে, কর্ম্ম ও ঈশ্বরের মধ্যে প্রবর্ত্ত্য-প্রবর্ত্তক ভাব অনাদি কাল চলিয়া আসিতেছে, এই অনাদি কালের উত্তমাধম কর্ম্মই সৃষ্টি-বৈষম্যের কারণ হইয়াছে। ইহাও এক অন্ধ অন্য অন্ধকে লইয়া চলার ন্যায় অসঙ্গত হয়। ইহা ব্যতীত কর্ম্ম ঈশ্বরকে কর্ম্মানুযায়ী উত্তমাধম সৃষ্টির প্রেরণা দেয়, ইহাও অতিশয় অসঙ্গত কথা। ন্যায়শাস্ত্রমতে প্রবর্ত্তনকারীও দোষমুক্ত নহে—"নহি কশ্চিদদোষপ্রযুক্তঃ স্বার্থে পরার্থে বা প্রবর্ত্তমানো দৃশ্যতে" অর্থাৎ কেহ কখন দোষপ্রযুক্ত না হইয়া স্বার্থে বা পরার্থে প্রবৃত্ত হয়, এমন দেখা যায় না। এই ন্যায়ানুসারে, ঈশ্বর যখন প্রেরক, তখন তিনিও দোষাদিযুক্ত হইবেন। ঈশ্বর যখন দোষাদিযুক্ত, তখন আর তাঁহাকে ঈশ্বর না বলিয়া আমাদের ন্যায় অনীশ্বর বলিতে হইবে; এই জন্যই নিমিত্তকারণবাদী দার্শনিকগণের মত অভ্রান্ত নহে।

যোগমার্গীরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। কিন্তু তাঁহাদের ঈশ্বর আবার উদাসীন, নির্বিকার পুরুষবিশেষ—ইহাও অতিশয় অসঙ্গত কথা। কল্পিত কর্ম্মবিহীন জড় সমাধির যৌক্তিকতারক্ষার জন্য কল্পিত এই ঈশ্বরবাদ প্রলাপ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? যিনি জগৎপ্রবর্ত্তক, তিনি উদাসীন দুর্জ্ঞেয় পুরুষবিশেষ, ইহা খুবই অসঙ্গত কথা।

সম্বন্ধ অনুপপত্তেঃ চ ॥৩৮॥

সম্বন্ধ (ঈশ্বরের সহিত প্রধানাদির সম্বন্ধ) অনুপপত্তেঃ চ (ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব উপপন্ন হয় না)।

সেশ্বরসাংখ্যমতে প্রধান ও জীবাত্মা হইতে ঈশ্বর স্বতন্ত্র, অতিরিক্ত। এইরূপ ঈশ্বর জীবকে অর্থাৎ পুরুষকে বা প্রধানকে সম্বন্ধের সূত্র না থাকিলে নিয়মানুগামী করিবেন কেমন করিয়া? সাংখ্যেরা বলেন,—প্রধান, পুরুষ বা ঈশ্বর, এই তিনই সর্ব্বব্যাপী ও নিরবয়ব। ইহাদের মধ্যে কি উপায়ে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা পাইবে? যদি সংযোগ-সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে উপরোক্ত তিন পদার্থের কোনটীই যখন অবয়ববিশিষ্ট নয়, তখন কে কাহার সহিত মিলিবে? সংযুক্ত হইবে? সাংখ্যমতে, কেহ কাহারও আশ্রিত বা অনুগত নহে। এইজন্য সংযোগ-সম্বন্ধের ন্যায় সমবায়-সম্বন্ধও সম্ভব নহে। কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ, তাহাও বলিবার উপায় নাই। প্রকৃতির কার্য্য যে ঈশ্বরপ্রেরিত, তাহাও সাংখ্যমতে স্বীকৃত নহে।

আরও ব্যাপকভাবে ঈশ্বরের লক্ষণ ব্যক্ত করিতেছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রে শ্রুতি ও স্মৃতির আশ্রয়ে যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বরতত্ত্বকে অবধৃত করান হইয়াছে; এক্ষণে তিনি বলিতেছেন যে, ঈশ্বর হইতে জীবের উৎপত্তি অসম্ভব হয়—এই হেতু আচার্য্য শঙ্করের এই অংশের ভাষ্য বিশেষ-ভাবে বিবেচ্য। উৎপত্তি অসম্ভব হয়, এই সূত্রের ব্যাখ্যায় আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন যে, সৃষ্টিতত্ত্বে শ্রুতি-স্মৃতি-প্রতিষ্ঠিত ঈশ্বরবাদ নিরস্ত করার জন্যই কি উপরোক্ত সূত্র? আচার্য্য বলিতেছেন—ঈশ্বরই সৃষ্টির উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, শ্রুতির এই উক্তির প্রতিবাদ উপরোক্ত সূত্রে হয় নাই। ব্যাসদেব সেই মতবাদকেই খণ্ডন করিতে চাহিতেছেন, যে মতবাদে বলা হইয়াছে যে, ভগবান এক, নিরঞ্জন ও জ্ঞানঘন চৈতন্যস্বরূপ হইয়াই নিজেকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রে বেদান্তবিরোধী সকল শাস্ত্রেরই মতবাদ খণ্ডিত হইয়াছে; অতঃপর শ্রুতির অনুগামী রূপে পুরাণাদির যে সকল অংশ রচয়িতৃগণের স্ব-কপোল-কল্পিত মতবাদ, তাহারই প্রতিবাদ এই সূত্র হইতে সুরু হইয়াছে। ভাগবতকার বলিয়াছেন—বাসুদেব-ব্যূহ হইতে সঙ্কর্ষণ-ব্যূহ। তাহা হইলে দেখা যায় যে, সঙ্কর্ষণ বাসুদেব হইতে সমুৎপন্ন; বাসুদেব এই ক্ষেত্রে পরাপ্রকৃতি হইলেন। ভাগবতে সঙ্কর্ষণ আবার জীবরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছেন। জীবের অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় ও যোগ, এই পঞ্চবিধ সাধনের দ্বারা মুক্ত ও নিষ্পাপ হওয়ার কথা ভাগবতে সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। অভিগমন অর্থে কায়-মনোবাক্যে ঈশ্বরের শরণ ও মনন। উপাদান অর্থে ঈশ্বর-প্রীত্যর্থে পূজাদির আয়োজনানুষ্ঠান। ইজ্যা অর্থে পূজা। স্বাধ্যায়—মন্ত্রজপ। যোগ অর্থে—ইষ্টে চিত্তলয়। জীব উৎপন্ন হয় বলিয়া পরিচ্ছিন্ন। পরিচ্ছিন্ন জীবের সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বভোগ অনিবার্য্য। ইহা হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা দুঃখনিবৃত্তির দায় ভিন্ন অন্য কিছু নয়। জীব পরিচ্ছিন্ন হইলে, তাহাকে কে অমৃত দিবে? ঈশ্বর হইতে মূলতঃ জীব যদি ভিন্ন হয়, ঈশ্বরপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা কেমন করিয়া পূর্ণ হইবে? তাহার পক্ষে ঈশ্বরযুক্তিও সম্ভব হইতে পারে না। যাহা জন্মে, তাহার মরণ আছে। সুখ-দুঃখ চির সঙ্গী। পরম কারণের সহিত তাহার যুক্তির প্রয়োজন ও হেতু থাকে না। বেদান্ত এইজন্য জীবের উৎপত্তি নিষেধ করিয়া উপরোক্ত সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন; আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যে ইহাই অনুভূত হয়। পুরাণের যে সকল অংশ শ্রুতিকে হুবহু অনুগমন করিয়াছে, সেই অংশগুলি আচার্য্যের মতে দোষাবহ হয় নাই। তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন—"নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাৎ প্রসিদ্ধঃ পরমাত্মা সর্ব্বাত্মা স আত্মনাত্মানমনেকধা ব্যূহ্যাবস্থিত ইতি" অর্থাৎ নারায়ণ প্রকৃতির পর, তিনি অব্যক্ত, সর্ব্বাত্মা, পরমাত্মা, তিনি আপনা আপনি অনেক প্রকারে বিরাজিত, এই সকল কথা শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে। শ্রুতি বলিয়াছেন "স একধা ভবতি," "ত্রিধা ভবতি"—শ্রুতিতে পরমাত্মার বহু-ভাবে অবস্থিতির কথা আছে। কিন্তু যদি বলা হয়, বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণ, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের জন্ম, তাহা হইলে জীবের উৎপত্তিবাদ প্রশ্রয় পায়। জীবের ঈশ্বরযুক্তিতে মোক্ষ হয়, এই প্রতিজ্ঞার বাধা হয়। ভগবান হইতে জীব বা প্রকৃতি উৎপন্ন নহে, ভগবান স্বয়ং পুরুষ ও প্রকৃতি হইয়াছেন। জীব বা প্রকৃতি হইতে তিনি ভিন্ন নহেন; ভিন্ন নহেন বলিয়াই জীবে ও ভগবানে যুক্তি-বাদ সম্ভব হয়। ব্যাসদেব পরবর্ত্তী সূত্রে আরও ভাল করিয়া বলিতেছেন

ন চ কর্ত্তুঃ করণম্। ৪৩॥

কর্ত্তুঃ (কর্ত্তার) করণম্ ন চ (কর্ম্মোৎপত্তি দেখা যায় না)

অর্থাৎ কর্ত্তা হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি দেখা যায় না।

স্ব-কপোলকল্পিত ভাগবতবাদীরা হয়তো বলিবেন—বাসুদেব নির্দ্দোষ অপ্রাকৃত। বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণাদির উৎপত্তি জীবভাবান্বিত নহে। এইরূপ বলিলেও, উৎপত্তির অসম্ভব দোষ নিবারিত হয় না।

বিজ্ঞানাদি ভাবে বা তৎ-অপ্রতিষেধঃ ॥ ৪৪ ॥

বিজ্ঞানাদিভাবে বা (বিজ্ঞান, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি যুক্ত থাকিলেও) তৎ-অপ্রতিষেধঃ (উৎপত্তির অসম্ভবতা থাকিয়া যায়)।

সঙ্কর্ষণাদি যদি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যূহাদির কেন্দ্রস্বরূপ হন, তাহা হইলে অনেক ঈশ্বর স্বীকার করিতে হয়। অনেক

ঈশ্বর স্বীকার করিলেও, এক হইতে অন্যের উৎপত্তি স্বীকৃত হওয়ায়, পরস্পরের মধ্যে তর-তম ভাব স্বতঃই আসিয়া পড়িবে। এক হইতে অন্যের উৎপত্তিতে কার্য্য কারণ ভাবের অতিশয়ত্ব স্বীকার করিতে হইবে। বাসুদেব কারণ—সঙ্কর্ষণ তাহার কার্য্য। আবার সঙ্কর্ষণ—কারণ, প্রদ্যুম্ন—তাহার কার্য্য। এইরূপ পরস্পর অতিশয় দোষ হওয়ায়, চতুর্ব্যূহের কোন একটীকে ঈশ্বরাখ্যা দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হইবে না। আর যদি বলা হয় যে, চতুর্ব্যূহের সমগ্রতাটাকে লইয়াই ঈশ্বররূপের কল্পনা? কিন্তু শ্রুতি বলেন "ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তস্য সমস্তস্যৈব জগতো ভগবদ্-ব্যূহত্বাবগমাৎ।" অর্থাৎ ব্রহ্মাদি তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত সমুদয় জগৎই ভগবদ্ব্যূহ। এই শ্রুতিবাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বতন্ত্র ব্যূহের স্বীকৃতি বেদবিরুদ্ধ বাদ হইবে।

বিপ্রতিষেধাৎ চ ॥ ৪৫ ॥

বিরুদ্ধ উক্তি থাকা হেতু পূর্ব্ব পূর্ব্ব মতবাদ উপেক্ষণীয়।

যে সকল শাস্ত্রে পরস্পরবিরুদ্ধ বাদ দেখা যায় এবং শ্রুতিবাদের প্রতিবাদ পরিলক্ষিত হয়, বেদান্তমতবাদীরা সেই সকল মতবাদ অস্বীকার করেন।

একটা জাতি কোন এক অখণ্ড মতবাদে প্রতিষ্ঠিত না হইলে, সে জাতির শ্রেয়ঃ হয় না। ভারতে বেদবাদ-প্রবর্ত্তিত জাতির সম্মুখে বহুবাদ আসিয়া, যখন তাহার সংস্কৃতিকে ছিন্নভিন্ন করিয়া তাহাকেও ছিন্নভিন্ন করিল, ভারতের সেই পতন-যুগ হইতেই আর্য্যরক্তধারা আশ্রয় করিয়া বৈদিক সংস্কৃতি অটুট রাখার প্রচেষ্টা চলিয়াছে। এই প্রচেষ্টার মূলে অসংখ্য ব্যাসের জন্ম হইয়াছে, ঋষি বাদরায়ণ তাঁহাদের অন্যতম। এবং আচার্য্য শঙ্কর ভারত-সংস্কৃতির মৌলিক ভিত্তি এই বেদবাদপ্রচার করায় ব্যাসদেবের অবতার বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। ধর্ম্ম যাবতীয় জগৎকে ধরিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু যে বিশেষ ধর্ম্মে মানবতার প্রকৃষ্টতর কৃষ্টি অভিব্যক্ত হয়, সেই সার্ব্ব-জনীন বেদবাদই ভারতের আদরণীয়। ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে বেদবাদ বিরুদ্ধ করার অসংখ্য মতবাদকে নিরস্ত করা হইল।

ব্রহ্মসূত্রে ব্যাসদেব বৌদ্ধ ও জৈন মতের সঙ্গে সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বৈশেষিক, এমন কি ভাগবতের মতও খণ্ডন করিয়াছেন। বৌদ্ধ ও জৈন মত বেদবিরুদ্ধ বলিয়া, ইহাদের খণ্ডন করা কিছু অসঙ্গত কথা নহে; কিন্তু হিন্দুর ষড়্‌দর্শন ও ভাগবতের মতবাদ খণ্ডন করার কারণ কি! এই সকল দর্শন ও পুরাণ কি বেদবাদের পুরণকারী নহে?

বেদ এক অদ্বয় ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় কিছু স্বীকার করে না। এই প্রতিজ্ঞা প্রমাণসাপেক্ষ নহে; শ্রুতি-বাক্যেই ইহার প্রমাণ। ইহা বিশ্বাসের কথা, সাংখ্যাদি দর্শনে বিশ্বাসকে এতখানি স্থান না দিয়া, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সৃষ্টিতত্ত্ব-নিরাকরণের প্রচেষ্টা হইয়াছে। সাংখ্যের প্রধানবাদ, বৈশেষিকের পরমাণুবাদে পর্য্যন্ত প্রমাণ সাহায্যে উপনীত হওয়া যায়; তাহার পর আসিয়া পড়ে বিশ্বাসের কথা।

বেদান্ত মতে, সৃষ্টির আদি তত্ত্ব দৃষ্ট প্রমাণ সাহায্যে নিরাকরণ করার যুক্তি নাই। যাহা সকলের আদি, তাহা আর্য দৃষ্টি ব্যতীত অনুভবযোগ্য হয় না এবং সাংখ্যাদির এত প্রচেষ্টা পরবর্ত্তী যুগে নিরীশ্বরবাদীদের অদ্বয় ব্রহ্মবাদ খণ্ডন করার সাহায্যই করিয়াছে।

ঈশ্বর, পুরুষ ও প্রকৃতি, বেদান্ত এই তিনই স্বীকার করেন; কিন্তু একই ঈশ্বর এই তিন হইয়াছে, ঈশ্বর হইতে কোনটীর উৎপত্তি হয় নাই। উৎপত্তি স্বীকার করিলেই বস্তুর জন্ম-মৃত্যুর কথা আসিয়া পড়ে। যাহা জন্ম-মৃত্যুর অধীন, তাহার সহিত শাশ্বত অমৃতের সাযুজ্য সম্ভব হয় না; এই জন্য প্রকৃতি ও জীবের যে ব্রহ্মযুক্তি, তাহা সিদ্ধ করার প্রতিজ্ঞার মূলে ব্রহ্মই প্রকৃতি ও জীব, লীলাবিশতঃ বা ঈশ্বরেচ্ছায় দ্বিধা বা ত্রিধা হইয়াছেন, ইহাই বেদান্ত-মত। যাহা স্বেচ্ছায় হয়, তাহা হইতে পুনরাবৃত্তি ইচ্ছাধীন হইবে; তাই ব্রহ্মই জীবের শেষ বা প্রকৃতির লয় স্থান; এই মতবাদ অসঙ্গত নহে। সমস্ত মতবাদ নিরসন করিয়া, অতঃপর শ্রুতির ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্ম-সংজ্ঞার মধ্যে ব্রহ্মৈক্য প্রদর্শনের জন্য পরবর্ত্তী অধ্যায়ের অবতারণা হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

সাময়িক সাহিত্য

শূলপাণি

ভারতবর্ষ—অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮ঃ

আগম ও শ্রীঅরবিন্দ—স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ। লেখকের বলিবার সুন্দর ভঙ্গী রচনাটিকে সাহিত্যের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছে। রচনাটির আবেদন হয়তো বিশিষ্ট রসিক-মহলের পরিমিত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ তথাপি ইহার উৎকর্ষ সম্বন্ধে আমরা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। "কিন্তু পরাবিদ্যার পথের আলোও কি পথের শেষে, শেষের কাছাকাছি নিভে যায় নি? যে ভাবে জেনেছি সে জানেনি, যেভাবে জানিনি সেই জেনেছে—এই রকম সব হেঁয়ালীর কথা শ্রুতিতেই শুনতে পাই। তবু পথ চলার আঁকা বাঁকা পথে, নানান হের ফেরে যে অজানায় আঁধার, যে অ-পাওয়ায় রিক্ততা শূন্যতা, তার সঙ্গে পথ শেষের সেই পরম অজানায় মিল নেই।" এ প্রশ্ন আজও প্রশ্নই রহিয়া গিয়াছে।

ক্ষুধা—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার। গল্প, নারী-জীবনের একটি ব্যর্থতার চিত্রকে রূপায়িত করা হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যে এই ধরণের ভাববস্তুকে অবলম্বন করিয়া ইতিপূর্ব্বে একাধিক গল্প রচিত হইতে দেখিয়াছি, সেই দিক হইতে হয়তো রচনাটির নূতনত্বের দাবী কিছু নাই। তথাপি লেখকের স্বাভাবিক রহস্যপ্রবণতা ও কুশলী হস্তের পরিচয় রচনাটিকে সত্যই উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। কয়েকটি খুঁটিনাটির প্রতি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। গল্পের তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ অংশটি অপ্রয়োজনীয়। বেলা নিঃসন্তান বিদুষী মহিলা, বয়স অল্প, বিবাহ হইয়াছে তাহার একটি বৃদ্ধ অধ্যাপকের সহিত, অন্ততঃ মিলিটারী অফিসের চাকুরী তাঁহার জীবনের সহিত ঠিকভাবে খাপ খায় নাই, লেখক তাহা বলিয়াছেন। হঠাৎ এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের একটি ভূতপূর্ব্ব ছাত্র একদিন তাঁহারই অফিসে উপরওয়ালা হইয়া আসিলেন, অতিথি হইলেন কয়েকদিন

"গোঁ ধরবে না ত কি করবে! আমার মত একলা থাকতে হোত ত—বাড়ীতে না একটা জনমনিষ্যি, না একটা ছেলে, না একটা—বলিতে বলিতেই তাহার (বেলার) চোখে জল আসিয়া পড়িল এবং চক্ষুর নিমিষে চায়ের বাটী ফেলিয়া সে যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল অনেকক্ষণ আর তাহাকে দেখা গেল না।" ব্যাপারটি খুবই ভাল বাহিরে হইতে কিছু বলিবার নাই, তথাপি পারিপার্শ্বিক লেখক যাহা খাড়া করিয়াছেন তাহাতে এ অংশটি বাহুল্য মাত্র, কতকটা গতানুগতিক, গল্পের রস উপভোগে অনর্থক বাধার সৃষ্টি করে। ছোট গল্প বাহুল্য বর্জ্জিত হওয়া উচিত। এইরূপ আরও কয়েকটি স্থানের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

অফিসের বড় সাহেব, স্বামীর এই ভূতপূর্ব্ব ছাত্রটির জন্য বেলার বুকের মধ্যে হু হু করিতেছে; সেবাপরায়ণা নারী ও স্নেহাতুরা মাতা, রহস্যপরায়ণা সাথী এই সকলের সংঘর্ষে আজ সারাদিন সে কি কষ্টই না পাইয়াছে।

লেখক দেখিতেছি সে-যুগের মানুষ, তিনি সেবা-পরায়ণা নারী ও স্নেহাতুরা মাতার কথা বলিয়াই শেষ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, ফ্রয়েড রসপিপাসু পাঠকেরা রক্ত চক্ষু হইয়া উঠিয়াছেন। গল্পটির এমন একটি রোমাঞ্চকর সম্ভাবনা মাঠে মারা গেল!

শেষের দিকে বেলার জীবনে যখন অকাল মৃত্যুর ছায়া নামিয়া আসিয়াছে তখন তাহার বুভুক্ষিত মাতৃ-হৃদয়ের আকুলতা হৃদয় স্পর্শ করিতে চাহিলেও মনে হয় ইহারই মধ্যে একটি অবাস্তবতা ও আতিশয্য যেন কোথায় উঁকি মারিতেছে। ইহা সত্ত্বেও নানা দিক দিয়া রচনাটি উল্লেখযোগ্য বলিয়া আমরা মনে করি।

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প—শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়। নিজের বক্তব্যের অপেক্ষা অপরের কথাই রচনাটিতে জোরালো হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছোট গল্প—শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম-এ। রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছোট গল্প 'ঘাটের কথা' লইয়া লেখক আলোচনা করিয়াছেন।

নিন্দার ভয়—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত। গল্পটির নামকরণের বাহাদুরী আছে স্বীকার করিলেও, নিন্দার ভয় যে লেখকের নাই, তাহা গল্পের মধ্যে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। কলমের জোরে কামিনী গোয়ালিনী ইলা দেবী হইয়া উঠিয়াছেন। 'আজ ধনী ঘরের মহিলারা হেসে কথা কয় তার সঙ্গে।' সম্প্রতি ইনি এক হতভাগ্য ডাক্তারের স্কন্ধে ভর করিয়াছেন।

ডাক্তার বললে—শত শত বৎসরেও উর্ব্বশীর যখন বার্দ্ধক্য আসেনি, পাঁচ বছরে আমার ইলারাণীর কি হবে? আসল কথা, পূরণের সমস্যা থাকে অসম্পূর্ণতায়। কিন্তু যে সৌন্দর্য্যে পূর্ণ—জোয়ারে সাগরের মত, পূর্ণিমার চাঁদের মত—

ইলা ওরফে কামিনী গোয়ালিনী বললে—বোতল ভরা মদের মত। ভাগাড়ে নজর পূর্ণমাত্রায় বজায় আছে দেখিতেছি! লেখক 'চাট'এর বন্দোবস্ত করিলে উপমাটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠিত।

গল্পটির দ্বিতীয় পর্ব্বে কামিনী গোয়ালিনী (ইলা দেবী) পত্নীরূপে ডাক্তারের পিতৃকুল উদ্ধার করিতে চলিয়াছেন। হঠাৎ পথে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিল, এই দুর্যোগে কোথায় রহিল ডাক্তার আর তাঁহার অনুচর। পাটনীকে লইয়া কামিনী দেবী মাঝ দরিয়ায় ভাসিয়া চলিলেন। হঠাৎ নৌকায় পাটনী-বেশী ভূষণ গোয়ালার সহিত ইলা রাণীর চারিচক্ষে মিলন হইয়া গেল। ভূষণ আর কেহ নয় ইলারাণীর পূর্ব্বপক্ষ। হঠাৎ ইলারাণী কামিনী গোয়ালিনী হইয়া উঠিলেন! লেখকের কলম তারিফ করিবার মত।

ভূষণ ক্রমশঃ অবসন্ন হচ্ছিল, একটু খেতে পেলে সে সুস্থ হয়। কামিনী বললে—নৌকার খোলে আমার (ডাক্তার বাবুর?) একটা ব্যাগ পড়ে আছে। তাতে টাকা আছে। কাছে গ্রাম। ব্যাগটা আনো।

—ওরে আমার চালাক্ রে—বল্‌লে ভূষণ।

—না, পালাব না।

কিন্তু তাকে না খাওয়ালে কামিনী ক্লান্ত হবে।

ভূষণ বললে—আমি ব্যাগ আনতে গেলে পালাবে না বল—তোমার ডাক্তারবাবুর দিব্যি।

রসিকতা যে উচ্চশ্রেণীর সে বিষয় আমাদের সন্দেহ নাই তবে ইহা পল্লীবিশেষের মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছে।

লেখকের গোপ-প্রীতি প্রশংসনীয়। রচনাটি আগা-গোড়া পড়িলে বলিতে ইচ্ছা হইবে 'কেয়াবাৎ'। আরও মণিমুক্তা উদ্ধার করা চলিত, বর্ত্তমানে স্থানাভাব।

বড় বাবুর ঘোড়া রোগ—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু। ভারতবর্ষের গল্পের আসরে ইহাও একটি রত্নবিশেষ। ঘোড়া রোগ যে কাহার তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না, লেখকের না পত্রিকা-কর্ত্তৃপক্ষের? লেখক তো লিখিয়াই খালাস। তবে এই রোগ যে ক্রমশঃ সংক্রামক হইয়া উঠিতেছে তাহা আলোচ্য সংখ্যার কয়েকটি রচনায়ই প্রকাশ।

চারুকলার রূপ ও অভিব্যক্তি—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার। শিল্প সম্বন্ধীয় একটি উপভোগ্য রচনা। লেখকের একটি উক্তি তুলিয়া কলারসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের বক্তব্য জানিতে পারিলে সুখী হইতাম।

"ভারতীয় কলার রসজ্ঞগণ বাস্তবকে ত্যাগ করিয়া নিজস্ব সৃষ্টির পক্ষে যুক্তি দেন যে, মানুষের মূর্ত্তি ঠিক মানুষের মত অঙ্কন করা অতি সাধারণ ব্যাপার। ইহাতে শিল্পীর মন অতীন্দ্রিয় জগতের কল্পনা করিতে সক্ষম, তাই তিনি বাস্তবের ঊর্দ্ধেও চলিয়া যান; যেমন দেবদেবীর মূর্ত্তি-পরিকল্পনায়। এ উক্তি উচ্চাঙ্গের সন্দেহ নাই; কিন্তু জিজ্ঞাস্য—শিল্পী যখন সেই অতীন্দ্রিয় রূপ চিত্রে বিকাশ করিবেন তখন বিকাশের সাহায্য করিতে যে সব উপকরণ প্রয়োজন তাহা তিনি কি অতীন্দ্রিয় জগৎ হইতে আনয়ন করিবেন? আর দেবদেবীর হস্তপদাদির রূপ মাফিক জগতের ন্যায় হইবে অথবা বিষয়ের গুরুত্ব হেতু হস্তগুলি অঙ্কুররূপে মস্তক হইতে উত্থিত হইবে? তা ছাড়া, তিনি অদৃষ্টপূর্ব্ব সেই অতীন্দ্রিয় চিত্র যদি বাস্তব জগতের উপাদান দ্বারা নির্ম্মাণ না করেন তবে অতীন্দ্রিয় বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিবার উপায় কি? সাধারণ ইন্দ্রিয়যুক্ত এই পৃথিবীর লোকের তাহা বোধগম্য হইবে কি করিয়া? যেহেতু তাহারা অতীন্দ্রিয় জগতের কোন বস্তুকেই প্রত্যক্ষ করে নাই।"

ব্রহ্ম ভারতী - রবীন্দ্র স্মৃতি সংখ্যা ঃ

রেঙ্গুণপ্রবাসী বাঙালী কর্ত্তৃক প্রকাশিত এই স্মৃতি-সংখ্যা বহু বিশিষ্ট রচনায় সমৃদ্ধ হইয়াছে। রবীন্দ্র-প্রতিভার বহুদিক অবলম্বন করিয়া কয়েকটা সুলিখিত রচনা ইহাতে স্থান পাইয়াছে। প্রত্যেক পৃষ্ঠায়ই বেষ্টনীর মধ্যে কবির রচনার সুপরিচিত অংশগুলি তুলিয়া দিয়া সুষ্ঠু সম্পাদনার পরিচয় কর্ত্তৃপক্ষ দিয়াছেন। বাংলার সাহিত্যিক প্রাণস্পন্দন ও তাহার সৃষ্টির বিশিষ্টতা সুদূর ব্রহ্মের বাঙালী সাহিত্যিকমহলেও যে সাড়া তুলিয়াছে তাহাতে আনন্দিত হইলাম। শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস রচিত 'গ্রামের কবি রবীন্দ্রনাথ' কবিতা ইতিপূর্ব্বে কলিকাতার একটি সাময়িকীতে প্রকাশিত হইয়াছে, অথচ কোনপ্রকার স্বীকৃতির উল্লেখ দেখিলাম না। শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'আধুনিক বাংলা গান ও রবীন্দ্রনাথ' প্রভৃতি রচনা উল্লেখযোগ্য।

শ্রী—(বর্দ্ধমান), কার্ত্তিক, ১৩৪৮ ঃ

পত্রিকাটি বর্দ্ধমান হইতে প্রকাশিত হইতেছে। হিন্দুর সভ্যতা ও সংস্কৃতিমূলক এই পত্রিকাটি সাহিত্যানুরাগী পাঠকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। রচনাগুলির বৈশিষ্ট্য ও ভাবধারা ভারতীয় কৃষ্টির বৃহত্তর পথ বাহিয়া চলিয়াছে। কয়েকটি রচনা আমাদের বিশেষ ভাল লাগিল। শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা লিখিত 'মহাযুদ্ধের জন্মকাহিনী' আলোচনাটি উল্লেখযোগ্য। এই বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় কোন ভাববস্তু ও আদর্শের দ্বন্দ্ব কাজ করিতেছে তাহারই একটি সুষ্ঠু পরিচয় লেখক দিয়াছেন। শিক্ষাবিৎ রবীন্দ্রনাথ—শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার রায় রচিত, ইহাও একটি ভাল রচনা। ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি সুলিখিত রচনা ইহাতে স্থান পাইয়াছে। আধুনিক সাময়িকের ক্ষেত্রে যে গতানুগতিকতা পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে আলোচ্য পত্রিকাটি আমাদের বিশেষ তৃপ্তি দিয়াছে।

গল্প-লহরী—অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮ ঃ

পত্রিকাটিতে বহু বিষয়ের সমাবেশে লোকরঞ্জনের একটা প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। গল্প, শিশু-সাহিত্য, সিনেমা প্রভৃতি নানা বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে গল্পগুলির অধিকাংশই নিম্ন স্তরের, কবিতাও অনুল্লেখ-যোগ্য। এই শ্রেণীর রচনারও একদল পাঠক আছেন তাঁহাদের ইহা ভাল লাগিতে পারে। এ সম্বন্ধে অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

উত্তরা—আশ্বিন, ১৩৪৮ ঃ

আলোচ্য সংখ্যা উত্তরার রবীন্দ্র-স্মৃতি-সংখ্যা। কয়েকটি সুনির্ব্বাচিত রচনার মধ্য দিয়া কবিগুরুর প্রতি শেষ প্রণতি জানান হইয়াছে। রচনার বৈশিষ্ট্যে 'উত্তরা'র এই সংখ্যাটি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

পত্র-সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
রবীন্দ্রনাথ ও তুলনা—শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
অতীত কথা—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
দূরের যাত্রী রবীন্দ্রনাথ—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
রবীন্দ্র-সঙ্গীত—শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
রবীন্দ্র সঙ্গ—শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

উপরোক্ত রচনাগুলির মধ্য দিয়া কবিগুরুর জীবনের বিভিন্ন দিকে আলোকপাত হইয়াছে। রবীন্দ্র-স্মৃতিতর্পণের এই দেশব্যাপী আয়োজনে 'উত্তরার' এই উপচার সাহিত্য-রসিককে তৃপ্ত করিবে বলিতে পারি।

সব্যসাচী—কার্ত্তিক, ১৩৪৮ ঃ

পত্রিকাটীর নামকরণ ঠিকই হইয়াছে, সিনেমা সাহিত্য—পত্রিকাটির এই double-barrelled চেহারা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়ছি! অবশ্য সাহিত্য অংশে বিশুদ্ধ সাহিত্য রস পরিবেশন করা হইয়াছে কিন্তু পর্দ্দার ব্যাপারে যে রসের সমারোহ দেখিলাম পাঠক বেচারীরা তাহা কতটা পরিপাক করিতে পারিবে সন্দেহের বিষয়! সিনেমা-আলোচনার নামে শুধু গালাগালি ও ইতরামির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, কোন শ্রেণীর সাহিত্য পত্রিকার পক্ষেই ইহা গৌরবের কথা নয়।

রচনাগুলির কোনটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে হইল না।

গ্রামে ও পথে—শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য—১।০ মাত্র।

কংগ্রেসের রাষ্ট্রনীতিক সাধনার পিছনে যে হৃদ্য আদর্শবাদ, দেশ-প্রাণের সহিত সেবক-প্রাণের সংযুক্তির তপস্যা, তাহারই মনোরম পরিচয় এই বইখানির মধ্যে পাইয়া অতিশয় পরিতৃপ্তি পাইয়াছি।

লেখক কাজের সূত্র ধরিয়া গ্রামে ও পথে ঘুরিয়াছেন—কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহার ভাবগ্রাহী দরদী মন দেশ ও জাতির মর্ম্মের ছোঁয়া অন্তরে কুড়াইয়াছেন, বাংলার মুসলমানকে রাজনৈতিক প্রলেপমুক্ত করিয়া তিনি দেখিয়াছেন—"ইহারা বাঙালা বলে, বাঙালায় ভাবে, বাঙালার মাটিতে হাঁটে, বাঙলার ক্ষেতে ফসল ফলায়, বাঙলার আকাশ-বাতাস ইহাদের প্রাণে বাঁশী বাজায়—ইহাদের দেহে বাঙলা, রক্তে বাঙলা, মনে বাঙলার সুর।" "স্বদেশী" মানে তিনি বুঝিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন—"স্বদেশী মানে চরকা, গ্রামশিল্প, সাধুশ্রম—স্বদেশী মানে ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে অস্বাস্থ্য, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের অন্ধকারের মধ্যে নূতন আলোকপাত, নূতন কর্ম্মরচনা—স্বদেশী মানে দেশের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ। গৌরাঙ্গদেব আচণ্ডালে হরিনাম দিয়াছিলেন। সেই প্রেমেই স্বদেশীর জন্ম। আপামর সাধারণের কল্যাণ-সাধনই হল স্বদেশীর ধর্ম্ম।" এমন মরমী দৃষ্টি দিয়া স্বদেশীর উপলব্ধি আমরা অনেকেই করিতে পারি নাই!

আমরা প্রত্যেক প্রেমিক দেশভক্তকে বইখানি শ্রদ্ধার সহিত পড়িতে অনুরোধ করি।

উপনিষৎ গ্রন্থাবলী—(প্রথম ভাগ) স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত। প্রকাশক—স্বামী আত্মবোধানন্দ, উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা। পৃঃ সংখ্যা ৪৭৪, মূল্য দুই টাকা চারি আনা।

আলোচ্য গ্রন্থে প্রসিদ্ধ উপনিষৎসমূহের মধ্যে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয় ও শ্বেতাশ্বতর এই নয়খানি উপনিষৎ স্থান পাইয়াছে। পুস্তকে প্রথমে মূল সংস্কৃত, অন্বয় মুখে বাঙ্গালা শব্দার্থ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া মূলানুগত প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ দুরূহ বাক্যসমূহের বিশদ টীকা এবং পুস্তকের শেষ ভাগে শ্লোকাদির অনুক্রমণিকা এবং নির্ঘণ্ট গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি করিয়াছে। পুস্তকটি যাহাতে সর্ব্বসাধারণের উপযোগী হয় সে বিষয়ে কোন ত্রুটী করা হয় নাই। ফলে সংস্কৃতে অল্প জ্ঞান পাঠকেরও উপনিষদের মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে অসুবিধা হইবে না। ধর্ম্মশাস্ত্রাদির সুলভ প্রচারে উদ্বোধনের খ্যাতি আজ দূর-বিস্তৃত। এই গ্রন্থ প্রকাশের মধ্য দিয়া সে খ্যাতি রক্ষিত হইয়াছে। জাতির অন্তর মথিত করিয়া জাতিগঠনের একটা দুর্ব্বার প্রেরণা আজ দিকে দিকে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে, এই যুগসন্ধিক্ষণে বিশাল হিন্দুসমাজের আত্মোপলব্ধির পথকে প্রশস্ততর করিতে এই প্রচেষ্টার মূল্য সাধারণ মাপকাঠিতে যাচাই করা চলিবে না। সম্পাদনার মধ্য দিয়া সর্ব্বত্র একটা রুচিশীল মনের পরিচয় পাইয়াছি যাহা বিষয়বস্তুর সহিত সুসমঞ্জস। পুস্তকটির গঠন পারিপাট্য মনোরম এবং মূল্যও যথেষ্ট সুলভ। এই গ্রন্থের বহুল প্রচার আমরা কামনা করি।

অম্বিকাচরণ মজুমদার (জীবনী)—শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র গোস্বামী, এম-এ প্রণীত। প্রকাশক—সংহতি পাব্লিশিং হাউস, ৭নং মুরলীধর সেন লেন, কলিকাতা। পৃঃ সংখ্যা ১১৯, দাম পাঁচ সিকা।

ফরিদপুরের স্বর্গীয় জননেতা অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের কর্ম্ম-বহুল জীবনের স্বচ্ছ পরিচয় ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। স্বদেশীযুগ বাঙ্গলার জাতীয়তাবাদের নবজাগরণের যুগ—এই যুগে বাঙ্গালার জাতীয় প্রতিভা যেন এই সব যুগপুরুষদের জীবনের মধ্য দিয়া রূপায়িত হইয়াছিল। চট্টগ্রামের যাত্রামোহন, মৈমনসিংহের অনাথবন্ধু, ঢাকার আনন্দচন্দ্র, বরিশালের অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি জননেতা বাঙ্গালীর চরিত্রবল ও জাতীয়তাবোধের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। আমরা ইহাদের নিত্য স্মরণ করি। স্বর্গত অম্বিকাচরণের জীবনী রচনায় লেখক এই দিকে যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা প্রশংসার যোগ্য। পুস্তকটির কাগজ, বাঁধাই ও ছাপা সাধারণ। আমরা পুস্তকটির বহুল প্রচার কামনা করি।

জলতরঙ্গ—শ্রীহিমাংশুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ প্রণীত। প্রকাশক—বাগচী এণ্ড কোং, ১২ নং হ্যারিসন রোড (কলেজ স্কোয়ার) কলিকাতা। পৃঃ সংখ্যা ১৩৪, দাম এক টাকা।

নাটকখানিতে লেখক আধুনিক সমাজ-জীবনের উপর ব্যঙ্গ ও শ্লেষের কশাঘাত করিয়াছেন। নাটকটি আমরা উপভোগ করিয়াছি, লেখকের পর্য্যবেক্ষণের সূক্ষ্মতায় ও ঘটনা সাজাইবার কৌশলে যে নাট্যরস জমিয়া উঠিয়াছে তাহাতে বেশ একটি পরিচ্ছন্ন রুচিশীল মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষা ও ডায়ালগ সচল, কোথাও অযথা মন্থর

হইয়া ওঠে নাই, পরিণতির মধ্যেও কোথাও অস্বাভাবিকতার দুর্ঘটনা লক্ষ্য করি নাই। আধুনিক বাঙালী চরিত্রের দৈন্য ও দুর্ব্বলতা ও ইহার অন্তরলীন ব্যথার চিত্রটি রচয়িতা সুকৌশলে ফুটাইয়াছেন। পুস্তকটি পাঠকসমাজে আদৃত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

ছোটদের রবীন্দ্রনাথ—শ্রীদীনেশ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃঃ সংখ্যা ১০৭, দাম দশ আনা।

পুস্তকটি ছোটদের উপযোগী করিয়া লিখিত। রবীন্দ্রনাথের জীবনীর বিচ্ছিন্ন পরিচয় ইহাতে দেওয়া হইয়াছে, শিশু চিত্তের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় কবি সম্বন্ধে তাহাদের মনে একটা সত্য ও সুন্দর ধারণা গড়িয়া উঠিবে—তাহা আমরা বলিতে পারি। পুস্তকটি সময়োপযোগী হইয়াছে। 'বিশ্বভারতী' নামক অধ্যায়টি দিয়া লেখক ভাল করিয়াছেন। ইহাতে কবি-কীর্ত্তির এই তীর্থস্থানের সহিত ছোটদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবে। আমরা পুস্তকটির প্রতি বাঙ্গলা দেশের বৃহৎ কিশোর সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালীন আরতি স্তোত্রদ্বয় ও শ্রীশ্রীগুরুপরম্পরা—শ্রীমৎ সাধু বাবা দিবোদাসজী মহারাজ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—নিম্বার্ক আশ্রম, বৃন্দাবন ইউ, পি। দুই আনার টিকিট পাঠাইলে একখণ্ড পুস্তিকা পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীনিম্বার্ক আশ্রমে ও অন্যান্য শাখা আশ্রমে শ্রীশ্রী৺ঠাকুরজীর প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালীন আরতির পর যে স্তোত্র পাঠ হইয়া থাকে ইহা তাহারই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ গৃহী ও ব্যবসায়াদি কার্য্যে ব্যস্ত শিষ্যগণের সময় সংক্ষেপের জন্য এই প্রচেষ্টা প্রশংসার্হ।

জাগরণ—ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবতরত্ন প্রণীত। প্রকাশক: শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি, এ, প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃঃ সংখ্যা ৮০, দাম দশ আনা।

অল্প শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া পুস্তকটি লিখিত হইয়াছে। যাহারা কোন ক্রমে সামান্য লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে জানিবার কতশত বস্তুই না তাহাদের নাগালের বাহিরে রহিয়াছে; অথচ এই অনুচ্চারিত জ্ঞান-পিপাসাকে তৃপ্ত করিবার বিশেষ কিছু ব্যবস্থাই এ দেশে নাই। সুপণ্ডিত লেখক এই দিকে যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য পুস্তকটি যুক্তাক্ষরবিযুক্ত সহজ সরল ভাষায় আগাগোড়া লিখিত। সহজ অনাড়ম্বর কাহিনীর মধ্য দিয়া লেখাপড়া শেখার উপকারিতা, কৃষিজাত জিনিষ কি ভাবে বেচিলে বেশী পয়সা পাওয়া যায়, মজুরদের সুখ-সুবিধা কিরূপে বাড়ানো যায়, চিঠির কদর প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। জনশিক্ষায় যাঁহারা উৎসাহী তাঁহারা এই পুস্তক প্রচারের দ্বারা তাঁহাদের পরিকল্পনাকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারেন। ডিষ্ট্রীক্ট ও লোকাল বোর্ড, পল্লী পাঠাগার এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় বইখানির সদ্ব্যবহার করিতে পারিবেন।

প্রবেশিকা সঙ্গীত—শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, এম, এল, সি, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ প্রণীত প্রকাশক: শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত, ৫৫নং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা। পৃঃ সংখ্যা ৮৬, দাম দুই টাকা।

বর্ত্তমানে সঙ্গীত শিক্ষার দিকে সাধারণের আগ্রহ বাড়িয়াছে ফলে সঙ্গীত সম্বন্ধে পুস্তকও রচিত হইতেছে। বিশেষ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ দিকে মনোযোগী হওয়ায় সঙ্গীত সাধনার একটি বিজ্ঞানসম্মত ধারার সূত্রপাত হইয়াছে। বর্ত্তমানে সঙ্গীত শাস্ত্র ম্যাট্রিকুলেশন ছাত্রীদের পাঠ্যরূপে ধার্য্য হইয়াছে; ইহার ফলে ছাত্রীরা সঙ্গীত শিক্ষায় অধিকতর উৎসাহী হইয়া উঠিবে। খ্যাতনামা সঙ্গীত-তত্ত্ববিৎ গ্রন্থকার আলোচ্য পুস্তকে ছাত্রীদের উপযোগী করিয়া বিষয়গুলির যে সমাবেশ করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়। ইহাতে রাগ ও রাগিণীর বিবিধ পরিচয় অধিকতর সুস্পষ্ট হইয়াছে। পুস্তকে ধ্রুপদের প্রাধান্য থাকিলেও খেয়াল, ঠুংরী, দাদ্রা, সরগম, রাগ-পরিচয় প্রভৃতিকে উপেক্ষা করা হয় নাই। সঙ্গীততত্ত্ববিদ্ হিসাবে গ্রন্থকারের নাম সুবিখ্যাত, কাজেই সঙ্গীতশিক্ষার্থীদের নিকট যে পুস্তকটির একটি বিশেষ মূল্য আছে তাহা বলাই বাহুল্য।

আত্মবাণী—ঋত্বিক সম্পাদক ও হোমিওপ্যাথ ডাঃ কে, চক্রবর্ত্তী এম্, বি, প্রণীত। প্রকাশক—প্রমথচন্দ্র বাগচী, ২৩।১, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা। পৃঃ সংখ্যা ৫৫, দাম আট আনা।

মানুষের অধ্যাত্মজীবনের পক্ষে নিত্য প্রয়োজনীয় কতকগুলি বিষয় লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। এই আলোচনায় মধ্যে লেখকের দেখিবার সহজ ভঙ্গিটি পাঠককে আকৃষ্ট করিবে। কোন জটিল ধর্ম্ম তত্ত্বের আলোচনা ইহাতে নাই, কেবল মাত্র আমাদের মনের সাধারণ কতকগুলি জিজ্ঞাস্য সমস্যার প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। যথা: নাম, নামের গুণ, নামের নেশা, আদর্শ ও অবলম্বন, কুলগুরু, সকাম, নিষ্কাম, কর্ম্ম, ত্রৈগুণ্য প্রভৃতি বিষয় লইয়া আলোচনা ইহাতে আছে। পুস্তকটি বিশেষ শ্রেণীর পাঠকের নিকট ভাল লাগিবে

মন্ত্রিমণ্ডলের পতন ও উত্থান

বাংলার অভিশপ্ত মন্ত্রিমণ্ডল—তথাকথিত "সুখী পরিবার" অপ্রত্যাশিতভাবে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ও তথায় নূতন মন্ত্রিমণ্ডলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—ইহা বাঙালীর পক্ষে সুসংবাদ, সন্দেহ নাই। যে মন্ত্রিমণ্ডল ইতিপূর্ব্বে সৈয়দ নৌশের আলি, মিঃ সামসুদ্দিন ও শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের পদত্যাগেও ভাঙ্গে নাই, তাহা মিঃ হক ও সারওয়াডি-নাজিমুদ্দিন সংঘর্ষ উপলক্ষ্য করিয়া এমন ভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িবে, তাহা কেহই সহসা ধারণা করিতে পারেন নাই। এই দিক্ দিয়া লীগের ষড়যন্ত্র অঘটনই ঘটাইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দেশবাসীর পক্ষে ইহা অবশ্য শাপে বর স্বরূপ—দীর্ঘ দিনের পর বাঙালী বুঝি একটু স্বস্তিশ্বাস ফেলিবার সুযোগ পাইবে!

লীগপন্থী ৬ জন মুসলমান মন্ত্রী যখন প্রথমে পদত্যাগ করেন, তখন মিঃ হক প্রধান মন্ত্রী বলিয়া স্বয়ং সেই সঙ্গে পদত্যাগ না করিয়া পূর্ব্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিতেন, ইহা সহজেই বুঝা যায়; কিন্তু তিনি এই সহজ পথ গ্রহণ করেন নাই। তিনি স্বীয় প্রভাব সম্বন্ধে এতখানি নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, লীগের চক্রান্ত উদ্ভিন্ন করিয়া অন্যান্য মন্ত্রিগণের সঙ্গেই পদত্যাগ-পত্র দাখিল করেন ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্মিলিত দলের স্বীকৃতির উপরই তাঁহাদের নেতৃরূপে পুনরায় গভর্ণর কর্ত্তৃক নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে আহূত হইয়াছেন। মাননীয় মিঃ হক অতঃপর এ পর্য্যন্ত ২ জন সহমন্ত্রী নির্ব্বাচন করিয়াছেন—তাঁহারা স্বনামধন্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ ও ঢাকার নবাব বাহাদুর। এই নব মন্ত্রিমণ্ডল শীঘ্রই পূর্ণ হইয়া উঠিবে, ইহা আমরা আশা করি।

এই নূতন মন্ত্রিমণ্ডল পূর্ব্ব কোয়ালিশন পার্টির প্রোগ্রেসিভ দল, হিন্দু মহাসভা ও শ্রীযুক্ত বসু চালিত কংগ্রেস পক্ষের সম্পূর্ণ সমর্থন লাভ করিয়া শক্তিশালী হইয়াছে। প্রোগ্রেসিভ দলের স্বমতে দৃঢ়তাই মিঃ হককে

তাই বাঙালীর বিশেষ ধন্যবাদার্হ। মাননীয় গবর্ণর বাহাদুর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অধিনায়ককে আইনতঃ মন্ত্রিত্ব গঠনের আহ্বান দিতে বাধ্য; তিনি তাহাই করিয়াছেন। উপায়ান্তরে তিনি বর্ত্তমান ব্যবস্থা পরিষৎ ভাঙ্গিয়া দিতে পারিতেন, তাহা তিনি করেন নাই। এই জন্য তিনিও ধন্যবাদার্হ। বাঙালী মাত্রেই বাগ্র হৃদয়ে আশা করিয়াছিল যে, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের পার্শ্বে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু আসীন হইয়া, এই মন্ত্রিমণ্ডলের আইন ও শৃঙ্খলার ভার গ্রহণ করিবেন: কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারত গভর্ণমেণ্টের আইন ও শৃঙ্খলাই তাঁহাকে গ্রহণ করিল। অনেকে ইহাও আশা করিতেছিলেন যে, কংগ্রেসের অপর পক্ষও শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে এই জাতীয় গভর্ণমেণ্টে যোগদান করিতে কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি পাইবেন; কিন্তু রাষ্ট্রপতি আবুল কালাম আজাদের সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীযুক্ত রায় যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় যে, এই কংগ্রেস পক্ষ এই গভর্ণমেণ্টে যোগ দিতে পারিবেন না। এই ক্ষেত্রে সিন্ধু প্রদেশের সহিত অবশ্য বাংলার পরিস্থিতি ঠিক তুলনাযোগ্য নহে।

যাহা হউক, নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর চিত্তে বহুদিনের পর যে আশার স্ফূরণ হইয়াছে তাহা সফল হইলে বাংলার বুকের উপর হইতে একটা দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটিয়া যাইবে—বাঙ্গালী বিধিনির্দ্দিষ্ট জাতীয় ব্রত সুসম্পন্ন করার পথে যে শাসনতান্ত্রিক বাধা, তাহা অনেকখানি দূর হইবে। —আমরা এই সমুজ্জ্বল আকৃতি লইয়াই নবীন মন্ত্রিমণ্ডল ও তাঁহার প্রধান পুরোহিতকে সাদর অভিনন্দন জানাইতেছি।

বন্দীমুক্তি

অবশেষে, ভারত সচিব তাঁহার দৃঢ় মত শিথিল করিয়াছেন, ফলে ভারতের বন্দীমোচন পর্ব্ব সুরু হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশে প্রদেশে সত্যাগ্রহী বন্দীদেরও এখনও

বাছিয়া বাছিয়া মুক্তি দেওয়া হইতেছে। সাধারণভাবে সকল রাষ্ট্রবন্দীকে ছাড়া হইতেছে না। ভারতবরেণ্য পণ্ডিত জহরলাল সত্যাগ্রহী না হইলেও, তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কংগ্রেস-রাষ্ট্রপতি আবুল কালাম আজাদ সাহেবও মুক্তি পাইয়াছেন। এইরূপ বন্দীমুক্তির দৃষ্টান্ত গভর্ণমেণ্টের মনোভাবের আন্তরিক পরিবর্ত্তন দুর্লক্ষ্য বলিয়া, ইহাতে দেশের বুকে আশানুরূপ উল্লাস সৃষ্টি করে নাই। মহাত্মা গান্ধী সুস্পষ্টই জানাইয়াছেন—ইহা তাঁহার প্রাণের একটী তন্ত্রীতেও তৃপ্তির সাড়া মিলে নাই।

বৃটিশ শাসনযন্ত্রের যাঁহারা কর্ণধার, তাঁহারা কোন্ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া চলেন তাহা আর অস্পষ্ট নহে। তাঁহাদের উক্তি ও আচরণ তাই অতি স্নিগ্ধ হৃদয় ভারতবাসীকেও তৃপ্তি দেয় না, গান্ধীজীর কথায় ক্ষতের উপর লঙ্কাবাটা ছড়ান মাত্র। এই বন্দীমুক্তি ব্যাপারেও, তাই ইংরাজ ভারতবাসীর মন পাইলেন না। বর্ত্তমান যুদ্ধের সঙ্কটে, বিশেষতঃ জাপানের সমর ঘোষণার পরে, ভারতের বর্দ্ধমান সহানুভূতিকে পক্ষে টানিয়া লইবার যে শুভযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আর একটু অকৃপণ হইলেই ইংরাজ রাজ সম্পূর্ণ সুব্যবহার করিয়া লইতে পারেন—কিন্তু শাসনকর্ত্তৃপক্ষের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি ইহাতে বাধা রোপণই করিতেছে। ভারত ব্যবস্থা পরিষদে মিঃ যোশী শুধু সত্যাগ্রহী বন্দী নহে, সর্ব্বশ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন তাহাতে কর্ণপাত করিলে যে সান্ত্বনা ও সহানুভূতির বৈদ্যুতিক তরঙ্গ উঠিত, তাহা এক মুহূর্ত্তে শুধু ভারতের ভাগ্যগতি নহে, এই বিশ্বসমরের গতিকেও সমধিক মিত্রশক্তির বিজয়মুখী করিয়া তুলিত। ইংরাজ কর্ত্তৃপুরুষগণ এই সন্ধিক্ষণে ন্যায়ানুভূতি লইয়া কার্য্য করিলেই তাঁহারা ভারতের এবং জগতের সমগ্র মানবজাতিরই অসীম কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

অন্যপক্ষে, মহাত্মা গান্ধীজি এবং কংগ্রেসের নেতৃমণ্ডলীকেও আমরা তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী আরও প্রসারিত করিয়া বিশ্বের এই ঘোরতম জীবন-সঙ্কটে বৃটনের সহিত করিতেছে, তাহার নিরাকরণ ও উন্মূলনে সহায়তা করিতে অনুরোধ করি।

অবৈজ্ঞানিক ভারতের বিভীষিকা

বসু বিজ্ঞান মন্দিরে ডাঃ জে, সি, ঘোষ তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণে জড় বিজ্ঞানে অনগ্রসর ভারত যে বিশ্বশান্তি-ভঙ্গের এক গুরুতর কারণ, এই তাৎপর্য্যপূর্ণ অভিমত চিন্তাশীল জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। জগতের হিটলার ও মুসলিনীগণ, সকলেরই লুব্ধ দৃষ্টি ভারতের উপরেই—এই কামধেনুকে কেন্দ্র করিয়াই তাহাদের ঈর্ষ্যা, অসন্তোষ ও উহার শেষ পরিণতি যুদ্ধাভিযান—এ কথা একটু ভাবিলে সকলেই স্বীকার করিবে। এই জন্য ডাঃ ঘোষ এই সময়োচিত নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, ভারতে ব্যাপকভাবে বিজ্ঞানের অনুশীলন প্রবর্ত্তন করিতে হইবে এবং ইহার ব্যবহারিক প্রয়োগে, ভারতবাসীর জীবিকা-নির্ব্বাহের মানদণ্ড উঁচু করিয়া তুলিতে হইবে। ইহা আজ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যুগসমস্যা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং এই যুগ-সমস্যার পূরণই ভারতের সর্ব্বাগ্রগণ্য রাষ্ট্রীয় নীতিস্বরূপ অবলম্বন করিতে হইবে। আমরা ডাঃ ঘোষের এই মত সম্পূর্ণ সমর্থন করি।

ইংরাজ ভারতে না আসিলেও অথবা শাসকরূপে যুগ-শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলেও, ভারতবাসীকে স্বাধীন জাতিরূপে বিজ্ঞানবিদ্যার অনুশীলনে যত্নশীল হইতে হইত, ইহাতে সন্দেহ নাই—কেননা, বিশ্বের কোন উন্নত জাতিই এই যুগ-প্রবাহ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া বাঁচিতে পারে না। বিধাতার বিধানে ভারত ইংরাজের শাসনাধীন হওয়ায়, এই ভার শাসকজাতির কর্ত্তব্যের মধ্যে পড়িয়াছে এবং তাহার জন্য সুযোগ ও ব্যবস্থায় তাই ইংরাজের রাষ্ট্রশক্তিকেই উদ্যত হইতে হইবে। যেমন করিয়া বৃটিশজাতি এদেশে ইংরাজী শিক্ষা সুপ্রচলিত করিয়াছে, তেমনি করিয়াই বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও অনুশীলনের ব্যাপক ব্যবস্থায় ইংরাজকে ভারতবাসীকে সুযোগ দান করিতে হইবে, সহায়তা করিতে হইবে। শুধু বিজ্ঞানের তত্ত্বশিক্ষা নয়, ব্যবহারিক শিক্ষা ও শিল্পক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ—[illegible] দৃষ্টি দিতে হইবে। এই সঙ্গে বিজ্ঞান শিক্ষা

যাহাতে অধিকাংশ পাশ্চাত্য জাতিসমূহের ন্যায় ধর্ম্মনীতি-বর্জ্জিত হইয়া প্রলয়ঙ্করী না হয়, তজ্জন্য ভারতীয় অধ্যাত্ম বিজ্ঞান ও ধর্ম্মনীতির শিক্ষা, দীক্ষা, সাধনার জন্যও আমাদের স্বয়ং ততোধিক মনোযোগী ও উদ্যোগী হইতে হইবে।

কংগ্রেসীদের নূতন সুর

কারামুক্ত জহরলালজী তাঁর মনোভাবের কয়েকটী যোগ্য অভিব্যক্তি ইতিমধ্যেই দিয়াছেন। তাঁহার এই বক্তৃতাগুলি হইতে বুঝা যায়, এই মুক্তিপিপাসু রাষ্ট্র-সাধকের অনির্ব্বাণ মুক্তিপিপাসার সঙ্গে তাঁহার সমস্ত আন্তরিক সহানুভূতি বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষেরই অনুকূলে বহিতেছে; কিন্তু তিনি চাহেন স্বাধীন জাতিরূপে বৃটেনের সহযোগিতা করিতে। শ্রীযুত রাজাগোপালাচারিয়াও কারামুক্তির পর লক্ষ্ণৌতে যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মুখে অহিংসা সম্বন্ধে নূতন সুরই শুনা যায়। শ্রীযুক্ত আচারিয়ার মতে, মহাত্মা গান্ধীজির অহিংসাবাদের সহিত তাঁহার এই মতগত পার্থক্য দীর্ঘ দিন হইতে চলিয়াছে এবং ইহা ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। তিনি অহিংস আদর্শের বাস্তব ক্ষেত্রে নির্ব্বিচার প্রয়োগে আস্থাবান্ নহেন; আদর্শের এইরূপ নির্ব্বিশেষণ প্রয়োগ সম্ভব নহে। ভারতের আত্মরক্ষা ব্যাপারে হিংসা নীতি বর্জ্জন করা যায় না। কংগ্রেস যখন বস্তুতন্ত্র রাষ্ট্রনীতির পূজারী, তখন তাহার দায়িত্বজ্ঞান বজায় রাখিয়া অহিংসা সাধনকে বিশেষণযুক্ত করিয়াই কার্য্যকরী রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত আচারিয়ার এই উক্তি মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় ঐকান্তিক আদর্শবাদী ব্যতীত বোধ হয় আর সকল রাষ্ট্রসাধক ও জাতীয়তার পূজারীই সমর্থন করিবেন।

বার্দ্দোলীর অধিবেশনে কারামুক্ত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সংযুক্ত বিচার ও আলোচনায় আমরা আশা করি, মহাত্মাজীর আদর্শ মোহ কাটাইয়া, এ সম্বন্ধে সুষ্ঠু জাতীয় রাষ্ট্রসাধননীতি ও কর্ম্মপন্থাই অতঃপর স্থিরীকৃত ও গৃহীত হইবে।

ভারতীয় কাগজ ব্যবসায়ে সঙ্কট

সম্প্রতি ভারতীয় মুদ্রণ-শিল্প এক সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে। যুদ্ধের পর হইতেই কাগজের মূল্য ধীরে ধীরে বাড়িতেছিল, এদিকে বাজারে পূর্ব্ব সঞ্চিত বিদেশী কাগজের যে ষ্টক ছিল তাহা ক্রমশঃ নিঃশেষ হইতে লাগিল। ফলে বর্ত্তমান বৎসরের সেপ্টেম্বর মাস হইতেই এদেশের কাগজের বাজারে একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। বর্ত্তমানে দৈনিক সংবাদপত্র মুদ্রণের জন্য যে বিদেশী 'নিউজ প্রিণ্ট' ব্যবহার হয়, তাহা ভারত সরকার কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, ফলে দৈনিক পত্রিকাগুলি কতকটা সুশৃঙ্খলভাবে তাহাদের কাগজের প্রয়োজন মিটাইয়া লইতেছে। কিন্তু বাংলা দেশের সাময়িক পত্রিকাগুলি এই দিক দিয়া একটা অসহায় পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছে। বাজারে কাগজের যে পরিমাণ মজুদ মাল আছে, ব্যবসায়ীগণ তাহা যথেচ্ছা মূল্যে বিক্রয় করিতেছেন এবং বর্দ্ধিত মূল্য দিয়াও তাহা সব সময়ে পাওয়া সম্ভব হইতেছে না। ভারতীয় কাগজ শিল্পের এই সঙ্কটের মধ্যেও বর্ত্তমানে বাংলার টিটাগর পেপার মিলস্ লিঃ যে সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়-নীতির পরিচয় দিতেছেন, তাহা এই সম্পর্কে বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। সম্প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই এই মিলের উৎপাদন শক্তির উপর একটা বিরাট্ চাপ পড়িয়াছে; ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের চাহিদা মিটাইতে মিলের সম্পূর্ণ শক্তি ব্যয় করিতে হইতেছে। ইহা সত্ত্বেও কাগজের মূল্য ও সরবরাহ প্রভৃতি বিষয়ে ইঁহারা যে প্রশংসনীয় ব্যবসায়-নীতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশে কাগজ শিল্প সম্পর্কিত ব্যবসায়ে যাঁহারা নিযুক্ত আছেন তাঁহারা টিটাগর পেপার মিলস্ লিঃ-এর এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলে দূরদৃষ্টির পরিচয় দিবেন বলিয়া মনে করি।

কলিকাতায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

বর্ত্তমানে জাপানের যুদ্ধে যোগদানের ফলে এক গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। এই সম্পর্কে কলিকাতার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা করিতেছেন তাহাতে জনসাধারণের বিশেষ করিয়া যুবক ও ছাত্রগণের যোগদান করা কর্ত্তব্য। এই মহাসমরের গতিবেগ বর্ত্তমানে আমাদের দ্বারপ্রান্তে হানা দিয়াছে। বিমান আক্রমণের প্রতিরোধমূলক যে ব্যবস্থা বর্ত্তমানে কর্ত্তৃপক্ষ করিতেছেন তাহাকে সার্থক করিয়া তুলিয়া আমাদিগকে জাতীয় সংগঠন শক্তির পরিচয় দিতে হইবে। অসামরিক অধিবাসী ও জনসাধারণের গৃহ ও ধনপ্রাণ রক্ষার মধ্য দিয়া এই যে সেবা-প্রচেষ্টা বর্ত্তমান সঙ্কটে তাহার অসাধারণ মূল্য আছে।

ঢাকা দাঙ্গা তদন্ত কমিটির সওয়াল :

আগামী ৫ই জানুয়ারী হইতে কলিকাতায় ঢাকা দাঙ্গা তদন্ত কমিটির সওয়াল জবাব আরম্ভ হইবে। এই তদন্ত সম্পর্কে মোট ২৭৪ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে—তন্মধ্যে হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে ১১৯ জন, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির পক্ষ হইতে ২০ জন, সরকার পক্ষের সাক্ষী হিসাবে ৫৪ জন, মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে ৭৭ জন এবং আদালতের সাক্ষী হিসাবে ৪ জন সাক্ষ্য দিয়াছেন।

কলিকাতা জরুরী এলাকা বলিয়া ঘোষিত :

সম্প্রতি সুদূর প্রাচ্যে যে গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহার ফলে কলিকাতা ও ইহার উপকণ্ঠবর্ত্তী স্থান সমূহ জরুরী এলাকা (Emergency Area) বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। সমস্ত সরকারী অফিস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র রক্ষা সম্পর্কে যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইউনাইটেড প্রেসের একটি সংবাদে প্রকাশ, সহরের হাসপাতালগুলি হইতে শতকরা ২৫ জন রোগীকে মুক্ত করিয়া দিতে এবং জরুরী অবস্থায় যাহাতে হাসপাতালে উপযুক্ত স্থান পাওয়া সম্ভব হয়, সে সম্পর্কে হাসপাতাল কর্ত্তৃপক্ষগণকে বিশেষভাবে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতা গেজেটের একটি অতিরিক্ত সংখ্যায় ঢাকা, বর্দ্ধমান, দার্জ্জিলিং, ময়মনসিংহ, খড়্গপুর, চাঁদপুর, আসানসোল এবং রাণীগঞ্জ প্রভৃতি সহরে আলোক নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি সরকারী আদেশ জারী হইয়াছে।

ভারতের নূতন হাই-কমিশনার :

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার স্যার মহম্মদ আজিজুল হক্, স্যার ফিরোজ খাঁ নূনের স্থানে ভারতের লণ্ডনস্থ হাই কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। স্যার ফিরোজ খাঁ এক্ষণে ভারতের বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য। আগামী মার্চ্চ মাসে স্যার আজিজুল হক্ তাঁহার নূতন কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। ১৯৩৭ সালে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার ও ১৯৩৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন। ১৯৪১ সালে তিনি 'স্যার' উপাধি লাভ করেন। বাংলার কৃষি-জীবন সম্বন্ধে তাঁহার পুস্তক 'দি ম্যান বিহাইন্ড দি প্লাউ' বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলন :

বর্দ্ধমানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনের দশম অধিবেশন বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সম্মেলনের নির্ব্বাচিত সভাপতি স্যার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অভিভাষণের মধ্য দিয়া বাংলার সমসাময়িক ইতিহাসের এক দুর্গতিপূর্ণ চিত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত (Communal Award)

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ও ভেদবুদ্ধির উপর বাংলার রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত—তাহার উপর বর্ত্তমান কংগ্রেসী কর্ত্তৃপক্ষের তোষণ-নীতি এই অসহায় সাম্প্রদায়িক অবস্থাকে অধিকতর জটিল করিয়া তুলিয়াছে। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের বক্তৃতায় ভারতের বর্ত্তমান সমস্যার নানা দিক আলোচিত হইয়াছে ও তাহার যুক্তির মধ্য দিয়া একটী সুচিন্তিত পথের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

আসাম মন্ত্রীমণ্ডলীর পদত্যাগ :

সম্প্রতি আসামের সাদুল্লা মন্ত্রিমণ্ডল পদত্যাগ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ভূতপূর্ব্ব শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুত রোহিণী-কুমার চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি বিরোধী ন্যাশন্যাল কোয়ালিশন পার্টি গঠনের ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি

হইয়াছে তাহার ফলেই মন্ত্রিমণ্ডল পদত্যাগ করেন। মন্ত্রি-মণ্ডলের বিরুদ্ধে একটি অনাস্থা প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে।

পুনরায় লোকগণনার দাবী:

বর্দ্ধমানে বঙ্গীয় হিন্দু-সম্মেলনে বহুবিধ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে বাংলায় পুনরায় লোকগণনার দাবী অন্যতম। উক্ত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, বাংলার সেন্সাস সুপারিন্টেন্ডেন্ট মন্ত্রীদের হস্তক্ষেপ বিমুক্ত হইয়া কাজ করিতে পারেন নাই। বাংলা সরকারের হস্তক্ষেপ বিমুক্ত হইয়া ভারত সরকারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে পুনরায় বাংলার আদমসুমারীর ব্যবস্থা করা হউক।

পরলোকে ডাঃ আশুতোষ দাস:

নীরবকর্ম্মি ডাঃ আশুতোষ দাস মহাশয়ের পরলোক গমনে তাঁহার সহকর্ম্মী সুহৃদ্‌গণের পক্ষ হইতে স্মৃতি-সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি চিরকুমার ছিলেন, তাঁহার গৃহ গ্রামের কর্ম্মীগণের গৃহ ছিল। কর্ম্মজীবনের প্রত্যেকটী মুহূর্ত্ত, অর্জ্জিত প্রত্যেকটী পয়সা, বিদ্যাবুদ্ধি, গবেষণা ও সমবেদনা আশুবাবু অকাতরে ও আনন্দের সহিত পীড়িত, অনাহারে কাতর, বন্যা ও দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোকদিগকে

৺আশুতোষ দাস

দিয়া গিয়াছেন। সুলভ-প্রশংসা ও আত্মপ্রচারের নেপথ্যে এই ধরণের কর্ম্মী পুরুষের সাক্ষাৎ সচরাচর মেলে না। এই সম্পর্কে যে 'আশুতোষ স্মৃতি-সংখ্যা' আমরা পাইয়াছি—তাহা অত্যন্ত সময়োপযোগী হইয়াছে সন্দেহ নাই।

কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের জয়ন্তী:

কলিকাতার কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ জাতির [illegible] বে-সরকারী প্রচেষ্টার ফলে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে এবং ইহার প্রতিষ্ঠার মূলে বাংলার চিকিৎসা-জগতের প্রধানদিগের সেবা ও দান বিশেষ স্মরণীয়। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠানের যে রজত জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহাতে সকলেই আনন্দিত হইবেন। চিকিৎসা বিদ্যার শিক্ষাদান ও সেবাকার্য্যের দ্বারা এই প্রতিষ্ঠান দেশবাসীর হৃদয়ে একটি শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছে। এই উৎসবকে বাঙালী মাত্রেই যে সহানুভূতি ও সহযোগিতা দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করিবেন তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই।

পরলোকে নির্ম্মল বন্দ্যোপাধ্যায়:

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বাংলা চিত্র-জগতের সুপরিচিত হাস্যরসাভিনেতা নির্ম্মলচন্দ্র

৺নির্ম্মল বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১২ই নভেম্বর শিমুলতলায় অকস্মাৎ পরলোকগমন করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে তিনি চিত্রাভিনয়ের মধ্য দিয়া তাঁহার প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। সঙ্গীত রচনায়ও তাঁহার সুনাম ছিল। 'শাশ্বতী' নামক কাব্যগ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি পিতা, স্ত্রী ও তিনটি নাবালিকা কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

ছাত্রদের স্বাস্থ্যের উন্নতি:

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন যে ছাত্রমঙ্গল সমিতি আছে, তাহার ১৯৪০-৪১ সালের কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ যে, ১৯২০ সালের তুলনায় ১৯৪০ সালে ছাত্রদের স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছে। ১৯২০ সালের যে স্থলে শতকরা ৬৬ জন ছাত্র চিকিৎসাধীনে থাকিত, সে স্থলে ১৯৪০ সালে শতকরা ৪৫ জন ছাত্রের চিকিৎসার প্রয়োজন হইয়াছে।

সিম্‌প্লেক্স পারপিচুয়াল ক্যালেণ্ডার :

আমরা গৌহাটির খ্যাতনামা প্রকাশক বি, দত্ত নামক ফার্ম্ম হইতে উপরোক্ত ক্যালেণ্ডার পাইয়াছি। এই ক্যালেণ্ডারের বিশেষত্ব এই যে, ইহার দ্বারা ১৬০১ খৃষ্টাব্দ হইতে ভবিষ্যতের সকল বর্ষের মাস দিন ও তারিখ নির্ভুলভাবে গণনা করা যাইবে। ইহা অভিনব সন্দেহ নাই। কারণ এই ক্যালেণ্ডারের ক্ষুদ্রকায় পরিধির মধ্যে অতীত ও ভবিষ্যতের অনাগত শতাব্দীগুলির পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই ধরণের দিন ও বর্ষপঞ্জীর যে অসাধারণ চাহিদা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বি, দত্ত—গৌহাটী, নং ১০ (ইণ্ডিয়া) এই ঠিকানায় অনুসন্ধান করিলে সবিশেষ জানা যাইবে।

প্রবাসী-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলন :

প্রবাসী-বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের উনবিংশ অধিবেশন আগামী ২৬, ২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর বড়দিনের অবকাশে কাশীধামে অনুষ্ঠিত হইবে। উনিশ বৎসর পূর্ব্বে এই কাশীধামেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পৌরোহিত্যে সম্মেলনের সূচনা হয়। বর্ত্তমান অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়কে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে বরণ করা হইয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতি নিম্নলিখিত বিভাগীয় অধিবেশনের আয়োজন করিয়াছেন। যথা (১) সাহিত্য—সভাপতি শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত (২) দর্শন—ডাঃ শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার (৩) সঙ্গীত—শ্রীধীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (৪) ইতিহাস—ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন (৫) শিল্প—শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় (৬) রবীন্দ্র স্মৃতি-বাসর—শ্রীক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী (৭) মহিলা—শ্রীনিরুপমা দেবী (৮) বিজ্ঞান (৯) বৃহত্তর বঙ্গ ও প্রবাসী বাঙালীর সমস্যা (১০) শিল্প (১১) শিশু ও কিশোর সাহিত্য। বারাণসীর এই অধিবেশনের প্রধান বৈশিষ্ট 'রবীন্দ্র স্মৃতি-বাসর' উদ্‌যাপন। 'উত্তরা' সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে এই বিভাগ পরিচালনার ভার দেওয়া হইয়াছে।

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ সম্মেলন ও প্রদর্শনী :

আগামী ২০শে ডিসেম্বর হইতে ৭ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত কলিকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে নিখিল-বঙ্গ প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ সম্মেলন ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইবার কথা ছিল। কিন্তু যুদ্ধের বর্ত্তমান পরিস্থিতি ও কলিকাতা জরুরী এলাকার অন্তর্গত হওয়ার সম্ভাবনার বিষয় বিবেচনা করিয়া অনুষ্ঠাতৃগণ অনুকূল অবস্থা ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত প্রদর্শনী স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রদর্শনীর কার্য্য ইতিমধ্যে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল।

কলিকাতায় শিক্ষামূলক মিউজিয়ম :

সম্প্রতি মিঃ জে, সি, বসাক মহাশয়ের উদ্যোগে কলিকাতায় একটি শিক্ষামূলক মিউজিয়ম গঠনের যে প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহার প্রতি আমরা সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বর্ত্তমানে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির ব্যর্থতা আজ জাতির জীবনে পরিস্ফুট। মিউজিয়ম বা প্রদর্শনীর মধ্য দিয়া শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা আধুনিক ইউরোপীয় জীবনেও স্বীকৃত হইয়াছে। বর্ত্তমানে গণ-শিক্ষার দিক্ দিয়া এই ধরণের প্রচেষ্টার মূল্য সম্বন্ধে অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে যাঁহারা উৎসাহী, তাঁহারা মিঃ জে, সি, বসাক, ২৬৩ নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতায় অনুসন্ধান করিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

মহিলা-সংবাদ :

শ্রীমতী সুরমা মিত্র শাস্ত্রী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি,এইচ্-ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন। তিনি আশুতোষ কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপিকা। ডাঃ এস, এন, দাশগুপ্ত সি, আই, ই-র অধীনে ইনি গবেষণা করিয়াছিলেন।

* * *

সম্প্রতি সঙ্গীত-ভারতী বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় শ্রীমতী বাসন্তী ব্যানার্জ্জী ও শ্রীমতী আশালতা ব্যানার্জ্জী বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া 'সঙ্গীত-ভারতী' উপাধি লাভ করিয়াছেন। সঙ্গীত সাধনায় ইঁহাদের প্রচেষ্টা আরও সার্থক হইয়া উঠুক ইহাই আমরা কামনা করি।

যুগ্ম সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী
... বি-এ কর্ত্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত

আনমনা
(উড্ কাট্)

ষড়বিংশ বর্ষ
১৩৪৮ সাল

মাঘ

দ্বিতীয় খণ্ড
৪র্থ সংখ্যা

অন্তর-দর্শন

দেহ শ্রীমন্দির। এই দেহের মধ্যে বিরাজ করেন জ্ঞান ও ইচ্ছা—শিব ও দুর্গা। ব্যষ্টিদেহে যেমন, তেমনি সমষ্টি-শরীরেও একই নিয়ম।

শিব জ্ঞানস্বরূপ। দুর্গাই ইচ্ছাশক্তি। উভয়ের মিলন—ইহাই পূর্ণতা।

জ্ঞান ও ইচ্ছার বিরোধ—জীবের নিম্ন-স্বভাব। ইহা অবিদ্যা বা অপরা প্রকৃতি। অসম্পূর্ণ জ্ঞান, অপরিণত ইচ্ছাই তাহার কারণ। পূর্ণ পরিণত জ্ঞান ও ইচ্ছা পরস্পর পূরণ করে। তাহাই বিদ্যা বা পরা প্রকৃতির লক্ষণ।

জ্ঞান আছে—সুপ্ত, ভস্মাবৃত বহ্নির ন্যায় ছায়াচ্ছন্ন। স্বাধ্যায় ও তপস্যার সহায়ে তাহা প্রদীপ্ত হইয়া অন্তরে বাহিরে জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করে। স্বাধ্যায়—শাস্ত্র বা বেদমন্ত্রাদির অভ্যাস। শ্রুতি, স্মৃতি, সদাচার—এই তিনের সশ্রদ্ধ অনুশীলনই জ্ঞানপ্রকাশের অমোঘ উপকরণ।

ইচ্ছাশক্তির পরিশোধন ও পরিস্ফুরণ সংযমের সাধনায়। যাহা কাম, তাহাই শুদ্ধ ও সিদ্ধ হইলে ব্রহ্মবীর্য্যে পরিণত হয়। ইহাই সৃষ্টির দিব্য শক্তি, অমৃত রসায়ণ।

পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ ইচ্ছা—সিদ্ধজীবনেই স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়। শিবশক্তির নিত্যলীলা আত্মদেহে যে প্রত্যক্ষ করে, সেই সিদ্ধ। ব্যষ্টিবিগ্রহের ন্যায় সমষ্টিবিগ্রহেরও এই হরপার্ব্বতীর মিলনলীলা দর্শন করা যায়। অন্তর্দ্দর্শী সাধক-সাধিকা, আত্মজীবনে এই অপার্থিব রূপ সন্দর্শন করিয়া ধন্য হও।

দেহস্থাঃ সর্ব্ববিদ্যাশ্চ দেহস্থাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
দেহস্থাঃ সর্ব্বতীর্থাণি গুরুবাক্যেন লভ্যতে॥

সম্পাদকীয়

ধর্ম্মের সাধন

ভারতের আদর্শবাদই অনুসরণীয়। এই আদর্শ—ধর্ম্ম। সে ধর্ম্ম সনাতন মানবধর্ম্ম। মানব মন ও মানব প্রকৃতির পরিপূর্ণ অনুশীলন এই ধর্ম্মই নির্দ্দেশ করে। যথার্থ ধর্ম্ম জীবনকে পঙ্গু করে না, ব্যর্থ করে না।

ধর্ম্মের বীজ সকল মানুষেরই অন্তরে নিহিত আছে। অনুকূল সাধনায় তাহা পরিস্ফুট হয়, কার্য্যকর হয়। ধর্ম্ম তাই কর্ম্মমূলক। প্রকাশ ও স্থিতি এই কর্ম্মশক্তিকেই সহায়তা করে, সহযোগিতায় পরিপুষ্ট করে।

জ্ঞাতা আত্মা ধর্ম্মকে ইক্ষণ করিলে, অব্যক্ত ধর্ম্ম ক্রিয়া-রূপে উদ্বেলিত হয়, বিকশিত হয়। ইক্ষণই প্রকাশ। যাহা সৎ, তাহার বিকাশই স্থিতি। স্থিতি—ভাব ও বস্তুরূপে অবস্থান। এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় রূপান্তরই ধর্ম্মের ক্রিয়াশক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয়। সত্তের গতিই ক্রিয়ার নিত্য স্বরূপ।

আত্মা যুগপৎ এক ও বহু। প্রত্যেক আত্মা নিজের মধ্যে এক; কিন্তু কার্য্যতঃ বহু। তাই একের সহিত অন্যের সম্বন্ধ স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক সম্বন্ধই প্রেমের আকর্ষণ। শিক্ষা, দীক্ষা ও সাধনার মধ্য দিয়া এই প্রেমের স্বভাবাকর্ষণ বিশুদ্ধ করিয়া তুলিতে হয়। শুদ্ধ প্রেমই আত্মার সিদ্ধ ধর্ম্ম।

আত্মার সহিত আত্মার সম্বন্ধে সমাজের বিকাশ—গোষ্ঠী, সঙ্ঘ ও জাতির উৎপত্তি। স্বরাট্ আত্মাই দিব্য সমাজ সৃজনের অধিকারী। আবার আত্মার বিরাট্ কর্ম্মশক্তিই রাষ্ট্রে, সাম্রাজ্যে রূপ পরিগ্রহ করে।

ভারতের ধর্ম্ম শুধু তথাকথিত দার্শনিক ভাবুকতা নয়। ধর্ম্মকে জীবনে পরিস্ফুট করার জন্যই ভারতের কৃষ্টি ও সদাচার—যাহাকে বর্ত্তমান যুগের পরিভাষায় 'কাল্‌চার' আখ্যা দেওয়া হয়। এই 'কাল্‌চার' শুধু ভাব নয়, ইহা চরিত্রে প্রকাশ পায়। ধর্ম্মনিয়ন্ত্রিত চরিত্রই দিব্য জীবন। [illegible] ধর্ম্মের [illegible] জীবনে ফুটিয়া উঠে। কর্ম্ম, কর্ম্মের দায়িত্ব ও কর্ম্মগত ফল—তিনি[illegible] উৎসর্গ করিয়া কর্ম্মব্রহ্মের সাক্ষাৎকার মিলে। যেমন ক[illegible] ধর্ম্মস্বরূপ, তেমনি ধর্ম্মের সাক্ষাৎ কারক তত্ত্বই ব্রহ্মতত্ত্ব। কর্ম্ম, কর্ম্মফল ও কর্তৃত্বের উৎসর্গ এই ব্রহ্মতত্ত্বে।

প্রথম উৎসর্গ—কর্ম্মফলের। 'যথানিযুক্তোঽস্মি' ম[illegible] যে কর্ম্মের সাধন, তাহাই কর্ম্মযোগের প্রথম পর্ব্ব। ই[illegible] যন্ত্রযোগের সাধনা। ভাল-মন্দ, সুফল-কুফল, সিদ্ধি অসিদ্ধি লক্ষ্য না রাখিয়া, শুধু কর্ত্তব্যবোধে যে ক[illegible] তাহাই ফলার্পণের আসল সঙ্কেত। আমি আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া চলিব—ফল যাহাই ঘটুক, ফলভোক্তা আমি নহি, ভগবান—এই ধারণাই উৎসর্গভাবের সাধন। কর্ম্মযোগীকে নির্ভীকভাবে জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হইবার অনুপ্রেরণা দেয়, তাহাকে বাধায়, বিপদে বিচলিত মুহ্যমান হইতে দেয় না, ব্যর্থতায় অবসাদে তাই সে ভাঙ্গিয়া মুষড়িয়া পড়ে না, কর্ম্মক্ষেত্রে বীরের ন্যায় সাধন করিয়া চলে।

কিন্তু কর্ম্মযোগীর কর্ম্মফলে অধিকার না থাকিলেও, কর্ম্মের দায়িত্ব ও কর্ত্তৃত্ববোধ বেশ অক্ষুণ্ণ থাকে। এই দায়িত্বই কর্ম্মের বন্ধন, কিন্তু ইহাই আবার শক্তির উৎস[illegible] বটে। দায়িত্ব-ভার নিজের উপর না পড়িলে প্রবল কর্ম্মশক্তি উৎসরিত হয় না, কর্ম্মে ঠিক ঠিক গভীরভাবে মন বসে না। দায়িত্বের বন্ধন এড়াইতে হইবে—ইহার অর্থ এ নয় যে, কর্ম্মে যথেচ্ছাচারী হইতে হইবে। যাহা করিব, তাহার দায়িত্বের গুরুত্ব আমারই উপর থাকিবে, কিন্তু তাহা ন্যাসরূপে ন্যস্ত বোধ করিতে হইবে—মূল দায়িত্ব আমার নহে, ভগবানের, আমি তাহার অংশীদার মাত্র। কর্ত্তৃত্বের কেন্দ্র তখন মনের ভিতর হইতে উপরে উঠিয়া, একটা বিরাট্ ও বৃহতের ক্ষেত্রে উপনীত হয়। কর্ম্মশক্তির মূল উৎস থাকে সেইখানেই—সেখান থেকে অবতীর্ণ প্রেরণা অবিরত অন্তরে অনুভব করিয়া আমরা

তখন কর্মপথে বিদ্যুদ্বেগে অগ্রসর হইতে পারি। শুধু কর্মের ফল তাঁহার নহে, কর্মকর্তাও ভগবান্ স্বয়ং—তাঁহারই অনন্ত ইচ্ছাশক্তি আমার সকল কর্মযন্ত্রের বল্গা ধারণ করিয়া তাহাদিগকে যথানির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালনা করিতেছে, আমি বিশ্বকর্ত্রী মহাশক্তিরই কোলে বসিয়া কর্মপ্রেরণার অবধারণ ও কর্মস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছি। ইহাই কর্মযোগের দ্বিতীয় পর্ব্ব—প্রকৃতি-সাধন।

ফলার্পণ ও কর্ত্তৃত্বার্পণের পর, কর্মও উৎসর্গণীয়। তবেই উৎসর্গযজ্ঞের পূর্ণাহুতি সম্পন্ন হয়। কর্মফল তাঁহার; যাহা করিতেছি, তাহার পরিপূর্ণ কর্ত্তৃত্ব ও দায়িত্বও তাঁহারই—আমি দায়িত্বের অংশটুকু অংশীরূপে, সাথীরূপে বহন করিতেছি—ইহা কর্মযোগের শেষ কথা নহে। কর্মটীও হওয়া চাই দিব্য, ভাগবত। তাহাতে না থাকে আমার অহঙ্কারের প্রলেপ, আমিত্বের ছায়ালেশ—এরূপ কর্মের প্রত্যেক অঙ্গই বিরাট্ ব্রহ্মের জীবন-স্পন্দন। ইহাই ব্রহ্ম-কর্ম-সমাধি। ইহা কর্মের লয় নহে, পরন্তু মানসিক কর্মের দিব্য রূপান্তর। ব্রহ্মকর্ম-সমাধিই কর্মযোগের তৃতীয় পর্ব্ব।

ভারতের ধর্মক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে আজ একদল নবীন কর্মযোগীর আবাহন আমরা করিতেছি, যাহারা কর্মফল, কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম, এই ত্রিবিধ উৎসর্গনীতি জীবনে সাধন করিয়া, প্রাচীন ত্রিনাচিকেতঃ অগ্নিহোত্রীদের ন্যায় দীপ্ত দিব্য চরিত্র লইয়া শিক্ষায়, সমাজে, অর্থে, রাষ্ট্রে সর্বক্ষেত্রে ছুটিয়া যাইবে, বহিয়া আনিবে দেশের বুকে অভিনব কর্ম-প্রবাহ। তাহারাই ধর্ম ও অধ্যাত্মভিত্তির উপর ভারতে জাতিনির্মাণের অধিকারী।

সংহতির স্বপ্রতিষ্ঠা

সৃষ্টির মূলে স্রষ্টা। সৃষ্টির নিয়ম আছে, বিজ্ঞান আছে। স্রষ্টা এই নিয়মের অনুসরণে, বিজ্ঞানের আলোকে তাঁহার সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন করেন। ঘটিকাযন্ত্রের নির্মাতা ঘটিকা-নির্মাণ শেষ করিলে পর, যন্ত্র তখন স্বতঃই গতিশীল বা ক্রিয়াশীল হয়। এই পরবর্ত্তী গতি বা ক্রিয়া প্রাকৃতিক নিয়মের বশেই; এখানে স্রষ্টার স্বকীয় হস্তক্ষেপ আর প্রয়োজন হয় না। অচেতন জড়সৃষ্টি কৃত্রিম বস্তু মাত্র; কিন্তু সাধারণ সৃষ্টিনীতির তাহাও সম্পূর্ণ বহির্ভূত নহে। সজীব মানুষের সংহতি বা প্রতিষ্ঠানরচনায় এই মৌলিক সৃষ্টি-বিজ্ঞান আরও পরিস্ফুট পরিণতি প্রাপ্ত হয়।

সংহতি গঠন করেন শক্তিশালী মানুষ বা ব্যক্তি। কিন্তু এই ব্যক্তি সমষ্টি-পুরুষেরই অভিব্যক্তি বা বিগ্রহ বলিলে অত্যুক্তি হয় না—কেননা তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বীজরূপে যে ভাব অভিব্যক্ত হয়, তাহার ভিতরে সমষ্টিরই প্রকাশ নিহিত থাকে। সংহতি বা সঙ্ঘ এই প্রতিষ্ঠাতাকে কেন্দ্র করিয়া শৈশব হইতে যৌবনে পদার্পণ করিলে, তখন তাহার আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়। এই আত্মপ্রতিষ্ঠার অর্থ সাপেক্ষ নেতৃনির্ভরশীল অবস্থা হইতে স্বস্থ, নিরপেক্ষ, আত্মনির্ভরশীল অবস্থায় উপনীতি। সংহতি-সাধনার এই [illegible] প্রতিষ্ঠাতা ও সংহতির বা নেতার জীবনে একটা সম্বন্ধের বিপর্যায় উপস্থিত হইতে পারে। এরূপ বিপর্যায় বা দুর্ঘটনার পরিচয় বহু সংহতির জীবনেতিহাসে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানসিদ্ধ সঙ্ঘের জীবনে এইরূপ বিপর্যায়ের স্থান নাই, প্রয়োজনও নাই।

কোনও সংহতির আত্মস্থ ও সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল অবস্থা সত্যই আসিয়াছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করারও কখনও কখনও প্রয়োজন হইতে পারে। সেরূপ ক্ষেত্রে সংহতির প্রতিষ্ঠাতা সংহতির সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া দূরে অবস্থান করিলেও, ধীরে ধীরে সংহতির জীবনে আত্মশক্তির উপর প্রত্যয় দৃঢ়তর হয়, আত্মনিয়ন্ত্রণের শক্তিও ক্রমশঃ পূর্ণতা লাভ করে। পৌরুষেয় ভাব হইতে অপৌরুষেয় ভাবের আশ্রয় সংহতির মেরুদণ্ডে অপরিমেয় শক্তি দান করে। এই ভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহার ফলে সংহতির দীর্ঘ স্থায়িত্বই অনুসূচিত হয়।

ভারতের জাতীয় কৃষ্টি ও সাধনা এইরূপ অপৌরুষেয় তত্ত্বকে কেন্দ্র করিয়া আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল বলিয়াই তাহার জাতীয় জীবন এমন অসাধারণ দীর্ঘায়ুঃ, এমন কি অবিনশ্বর স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে। এই অপৌরুষেয় তত্ত্বই সনাতন ব্রহ্মভিত্তি। ব্রহ্ম হইতেই এ জাতির জন্ম ও পুষ্টি, ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াই তাহার

ঐতিহাসিক বিবর্ত্তন ও পরিণতি। তাই ভারতের বেদান্ত শাস্ত্র "জন্মাদ্যস্য যতঃ" বলিয়া ব্রহ্মবাদই ঘোষণা করিয়াছে। যে শাস্ত্রের আলোকে এই অপৌরুষেয় ব্রহ্মতত্ত্বের উন্মেষ ও অনুভূতি, সেই শাস্ত্রও স্বয়ং অপৌরুষেয়। "শাস্ত্র-যোনিত্বাৎ"—সূত্রে ব্রহ্মসূত্রকার বেদব্যাস এই অপৌরুষেয় শাস্ত্রবাদও সমকণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন। ভারতের আর্য্য জাতি রাম, কৃষ্ণ, ব্যাস, বশিষ্ঠ প্রমুখ অসংখ্য অসাধারণ মহামানব ও লোকগুরুকে যুগে যুগে নেতৃরূপে পাইয়াও, কোনদিন এই অপৌরুষেয় ব্রহ্মবাদ ও শাস্ত্রবাদ বিস্মৃত হয় নাই—এই অপৌরুষেয় তত্ত্বের আলোকেই তাহার মধ্যে সকল বিশেষ পুরুষকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা স্থান দিয়াছে, তাঁহাদের বিশিষ্ট জীবনের দান ও বাণী সনাতন শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায়ের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া তবেই গ্রহণ করিয়াছে বা বর্জ্জন করিয়াছে। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই—ভারতে বুদ্ধের ন্যায় মহামানবের অভ্যুদয়ে তাঁহার মহামানবত্বে পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা দান করিয়াও বৌদ্ধ-বাদকে শ্রুতিবিরোধী বলিয়া ভারত হইতে বিদায় করি[illegible] দেওয়া হইয়াছে। আবার শ্রীকৃষ্ণ বেদবাদ নিন্দা করিয়া[illegible] আসল অপৌরুষেয় বেদতত্ত্বকে সম্পূর্ণ শিরোধার্য্য করি[illegible] স্বয়ং "বেদান্তকৃৎ বেদবিদেব চাহম্" বলিয়া সগৌরবে আত্মপ্রকাশ করিতে কুণ্ঠা করেন নাই। ভারতের এ[illegible] অপৌরুষেয় বিশেষত্ব সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হইয়াই আমর[illegible] অসংখ্য যুগমানবের অবদান সঞ্চয় করিয়াও জাতীয়তার মৌলিক বেদী সকল ব্যক্তিবাদ হইতে উর্দ্ধে রক্ষা করিতে সচেষ্ট থাকিব। ভারতের শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্রের ভিত্তি শক্তি কোনও মহামানব নহেন, পরন্তু একটী মহাতত্ত্ব—সেই মহাতত্ত্বই "সত্যং ঋতং বৃহৎ"—শাশ্বত, চিন্ময়, অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্ব। উদীয়মান জাতি এই ব্রহ্মবিজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াই অতীতের চেয়েও গৌরবময় আপনার সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনা করিবে। আমরা সেই দিকেই প্রত্যেক জাতীয় কর্ম্মী ও সংহতিসাধকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

জাতীয় শিক্ষা ও অষ্টাদশ বিদ্যা

মহাত্মা গান্ধীজির নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস-দল যেদিন ভারতের শাসনতন্ত্র বরণ করিয়া ১১টী প্রদেশের মধ্যে ৭টী প্রদেশের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেদিন তাঁহাদের শাসনঘটিত কার্য্যের মধ্যে অন্যতম সর্ব্বপ্রধান কার্য্য হইয়াছিল—শিক্ষানীতির আমূল সংস্কার ও নবশিক্ষানীতির প্রবর্ত্তন। এই নব শিক্ষাবিধান ওয়ার্দ্ধার শিক্ষাপরিকল্পনা নামে সুপরিচিত। উক্ত শিক্ষাপরিকল্পনায় মহাত্মাজীর শিক্ষাসম্বন্ধীয় নিজস্ব আদর্শ ও ধারণাগুলিই মূলতঃ গৃহীত হইয়া তাঁহার একান্ত অনুরাগী কয়েক জন শিক্ষাতত্ত্ববিৎ মনীষীর দ্বারা বিস্তারিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। আমরা দেখিতে পাই—এই শিক্ষাপরিকল্পনায় হিন্দী, চরকা ও প্রধানতঃ ব্যবহারিক শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে জোর দিয়া তরুণজাতির মস্তিষ্কগঠনের প্রয়াস হইয়াছিল; কিন্তু তাহার মধ্যে ভারতের সনাতন কৃষ্টি ও সাধনার প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও মর্য্যাদা দেওয়া হয় নাই। এরূপ শিক্ষানীতি ভারতীয় আর্য্যজাতির শিক্ষা-দীক্ষা-সাধনার আদর্শের অনুকূল [illegible] না। তাই বাঙলা তথা বিশেষভাবে গুরুতর সংস্কৃতি ও আদর্শপরায়ণ বাঙালীজাতির কিঞ্চিন্মাত্র শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে নাই। সৌভাগ্যক্রমেই আমরা বলিব—কংগ্রেস শাসনতন্ত্র হইতে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া অপসৃত হওয়ায়, গান্ধীজির শিক্ষাপরিকল্পনা আর রাষ্ট্রশক্তিসহায়ে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে আরোপিত হইতে পারে নাই। ভারতের হিন্দু জাতিকে এক অগ্নিকটাহ হইতে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া দ্বিতীয় জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দিতে হয় নাই। প্রাচীন কৃষ্টি ও সংস্কৃতিনিষ্ঠ ভারত এইরূপে কিঞ্চিৎ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে।

কোনও মহাপুরুষের চরিত্র ও আদর্শ যতই উচ্চ ও মহনীয় হউক, সে মহাপুরুষ সর্ব্বতোভাবে নির্দ্দোষ ও নির্ভুল নহেন বলিয়া ভারতের সংস্কৃতি ও সাধনায় তাঁহার প্রবর্ত্তিত আদর্শবাদকে কখনও গৌণ ছাড়া মুখ্য স্থান দেওয়া হয় নাই। মহাত্মা গৌতম বুদ্ধের আদর্শবাদের ন্যায় মহাত্মা গান্ধীজির আদর্শবাদ যতই দরদী হৃদয়ানুপ্রেরণালিপ্ত হউক, তাহা ভারতের জাতীয় কৃষ্টি ও সাধনার মৌলিক ধারায় খুব গভীরভাবে অভিষিক্ত ও তৎপ্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাপরায়ণ না

হওয়ায়, ভারতের জাতীয় সত্তা উহা আত্মজীবনে পরীক্ষা করিয়া অতীতে যেমন বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছে, তেমনি ভবিষ্যতেও হইবে। ভারতে ইংরাজরাজও রাষ্ট্রশক্তির অধিকার পাইয়া ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন; কিন্তু প্রবলপ্রতাপ ব্রিটিশরাজও প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয় ধর্ম্ম ও সাধনাকে আঘাত করিতে সাহসী হন নাই। ইহাতে তাঁহাদের কথঞ্চিৎ রাজনৈতিক বিচক্ষণতারই পরিচয় পাওয়া যায়। মেকলের শিক্ষানীতির মূলে ভারতে "কালা ইংলিশম্যান" সৃষ্টি করার চেষ্টা ছিল; কিন্তু সে উদ্দেশ্য জাতির উপরিচর বুদ্ধি ও চরিত্রকে খুব ভাসা-ভাসিভাবেই স্পর্শ করিয়াছিল বা করিতে পারিয়াছিল—ভারতের গভীরতর সত্তার ক্ষয়ক্ষতি-সাধনের ইচ্ছা থাকিলেও, তাহা তাহার ক্ষমতার বহির্ভূত ছিল। পক্ষান্তরে ভারতের আসল ক্ষতি সনাতন তত্ত্বে অনাস্থাপরায়ণ প্রতিপত্তিশালী ভারতীয় মনীষী ও নেতৃপুরুষগণের দ্বারা যতটা সম্ভব, এমনটা কোনও বৈদেশিক রাজপুরুষ বা রাজশক্তির দ্বারা সম্ভবপর নহে। এইজন্যই ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে ও শিক্ষাক্ষেত্রে—ভারতবাসীকে স্বজাতীয় পুরুষবাদের সম্বন্ধেই বিশেষভাবে সতর্ক থাকিতে হইবে।

ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে জাতির সনাতন শাস্ত্র ও সংস্কৃতির শিক্ষা, দীক্ষা, সাধনার প্রবর্ত্তন ও প্রচলন কি একান্তই সম্ভব নহে? আমরা তাহা মনে করি না। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের সঙ্ঘগুরু তারস্বরে বিভিন্ন সভাক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষার পুনর্গঠনকল্পে প্রাচীন অষ্টাদশ বিদ্যার পুনঃপ্রচলনের দিক্‌নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছেন। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের নবপ্রতিষ্ঠিত কলেজে মুষ্টিমেয় তরুণকে লইয়া এইরূপ জাতীয় শিক্ষারই ব্যবস্থা ধীরে ধীরে প্রবর্ত্তন করাও হইয়াছে। এই শিক্ষার মূল ভিত্তি কোনও মহাপুরুষের প্রেরণা বা অনুভূতি নহে, কোনও পৌরুষেয় আদর্শবাদ নহে, পরন্তু ভারতের সনাতন শাস্ত্র ও সংস্কৃতিই তাহার মূল অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার বিষয়। শাস্ত্রপ্রবর্ত্তিত বা তদনুমোদিত সদাচারবিধি যুগাবস্থার উপযোগী করিয়া শিক্ষার্থীদের তনু-মন-প্রাণ সংস্কৃত ও সংগঠিত করার নীতিই এখানে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ভারতীয় ভাবধারায় যুগের মস্তিষ্ককে অভিসিঞ্চিত ও পুনর্গঠিত করিতে পারিলে, তবেই এই শিক্ষানীতি যথার্থ সফল হইবে।

অপৌরুষেয় শিক্ষানীতিই জাতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এইজন্য অষ্টাদশ বিদ্যার প্রচলন প্রয়োজনীয়। সে অষ্টাদশ বিদ্যা—

> "অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসান্যায়বিস্তরঃ।
> ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণং চ বিদ্যাস্থেতাশ্চতুর্দ্দশ॥
> আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চেব তে ত্রয়ঃ।
> অর্থশাস্ত্রং চতুর্থং তু বিদ্যাস্বষ্টাদশৈব তু॥
>
> —বায়ুপুরাণ, ৬১ অঃ, ৭৮ ও ৭৯ শ্লোঃ।

শিক্ষাদি ছয় বেদাঙ্গ, চতুর্ব্বেদ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণ—এই চতুর্দ্দশ মূলবিদ্যা এবং তৎসহ চারি উপবেদ অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ, ধনুর্ব্বেদ ও অর্থশাস্ত্র—পূর্ণাঙ্গ জাতীয়জীবনগঠনের জন্য এই সংগঠনমূলক খাঁটি ভারতীয় শিক্ষানীতিই আমাদিগকে যুগানুকূল করিয়া বরণ করিতে হইবে। বাঙালী যদি সত্য জাতীয় গভর্ণমেণ্ট কোনও দিন প্রতিষ্ঠা করিতে পারে, তবে সেদিন তাহার শিক্ষা-সচিবকে সর্ব্বপ্রথমে এই ধারা ধরিয়াই শিক্ষানীতি সুসংস্কৃত ও নবগঠিত করিয়া লইতে হইবে। তৎপূর্ব্বে দীর্ঘদিন ধরিয়া হয়ত জাতির এক দল চিন্তাশীল ও তপস্বী সাধকসঙ্ঘকে আশ্রমে, মন্দিরে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতীয় শিক্ষা-নিকেতনেই এই শিক্ষা, দীক্ষা, সাধনার সূত্রটুকু ধরিয়া নীরব তপস্যার দ্বারা ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হইবে।

জীবন-সঙ্গিনী

শ্রীমতিলাল রায়

৩২

বাহিরের ঘটনা অপ্রিয় হইলে, মানুষ বাহিরকেই দায়ী করে। কিন্তু সর্ব্ব ঘটনার জন্য সেই যে সম্পূর্ণরূপে দায়ী, এ বিষয়ে আমারও সেদিন তেমন প্রত্যয় হয় নাই। শ্রীঅরবিন্দ চাহিতেছিলেন যাহা, তাহার পরিপন্থী ছিল অনেক কিছু; তাহা যে একেবারে অলীক ছিল তাহাও নহে। শ্রীঅরবিন্দের মুখেই অনেক কথা শুনিয়াছিলাম। এই সকল গোপন হস্তের কর্ম্ম তিনি আমলে না আনিয়া যাহা চাহিতেছিলেন, সেই দিকেই ছিল আমার লক্ষ্য; বাধা ছিল আমার অন্তরেরই অবস্থার লক্ষণ। তিনি বলিতেন, "যোগ অনেকে পাইয়াছে, কিন্তু সকলে supermind পায় না। আমি কাজ কর্‌ব supermind নিয়ে। তুমি আমার সর্ব্বপ্রথম চিহ্নিত মানুষ। তোমায় নিখুঁত হতে হবে।" "অন্নোর" এই আকৃতি আমার অন্তরে সৃষ্টির উৎস উছলিয়া তুলিত। অকস্মাৎ এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটিল; বাহ্যতঃ মনে হইল তাহা শ্রীঅরবিন্দের চাওয়া পূরণ করারই সুযোগ, কিন্তু ঠিক তাহার বিপরীত ফল হইল। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ২রা জুলাই আমরা সকলে মধ্যাহ্নভোজনে বসিয়াছি। মাদ্রাজী প্যারিয়ার পশ্চাতে বঙ্গকুললক্ষ্মীর সুনিপুণ হস্ত রন্ধনাদির পারিপাট্য রক্ষা করিত; ভোজনাদি ব্যাপারে তাই চন্দননগর হইতে দূরে আছি বলিয়া মনে হইত না। আমার এক সহযাত্রীর ভোজনপাত্র নিমেষেই শেষ হইল। আমার পাত্রে প্রচুর অন্ন ছিল, আমি তাড়াতাড়ি কিছু অন্ন চিরাচরিত অভ্যাসবশতঃ তাহার পাতে তুলিয়া দিলাম। সহসা পথিকের সম্মুখে বিষধর সর্প ফণা তুলিয়া দাঁড়াইলে সে যেমন সচকিত হয়, আমার অবস্থাও তদ্রূপ হইল। সেইদিন আমার যে তিক্ত অভিজ্ঞতা জন্মিল তাহা ভুলিবার নহে। এই ব্যক্তি আমার পাত্র হইতে তাহার পাত্রে উচ্ছিষ্ট অন্ন তুলিয়া দিয়াছি বলিয়া আমার প্রতি একেবারে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল। আমার খানি হৃদয় দিয়া মায়ের মতই তাহাকে মানুষ করার শুভেচ্ছা চিরদিনই পোষণ করি। আমার পাতের অন্ন শুধু নহে, আমার স্ত্রীর প্রসাদ ভক্ষণ করাও সে এতদিন গর্ব্ব বলিয়াই মনে করিত। আমার আরও দুঃখ হইল যখন সে আমার এই আচরণে অতিশয় ঘৃণার সহিত একপ্রকার অভুক্ত অবস্থায় উঠিয়া দাঁড়াইল। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় আমি বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলাম। অভিমানে অপমানে আমার চক্ষু ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল। হৃষীকেশ কাঞ্জিলালও এই সঙ্গে ভোজনে বসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "মতিদা, কাজটা ভাল কর নাই।"

আমার মুখে ভাষা নাই। আমি তো বুঝাইতে পারিব না, ইহার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমার এই সহযাত্রী মানুষটীকে কি চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। অতীতের ইতিহাস হৃষীদাদা তো জানিতেন না। এই অসম্ভব ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া আমার নয়ন অশ্রুসিক্ত হইল; আর একজন দূরে দাঁড়াইয়া সবিস্ময়ে আমার ব্যথার ভার লাঘব করার জন্য করুণ নয়নে আমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

আমি বুঝিলাম—শ্রীঅরবিন্দের অপরিসীম স্নেহের অধিকারী হইয়া আমার অলক্ষ্যে এমন বিষাক্ত আব্‌হাওয়া সৃষ্ট হইয়াছে, যাহাতে আমার চির সুহৃৎ সহযাত্রীদের সশ্রদ্ধ হৃদয় আমার প্রতি বিরূপ হইয়াছে। আমি ক্ষুণ্ণ মনেই উঠিয়া পড়িলাম।

ইহার পরই অরুণের একখানি টেলিগ্রাম আসিল। তার পূর্ব্বের চারিটী অক্ষর সুস্পষ্ট, পরের অক্ষরটী একেবারেই দুর্ব্বোধ্য। পোষ্ট আফিসে সেই শব্দটীর পাশে একটী তীরচিহ্ন দেওয়া আছে—টেলিগ্রামটী এইখানে উদ্ধৃত করিলাম—"Won't Kakima come strong samslutural* need" বুঝিলাম—চন্দননগর হয় আমায়, নয় তাদের কাকীমাকে চায়। ক্ষুণ্ণ মন অরুণের টেলিগ্রাম পাইয়া কিছু অস্থির হইল। তবুও উত্তরে লিখিলাম—

"টেলিগ্রামের শেষ কথাটা বুঝিলাম না, চুপ করিয়াই রহিলাম। তবে আমার কথা, প্রয়োজন বলে' আর কিছু করা হবে না; এবার থেকে উপবের প্রয়োজন ধরে'ই চলতে হবে। ইহার উপর চাই তোমাদের দিক্ থেকে দিনের মত স্পষ্টতা। নিঃসঙ্কোচে হাঁ বা না, এই দুইয়ের মাঝে যেন কোন সংশয় না থাকে। কাকীমা কেন, আমার যাওয়াও যদি ভিতর থেকে অনুভব কর, আমি এক মুহূর্তে চলে' যাব। আমি নিজের মুক্তি চাহি না; নিজের ব্যক্তিত্বও আমার কাছে তুচ্ছ; যদি তোমাদের প্রয়োজন হয়, আমি নিঃস্ব হয়েই দাঁড়াব। এখানে আমার জীবন নিয়ে যেন একটা 'এক্সপেরিমেণ্ট' হচ্ছে। আমার জীবনের যাচাই আমার অন্তরাত্মা সহ্য করতে চান না! জীবন যদি ঋতময় হয়, তবে সত্যকে আশ্রয় করে' কর্ম্মই আমার সুপথ।"

শ্রীঅরবিন্দের অপার্থিব স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ আমায় যেমন একদিকে প্রবুদ্ধ করিতেছিল, তেমনই অন্য দিকে আমারই সহযাত্রীদের শ্রদ্ধাহীন আচরণ আমায় পীড়িত করিতেছিল। আমি অরুণকে স্পষ্টই সেদিন লিখিয়াছিলাম—"আমার মধ্যে ভগবান যাহা চাহেন, তাহা কোন কারণে বিলম্বিত হয়, ইহা আমার ইচ্ছা নয়। আমি ফিরিতে চাই এবার উলঙ্গ হয়ে। 'অরো'র সহিত আমার যে উলঙ্গ সম্বন্ধ, তার ভিত্তিপরীক্ষার সংশয়দৃষ্টি আমায় পীড়ন করছে। তিনি নিঃসংশয় না হলে, আমি শান্তিহীন।"

"কিন্তু আমি চাই 'অরো'র ছায়াশীতল আশ্রয় নয়: 'অরো'র সহিত আমার সত্য সম্বন্ধের পাকা ভিত্তি। ইহার জন্য পুরাতন সব কিছু ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হোক; সত্য সম্বন্ধের ভিত্তি তাহাতে অটল থাকবে। এ জীবনে অনেক অগ্নি-পরীক্ষা হয়েছে। আমার আত্মা আর তাহাতে রাজী নয়। আমার জীবনই সত্য সার্থক হোক, সে ইচ্ছা আমার নাই। আমার অন্তরবাণী হাঁকিতেছে—সঙ্ঘসৃষ্টির জন্য। সে সঙ্ঘ দু'জন হ'লেও হয়।"

শ্রীঅরবিন্দের সন্নিধানে বসিয়াই কর্ম্মদেবতা নিপুণ হস্তে ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতেছিলেন। তাই ১৯২১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসেই লিখিয়াছি এই অন্তর-বাণী "সঙ্ঘের [illegible] জগতে' বসেছেন তোমাদের কাকীমা। এই দূরে পরীক্ষার কষ্টিপাথরে আমি যাচাই হচ্ছি না, যাচাই হচ্ছে সঙ্ঘ। সেই সঙ্ঘকে আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাদের কাকীমার ভিতরেই। অশেষ শূন্যতার মাঝে তাই দাঁড়িয়ে আছি হৃদয়ের তৃপ্তি নিয়ে। তোমাদের কাকীমার চাই আরও 'ডেভলেপমেণ্ট'। আমি যেন ধীরে ধীরে আমার নব জীবনের এই পুণ্যতীর্থে দাঁড়িয়ে সঙ্ঘাত্মার কাছেই আত্মসমর্পণ করছি।"

এতদিন পরে শ্রীঅরবিন্দ ও আমার মধ্যে কোথায় ভেদ-প্রবাহ বহিতেছিল, তাহা বিচার করিয়া লক্ষ্য করিতেছি। মানুষ নিজের কাছেই কত দুর্জ্ঞেয়—অন্তরে অন্তরে তার কত রূপের ঢেউ, কে তাহার সন্ধান রাখে? পৃথিবীতে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, এই দুইটী প্রধান প্রবৃত্তি। শ্রেয়ঃ আত্মার অভ্যুত্থান আনে; প্রেয়ঃ বন্ধন সৃষ্টি করে। বাল্যকাল হইতে এই সব তত্ত্ব আমি ভাল করিয়াই অধিগত করিয়াছি। প্রেয়ঃ দেয় আসন্ন সুখ, সহজ তৃপ্তি; শ্রেয়ঃ বুকে তপস্যার আগুন জ্বালে, চিত্তের স্বভাব-গতির পথ আগুলিয়া ধরে। অন্তহীন তপস্যাই ছিল আমার জীবনের আশ্রয়। আমার নতি পাওয়ার প্রতীক্ষায় কোথাও প্রকাশ পাইত না। প্রেম ও ঐক্যের বিগ্রহ ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। এই অপার্থিব সম্বন্ধের ক্ষেত্রেই আমার ছিল অকৃত্রিম প্রণতি। শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু চাহিতেছিলেন আমার কর্ম্মসংস্কারকে নির্ব্বিশেষে দূর করিয়া অভিনব জীবনের ভিত্তিতে আমায় তুলিয়া লইতে। উভয়ের হৃদয়বিনিময় আলো-আঁধারে আবর্ত্ত সৃষ্টি করিতেছিল। আমি চাহিতেছিলাম শ্রীঅরবিন্দের নিঃসংশয় স্বীকৃতি আমাদের চির সম্বন্ধের উপর। শ্রীঅরবিন্দ আমার স্বভাব ও স্বধর্ম্ম অনাত্ম ক্ষণস্থায়ী মনে করিয়া আমাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া চাহিতেছিলেন আমার নূতন জন্ম। এই দুইটা প্রবল চাওয়ার সংঘর্ষে আমার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির মধ্যে নানা ঘটনারাজী দেখা দিতেছিল।

সে আর একদিনের ঘটনা। আকাশে ঘন মেঘ জমিয়াছে। টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। পথ পিচ্ছিল। প্রতিদিন প্রভাতে যেমন শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করিয়া বাসায় ফিরি, সেদিনও বাড়ী ফিরিয়াছি। হঠাৎ দেখি—পাদুকা রাখার স্থানে একখানি নূতন 'প্রবর্ত্তকে'র উপর আমার এক সহযাত্রী বন্ধুর চর্ম্মপাদুকা দুইটা রাখা হইয়াছে, আর

তাহারই পার্শ্বে অতি সযত্নে বারীনদার 'বিজলী' পত্রিকাখানি রক্ষিত হইয়াছে। ঘটনা বড় তুচ্ছ। সকল কর্ম্মের পশ্চাতে একই নিয়ন্তা কর্ম্মরত। মানুষ সসীম; তাহার কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি অবিকৃত, বিশুদ্ধ নহে। তাই তার সব কাজই অনিয়মিত ও বিশৃঙ্খল। এই স্বভাবনিয়ত কর্ম্মে দোষ দিব কাহাকে? কিন্তু চেতনার স্তরে ভূমার জ্ঞান উর্দ্ধেই ঝিলিক দিয়া চিত্তে অন্ধকার ঘনাইয়া তুলিল। এই কর্ম্মে মানুষের অন্ধতাই প্রশ্রয় পাইয়াছে; কিন্তু প্রকৃতির এইরূপ বিদ্রূপাত্মক কৌতুক আমি নীরবে মানিয়া লইলাম না। ইহা ব্যতীত 'প্রবর্ত্তক'কে আমি একখানি সাময়িক পত্র মাত্র বলিয়া মনে করিতাম না। ঈশ্বরের বাণী আমার ভিতর দিয়া 'প্রবর্ত্তক' বহন করিত। ইহাই ছিল আমার বিশ্বাস। আমার এই অনুভূতি সমর্থিত হইয়াছিল শ্রীঅরবিন্দের কথায়। তিনি নিঃসংশয়ে জানাইয়াছিলেন —ঈশ্বরের বাণী আমার ভিতর দিয়া তিনি প্রকাশ করিতেছেন। এই পবিত্র 'প্রবর্ত্তকে'র বুকে পাদুকারক্ষার অভিসন্ধি আমাকে ও আমার অনুভূতিকে হেয় করা ছাড়া আর কিছু নয়। তাহা বুঝিয়াই আমি সক্রোধে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলাম। হৃষীদা আমায় প্রবোধ দিলেন—ইহা আমার সহযাত্রীর ইচ্ছাকৃত ত্রুটি নহে, পরন্তু একটা আকস্মিক ব্যাপার, এইরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। এই ঘটনা লইয়া আমার ভাবপ্রবণতাকে দায়ী করিয়া আমার প্রতি শ্রীঅরবিন্দের উচ্চ ধারণা নির্ভুল নহে, এইরূপ একটা অভিসন্ধিমূলক আবহাওয়ার অনুভূতি আমায় অতিষ্ঠ করিল, আমার যেন শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হইল। মানুষের অন্তরতম সত্য আহত হইলে সে ক্ষেত্রে তাহার পাথরের ন্যায় সহনশীলতার প্রশংসা অনেকের নিকট গৌরবের বস্তু হইলেও, আমার প্রকৃতিতে এইরূপ সহিষ্ণুতা প্রশংসার বস্তু বলিয়া মনে হইত না, বরং কাপুরুষতা বলিয়া এইরূপ চরিত্র আমার নিকট ঘৃণ্য বলিয়াই উপেক্ষিত হইত। সত্ত্বগুণ শান্ত-স্তব্ধ-মৌন মূর্ত্তির মধ্যেই অভিব্যক্ত—এই ধারণা লোকের মনে দৃঢ়মূল থাকিতে পারে। আমি কিন্তু অনুভব করিতাম—রাজসিকতা যদি হয় অহঙ্কার-দীপ্ত অগ্নিশিখা, সত্ত্বগুণ ঈশ্বরেচ্ছার [illegible]

পরাজিত জাতির ললাটে ঘোরতর তামসিকতার উপর সাত্ত্বিকতার আরোপ মাত্র। আমি এইরূপ হীনতার প্রতিকারকল্পে সেদিন আর অন্ন-জল গ্রহণ করিলাম না।

ঘটনা অনেক দূর গড়াইল। ইহা লইয়া শ্রীঅরবিন্দের নিকট নানা প্রকার আলোচনা সুরু হইল। তাঁর শান্ত সমাহিত জীবনে আমি যেন উপদ্রবের ন্যায় অনর্থসৃষ্টির হেতুস্বরূপ হইলাম। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের নিকট আমি ন্যায়বিচার পাইলাম। সকলেই বলিলেন, আমি এই ঘটনাকে যেরূপ গুরুতর করিয়া লইয়াছি, প্রকৃত পক্ষে উহা সেরূপ নহে। একটা আকস্মিক ব্যাপার লইয়া আমার মত লোকের এতটা ধৈর্য্যহীন হওয়া সঙ্গত নহে। এইরূপ মতবাদের প্রতিপক্ষে আমার ক্ষীণকণ্ঠ আদৌ কার্য্যকরী হইত না, যদি শ্রীঅরবিন্দ আমার পক্ষ সমর্থন না করিতেন। তিনি বিস্ফারিত নেত্রে স্থিরকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিলেন—"ব্যাপার আকস্মিক বটে; কিন্তু ইহা যে একটী ঘটনা, তাহা অস্বীকার করা যায় না—It is an accident, তবুও ইহাকে একটী incident বলিয়া লইতে হইবে।"

শ্রীঅরবিন্দের অন্তহীন করুণা এবারও আমার ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে শীতল প্রলেপ মাখাইয়া দিল। তিনি আমায় একান্তে ডাকিয়া লইয়া, আমার স্কন্ধের উপর দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া বলিলেন, "তুমি তোমার ঐ দুটী সহযাত্রীকে চন্দননগর পাঠাইয়া দাও।" তাঁহার মুখে এই অপ্রত্যাশিত কথা শুনিয়া একটু বিচলিত হইলাম। তিনি যে এই ঘটনা এতখানি দরদের সহিত গ্রহণ করিবেন, তাহা আমি কল্পনাও করিতে পারি নাই। আমি সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম "ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে? আমিই বা তাহাদিগকে এমন নিষ্ঠুর কথা কি করিয়া বলিব?" শ্রীঅরবিন্দ বলিলেন "সে ভাবনা তোমার নয়, আমিই এ কথা তাহাদের বলিব।" তিনি ঠিক তাহাই করিলেন। তিনি আমার এই সহযাত্রী দুইটীকে ডাকিয়া বলিলেন "তোমরা চন্দননগরে ফিরিয়া যাও। তোমরা যে supermind চাও, সে চন্দননগরেও হবে। কেননা আমি এমন লোক দেখেছি, যে কখনও আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেনি; সে এখানে এতদিন যারা আছে, তাদের

...য়ে ঢের এগিয়ে গেছে। চাই absolute and sincere desire, surrender of ego and patience :—এই তিনটী condition রেখে চল, সব হবে। বরং সেখানে গিয়ে অরুণকে সাহায্য কর।" সেদিন ছিল ৮ই জুলাই ; একজন ১৫ই জুলাই প্রত্যাবর্ত্তনের দিন স্থির করিল। আর একজন সেই মুহূর্ত্তেই প্রস্থানোদ্যত হইল। ইহার মধ্যে আবার কথা উঠিল এই সঙ্গে আমার স্ত্রীকে পাঠাইয়া দেওয়ার। বারীনদার মুখে শুনিলাম—তিনি (শ্রীঅরবিন্দ) নাকি আমাকে এখনও তিন মাস রাখিবেন। কথাটা বেশ পাকা রকমেই আমার কাণে আসিয়া পৌঁছিল। আমার স্ত্রীও ইহা শুনিলেন। আমারও মনে হইল—শ্রীঅরবিন্দের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইলে, এখানে আমার নিঃসঙ্গ অবস্থা শ্রেয়ঃ। আমিও তাঁহাকে ইহাদের সহিত যাইতে বলিলাম। কিন্তু তাঁহার যাওয়ার কথা পাড়িতেই হৃদয় মুষড়িয়া আমার চক্ষে জল আসিল। তিনিও কাঁদিয়া সারা হইলেন। সে এক অপূর্ব্ব মনোবিকার ; উভয়ের মধ্যে আসন্ন বিচ্ছেদ-কল্পনায় আমরা এক রাত্রি কাঁদিয়াই কাটাইলাম। কিন্তু তৎপর দিন শ্রীঅরবিন্দের নিকট গিয়া আমাদের ভুল ভাঙ্গিল। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার বন্ধুরা ১৫ই জুলাই চন্দননগর যাইতেছে, আমার স্ত্রীকে কি ঐ সঙ্গে পাঠাইয়া দিব ?" তিনি সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এ কথা তোমায় কে বলিল ?" আমি যেন একটু আশ্বস্ত হইয়া বলিলাম "চারিদিক্ হইতেই শুনিতেছি ইনি সঙ্গে থাকায়, আমার সাধনার বড় ক্ষতি হইতেছে, তাই—"

তিনি আর আমায় কথা বলিতে দিলেন না। ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "তোমার যোগের সহায় যদি কেউ থাকে, সে তোমার স্ত্রী। উনি তোমার যোগের বাধা নহেন ; পরন্তু তোমার সিদ্ধি আসন্ন করিতেছেন।"

আমাদের উঠিবার সময় হইয়াছিল, শ্রীঅরবিন্দ এক প্রকার অভিনবভাবে দন্তে দন্ত দিয়া ওষ্ঠপুট কম্পিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রদীপ্ত মুখমণ্ডলে প্রসন্নতার চন্দ্রজ্যোতিঃ উছলিয়া উঠিতেছিল। তিনি ধীর পদবিক্ষেপে শয়নকক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। আমরা দু'জনেই ... তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিলাম। মনে হইল—প্রচণ্ড প্রাণপুরুষ আমার মধ্যে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে। শ্রীঅরবিন্দ যেন এই প্রাণপুরুষকে নিয়ত কশাঘাত করিতেছেন। বাহিরে তাহার তাণ্ডবনৃত্য কারণে-অকারণে নানাপ্রকারে দেখা দিতেছে মাত্র। তিনি তাঁর শয়নকক্ষের সম্মুখে একটা ক্ষুদ্র গৃহ-বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমার মস্তকে হস্তার্পণ করিলেন। আমার মনে হইল—যে প্রচণ্ড প্রাণশক্তি আমায় সতত কর্ম্মোন্মত্ত করে, সে যেন তাঁহার ঐন্দ্রজালিক হস্তস্পর্শে দ্রবণীয় ধারারূপে আমায় অভিষিক্ত করিতেছে। আমি যেন নিদাঘ-দগ্ধ কলেবর লইয়া সুশীতল ভাগীরথীজলে অবগাহিত হইতেছি। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া অভিমান-বিজড়িত কণ্ঠে বলিলাম, "আপনার ইচ্ছা ষোল আনা পূর্ণ করার আকাঙ্ক্ষায় আমি উন্মাদ হয়ে আছি ; কিন্তু এবার আপনি আমায় এই বাড়ীর আব্ হাওয়ায় রাখেন নি, সাধন তাই পদে পদে বাধা পাচ্ছে।" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তুমি ভুল বুঝেছ। এ'বাড়ীর 'atmosphere' খুব খারাপ যাচ্ছে। খুব 'fight' করছি, দেখি কি হয় ? তোমার না হলে এবার আর ছাড়ব না।"

জুলাই মাস সচ্ছন্দে শেষ হইল। শ্রীঅরবিন্দ আমার অন্তরে বাহিরে শান্তিস্থাপন করিয়া সাধনার সুবিধা করিয়া দিলেন। পণ্ডিচারীতে এই সময়ে ধ্যানের যুগ চলিয়াছে। পাশের ঘরে হৃষীদা কাপড় আড়াল দিয়া দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া সারাদিনই বসিয়া থাকেন। অবকাশ পাইলে সাধন-প্রসঙ্গ লইয়া বেশ আলোচনা চলে। বাল্যকাল হইতে নানাপ্রকার সাধনভজনের ভিতর দিয়া অনেক বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, এই সকল আমার কাছে নূতন ছিল না। এই সকলের ভিতর দিয়া মানুষ একপ্রকার অসাধারণ চরিত্র লাভ করিতে পারে, পরন্তু আপনার মধ্যে ঈশ্বরকে সন্দর্শন করিয়া তাঁহার ইচ্ছানুগত জীবন-যন্ত্র নিয়ন্ত্রিত করার সুপথ এই সবে সর্ব্বত্র মিলে না ; এইজন্য শ্রীঅরবিন্দের আত্মসমর্পণযোগই আমি শ্রেয়ঃ করিয়াছিলাম। হঠযোগের নেতি-ধৌতি হইতে আরম্ভ করিয়া দীর্ঘক্ষণ কুম্ভকে থাকা পূর্ব্বেই আমার আয়ত্তে আসিয়াছিল। ত্রাটক-সাধনায় দৃষ্টি স্থির রাখিয়া চিত্তের বিচিত্র

বর্ণ আমার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। রক্ত, পীত প্রভৃতি বর্ণ অতিক্রম করিয়া আমার চক্ষে নীল নীরদ-কান্তির মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল প্রকাশিত হইত। আবাল্য প্রতিমাপূজা হইতে হঠযোগাদি তন্ত্র, সহজিয়া, আউল, বাউল, এমন কি সতীমা সম্প্রদায়ের সাধনার সমাপ্তির পর শ্রীঅরবিন্দের আগমন হয় আমার সাধন-মন্দিরে। কুলগুরু দিয়াছিলেন শ্রী-সাধনার অমোঘ মন্ত্রবীর্য্য, ভোগ ও অধিকার ছিল আমার সিদ্ধ বস্তু। শ্রীঅরবিন্দ অযাচিত দানরূপে দিয়াছিলেন জ্ঞান-শক্তি-প্রেমের মন্ত্র। অতীত বলিতে আমার কিছুই ছিল না—সাধনও নয়, সম্ভোগও নয়; কায়ার সহিত ছায়ার ন্যায় পত্নী ছিলেন শুধু অপরিত্যাজ্য সঙ্গিনীরূপে। পণ্ডিচারী আসিয়া ব্রহ্মকর্ম্ম অর্থাৎ মৎকর্ম্মকৃৎ—গীতার এই বাণী সফল করার জন্য, হৃদয় হাহাকার করিলেও, স্ত্রী ত্যাগ করিতে আমার কুণ্ঠা ছিল না। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ তাহাও করিতে দেন নাই। আমার সাধনার কিছু গর্ব্ব ছিল। সেই গর্ব্বের অনুরঞ্জন-লিপ্ত দৃষ্টি দিয়া এখানকার সাধনকে আমি অভিনব বলিয়া মনে করিতাম না। ইষ্ট ছিলেন আমার শ্রীঅরবিন্দ। তাঁর ভিতর দিয়া আমার মধ্যে যে সকল চেতনা বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশ হইতেছিল, তাহারই সমর্থন পাওয়ার প্রতীক্ষায় তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া থাকাই আমার ছিল পণ্ডিচারীর সাধনা। আমার অধ্যাত্মদর্শনাদির কথা ব্যক্ত করিতে গিয়া অন্য সকলের নিকট বহুবার হাস্যাস্পদ হইয়াছি, সেই সকল কথা কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতাম না। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দকে সব কথা বলিতাম, তিনি সব শুনিতেন ও আনন্দ প্রকাশ করিতেন। এই অবস্থায় আগষ্ট মাসের ৩রা তারিখ আসিয়া হাজির হইল। ১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দের উৎসব। প্রকৃতির অভাবনীয় প্রতারণা। অন্তরে প্রেরণা জাগিল—এবার ১৫ই আগষ্টের উৎসব সম্পন্ন করার ভার আমিই গ্রহণ করিব। চন্দননগরে ১৯১১ খৃষ্টাব্দ হইতে এই উৎসব আমার ভিতর দিয়া শ্রীভগবান সুরু করিয়াছিলেন। স্বামি-স্ত্রী একত্র একচিত্তে উৎসবের পরিকল্পনা স্থির করিয়া লইলাম। শ্রীঅরবিন্দ অতি আনন্দের সহিত এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। এই কর্ম্মে কিছু অর্থব্যয় হইবে, এই হেতু 'standard bearer'-এ বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য মাদ্রাজের গণেশ পাবলিশিং এর নিকট অনেক টাকা পাওনা ছিল। মাষ্টার গণেশকে পত্র লিখিতে তিনি তাহা পাঠাইয়া দিলেন। উৎসবের আনন্দে উদ্বুদ্ধ প্রাণ আবার এক আকস্মিক ঘটনায় স্তম্ভিত হইল। আমার সাধের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া চুরমার হইল।

আগষ্ট মাসের ছয় কি সাত তারিখে সান্ধ্য-ভোজনের পর আমরা দুই জনে উৎসবপরিকল্পনা লইয়া আলোচনা করিতেছি। কথায় কথায় সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া শয়নের ব্যবস্থা করিব, এমন সময়ে শ্রীঅরবিন্দের বাড়ী হইতে একজন সংবাদ লইয়া আসিল—কোন এক সন্ন্যাসী শিষ্যগণসহ আমার অন্বেষণ করিতেছেন। বাড়ীর দিকে যাত্রা করিলাম।

সত্যই এক জটাজুটধারী, উন্নতকায়, গৈরিকবসন-পরিহিত সন্ন্যাসীর সহিত কয়েক জন মাদ্রাজী তরুণ শ্রীঅরবিন্দের বাড়ীতে বসিয়া আছেন; সন্ন্যাসী আমাকে দেখিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। একজন শিষ্য আমায় বলিলেন, "ইনি হিমালয় হইতে কিছুদিন আমাদের নিকট আসিয়াছেন। আপনি পণ্ডিচারী আসিয়াছেন শুনিয়া ইনি আপনার সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করায়, আমরা সকলে মিলিয়া আসিয়াছি।"

আমি সন্ন্যাসীর দিকে সবিস্ময়ে চাহিতেই জটাজুট-মণ্ডিত, শ্মশ্রুগুম্ফপরিবেষ্টিত সন্ন্যাসী ঠাকুরকে চিনিয়া ফেলিলাম। বন্ধুকে এমন বেশে এইরূপ ক্ষেত্রে দেখিব তাহা ধারণায় ছিল না; চক্ষের ইঙ্গিতে দুইজনের পরিচয় হইয়া গেল। দীর্ঘ দিনের পর সুহৃৎ-সম্মিলনে আমার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। আমার পরিধানে ফরাসডাঙ্গার কালাপেড়ে ধুতি, গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী, সিল্কের চাদর, পায়ে দামী ঝকঝকে এলবার্ট শু, অঙ্গুলীতে হীরকাঙ্গুরীয়, গলায় সোণার বোতাম, হাতে সোণার রিষ্ট্ ওয়াচ, আর সম্মুখে সন্ন্যাসী জটাজুটধারী, ললাট ভস্মাচ্ছাদিত, রুক্ষ শ্মশ্রুগুম্ফ। তাঁহার শিষ্যেরা মনে করিয়াছিলেন—এই মহাপুরুষের চরণে আমি প্রণত হইয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিব। কিন্তু আমি স্থান-কাল-বিচার হারাইয়া সন্ন্যাসীকে বুকে জড়াইয়া ধরিলাম এবং তাহাকে হিড়-হিড় করিয়া

নিয়া দ্বিতলে শ্রীঅরবিন্দের নিকট লইয়া চলিলাম। শিষ্যগণও আমাদের অনুসরণ করার উদ্যোগ করিতেছিল। আমার এই আচরণ দেখিয়া তাহাদের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সন্ন্যাসী ঠাকুর তাহাদের নিষেধ করায়, তাহারা সেইখানেই বসিয়া রহিল। ঘটনা এক নিমেষে হইয়া গেল। নীচের তলায় যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা নিজ নিজ গৃহে গভীর ধ্যানমগ্ন। আমি উপরে উঠিয়া দেখিলাম—অপরাহ্নের হাস্যমুখরিত সুপ্রশস্ত বারান্দাটী স্বপ্নপুরীর ন্যায় শান্ত, স্তব্ধ। রাজপথের বিদ্যুতালোক আঁকিয়া-বাঁকিয়া দেওয়ালে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নীলাকাশে স্তব্ধ নক্ষত্র-রাজী আমার ভাবপ্রবণ হৃদয়ের অনিয়মিত উচ্ছ্বাসে আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় যেন স্তব্ধ, বিমূঢ়। আমি একেবারে শ্রীঅরবিন্দের ঘরের দরজায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমার স্ত্রীও আসিয়াছিলেন। দ্বার রুদ্ধ। আমি ধীরে ধীরে দ্বারে করাঘাত করিলাম। উল্লাস-মদিরামত্ত ধৈর্য্যহীন হৃদয় বর্ত্তমান পরিস্থিতির মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া আমায় শ্রীঅরবিন্দের দরজায় আঘাতের পর আঘাত দিতে উত্তেজিত করিল। সহসা বিদ্যুতালোকে চারিদিক্ উদ্ভাসিত হইয়া, বিদ্যুল্লতার ন্যায় মীরা দেবী ঘর হইতে ঝটিকার ন্যায় নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। নিদ্রালস নয়নে শ্রীঅরবিন্দের প্রশান্ত মূর্ত্তি সম্মুখে আবির্ভূত হইল। আমার প্রগল্ভ আচরণের বিরুদ্ধে তাঁহার ললাটে ত্রিবলী চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সন্ন্যাসী মস্তক অবনত করিয়া তাঁহার চরণধূলি লইলেন। আমি একান্ত অপরাধীর ন্যায় শ্রীঅরবিন্দের অনুসরণ করিয়া বারান্দায় আসিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলাম। এতক্ষণ আমি যেন স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, সে ঘোর যেন ভাঙ্গিয়া গেল। আমার উদ্বেগপূর্ণ মনের অন্তরে অন্তরে মুণ্ডপাত করিয়া, শ্রীঅরবিন্দের গম্ভীর ও বিরক্তিপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া ভয়ে ভয়ে বলিলাম, "হঠাৎ গেব্রিয়েলকে দেখিয়া আপনার সহিত ইহার সাক্ষাতের জন্য আমি এই শান্তিপূর্ণ ধ্যানপূর্ণ আবহাওয়া নষ্ট করিয়াছি।" শ্রীঅরবিন্দের মুখে ম্লান হাসি দেখা দিল। তিনি গেব্রিয়েলের অপূর্ব্ব বেশ দেখিয়া এইবার স্বভাবোদার হাস্যে বলিলেন—"অদ্ভুত সেজেছ।"

এই গেব্রিয়েল আমাদের চিরপ্রিয় শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। অমরেন্দ্রনাথ আমার চির সুহৃৎ। শ্রীঅরবিন্দের অনুগত সে যুগের এক প্রধান কর্ম্মী। শ্রীঅরবিন্দকে গোপনে পণ্ডিচারী পাঠাইবার সময়ে উত্তরপাড়া হইতে অমরেন্দ্রনাথ এই কার্য্যে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সময়ে ফেরারী সংশয়-ভাজন রাজনীতিকদের মুক্তির ভার আমিই গ্রহণ করিয়াছিলাম। গোয়েন্দা পুলিসের সংবাদে গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছিলেন, আমিই ইহাদের লুকাইয়া রাখিয়াছি, গভর্ণমেণ্ট সুবিধা দেওয়ায় তাহাদের একে একে বাহির করিয়া দিতেছি। কথাটা কিন্তু সত্য ছিল না। চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া ইহারা আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। আমি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া ইঁহাদিগকে সংগ্রহ করিতেছিলাম। অমরেন্দ্রনাথকে এই দূর প্রবাসে এমন বেশে দেখা পাইব, তাহা কল্পনাও করি নাই। অকস্মাৎ অমরেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পাইয়া আনন্দে আমার চিত্ত বিহ্বল হইয়াছিল। হৃদয়টার এইরূপ ভাবপ্রমত্ততার জন্য আমি নিজেও অনেক ক্ষেত্রে অপদস্থ হইয়াছি, অনেককে এই জন্য বিব্রতও হইতে হইয়াছে। আজ তার চরম হইল।

শ্রীঅরবিন্দ স্থির প্রশান্ত এবং অবিচলিত চিত্তে অমরেন্দ্রের সংবাদাদি লইয়া আমায় আদেশ করিলেন—এই অবস্থায় এখানে অমরেন্দ্রকে রাখা ঠিক হইবে না। আমি এই রাত্রির জন্য ইঁহাকে আমার নিকট রাখিতে পারি কিনা, জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন "একই কথা, এ কথা প্রকাশ হইলে উভয় পক্ষেরই ক্ষতি হইবে।" উপর হইতে নামিবার সময়ে অমরেন্দ্রনাথ আমায় বলিলেন, "তুমি চিরদিন ছেলেমানুষই রইলে। আমি তোমার সঙ্গে একবার দেখা করে' চলে যাব ভেবেছিলুম। হঠাৎ অরবিন্দকে বিরক্ত করা ঠিক হয়নি!"

আমি ঘটনার গুরুত্ব অনুভব করি নাই। দরদীর মতই বলিলাম "আজ রাত্রে থাক্‌বে কোথায়?"

"কেন ছত্র নেই? কাল সকালেই চলে যাব'। কাঙালোরে আশ্রম বেঁধেছি যে।"

সে অনেক অবান্তর কথা—এই ক্ষেত্রে তাহা উল্লেখ-যোগ্য নহে। শ্রীঅমরেন্দ্রকে বিদায় দিলাম। কথা রহিল,

চন্দননগরে ফিরিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিব। তারপর চন্দননগরে আসিলে তাঁহার মুক্তির ব্যবস্থা হইবে।

পরদিন পণ্ডিচারীর আব্‌হাওয়া আমার প্রীতিকর মনে হইল না। গত রাত্রির ঘটনা লইয়া স্পষ্টতঃ কাহারও মুখে কোন কথা শুনা গেল না বটে, কিন্তু অলক্ষিতে এই বিষয় লইয়া অনেক আলোচনা হইল। একটা গেঁয়ো লোকের ন্যায় পূর্ব্ব রাত্রির অমার্জ্জিত আচরণ সকলের নিকট বিসদৃশ হইয়াছিল; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দকে আমি অপ্রসন্ন দেখিলাম না। তিনি আমার বন্ধুবাৎসল্যের আতিশয্যে অসামঞ্জস্য-চিত্তের পরিচয় মাত্র পাইয়াছিলেন; কিন্তু সেই পরিচয়ই আমার জীবনের সবখানি নয়, তিনি যে আমায় নবজীবন দিতেই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। বিশ্বকর্ম্মার অসম্পূর্ণ সৃষ্টিকে কি সম্পূর্ণ না করা পর্য্যন্ত তিনি তাহা অবহেলা করিতে পারেন?

শ্রীঅরবিন্দের অমোঘ ইচ্ছাশক্তি জয়যুক্ত হইল না, এমন বলিলে ঋতময় ইষ্টের প্রতি শ্রদ্ধাভঙ্গ হয়। এই ভয়েই আমি যে বিষয়টা সাপ্‌টাইয়া লইতেছি তাহা নহে; সত্য শুধু অনুমানের বস্তু নহে, তাহা জীবনের দৃষ্টান্তে পরিলক্ষিত হয়। কালই তাহা সপ্রমাণ করিতে পারে, সে কথা আজ নয়।

ঈশ্বরের চাওয়া ব্যর্থ হয় না, কোন কারণে, কোন ঘটনায়। ঈশ্বরের চাওয়া পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে যে ভাবে প্রকাশ পায়, তাহার অর্থবাদের এক অলক্ষ্য অভিধান আছে। বাহ্যতঃ শ্রীঅরবিন্দের প্রচেষ্টা ব্যাহত করার বজ্রপাত হইল চন্দননগরের এক টেলিগ্রামে। হঠাৎ আগষ্টের ৯ই তারিখে শ্রীমান্ অরুণচন্দ্র এক টেলিগ্রাম করিয়া বসিল "সম্মুখে ১৫ই আগষ্ট, শীঘ্র চলিয়া আসুন, আপনার সাফল্য এইখানেই।"

টেলিগ্রাম পড়িয়া হাসিলাম। এ টেলিগ্রাম কি অরুণের? না ইহার পশ্চাতে ভাবী প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের অনুপ্রেরণা আছে? আমার বিচারের প্রয়োজন ছিল না; যাহা হয়, তাহার জন্য ঈশ্বরবিধানই দায়ী। বিধাতৃপুরুষ এখানে জাগ্রত মূর্ত্তিমান্। শ্রীঅরবিন্দকে টেলিগ্রামটী দেখাইলাম। টেলিগ্রামটী হাতে লইয়া তিনি দেখিতে-ছিলেন। এলোমেলো বাতাসে তাঁহার বিলোল লঘু দীর্ঘ কেশ বাম হস্তে কর্ণের পার্শ্বদেশে ঠেলিয়া, দক্ষিণ হস্তে টেলিগ্রামটী আমার হাতে দিয়া বলিলেন "লিখে দাও একটা প্রকাণ্ড 'না'।"

অরুণকে টেলিগ্রামে জানাইলাম "অরোর নির্দ্দেশ আমার যাওয়া হইবে না।"

মাথার উপর দিয়া কালো বাদুড়ের মত সারা রাত্রি অলক্ষ্য আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়া উড়িয়া গেল। প্রভাতে শ্রীঅরবিন্দকে যথারীতি অভিনন্দন জানাইয়া বাড়ী ফিরিলাম। অরুণের আবার টেলিগ্রাম। তীক্ষ্ণ শেলের ন্যায় হৃদয় বিদ্ধ করিল; টেলিগ্রামের ভাষা—"ফিরিয়া আসুন, অন্যথা অনন্ত বিয়োগ। Eternal separation".

ইংরাজী শব্দের প্রতিভাষা বাংলায় বুঝি ঠিক হয় না। এই 'সেপারেশন' অপনয়ন নহে। Elimination হইলে আমি বিন্দুমাত্র ব্যথিত নহি। এমন দুর্ঘটনার অনুভূতি জীবনের নিত্য সঙ্গী। অরুণ কি চাহিতেছে আমার অপ্রত্যাগমনে আত্মবিনাশ? কি সাঙ্ঘাতিক কথা! উদ্গত অশ্রু হৃদয় প্লাবিত করিল। যাহা নহে, তাহা লইয়া এমনই দুর্ভাবনা আমার চরিত্রগত একটী বিশেষ দোষ। আমি তাহা হইতে সে দিন মুক্তি পাই নাই। আমার কান্না দেখিয়া আমার স্ত্রী বলিলেন, "তুমি ফিরে চল, অরুণের টেলিগ্রাম উপলক্ষ্য। আমি আসিয়া অবধি দেখিতেছি—শ্রীঅরবিন্দ তোমার আপনার জন, কিন্তু তোমার সাধনার এ স্থান নয়।"

আমি বিস্ময়বিহ্বল চিত্তে তাঁহাকে বলিলাম, "কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ যে চাহেন এইখানেই আমার সাধন ও সিদ্ধি! আর ১৫ই আগষ্টের ভার যে আমার উপর।" তিনি বলিলেন "শ্রীঅরবিন্দ দয়া করিয়া তোমায় আটকাইবার জন্য এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ ভার বহন করিবেন মীরা, তুমি নহ।"

কি এক অজ্ঞাত পীড়নের দুঃখে মর্ম্ম নিঙড়াইয়া চক্ষে আমার অশ্রুসাগর উথলিয়া উঠিতেছিল। এমন ক্রন্দনের অনুভূতি আমি কোনদিন পাই নাই। চক্ষে যত জল ঝরে, তিনি আঁচল দিয়া তত মুছাইয়া বলেন "আজ তোমার হ'ল কি? হয় চন্দননগর, নয় পণ্ডিচারী—এত কান্না কেন?"

আমার হৃদয়ের গ্রন্থিগুলি শিথিল হইয়া আসিতেছিল। সে মৃত্যুযন্ত্রণার হেতু ছিল গভীর অপ্রকাশের ক্ষেত্রে। ভিতরে ভিতরে সর্বনাশ কুণ্ডলী পাকাইয়া আমায় অধীর করিতেছিল। আমি দু'কূল হারাইয়া কখনও উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে, কখনও রুদ্ধশ্বাস হইয়া কাঁদিতেছিলাম। ১০ই আগষ্ট রাত্রি ঘনাইয়া আসিল, সে কালরাত্রিতে অশ্রুময় অক্ষর বিনাইয়া বিধাতা ললাটে লিখিয়া দিলেন "তুমি ফিরে যাও। তোমার সিদ্ধক্ষেত্র চন্দননগর।" ১১ই প্রাতে বজ্র-কঠিন হৃদয় লইয়া, সাদা কাগজের বুক চিরিয়া, চক্ষের জলে শ্রীঅরবিন্দকে লিখিলাম "অরো, আমি চলিলাম!" সে ব্যথা প্রকাশের নহে। আমি তাই আর এক ছত্রও লিখিতে প্রস্তুত নহি। পত্রশেষে নিষ্ঠুর ভাগ্যদেবতা কিন্তু আমার হাতকে যন্ত্রচালিতের ন্যায় লিখাইয়া দিল "আজ হইতে আপনার সঙ্গে হইল আমার "Eternal separation"। এই নিষ্ঠুর বজ্র আমার হৃদয়-তন্ত্রীকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া শ্রীঅরবিন্দকেও কত ব্যথা দিবে, তাহা বুঝিয়া মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িলাম। জ্যোতির্ময় সূর্য্যালোক তখন মসীময় মনে হইতেছিল।

অপরাহ্নে হৃদয়ের নিষেধ অমান্য করিয়া শ্রীঅরবিন্দ-মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। শ্রীঅরবিন্দ জানাইলেন "আর প্রয়োজন নাই।" আর প্রয়োজন নাই? হৃদয়ে মত্ত কেশরী গর্জ্জন তুলিল। প্রয়োজন না থাকিতে পারে মর্ত্ত্যের চক্ষে। মর্ত্ত্যজীবনে এই অমৃত-সম্বন্ধের পরিচয় চির বিলুপ্ত হইতে পারে। স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যে অনন্ত আকাশের ব্যবধান কল্পান্তকালস্থায়ী—তাই বলিয়া এই দুইয়ের মধ্যে সম্বন্ধচ্ছেদ হইয়াছে কে বলিবে? সেইরূপ আমাদের মধ্যে চিরজয়ী সম্বন্ধের অমৃত-নির্ঝর রুদ্ধ হইবে না। আমা হইতে শ্রীঅরবিন্দকে পৃথক্ করার শক্তি আমারও নাই, শ্রীঅরবিন্দেরও নাই। নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে আমরা সস্ত্রীক উপরে উঠিয়া গেলাম। শ্রীঅরবিন্দ ও আমার মধ্যে তখন ভাগ্য দেবতা অভিনব কৃষ্ণ যবনিকা টানিয়া দিতে উপক্রম করিতেছিল। আমার সাড়া পাইয়া শ্রীঅরবিন্দ তাড়াতাড়ি ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আসিলেন। সাশ্রু নয়নে চরণে প্রণত হইলাম। শ্রীঅরবিন্দের ললাটে আগুন জ্বলিতেছিল—আমি বক্ষ বিস্তার করিয়া তাহা গ্রহণ করিয়া বলিলাম—"চলুন, আপনার ঘরে চলুন।"

তিনি স্থির কণ্ঠে বলিলেন "না।" "না?"—আমার হৃদয়ে শত শত মত্ত মাতঙ্গ লম্ফ দিতেছিল; তাঁহাকে বলিলাম "আসুন একবার ঘরে।"

রুদ্রের হিরণ্ময় শ্মশ্রু সক্রোধে থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। অকস্মাৎ তাহা প্রসন্ন শিবমূর্ত্তিতে পরিণত হইল। তিনি তাঁহার শয্যাগৃহে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমি বলিলাম "বিদায়। চির বিদায়!"

চারি চক্ষের প্রসন্নতা অমৃতবর্ষণ করিল। শ্রীঅরবিন্দ বুঝি অনন্ত যুগের জন্য মাথায় আশীষকর স্থাপন করিয়া বলিলেন "একনিষ্ঠ হও। তোমার মধ্যে সত্য ও আলো আবির্ভূত হোক।"

আমি অগ্রে, পশ্চাতে মহামায়া তপঃশক্তি। পশ্চাতেই পরিচারী পড়িয়া রহিল। ভারতীর মন্দিরে বিজয়ঘণ্টা ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলিল। শ্রীঅরবিন্দের করুণামূর্ত্তি পলকেও অন্তর্হিত হয় না; আনন্দে অশ্রু উথলিয়া উঠে নয়নে। শেষ বিদায়-ভাষণ নলিনী ও সুরেশ গ্রহণ করিয়া ফিরিল। আর আমি ফিরিলাম ব্রহ্মচারিণী পত্নীকে সঙ্গে লইয়া শস্যশ্যামলা বাংলায়। তারপর অনতিদীর্ঘ জ্যোতির্ম্ময় জীবনসঙ্গিনীর করুণ ইতিহাস। তাহাও কি তোমরা শুনিতে চাহ?

(দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত)

রণঝঞ্ঝা

শ্রীতারাকিশোর বর্দ্ধন

বিশ্বব্যাপী মহাসংগ্রাম দ্বিতীয় মাসে পদার্পণ করিল। প্রশান্ত মহাসাগরকে অশান্ত করিয়া জাপানী রণঝঞ্ঝা আজ সমগ্র পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ আচ্ছন্ন করিয়া মালয় উপকূলে ভীমবেগে প্রধাবিত হইতেছে। এমন কি উহার ঝাপটা ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুণ মাগুঁই প্রদেশ পর্য্যন্ত আসিয়া লাগিতেছে। জাপানের সামরিক প্রতিভা আজ মার্কিণ যুক্তরাজ্যের নৌবহরের সঙ্গে বৃটিশ নৌবহরের সংযোগের পথ অবরুদ্ধ করিয়া সিঙ্গাপুর অবরোধ করিতে উদ্যত। ইতিমধ্যে সমগ্র চীনদেশ ও হংকং হইতে বৃটিশ ও আমেরিকার প্রভাব বিলুপ্ত হইয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরে অবাধ আধিপত্যলাভের জন্য জাপান যেন আজ বদ্ধপরিকর। মার্কিণের ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী ম্যানিলার পতন হইয়াছে। সমগ্র ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের পতনও আসন্ন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগরের সর্ব্বপ্রধান নৌ ও বিমান-ঘাঁটি হওয়াই দ্বীপপুঞ্জও সম্ভবতঃ খুব শীঘ্রই জাপান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবে। প্রকাশ যে, ইতিমধ্যেই জাপানী সৈন্যদল সেলিবিস্, বোর্ণিও, নিউগিনি প্রভৃতি দ্বীপে অবতরণ করিতে সুরু করিয়াছে। যদিও ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে জাভা, সুমাত্রায় জাপান এখনও প্রবল

জাপানের নবাধিকৃত হংকং সহরের প্রান্তবর্ত্তী একটি পল্লীর দৃশ্য

যে, উহার উপরও জাপানের প্রবল আক্রমণ আসন্ন। ঐ দ্বীপপুঞ্জে জাপান অধিষ্ঠিত হইলে অষ্ট্রেলিয়া বিপন্ন হইবে।

প্রশান্ত মহাসাগরের উপর জাপানের অবাধ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিপক্ষে আমেরিকা, বৃটেন, চীন এবং ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিজ এই চারিশক্তির একটা মিতালী আছে। উহাকে সংক্ষেপে A, B, C, D ফ্রণ্ট বলে। এই মিতালী কূটনীতির চালে ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য জাপান অনেক বার ব্যর্থ-প্রয়াস করিয়াছে। তাহাতে সফলকাম না হইয়া সে যুগপৎ এই চারি শক্তিকেই আক্রমণ করিয়া বসিয়াছে। থাইল্যাণ্ড ও ইন্দোচায়না জাপানের পক্ষে যোগদান করায় জাপানের বিস্তর সুবিধা হইয়াছে এবং উহাদ্বারাই প্রত্যক্ষভাবে ভারতবর্ষও বিপন্ন হইয়াছে। থাইল্যাণ্ডের ভিতর দিকে অগ্রসর হইয়া একদল জাপবাহিনী মালয় আক্রমণ করিয়াছে—তাহা ছাড়া জলপথেও বিস্তর জাপানী সৈন্য মালয়ে পৌছিতেছে। সমগ্র মালয় উপদ্বীপের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০০ মাইল। উহার মধ্যে সিঙ্গাপুর হইতে এখন জাপানী সৈন্যের অবস্থান প্রায় ১৫০ মাইল দূরে হইবে। মালয় উপদ্বীপের অপেক্ষাকৃত অরক্ষিত অঞ্চল জাপ-সৈন্য দখল করিয়াছে বটে, কিন্তু সিঙ্গাপুর দখল করা এত সহজ হইবে না। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিল সাহেবও বলিয়াছেন যে, "জাপানকে আক্রমণ করিবার জন্য বৃটেন ও আমেরিকা তৈরী না হওয়া পর্য্যন্ত সিঙ্গাপুর আত্মরক্ষা করিতে পারিবে।"

জাপানের সৈন্যপরিচালনার কৌশল দেখিয়া মনে হয় যে, জাপ-নৌ সেনাপতিগণের রণবিষয়িণী প্রতিভা অনন্য-সাধারণ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নৌশক্তি বৃটেন ও আমেরিকার বিপক্ষে তাহারা যেভাবে ফিলিপাইন ও মালয়ে জাহাজ হইতে সৈন্য অবতরণ করাইয়াছে, তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। শত্রুর শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ মিত্রপক্ষীয় দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিগণও করেন না। উহা

নয়টা উৎকৃষ্ট রাজনীতিও নয়। মিত্রপক্ষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। অদূর ভবিষ্যতে রুশ-রণক্ষেত্রে জার্ম্মাণীর পরাজয় আসন্ন, অথবা ইটালী ও জাপান একেবারে তৃতীয় শ্রেণীর শক্তি—অথবা শত্রু-দেশসমূহের আর্থিক বনিয়াদ সত্বরই ভাঙ্গিয়া পড়িবে—এই ধরণের হাল্কা প্রচারকার্য্য অনভিজ্ঞ খোসগাল্পিকেরাই করিয়া থাকেন। জার্ম্মাণীর আপাততঃ পশ্চাদপসরণে রুশিয়ার বিপদ্ এখনও কাটিয়া যায় নাই এবং ইটালী বা জাপানের সামরিক শক্তিরও কিছুমাত্র ন্যূনতা এখনও ঘটে নাই। সুদূর ভবিষ্যতে মিত্রপক্ষ জয়ী হইবেন; কিন্তু ১৯৪২ সালে অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতে হইবে—চার্চ্চিল সাহেবও একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

প্রশান্ত মহাসাগরে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হওয়ায় অষ্ট্রেলিয়ার আত্মরক্ষার প্রশ্ন গুরুতররূপে দেখা দিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান প্রধান রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণ এখনই বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, অষ্ট্রেলিয়া গেলেও, ইংলণ্ড বাঁচিয়া থাকিবে—ইহাই পারিপার্শ্বিক অবস্থার ইঙ্গিত। সেইজন্য অষ্ট্রেলিয়ার আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ইংলণ্ডের উপর অর্পণ করিতে আর তাঁহারা চাহিতেছেন না। অষ্ট্রেলিয়া স্বয়ংই তাহার আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতে চাহে। এজন্য সে স্বাধীন-ভাবে আমেরিকা ও রুশিয়ার সঙ্গে দহরম্ মহরম্ করিতে চাহে। অষ্ট্রেলিয়ার পার্ল্যামেণ্টে এই মত বিশেষভাবে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিধানের দিক্ হইতে ইহা অত্যন্ত গুরুতর ও জটিল প্রশ্ন। ভারতবর্ষের বেলায়ও সেই প্রকার প্রশ্ন অবশ্যই উত্থাপিত হইতে পারে। কিন্তু এখানেই অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রভেদ—যদিও অষ্ট্রেলিয়াবাসীর রক্ত ও ভারতবাসীর রক্ত আজ মালয় উপদ্বীপে একই খাতে প্রবাহিত হইতেছে। সে যাহাই হউক, রুশিয়াকে জাপানের বিপক্ষে যুদ্ধে নামাইবার পক্ষে অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার স্বার্থ বেশী। কিন্তু রুশিয়া নিশ্চয়ই মনে করে যে, জার্ম্মাণীকে বিধ্বস্ত করিতে পারিলে, পরে জাপানকে দমন করা সহজ হইবে এবং একমাত্র এই উদ্দেশ্যে সে তাহার সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিতেছে। জাপানের আক্রমণ প্রতিরোধের জাপানের উপর কিছু বিমান আক্রমণ ব্যতীত জাপানের দক্ষিণ সমুদ্রের অভিযানের বিশেষ কিছু ক্ষতি সে করিতে পারিবে না। সুতরাং উহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অষ্ট্রেলিয়া বা যুক্তরাষ্ট্রের বেশী লাভ হইবে না। বরঞ্চ রুশিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই উভয় সীমান্তে যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়া পড়িলে যদি আগামী বসন্তে জার্ম্মাণীর প্রবল আক্রমণ প্রতিরোধ সে করিতে না পারে, তাহাতে বৃটেনই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। এখানে বৃটেন ও অষ্ট্রেলিয়ার স্বার্থ পরস্পর বিপরীত। এই হেতুই সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধে অবতরণ করাইবার জন্য বৃটেন রুশিয়াকে বেশী চাপ দিতে পারে না। সম্ভবতঃ রুশিয়ায় ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ইডেনের দৌত্যগিরিতে ইহাই স্থির হইয়াছে।

পিনাং-এর স্থানীয় আদিম অধিবাসী: সম্প্রতি পিনাং বন্দর জাপান অধিকার করিয়াছে

চার্চ্চিল সাহেবও সেদিন মার্কিণ কংগ্রেসে বলিয়াছেন যে, রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধে জার্ম্মাণী এখনই এতটা হীনবল হইয়া পড়ে নাই যে, সে আগামী বসন্তকালে প্রবল বেগে আক্রমণ করিতে পারিবে না। উহা খুবই সত্য কথা। এই কথার উপরে লক্ষ্য রাখিয়া ১৯৪২ সালে এই মহাসমরের প্রকৃতি কিরূপ হইতে পারে, সে বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাক। বসন্তসমাগমে হিটলার রুশিয়ার উপর প্রবল আক্রমণ চালাইবেন, একথা তিনি নিজেই তাঁর নববর্ষের বাণীতে স্বীকার করিয়াছেন। রুশিয়াকে পর্য্যুদস্ত করিতে না পারিলে, পৃথিবীতে তাঁহার নববিধানপ্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা

ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে। রুশিয়ার সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে যদি তাঁহার সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিতে হয়, তবে আফ্রিকা বা মধ্য প্রাচ্যের দিকে তাঁহার অভিযানের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, জার্ম্মাণ সৈন্য জিব্রাল্টার এবং তুরস্কে অভিযান করিতেছে,—তাহা হইলে মনে করা যাইতে পারা যায় যে, তিনি রুশিয়ার বিপক্ষে সর্ব্ব-শক্তি প্রয়োগ করার প্রয়োজন মনে করেন না। যদি আংশিক শক্তি প্রয়োগ করিয়াই রুশিয়াকে পরাস্ত করিতে পারিবেন, এরূপ ধারণা তাঁহার থাকে, তবে আমরা নিকট ভবিষ্যতেই তুরস্ক ও জিব্রাল্টারে জার্ম্মাণ অভিযান দেখিতে পাইব। তাঁহার বিদ্যুদ্‌গতি আক্রমণ চালাইবেন, সে বিষয়ে বিস্তর গবেষণা হইয়াছে। কেহ বলিতেছেন, তিনি ইংলণ্ড আক্রমণ করিবেন। কেহ বলেন জিব্রাল্টার; কেহ বলেন তুরস্ক। এইরূপ নানা জল্পনা-কল্পনা রাজনীতিকমহলে চলিতেছে। আপাততঃ হিটলার ইংলণ্ড আক্রমণ করিবেন, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রুশিয়াই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। এমন কি বসন্তসমাগমে জাপানও সাইবেরিয়া আক্রমণ করিতে পারে; অবশ্য যদি ইতিপূর্ব্বেই প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ সে কুক্ষিগত করিতে পারে এবং সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত

ভূমধ্যসাগরস্থ মাল্টা দ্বীপ ব্রিটিশ-'লাইফ-লাইন'-এর অন্যতম প্রধান ঘাঁটি: এখানে জার্ম্মাণীর আক্রমণ আসন্ন বলিয়া অনেকে মনে করিতেছে

রুশ-রণাঙ্গনে প্রায় দুই মাস যাবৎই জার্ম্মাণবাহিনীর পশ্চাদপসরণের সংবাদ আমরা পাইতেছি। দুরন্ত শীত পড়ার পর হইতে এ পর্য্যন্ত কোনও কোনও স্থলে পঞ্চাশ মাইল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ২০।২৫ মাইল মাত্র জার্ম্মাণরা পশ্চাদপসরণ করিয়াছে। খুব সম্ভব জার্ম্মাণ-বাহিনী আত্ম-রক্ষার উপযুক্ত স্থানে সরিয়া আসিয়া স্থাণুব্যূহ রচনা করিবে এবং শীতকালটা এভাবেই কাটাইবে। উহাকে নেপোলিয়ানের প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে না। রুশিয়ার বিপদ্ এখনও কাটিয়া যায় নাই। সোভিয়েট রুশিয়া সত্যই বিপদ্ হইতে মুক্ত হইলে আমরা অধিকতর সুখী হইব, সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ উল্লসিত হইবার সময় হইতে পারে। তাহা ছাড়া জার্ম্মাণীর পক্ষে তুরস্কের ভিতর দিয়া অভিযান করারও প্রবল সম্ভাবনা আছে। কারণ তাহাতে একদিকে জার্ম্মাণী ককেশাস্ অঞ্চলে অবস্থিত রুশবাহিনীর পশ্চাদ্‌ভাগে আক্রমণের সুবিধা পাইবে এবং ইহা রুশ রণাঙ্গনেরই অংশবিশেষে পরিণত হইবে। অন্যদিকে তুরস্ক ও সিরিয়ার ভিতর দিয়া সুয়েজ খাল ও ইরাকের ভিতর দিয়া পারস্য উপসাগরের দ্বার জার্ম্মাণ বাহিনীর নিকট উন্মুক্ত হইয়া যাইবে। সুয়েজ খাল অবরোধ করা যদি সম্ভব হয়, তখনই সঙ্গে সঙ্গে জিব্রাল্টার আক্রমণ করিয়া ভূমধ্যসাগরস্থ বৃটিশ নৌবহরকে অচল করিয়া দিবার কল্পনাও সম্ভবতঃ জার্ম্মাণীর মনে জাগিতে পারে। কিন্তু পরিকল্পনা এক কথা এবং তাহা

কার্য্যে পরিণত করা আর এক কথা। যদি ইতিমধ্যে রুশিয়ার প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং যদি তুরস্ক, ইংল্যাণ্ডের মত বিনা বাধায় পথ ছাড়িয়া না দেয়, তবে উক্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইবার সম্ভাবনা কম।

ভূমধ্য সাগরে ব্রিটিশের সুদৃঢ় ঘাঁটি মাল্টার উপর সম্প্রতি জার্ম্মাণ প্রবল বিমানাক্রমণ চালাইতেছে। ইহা সামরিক আক্রমণেরই পূর্ব্ব সূচনা। মাল্টা অধিকার করিয়া আফ্রিকার সহিত নিরাপদ যোগাযোগ স্থাপন করাই জার্ম্মাণদের উদ্দেশ্য। অদূর ভবিষ্যতে সুদূর প্রাচ্যেও রুশ-জাপান যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা যায়। যেহেতু জাপান যদি সাইবেরিয়ার পূর্ব্ব প্রান্ত দখল করিতে না পারে, তাহা হইলে সে নিরুদ্বেগে আমেরিকা ও বৃটেনের বিপক্ষে সংগ্রাম পরিচালনা করিতে পারিবে না।

সুদূর প্রাচ্যে জাপান যতই নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লাভ করিবে ততই ভারতবর্ষের পক্ষে দুর্ভাবনার কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। ইতিমধ্যে সেনাপতি ওয়াভেলের নীতি-কুশলতায় ব্রহ্মদেশ রক্ষার জন্য চীনা সৈন্যের আমদানী হইয়াছে। উহাতে চীনেরও সুবিধা, বৃটেনের সুবিধা। কিন্তু ৩৮ কোটী লোকের অধ্যুষিত ভারতভূমি রক্ষার জন্য আজ কেন চীনা সৈন্যের আমদানী করিতে হয় তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলেই কংগ্রেসের দাবীর সঙ্গে সঙ্গেই আটলাণ্টিক সনন্দের কথা স্মৃতিপথে উদিত হয়। ভারতের পক্ষে উহা অরণ্যে রোদনেরই মত।

জাপানের প্রশান্তমহাসাগরীয় আধিপত্য বিনষ্ট করিবার এবং নাৎসী বর্ব্বরতা নির্ম্মূল করিবার জন্য ইংলণ্ড-আমেরিকা-চীন ও রুশিয়ার নেতৃত্বে ২৬টি দেশের ধন-জন ও সামরিক শক্তি একত্রিত হইয়াছে। কিন্তু দেখা যায় বৃটেন বর্ত্তমানে তাহার সমগ্র দেশের নৌশক্তি সুদূর প্রাচ্যে প্রেরণ করিতে পারে না। আটলাণ্টিকে ও ভূমধ্য সাগরে তাহার যথেষ্ট দায়িত্ব রহিয়াছে। সেইরূপ আমেরিকাও আটলাণ্টিকের দায়িত্ব পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত নৌশক্তি প্রশান্ত মহাসাগরে কেন্দ্রীভূত করিতে পারিতেছে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রশান্ত মহাসাগরে বৃটেন ও আমেরিকার আংশিক নৌবহর রুশিয়ার প্রাচ্য নৌবহরের সহযোগিতায় যদি যুগপৎ জাপান আক্রমণ করে, তবে সুফল হইতে পারে। মিত্রপক্ষীয় নৌবহর জাপানের নৌবহর অপেক্ষা আয়তনে বড় হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিবেচ্য এই যে, ইতিমধ্যে যদি প্রশান্ত মহাসাগরের সমস্ত দ্বীপপুঞ্জ জাপানের অধিকারে চলিয়া যায়, তবে পাঁচ হাজার মাইলের বিরাট সামুদ্রিক ব্যবধানের মধ্যে মিত্রপক্ষের বিস্তর অসুবিধা ঘটিবে। মিত্রপক্ষের নৌবহরগুলির মধ্যে ক্রমশঃ সংযোগ সাধন করাও কঠিন হইবে। মিত্রশক্তির পক্ষে জাপানকে প্রবল আঘাত হানিবার ইহাই উপযুক্ত সময়। এই কার্য্যের জন্য জল, স্থল ও বিমানবাহিনীর অটুট সহযোগিতা দরকার। এই সব বিবেচনা করিয়াই চার্চ্চিল-রুজভেল্টের গ্রাণ্ড ষ্ট্র্যাটেজি উদ্ভাবিত হইয়াছে। এবং সেই জন্যই সম্ভবতঃ সমস্ত মিত্রপক্ষের অনুমোদনক্রমে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে অভিজ্ঞ সমরবিশারদ ওয়াভেলকে সর্ব্বাধিনায়ক নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই জন্য মিত্রশক্তি বিশ্বব্যাপী যে সামরিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন তাহার জটিলতাও যেমনি প্রচুর, সম্ভাবনাও তেমনি সীমাহীন। মোটের উপর বর্ত্তমানে পৃথিবীব্যাপী যে সমরানল প্রজ্বলিত হইল তাহা নির্ব্বাপিত দেখিতে জগদ্বাসীকে দীর্ঘ অপেক্ষায় উৎকণ্ঠমান থাকিতে হইবে।

আবাহনী

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

এস কল্যাণি কুন্দ-নিন্দিত বরণা
পুষ্পিত ফুলদল গন্ধে,
এস মঙ্গলে, মঞ্জু মঞ্জীর চরণা
ঝঙ্কৃত সামগীতি ছন্দে।

এস চিন্ময়ী চিত্ত ছন্দিত শরণে
মণ্ডিত মণি-কর-দীপ্তা
এস অন্তর-তীর্থে সঙ্গীত রণনে
বাগ্দেবী জ্ঞানসুধা-লিপ্তা

নীলিমা-স্মৃতি

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

বাংলার পুরুষসিংহ স্বর্গত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং শ্রীযুত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা—ইহাই শ্রীমতী নীলিমা দেবীর বড় পরিচয় নহে। এই প্রখ্যাত পরিবেশ এবং সনিষ্ঠ পারিবারিক প্রভাব তাঁহার জীবন-গঠনে আনুকূল্য করিলেও, নীলিমা এক প্রাক্তন অত্যুজ্জ্বল অন্তর-সম্পদের জন্মগত অধিকার লইয়া কক্ষভ্রষ্ট নক্ষত্রের মত মর্ত্যের বুকে আবির্ভূত হইয়াছিল। নীলিমার ধাতু ও উপাদান ছিল অনন্যসাধারণ। সহৃদয় ও উৎকর্ষপরায়ণ পারিবারিক সম্বন্ধের আবেষ্টনী তার স্বকীয় ভাব-পুষ্টির পথে প্রচুর সহায়তা করিয়াছিল, ইহা অস্বীকার্য্য নয়। এমন শুভ যোগাযোগ বাঙালী ঘরের খুব কম মেয়ের ভাগ্যেই ঘটে। কিন্তু স্বল্পায়ুঃ লইয়া সে জন্ম লইয়াছিল। মাত্র কুড়িটি বছর! যে বয়সে মানুষ হাসি-খেলা ছাড়িয়া জীবনের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে, সেই বয়সেই তার জীবন-নাট্যের উপর যবনিকা পড়ে। দিন গণিয়া যদি আয়ুর হিসাব করিতে হয়, তবে ইহা তার অকাল মৃত্যুই বলিতে হইবে। কিন্তু মাস-বৎসর অনন্ত জীবন-প্রবাহের সত্যকার পরিমাপ নয়। মানুষ আদৌ ভাব। এই ভাবোন্মেষের তারতম্যেই জীবনের সার্থকতা। এই দিক্ দিয়া অনাঘ্রাত কুসুমের ন্যায় স্বল্পায়ুঃ নীলিমার কুমারীজীবনের যে চমৎকারিতা, তাহা সত্যই অলোকসামান্য। অন্যথায় চাঞ্চল্যকর ঘটনাবৈচিত্র্যে উত্তেজক চমকপ্রদতার অভাবে নীলিমার অনুস্মৃতি অনুধাবনের বিশেষ কোন সার্থকতাই ছিল না।

১৩২৮ সালের ২০শে আষাঢ় নীলিমার জন্ম হয়। বর্ষার বারিধৌত নির্ম্মল ফুলটির মতই সদা সহাস্যবদন নীলিমা মাতৃক্রোড় শোভা করিয়া পরিপূর্ণ পারিবারিক সুখ ও গৃহশ্রী আরও পূর্ণতর করিয়া তুলিল। স্নিগ্ধ কমনীয় রূপ-লাবণ্য লইয়া সে জন্মিয়াছিল। বাঙালী ঘরের মেয়ে হইলেও, এই প্রাচুর্য্যের সংসারে বহু বাঞ্ছিত রত্নের সমাদরেই সে সকলের স্নেহের দুলালী ও নয়নানন্দরূপে অপূর্ব্ব শ্রী ও স্বাস্থ্যে দিন দিন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রথম সন্তান হওয়ায়, নীলিমার আদরের সীমা ছিল না। বৃহৎ আত্মীয়স্বজন ও স্বগোষ্ঠির অফুরন্ত স্নেহাশীষ বালিকা নির্ব্বিচারে কুড়াইয়াছিল। নীলিমার তিন বৎসর বয়ঃক্রমকালে পুণ্যশ্লোক স্যার আশুতোষ স্বর্গারোহণ করেন। জ্ঞানপ্রাপ্তা হইলে, হৃদয়ের অনাবিল শ্রদ্ধাতর্পণ করিয়া সুযোগ্য পিতামহের প্রতিমূর্ত্তি কতই না সে ভালবাসিয়াছে! অতি শৈশব হইতেই নীলিমার চিত্তে ভক্তি-লতা-বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয়। ইহাকে প্রাক্তন সংস্কার ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণপরিবারের অনুকূল আবহাওয়ায় অলক্ষ্যে এই অহেতুক পরানিষ্ঠা ও ভক্তি তার বয়োবৃদ্ধির সহিত বাড়িয়া

৺নীলিমা দেবী

উঠে। মরণের পরে এখন নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই অন্তর্বাহী বিশুদ্ধ প্রেম-ভক্তির ফল্গুধারাই ছিল নীলিমা-জীবনের বৈশিষ্ট্য এবং ইহাই তাহার স্বল্প পরিসর জীবনকে মহনীয়, বরণীয় ও সুন্দর করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

একই গৃহপরিবেশের মাঝে যখন অপরাপর সমবয়সী ছেলেমেয়েরা মনোহারী চাকচিক্যময় খেলনায় ভুলিয়া থাকিত, তখন বালিকা নীলিমা কিন্তু ঠাকুরদেবতার মূর্তির প্রতি সহজভাবেই আকৃষ্ট হইত। কৈশোরেই তার হৃদয়ের এই প্রবণতা আরও সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে। একদা নীলিমার মা এক পিতলের রাধাকৃষ্ণ মূর্তি কিনিয়া কন্যাকে পুতুল খেলার জন্য উপহার দিলেন। তখন নীলিমার বয়স সবেমাত্র আট বৎসর, কিন্তু মূর্তির সঙ্গে খেলার মাঝে নীলিমা তন্ময় হইয়া গেল। অজানায়ই বুঝিবা সে আত্মনিবেদন করিয়া বসিল। সে অন্তরঙ্গ পরিচয় কেহ বুঝিল না, শুধু দেখিল ঐ পিতলের ঠাকুর নীলিমার সর্ব্বসেব্য হইয়া উঠিয়াছে। ঠাকুরের জন্য সে ছোট কাঠের খাট করাইল, বাসনপত্র এবং বিচিত্র অলঙ্কার কিনিল, নিজের হাতে শয্যা প্রস্তুত করিল, পছন্দমত পরিচ্ছদ তৈয়ারী করাইল। নিত্যদিন নব নব মালা গাঁথিয়া সে ঠাকুরকে পরাইত—কত বিচিত্র বর্ণের পুষ্পসজ্জা রচনা করিয়া দিত। পিতলের ঠাকুরকে ঘিরিয়া নীলিমার ব্যস্ততার সীমা থাকে নাই। নীলিমার এই অনন্যনিষ্ঠায় ঠাকুর বুঝি প্রাণ পাইল। পরিপাটি বিছানা করিয়া ঠাকুরকে নীলিমা প্রতি সন্ধ্যায় শোয়াইত, আবার ভোরে শয়ন হইতে জাগাইত। মুখে মুখে তার রাধা-গোবিন্দের স্তবপাঠ চলিত। ঠাকুরকে খাওয়াইয়া সে খাইত। কোথাও কখনও বিদেশে গেলে আগে সে ঠাকুরকে সঙ্গে লইত। ইহার পর হইতে কোনদিন কোন অবস্থায়ই নীলিমার এই ঠাকুর লইয়া পুতুল খেলার আর ব্যতিক্রম হয় নাই। কিশোরী জীবনের এক শুভ মাহেন্দ্রক্ষণে তার যে এই রাধাকৃষ্ণবিগ্রহের সঙ্গে পরিচয়, তাহা যৌবনে ক্রমশঃ প্রগাঢ় অনুরাগে পরিণত হইল। প্রথম প্রথম সকলেই ভাবিত, হয়তো বা তার এই ঠাকুরের নেশা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া যাইবে। কিন্তু নীলিমা যত বড় হইতে নিখুঁত হইয়া উঠিল। ঠাকুরের ঝুলন, রাস, দোল প্রভৃতি উৎসব নীলিমা বরাবর ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত নিজেই করিত। এই সব করিয়া সে যে অন্তরে অন্তরে অসীম তৃপ্তি বোধ করিত, তাহা তার আনন্দোদ্দীপ্ত মুখ দেখিয়াই বেশ বুঝা যাইত। বিগ্রহের নয়নে নয়ন মিলাইয়া নীলিমা যে কি মৌন প্রেরণা পাইত, তাহা সে-ই জানিত। ঠাকুরকে কেন্দ্র করিয়া তার যে দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবন নিয়মিত হইত, তার মাঝে এতটুকু লজ্জা-সঙ্কোচ ছিল না। এই ঠাকুরের নাওয়ানো-খাওয়ানো ব্যাপার লইয়া কেহ কোন ঠাট্টা বিদ্রূপ করিলে সে সত্যই অন্তরে গভীর আঘাত পাইত এবং বলিত, "আমার ঠাকুর যদি না খায়, তবে আমার মন ও শরীর খারাপ লাগে।" কোনদিন কোন কারণে তার এই বিগ্রহসেবার ব্যাঘাত হইলে, সত্যসত্যই সে অসুস্থ হইয়া পড়িত। নীলিমার এই দৈবী শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠায় প্রীত হইয়া তাহার জননী একবার প্রস্তাব করিয়াছেন, "নীলু, বড় বিগ্রহমূর্তি স্থাপন করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া দিই, কি বলিস্?"

নীলিমা সবিনয়ে মায়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। ছোট্ট মূর্তিকে বুকে ধরিয়া নীলিমা মাকে বলিয়াছে, "আমার এই-ই ভাল, অন্য ঠাকুরের প্রয়োজন নেই। এ ঠাকুরের প্রাণ নেই তোমায় কে বললে?"

এমনি করিয়াই কিশোরীর দুইটি বৎসর কাটিল।

দশ বৎসর বয়স হইতে সে গোখেল মেমোরিয়াল স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করে। সেখানে চার বৎসর পড়িবার পর স্কুল হইতে তাহাকে ছাড়াইয়া লওয়া হয়। তাহার ১৪ মাস পরে পনর বৎসর বয়সে নীলিমা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হয়। স্কুলে পড়িবার সময়ে নরম-সরম স্বভাবের জন্য সে মিসেস্ পি, কে, রায় ও শিক্ষয়িত্রীগণের বিশেষ প্রিয়পাত্রী ছিল। ঐ স্কুলে কলিকাতার যত ধনী অভিজাতগৃহের মেয়েরা পড়িয়া থাকেন ও সেখানে মেয়েদের সাজসজ্জা ও বিলাসিতার স্বভাবতঃই একটা নিত্য নূতন প্রথার স্রোত বহিয়া যায়। তাহার সংস্রবে আসিয়াও কোন দিনের তরেই এতটুকু বিলাসিতার ও সাজসজ্জার মোহ নীলিমার স্পর্শ করিতে পারে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া

তাহার বেশভূষায় কখনও একটুও অপরিচ্ছিন্নতা ছিল না। অন্তর-বাহিরে সে ছিল শুভ্র ও সুন্দর। নীলিমার ছিল সুদীর্ঘ ঘনকৃষ্ণ কুন্তল, দীপ্তোজ্জল আয়ত চক্ষু, টানা-টানা ভ্রূ এবং অটুট স্বাস্থ্য। সর্ব্বোপরি শুদ্ধাচার ও অন্তঃশুচিতা ছিল নীলিমা-জীবনের অলঙ্কার। প্রতিমার মত স্নিগ্ধ অনবদ্য রূপ লইয়া দেবতার চরণের ফুলটির মতই সর্ব্বদা সে গৃহ ও বাহির আলোকিত করিয়া ফিরিত।

গোখেল স্কুলে পড়িবার সময়ে নীলিমার ভাই ফল্টু তাহাকে স্কুল হইতে গাড়ীতে আনিতে যাইত বলিয়া তাহার সহপাঠিনীগন তাহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিত "তুই কি হারিয়ে যাবি বলে' তোর ভাই তোকে রোজ নিতে আসে?"

নীলিমা সে ঠাট্টা কাণে না তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিত "ও আমার ভাই, তা' কি করিয়া তোরা বুঝ্‌লি?"

"নাক দেখিয়া" সহপাঠিনীরা রহস্য করিত।

ভাইয়ের নাক ও নীলিমার নাক একই রকমের বলিয়া তাহারা বুঝিয়াছে, বিদ্রূপপূর্ণ এই উত্তর পাইয়াও নীলিমা তাহার ভাই যে তাহার মত দেখিতে, এই ভাবিয়া কতই না সুখী হইয়াছে এবং কতদিন না এই একই গল্প করিয়াছে! সরলতার ছবি নীলিমা কখনও কোন কপটতা বা ছল-কুটিলতা কি হিংসা-দ্বেষ জানিত না। সত্যরক্ষা তার জীবনে ব্রত ছিল। স্বভাবগম্ভীরা ও স্বল্প-ভাষিণী নীলিমা হাল্‌কা ঠাট্টা-বিদ্রূপে ও হাস্য-রসিকতাতেও আনন্দ পাইত না। এইজন্য সে অনেক সময়ে তাহার সমবয়সী তরলহৃদয়া আধুনিকাগণের সহিত প্রাণ খুলিয়া মিশিতে পারিত না। তবে তাহার মনের মত যে কয়টী সহচরী ছিল, আন্তরিকতার আদান-প্রদানে তাহাদিগের সম্মান সে আজীবন রাখিয়া গিয়াছে ও নিজের অমায়িক সরল স্বভাবে সকলকে মুগ্ধ করিয়াছে।

নীলিমার পড়াশুনা করিবার ও শিখিবার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাস করিবার পর তাহাকে আর কলেজে দেওয়া হয় নাই; কিন্তু বাড়ীতে ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত, এ সবই সে নিয়মপূর্ব্বক পড়িত। বহু ইংরাজী ও বাঙ্গলা সাহিত্য গ্রন্থ সে পড়িয়াছিল এবং শরৎচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সকল বই সে শেষ করিয়াছিল। ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত, ভাল ভাল জীবন-চরিত, কাব্য, ইতিহাস, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এই সকল পড়িয়া সে বিশেষ আনন্দ পাইত। বাড়ীতে সংস্কৃত অধ্যাপকের নিকট নীলিমা শকুন্তলা, কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, মেঘদূত, মালবিকাগ্নিমিত্র, কীরাতার্জ্জুনিয়ম, মৃচ্ছকটিক নাটক প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থগুলি অতি নিষ্ঠাসহকারে অধ্যয়ন করিয়াছিল। স্ত্রীশিক্ষা ও নারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সে চিন্তা করিত এবং এই সম্বন্ধে যে সকল রচনা সে লিখিয়া গিয়াছে, তাহা তাহার চিন্তা ও ভাবের স্বচ্ছতারই পরিচায়ক। আত্মপ্রচারে কুণ্ঠা ছিল বলিয়া সে তাহা প্রকাশ করিতে কখনও আগ্রহ করে নাই। বিখ্যাত সেতারী শফিউল্লা খাঁকে বাড়ীতে ওস্তাদ রাখিয়া নীলিমা সেতার বাজাইতে শিখিয়াছিল। রেডিওতে রান্নার বিষয় যাহা বলা হয়, তাহা শুনিয়া ও রন্ধনের বই পড়িয়া সে নানা প্রকার নূতন নূতন রান্না ও খাবার করিত। ইংরাজী বই দেখিয়া অনেক রকম কেক, বিস্কুট পর্য্যন্ত করিতে সিদ্ধহস্ত হইয়াছিল। দেশীয় সর্ব্বপ্রকারের রান্নায়ই সে বিশেষ পটু ছিল। স্বহস্তে রন্ধন ও পরিবেশন সেবার একটি বড় অঙ্গ বলিয়া সে মনে করিত। গৃহে প্রায়ই সন্দেশ, রসগোল্লা, পানতোয়া, চমচম, ছানার পায়েস, ঘুগ্‌নি নানা প্রকার জেলি, চাট্‌নি প্রভৃতি নিজে প্রস্তুত করিয়া এবং সকলকে খাওইয়া সে পরম তৃপ্তি বোধ করিত। একবার কৃষ্ণনগরে মামা বাড়ীতে গিয়া নীলিমা স্থানীয় ময়রাকে ডাকাইয়া তাহার নিকট সরপুরিয়া প্রস্তুত করিবার প্রণালীটী শিখিয়া লইল। অবসর পাইলেই নারীশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গিয়া কত নূতন নূতন সেলাইয়ের কাজ, মাটীর মূর্ত্তি গড়িবার কাজ ও চামড়ার কাজ সে শিখিত। বিচিত্র ডিজাইনের এই সব কাজ করিয়া ও তাহা প্রিয়জনকে উপহার দিয়া কতই না সে আনন্দ পাইত! এমন কি তার বাবার চেয়ারে বসিবার চামড়ার কুশান অবধি সে নিজে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। গুজরাটি, বোম্বাই প্রভৃতি দেশী-বিদেশী নানা প্রকারের সেলাইয়ের কাজে ও প্যাটার্ণে সে প্রচুর নিপুণতা অর্জ্জন করিয়াছিল। নীলিমার সর্ব্বতোমুখী জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহার ও কর্ম্মনিষ্ঠার বুঝিবা তুলনা মিলে না।

চাকর, দাস-দাসীর অপ্রাচুর্য্য ছিল না। তবুও সকলের সেবার মধ্যে নিজেকে বিলাইয়া দেওয়াই নীলিমা পাইত তৃপ্তি ও আনন্দ। খুঁটিনাটি ছোট-বড় সকল রকম গৃহকর্ম্মই সে আনন্দে স্বহস্তে করিত। বাড়ীর ছেলেমেয়েদের আটপৌরে পোষাক সেমিজ-জামা-সেলাই হইতে বাজারাহিসাব, ধোপার দেখা কোন কর্ম্মই তার বাদ যাইত না। উৎসব-আয়োজনে কর্ম্মতৎপরতা, অতিথি-অভ্যাগতের আপ্যায়ন, এমন কি ঝি-চাকরের সুখ-সুবিধা কিছুই তার জাগ্রত দৃষ্টির বহির্ভূত ছিল না। সেবাপরায়ণা বিনম্রস্বভাব নীলিমার জীবনের সৌরভ সর্ব্বদাই তার সমগ্র পরিবেশকে উৎফুল্ল ও আমোদিত করিয়া রাখিত।

সবুজ ও শ্যামলিমা নীলিমার বিশেষ আকর্ষণের বস্তু ছিল। ভবানীপুরের বাড়ীর ছাদে বহু টবে সে বিচিত্র পুষ্প ও শাক-সব্জী লাগাইয়া প্রতিদিন পরিচর্য্যা করিত। এই সব গাছ ও লতাকুঞ্জ তার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। কতদিন কত সময়ে এই বাগিচার নিরালায় সে একাকী বসিয়া কাটাইত। মহানগরীর ইট-কাঠ পাথরের মরুভূমির মধ্যে মরুদ্যানের মতই ছিল নীলিমার স্বহস্তে রচিত এই পুষ্পোদ্যান। বহুর ভীড়ে বুঝিবা এমনি করিয়া সে তার স্বরূপ উপলব্ধি করিত।

সাংসারিক বহু এবং বিচিত্র কর্ম্মের মাঝেও নীলিমার ছিল নিবেদিত আত্মা। দেবালয়ের ঘৃত-প্রদীপের মতই নিষ্কম্প্র তার জীবন-শিখা ঊর্দ্ধমুখী অনির্ব্বাণ জ্বলিত। মর্ত্ত্যের কোন প্রলোভন, শত ঝঞ্ঝায়ও তাহা এতটুকুও অনুজ্জ্বল হয় নাই। নিত্যনৈমিত্তিক পূজা-পার্ব্বণে নীলিমার উৎসাহের অন্ত থাকিত না। ভক্তি-বিগলিত চিত্তে নীলিমা চন্দন-ঘষা, ফুলের সাজ করা, পূজার সকল আয়োজন নীরবে সম্পন্ন করিত। সংযমের অপূর্ব্ব শান্তশ্রী তার সর্ব্বাঙ্গ উপচিয়া পড়িত। সামান্য একখানি বম্বে-প্রিন্টের শাড়ী হিন্দুস্থানী ধরণে পরিধান করিয়া, পৃষ্ঠদেশে লম্বমান মেঘের মত কালো কেশের বেণী দোলাইয়া ও শুভ্র ললাটে কুঙ্কুমের টিপ পরিয়া নীলিমা বৈকালিক প্রসাধন সম্পন্ন করিয়া যখন বিগ্রহসেবার আয়োজন করিতে চলিত, তখন তাহার শুচিশুভ্র মূর্ত্তি [illegible] কথাই স্মরণ

করাইয়া দিত। সত্যই মনে হইত—নীলিমা যেন এই মর্ত্ত্যের মানবী নয়। নীলিমার এই ভাগবৎপ্রেম ছিল সহজাসিদ্ধ। এই পৃথিবীর কলঙ্ককালিমা তার স্বভাবতঃ উন্নতোজ্জ্বল চিত্ত মন কোনদিন ম্লান করিতে পারে নাই। জন্মসিদ্ধ এই দৈবী অনুরাগ তাকে যে সতত রক্ষা করিয়া গিয়াছে, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ নীলিমার জীবন-ঘটনায় বহুবার মিলে। একবার সে দুইদিনের জন্য কৃষ্ণনগরে তার মামার বাড়ী বেড়াইতে যায়। যাইবার সময়ে সে তার ঠাকুরের একখানি চিত্রপট সঙ্গে লইতেও বিস্মৃত হয় নাই। রাত্রে নীলিমা সেই ঠাকুরের ছবি লইয়া শুইতে যাইতেছে দেখিয়া তাহার মামীমা বলিলেন, "নীলু, ও কি করছিস্? তোর কি ভয় করবে, আমি তোর কাছে শোব নাকি?"

"না মামীমা, সকালে উঠেই আমি আমার ঠাকুরের মুখ দেখবো বলে' তাঁর ছবি শিয়রে রেখে রোজই তো শুই" হাসিয়া নীলিমা উত্তর করিল।

নীলিমার এই ভক্তিপ্রাণতা সকলেরই মর্ম্মস্পর্শ করিল। নীলিমার ব্যবহারিক আচরণের অন্তরালে ফল্গুধারার ন্যায় একটা অখণ্ড উৎসর্গের সাধনা সকলের অলক্ষ্যে প্রবাহিত হইত। 'শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় করি মাকে ধ্যান'—এই সত্য তার জীবনে সত্যই প্রতিফলিত হইয়াছিল। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যায় সর্ব্বকর্ম্মের মাঝে সে কখনও তার প্রেমাস্পদের প্রতি দৃষ্টিহারা হইত না।

দেশভ্রমণ, বিশেষভাবে তীর্থপর্য্যটনে নীলিমার আগ্রহ ছিল অসীম। সে তার বাবা ও কাকাদের সঙ্গে প্রায় সমগ্র ভারতই ঘুরিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিল। এমন খুব কম তীর্থই আছে, যাহা নীলিমা দর্শন করে নাই। পিতার অর্থভাণ্ডার তার নিকট মুক্ত ছিল। যেখানে গিয়াছে, সেখানেই সে অকাতরে দরিদ্র ভিখারীদের অর্থ বিলাইয়াছে। সভক্তি বিল্বপত্রচন্দন দ্বারা সে কাশীর বিশ্বেশ্বরের অর্চ্চনা করিয়াছে। পুরীর পুরুষোত্তম দর্শন করিয়া ও রথের দড়ি টানিয়া নীলিমা আত্মহারা হইয়াছে। শ্রীধাম বৃন্দাবনে গোবিন্দজী ও মদনমোহনবিগ্রহের সম্মুখে সে বিগলিত হৃদয়ে মৌন আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিয়াছে। আত্মসমাহিত চিত্তে নীলিমা মথুরায় দ্বারকাধীশের মন্দিরের ঐক্যতানমিলিত ভজন-

গান বিমুগ্ধ হইয়া শুনিয়াছে। কত সন্ধ্যা-সকালে সমুদ্র-তটে বিভোর হইয়া নীলিমা কৃষ্ণগুণগানে সময় কাটাইয়াছে। বিংশ শতাব্দীর আধুনিকা, ইংরাজী শিক্ষিতা, ভরা যৌবন-সম্পন্না নীলিমা অসামান্যা কৃষ্ণভক্তি হিয়ায় ধরিয়া মীরার মতই 'ময়নে চাকর রাখজী…' গীত গাহিতে গাহিতে বৃন্দাবনের রজ অঙ্গে মাখিয়াছে। সত্যই অপূর্ব্ব সুন্দর এই নীলিমা-জীবন!

পিতামাতার জ্যেষ্ঠা কন্যা বলিয়া সকলেই তার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেও, নীলিমার এই অলোক-সামান্য অন্তর্জীবন লক্ষ্য করিয়াই অনেক বাঞ্ছনীয় সম্বন্ধ আসা সত্ত্বেও তার পিতা এতদিন বিবাহে বেশী গরজ করেন নাই। বিগত অগ্রহায়ণ (১৩৪৮) মাসে নীলিমার বিবাহ দিবেন, একরূপ স্থির করিয়াই পিতা আয়োজন করিতে উদ্বুদ্ধ হইলেন। মা দক্ষিণ ভারতে বেড়াইতে গিয়া কাঞ্চী ও মাদুরা হইতে পছন্দমত বিচিত্র সিল্কের শাড়ী, বেনারসী শাড়ী প্রভৃতি কিনিয়া আনিলেন। এই ব্যাপক বিবাহের আয়োজনের মধ্যেও কিন্তু নির্বিকার সাধিকা নীলিমা তার আরাধ্য দেবতাকে আরও নিবিড় করিয়া যেন আশ্রয় করিল। ইদানীং কেবলই তার মুখে অবিরাম গুঞ্জন শোনা যাইত: "গিরিধারী সাথে মিলিতে যাইব, সুন্দর সাজে মোরে সাজায়ে দে"।

মানুষের সকল নর আশা-আকাঙ্ক্ষার অলক্ষ্যে নিগূঢ় দেবতার ইচ্ছাই পূর্ণ হইল। নীলিমার জীবনে অগ্রহায়ণ আর আসিবার অবসর পাইল না। দেবতার নির্ম্মাল্যের মতই পবিত্র নীলিমার জীবনে পার্থিব পরিণয় বুঝি ঘটিবার ছিল না।

দেখিতে দেখিতে পূজা আসিল। প্রতিবারের মতই বাড়ীশুদ্ধ সকলে দেশভ্রমণে বাহির হইলেন। চূড়ামণি যোগে নীলিমা কাশীতে গঙ্গায় মুক্তিস্নান করিল। মহানবমীর দিনে নীলিমা জ্বরে পড়িল। সেই জ্বর ক্রমশঃ বাড়িয়া টাইফয়েডে দাঁড়াইল। কলিকাতায় আনিয়া বত্রিশ দিন ধরিয়া বাপ-মা চিকিৎসার চরম করিলেন। স্নেহের দুলালীকে ঘিরিয়া উৎকণ্ঠ প্রিয়জন শুশ্রূষার অন্ত রাখিলেন না। তবুও কালের করাল ছায়া বুঝি [illegible]

[illegible]কিয়া বলিল, "মা শোন, কে যেন আমাকে অদ্ভুত রকমে [illegible]কছে।"

"কে সে? কোন মেয়েমানুষ?" উদ্‌গ্রীব হইয়া জননী প্রশ্ন করিলেন।

"না"—নীলিমার কণ্ঠ ক্ষীণ।

পুনরায় মা প্রশ্ন করিলেন, "তবে কি কোন পুরুষ মানুষ?"

বিগলিত স্বরে নীলিমা উত্তর করিল, "না। সে শুধু বাঁশী বাজিয়ে আয় আয় বলে' আমাকে ডাকছে, আমায় চন্দন পরিয়ে দিচ্ছে, ফুল দিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছে। আশ্চর্য্য, তোমরা শুনতে পাচ্ছ না কি সুন্দর করে' সে বাঁশী বাজাচ্ছে! ফুল-পরা ছোট ছোট ছেলেরা আমার গায়ে-পায়ে ফুল ছিটিয়ে দিচ্ছে আর হাত নেড়ে কেবলই ডাকছে!"

জগদ্ধাত্রীপূজার আগের দিন নীলিমার পরিপূর্ণ জ্ঞান রহিয়াছে। এক সময়ে সে আকস্মিক বলিয়া উঠিল, "উহুঁ আজ হতেই পারে না, কালও নয়, পরশু জরুর জায়েঙ্গে।"

আশ্চর্য্য, ঠিক তাহাই ঘটিল। পরশু দিন ১৩ই কার্ত্তিক। উত্থান একাদশী তিথি। অপরাহ্নে নীলিমা পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, "বেশ বুঝতে পারছি আজ মৃত্যু এসে গেছে।"

ঢং-ঢং করিয়া রাত্রি দশটা বাজিল। শুকবাক্ নীলিমা। শয্যালীনা শীর্ণ তনু। আসন্ন মৃত্যু প্রতীক্ষায় নীলিমার চারিপাশ ঘিরিয়া ঠাকুরমা, বাবা-মা, কাকারা, ভাই-বোন সকল প্রিয়জনেরা রুদ্ধশ্বাসে দণ্ডায়মান। পিতা বুক বাঁধিয়া প্রাণ-প্রতিমার শুষ্ক কণ্ঠে গঙ্গাজল দিলেন। নিষ্পন্দপ্রায় নীলিমার হস্তযুগ্ম ললাট-স্পর্শ করিল, আর অন্বেষণরত দুই চক্ষুতারকা ঘুরিতে ঘুরিতে সম্মুখের দেওয়ালে টাঙ্গানো তারই চিরারাধ্য ইষ্ট দেবতার চিত্রের প্রতি স্থিরনিবদ্ধ হইল।

দেবতাহীন নীলিমার শূন্য দেহমন্দির পড়িয়া রহিল।

কিন্তু এ মায়াময় মর্ত্ত্যে মৃত্যুই জীবনের অবসান নয়। মরণের ফাঁক দিয়া নীলিমার বিদেহী ভাবতনু চিন্ময় ধামে তারই একান্ত প্রিয়তম-মিলনের পরিণতির পথেই বুঝিবা অভিসার করিল।

ব্রহ্মসূত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

(তৃতীয় পাদ)

শ্রীমতিলাল রায়

জীব বা আত্মা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, অতএব নিত্য বা শাশ্বত। আবার ব্রহ্মই জগৎ হইয়াছেন। জগতের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নহে। অতএব জগৎও নশ্বর হইবে না। অমূল যাহার উপাদান, সে বস্তু নিত্যই হইবে।

ব্রহ্ম জগতের উপাদান। যেমন স্বর্ণ বলয় কুণ্ডলের উপাদান। উপাদান হইতে যাহা জাত, তাহা উপাদান মধ্যে পুনঃ পরিণত হওয়া অসঙ্গত নহে। কিন্তু এই পরিণতি জাত বস্তুর ইচ্ছাকৃত নহে। যাহা হইতে জাত, তাহারই ইচ্ছাসঙ্গত বলিয়া এক মাত্র তাহারই ইচ্ছাতে বস্তুর উদয় হইতে পারে। এইরূপ ব্রহ্মজাত সকল কিছু, তাহার প্রত্যক্ষ অথবা ক্রমিক অভিব্যক্তি যাহাই হউক, ব্রহ্ম হইতে উৎপন্নতা হেতু তাহার ব্রহ্মে লয়সম্ভাবনাও আছে। ইহা প্রদর্শন করার জন্য সৃষ্টিক্রম ও লয়ের আলোচনা আরম্ভ হইতেছে। যথা—

ন বিয়দশ্রুতেঃ ॥১

বিয়ৎ (আকাশ) ন (উৎপন্ন পদার্থ নয়) অশ্রুতেঃ (ইহার শ্রুতিবচন নাই)।

অর্থাৎ জীবের ন্যায় আকাশও অনুৎপন্ন নিত্য। কেননা শ্রুতিতে আকাশের উৎপত্তির কথা দেখা যায় না। যাহা উৎপন্ন হয়, তাহার লয়ও হয়। জীব ব্রহ্ম, জীবের লয় নাই, প্রপঞ্চময় জগৎ জীবের মত অনুৎপন্ন নয়; কিন্তু প্রতিপক্ষ বলিতেছেন—জীবের ন্যায় আকাশও অনুৎপন্ন। ব্যাসদেব তদুত্তরে বলিতেছেন—

অস্তি তু ॥২॥

তু (পক্ষান্তর দ্যোতনার্থক) (অস্তি অর্থাৎ আকাশের উৎপত্তির কথা শ্রুতিতে আছে)।

অর্থাৎ তুমি যে বলিতেছ, আকাশের উৎপত্তির কথা শ্রুতিতে নাই, তাহা সবখানি সত্য নহে। সকল শ্রুতি অবশ্য আকাশোৎপত্তির কথা বলেন নাই। কিন্তু তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে স্পষ্ট কথিত আছে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'; ব্রহ্মকে এইরূপ বিশেষিত করার পর বলা হইয়াছে "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" অর্থাৎ তাঁহা হইতেই আকাশ সম্ভূত হইয়াছে। অতএব শ্রুতিতে আকাশের উৎপত্তি কথা নাই বলিয়া আকাশ অনুৎপন্ন, এরূপ কথা সঙ্গত নহে। তদুত্তরে প্রতিপক্ষ বলিতেছেন—

গৌণ্যসম্ভবাৎ ॥৩॥

গৌণী (আকাশের এই উৎপত্তিবাদিনী শ্রুতি গৌণার্থে গ্রহণীয়) অসম্ভবাৎ (যেহেতু আকাশের উৎপত্তি অসম্ভব)।

কেবল একটী শ্রুতি-বচন উদ্ধার করিয়া আকাশের উৎপত্তি স্বীকার করা সঙ্গত নহে। ইহাতে অন্যান্য শ্রুতিবাক্যের বিরোধ উপস্থিত হয়। এই হেতু তৈত্তিরীয় উপনিষদের বাণী মুখ্য বলা সঙ্গত হইবে না। অন্যান্য শ্রুতিতে আকাশকে অনাদি বলা হইয়াছে। শ্রুতিতে আছে "আকাশ অনাদি, সূক্ষ্ম ও অতীন্দ্রিয়।" ছান্দোগ্য শ্রুতি সৃষ্টিক্রম দেখাইতে গিয়া স্পষ্টই বলিয়াছেন "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত" অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম ঈক্ষণ করিলেন অর্থাৎ তিনি আলোচনা করিলেন, তাহার পর তেজঃ সৃষ্টি করিলেন। এই শ্রুতিতে আকাশোৎপত্তির কোন কথা নাই। কেবল তৈত্তিরীয় উপনিষদে আকাশোৎপত্তির কথা আছে, অন্যান্য শ্রুতিতে নাই; অতএব শ্রুতিবিরোধ যখন হইতেছে, তখন তৈত্তিরীয় উপনিষদের উক্তি গৌণার্থে গ্রহণ করাই সঙ্গত। শ্রুতিবিরোধক্ষেত্রে লোক-মধ্যে একটাকে গৌণ ও অন্যটাকে মুখ্যার্থে গ্রহণ করার নীতি প্রবর্তিত আছে। 'আকাশং কুরু' অর্থাৎ আকাশ কর। আকাশ অখণ্ড হইলেও, ঘটাকাশ, মঠাকাশ রূপভেদ ব্যপদেশ বেদে আছে। "আরণ্যানাকাশেষ্বালভেরন্" অর্থাৎ আকাশে আরণ্য জীব বধ করিবে ইত্যাদি আকাশবাচ্য যেমন গৌণার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তৈত্তিরীয় উপনিষদে আকাশোৎপত্তির কথাও তদ্রূপ গৌণার্থে গ্রহণীয়। পরন্তু আকাশ অনুৎপন্ন বস্তু।

আকাশের উৎপত্তি অনুভূতিগ্রাহ্যও নহে। কেননা যে বস্তু উৎপন্ন হয়, সে বস্তুর পূর্ব্বের রূপ পরে থাকে না। ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বে উহার আকৃতি মৃত্তিকা থাকে। তেজের উৎপত্তির পূর্ব্বে অন্ধকারনাশাদি গুণ তাহাতে থাকে না। আকাশসৃষ্টির পূর্ব্বে উহা কিরূপ ছিল, তাহা কেহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেখিতে পারে না। প্রত্যেক উৎপন্ন বস্তুর প্রাক্ ভাব সর্ব্বজনবিদিত। আকাশের যখন প্রাক্-ভাব নাই, তখন উহা অনুৎপন্ন। যুক্তির দিক্ দিয়াও আকাশের উৎপত্তি অসম্ভব হয়। দ্রব্যের উৎপত্তিবিষয়ে কণাদের সিদ্ধান্ত অকাট্য। কোন বস্তুই নিম্নোক্ত কারণ-ত্রয় অতিক্রম করিয়া উৎপন্ন হয় না। সমবায়ী কারণ, অসমবায়ী কারণ, নিমিত্ত-কারণ দ্রব্যোৎপত্তির মূলে থাকা চাই। ঘটনির্ম্মাণের সমবায়ী কারণ—কপাল ও কপালিকা অর্থাৎ ঘটের দুইটী খাপড়া। অসমবায়ী কারণ—উক্ত খাপড়া দুইটীর সংযোগসাধন। নিমিত্ত-কারণ কুম্ভকার, রজ্জু, দণ্ড প্রভৃতি। আকাশোৎপত্তির এইরূপ কারণত্রয় যখন কিছু নাই, তখন আকাশও ব্রহ্মের ন্যায় অজ, অনাদি ও অনন্ত।

যুক্তি ও অনুভূতি ছাড়াও শ্রুতি প্রত্যক্ষভাবে আকাশ অনুৎপন্ন বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে। পরবর্ত্তী সূত্রে তাহা বলা হইতেছে—

শব্দাচ্চ ॥৪॥

শব্দ অর্থে শ্রুতি। শ্রুতিতে আছে—"বায়ুশ্চান্তরীক্ষ-ঞ্চৈতদমৃতম্" ইতি। অর্থাৎ বায়ু ও অন্তরীক্ষ, ইহারা অমৃত। অমৃতের উৎপত্তি হয় না। শ্রুতিতে আরও আছে—"আত্মা আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ"। শ্রুতির এই সকল উদাহরণের দ্বারা আকাশকে উৎপন্ন বস্তু বলা যায় না। আরও যুক্তি আছে—

স্যাচ্চৈকস্য ব্রহ্মশব্দবৎ ॥৫॥

একস্য চ (সম্ভূত শব্দের একবার গৌণ আর একবার মুখ্যার্থে) স্যাৎ (প্রয়োগ হয়, এই হেতু। অর্থাৎ এক শব্দের একবার এক অর্থে, অন্যবার অন্য অর্থে কেমন করিয়া প্রয়োগ হইতে পারে? এইরূপ প্রতিবাদের উত্তরে বলা যায়)—ব্রহ্মশব্দবৎ (ব্রহ্মশব্দের ন্যায় একই শব্দের মুখ্য ও গৌণ অর্থ হইয়া থাকে)।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে "আকাশঃ সম্ভূতঃ" শব্দের পর "তেজঃ সম্ভূতঃ", এই কথার উল্লেখ থাকায়, এক সম্ভূত-শব্দ আকাশ পক্ষে গৌণার্থে প্রযুক্ত হইল, আর পশ্চাদুক্ত তেজঃ প্রভৃতিতে মুখ্যার্থে ব্যবহৃত হইবে, ইহা অসঙ্গত বলিয়া যদি কেহ তর্ক উত্থাপন করেন, তাহার জন্য ব্রহ্মশব্দের প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে—"তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব তপোব্রহ্ম" অর্থাৎ তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর, তপস্যাই ব্রহ্ম। এখানে একই ব্রহ্মশব্দ যেমন একবার মুখ্য ও অন্য বার গৌণ অর্থে স্বীকার করা হইয়াছে, সেইরূপ সম্ভূত-শব্দেরও প্রয়োগ একবার গৌণ ও অন্যবার মুখ্য অর্থে হওয়ায় দোষ হয় না।

আকাশ অনুৎপন্ন বস্তু, তাহার আরও কারণ—ব্রহ্ম আকাশেরই সমলক্ষণ। শ্রুতিতে আছে—সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন। শ্রুতির এই উক্তি তৈত্তিরীয় উপনিষদে সমর্থিত হইয়াছে। "তথাচাকাশশরীরং ব্রহ্মেতি" অর্থাৎ আকাশশরীর ব্রহ্ম। এই ক্ষেত্রে ব্রহ্ম ও আকাশ একই ও নিত্য পদার্থ। ব্রহ্মের ন্যায় আকাশও সর্ব্বব্যাপী।

(ক্রমশঃ)

পাথর

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ কুণ্ডু

পথে পথে ফিরি অনাথ আতুর ভগবানে নাহি পায়—
পথের পাথর দেবতা হইয়া মন্দিরে আছে হায়!
যারা কাঁদিতেছে দেখা দাও বলে
তাদের দেবতা গেছে কোথা চলে;
যাহারা পেয়েছে তারা ভুলে গিয়ে আর তারে নাহি চায়।

চাওয়া ও পাওয়ার হেন ব্যবধানে আজিকার ভগবান
মানুষের দ্বারে নীরব হইয়া হ'য়ে আছে হতমান!
আজিকে তাহার পাথরের আঁখি
কাজল পাহাড়ে রাখিয়াছে ঢাকি
প্রস্তর চাপে ক্ষয় হ'ল প্রাণে হৃদয়ের অবদান!

জলযানের জন্ম ও ক্রমবিকাশ

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

জলযানের ক্রমবিকাশের কাহিনী আমরা বলিতে পারি বটে, কিন্তু উহার জন্মকথা যথাযথ ভাবে বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। কারণ যেমন আমরা জন্মাই বা আমাদের মত কোন জীব জননীর জঠর হইতে একটি নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে জন্ম গ্রহণ করে, জলযান ঠিক সেইরূপ ভাবে জন্মায় নাই। কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির উদ্ভাবনীশক্তির দ্বারা কোন বিশেষ দেশে জলযানের জন্ম হয় নাই বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। অতি প্রাচীনকালে নানা দেশের লোক প্রয়োজনের তাড়নায় নানা প্রকার নৌকা নির্ম্মাণ করিতে শিখিয়াছিল। সুতরাং কোন বিশেষ ব্যক্তিকে জলযানের জনক বা আবিষ্কারক বলা যায় না। প্রশ্ন উঠিতে পারে, জলরাশি অতিক্রম করিবার উপযোগী যানের পরিকল্পনা সর্ব্বপ্রথম কাহার মনে জাগ্রত হইয়াছিল? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আদৌ সহজ নহে। কোন্ দেশের অধিবাসীরা ইহার ব্যবহার সর্ব্বাগ্রে শিখিয়াছিল, তাহাও বলা কঠিন। ক্ষুদ্র বা বৃহত্তর নদ-নদীর তীরে যে সকল দেশ বিরাজিত, অবশ্য তাহাদের অধিবাসীরাই এ বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অগ্রগামী হইতে সমর্থ হইয়াছিল। কোন কোন জাতি অতি প্রাচীনকালেই জলযান-চালন-বিষয়ে অধিকতর দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিল, ইহাও সত্য।

আদিম মানুষ সর্ব্বপ্রথম সন্তরণের সাহায্যেই জলরাশি অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। তারপর জলস্রোতে ভাসমান কাষ্ঠখণ্ড অবলম্বন করিয়া পরপারে যাইতে প্রয়াস করিয়াছিল। অবশ্য এখানে আমরা দৈবাৎ ভাসিয়া আসা কাষ্ঠখণ্ডের কথা বলিতেছি। ইহার পর প্রাগৈতিহাসিক মানুষ নিজে কাষ্ঠখণ্ড ভাসাইয়া তাহার সাহায্যে নদ-নদী পার হইতে প্রযত্ন করিতে লাগিল। পরে সে ভেলার ব্যবহার শিখিল। কয়েকটি কাষ্ঠখণ্ডকে লতা ও পাতার দ্বারা একত্র গ্রথিত করিয়া সে ভেলা প্রস্তুত করিল। 'রীড়' বা নল-জাতীয় তৃণকে গুচ্ছাকারে বাঁধিয়াও এক প্রকার ভেলা প্রস্তুত হইতে লাগিল। ভেলার সঙ্গে সঙ্গে ডিঙ্গির ব্যবহার হইতে আরম্ভ হইল। প্রথমে অগ্নির সাহায্যে বৃক্ষকে শূন্য-গর্ভ করিয়া, সেই শূন্য-গর্ভ বৃক্ষকে ডিঙ্গিরূপে নদ নদী পার হইবার জন্য ব্যবহার করা হইতে লাগিল। পরে প্রস্তর-প্রস্তুত অস্ত্রের সাহায্যে

মশকের সাহায্যে গঙ্গা পার হইবার দৃশ্য: এই জাতীয় জলযান প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে

বৃক্ষের বক্ষকে গহ্বরে পরিণত করিয়া ডিঙ্গি নির্ম্মিত হইল। বৃহৎ বংশ-খণ্ড বা অন্য কোন প্রকার দণ্ড ডিঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে জলের বুকে ইচ্ছামত চালনের জন্য ব্যবহৃত হইতে লাগিল, ইহাও সত্য। ইহার পর ক্রমশঃ অতি সাধারণ নৌকার পরিকল্পনা প্রাচীন মানবের মনে জাগিয়া উঠিল। যতই মানুষ লৌহ-নির্ম্মিত যন্ত্র-পাতি ব্যবহার করিতে শিখিল, ততই তাহার পক্ষে উপযুক্ত জলযান প্রস্তুত করা সহজ হইল। দীর্ঘদণ্ড অপেক্ষা দাঁড়ের দ্বারা অধিক সুবিধা হইতে পারে, ইহাও সে ক্রমশঃ শিখিল এবং পরে অনুকূল বাতাসে পাল তুলিয়া দিয়া নৌকাপরিচালনের পরিকল্পনা তাহার অন্তরে উদিত হইল।

সকল দেশেই যে একই প্রকার জলযান প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা নহে। কোন কোন দেশে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আজ পর্য্যন্তও চর্ম্ম-নির্ম্মিত জলযানের ব্যবহার চলিতেছে। এই বাষ্পচালিত বড় বড় জাহাজের যুগেও প্রায় প্রত্যেক দেশেই আদিম বা প্রাচীন প্রণালীর জলযান ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভেলা, ডিঙ্গি এবং সম্পূর্ণ সেকেলে নৌকা এখনও চলিতেছে। হিমাদ্রি হইতে কন্যা-কুমারী পর্য্যন্ত প্রসারিত বিশাল ভারতবর্ষে প্রাচীন পন্থায় প্রস্তুত বহু প্রকার বিচিত্র জলযান আজিও দেখা যায়। যাহাকে প্রাচীনতম প্রণালীর অবশেষ বলা চলে, এরূপ উপায় নদ-নদী পার হইতে এখনও অনেক দেশেই অবলম্বিত হয়।

সিন্ধুনদ-বক্ষে প্রসারিত-পাল নৌকা

ইংরেজীতে যাহাকে 'ডাগ্ আউট' বলা হয়, বাঙ্গালায় তাহাকে ডিঙ্গি বলিলে ভুল হয় না। অগ্নি বা হাতিয়ারের সাহায্যে বৃক্ষকাণ্ডের বক্ষকে গহ্বরে পরিণত করিয়া উভয়ই প্রস্তুত হয়। আমাদের দেশের নানা স্থানে এখনও গহ্বর-বক্ষ তাল-বৃক্ষ ডিঙ্গি-রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। বাল্যে আমরাও এইরূপ ডিঙ্গির সাহায্যে নদী পার হইয়াছি। দুইটি ডিঙ্গিকে একত্র করিয়া তাহাদিগের সাহায্যে গরুর গাড়ীর ন্যায় গুরুভার পদার্থ পার করার দৃশ্যও আমরা দেখিয়াছি। ডিঙ্গি বা ডাগ-আউট যে আদিম [illegible] থাকিতে পারে না। আমাদের দেশে পরে ছোট নৌকাকে ডিঙ্গি নাম দেওয়া হইলেও প্রকৃত ডিঙ্গি উহারা নহে।

মশকের সাহায্যে গঙ্গানদী ও সিন্ধুনদ পার হইতে এখনও দেখা যায়। চর্ম্মকে বায়ুর দ্বারা স্ফীত করিয়া এই অতি প্রাচীন প্রণালীর জলযান প্রস্তুত করা হয়। মৃত ছাগাদির দেহের সমগ্র চর্ম্মকেই এই অদ্ভুতাকৃতি জলযানে পরিণত করা হয়। দূর হইতে দেখিলে ছাগাদি পশুর মৃতদেহ ভাসিয়া আসিতেছে বলিয়া মনে হয়। এক প্রকার ক্ষুদ্র মশক আছে, যাহাতে আরোহণ করা হয় না, উহার সাহায্যে সন্তরণ করিয়া নদী পার হওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত বৃহৎ মশকে চড়িয়া এবং দীর্ঘদণ্ড বা লগির সাহায্যে উহাকে চালাইয়া সিন্ধু ও গঙ্গার ন্যায় নদীও পার হওয়া যায়। কাষ্ঠ-ব্যবসায়ী বড় বড় কাষ্ঠখণ্ডকে মশকের সাহায্যে বহুদূরবর্ত্তী স্থানেও লইয়া যাইতে সমর্থ হয়। এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ কতকগুলি মশককে একত্র করা হয় এবং কাষ্ঠগুলিকেও একত্রিত করিয়া ভেলাকারে পরিণত করা হইয়া থাকে। আসীরিয়ার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে সকল আশ্চর্য্যজনক ভাস্কর্য্য-কীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে বায়ুর সাহায্যে স্ফীতীকৃত চর্ম্ম বা মশকের প্রতিকৃতিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। অনেকেই জানেন—মুসলমানদিগের দ্বারা ব্যবহৃত চর্ম্মময় জলাধারকেও মশক বলা হয়।

চর্ম্ম-নির্ম্মিত জলযান বহু দেশে আজিও ব্যবহৃত হইতেছে। পৃথিবীর উচ্চতম দেশসমূহের অন্যতম তুষার শীতল উষর তিব্বতের অধিকাংশই বৃক্ষ-বিহীন বলিয়া সেখানে ডিঙ্গি বা কাষ্ঠনির্ম্মিত নৌকা দেখা যায় না। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে বহু উচ্চে বিরাজিত সুতীব্র শৈত্য-পূর্ণ তিব্বতে প্রধানতঃ ইয়াক নামক পশুই পালিত হইয়া থাকে। এরূপ তুষারপূর্ণ শীতার্ত্ত উচ্চতায় অপর পশু বাঁচিয়া থাকা কষ্টকর। কতিপয় ইয়াক-চর্ম্ম একত্র গ্রথি

করিয়া তিব্বতীরা এক প্রকার জলযান নির্ম্মাণ করে এবং সেই জলযানের সাহায্যে তাহারা ব্রহ্মপুত্রাদি নদী পার হয়। অনেক সময়ে কাষ্ঠনির্ম্মিত ভেলাকে চর্ম্মাবৃত করিয়া যে জলযান প্রস্তুত করা হয়, তাহার আকার অনেকটা নৌকার মত। নৌকার মতই দাঁড় টানিয়া আগাইয়া যাইতে হয়।

বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসী বৃটনরাও চর্ম্ম-নির্ম্মিত তরণী ব্যবহার করিত। বৃটনরা কেল্‌টিক্ শাখার অন্তর্ভুক্ত সম্প্রদায়। সুতরাং আমাদের মনে হয়—কেল্‌টিক্ জাতিভুক্ত সম্প্রদায় মাত্রেরই মধ্যে চর্ম্ম-নৌকার প্রচলন ছিল। ইংলণ্ডের পশ্চিমস্থ ওয়েলস্ প্রদেশে এবং আয়র্লণ্ডে করাকল নামক জলযান আজিও দেখা যায়। পূর্ব্বে কঞ্চির কাজ-করা বড় বড় ঝোড়াকে চর্ম্মে আবৃত করিয়া এই নৌকা প্রস্তুত করা হইত। বর্ত্তমানে করাকলের অভ্যন্তর ভাগ য়্যাশ বা উইলো বৃক্ষে প্রস্তুত হয় এবং এই কাষ্ঠময় কাঠামোর উপর ক্যান্‌ভাসের আচ্ছাদন থাকে। এই আচ্ছাদনকে ওয়াটার-প্রুফ করিবার জন্য উহার গাত্রে আলকাতরা বা বার্ণিশ লেপন করা হয়। আইরিশ ও ওয়েলস্ উভয় জাতিই প্রাচীন কেল্‌টিক্‌দিগের বংশধর।

কেল্‌টিক্‌দিগের ব্যবহৃত করাকলের সহিত তাইগ্রিস ও ইয়ুফ্রেতিস নদ অতিক্রম করিতে মেসোপোটেমিয়া-বাসীদের দ্বারা ব্যবহৃত গুফা নামক জলযানের সাদৃশ্য যথেষ্ট দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বের করাকলের ন্যায় গুফার কাঠামোতে কঞ্চির কাজ থাকে এবং প্রাচীন করাকলের মতই উপরে চর্ম্ম-নির্ম্মিত আচ্ছাদন দেওয়া হয়। চর্ম্মকে জলের প্রভাব হইতে বিমুক্ত রাখিবার জন্য উহার উপর পিচের পাতলা পর্দ্দা সংলিপ্ত করিবার প্রথা প্রচলিত। অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার গুফাগুলিতে পালিত পশুপালও পার হইতে পারে। এ কথা অনেকেই জানেন—মেসোপোটেমিয়া অতি প্রাচীন সভ্যতার লীলাস্থলী দেশসমূহের অন্যতম। এক সময়ে ইয়ুফ্রেতিস্ তীরে সুমেরীয় ও বাবিলোনীয় সভ্যতার এবং তাইগ্রিস তীরে আসীরীয় সভ্যতার বিস্ময়কর বিকাশ দেখা গিয়াছিল।

উত্তর মেরুর অধিবাসী এস্কিমো নামক সম্প্রদায়ও চর্ম্ম-নির্ম্মিত নৌকা ব্যবহার করে। এই নৌকার নাম কা-ইয়াক। তিমির অস্থির উপর উত্তরসাগরবাসী শীল নামক প্রাণীর চর্ম্ম বিস্তৃত করিয়া এই জলযান প্রস্তুত করিয়া থাকে। এস্কিমোরা এই অস্থি ও চর্ম্মে নির্ম্মিত ক্ষুদ্র নৌকায় চড়িয়া অনায়াসে বিরাট্ বারিধিবক্ষে বিচরণ করিতে পারে। বারিধিবক্ষে ব্যবহৃত জলযানসমূহের মধ্যে ইহাই

শঙ্করের সিন্ধুনদতীরে সমতল-তল বিশিষ্ট নৌকাশ্রেণী

আকারে ক্ষুদ্রতম। দৈর্ঘ্যে ইহা ১৭ ফুটের অধিক হইবে না এবং ইহার প্রশস্ততা ২ ফুটেরও অল্প। এক-জনের অধিক আরোহী ইহাতে চড়া চলে না। ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর এক প্রকার নৌকাও এস্কিমোদিগের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। এই জলযানের নাম উম্-ইয়াক। জলস্রোতে ভাসিয়া-আসা কাষ্ঠখণ্ডগুলিকে একত্র গ্রথিত করিয়া এবং পরে উহাদিগকে বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত চর্ম্মাবৃত করিয়া এই নৌকা নির্ম্মাণ করা হয়। ৪০ ফুট লম্বা উম্-ইয়াকও দেখা যায়। ইহাতে দুই তিনটি পরিবার নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যসম্ভার সহ অনায়াসে আরোহণ করিতে পারে। লৌহ বা অন্য কোন ধাতুনির্ম্মিত যন্ত্রপাতি বা কীলকাদির সাহায্য না পাইয়াও আদিম এস্কিমোগণ কি প্রকারে

উম্-ইয়াক প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহা আমাদের বিস্ময়ের বিষয় হইতে পারে।

ক্যাটামারাণ জাতীয় নৌকার নাম অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। ক্যাটামারাণ আমেরিকাতেও দেখা যায়। সকলে হয় তো জানেন না যে, ক্যাটামারাণ জাতীয় জলযানের জন্মস্থান দক্ষিণ ভারত। ক্যাটামারাণ শব্দটি তামিল। এই তামিল শব্দের অর্থ গ্রথিত কাষ্ঠখণ্ড। দক্ষিণ ভারতে ও সিংহলে এই জাতীয় জলযানের বিস্তৃত ব্যবহার দেখা যায়। ইহা সাধারণতঃ তিনটি বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ডকে একত্র সংলগ্ন করিয়া প্রস্তুত করা হয়। মধ্যবর্ত্তী কাষ্ঠখানি অপেক্ষাকৃত

মালাবার উপকূলের মাছধরা নৌকা: ধীবরদিগের মস্তকাবরণ লক্ষ্য করিবার যোগ্য

দীর্ঘতর হইয়া থাকে এবং ইহার একটি প্রান্তকে বক্র করিয়া ধনুকাকারে পরিণত করা হয়।

প্রশান্ত মহাসমুদ্রবক্ষে বিরাজিত পলিনেশিয়া আখ্যায় অভিহিত দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে স্যামোয়া নামক দ্বীপ আছে। এই দ্বীপের অধিবাসীরা দুইখানি কেনু-জাতীয় নৌকাকে একত্র সংলগ্ন করিয়া ব্যবহার করে। এই যুগ্ম বা যৌড়া নৌকাকে ক্যাটামারাণ বলা হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত ক্যাটামারাণ একমাত্র দ্রাবিড় এবং সিংহলেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। মাস্তুল এবং পালযুক্ত একপ্রকার বৃহদাকার ক্যাটামারাণ-জাতীয় নৌকা দক্ষিণ আমেরিকার মহানদ আমাজনের বক্ষে দেখা যায়। প্রশান্ত মহাসাগরে অসংখ্য দ্বীপ অবস্থিত। এই সকল দ্বীপের অধিবাসীরা রুদ্র সমুদ্র-[illegible] এক দ্বীপ হইতে অন্য দ্বীপে যে ভাবে যাওয়া আসা করে, তাহা দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। উচ্চ-বীচিবিচঞ্চল বারিরাশির দ্বারা বেষ্টিত হইয়া যাহারা বাস করে, জল দেখিয়া ভয় পাইলে তাহাদের চলে না। ইহারা যে সকল জলযান ব্যবহার করে, তাহাকে ডিঙ্গি বলিলেই ঠিক হয়। আদিম অধিবাসীদিগের ব্যবহৃত এই সকল জলযানকে সাধারণতঃ কেনু আখ্যা দেওয়া হয়। কেনু এক প্রকারের নহে। এমন অনেক কেনু আছে, যাহা আমাদের দেশের ডিঙ্গির মতই সাদা-সিধা। ফিজি, স্যামোয়া প্রভৃতি পলিনেশিয়ান দ্বীপে এইরূপ কেনুই প্রধানতঃ দেখা যায়। ইহারা প্রায়ই পালের সাহায্যে পরিচালিত হইয়া থাকে।

উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসী রেড-ইণ্ডিয়ানরা বার্চ্চ বৃক্ষের বল্কলে প্রস্তুত কেনু ব্যবহার করে। হাল্কা কাঠের কাঠামোর উপর বার্চ্চ বৃক্ষের বল্কলসমূহ সংলগ্ন করিয়া এই সকল কেনু তৈয়ারী করা হয়। বল্কলগুলিকে একপ্রকার বৃক্ষের শক্ত শিকড়ের সাহায্যে সেলাই করিয়া কাঠামোর সহিত সংযুক্ত করা হইয়া থাকে। এই আবরণকে ওয়াটার-প্রুফ করিবার জন্য বা জলের প্রভাব হইতে বিমুক্ত রাখিবার জন্য বৃক্ষবিশেষের নির্য্যাস বা আটা উহার গাত্রে লিপ্ত করিবার প্রথা প্রচলিত। একটিও কীলক বা পেরেক ব্যবহার না করিয়া রেড-ইণ্ডিয়ানরা যে-ভাবে এই সকল কেনু নির্ম্মাণ করে, তাহাতে তাহাদিগের রচনাকৌশলের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। সম্ভবতঃ রেড-ইণ্ডিয়ানরা এশিয়া হইতে বেরিং প্রণালী পার হইয়া উত্তর আমেরিকায় গিয়াছিল। বহু বৃহৎ এবং বেগবান্ নদ-নদীতে পরিপূর্ণ এই মহাদেশে প্রবেশ করিলে, তাহাদিগের পক্ষে সেই তরঙ্গ-ভঙ্গ-ভীষণ গর্জ্জমান সলিলরাশি যে সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাই তাহাদিগকে এই প্রকার লঘুভার ও ক্ষিপ্রগামী জলযানরচনায় প্রণোদিত করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আদিম অধিবাসীরা

যে সকল জলযান প্রস্তুত করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে উত্তর আমেরিকার রেড-ইণ্ডিয়ানদের বল্কলরচিত এই কেনুই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, হাল্কা এবং দ্রুতগামী। অসভ্য জাতিদের দ্বারা উদ্ভাবিত হইলেও, এই জাতীয় জলযান বহু সভ্য সম্প্রদায়ের দ্বারা পরে সাগ্রহে গৃহীত হইয়াছে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে আকার একই প্রকার রাখিয়া উপকরণের পরিবর্ত্তন সাধন করা হইয়াছে। এক প্রকার কেনুকে "ক্যানেডিয়ান কেনু" নাম দেওয়া হয়। গাছের ছালের পরিবর্ত্তে ক্যানভাস আচ্ছাদনরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে মাত্র। এই শ্রেণীর কোন কোন কেনুতে কাঠামো এবং আবরণ দুইই কাঠের। দেখিলে মনে হইবে—এই ক্ষুদ্রকায় কেনু রুদ্র মূর্ত্তি সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার আঘাতে মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া যাইবে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় না। ইহা উদ্বেল উর্ম্মিমালার উপর দিয়া অনায়াসে নাচিতে নাচিতে চলিয়া যায়। একবার ১৭ ফুট দীর্ঘ এবং ২৩ ইঞ্চি প্রশস্ত একখানি কেনু ১১ ঘণ্টায় বুলোঁ হইতে ডোভার গিয়াছিল। হেণ্ডারসন নামক একটি সপ্তদশবর্ষ বয়স্ক বালক একখানি অতি ক্ষুদ্র কেনুতে চড়িয়া এবং উহা স্বহস্তে চালাইয়া ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্সের উপকূলে পৌছিয়াছিল।

অন্যতম প্রাচীন সভ্যতার লীলা-ক্ষেত্র মিশরে নলজাতীয় উদ্ভিদে রচিত নৌকা (অতি প্রাচীনকালে যাহা মিশরে ব্যবহৃত হইত) এখনও ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন মিশরের সম্রাটদিগকে ফেরাহ বলা হইত। ৪ হাজার বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ফেরাহের সমাধিতে এইরূপ নৌকার নমুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে। শবের সহিত ক্ষুদ্রকায় নৌকা সংরক্ষিত করার প্রথা অনেক দেশে প্রচলিত আছে। উদ্দেশ্য—উক্ত ব্যক্তির প্রেতাত্মা উহার সহায়তায় বৈতরণী পার হইতে সমর্থ হইবে। ফেরাহের সমাধিতে যে নল-নির্ম্মিত নৌকার নমুনা পাওয়া গিয়াছে, তাহা দেখিলে মনে হয় যে [illegible] গুচ্ছগুলিকে একত্র গ্রথিত করিয়া ভেলাকারে পরিণত করার প্রথাই বর্ত্তমান ছিল। দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত বলিভিয়া নামক দেশে টিটিকাকা নামক হ্রদ আছে। এই হ্রদ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৩ হাজার ফুট উচ্চে অবস্থিত। হ্রদটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০ মাইল। এত উচ্চে এরূপ বৃহৎ হ্রদ পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। মিশরের নল-নির্ম্মিত নৌকার ন্যায় (নল-জাতীয় উদ্ভিদেই প্রস্তুত) জলযান এই হ্রদ-বক্ষেও লক্ষিত হয়। একদা বলিভিয়া ইন্‌কা-সভ্যতার লীলাস্থলী ছিল। নল বা অন্য কোন জাতীয় উদ্ভিদের গুচ্ছকে রজ্জুতে বাঁধিয়া এবং অবশেষে সেই গুচ্ছগুলিকে একত্র গ্রথিত করিয়া বলিভিয়াবাসীরা নৌকা নির্ম্মাণ করে। এই সকল নৌকার আর একটি বৈশিষ্ট্য—ক্যানভাস বা বস্ত্রের পরিবর্ত্তে নল-জাতীয় তৃণরচিত পালের ব্যবহার। মিশরে নদী-পারাপারের জন্য নাগার নামক এক প্রকার প্রাচীন ধরণের নৌকা এখনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই নৌকা সুদৃশ্য বা সুদৃঢ় নহে। নীল-নদের বক্ষে ব্যবহৃত দাহাবী নামক নৌকা বিশেষ সুদর্শন। ইহা যখন নীলের নৃত্যশীল জলরাশির উপর দিয়া প্রশস্ত পালে ভূষিত হইয়া অনুকূল বাতাসে আগাইয়া যায়, তখন সেই দৃশ্য দর্শকদলের অন্তরে হর্ষ সঞ্চারিত করে।

টুকরীর আকারবিশিষ্ট প্রাচীনকালের জলযান : কেল্টিক্ করাকলের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে

মধ্যে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ ব্যাপার বলিয়া গণ্য হইত

বটে, কিন্তু এক সময়ে ভারতবর্ষের জনসাধারণ না হইলেও সম্প্রদায়বিশেষ নৌ-বিদ্যানিপুণ যে ছিলেন, সে বিষয়ে সংশয় নাই। ভারতের বাণিজ্য-পোত পণ্যবিনিময়ের জন্য বহুদূরবর্ত্তী দেশেও গমন করিত। বৈদিকযুগে যাহাই হউক, বৌদ্ধযুগে যখন ভারতবর্ষ সমৃদ্ধির সমুচ্চ শিখরে সমারূঢ়, তখন বিশাল বারিধিবক্ষে ব্যবহারের উপযুক্ত উৎকৃষ্ট পোত ভারতে প্রস্তুত হইত। সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে এবং মহাভারত প্রভৃতি পুরাণে জলযানের উল্লেখ আছে। মহাভারতে পোত-সম্পর্কীয় শুল্কেরও উল্লেখ দেখা যায়। এক সময়ে বঙ্গদেশে নৌ-শিল্প বিশেষ বিকাশ লাভ

চৈনিক জাঙ্ক

করিয়াছিল। বঙ্গের সপ্তগ্রাম ও তাম্রলিপ্ত বিশ্ববিখ্যাত বন্দর ছিল। একদিন বাঙ্গালী সদাগরদের পণ্যপূর্ণ সুদৃশ্য পোতশ্রেণী সমুদ্র-সলিলে শোভা পাইত। বঙ্গের বহু কৈবর্ত্তবীর জলযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অনেকে মনে করেন যে, চৈনিকরাই সমুদ্রগামী পোত প্রথম প্রস্তুত করিয়াছিল। চীন অতি প্রাচীনকালে যে সভ্যতালোক প্রাপ্ত হইয়াছিল, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। সভ্যতা-সম্পর্কে সাহায্যকারী বহু ব্যাপারে চীনবাসীরা পথপ্রদর্শক, ইহাও সত্য। তাহারাই সমুদ্রবক্ষে ভ্রমণকারীর পক্ষে মহাসহায়ক দিগ্দর্শন যন্ত্রের আবিষ্কারক।

লাভ করিয়াছে বলিয়া তাহারা নৌ-শিল্পীরূপেও নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছে। পোতের 'কোন কো- পরম প্রয়োজনীয় অঙ্গ চীনারাই প্রথম প্রস্তুত করিয়া সেই বিষয়ে পাশ্চাত্য জাতিদিগেরও পথপ্রদর্শক হইয়াছে। বাতাস প্রতিকূল হইলেও জাহাজ যাহাতে গন্তব্যাভিমুখে যাইতে পারে, সেইরূপ উপায় তাহারাই প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিল বলিয়া কথিত। চৈনিক জাঙ্ক-জাতীয় জাহাজ প্রাচীন পন্থায় প্রস্তুত পোতসমূহের মধ্যে কার্য্যকারিতার জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুদূর অতীতে যাহার জন্ম হইয়াছিল, উপযোগিতার জন্য এই বাষ্পীয় যানের যুগেও তাহা আজও সমভাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

অনেকে দূর-অতীতের নৌবিদ্যানিপুণ জাতিদের মধ্যে ফিনিসীয়ানদিগকেই অগ্রণী বলিয়া মনে করেন। ফিনিসীয়ানরা পশ্চিম এশিয়ায় প্যালেষ্টাইন উপকূলের ১২ মাইল মাত্র প্রশস্ত ক্ষুদ্র একটি ভূখণ্ডের অধিবাসী হইয়াও অধ্যবসায়বলে পোত প্রস্তুত ও পরিচালন করিতে বিস্ময়কর দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিল। অবশ্য নিকটে অরণ্য থাকার জন্য তাহাদের পক্ষে পোতনির্ম্মাণ করিবার উপযোগী উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ সংগ্রহ করা সহজ হইয়াছিল। প্রাচীন মিশর সভ্যতার পথে যতই অগ্রসর হউক, নৌ-বিদ্যায় বিশেষ নৈপুণ্য তাহাদের কোনদিনই ছিল না। এ বিষয়ে মিশরের অপেক্ষা ভারতের দক্ষতা ছিল অনেকগুণ অধিক। পাঁচ হাজার বা তদপেক্ষাও অধিককাল পূর্ব্বে ভারতের সহিত চ্যাল্‌দিয়া, ফিনিসীয়া প্রভৃতি এশিয়ার পশ্চিম-প্রান্তবর্ত্তী দেশসমূহের জলপথে আদানপ্রদান চলিত। ফিনিসীয়ানরা ভারত হইতে গজদন্ত, শিখিপুচ্ছ, মণি-মাণিক্য লইয়া গিয়া উহাদিগের ব্যবহার প্রতীচীতে প্রথম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকের অভিমত। ফিনিসীয়ানদিগের পর ভারতের উপকূলের সহিত আরবদিগের বাণিজ্য-সম্পর্ক উল্লেখযোগ্য। নাবিকরূপে

নাবিকরাও নির্ভীকতা ও নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছে।

প্রতীচীর প্রথম পোত-প্রস্তুতকারকদিগের মধ্যে নর্স জাতি বা নরওয়েবাসীরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিল। নাবিকরূপেও তাহারা যে অসম-সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছে, তাহাও বিস্ময়কর। এই সাহসের চিত্তাকর্ষক বিচিত্র কাহিনী কাব্যে ও কথায় স্থান লাভ করিয়াছে। এক সময়ে নির্ভীক নর্স নাবিকদিগের জন্য বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদিগকে সদা শঙ্কিত থাকিতে হত। বিখ্যাতনামা নর্স-দেশীয় কবি ওলাফ ট্রিগ্‌ভ্যাসনের রচনায় একটী দীর্ঘাকৃতি পোতের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই জাহাজের দৈর্ঘ্য ১ শত ৪০ ফুট এবং ইহাতে দাঁড় টানিবার জন্য যে সকল বসিবার আসন ছিল, তাহার সংখ্যা ৩১টির কম নহে। সেই যুগে এরূপ জলযান নৌ-বিদ্যায় নৈপুণ্যের পরিচয় বটে। মোটের উপর নর্স নৌকানির্ম্মাতাদিগের দ্বারা নৌ-শিল্প বিশেষ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল। যেমন বৃটেন এক সময়ে নর্স বা ভিকিং জলদস্যুদলের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিল, তেমনই ভারতবর্ষকে এক সময় দুর্দ্ধর্ষ পর্ত্তুগীজ পাইরেট জলদস্যুদিগের অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছে। ইউরোপের জাগরণ-যুগে গ্যাস, বিদ্যুৎ, ষ্টীম প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উৎকর্ষের সহিত নৌশিল্পে যে যুগান্তর আসিল, সে কথা বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

মানুষ

শ্রীতারাকুমার সান্যাল

মাটিতে মানুষ সমাধি লভেছে, নাই সে হেথায় বেঁচে—
আজিকে মানুষ মানুষে দিয়াছে মনের মানুষে বেচে।
মানুষের দেহ আশ্রয় করি'
সঞ্চরে সুখে প্রেত নিশাচর-ই।
কলুষ-কালীতে অন্তর ভরি' কে নিল সুষমা সেঁচে
দৈন-দস্যু হানা দেয় ঘরে মানুষ নাইকো বেঁচে।

জননীর ক্রোড়ে কাঁদে ক্ষীণ শিশু⋯স্তনে নাই তার ক্ষীর
শিশুর শোষণে শিরা-উপশিরা বাহি' যে বয় রুধির—
নয়নে সলিল নাহি আর গলে
আলেয়ার আলো নেভে আর জলে
মনের আগুনে পুড়ে পলে পলে চঞ্চল অস্থির⋯
লাভের নেশায় লোভ জেগে ওঠে, হলাহল ফেরে ক্ষীর।

মাটির ভুবনে থেমে গেছে মৃদু সেতারের মিঠা সুর
শুধু ধূ-ধূ-করা মরুভূমি হেথা, ভেঙ্গে গেছে দেবপুর!
প্রেতিনী বসেছে দেবীর আসনে
মানুষ মরেছে শোষণে, শাসনে
কোথা কৌমুদী হুতাশনে শুধু শুনি ধ্বংসের সুর
ভাঙ্গা আসরেতে গড়াগড়ি যায় মৃদঙ্গ তানপুর।

উর্ব্বশী আর নৃত্য করে না, চীৎকারে শিশু-শিবা
চন্দ্রের মৃদু আলো হতে ভাল তাঁর বিজলী-বিভা?
কল্পনা বুকে কাঁদে হতাদরে
রূঢ় বাস্তব টুঁটি চেপে ধরে,
বুভুক্ষা কাঁদে অন্ধ জঠরে সভ্যতা ধরে গ্রীবা
চাওয়ার নেশায় ফিরে চাহেনাকো হারায় দেখেনা কিবা।

পীন-উন্নত পয়োধর কিগো কাম-বিলাসেরই ছলা?
স্বার্থের লোভে চাহে না সে আর অমৃত স্নেহ-গলা।
মনের মানুষ বাহিরের চাপে
অন্তরাসনে দিবা-রাতি কাঁপে?
কি বাণী তাহার কার অভিশাপে হয় নাই আজো বলা?
মুক্তি মাগিলে নব সভ্যতা টিপে ধরে তার গলা।

মরে বেঁচে আছে মাটির মানুষ⋯বুভুক্ষু অন্তর।
মরে বেঁচে আছে মাটির দেবতা, অর্দ্ধ দেবতা-নর।
হে মাটির দেব, পরমহংস,
তোমারই এ জাতি, দেবের অংশ
মরে বেঁচে আছে মনুর বংশ, মনুর বংশধর
হেথায় মানুষ মরে বেঁচে আছে⋯বুভুক্ষু অন্তর।

তাওয়ারীশ্ *

শ্রীসত্যব্রত মুখোপাধ্যায়

বাড়ীখানি ডনের তীরে; দূর হ'তে মনে হয় বুঝি একটা সারস গায়ে শেওলা মেখে তীরে বসে ঢেউ গুনছে। ধব্‌ধবে বাড়ীখানার উপরে মাধবীলতা কুঁড়ি বুকে করে' অপেক্ষা করছে বর্ষার প্রতীক্ষায়। ডনের কল্লোল তাদের শুনিয়ে যায় কত আশার বাণী।

বাড়ীটি স্থানীয় কৃষিপ্রতিষ্ঠানের মেস্। সব সময়ে হৈ-হৈ লেগেই আছে। এদের সবাই যুবক-যুবতী—সমবয়সী। জীবনের সমস্ত দুঃখকে এরা প্রাণখোলা হাসি হেসে করেছে জয়।

মিল্‌কা থাকে ঠিক ডনের উপরের ঘরখানায়। তার কাছে খুব ভাল লাগে চাঁদের কিরণালোকিত ডনের পাগলামী আর উদয়াস্তে তরুণ রাগমাখা নদীর মাতাল রূপ। অনেক রাত পর্য্যন্ত মিল্‌কা বসে' থাকে ডনের দিকে চেয়ে। তরঙ্গে তরঙ্গে চাঁদের রূপালী আভা, দূরের পাহাড়ে বাতাসের ঘুমপাড়ানী গান তাকে বিভোর করে' দেয়; কিন্তু মিল্‌কার কক্ষ-সঙ্গিনী নভ্‌না মোটেই এসব বরদাস্ত করতে পারে না। নভ্‌না কিছুতেই বুঝতে পারে না, একটা যুবক কি করে' চুপ করে' বসে থাকতে পারে? তার মতে মানুষের জীবন হ'বে মাতালের মত সদা হাস্যমুখর। তাই নভ্‌না যতক্ষণ জেগে থাকে, মিল্‌কা চুপ করে' ঘুমের ভাণ দেখিয়ে পড়ে থাকে; যখনই পাশের বিছনায় শুনতে পায় বড় বড় নিঃশ্বাস, আস্তে আস্তে উঠে মিল্‌কা খুলে দেয় জানালা, অল্পক্ষণের মধ্যেই ডনের রূপে সে আত্মহারা হ'য়ে যায়।

নভ্‌না এত অল্পে হার মানার মেয়েই নয়। সেও অনেক সময়ে ঘুমের ভাণ করে' পড়ে থাকে চোর ধরার জন্য। মিল্‌কা জানালায় গিয়ে দাঁড়ালেই নভ্‌না চুপি চুপি উঠে গিয়ে পিছন হ'তে জাপ্‌টে ধরে' দিতে থাকে কাতুকুতু। মিল্‌কা হাঁসতে হাঁসতে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। একটু পরেই হয় সন্ধি; রাতের মত তারা ঘুমিয়ে পড়ে।

ডনের সেদিন অন্যরূপ—একটু কোমলতাও নেই তার বুকে। আকাশে বাতাসে চলেছে মাতামাতি। দিগন্তে জমেছে মেঘ; সন্ধ্যার পরই আরম্ভ হ'ল প্রবল তুষার বর্ষণ। ক্ষেপা নদী ডনও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। ঝড় আরম্ভ হ'ল। জানালা কবাট খট্ খট্ করে' আওয়াজ করে' উঠল। আলোর বাল্‌টি গেল ফেটে। মিল্‌কা তখনও তেমনি জানালার ধারে দাঁড়িয়ে। ডনের বুকে সে যেন একটা অমঙ্গলের গুপ্তলিপির পাঠোদ্ধারে ব্যস্ত।

নভ্‌না গেছিল রিহার্সালে। পাশের ক্লাব-ঘরেই বসে রিহার্সাল। নভ্‌না ছুটে এল। দুয়ারে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে ডাকল—"তাওয়ারীশ,—তাওয়ারীশ—!"

মিল্‌কা মুখ না ফিরিয়েই জবাব দিল—"কি তাওয়ারীশ?"

"যুদ্ধ বেধেছে—যুদ্ধ!"

"যুদ্ধ?"

"হ্যাগো, যুদ্ধ। জার্ম্মাণরা আমাদের আক্রমণ করছে…"

কথাটির উপর মিল্‌কা তেমন গুরুত্ব দিল না, নভ্‌না হয়ত তার সঙ্গে চালাকী করছে বলেই ভাবল। সে বলল—"এখনও আক্রমণ করেনি ত—করবে!"

"মস্কো বেতার হ'তে এক্ষুণি ঘোষণা করা হ'ল।"

"এ্যাঁ, মস্কো বেতার হ'তে বলেছে?" পুচ্ছাহত নাগিনীর মত মিল্‌কা ঘুরে দাঁড়াল।

"তারা বললে, পাকা খবর না দেওয়া পর্য্যন্ত কেউ যেন চঞ্চল না হয়, আর সারা রাত খবরের জন্য রেডিও খুলে রাখতে বলেছে।"

মিল্‌কার ভিতরের কশাক রক্ত লাফিয়ে উঠল; চোখ দু'টো জ্বলে উঠল বাঘের মত। বারান্দায় বেরিয়ে এসে মিল্‌কা ক্ষিপ্তের মত চিৎকার করে' বলল—"রাশিয়ার গায়ে যদি একটু আঁচড়ও লাগে, আমরা কি চুপ করে' থাকব?

* 'তাওয়ারীশ্' রুশ কথা, এর অর্থ 'কমরেডে'র অনুরূপ।

...েন, কশাকরা কি ডনের জল আর ভল্গার বাতাসে ...ষ্ট হয়নি যে, তাদের মায়ের গায়ে হাত দেবে বিদেশী ...?" নভ্‌নাকে টেনে নিয়ে মিল্‌কা ক্লাব ঘরে গেল।

ক্লাবে তখন মেসের সবাই জড় হ'য়েছে। সবার মুখ ...ক্ত উত্তেজনায় রাঙ্গা; জল্পনা-কল্পনার অন্ত নাই। ...ল্‌কা এক লাফে টেবিলের উপর উঠে বলল— ...ওয়ারীশ!" সব চুপ।

"আমাদের আনন্দ দেখে যদি কারও হিংসা হয়; অপর্য্যাপ্ত খাবার দেখে যদি কারও লোভ হয়; কেউ যদি ...োর করে' আমাদের বঞ্চিত রাখতে চায় ডনের জলে— আমরা কি তা' সহ্য করব?"—কথাগুলি মিলকার উত্তেজিত ...ঠ হ'তে বেরিয়ে এল।

"কখনই না"— সমস্বরে সবাই বলল।

"মনে রেখো তাওয়ারীশ্, আজ আর আমরা একা নই, ...স্ব নই—পেছনে আছে সারা বিশ্বের নির্য্যাতিত, বুভুক্ষু ...বনের আত্মিক শক্তি, অপরিমেয় অস্ত্রবল আমাদের ...হায়। সর্ব্বোপরি আমরা নারীপুরুষ সবাই সৈনিক। ...শ তো, তারা যদি আসতে চায়, বীরের মত আমরা ...দের অভ্যর্থনা জানাব। বল্‌শেভিক্ বিজয়ী হোক!"

সম্মিলিত কণ্ঠের জয়ধ্বনিতে আকাশ কেঁপে উঠল।

নিদ্রাহারা প্রতিটি আঁখি। সবাই উদ্বিগ্ন—রেডিও কখন জানাবে তাদের নির্দ্দেশ। ক্লাব ছেড়ে কেউ গেল না।

রাত প্রায় তিনটা। রেডিও খুট্ করে' একটু আওয়াজ করল। সবাই নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ, দম বন্ধ করে' রইল। রেডিওর মৌন কণ্ঠ মুখর হ'ল: "মস্কো রেডিও ষ্টেশান থেকে বলছি। তাওয়ারীশ্, পনের মিনিট পূর্ব্বে জার্ম্মাণ কামানশ্রেণী আমাদের সীমান্ত ব্যূহ লক্ষ্য করে অগ্ন্যুদ্গীরণ আরম্ভ করেছে। আমাদের কামানশ্রেণীও তার সমুচিত উত্তর দিচ্ছে। শান্তির মর্য্যাদাকে পদদলিত করে যে বর্ব্বর হিংস্রতা নিয়ে জার্ম্মাণ আজ আমাদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে, তার জবাব দিতে হ'বে আমাদের যুবক-যুবতীদের। সমস্ত শিল্পকেন্দ্রের উৎপাদন অক্ষুন্ন রাখতে হ'বে। সামরিক শিক্ষায় যাঁরা প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট্ পেয়েছেন, তাঁদের অবিলম্বে সৈন্যশ্রেণীতে যোগ দিতে আহ্বান করছি। নিকটবর্ত্তী সামরিক কেন্দ্রে নাম লিখিয়ে নির্দ্দেশের অপেক্ষা করুন। যাঁরা সৈন্যশ্রেণীতে যোগ দেবেন, তাঁদের শূন্য স্থান পূরণ করতে অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের অনুরোধ করছি। সাবধান এক কড়া শস্যও যেন শত্রুর হাতে না পড়ে, মাথা রাখার মত একখানা কুঁড়েও যেন শত্রুসৈন্য দাঁড়িয়ে থাকতে না দেখে। অনিবার্য্য কারণে পশ্চাদ্বর্ত্তন করতে হ'লে, পিছনের সব কিছু নষ্ট করে দিয়ে আসতে হ'বে। নমস্কার।"

মিল্‌কা দাঁড়িয়ে বলল—"আমাদের আজই ভোরের গাড়ীতে রওনা হ'তে হ'বে। যাঁদের প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট আছে, তাঁরা হাত তুলুন।"

অনেকেই হাত তুলল, আর সবাই ঘাড় নীচু করে' রইল অক্ষমতার লজ্জায়। মিল্‌কা বলল—"রাতও শেষ হ'য়ে এসেছে, এখান থেকেই আমরা বিদায় নিতে চাই। রাত থাকতে না চললে গাড়ী পাওয়া কষ্ট হ'বে।"

ভোরিয়া প্রাচীন কশাক নৃত্যে বিদায়ী তাওয়ারীশ্‌দের প্রীত করল। স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করে কেউ কেউ বক্তৃতা করল। তারপর সভা ভেঙ্গে গেল। একে একে সবাই চলে' গেল। চারিদিকে সাজ-সাজ রব। যাবার সময়ে মিল্‌কার দৃষ্টি পড়ল ঘরের কোণের দিকে— কে যেন হাতে মাথা গুঁজে কাঁদছিল। সে ফিরল। একটু এগিয়ে যেতেই সে নাটালিয়াকে চিনল। মিল্‌কা নাটালিয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে' জিজ্ঞাসা করল—"কি হ'য়েছে তাওয়ারীশ্?"

নাটালিয়ার কান্নার বেগ আরও বেড়ে গেল।

"বল—বল তাওয়ারীশ্, কি হ'য়েছে?"

"তোমরা যাবে আর আমি যেতে পাব না?"

"এই জন্যে? ছিঃ—দুঃখ করো না তাওয়ারীশ্, প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট্ নেই বলে' তুমি দেশসেবায় বঞ্চিত থাকবে—অন্ততঃ রাশিয়ায় আজকাল তা হয় না।"

নাটালিয়া উঠে দাঁড়াল। উৎসাহ-মেশান কণ্ঠে সে বলল—"বল তাওয়ারীশ, আমি সে গৌরব পাব?"

"নিশ্চয়ই। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেওয়াই যে সব চেয়ে বড় দেশসেবা তা নয়; তাই যদি হ'ত তাওয়ারীশ, ষ্টালিন তবে এগিয়ে যেতেন সবার আগে। দেশসেবার কত শত কর্ম্ম পড়ে রইল তোমাদের জন্য—তারই ভিতর

দিয়ে নিজের জীবনকে তুমি সফল করে' তোল। চল, ছিঃ—আমরা যাচ্ছি যুদ্ধক্ষেত্রে, তোমার মলিন মুখ দেখে গেলে আমাদের মনে দুঃখ হ'বে না ?"

"না তাওয়ারীশ, আমি হাসিমুখেই তোমাদের বিদায় দেব।"

* * * *

সন্ধ্যার আগেই তারা সামরিক অফিসে সার্টিফিকেট্ দাখিল করে' অনুমতিপত্র নিয়ে নিল। পরের দিন দুপুরে তারা পোষাক ও অস্ত্রাদি পেয়ে গেল। নিজস্ব পোষাক-গুলি সামরিক অফিসে জমা দিয়ে ফিরার পথে নভ্না মিল্কাকে বলল—"আমার সঙ্গীনটি বেশ চক্‌চকে না ?"

মিলকা সংক্ষেপে জবাব দিল—"হুঁ"।

"এই সঙ্গীনের খোঁচায় যদি ডনের জলগুলি শত্রুর রক্তে রাঙিয়ে দিতে পারি, তবেই আমার জন্ম সার্থক।"

"আমিও ডনের সেই রূপই কল্পনা করছি।"

"আমি যে আর ধৈর্য্য রাখতে পারছি না ; এখানে আর ক'দিন দেরী করতে হ'বে কিছু জান ?"

"আদেশ এলেই যাব।"

ডন প্রদেশের বাহিনীর কিছু ষ্টালিন লাইনে ও অবশিষ্ট কল্‌জাকের অধীনে পশ্চিম রণক্ষেত্রে পাঠাবার আদেশ এল। মিল্কা ও নভ্না ইচ্ছা করে'ই কল্‌জাকের দলে গেল। সারাদিন তারা সহরটি ঘুরে' ঘুরে' দেখল। অন্যান্য সৈন্যেরা ছোট ছোট দলে সহরে ঘুরতে বেরুল। নাগরিকরা জানায় তাদের অভিনন্দন, তারা উপহার দেয় নাগরিকদের অমলিন হাসি।

ক্রমে সন্ধ্যা নেমে এল সহরের বুকে। সৈন্যেরা সব ফিরে এল তাদের ছাউনিতে। নৈশ ভোজনের পরই তাদের ফ্রন্টের দিকে যাত্রা করতে হ'বে। নিজেদের সব কিছু গুছিয়ে তারা ঠিক হ'ল। একটু পরেই খাবার সঙ্কেত হ'ল। রুটি, মাংস ও এক কাপ করে' কাফি তাদের প্রত্যেককে দেওয়া হ'ল। কল্‌জাক নিজে দাঁড়িয়ে খাদ্য বিতরণ করছিলেন। খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যেরা পেল সেনানীর আন্তরিকতার পরশ।

নভ্না এগিয়ে গিয়ে বলল—"কমাণ্ডার আমার একটি অনুরোধ রাখবে ?"

"অসুবিধা না হ'লে নিশ্চয়ই রাখব।"

মিলকাকে দেখিয়ে নভ্না বলল—"আমি আর তাওয়ারীশ মিল্কা একই কাজ করতাম, থাকতামও একই ঘরে……

"যুদ্ধক্ষেত্রেও পাশাপাশিই থাক্‌তে চাও বুঝি ?"

"হ্যাঁ, একই গ্রুপে, ডিউটি এক হওয়া চাই।"

"বেশ, তাই হ'বে—কলজাক্ হাসতে হাসতে নভ্নাকে বিদায় দিল। দূরে রুটি বগলে মিল্কা দাঁড়িয়ে দেখছিল নভ্নার কাণ্ডটা। নভ্না ফিরে আসতেই মিল্কা বলল—"কমাণ্ডারের সঙ্গে কি কথা হচ্ছিল তাওয়ারীশ ?"

"বা—রে, তা' বলব কেন ?—কত কথা…"

মিল্কা অভিমান করল।

"না—না, শোন বলছি।"

মিল্কা চল্‌তে চল্‌তেই জবাব দিল—"না, দরকার নেই।"

নভ্না মিল্কার বগলের কাছে তার তর্জ্জনীর দ্বারা দু'একটা পাক দেবার ভঙ্গী করতেই মিলকা দারুণ বেগে হেসে দিল। হাত হ'তে ভর্ত্তি কাফির কাপটি পড়ে' গেল মাটিতে। নভ্না ভারি অপ্রস্তুত হ'ল, মিনতি-ভরা চোখ তুলে সে বলল—"রাগ করো না তাওয়ারীশ।"

মিল্কা নভ্নার হাত ধরে' এগিয়ে এল। দু'জনে বসে খাবার খেয়ে, নভ্নার কাফিটুকু দু'কাপে ভাগ করে নিল। পাশের কশাকটি নিজের কাপটি এগিয়ে দিয়ে বলল—"তাওয়ারীশ, এ-কাপ শুদ্ধ ভাগ করে' নাও; তিনজনে আনন্দ করেই খাওয়া যাক।"

হাসি-ঠাট্টার মধ্যে তিনজনে কাফি খাওয়া শেষ করল।

রাত আটটায় তারা ট্রেণে চাপল। নভ্না বাঙ্কের উপর উঠে শুল। তার পায়ের কাছে আর একটি মেয়েও শুয়েছে। নভ্না বলল—"ঘুমের ঘোরে যেন গড়িয়ে পড়ো না তাওয়ারীশ।"

মেয়েটি মুচকি হেসে জবাব দিল—"ধ্যেৎ"।

আলো নিবিয়ে দেওয়া হ'ল ; গাড়ী চল্‌তে লাগল। সব কম্পার্টমেণ্ট হ'তে এক সুরে সবাই গেয়ে উঠল জাতীয়-সঙ্গীত। মনে হ'ল যেন একটা সঙ্গীত ধীরে ধীরে মিশে গেল দিগন্তের বুকে।

যুদ্ধের জরুরী অবস্থায় রুশপল্লী সব আঁধার। আঁধারের বুক চিরে' দুর্ব্বার গতিতে ছুটেছে যন্ত্রদানব। সৈনিকদের কোলাহল ক্রমেই থেমে এল। অনেকেই ঘুমিয়ে পড়ল, কারও কারও চোখে তখনও যুদ্ধের চিত্র ছায়া-ছবির মত ভেসে যাচ্ছিল।

রাত তখন প্রায় দেড়টা, হঠাৎ গাড়ী থেমে গেল। আচম্‌কা ঝাঁকুনিতে সবাই জেগে উঠল। একজন অফিসার গাড়ীর সামনে দিয়ে যেতে যেতে বলে' গেল—"সবাই শৃঙ্খলভাবে নেমে পড়। এখান থেকেই আমাদের আক্রমণ সুরু করতে হবে। শত্রু খুব দূরে নয়, শত্রু টের পায় তেমন শব্দ যেন না হয়।"

বাদলা বাতাসের সঙ্গে বরফ পড়ছিল; শীতও বেশ কন্‌কনে। শৃঙ্খলার সহিত সবাই নেমে দাঁড়াল। গোটা বাহিনীটাকে ছোট ছোট কয়টা দলে ভাগ করে' এক একজন অফিসারের অধীনে বিভিন্ন পথে তারা এগিয়ে চলল। অন্ধকার পৃথিবীকে বুকের তলায় চেপে রেখেছে। দু'হাত সামনের জিনিষও দেখা যায় না। সঙ্গীন তাদের উদ্‌গ্রীব, আঙ্গুলে টিপে রেখেছে ট্রাইগার।

মিল্‌কাদের দল এগিয়ে চলল একটা বনের আঁকাবাঁকা পথে। পথ কাদায় পিছল। তার উপরে জার্ম্মাণদের বেপরোয়া কামানের গোলায় এখানে সেখানে গর্ত্ত হয়ে আছে। কেউই কথা কয় না, পাছে শত্রু জানতে পায়। নভ্‌না মিলকার কাণে কাণে বলল—"কেমন যাচ্ছ তাওয়ারীশ?"

"মন্দ নয়, তুমি কেমন?"

"তোমারই মত কোনও রকমে।"

"হুসিয়ার, খাদে পড়ো না যেন'—কথাটি বলে'ই মিল্‌কা সশব্দে পড়ে গেল একটা গর্ত্তের ভিতর; তার পিঠের উপর তেমনি ভাবেই পড়ল আর একজন। নভ্‌না কোনও রকমে টাল সামলে নিল। খাদের পাড় হ'তে নভ্‌নার হাসি শোনা গেল। মিল্‌কা ও তার দুর্ঘটনার সাথী বিজ্‌বিজ্‌ করে' জার্ম্মাণ গোলন্দাজদের গালি দিতে দিতে উঠে এল।

মাথার উপরে খুব নীচু দিয়ে উড়ে গেল কয়খানা শত্রু-পড়ে' আত্মগোপন করল। মিল্‌কা অফিসারের কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করল—"খুব নীচু দিয়ে যাচ্ছে, গুলী করব?"

"না—না, আমাদের অবস্থান কোনও রকমেই তাদের জানতে দেওয়া হবে না, আমরা যাচ্ছি শত্রুকে অতর্কিত আক্রমণ করতে।"

মিল্‌কাদের দলে সৈন্যসংখ্যা তিন শতের বেশী হবে না। পথের অসুবিধা ও অন্ধকারে তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। কে যে কোন্ পথে কত দূর গেল, কেউই তা' দেখতে পায় না, তবে কোথায় গিয়ে সবাই একত্র হ'বে তা' সবাই জানে। বনের ফাঁকে ফাঁকে তীব্র আলোক-বিচ্ছুরণের মত দেখা যাচ্ছিল দূরে; তাতে তাদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার সুবিধাই হ'ল।

রাত প্রায় আড়াইটার সময়ে তারা এসে সব জড় হ'ল এক মাঠের পাশে। অফিসার বলল—"আড়াইটা বাজে। মাঠের প্রান্তে ঐ অনুচ্চ জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ে শত্রুর অগ্রগামী সৈন্যেরা ঘাঁটি করে আছে। আজ শেষ রাত্রে তারা সম্ভবতঃ নূতন করে' আক্রমণ চালাবে। আমাদের তার পূর্ব্বেই তাদের আক্রমণ করতে হ'বে। চারিদিক্ হ'তে ঘিরে ফেলার বন্দোবস্ত হ'য়েছে। এই মাঠের দক্ষিণ পাশে খুব বড় একটা জলা আছে। আমাদের একটি দল তাদের জলার ধার হ'তে প্রথম আক্রমণ ক'রবে। শত্রু যখন পাহাড়ের ঘাঁটি ছেড়ে জলার দিকে প্রত্যাক্রমণ করবে, চারপাশ হ'তে তাদের ঘিরে ধ্বংস করতে হ'বে।"

ছোট দলটিকে তিন ভাগে ভাগ করা হ'ল। চোখা চোখা পাঁচ জন সৈনিক অগ্রগামী দলের জন্য বাছাই করা হ'ল। অগ্রগামীদের নির্দ্দেশানুযায়ী চলবে দ্বিতীয় দল—কার্য্যতঃ এরাই করবে আক্রমণ আর কিছু সৈন্য রাখা হ'ল রিজার্ভ। হাতাহাতি লড়াই যখন বেশ জমে' উঠবে, রিজার্ভ সৈনিকেরা ঝাঁপিয়ে পড়ে' লড়াই শেষ করবে।

নভ্‌না ও মিল্‌কা পড়ল দ্বিতীয় দলে। প্রথম দল ফোনের তার নিয়ে চলল এগিয়ে। শত্রুকে ফাঁকি দেবার জন্য পিঠের উপর ডালপালা কতগুলি তারা বেঁধে নিল। সঙ্গীন-চাপান রাইফেল এক হাতে ধরে' বুকে হেঁটে তারা সামনের দিকে এগিয়ে চলল। দ্বিতীয় দল প্রস্তুত হ'য়ে

রইল। প্রথমে চলবে মেশিন গান্, তার পরে রাইফেল-ধারী। তারা রিসিভারে লাউডস্পীকার লাগিয়ে পাশে জড় হ'য়ে রইল অগ্রগামীদের নির্দ্দেশের অপেক্ষায়।

স্পীকারে বেজে উঠল অগ্রগামীদের স্বর—"তাওয়ারীশ, প্রায় ছ'শত গজ দূরে ছোট একটা জলা আছে, তার দক্ষিণ ধারটায় কাদা, উত্তর দিক্ দিয়ে আক্রমণ চালাতে হবে।"

আকাশে হাউয়ের মত একটা বাজী উঠল, তা' হ'তে অজস্র উজ্জ্বল তারকা ঝরে' মাঠ আলোকিত করে' তুলল। স্পীকার নীরব হ'ল। খানিক পরে আবার নির্দ্দেশ এল "শত্রু সন্দেহ করছে বলে মনে হচ্ছে, তাদের প্রস্তুত হবার মত একটু আওয়াজও যেন কাণে আস্‌ছে—এবার দ্বিতীয় দল এগিয়ে এলেই ভাল হয়। আমরা ছয় ফার্লং—প্রায় অর্দ্ধেক পথ এগিয়েছি।

প্রথমে মেশিন-গান্‌বাহীরা সারি দিয়ে সন্তর্পণে এগিয়ে চলল; তাদের পিছনে চলল রাইফেলধারীরা। যতক্ষণ আঁধার থাকে, সৈন্যেরা এগিয়ে চলে দ্রুত, আকাশে আলোক দেখ্‌লেই মাঠে শুয়ে পড়ে। সংবাদসরবরাহকারী মাথায় রিসিভার লাগিয়ে তার টেনে চলে। মিল্‌কা ও নভ্‌না পাশাপাশিই চলেছে। নভ্‌না মিল্‌কার কাণে কাণে বলল—"তাওয়ারীশ, হাতটা যেন কিসে খানিক কেটে গেল; হুঁসিয়ার হয়ে চল।"

মিল্‌কার জবাব শোনা গেল না; রুশ দক্ষিণবাহিনীর মেশিন গান্ বাতাসে ছড়িয়ে দিল মরণের বার্ত্তা। জার্ম্মাণ ব্যূহ হ'তেও এল তার সমুচিত জবাব। সার্চ্চ-লাইটের তীব্র আলোকে সারা মাঠ দিনের মত আলোকিত হ'য়ে গেল। বারুদের গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত। মিল্‌কাদের কমাণ্ডিং অফিসার আদেশ দিল—"কোনও নিরাপদ্ স্থানে আত্মগোপন কর।"

অগ্রগামী দল বলল—"জলা হ'তে তিনশ' গজ এগিয়ে জলসরবরাহের নালা আশ্রয়ের উপযুক্ত। শত্রু পাহাড় ছেড়ে দক্ষিণ জলার দিকে এগিয়ে চলেছে। নির্দ্দেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত নালার মধ্যে অপেক্ষা কর।"

ছোট হাল্কা ট্যাঙ্কের আড়ালে জার্ম্মাণরা এগিয়ে চলেছে। রাশিয়ানদের ট্যাঙ্কধ্বংসী কামানের আঘাতে কয়েকটা ট্যাঙ্ক উল্টে পড়ল। জার্ম্মাণ সৈন্যদল তাই আশ্রয়রূপে ব্যবহার করে' অবিরাম গুলী চালাতে লাগল। ... ক্ষেত্রে নেমে এল মরণের বীভৎসতা। কারও উড়ে ... মাথার খুলি, হাত পা ছড়িয়ে বেচারা ছিট্‌কে পড়ল ... কারও হয়ত লেগেছে বুকে, আর্ত্তনাদের অবসরও ... পায়নি; কারও আঘাত তত গুরুতর নয়, যন্ত্রণা সহ্য কর... না পেরে হাহাকার করে মাটি কামড়াতে লাগল।

জলার দিকের রুশসৈন্যের সঙ্গে এবার জার্ম্মা... হাতাহাতি লড়াই আরম্ভ হ'ল। এদিকে রুশবাহি... একটা দল পাহাড়ের অপর পাশ বেয়ে পেছন ... জার্ম্মাণদের আক্রমণ করল। অতর্কিত আক্রমণে ... রক্ষীদল সামান্য যুদ্ধের পরই হ'টে যেতে বাধ্য ... হাল্‌কা কামান ও সার্চ্চলাইট প্রভৃতি সব কিছু ... সৈন্যের হাতে পড়ল বটে; কিন্তু রুশদের হস্তগত হব... আগেই জার্ম্মাণরা তা' নষ্ট করে দিয়েছিল। এত... কামানের অজস্র গোলাবর্ষণের আড়ালে জার্ম্মাণ... অনেকটা নিরাপদ্‌ই ছিল, সে আশ্রয় তারা এবার হারা... সারা রণস্থল অন্ধকারে ডুবে গেছে।

রুশদের পিছনের চাপে জার্ম্মাণদের অগ্রগতি শি... হ'য়ে গেল। তাদের ভিতর বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। ফ্রে... লাইন রুশদের হস্তগত হওয়ায় জার্ম্মাণরা মূল বাহিনী... সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ হারাল। জলার দিকের রু... সৈন্যেরাও শত্রুর উপর প্রবল চাপ দিল। গোটা জার্ম্মা... বাহিনীটা বিপুলকায় জানোয়ারের মত কখনও আগে, কখনও পাছে আন্দোলিত হ'তে লাগল।

মিল্‌কা অধৈর্য্য হ'য়ে উঠেছে। আঁধারের মধ্যে তা... চোখ দুটো যেন জ্বল্‌ছে। নভ্‌না বলল—"আর কতক্ষ... নালায় বসে থাকতে হ'বে তাওয়ারীশ? লড়াই ফতে হ'লে তবে আমরা যাব!"

বজ্রনির্ঘোষে আদেশ এল—"প্রস্তুত?"

সমগ্র দলটি শিরস্ত্রাণ ঠিক করে' রাইফেল উঁচিয়ে ধরল।

"আক্রমণ কর—ঝড়ের বেগে"—হুকুম হ'ল।

শত্রুকে স্তম্ভিত করে' গর্জ্জে উঠল মিল্‌কাদের রাইফেল ও মেশিন গান্। সঙ্গে সঙ্গে বাম পাশের রুশ-দলও এদের প্রতিধ্বনির মত শত্রুর উপর গোলাগুলি চালাল। সম্মুখে বিস্তীর্ণ জলা, তিন পাশে রুশ সৈন্যের প্রচণ্ড আক্রমণ

জার্ম্মাণদের হতভম্ব করে' দিল। পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহকে চারিদিক্ হ'তে খোঁচা দিলে যেমন তার অবস্থা হয়, তেমনি জার্ম্মাণবাহিনীরও অবস্থা হ'ল। পিছু হটতে গেলে, পেছনের প্রচণ্ড আঘাত তাকে চিরদিনের মত ধরাশায়ী করে; পিছনে ফিরতে গেলে পাশের দিক্ হ'তে আসে মর্ম্মান্তিক আঘাত। অল্পক্ষণের মধ্যেই জার্ম্মাণরা সমস্ত শৃঙ্খলা হারিয়ে ফেলল। অন্ধকারে শত্রুমিত্র চিনবার যো নাই। ট্যাঙ্কগুলির কার্য্যকারিতা কিছুই রইল না। উভয় পক্ষের সৈন্য হাতাহাতি যুদ্ধে আত্মহারা, শত্রুমিত্রের শ্রেণী বিভাগের প্রয়াস ব্যর্থ।

রণক্ষেত্রে জেগে উঠল ভীষণ বীভৎস তাণ্ডবতা। মৃত্যুর আর্ত্তনাদে ভরে' গেল আকাশ; বাতাস দীর্ঘশ্বাসে তপ্ত। কেউ চাইছে জল, কেউ বা প্রিয়জনের নাম করে' করছে হাহাকার। যারা মরেছে, তারা ত গেলই; কিন্তু যারা আহত হ'য়ে মাটিতে পড়ল, তারাও মরতে বাধ্য হ'ল রণমত্ত সৈন্যের পদাঘাতে। পৃথিবীতে নেমে এল নরক।

যুদ্ধ শেষ হ'য়েছে; পূব আকাশে ফুটে উঠেছে দিনের আভা। জার্ম্মাণ বাহিনীর অধিকাংশই নিহত, অল্প কিছু বন্দীও হ'য়েছে। এম্বুলেন্স খুঁজে বেড়াচ্ছে আহতদের, আর নভ্না খুঁজে বেড়াচ্ছে মিল্কাকে। ছ'জনে এক সাথেই শত্রুকে আক্রমণ করেছিল, কিন্তু জীবন-মরণের এ তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শেষ পর্য্যন্ত কে কোথায় ছিটকে পড়েছে, কেউই জানে না। যাকেই সামনে দেখে, তাকেই নভ্না জিজ্ঞাসা করে মিল্কার কথা। অনেকেই চিনে না; যারা চিনে, তারাও কোন সদুত্তর দিতে পারল না।

একজন আহত সৈনিক অতি কষ্টে শবস্তূপ হ'তে দেহের খানিকটা বের করেছে। আর সে পারে না; জীবন-মৃত্যুর দোটানায় পড়ে' সে ধুকতে লাগল। নভ্না দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে শব সরিয়ে তাকে মুক্ত করে' জিজ্ঞাসা করল—"তাওয়ারীশ, মিল্কাকে দেখেছ?"

চক্ষুতারকা তার স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নভ্নার দিকে। সে যেন কিছু বল্‌তে চেষ্টা করছিল; কিন্তু বল্‌তে কিছুই পারল না, অধর কাঁপতে কাঁপতে আড়ষ্ট হ'য়ে এল। সৈনিক দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে বুকের উপর চেপে ধরা হাতখানি নভ্নার কোলের উপর সে রাখল। আঙ্গুলগুলি যেন তার অদৃশ্য মৃত্যুবীণায় দিচ্ছিল ঝঙ্কার। বুক চিরে তার বেরিয়ে এল একটা বিকট আর্ত্তনাদ; আর্ত্তনাদের সঙ্গে মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল কালো কতকটা রক্ত। দেহ তার নিথর, নিস্পন্দ।

নভ্না প্রাণহীন সৈনিকের হাতখানা কোল হ'তে সরিয়ে রাখতে গিয়ে দেখল, কি একটা সাদা জিনিস আহতের শিথিল হাত হ'তে গড়িয়ে মাটিতে পড়ল। নভ্না তুলে নিয়ে দেখল, ছোট একটি শিশুর প্রতিকৃতি, নীচে তার লেখা, 'আমার মাতৃহারা শিশু।' নভ্নার নারী-হৃদয় মাতৃস্নেহে ভরে' উঠল এই পিতৃমাতৃহীন শিশুর মুখখানি কল্পনা করে'। চোখ দুটো তার ভিজে উঠল।

কিন্তু মিল্কা—মিল্কা কোথায়? নভ্নার আশঙ্কা হ'ল; তবে কি তাওয়ারীশ নেই? অসম্ভব, মিল্কার মৃত্যু নভ্না ভাবতেই পারে না। পাগলিনীর মত নিজের খেয়ালেই সে তবুও শবস্তূপ সরিয়ে দেখতে লাগল, আহত হ'য়ে শব চাপাও পড়তে পারে তো? নিজের দিকে তার খেয়ালও নাই—মাথার অনেকখান কেটে গেছে, ক্ষতস্থান হ'তে অঝোরে ঝরছে রক্ত। যারা দেখে তার এ অবস্থা, তারাই তাকে পরামর্শ দেয় হাসপাতাল কারে গিয়ে ব্যাণ্ডেজ করিয়ে নিতে, কিন্তু সে কি এখন যেতে পারে? যাকে সে নিয়ত কাছেই রাখতে চেয়েছিল, তাকে যে খুঁজে পাচ্ছে না!

সূর্য্য উঠেছে; দূর পাহাড়ের পাশ হ'তে স্বর্ণকিরণ ছড়িয়ে সে বসুধাকে জানাল অভিবাদন। নভ্নার উৎকণ্ঠিত মুখশ্রীর উপর অরুণাভা চুমু খেয়ে গেল। নভ্নার দৃষ্টি তখনও চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তার তাওয়ারীশকে। ও কে? নভ্না সে দিকে ছুটে গেল। চোখে নেমেছে তার বিষাদের বাদল, কাণে তার বাজছে মৃত্যুর মাদল। মিল্কার নিষ্প্রভ মুখের উপর সূর্য্যের লালিমা পড়েছে ছড়িয়ে। নভ্না মিল্কার মাথাটি কোলের উপর তুলে' নিল, রক্তমাখা চুলগুলি পেলব হাতে সরিয়ে অপলকে চেয়ে রইল তার প্রিয় তাওয়ারীশের মুখের দিকে। মুখে তার ভাষা নেই—উদাস, গম্ভীর। চোখের কোলে দু'টি ফোঁটা অরুণালোকে জলজল্ করছিল। বুকফাটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে নভ্নার শেষ সম্বোধন শোনা গেল—"তাওয়ারীশ্!"

আত্মদর্শনে প্রেমতত্ত্ব

শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, ভাগবতরত্ন

'আত্মদর্শন' ও 'অনাত্মদর্শন'-ভেদে দর্শন দুই প্রকার। আত্মদর্শন-সূর্য্য প্রাচ্য-গগনে সমুদিত হইয়া সমগ্র বিশ্বে স্বীয় অমল উজ্জ্বল রশ্মি বিকীরণ করে। আত্মা সৎ বা নিত্য, চিৎ বা শুদ্ধসত্ত্ব এবং আনন্দময়। সুতরাং আত্মার ধর্ম্মে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ বিরাজিত। অণুচিৎ জীবাত্মার সেব্য বিভু সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবানের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটী শক্তি বিশেষভাবে লক্ষিতব্য। এই শক্তিত্রয়ের একটীর নাম চিচ্ছক্তি, একটীর নাম জীবশক্তি, অপরটীর নাম মায়া-শক্তি। প্রত্যেকটী শক্তির তিনটী বৃত্তি—সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী শক্তিমান্ শ্রীভগবানের ইচ্ছায় শক্তি-সমূহ পরিচালিত। স্বেচ্ছাময়তাই শক্তিমত্তত্ত্বের সর্ব্বোপরি অধিষ্ঠানের প্রকৃষ্ট পরিচয়।

চিচ্ছক্তির সন্ধিনী বৃত্তির অপর সংজ্ঞা 'শুদ্ধ সত্ত্ব'। শ্রীভগবানের লীলোপযোগী বিগ্রহ, লীলাস্থল গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি ধাম এবং তাঁহার লীলার পরিকরগণও যাবতীয় দ্রব্য নিত্যা সন্ধিনী-বৃত্তির দ্বারা নিত্য প্রকট। সম্বিৎ-বৃত্তির অপর নাম শুদ্ধজ্ঞান। এই জ্ঞানে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্—"কৃষ্ণে ভগবত্তা-জ্ঞান সম্বিতের সার"। শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"। হ্লাদিনী বৃত্তির অপর নাম প্রেম। হ্লাদিনী বৃত্তি শ্রীভগবান্‌কে আনন্দ প্রদান করেন। সম্বিৎ বৃত্তি যখন হ্লাদিনীর সহিত যুক্ত হইয়া জীবকে কৃপা করেন, তখন জীব প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচন হইয়া শ্রীকৃষ্ণকেই সর্ব্বসেব্য বলিয়া জানিতে পারেন।

গীতায় জীব-শক্তিকে তটস্থা শক্তি এবং পরা প্রকৃতি বলিয়াও অভিহিত করা হইয়াছে। এই জীবশক্তিও চৈতন্যস্বরূপা। এই শক্তি হইতে সমস্ত জীব নিঃসৃত হইয়া জড় জগৎকে চৈতন্যবিশিষ্ট করিয়াছে। চিচ্ছক্তি-নিঃসৃত চিজ্জগৎ ও মায়া-শক্তি-নিঃসৃত জড় জগৎ—এই উভয় জগতের উপযোগী বলিয়া জীব-শক্তির নামান্তর—তটস্থা শক্তি। জীব-শক্তি চিচ্ছক্তির অণু; তজ্জন্য জীব-শক্তিতে স্বরূপ-শক্তির সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী বৃত্তিত্রয় অণুস্বরূপে বিদ্যমান। 'সন্ধিনী' বৃত্তি জীবের 'অণুচৈতন্য' আকারে প্রকাশিত। 'সম্বিৎ'বৃত্তি জীবের ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপে বর্ত্তমান এবং 'হ্লাদিনী' বৃত্তি জীবে ব্রহ্মানন্দস্বরূপে নিত্যসিদ্ধ। ব্রহ্ম শ্রীভগবানের শক্তিগত একটী নির্ব্বিশেষ ভাব মাত্র। তাঁহার স্বরূপ নাই। সৃষ্ট জগতের ব্যতিরেক-চিন্তাতে ব্রহ্মের সাপেক্ষিকী অবস্থিতি।

বহিরঙ্গা বা মায়া-শক্তি—'জড়' জননী। তজ্জন্য তাঁহার একটী নাম অপরা শক্তি। এই শক্তির সন্ধিনী বৃত্তিতে জড় জগৎ, জড় বস্তু ও পাঞ্চভৌতিক দেহাদির উৎপত্তি। সম্বিৎ-বৃত্তিতে জড়-জ্ঞান এবং হ্লাদিনী বৃত্তিতে জড়ানন্দের উদয় হইয়া থাকে।

উক্ত বহিরঙ্গা শক্তির অষ্টধা প্রকৃতির উল্লেখ গীতায় দেখা যায়, যথা—ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার। এই আটটী তত্ত্বের মধ্যে প্রথম পাঁচটী, (যাহা পঞ্চ মহাভূত নামে খ্যাত) স্থূল দেহের এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার সূক্ষ্ম দেহের উপাদান। স্থূল দেহে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় রহিয়াছে। ইন্দ্রিয় পাঁচটীর মধ্যে সাধারণতঃ চক্ষুর কার্য্য 'দর্শন' নামে অভিহিত। দর্শন শব্দের আরও একটু বিস্তৃত অর্থ—জ্ঞানলাভ করা। শুধু চক্ষুদ্বারা সংগৃহীত জ্ঞানই যে 'দর্শন'-শব্দে উদ্দিষ্ট, তাহা নহে। অপর ইন্দ্রিয়চতুষ্টয় দ্বারা সংগৃহীত জ্ঞানও 'দর্শন' শব্দের অন্তর্গত। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ সর্ব্বক্ষণ ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া জ্ঞানোৎপত্তি করিতেছে। অনেকে চক্ষুদ্বারা সংগৃহীত জ্ঞানকে মাত্র প্রত্যক্ষ জ্ঞান মনে করেন। কিন্তু 'অক্ষ' শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। সুতরাং যে কোনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানই প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

স্থূল-দেহের ইন্দ্রিয়নিচয়ের ক্রিয়ার ফলে যে দর্শনের উৎপত্তি, তাহাকে স্থূল-দর্শনও বলা যাইতে পারে। মনকে কেহ কেহ একাদশ ইন্দ্রিয় বলেন। মনঃসংযোগ না হইলে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান স্মৃতিতে সংরক্ষিত হয় না। মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার-জাত দর্শন সূক্ষ্ম-দর্শন-সংজ্ঞায় অভিহিত হইতে পারে। এই স্থূল দর্শন ও সূক্ষ্ম দর্শন অপরা প্রকৃতির অন্তর্গত। চার্ব্বাকের নাস্তিক্যবাদ স্থূল-দর্শন ও স্থূল ভোগের সীমাতেই আবদ্ধ। বৌদ্ধগণ বেদ স্বীকার

না করিয়া 'বাসনা-বিনাশ'-রূপ যে নির্ব্বাণের কল্পনা করেন, তাহাও অপরা প্রকৃতিরই গণ্ডীতে আবদ্ধ। মহাযানী বৌদ্ধগণ কোন কোন দেবদেবীর উপাসনা করিলেও পরিণামে নাস্তিক্যবাদেরই উপাসক। জৈনবাদ বৌদ্ধবাদের সহিত অতি-নিকট সম্বন্ধ-যুক্ত। ষড়্দর্শনের অন্তর্গত জৈমিনির 'পূর্ব্ব-মীমাংসা', নিরীশ্বর কপিলের 'সাংখ্য', গৌতমের 'ন্যায়', কণাদের 'বৈশেষিক', অষ্টবক্রের 'মায়াবাদ', পতঞ্জলির 'যোগশাস্ত্র' সূক্ষ্ম দর্শনের ভূমিকায় অবস্থিত। জৈমিনির পূর্ব্ব-মীমাংসাকে কর্ম্ম-মীমাংসাও বলা যাইতে পারে। সুখভোগের জন্য স্বর্গলোক-প্রাপ্তির উপদেশই তিনি করিয়াছেন এবং তদুপায়স্বরূপে যাগ-যজ্ঞের ব্যবস্থা দিয়াছেন। 'ধর্ম্ম' শব্দে পুণ্যকর্ম্ম উদ্দেশ করিয়া কেহ কেহ কর্ম্ম-মীমাংসাকে ধর্ম্ম-মীমাংসাও বলিয়াছেন। কর্ম্মই ফলপ্রদানে সমর্থ বিবেচনা করিয়া জৈমিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন, যদি ঈশ্বর থাকেন, তিনি কর্ম্মের অঙ্গ। সূক্ষ্ম দর্শনের অন্যান্য মনীষিগণ বাসনা বা তৃষ্ণাকে যাবতীয় ক্লেশের আকর জানিয়া তৃষ্ণাক্ষয়জনিত মোক্ষ, মুক্তি বা অপবর্গের প্রাপ্তিকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। চার্ব্বাকের দর্শন—প্রত্যক্ষ দর্শন; জৈমিনির দর্শন—পরোক্ষ দর্শন এবং সূক্ষ্ম দর্শনের অপরাপর দর্শনকে অপরোক্ষ দর্শন বলা যাইতে পারে। এই প্রত্যক্ষ-দর্শন, পরোক্ষ-দর্শন ও অপরোক্ষ-দর্শনের অতীত 'আত্মদর্শন', যাহা শ্রীভগবানের লীলা-বৈচিত্র্যানুযায়ী 'অধোক্ষজ-দর্শন' ও 'অপ্রাকৃত-দর্শন' ভেদে দ্বিবিধ। শ্রীনারায়ণের ঐশ্বর্য্যময়ী লীলা অধোক্ষজা এবং শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যময়ী লীলা অপ্রাকৃতা।

'দর্শন' শব্দের ইংরাজী প্রতিশব্দ 'ফিলজফি' কিন্তু আত্মদর্শনের কোনও প্রকৃত প্রতিশব্দ ইংরাজীতে আছে কিনা সন্দেহ। 'ফিলজফি'-শব্দটী প্রাকৃতজ্ঞানাহরণ-চেষ্টায় আবদ্ধ। মুক্তির ভূমিকায় অভিযানেও তাহার অনিচ্ছা। সুতরাং অপ্রাকৃত জগতের সন্ধান যে তাহার আয়ত্তে নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। অপ্রাকৃত আত্মদর্শনকে কেহ কেহ 'থিওলজি'-শব্দদ্বারা উদ্দেশ করিতে চাহেন। কিন্তু ইহাও আত্মদর্শন-সম্বন্ধে কতটা প্রকৃত ভাব প্রকাশ করে, তদ্বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। খৃষ্টীয় মুক্তিবাদের সহিত আমাদের আত্ম-দর্শনের সম্বন্ধ অতি অল্প। 'ফিলো দি জিউ'র মতে যে মন ভগবান্‌কে দেখিতে চাহে, সে ভগবান্ হইয়া যায়। স্পিনোজা বলেন, জগৎ ও জগন্নাথ এক। নিউপ্লেটনিক দার্শনিকগণের মধ্যে বৌদ্ধ নির্ব্বাণবাদেরই প্রতিধ্বনি দেখিতে পাওয়া যায়। ইস্‌লাম দর্শনের 'এস্ক' শব্দটী আত্মদর্শনের প্রেম হইতে স্বতন্ত্র।

স্থূল ও সূক্ষ্ম দর্শনের অতীত আত্মদর্শন। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞানের অতীত আত্মজ্ঞান। শ্রীবেদব্যাস আত্মদর্শনের স্বরূপ বর্ণন করিয়াই বেদান্ত-দর্শন রচনা করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বেদান্ত-দর্শনের প্রকৃত অর্থের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া বহু ব্যক্তি শ্রীশঙ্করাচার্য্য-রচিত 'মায়াবাদ'-ভাষ্যকেই বেদান্ত-দর্শন মনে করেন। দর্শন বলিলেই দ্রষ্টা ও দৃশ্য থাকিবেন। দ্রষ্টা ও দৃশ্য না থাকিলে, দর্শনের অস্তিত্ব কোথায়? যেস্থানে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনকে একাকার-কবল রূপ ত্রিপুটি-বিনাশের চেষ্টা, সে স্থলে দর্শনের শুদ্ধাবস্থা কিছুতেই থাকিতে পারে না। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকটে বেদান্তের 'মায়াবাদ'-ভাষ্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

> প্রভু কহে—"সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল।
> তোমার ব্যাখ্যা শুনি' মন হয় ত বিকল॥
> সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
> ভাষ্য কহ তুমি,—সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া॥
> সূত্রের মুখ্য অর্থ না করহ ব্যাখ্যান।
> কল্পনার্থে তুমি তাহা কর আচ্ছাদন॥"
>
> (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর নিকটে মহাপ্রভু অভিধা-বৃত্তিতে বেদান্ত-দর্শনের যে দিগ্-দর্শন করিয়াছেন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠকগণ তাহা নিশ্চয়ই অবগত আছেন। শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদের 'অণুভাষ্য', শ্রীল রামানুজ আচার্য্যের 'শ্রীভাষ্য', শ্রীনিম্বার্কপাদের 'পারিজাত-ভাষ্য' এবং সর্ব্বোপরি গৌড়ীয়াচার্য্যপ্রবর শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর বিরচিত 'শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য' পাঠ করিলে বেদান্ত-দর্শনের প্রকৃত অর্থ জানা যাইবে। শ্রীমদ্ভাগবতও ব্রহ্মসূত্রেরই ভাষ্য। বেদান্ত দর্শনের অপর নাম উত্তর বা তত্ত্বমীমাংসা। শ্রীগোবিন্দভাষ্যে 'অচিন্ত্য-

ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত' শ্রুতিপ্রমাণ সহ অতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

বেদান্ত দর্শনে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের নিত্যত্ব বর্ণিত হইয়াছে। সেব্য ভগবান্—নিত্য; সেবক জীবচয়—নিত্য; জীবের ভগবৎসেবা নিত্য। শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধ। কৃষ্ণভক্তি—অভিধেয়। কৃষ্ণপ্রেম—প্রয়োজন। বেদের সর্ব্বাংশ বিচার না করিয়া স্বমত-স্থাপনের জন্য অংশ-বিশেষ মাত্র গ্রহণ করিলে, বাস্তব সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। বেদের একদেশ মাত্র বিচার করিয়া নির্ব্বিশেষ-বাদিগণ ব্রহ্মকে নির্গুণ এবং কোন স্থলে ত্রিগুণময় বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। বিগ্রহযুক্ত হইলেই ব্রহ্ম ত্রিগুণাধীন হন, ইহাই তাঁহাদের ধারণা। কিন্তু সার্ব্বদেশিক বিচারে এই সৎসিদ্ধান্তই পাওয়া যায় যে, ব্রহ্ম বা ভগবদ্বস্তু কেবল নির্গুণ বা ত্রিগুণাতীত নহেন, পরন্তু তিনি অনন্ত চিদ্‌গুণ-রাশির আধার সবিশেষ বিগ্রহ। শ্রীভগবানের বিগ্রহ মায়িক বা পাঞ্চভৌতিক নহে; তিনি বিভু শুদ্ধসত্ত্বময় তনু। শ্রীভগবানের নাম—নিত্য, রূপ—নিত্য, গুণ—নিত্য, পরিকরগণ—নিত্য, লীলা—নিত্য, লীলানন্দ—নিত্য। নিত্যলীলানন্দই আত্মদর্শনে প্রেমতত্ত্ব।

বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলেন,—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" অর্থাৎ আত্মবস্তু বা হরিসম্বন্ধি-বস্তু দর্শন করিতে হইবে, তাঁহার বিষয় শ্রবণ করিতে হইবে, চিন্তা করিতে হইবে এবং ধ্যান করিতে হইবে।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ বলেন,—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

যাঁহার শ্রীভগবানে পরাভক্তি বর্ত্তমানা, আবার যেমন শ্রীভগবানে তেমন শ্রীগুরুদেবেও শুদ্ধভক্তি আছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধেই এই সকল বিষয় উপদিষ্ট হইয়া প্রকাশ পায়।

শ্রীগোপাল তাপনী বলেন,—"ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনসঃ কল্পনম্।" অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দদেবে ভক্তিই ভজন। ইহলোক ও পরলোক-সম্বন্ধীয়-কামনা নিরসনপূর্ব্বক এই কৃষ্ণাখ্য পরব্রহ্মে শুদ্ধমনের প্রেমদ্বারা তন্ময়ত্বই ভগবানের ভজন।

বৃহদারণ্যক আরও বলেন,—"আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত।" আত্মাকে অর্থাৎ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে প্রিয়বুদ্ধিতে উপাসনা করিবে।

উক্ত প্রকারের অসংখ্য শ্রুতিবাক্যে অনাত্মপ্রতীতির অতীত আত্মদর্শনের নিত্য সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে।

বৈষ্ণব-দর্শনের নামান্তর আত্মদর্শন। আত্মদর্শনে কখনই অচিদ্‌ভূমিকার স্থান নাই, সুতরাং প্রেমতত্ত্বেও যে নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। আত্মদর্শন ব্যতীত অন্যত্র প্রেমের অবস্থিতি নাই। আত্মজগৎ গোলোক-বৈকুণ্ঠের হেয় বিকৃত প্রতিফলন এই জড় জগৎ। জড়বাদিগণ যাঁহাকে প্রেম বলেন, তাহা আত্মজগতের হেয় বিকৃত প্রতিফলন 'কাম' মাত্র। কাম ও প্রেমের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন,—

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য—নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য প্রেম ত প্রবল॥"

প্রেমিক ভক্তের হৃদয়ে নিজ সুখের বাঞ্ছা বিন্দুমাত্রও নাই। সেব্যকে আনন্দিত দেখিলেই তাঁহার অপার আনন্দ। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এমন কি মোক্ষবাসনা পর্য্যন্ত তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না। তাঁহার শুদ্ধ বিচার এই—

"অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব।
তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

কামের অতৃপ্তিতে ক্রোধের উদয় হয়। তৎফলে কলহের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহ জগতে বদ্ধজীব মাত্রই নিজ সুখের জন্য ব্যস্ত। আবার একের সুখপ্রচেষ্টায় অপরের সুখ বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে গৃহে গৃহে কলহের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া থাকে। অপ্রাকৃত প্রেমের সেবক-গণের নিজেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাসনার পরিবর্ত্তে সর্ব্বসেব্য শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবর্দ্ধনই একমাত্র উদ্দিষ্ট বিষয় হওয়ায়, তথায়

প্রাকৃত কলহের স্থান নাই। অপ্রাকৃত প্রেমের সেবক আনন্দের অভিলাষী না হইয়াও আনন্দলীলাময়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় অতুল আনন্দের অধিকারী হইয়া থাকেন। তাঁহার আনন্দ-সমুদ্রের তুলনায় ব্রহ্মানন্দও খাতোদক সম তুচ্ছ। এই প্রেম-রাজ্যের এমনই চমৎকারিতা যে, ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ হইতেও ভোগ্যা হ্লাদিনী শক্তির আনন্দ কোটি গুণে অধিক। প্রাকৃত রতি-শাস্ত্র আলোচনা করিয়া ভরত মুনি লিখিয়াছেন যে, 'বিষয়' ও 'আশ্রয়' উভয়ের আনন্দ সমান। কিন্তু চিদ্‌বিলাস-রাজ্যের প্রেমসম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানাভাব।

অপ্রাকৃত জগতে প্রবেশ না করিয়া প্রাকৃত সহজিয়া ও নেড়ানেড়ীর দল শ্রীকৃষ্ণ-লীলা লইয়া যে ছিনি-মিনি খেলা আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে জগজ্জঞ্জাল বৃদ্ধি পাইতেছে মাত্র। জনসাধারণ তাহাদের নীতিহীন কদাচারকে কৃষ্ণলীলা জ্ঞান করিয়া ভ্রান্ত হইতেছেন। কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণপ্রেম জড়-জ্ঞানের অধীন নহেন। শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ ও ভজনক্রিয়ার ফলে অনর্থ নিবৃত্ত হয়। অনর্থনিবৃত্তি হইলে ভজনে নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তির উদয় হয়। সাধনভক্তির এই সাতটী অবস্থার পরে ভাব-ভক্তি। ভাব-ভক্তির গাঢ় অবস্থা প্রেম-ভক্তি। সুতরাং এই জগতের নীতিহীন-কামুকতা কেন, নীতিপরায়ণতাও অপ্রাকৃত প্রেমতত্ত্ব বুঝিতে সমর্থ নহে। প্রেমোপলব্ধির জন্য সাধন, ভজন ও কৃষ্ণ-কাষ্ণ-কৃপার প্রয়োজনীয়তা আছে। কৃষ্ণলীলা হাটে বাজারে কীর্ত্তিত হইবার সামগ্রী নহে। তাহা শুদ্ধান্তঃকরণে আস্বাদনীয়।

বদ্ধ জীবের নিজ বিদ্যাবুদ্ধির বলে জ্ঞানাহরণ চেষ্টা 'আরোহমার্গ'-নামে অভিহিত। স্থূল ও সূক্ষ্মদর্শনসমূহ আরোহমার্গে অবস্থিত, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণলীলা জড় বিদ্যা, বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের অগম্যা। আরোহ-মার্গ অপ্রাকৃত প্রেম-রাজ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ নহে। শ্রীভগবানের ও তাঁহার নিত্যসিদ্ধ সেবকগণের কৃপালোকেই প্রেমতত্ত্ব হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করে। কৃপা অবতরণ করেন। তজ্জন্য কৃষ্ণ-দর্শন ও কৃষ্ণপ্রেম-লাভ যে উপায়ে সম্ভব, তাহা 'অবরোহ'-মার্গ নামে অভিহিত। স্থূল ও সূক্ষ্ম দর্শনসমূহে শুদ্ধ প্রেম-তত্ত্বের অবস্থিতি নাই। আত্মদর্শনেরই ইহা একচেটিয়া সম্পত্তি।

'স্থায়ি-ভাব' নামে একটী পরম উপাদেয় ভাব ভাবনার পথ অতিক্রম করিয়া অবস্থিত। তাহা চমৎকারাতিশয়ের আধার-স্বরূপ এবং শুদ্ধসত্ত্ব পরিমার্জ্জিত উজ্জ্বল হৃদয়ে আস্বাদিত হইয়া থাকে। এই স্থায়ি ভাবের নামান্তর অপ্রাকৃত রস। এই রসের সহিত 'বিভাব', 'অনুভাব', 'সাত্ত্বিক-ভাব' ও 'সঞ্চারিভাব'—সামগ্রীচতুষ্টয়ের সংযোগে অপ্রাকৃত প্রেমের প্রকাশ হয়। প্রবন্ধবিস্তারভয়ে অদ্য প্রেমসম্বন্ধে আর অধিক আলোচনায় অগ্রসর হইলাম না।

শাশ্বত

শ্রীপ্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুখেও আছ, দুখেও আছ,
দুঃখ সুখের তফাৎ কোথা ?
কাজের মাঝে তুমিই বাধা
ব্যর্থতা ও সার্থকতা।
আকাঙ্ক্ষাতে লুকিয়ে আছ
বিফলতার অশ্রু হয়ে—
বিলাস-লীলায় নৃত্যশীলা
সৃষ্টি-নদী যাচ্ছো বয়ে।

স্নেহের বুকে স্নিগ্ধতাটি
আলিঙ্গনের তুমিই জ্বালা।
বিদ্বেষেরই বিষটি তুমি
তুমিই প্রীতি-পুষ্পমালা ;
জন্ম তুমি, জীবন তুমি,
মরণ তুমি—মরণহীন—
কার্য্য তুমি, কারণ তুমি,
কর্ত্তা তুমি, ভৃত্য দীন।

তন্দ্রিতা

শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

রাত অনেক হয়েছে, কমলি তার কোলের ভাইকে ভোলাচ্ছে। অ অ…কাঁদে না।…ঘু—মো—ও।…অ অ…। এইবার কাশি ভাল হয়ে যাবে। এই মাথায় ফুঁ দিয়ে দিলুম। মধু খাবে…মধু!

খাটিয়ার খুরোর কাছে পিদিম জ্বলছে, ওধারে দড়ির আলনায় সব কাপড় কোঁচান রয়েছে; পিদিম রেখে রেখে দেয়ালটায় কি রকম কালি পড়েছে! দড়ির কাপড়ের সব লম্বা লম্বা ছায়া পড়েছে মেঝেয়, দেয়ালে; দীপশিখা যত নড়ে, ছায়াগুলো তত নড়বড় করে। কচি ভাইয়ের কান্না আর থামে না, শেষে কেঁদে কেঁদে গলা ভেঙে গেছে। ডুলী খাট নাড়া দিতে দিতে ঢুলতে থাকে কমলি।…আ… আ…কাঁদে না…কাঁদে না। চোখ বুজে আসে, মাথাটা ঝুঁকে পড়ে, কমলি জোর করে ঘাড় সোজা করে রাখে।

তের বছরের মেয়ে কমলি, ভাইটিকে নিয়ে পাশের ঘরে শোয়। ওধারে বড় ঘরে, বাপের নাক ডাকছে। দীপশিখা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কাল কাল মস্ত মস্ত ছায়া এধার ওধার চলে বেড়াচ্ছে। রুগ্ন ভাইটি, কমলি ঘুমুতে পাচ্ছে না। যদি ঘুমিয়ে পড়ে, বাপ কি আর আস্ত রাখবে! কমলি চুপি সাড়ে পা টিপে টিপে দরজার কাছে এল। কাণ পেতে রইল। ঘরে আর কোন সাড়া শব্দ নেই, কেবল বাপের নাক ডাকছে। নাক ডাকা একটু থামল। কমলি কাণ খাড়া করে আছে। বোধ হয় জাগল! ত্রস্তে একেবারে ভাইয়ের খাটের দিকে এগিয়ে গেল, আবার আস্তে আস্তে পেছু হেঁটে দরজার কাছে এল। কেমন যেন একটা গোঙানির শব্দ, গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল, খাটটা মচ্‌মচ্‌ করে উঠল, বাবা পাশ ফিরল হয়ত! তা হলে জাগে নি। কমলি ভাইটির কাছে এল। ভাই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘরে চাঁদের আলো এসেছে দরজার ফাঁকে, অল্প একটু। বড্ড গরম বোধ হচ্ছে। জানলা একটু খুলে দিই।…কমলির মাথাটা টিপ টিপ করছে; কয়েক রাত্রের অনিদ্রা। ঘরের কোলে রাস্তাটা চওড়া দেখাচ্ছে, আর কি লম্বা যেন শেষ নেই। তার এক পাশে পড়েছে চাঁদের আলো, আর এক পাশ অন্ধকার। জাম আর ছাতিম গাছের বড় বড় ছায়া পড়েছে এধার থেকে ওধার পর্য্যন্ত; ওপাশের শিব মন্দিরের চূড়াটা একেবারে তাদের দাওয়ায় এসে পড়েছে। হাত বাড়িয়েই কমলি সেটা ছুঁতে পারে!…নিশুতি রাত। একটা পেঁচা কর্কশ চীৎকার করে ছাতিম গাছে বসল, কমলি অনেক চেষ্টা করেও পেঁচাটাকে দেখতে পেলে না। শীতল হাওয়ায় তার মাথা ধরা কম বোধ হ'ল—ঘুমে চোখ ঢুলে এল, জানলার চৌকাঠে মাথা রাখলে। তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে ধোঁয়াটে সব ছবি ভেসে উঠছে। কাল অন্ধকারের মধ্যে গোল গোল ভাঁটার কাঁটা মত কি সব ঘুরতে লাগল, কোন শব্দ নেই, কেবল ঘুরছে। গাছের ফাঁক দিয়ে বড় বড় মেঘ ভেসে গেল; মেঘের ওপরে কারা শুয়ে কে যেন ঘুমোচ্ছে।…বড্ড অন্ধকার, স্পষ্ট দেখা যায় না।… …দূরে টেলিগ্রাফের তার, রূপোর মত চক্‌চকে, তার ওপর দিয়ে বালির কাগজের খাম চলেছে ঊর্দ্ধশ্বাসে,… তাদের রামহরি পিয়ন পেড়ে নিজে— খুলে, পড়ে শুনিয়ে দিলে…সব ঘুমিয়ে পড়।…

ভাইটি ককিয়ে উঠল। কমলি দৌড়ে এল খাটের কাছে। মাথা চাপড়ালে, পাশ ফিরিয়ে দিলে, কপাল ভিজে গেছে কিনা দেখলে। মেঝেয় পা ছড়িয়ে খাটিয়ার কাছে বসল। পিদিমটা নিবু নিবু হয়ে এসেছে। তার চোখের সামনে খাট, পিলসুজ, আলনা সব যেন ঘুরছে; চোখ বুজলে কমলি।…

…সাদা কাপড় পরা, মাথায় এক মাথা চুলের খাবলানো, হাতের তেলো, পায়ের চেটো লাল টকটকে, কে শুয়ে আছে?…ওমা, মা তুমি! মা বললে, "কমলি বুকে একটু হাত বুলিয়ে দেরে, বড় কষ্ট!" মার রঙটা কি ফ্যাকাশে, যেন রক্ত নেই। "কমলি", হাঁফাতে হাঁফাতে বললে মা, "তোর যদি একটা বিয়ে দিয়ে যেতে পারতুম।" …সকালে কবিরাজ এল, নাড়ী টিপলে, বললে আর আশা নেই, শ্বাস উঠেছে।…

...র সব কালোয় কালো হয়ে গেল।...
...তিম গাছটায় বসে, ছেলেটার কি কাশি,...
...ক, নেমে এসো, মধু খেলেই সেরে যাবে।...
...কিন্তু নামল না।— একটা পেঁচা উড়ে গেল।...

...লো সব আকাশ থেকে নেমে এসেছে, কি জলছে। ...তারা ত নয়, কি সুন্দর সব বাতি! ও, ...সেই দেশ, ঝণ্টু বলেছিল, কি যেন নাম। ..., কলকাতা।......কি মিষ্টি সুর ভেসে আসছে!... ...শব্দ...সাদা ঘোড়া নেমে এল আকাশ থেকে, কি বড় পাখা,...আর কি সুন্দর! কমলি তার পিঠের ...চড়ে বসল। আর সোঁ সোঁ গোঁ গোঁ উড়ে চলল ...

...বাড়ী, কি ফটক, চার পাশ সাদা...

...বড় ঘর দালান পেরিয়ে কমলি চলেছে, সঙ্গে এক ...। একটা ঘরে তাকে ঢুকিয়ে দিয়ে ঝিটা চলে ...সব সাদা আর সাদা, চক্‌চক্‌ করছে। পালঙ্কে একখানি উঁচু সাদা বিছানা...কে যেন শুয়ে—ওমা, এ যে ঝণ্টু! ঝণ্টুকে কি সুন্দর দেখতে লাগছে।

ঝণ্টু বললে, 'কমল, দাঁড়িয়ে রইলে, এস। তিনবার ঘুমোওনি, শোবে এস।' ঝণ্টুর রিনরিনে গলা, আবার কত মিষ্টি শোনাল! হাত ধরে' তাকে পালঙ্কে বসাবে, —স্ফটিকের পালঙ্ক, আন্দাজ করতে না পেরে, কমলি ভুম্‌ করে পড়ে গেল।

"পোড়ারমুখী ঘুমানো হচ্ছে! জানলাটা খুলে রেখেছিস যে; ছেলেটাকে তুইই খাবি রাক্কুসী!" বাপের কর্কশ কণ্ঠে, কমলি ধড়্‌ফড়্‌ করে উঠে বসল। তার মাথাটা ঠুকে গিয়েছিল।

লাল ফোলা ফোলা চোখে জল নিয়ে, জানালাটা বন্ধ করে, কমলি ভাইয়ের জন্যে পালি করতে বসল, তোলা উনুনে, নারকল পাতা গুঁজে দিয়ে। তার কেশভার বিপর্যস্ত, খাড়া নাক, নাসারন্ধ্র কেঁপে কেঁপে উঠছে থেকে থেকে, নাকের ...টা তেল চক্‌চকে হয়ে উঠেছে।...

বীজ ও আবরণ

শ্রীসত্যব্রত মজুমদার, বি এ.

...র ভূমির পরে অনাদৃতা খদ্যোতিকা মত
বীজগুলি যত,
...রবে পড়িয়া থাকে—
জড়ানো অন্তরতল শত শত বাসনার পাকে।
দেহ 'পরে ক্ষীণ আবরণ
ঢেকে রাখে প্রাণের স্পন্দন।

সজল বরষারাণী বসুন্ধরা বক্ষ 'পরে আসে
দিগ্বধূরা হাসে;
ধরাতল নব পত্রে সাজি'
আনে পুষ্পরাজি।
নিভৃতে বীজের অঙ্গে আবরণখানি যায় টুটে'
নবরূপ ওঠে সেথা ফুটে'।

অন্তরের অন্তঃস্তলে গভীর ক্রন্দন
লভিতে জীবন,
হয়ে যায় অবসান
পাইয়া প্রতীক্ষা-শেষে বরষার করুণার দান।
আবরণ পড়ে' থাকে দূরে
শাশ্বত প্রাণের বাণী স্ফুরে।

বেগম লুৎফুন্নিসা

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

নবাব সিরাজদ্দৌল্লাকে ঘিরিয়া জীবনের যে মহোৎসব চলিতেছিল, অর্দ্ধপথেই তাহা থামিয়া গেল কেন? বিধাতা-পুরুষ সিরাজকে ত' অনেক কিছুই উজাড় করিয়া দিয়াছিলেন—দিতে কিছুই কার্পণ্য করেন নাই। কিন্তু তিনিই আবার সেই সব ছিনিয়া নিলেন কেন? বিরাট আশা-আকাঙ্ক্ষা, মুক্তির প্রতীক সিরাজের জীবন অর্দ্ধ-মুকুলিত অবস্থায় কেন শুকাইয়া গেল? কে বলিবে, কেন? তাই সিরাজের কথা মনে হইলেই বঙ্কিমচন্দ্রের অমর ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে—"কে এমন পাইয়াছিল, কে এমন হারাইয়াছে!"

হতভাগ্য নবাব সিরাজদ্দৌলার জীবনের ইতিহাস বলা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তাঁহারই জীবন-সঙ্গিনী, তাঁহার সুখ দুঃখের অংশভাগিনী বেগম লুৎফুন্নিসার শেষ জীবনের একটী মাত্র করুণ কাহিনী আমরা এখানে বর্ণনা করিব।

নবাব সিরাজদ্দৌল্লা সম্বন্ধে ইতিহাস সত্য মিথ্যা অনেক কিছু বলিয়াছে। কিন্তু তাঁহার পরিবারস্থ লোকের কথা, বিশেষ করিয়া বেগম লুৎফুন্নিসার কথা, তাঁহার জীবনের করুণ কাহিনী সম্বন্ধে ইতিহাস প্রায় নীরব। বাংলার দ্বিতীয় রাজধানী ঢাকায় (প্রাচীন নাম—জাহাঙ্গীর নগর) সিরাজের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের পর বেগম লুৎফুন্নিসা কিছুকালের জন্য আশ্রয় লইয়াছিলেন। বড় দুঃখের দিনে ঢাকা নগরী তাঁহাদিগকে একটু ঠাঁই দিয়াছিল। আজও ঢাকা নগরীর এক অঞ্চল "জিঞ্জিরা" সিরাজ-পত্নী বেগম লুৎফুন্নিসা ও কন্যা জহুরার স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া মৌনমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এই ঢাকা নগরীতেই লুৎফুন্নিসা সিরাজের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের পর তাঁহার জীবনের প্রত্যক্ষ দেবতা, প্রিয়তম স্বামীর স্মৃতি দীর্ঘ সাত বৎসর কাল আদর্শ পত্নী ও যোগ্যা সহধর্ম্মিনীর ন্যায় হৃদয়ে ধারণ করিয়া বাঁচিয়াছিলেন। এইখানেই তিনি অশ্রু-মালা গাঁথিয়া দয়িতের ধ্যানে তন্ময় হইয়া থাকিতেন।

বুড়ীগঙ্গা নদীর তীরে জিঞ্জিরার এই ধ্বংসাবশেষ যেন অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া অতীতের একটা বিষাদময় ক[illegible] কাহিনীর প্রতি পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বর্ত্ত[illegible] উক্ত স্থান ঢাকার নবাবের বাগান-বাড়ী। ঢাকা [illegible] হইতে মুর্শিদ কুলি খাঁর গমনের পর নবাবেরাই প্রকার[illegible] মুর্শিদাবাদ নবাবের প্রতিনিধিস্থানীয় হইয়াছিলেন।

সিরাজদ্দৌল্লার শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের পর না[illegible] নবাব মীরজাফরের আদেশে সিরাজের পরিবারের [illegible] দিগকে জিঞ্জিরার এই বাগান-বাড়ীতে নির্ব্বাসিত [illegible] হইয়াছিল। হায়, ইহাই ছিল বাংলার বেগমের দুঃ[illegible] দিনের আবাস-স্থল। সিরাজ-জননী আমিনা বেগম [illegible] তাঁহার মাতৃস্বসা ঘসেটী বেগমকে যে এখানে নির্ব্ব[illegible] পাঠান হইয়াছিল, ইতিহাস তাহার সন্ধান রাখে। [illegible] সিরাজ-পত্নী বেগম লুৎফুন্নিসা ও কন্যা জহুরা যে এইখ[illegible] নয়নের জলে ভাসিয়া দীর্ঘ সাত বৎসর কাল কাটা[illegible] ছিলেন, ইতিহাসও উহার বড় একটা খোঁজ খবর র[illegible] না। কিন্তু বেগম লুৎফুন্নিসা ও নবাব-নন্দিনী জহুরা[illegible] যে এখানে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছিল, তাহারও প[illegible] ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। প্রসিদ্ধ "সিরমুটিখারি[illegible] লেখক গোলাম হোসেনও এই মত সমর্থন করেন।

ইতিহাসের পাঠকপাঠিকাগণ অনেকেই ঘসেটি বে[illegible] ও আমিনা বেগমের শোচনীয় মৃত্যুর কথা অবগ[illegible] আছেন। এই সময়ে মীরজাফরের দুর্দ্দান্ত পুত্র মী[illegible] সিরাজের বংশ নিশ্চিহ্ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হ'ন। কির[illegible] এই ভীষণ কু-অভিপ্রায়কে কার্য্যে পরিণত করা যায়, [illegible] পাপিষ্ঠ তাহারই ছল খুঁজিতে আরম্ভ করিল। খ[illegible] ছলের অভাব কোন কালেই হয় না। সে (মীর[illegible] ঢাকায় মুর্শিদাবাদের তদানীন্তন নায়েবের পরামর্শ জিজ্ঞা[illegible] করিল এবং জসরত খাঁকে এই দুষ্কার্য্যে সহায়তা করি[illegible] বলিল। কিন্তু জসরত খাঁ সোজা অস্বীকার করিলে[illegible] তখন দুর্ম্মতি নরাধম মীরণ নিজেই এই দুষ্কর্ম্ম সা[illegible] করিতে অগ্রসর হইল। বৃদ্ধা বেগমদ্বয়কে (ঘসেটি বেগম আমিনা বেগম) মুর্শিদাবাদ পৌঁছানর ছলে নৌক

আনিয়া তোলা হইল। তারপর নৌকাখানা ধলেশ্বরী নদীর প্রবল স্রোতে নিমগ্ন করা হইল। এইরূপে বেগমদ্বয় ধলেশ্বরীতে প্রাণ হারাইলেন। এইরূপ কথিত আছে যে, আমিনা বেগম মৃত্যুকালে মীরণকে এইরূপ অভিশাপ দেন যে, বজ্রাঘাতে তাহার মৃত্যু হইবে। হইয়াওছিল তাহাই। প্রখর দিবালোকে বিনা মেঘে বজ্রপাতে মীরণের পাপ-জীবনের অবসান হয়। যেই স্থানে নৌকা ডুবান হইয়াছিল, ধলেশ্বরী নদীর সেই স্থানটিকে আজিও লোকে দেখাইয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ধলেশ্বরীর এই স্থানটীতে সব সময়েই একটা প্রবল ঘূর্ণাবর্ত্ত দেখা যায়। সৌভাগ্যের বিষয়, লুৎফুন্নিসা তাঁহাদের সাথে সেই নৌকায় ছিলেন না।

লুৎফুন্নিসার জীবন বড়ই দুঃখময়। প্রিয়-বিয়োগে দুঃখের পাহাড় যেন তাঁহার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। সুখ দুঃখে, সম্পদে বিপদে, এই নবাব-মহিষী ছায়ার ন্যায় তাঁহার স্বামীর অনুগমন করিতেন। এমনই নিবিড় ছিল তাঁহার প্রেম। এই প্রেম শোক-দুঃখের গহন অরণ্যপথেও পথ হারায় নাই এবং বিপদের নিদারুণ সংঘাতেও তাঁহার জীবনের সুর বিগড়ায় নাই। যতদিন তিনি জীবিতা ছিলেন, শান্তি তাঁহার অদৃষ্টে ছিল না। কিন্তু অতীত দিনের স্বামীর সুখ-স্মৃতির মধ্যেই তিনি ডুবিয়া থাকিতেন এবং সেই রূপেরই ধ্যান করিতেন।

লুৎফুন্নিসার জীবনী সম্বন্ধে এইটুকু জানা যায় যে, তিনি হিন্দু ক্রীত-বালিকা (Hindu slave girl) ছিলেন। তিনি ছিলেন অসামান্য সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী। তাঁহার নাম ছিল রাজকুমারী। সিরাজের মাতার সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল এবং সিরাজ-জননীকে তিনি সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। সিরাজ তাঁহার অনবদ্য সৌন্দর্য্য ও অনুপম রূপলাবণ্য দর্শনে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হ'ন এবং সেই হইতেই তাঁহারা শুধু ইহ জীবনের চলার পথে নয়, জীবনের পরপারেও উভয়ে ছিলেন বিশ্বস্ত বন্ধু এবং আদর্শ জীবন-সঙ্গী ও সঙ্গিনী।

আবার কেহ কেহ বলেন যে, লুৎফুন্নিসা মোহনলালের ভগিনী ছিলেন। মোহনলাল সিরাজের সাথে স্বীয় ভগিনীর বিবাহ দিয়া ভাগ্যদেবীর প্রসন্ন দৃষ্টি লাভ করেন। ঐতিহাসিকদের মধ্যে এই বিষয়ে মতানৈক্য দেখা যায়। সে যাহা হউক, লুৎফুন্নিসা যে পতির প্রতি অনুরক্তা, আদর্শ সাধ্বী স্ত্রী ছিলেন, সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। পুণ্যতোয়া কলনাদিনী জাহ্নবী-সৈকতে পলাশীর সংগ্রাম-ক্ষেত্রে ভাগ্যলক্ষ্মী সিরাজের নিকট হইতে বিদায় লইলেন। তখন আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, অমাত্য সকলেই বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া একে একে তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে লাগিল;—কেবল তাঁহার পাশে একাকিনী দণ্ডায়মানা রহিলেন তাঁহার অঙ্কলক্ষ্মী, তাঁহারই জীবন-মরণের বিশ্বস্ত সঙ্গিনী লুৎফুন্নিসা। যখন সিরাজ রাজমহল হইতে পলাইয়া যাইতেছিলেন, তখন পত্নী লুৎফুন্নিসা ও তাঁহার কন্যা জহুরা তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু, তিনি পথে মীরকাশিম কর্ত্তৃক ধৃত ও বন্দী হইলেন। অদৃষ্ট-দেবী আর এক খেলা খেলিলেন! রুস্তম মহম্মদী বেগের শাণিত তরবারিতে সিরাজের জীবন-নাট্য শেষ হইলে পর লুৎফুন্নিসা ও জহুরা উভয়েই ঢাকায় নির্ব্বাসিতা হ'ন। ইহা সংঘটিত হইয়াছিল ১৭৫৮ খৃঃ অব্দে। লুৎফুন্নিসা যে ১৭৬৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ঢাকায় ছিলেন, তাহা বিশ্বাস করিবার পর্য্যাপ্ত কারণ আছে। এই ১৭৬৫ খৃঃ অব্দেই ইংরাজেরা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন এবং ক্রমে ইহা হইতেই সমুদ্রমেখলা ঐশ্বর্য্যপরিপূর্ণা ভারতভূমি অধিকার করেন। এই সময়ে ইংরাজেরা লুৎফুন্নিসাকে মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি দেন। যিনি ছিলেন বাংলার নবাবের হৃদয়েশ্বরী, নয়নের মণি, জীবনের বিশ্বস্ত সুহৃদ্ ও সহচরী, সেই লুৎফুন্নিসাকে এক-মুষ্টি অন্নের জন্য পরের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইয়া-ছিল। দারিদ্র্যের তীব্র কশাঘাতে তিনি তখন জর্জ্জরিতা ছিলেন। তদুপরি প্রিয়তম স্বামীর শোচনীয় অকাল মৃত্যুতে তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তিনি উন্মাদিনী প্রায় হইয়াছিলেন। এই সময় বাৎসরিক ৬০০৲ (ছয় শত টাকা) তাঁহাকে "পেন্সন" দেওয়ার বরাদ্দ হইল। তাহাও আবার তিনি নিয়মিতরূপে পাইতেন না। মহম্মদ রেজা খাঁর ঢাকায় আগমনের পর হইতে এই ব্যবস্থার সামান্য উন্নতি হইয়াছিল মাত্র।

সিরাজ-নন্দিনী জহুরা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায়

না। তিনি সময়ে সময়ে মস্তিষ্কবিকৃতি রোগে ভুগিতেন। মীর আশদ আলী খাঁ নামক জনৈক ব্যক্তির সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। এই বিবাহে জহুরার চারিটি কন্যা-সন্তান জন্মিয়াছিল। তাঁহাদের নাম শারফুন্নেসা, আসমতুন্নিসা, সাকিনা এবং আমৎউলমহদী। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, জহুরা তাঁহার মাতার জীবদ্দশাতেই পরলোক গমন করেন। জহুরার মৃত্যুর পর তাঁহার বার্ষিকী টাকা লুৎফুন্নিসা ও তাঁহার দৌহিত্রীদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। লুৎফুন্নিসার অংশে পড়িয়াছিল মাসিক ১০০৲ একশত টাকা এবং দৌহিত্রীরা প্রত্যেকে পাইতেন মাসিক ১২৫৲ টাকা করিয়া।

১৭৯০ খৃঃ অব্দে মুর্শিদাবাদে লুৎফুন্নিসার দুঃখময় জীবনের অবসান হয়। "সিরমুতাখরিনের" হাজি মুস্তাফা ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে তাঁহাকে তথায় দেখিয়াছিলেন। লুৎ-ফুন্নিসার মৃত্যুর পর তাঁহার দৌহিত্রীরা মাতামহীর বার্ষিকী টাকা পাইবার জন্য আবেদন করেন। কিন্তু প্রথমতঃ "বোর্ড অফ্ রেভেনিয়ু" কর্ত্তৃক উহা না-মঞ্জুর হয় এবং ঢাকার তদানীন্তন কালেক্টর মিঃ উইলিয়ম্ ডগ্‌লাস্‌কে বেগমের ঐ টাকা প্রদান করিতে নিষেধ করা হয়। পরে এই বিষয় গভর্ণর জেনারেলের গোচরীভূত করা হইলে, মৃতা বেগমের উক্ত মাসিক ১০০৲ টাকা চারি-দৌহিত্রীর মধ্যে সমান অংশে ভাগ করিয়া দিবার আদেশ হয়।

চারি দৌহিত্রীর মধ্যে বেগম সাকিনা ১৭৯৭ খৃঃ অব্দে মারা যান। বেগম লুৎফুন্নিসা যে ঢাকায় ছিলেন, সেই বিষয়ে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। কিন্তু দৌহিত্রীরা যে ঢাকায় ছিলেন, তাহার কোন স্মারক-চিহ্ন বর্ত্তমান নাই। দৌহিত্রীরা খুব সম্ভব মুর্শিদাবাদে বাস করিতেন এবং পেন্সনের টাকা ঢাকার নিজামতের নিকট হইতে তথায় প্রেরিত হইত। বর্ত্তমানে ঢাকায় মুর্শিদাবাদের নবাবের কোন উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তির ভগ্ন-স্তূপও দৃষ্টিগোচর হয় না। মুর্শিদাবাদ হইতে পেন্সন পান, এমন একটী পরিবার মাত্র ঢাকায় আছেন।

জিঞ্জিরার উদ্যান-বাটীটুকু আজও সিরাজ-মহিষী বেগম লুৎফুন্নিসার জীবনের দুঃখময় করুণ কাহিনী বহন করিয়া নীরবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আজিও সেখানকার ধ্বংস-স্তূপ হইতে বাংলার বেগমের হৃদয়-মথিত মর্ম্মবেদনা ঝরিয়া পড়িতেছে। তাই, পাষাণের চোখেও দেখা যায় অশ্রুবিন্দু। জিঞ্জিরার পাদদেশ চুম্বন করিয়া আজিও বুড়ীগঙ্গা কুলুকুলু নিনাদে সাগর সঙ্গমে প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু যাঁহারা এখানে ছিল, তাঁহারা আর নাই।

"আমার গানের মালাখানি, করলে কারে দান"

শ্রীমতী কনকপ্রভা দেব সরকার, বি.এ.

আমার গানের মালাখানি
করলে কারে দান,
মালার সাথে জড়িয়ে আছে
করুণ অভিমান।
বাদল-ঝরা অশ্রুব্যথা,
মনের মাঝে তোমার কথা,
সবার সাথে রঙিয়ে তোলে
সাঁঝের অভিযান।

জীবন-তরী মিশ্‌ছে এসে,
নিরুদ্দেশের যাত্রা শেষে,
অশ্রুজলে ধৌত করি
বেদন-কাতর প্রাণ;
মিলনসুরে ভরিয়ে তোল
নীরব ব্যথার দান।

জ্যোতিষী

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

যদিও ছাত্রাবস্থা হ'তেই আছি ক'লকাতায়, এবং আমার চাকরী-জীবনের দীর্ঘ সতরটা বছর কেটে গেছে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় সহরে, তা' হ'লেও রমেশবাবুর সঙ্গে পরিচয় আমার এখানে হয়নি। 'পরিচয়' বলতে যা বোঝায় তা' অবশ্য হয়নি; কিন্তু আলাপই বা ঠিক বলি কি করে? আমি তো ভেবে পাচ্ছিনা ঠিক কি নাম এর দেব! তার চেয়ে বরং সমস্ত ঘটনাটাই আপনাদের খুলে বলি; আপনারাই বলুন কি নাম এর দেওয়া যেতে পারে?

সেবারে গিয়েছিলাম ঋতু ওরফে ঋতব্রতর সঙ্গে ওদের গ্রামে। ঋতু ছিল আমার কলেজ-জীবনের সহপাঠী এবং আমার কর্ম্মক্ষেত্রে অর্থাৎ ষাট টাকা মাইনের কেরাণী-জীবনে সহকর্ম্মী। দু'জনেই কাজ করি রেল আফিসে—য়্যাকাউন্টস্ ডিপার্টমেণ্টে, একই সেক্‌শানে। চাকরী হবার বছর দুই পরে ঋতুর অনুরোধে একবার কিসের ছুটিতে ঠিক মনে নেই—বোধ হয় গুড্ ফ্রাইডেতে—ওর দেশে গিয়েছিলাম।

ষ্টেশনটি ছোট। একজন অধীনস্থ কর্ম্মচারী এবং গোটা দুই কুলী—এই নিয়েই ষ্টেশন্ মাষ্টারের সংসার। প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের বাইরে খান দুই গোযান—ঘোড়ার গাড়ীও নাকি পাওয়া যায়, আগে হ'তে খবর দিয়ে রাখলে। ধুলো ভরা, সাপের মত আঁকা-বাঁকা পথটা খানিক দূর গিয়ে সামনের বিরাট্ মাঠের বুকে এলিয়ে পড়ে মিলিয়ে গেছে—যেন কোন ভীরু পল্লীবালা দয়িতের বুকে আশ্রয় পেয়ে তারই মাঝে নিজেকে ফেলেছে হারিয়ে। দূরে কতক-গুলো বড় বড় গাছও দেখা যায়—তাল-নারিকেলের গাছই বেশী; দু'একটা বট-অশ্বত্থও আছে। ছোট খাট বিল এবং পুকুরও এখানে সেখানে রয়েছে। চারদিকের ভাবটা কেমন নীরব, শব্দলেশহীন। আমাদের ট্রেণখানার শব্দ দূর হ'তে দূরান্তরে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাবার পর একমাত্র দু' একটা পাখীর ডাক ছাড়া আর কোন শব্দই সেখানে শোনা যায় না। ক'লকাতার জন-কোলাহল, কর্ম্মব্যস্ত জীবনের কলরোল, বিবিধ উপায়ে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় সকলের ছুটোছুটি—সকল সময়ে মানুষের মনে জাগিয়ে রাখে একটা অশান্তি, অতৃপ্তি। প্রত্যেক চলা, বলা, ওঠা, বসার মধ্যে ফুটে উঠছে একটা মাধুর্য্যহীন চাওয়ার ভাব, একটা উপার্জ্জনের নগ্নরূপ। কিন্তু এখানে বিরাজ করছে একটা প্রশান্ত নীরবতা, সব চাওয়া যেন এর শেষ হয়ে গেছে। সকল অভাব অনটনের ঊর্দ্ধে, একটা পরিপূর্ণ আত্মতৃপ্তির মধ্যে যেন এ রয়েছে আত্মসমাহিত হ'য়ে—বিজন, তুষারাচ্ছন্ন হিমালয়ের গিরিগহ্বরে সমাধি-মগ্ন যোগীর মত। মোটের ওপর জায়গাটা ভালই—যদিও কবি-বর্ণিত গ্রামের সঙ্গে এর সাদৃশ্য খুব বেশী নয়। এখানে পুকুরে শুধু পদ্মই ফোটেনা—পানাও ভাসে, মশাও জন্মে। গ্রামের গৃহস্থ বধূরা গোধূলি বেলায় কলসী কাঁখে আমগাছের তলা দিয়ে ছায়াঘন পথের ওপর পা ফেলে ঘাট হ'তে শুধু জল নিয়েই ঘরে ফেরেনা, অনেক রোগের বীজাণুও সঙ্গে ক'রে আনে। ধূলিহীন মুক্ত বায়ুই শুধু তারা উপভোগ করে না, ম্যালেরিয়াতেও ভোগে।

শুনলাম ক্রোশখানেক আমাদের যেতে হবে ঐ মাঠেরই ওপর দিয়ে উত্তর পূব্ মুখে—তারপর গ্রাম পাওয়া যাবে। যেতে যেতে ঋতু আমায় দেখিয়ে দিলে—ঐ যে তিনটে তালগাছ কাছাকাছি রয়েছে, ওর ডান দিকেই যে প্রথম বট গাছটা, ওরই পেছনের গ্রামখানা। আমি কিন্তু কিছুই বুঝলাম না। না বুঝলাম কেমন ক'রে ওরা নিশানা ঠিক ক'রে রাখে। কেমন ক'রেই বা আঁকা-বাঁকা আলপথের ওপর দিয়ে সেইদিকে দিক্ ঠিক রেখে চলে। আমি তো দেখলাম সব দিকেই অবস্থা সমান। মাঠের যে দিকেই তাকাই না কেন, কাছাকাছি গোটা তিনেক তাল গাছ আর তার ডানদিকে একটা বটগাছ—এ তো মাঠের সব দিকেই রয়েছে। এর মধ্যে কেমন ভাবে বিশেষ ক'রে ঐ গাছটাকেই ওরা চিনে রাখল, তা' বুঝতে পারলাম না। কোন কথা না ব'লে ঋতুর পিছনে অনভ্যস্ত পায়ে বাধা পেতে পেতে চলতে লাগলাম।

বেশ বাড়ীটি ঋতুদের। ছোট্ট বাড়ী, ছবির মত। বাড়ীর দরজার মাথায় উঠেছে তরুলতা এবং অপরাজিতা লতা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে, স্নেহাতুরা দুই সহোদরার মত। বাড়ীর ডানদিকে ছোট্ট একটি বাগিচা, পিছনে মস্ত বড় বাগান, দুটো পুকুর তার মধ্যে। খানিক দূর দিয়ে বয়ে গেছে অতসী নদী—তন্বী চপলা কিশোরীর মত। যেমন ঝরঝরে পরিষ্কার ছোট্ট বাড়ীখানা, তেমনই সুন্দর তার অবস্থান!

প্রথম দিনটা আর কিছুই হ'ল না। পৌছেছিলাম বিকেলে—হাসি-গল্পের মধ্য দিয়েই সন্ধ্যেটা কেটে গেল, এবং দীর্ঘ একটি সুনিদ্রার মধ্যেই রাতটা গেল ফুরিয়ে।

পরের দিন বার হ'লাম। সকালেই গ্রামের স্কুল, ইউনিয়ন বোর্ড,—সব দেখা হয়ে গেল। বিকেলে আমি গেলাম নদীর ধারে, একাই। ঋতু গেল গ্রামের পাঁচজনের সঙ্গে দেখা করতে। ঠিক হ'ল সন্ধ্যের আগেই ও ফিরে আসবে নদীর ধারে, তারপর দু'জনে বসে দেখা যাবে প্রকৃতির আপন হাতে গড়া সৌন্দর্য্য—সূর্য্যাস্তের বর্ণ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কেমন ক'রে প্রকৃতি তার রূপ বদলায় আধুনিকা মেয়েদের বেশ-পরিবর্ত্তনের মত। তারপর সূর্য্যের মৃত্যুর সাথে কি ভাবে এক একখানি অলঙ্কার খুলে ফেলে' দিবস সাজে নিরাভরণা বিধবার বেশ—কেমন ক'রে সন্ধ্যার মাঝে নেমে আসে মৃত্যুর কালো ছায়া।

কতক্ষণ বসে ছিলাম জানি না, হঠাৎ অপরিচিত স্বর শুনে চম্‌কে উঠলাম।

—"কি দেখছেন, সূর্য্যাস্ত?"

তাকিয়ে দেখি হাস্যমুখ এক প্রৌঢ়, রুক্ষ চুল, আধময়লা কাপড় পরণে। গায়ের বর্ণ বোধহয় এক কালে গৌর ছিল, এখন রোদে পুড়ে হ'য়ে গেছে তামাটে। হাতে একখণ্ড কাগজ। আমি তাঁর দিকে তাকাতেই একটু জোরে হেসে উঠে আবার শুধালেন, "কি দেখছেন, সূর্য্যাস্ত?"

সংক্ষেপে উত্তর দিলাম, "হ্যাঁ।"

—"এদিকে জীবনের সূর্য্যাস্ত যে হ'য়ে এল, তার খোঁজ রাখছেন?"

চম্‌কে উঠলাম। এ কি রকম প্রশ্ন? বিশেষ ক'রে একজন অপরিচিতকে!

ভদ্রলোকের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। প্রশ্ন করলেন, "সূর্য্যাস্ত তো দেখছেন, সূর্য্যের গতি কত জানেন?"

স্বীকার করতে হ'ল জানি না। যখন রেলে চাকরী করতে ঢুকি, তখন এখনকার মত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা ছিল না। কাজেই ও-সব কর্ম্মভোগও ক'রতে হয় নি। সসঙ্কোচে উত্তর দিলাম, "আজ্ঞে না!"

—"এক ডিগ্রী, এক ডিগ্রী। আপনি তো দেখছেন এক ঘণ্টার মধ্যেই সূর্য্য অতটা পথ চলে গেছে, আর ঐটুকু গেলেই, ব্যস্, ডুববে—কিন্তু সূর্য্য সমস্ত দিনে কতটা যায় জানেন? এক ডিগ্রী। হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলেন যে! তা' হ'লেই তিরিশ ডিগ্রী হ'ল না? তবেই তো একটা রাশি পেরিয়ে গেল। আর সমস্ত রাশি-চক্রটা যদি তিনশ' ষাট ডিগ্রী হয়, তা' হ'লে এক একটা রাশির কোন্ তিরিশ ডিগ্রী ক'রে হবে না? বলি অঙ্ক জানেন, অঙ্ক?"

—"আজ্ঞে, চাকরী করতে করতে টাকা-আনার যোগটা খুব ভাল রকমই সড়গড় হয়ে গেছে!"

—"দুত্তোর! আপনার কি রাশি?"—ভদ্রলোক আমার পাশেই বসে পড়লেন।

উত্তর করলাম, "বৃশ্চিক।"

"হুঁ। মীনগত শনি। হবে, হবে, ভাল সময় আপনার আসছে। আর দুটো মাস। তারপর শনি যাবেন মেষে। ষষ্ঠে শনি হবে। ভালই, ফল ভালই হবে।—কি লগ্নে আপনার জন্ম?"

—"আজ্ঞে, তা' তো বলতে পারি না।"

—"বলি, কুষ্ঠি, ঠিকুজি আছে?"

—"তা' আছে।"

—"কার তৈরী?"

—"তা' ভাল লোকেরই। আমাদের কুলগুরু পঞ্চানন জ্যোতিষার্ণবের।"

ভদ্রলোক ওষ্ঠ এবং কপাল কুঞ্চিত ক'রে নাসিকার সাহায্যে এক প্রকার শব্দ করলেন—যার অর্থ কোন অভিধানে পাওয়া না গেলেও, বোঝা গেল তিনি অবজ্ঞা

কাশ করলেন। "ওসব পঞ্চানন, ষড়াননের কর্ম্ম নয়। ..., জ্যাড্‌কিলের তৈরী কুষ্ঠি আছে? জ্যাড্‌কিলকে ...নেন তো?"

ভদ্রলোকের ব্যবহার ও প্রশ্নে উত্তরোত্তর বিস্মিত ...ছিলাম। অজ্ঞতা স্বীকার ক'রে নিতে হ'ল। বললাম, "না, তার নাম কখনও শুনিনি।"

—"জ্যাড্‌কিলের নাম শোনেন নি? জ্যাড্‌কিল, জ্যাড্‌কিল,—বর্ত্তমানে পিয়ার্স সাহেব।"

—"বেচারী পিয়ার্স সাহেবকে ধ'রে আবার টানাটানি করেন কেন, রমেশবাবু?"

তাকিয়ে দেখি ইতিমধ্যে কখন ঋতু এসে হাজির হয়েছে।

—"পাঁচটা যে বেজে গেল, রমেশবাবু—" বল্‌তে বল্‌তে ঋতু বসে পড়ল আমার পাশে।

রমেশবাবু লাফিয়ে উঠলেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত—"অ্যাঁ, পাঁচটা বেজে গেছে? তাপস যে আজ আসছে পাঁচটা চব্বিশের গাড়ীতে। এই দেখনা চিঠি দিয়েছে সে।"

হাতের কাগজটা একবার আমাদের দিকে এগিয়ে ধরলেন, তারপর নিজের চোখের কাছে পড়বার ভঙ্গীতে তুলে ধরে বললেন,—"হ্যাঁ, এই দেখনা, পাঁচটা চব্বিশ। যাই, আমি ষ্টেশনে চললাম। আর সময় নেই। তোমরা দেখা করতে যেও কিন্তু—" বল্‌তে বল্‌তে ভদ্রলোক এক রকম ছুটে চলে গেলেন।

আমি একটু অবাক্ হ'য়ে তাকালাম ঋতুর মুখের দিকে। ঋতুর কথার মধ্যে কেমন একটা যেন হেঁয়ালী রয়েছে বোধ হ'ল।

আমাকে ওর মুখের দিকে তাকাতে দেখে ঋতু বলল, "বুঝতে পারলি না এখনও! লোকটা পাগল!"

—"পাগল! আমি চমকে উঠলাম। সে কি, এতক্ষণ ভদ্রলোক দিব্যি আমার সঙ্গে কথা কইছিলেন, আর তুই বললি পাগল!"

—"তবে শোন্, ব্যাপারটা সব তোকে বলি। পাগল বলতে এমন মারাত্মক কিছু উনি নন। ওঁর এই মস্তিষ্ক-বিকৃতির পিছনে আছে একটা করুণ পারিবারিক ইতিহাস:

কথাবার্ত্তা যখন কয়েছিস, তখন নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিস্ উনি একজন জ্যোতিষী। সত্যিই বেশ গুণী ব্যক্তি ঐ রমেশবাবু। জ্যোতিষ শাস্ত্রে ওঁর মত পণ্ডিত আমাদের দেশে খুব কমই আছে। জীবনের অধিকাংশ সময়ই কাটিয়েছেন ঐ নিয়ে। ঐ ছিল ওঁর একমাত্র আনন্দ। সংসারের কোন জটিলতা ওঁকে কোনদিন বাঁধতে বা বিচলিত করতে পারেনি। স্ত্রী গত হবার পর একমাত্র সন্তান তাপস ছাড়া সংসারের আর কোন বন্ধন ওঁর ছিল না। তাপসই ছিল ওঁর নির্ভর, একমাত্র অবলম্বন —ওঁর সব। আর ছিল জ্যোতিষ শাস্ত্র। স্ত্রী-বিয়োগের দারুণ আঘাত সহ্য করেছিলেন ঐ তাপসের মুখ চেয়ে। আর তারপর থেকেই যেন বেশী ক'রে ডুবে গিয়েছিলেন শাস্ত্রালোচনায়। তাপস যখন চাকরী পেয়ে চলে' গেল রেঙ্গুনে, তখন প্রথমে উনি কিছুতেই রাজি হননি তাকে ছেড়ে দিতে। একমাত্র ছেলে—তা'ও অত দূরদেশে! কিন্তু শেষে মত দিয়েছিলেন ছেলের আগ্রহ দেখে! সে আজ সাত আট বছর আগের কথা। তারপর এই সেদিনে, বছর দুই আগে তাপস আসছিল। মাঝে অবশ্য আরও কয়েকবার এসেছিল। সেবারে কলকাতা এসে টেলিগ্রাম ক'রে দেয়—যেমন প্রত্যেক বারই করত চিঠি দেওয়া সত্বেও—পাঁচটা চব্বিশের ট্রেনে সে আসছে। কিন্তু সে আর আসেনি। চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়ে সে নাকি ট্রেন এবং প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের মাঝে পড়ে' গিয়েছিল হাসপাতালে। সেখান থেকে সে আর ফেরেনি। আর তারপর থেকেই রমেশবাবুর মাথাটা গেছে কেমন খারাপ হয়ে। প্রথম প্রথম তো প্রতিদিনই বিকালে যেতেন ষ্টেশনে তাপস আসছে ব'লে। এখনও সে রোগ ছাড়তে পারেন নি। কোন কাগজ-পত্র কোথাও দেখলেই কুড়িয়ে নেন, বলেন— 'তাপসের চিঠি। আসবার কথা লিখেছে।' কারও সঙ্গে দেখা হ'লেই—পরিচিত বা অপরিচিত, যাই হোক্ না কেন —তার সঙ্গে কথা কইতে আরম্ভ করেন ঐ জ্যোতিষ শাস্ত্র নিয়ে—কখনও সে কথার মানে থাকে, কখনও থাকে না। আর খেয়াল হ'লেই ছোটেন ষ্টেশনের দিকে। হাতে সব

সময়েই একখণ্ড কাগজ আছে। দেখ্‌গে—হয়তো এতক্ষণ আবার কারও সঙ্গে কথা কইতে সুরু ক'রে দিয়েছেন। তাই বলছিলাম,—ভদ্রলোক পাগল!"

চুপ ক'রে তাকিয়ে রইলাম ঋতুর মুখের দিকে। কি বলব, ভেবে পেলাম না। এমন ভাবে যে ভদ্রলোক এতক্ষণ গল্প করে গেল, সেও হ'ল পাগল!

এর পর অনেকদিন কেটে গেছে। কিন্তু এখনও ষ্টেশনে কোন লোককে কারও জন্য অপেক্ষা করতে দেখলেই আমার মনে পড়ে যায় ঋতুদের গ্রামের সেই নদী-তীর—যেখানে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক ঘুরে' বেড়াচ্ছেন একখণ্ড কাগজ হাতে ক'রে তাঁর প্রবাসী পুত্র এখনও ঘরে ফিরে আসবে এই আশায়।

মুরুং নৃত্য

নৃত্যবিৎ শ্রীকিরীট রায়

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে চাক্‌মা, মগ, কুকী, লুসাই, জুম্মা, টিপ্‌রা প্রভৃতির ন্যায় "মুরুং" নামেও একটি উপজাতি আছে। এই মুরুংরা এখনও সভ্য হইতে পারে নাই। এখনও ইহারা বনে জঙ্গলে নিষ্ঠুরভাবে প্রাণি-হত্যা করিয়া থাকে। চট্টগ্রামের পর্ব্বতগাত্রে স্থানে স্থানে ইহাদের বাসস্থান। ইহাদের স্ত্রী ও পুরুষরা সময়ে কাপড় জামা পরে ও সময়ে উলঙ্গ ভাবেই থাকে। স্ত্রীলোকেরা বন-জঙ্গল হইতে সংগ্রহ করিয়া ফলের বিচি ও পুঁতির মালা গাঁথিয়া গলায় পরে এবং মধ্যে মধ্যে তাহারা বহুরূপ সাজসজ্জাও করে। মুরুং রমণীরা একটু সৌখীন প্রকৃতির এবং ইহাদের দেহে যথেষ্ট লালিত্য আছে।

এই মুরুং জাতি যখন নৃত্যের আয়োজন করে, সেই সময়ে তাহাদের একটি বিরাট্ ভোজ হয়। ভোজের সময় তাহারা বড় বড় জানোয়ার নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে, জানোয়ারগুলির মধ্যে অধিকাংশই গরু ও মহিষ। জানোয়ার-গুলি বধ করিবার পূর্ব্বে গরু বা মহিষকে নৃত্য-স্থানে আনা হয় এবং উহাদের একটি স্থানে রজ্জু দ্বারা শক্ত করিয়া বাঁধা হয়, যাহাতে একটুও নড়িবার শক্তি না থাকে। পরে তাহারা নৃত্যাদি শেষ করিয়া ঐ জানোয়ারগুলি বধ করে। ইহারা যে সমস্ত জীবহত্যা করিয়া মাংসাদি ভক্ষণ করে, তন্মধ্যে কুকুরের মাংসই ইহাদের নিকট অতিশয় প্রিয়। এইজন্য ইহারা ঘরে ঘরে কুকুর পুষিয়া থাকে।

মুরুংদের নৃত্যাসরটি দেখিবার মত। ইহাদের নৃত্যাসর বলিতে খানিকটা উন্মুক্ত স্থান, সেই স্থানকে ইহারা বাঁশের পাতা ও বহু প্রকার ফুল দ্বারা বিশেষরূপে সাজায় এবং গ্রামের বহু স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বেশীর ভাগই কুমার ও কুমারীরা সেই স্থানে আসে এবং তন্মধ্যে অধিকাংশ লোকই নৃত্যে যোগদান করে। আর একদল তাহাদের নির্ম্মিত বাঁশের লম্বা লম্বা বাঁশী বাজাইতে থাকে। সময়ে সময়ে তাহাদের ধর্ম্মযাজক নৃত্যকালে খুব উৎসাহ দিতে থাকেন। নৃত্যকালে যাহাদের মধ্যে প্রেমের সঞ্চার হয় বা পছন্দমত পাত্র বা পাত্রী যোগাড় করিতে হয়, তাহাদের ধর্ম্মযাজক সেই সময়ে তাহাদিগকে মিলনসজ্জায় সজ্জিত করিয়া দেন। ইহা প্রকৃতির খেলা, প্রকৃতির বুকে এইরূপ আত্মহারা নৃত্যের উল্লাসে ইহারা জীবন যাপন করে।

চট্টগ্রামের পূর্ব্বাঞ্চলে "মহামনী" নামক স্থানে একটি বুদ্ধদেবের মন্দির আছে। মুরুংদের কোনও এক উৎসবে পর্ব্বতশ্রেণী হইতে বহু বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পাহাড়ী সেই স্থানে আসিয়া সমবেত হয় এবং স্ত্রীপুরুষ মিলিয়া এই প্রকার সমবেত নৃত্যের দ্বারা তাহাদের মিলন হয়। মুরুংরা নাচের সময়ে যে যত পারে সুরা পান করিয়া থাকে। ইহাদের নৃত্যে কেবল রমণীরাই পায়ে নূপুর ব্যবহার করে, আর পুরুষরা নৃত্যপরা রমণীদের সম্মুখে ঘুরিয়া ফিরিয়া নাচিতে থাকে। এই নৃত্যে কুমার ও কুমারী ব্যতীত অন্য কেহ যোগদান করিতে পারে না।

মুরুংরা সমস্ত রাত্রি ধরিয়া নৃত্য করে। দলের পর দল কুমার ও কুমারীরা অবিরামভাবে নাচিয়া যাইতে

...কে, ভোর হইলে একটু বিশ্রাম করিয়া যে যাহা পারে ...ছু খাইয়া লয়, আবার মধ্যাহ্নকালে তাহারা নৃত্য ...রম্ভ করে। এই সময়কার নৃত্যে তাহাদের ঢং ও কায়দা ...কটু অদল বদল করিতে দেখা যায়।

মুরুংজাতির মেয়েরা আর একপ্রকার নৃত্য করিয়া ...কে, তাহা "থুরুং" (থুরুং অর্থে ঝাঁকা) বলিয়া পরিচিত। স্ত্রীলোকেরা দলে দলে মাথায় ঝাঁকা রাখিয়া নৃত্য করিতে করিতে জল সংগ্রহ করিতে যায়; তবে এই নৃত্যের দলে বেশী লোক থাকে না, সামান্য কয়েকজন ঐ ঝাঁকা মাথায় করিয়া নদীর পারে আসিয়া নৃত্য করিতে করিতে নদীতে নামিয়াই উঠিয়া পড়ে, মাথা আর ডুবায় না। তাহাদের মেয়েরা আর এক প্রকার নৃত্য করে, তাহা অনেকটা সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের মত। সাঁওতালীরা যেমন সম্মুখভাগে উপুড় হইয়া ঝুঁকিয়া ঝুঁকিয়া নাচে, এই নৃত্যটিও প্রায় তদনুরূপ। এই সব নৃত্যে একটা বিশেষ লালিত্যের রূপ প্রকটিত হয়। নৃত্যকালে ইহারা বহুরূপে সাজসজ্জা করে, মস্তকের ভ্রমরকৃষ্ণ অলক-গুচ্ছে কবরী বাঁধে, সেই কবরীতে বহু প্রকার পাহাড়ী ফুলের মালা পরে এবং গলদেশে রঞ্জিত বস্ত্রখণ্ডও শোভা পায়। এই সজ্জায় এদের রূপশ্রী অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর হয়। নৃত্যের সঙ্গে একটি মধুর সঙ্গীত গীত হয়। তাহাদের নৃত্যে যদিও বা পায়ের কাজ বা রূপান্তর ভঙ্গী থাকেনা, তবুও যেন মনের মধ্যে একটা প্রফুল্লতা আনিয়া দেয় ও এই প্রকার নৃত্যে মানুষেরা বিশেষভাবে প্রকৃতির রূপকে আকর্ষণ করিয়া দেবালিঙ্গন পাইয়া থাকে। পুরুষেরা তাহাদের নৃত্যে কাশ ফুলের লম্বা লম্বা ঝাঁটার ন্যায় ডাঁটা হস্তে লইয়া অর্দ্ধোলঙ্গ অবস্থায় নৃত্য করিতে থাকে—একবার সম্মুখে যায় ও একবার পশ্চাতে হাটে। এই ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইহারা নাচিয়া যায়, এইরূপ অবিরাম নৃত্যে উহাদিগকে বড় একটা ক্লান্ত হইতে দেখা যায় না, বরং দ্বিগুণ উৎসাহেই তাহারা নাচে।

এই পার্ব্বত্যজাতি মুরুংদের নৃত্য ও সঙ্গীতে বাহ্যিক মিশ্রণরীতি নাই, আছে স্বকীয়তার একটা অনবদ্য সৃষ্টি। সৃষ্টিমাধুর্য্যের রসেই ইহারা দিনরাত্রি ডুবিয়া থাকে। এই রসই ইহাদের বাহ্যিকতা-বর্জ্জিত, তথাকথিত অসভ্য জীবনযাত্রাকে আনন্দময় করিয়া তুলিয়াছে।

স্কট্‌ল্যাণ্ডে কয়েকদিন

শ্রীমতিলাল দাশ

৪

১০ই সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার—সকালে উঠিয়া ফাউন্টেন হল নামক স্থানে রেভারেণ্ড গুরসের বাড়ী গেলাম। তাঁহার দেখা পাইলাম না। সেখান হইতে হাইকোর্ট গেলাম—হাইকোর্ট তখন বন্ধ, শুধু গৃহ ও বিচারকক্ষটি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে হইল। সেখান হইতে সেরিফ কোর্টে একটা মোকদ্দমা দেখিলাম—তারপর ইহাদের ছোট আদালতের মোকদ্দমা দেখিলাম। স্মল কজ কোর্টকে ইহারা Small Debt Recovery বলে—ইংরেজ আইনের পরিভাষা ও স্কচ আইনেরও পরিভাষার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে—তাহা ছাড়া আইনেরও কিছু কিছু বিশেষত্ব আছে।

এখান হইতে ইহাদের ন্যাশন্যাল মিউজিয়াম দেখিতে চলিলাম। ঐখানে ন্যাশন্যাল পোর্ট্রেট্ গ্যালারিও অবস্থিত। এখানে অনেকক্ষণ কাটিল—এখান হইতে হিরিয়ট কলেজ দেখিতে চলিলাম। হিরিয়ট ষষ্ঠ জেম্‌সের স্বর্ণকার ছিলেন। তিনি জাতির কল্যাণের জন্য তাঁহার ধনসম্পত্তি অর্পণ করেন।

এখান হইতে রয়াল বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখিতে চলিলাম—নাম যতখানি, আসলে তাহার মধ্যে দর্শনীয় তেমন কিছু নাই—বিস্তৃত কানন।

এখান হইতে S. M. T. অফিসে গিয়া মেলরোজ

যাইবার টিকেট কিনিলাম। কোম্পানীর পুরা নাম Scottish Motor Traction Company—ইহাদের মোটর-বাস নগরের উপকণ্ঠের দ্রষ্টব্য স্থানে যাতায়াত করে।

তারপর জর্জ্জ ষ্ট্রীট ধরিয়া বাড়ী ফিরিলাম। জর্জ্জ ষ্ট্রীট সম্রান্ত অভিজাত ব্যক্তিগণের আবাসস্থল—এই রাজপথের উপরই ইহাদের পরিষদ্‌গৃহ—এই Assembly-room অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে নির্ম্মিত। তাহা ছাড়া Masonic Hallও উল্লেখযোগ্য। সেণ্ট এণ্ড্রুজের গির্জ্জাও এই রাস্তায়। এই গির্জ্জাতেই ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মবিপ্লবের সূত্রপাত হয়।

বাসায় ফিরিয়া বিশ্রাম করিয়া সিন্‌ক্লেয়ার দম্পতীর ওখানে চলিলাম। সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যে কাটিল। বুড়া ও বুড়ী থাকেন—একজন পরিচারিকা ঠিকা কাজ করিয়া দিয়া যায়। আমি মাংস খাই না বলিয়া মুস্কিল। বুড়ী আমার জন্য মায়ের মতন স্নেহে পোলোয়া রান্না করিয়া দিলেন—যদিও দেশের পাকান্নের সহিত তাহার জ্ঞাতিত্ব স্বীকার করা কষ্টকর, তথাপি বিদেশে এই স্বল্পপরিচিতা স্নেহময়ী নারীর উপহার বলিয়া মনের তৃপ্তিতে তাহা ভোজন করিলাম। ডিমের আমলেট ও পুডিং প্রভৃতি দিয়া ভোজনপর্ব্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইল। বুড়ী আদর করিয়া তাঁহার রান্নাঘর ও রান্নায় আধুনিক ব্যবস্থাদি দেখাইলেন। যন্ত্র মানুষের জীবনে কত স্বাচ্ছন্দ্য আনিয়াছে, তাহা দেখিয়া লইলাম—রান্না করিতে বুড়ীর অনেক সময় ব্যয় হয় না। সপ্তাহে একদিন ধৌত করিবার দিন—সেদিন কি ভাবে কাজ করা হয়, বুড়ী তাহাও দেখাইলেন। যত্ন ও আপ্যায়নে যে আন্তরিকতা ছিল, তাহা আমাকে অতিশয় মুগ্ধ করিল।

আহারশেষে বুড়া ও বুড়ী আসিয়া তাঁহাদের ড্রয়িং-রুমে বসিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন। সে সরস কথা-বার্ত্তার অধিকাংশ আজ ভুলিয়া গিয়াছি। দুই চারিটি যাহা মনে আছে, তাহাই লিখিতেছি:

বুড়ী প্রশ্ন করিলেন, "স্কচদের আপনার কেমন লাগল?"

আমি বলিলাম, "এই প্রশ্নের উত্তর খুব মুস্কিল, দু'দিনের আলাপে একটা জাতির কথা বলা দুরূহ, তবে বলতে পারি ইংরেজ চাপা জাতি, আর স্কচেরা দিল-খোলা—"

সিন্‌ক্লেয়ার হাসিলেন এবং বলিলেন, "তা' ঠিক, আমাদের রক্তে কেল্‌টিক প্রভাব আছে, তা' ছাড়া আমরা ছড়িয়ে আছি পৃথিবী সর্ব্বত্র, তাই আমরা মানুষকে সহজে গ্রহণ করতে পারি—"

বৃদ্ধ তারপর খানিক পারিবারিক ইতিহাস বলিলেন। আমি কোথায় কোথায় যাইব, তাহারও সন্ধান লইলেন। বুড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "পোর্টোবেলো যাবে না?"

আমি বলিলাম, "যদি সময় করতে পারি—"

—"না, না সময় করবে, চমৎকার স্থান—ওখান থেকে সমুদ্রের দৃশ্য খুব চমৎকার লাগবে—"

এই অনুরোধ পালন করিতে পারি নাই।

স্থানীয় সাহিত্যিক প্রভৃতির সহিত আলাপের সুযোগ হইল না বলিয়া দুঃখ করিলাম। সিন্‌ক্লেয়ার বলিলেন, "এখন আলাপ-পরিচয়ের সময় হয় না—লোক সব বেড়াতে যায়—"

ফিরিবার সময়ে বলিলেন,—"ভূপেনকে আমাদের স্নেহাশীষ জানাবে—ভারতবর্ষের কথা আমাদের সব সময়ে মনে আছে।"

কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বিদায় লইলাম। ফিরিবার সময় আলোকিত নগরীর পথে একটি নারীর সহিত সাক্ষাৎকার হইল—হয়ত সে পথচারিণী গণিকা—ব্যবসায়ের জন্য দাঁড়াইয়া আছে অথবা সে অভিসারিকা—পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই দুর্দ্দশা।

জলধর-কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৪) টহল—আগমনী

দাদা ডেরাডুনে মাষ্টারী করেন। আলখাল্লা পরেন ও পাগড়ী বাঁধেন। স্কুল ও হিন্দুস্থানী মহলে তিনি মাষ্টারজী বা সাধু মাষ্টারজী এবং বাঙালী মহলে—রহস্যচ্ছলে মাষ্টারজী অথবা স্বনামেই পরিচিত। শেষদিকেও অনেকে তাকে মাষ্টারমশায় বলতেন। অধ্যাপক ললিতকুমার বরাবরই এইভাবে তাঁকে সম্বোধন করতেন।

বাঙালীরা দুর্গোৎসব করবেন আলোচনা করছেন। দাদা বললেন—একটুও কঠিন নয়। —প্রত্যূষে আলখাল্লা প'রে খঞ্জনী বাজিয়ে দাদা টহল সুরু করলেন। মাসান্তে ভিক্ষা। কোন্ গৃহস্থবাড়ী আর সিধে সাজিয়ে আলোচাল কাঁচাকলা দাদাকে ভিক্ষে দেবে। সাধু মাষ্টারজী সকালে খঞ্জনী বাজিয়ে টহল দেন—সকলেই আশ্চর্য্য। দাদা ইংরিজি স্কুলের অঙ্কের মাষ্টার। ইংরিজি শিক্ষিত ও বক্তা। প্রয়োজন হলেই ইংরিজিতে কথা বলেন। সুতরাং আলোচাল ও মোমবাতি আর তাঁকে কে দেবেন? টাকার নীচে কেউ দেন না, বেশী তো অনেকেই।

যখন যেমন,—টহল বা কীর্ত্তন চললো। ওদিকে দুর্গোৎসবের আয়োজনও চলতে থাকলো। যথাকালে দাদার আগমনী গান সুরু হ'ল। দূর প্রবাসে প্রবাসী বাঙালীরা বিশেষ মায়েরা বড়ই আনন্দ বোধ করলেন। দাদার আর এক দফা যথেষ্ট ভিক্ষা মিল্‌ল।

সমস্ত ভিক্ষাই দুর্গোৎসব ফাণ্ডে জমা হ'ল। সকলে চমৎকৃত হ'লেন। ফণ্ডের জন্য নয়। এমনি এক মহাপ্রাণের মহাপ্রাণতার পরিচয় পেয়ে। শুধু কি বাঙালীরা? না। বাঙালী অ-বাঙালী সকলেই। তখনকার দিন এখনকার মত বাঙালী-বিদ্বেষে পূর্ণ ছিল না। তখন বাংলার সঙ্গে সকলেই যোগসূত্র রাখতে চাইতেন। তাই সবাই দাদার জয় জয়কার করলেন।

দাদার গানের সঙ্গে আপনারা ক'জন পরিচিত জানিনে। বর্ত্তমান সর্ব্বাধ্যক্ষ (রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর) মহাশয়তো অতি পরিচিত। তাঁর রোগশয্যায় দাদা তাঁকে গান শোনাতেন। গণ্ড বেয়ে ধারা বইতো। আমি সাহিত্যিক বা গৈনিক না হয়েও তাঁর গানের সঙ্গে পরিচিত। এইসব কথা-প্রসঙ্গেই স্থির হ'ল—একটা খঞ্জনী চাই।

২।১ দিনের মধ্যেই তা এলে সন্ধ্যায় প্রায়ই দাদা খঞ্জনী বাজিয়ে আমাদের গান শোনাতেন। তার মধ্যে একটী—

"ওরে দিন তো গেল সন্ধ্যা হ'ল—পার কর আমারে,—
তুমি পারের কর্ত্তা, শুনে বার্ত্তা ডাকছি হে তোমারে।
আমি আগে এসে, ঘাটে রইলাম বসে,
যারা পাছে এল আগে গেল, আমিই রইলাম পড়ে।"

দাদার লেখা অনেক গান কাঙালের গানে মিশে গেছে। এ নিয়ে কেউ তর্ক করলে আমি পরাভব স্বীকার করব। প্রথম আমি সাহিত্যিক নই, দ্বিতীয় আমি গৈনিক নই, তৃতীয় এতে আমার ইতিহাস নেই, নজীরও নেই; চতুর্থ ও সর্ব্বশেষ দাদার সাহচর্য্যে—এ আমার তাঁর কাছেই শোনা।

তাঁর গুরুদেব তিন প্রিয় শিষ্যকে তিনটী আখ্যায় ভূষিত করেন। ফকির, ফিকির, মুসাফির। তন্মধ্যে ফকীর কাঙাল হরিনাথ। ফিকির ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার। মুসাফির—দাদা জলধর। ফিকিরচাঁদ ফকিরের যে সব বাউল সঙ্গীত পাওয়া যায়—যার শেষ চরণে "ফিকিরচাঁদ ফকির বলে" ইত্যাদি সন্নিবেশিত দেখা যায়, তার সকলই কাঙালী হরিনাথের সঙ্গীতাবলীরূপে পরিচিত।

(৫) দাদার লাটপরিচয়

দাদা ডেরাডুনের মাষ্টারজী—গণিতের মাষ্টার। একথা অনেকবার বললাম। তখন ট্রিগোনোমেট্রিকাল সার্ভের গ্রেট্ ট্র্যাঙ্গ্‌ল (Great Triangle)এর কথা হচ্ছে। কালীমোহনবাবু এতদ্বিষয়ে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি ঐ কার্য্যে নিযুক্ত। তিনি দাদাকে ধরলেন—যে অবসর সময়ে সন্ধ্যাকালে ঐ বৃহত্তর ত্রিভুজ সমাধানে মনোনিবেশ করতে হবে। গণিত বা উচ্চ গণিত ছিল

দাদার একটা নেশা। তিনি তথাস্ত বলে লেগে গেলেন। সন্ধ্যায় কালীমোহনবাবুর বাড়ীতে কয়েকজনের সঙ্গে তিনি গভীর ভাবে খাতা পেন্‌সিলে গ্রেট্‌ ট্র্যাঙ্গল কষছেন। সন্ধ্যা থেকে ক্রমে সন্ধ্যা সকাল। শুনেছি ঐ গ্রেট্‌ ট্র্যাঙ্গল ক্রমে দাদার এক নেশা হয়ে দাঁড়ায়। এবং দেখেছি গণিতের আলোচনা পেলেই তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন।

সেই সময় তদানীন্তন বড়লাট ডেরাডুন স্কুল পরিদর্শন করেন। অদ্ভুতবেশী দাদাকে দেখে তিনি অনুমান করতে পারেন নি যে, তিনি ইংরাজি শিক্ষিত গণিত শিক্ষক। তাঁর অধ্যাপনা দেখে তিনি বিস্মিত হন ও তাঁর সঙ্গে আলাপসূত্রে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি কোন্ দেশের লোক ও বাঙ্গালী পরিচয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মন্তব্য করেন যে, তাই এরকম সম্ভব। পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে তিনি এতক্ষণ কিছু বুঝতে পারেন নি। তৎপর তাঁর সম্বন্ধে তিনি আরও অনুসন্ধান করে এক বাঙ্গালী সাধুর এবম্বিধ মাষ্টারী দেখে কি মনে করেছিলেন তা বলা কঠিন।

(৬) ভরসাবাদ

সন্ধ্যাবেলাকার কাহিনী বলতে সুরু করে কত কি বলে' ফেললাম। সন্ধ্যা সকলেরই হয়—তাতে খেইও হারায়। সুতরাং আমার পক্ষেই বা না হবে কেন? তাতে আবার আমি অ-সাহিত্যিক।

হচ্ছিল চা চুরুটের কথা। কথাপ্রসঙ্গে অনেক কথা এসে গেল। দাদাকে আপনারা সবাই বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করতেন। রোজই তো আপনাদের কিছু আর পাচ্ছিনে। তাই আজ দু'কথা শুনিয়ে দিচ্ছি।

দাদা বল্লেন—"চা"—"হুঁ"।

আমি বললাম, কেন ধুনীতো জলতোই আর মাটীর ভাঁড়ও একটা আধটা হয়তো থাকতো। সুতরাং চায়ের ব্যবস্থা করলেই তো হ'ত।

তিনি বল্লেন "হুঁ"।

জিজ্ঞাসা করলাম—"যখন বেশীদিন পাহাড়ে থাকতেন তখন কি হ'ত—বাসা থেকে সঙ্গে কি কি নিতেন।"

তিনি বল্লেন সঙ্গে যা থাকতো। তা ছাড়া একখানি গীতা। কাপড় ছিঁড়ে গেলে কি হ'ত? —গেরো বাঁধা। আরও ছিঁড়লে? সে অবস্থা হলে—পাওয়া যেতো। কেউ না কেউ দিত। আহারও অমনি ভাবেই জুটতো।

প্রশ্ন—আচ্ছা দাদা, এমন ত ভারী বোঝা কিছু নয়। একটা ছুঁচ ও একটু সুতো রাখলেও তো চলতো? দাদা বল্লেন—"হুঁ"। ঠিক বলেছ একটা ছুঁচ, একটু সুতো, গোটা কয়েক চুরুট, একটা টি-পট, কিছু চা, খানিকটা চিনি, কাপ গোটাকতক কারণ তোমার মত ২।১ জন এলে তাঁদেরও তো দিতে হবে! তার ওপর ভাই শোবে কিসে? সুতরাং কিছু লেপ বিছানা, তার পর খিচুড়ির চাল ডাল ইত্যাদি নইলে খাবে কি? তারপর ঠাণ্ডা—সুতরাং সর্দ্দির ভয়—কাজেই একখানি বাংলো, আর কিছু ওষুধ বিষুধ—কেমন ভাই নয় কি? চমৎকার সন্ন্যাস! তারপর আবার বাঘ ভালুকের ভয় আছে, কাজেই কিছু অস্ত্রশস্ত্র বা শিকারী!

হ্যাঁ, ঐ একটা জিনিষ যা তাঁকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করতাম। ছেলেবেলা থেকে বন্দুক ব্যবহার করি সুতরাং পাহাড়ে হিমালয়ান টাইগারের বিষয়টা জানবার আগ্রহ একটু কম নয় যে তিনি কি করে ঐ জঙ্গলেও বেঁচে থাকতেন। তিনি বুঝিয়ে দিলেন—কি ভাবে ধুনী জলতো। তাতে বাঘ ছেড়ে কেউ আসতে পারে না। আর স্নান—দৌড়ে গিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কোন রকমে ফিরে এসে রৌদ্রে পিঠ দিয়ে বসা ও কাপড় শুকিয়ে নেয়া। জল কত?—কেউ না দেখলে কিছুই না—দেখলে অবশ্য জল বেশী!

আমার মত আনাড়ী ভক্তের প্রশ্নে শেষে হাঁপিয়ে উঠে বললেন—ওরে, সেদিন একজন জিজ্ঞাসা করল যে আপনি সন্ন্যাসী হয়ে চলে গিয়েছিলেন, তবে আবার সংসারে ফিরলেন কেন? আমি বল্লাম—তাইতো ভাবি—গিয়েছিলামই বা কেন? দ্যাখ্‌ যার কথা মনে করে ঐ সব জায়গায় যেতাম—তিনিই সব ব্যবস্থা করে দিতেন,—বলে' খঞ্জনী নিয়ে বাজিয়ে গাইলেন—

"যদি ডাকার মত পারতাম ডাকতে—
তবে কি মা এমন ক'রে লুকিয়ে থাকতে পারতে?"

মেঘেঙ্পুরী

শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নয়

গার্গী আজকাল আর একটা নতুন আত্মোপলব্ধিতে ভ'রে উঠেছে। যত পরীক্ষা নিকটতর হ'চ্ছে তত মন সে নিজেকে ভারি সুস্থ, ভারি লঘু মনে করতে পারছে। আজকাল সকাল আর সন্ধ্যাগুলো বেশ কাটে। একদিন মঞ্জুদি এসেছিলেন, গার্গীর বাড়ীর এই শিথিল ভঙ্গী দেখে বলেছিলেন, "কি করছিস্ গার্গি—শেষ কালে একটা বিশ্রী রেকর্ড রাখ্‌বি য়ুনিভার্সিটিতে?"

গার্গী এ প্রশ্নে হেসেছিলো, বলেছিলো, "আর পড়তে ভালো লাগে না মঞ্জুদি—বেশ, এইভাবে নির্লিপ্ত মনে সময় কাটাতে ভারী চমৎকার লাগে—কি হ'বে প'ড়ে?" বলে মঞ্জুদির মুখের দিকে চেয়েছিলো।

"হতভাগী মেয়ে কোথাকার—" মঞ্জুদি কৃত্রিম রাগে ঝলসে উঠেছিলেন সেদিন, "খুব বুদ্ধি হ'চ্ছে আজকাল?"

তা হোক—গার্গী এ কথার আর উত্তর দেয় নি। তবু এই ভালো লাগে। কি হ'বে প'ড়ে? বইয়ের ওপরে বইয়ের স্তূপই জমে উঠ্‌ছে শুধু—কি সে পড়ছে—কি সে শিখলে? গার্গী আজ তার কিছুই বুঝিয়ে দিতে পারবে না। তার থেকে এসো এই জানলার ধারে—আস্তে চুপ ক'রে জান্‌লাটা খুলে দাও দেখো সমস্ত আকাশ ভ'রে কত রাত্রি, কত নরম অন্ধকার। তারাগুলোকে দেখো কি সুন্দর—একটা বড় পিন্‌কুশনের মত, পিনগুলো যেন ওই তারা—ওই সব ছোট ছোট নক্ষত্র তারা তাদের ক্ষীণ জ্যোতিঃ মেলে গার্গীর দিকে চেয়ে আছে, আর বিরাট্ আকাশের পটভূমিকায় গার্গী সেই তারার কবিতা পড়বার চেষ্টা করছে।

বেশ তো—এই তো ভালো—এর থেকে সুখকর আর কি আছে?—থাক্ প'ড়ে এই বইগুলো একধারে, নীরব, নির্জন, শুষ্ক কতগুলি কথার সমষ্টিতে ভরা বিরাট্ বই—ওই সব বইগুলোকে টেবিলের ওপরে নির্বিঘ্নে পড়ে থাকতে দিও তোমরা!

মাঝে কতগুলি মন্থর সময় চ'লে গিয়েছে। গার্গীকে অবশ্য তারা কিছু নিষ্প্রভ করেনি, করতে পারেনি, তবে কয়েকটা সামান্য রেখা প'ড়েছে তার জীবনে। যেমন একদিন দেখা গেল দাদামশায় নেই—দিদিমা আর গার্গী সেদিন থেকে এই বিরাট্ বাড়ীটার মধ্যে যেন একলা। তারপরে এই কিছুদিন আগে দিদিমার শরীরও খুব খারাপ হ'য়েছিলো, কোনোদিন তিনিও হয়তো থাকবেন না—তখন গার্গী সমস্ত বাড়ীটাতেই একলা বাস করবে। একেবারে নির্জন শান্ত জীবন-যাত্রা। গার্গী সে কথাও ভাবে মাঝে মাঝে। ক'য়েক দিন হ'ল দিদিমা কাশী যেতে চেয়েছেন। গার্গী ভাব্‌ছে তাঁকে এখন সেখানে পাঠানো উচিত কিনা—এই অপটু শরীরে পাঠানোর অনেক আশঙ্কাই আছে।

তবু হয়তো শেষ পর্য্যন্ত গার্গী তাঁকে পাঠিয়ে দিতেই বাধ্য হ'বে। তাঁর জীবনের এখন এই শেষ কামনা। গার্গী যেন তাঁর এই অন্তিম আবেদন অগ্রাহ্য না করে।

না, গার্গী তা পারবে না—কিন্তু তারপর? দিদিমাকে পাঠিয়ে এই বিরাট্ বাড়ীতে গার্গী বাঁচ্‌বে কি ক'রে?—উঃ, সে এ সব কথা এর বেশী কোনোদিনই ভাব্‌তে পারেনি। তখন—তখন হয়তো গার্গী এ বাড়ী ছেড়ে অন্য কোথাও চ'লে যাবে, বাড়ীটাকে সে প'ড়ে থাক্‌তে দেবে নির্জন রুক্ষতায়! গার্গী পালাবে কোনো দূর-দেশে, কোনো শান্ত আবহাওয়ার ভেতরে—যেখানে তার এই অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই—নেই কোনো চিন্তার অবমাননা, সে স্বাধীন ভাবে দিন কাটাবে সেখানে।

সাম্‌নে হয়তো গংগা। ছোট একটা কুটির নির্মাণ করবে, বাংলো প্যাটার্নে দিগন্ত বিস্তৃত আকাশকে সেখান থেকে দেখা যায়—গার্গী ডুবে থাকবে নিজের সাধনায়: জ্ঞান, জ্ঞান সে অর্জন করবে—কি হ'বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীতে ভারাক্রান্ত হ'য়ে? সে মহিয়সী হ'য়ে উঠ্‌বে—হ'য়ে উঠ্‌বে তার পিতা যা চেয়েছিলেন—সেই সম্মাননীয়া গার্গী! তার মা যা চেয়েছিলেন, সেই আদর্শ গার্গী; কিসের দুঃখ তার?

এ বাড়ীটা গার্গী ভাড়া দেবে—তার একার জীবন, খুব চ'লে যাবে—ভাবনা কি? দুঃখ কি? তারপর আছে 'কুমারী-কল্যাণ'—ঢাকায় আরো একটা শাখা-কেন্দ্র খোলার দরকার—মঞ্জুদি সেদিন বল্‌ছিলেন, ওদিকে পূর্ণ উৎসাহে সঙ্ঘের কাজ চালানো দরকার! জীবনটা কি এতোই দুর্বোধ্য হ'য়ে থাকবে তার কাছে? কত কাজ, কত কাজ ছড়িয়ে আছে গার্গীর এ দিকে ওদিকে—শুধু গার্গী নিজেকে শাসন করতে শিখুক—নিজেকে সংবরণ করতে শিখুক—যে একদিন সমস্ত বাঙ্‌লা দেশের মধ্যে হ'বে মাননীয়া—বরণীয়া, তার কি সাজে এই সব মনোবিলাস?—এই জীবনের কর্ম-কঠোর সংগ্রামে ফুলের বিছানার ওপরে শোয়ার সাধ? গার্গী বোঝে, গার্গী জানে—গার্গী উপলব্ধি করে—তবু, তবু কেন যে তার এ দুর্বলতা আসে? এই মনের ক্ষণ-বিলাসে! সমস্ত পৃথিবীতে ছোট এক টুকরো নীড় বাঁধবার দুর্বার কামনা! এতেই যে গার্গী ধ্বংস হবে, সে কি তা বোঝে না, ধন নয় মান নয় এতোটুকো বাসা, ক'রেছিনু আশা—কেন, কেন এ আশা তার জেগে থাকবে সমস্ত সাধন-চৈতন্যের ভেতরে, কাঁটার মত সে মাঝে মাঝে পীড়া দেবে—মাঝে মাঝে ব্যস্ত করবে তাকে, মনকে করবে উদ্‌ভ্রান্ত! গার্গী ভেবে দেখেছে এ সম্পূর্ণ তার নিজের দোষেই—গার্গী যদি সে চিন্তাকে কোনোদিন প্রশ্রয় না দিত তাহ'লে কি আজ সে তার মনের এই দৈন্যে ভেঙে পড়তো? গার্গী সাবধান হ'বে। এখনো তার সাবধান হওয়ার সময় আছে।

তাই সে আজকাল একটা নতুন আত্মোপলব্ধিতে ভ'রে উঠতে চেষ্টা করছে—নিজেকে সে পরিপূর্ণ করে রাখবে তার সাধনার একনিষ্ঠতায়, গার্গী নিজেকে কোনদিনই বাধাহীনভাবে ভেসে যেতে দেবে না—নিজেকে সে ব্যর্থ করবে না তিলে তিলে। দুঃখ কি তার? নিজের মধ্যে নিজেই সে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে একদিন!

কয়েকদিন হ'ল চৈত্র এসেছে। আকাশে তার চিহ্ন—বাতাসে তার চিহ্ন—গার্গী তা লক্ষ্য ক'রেছে। সারা বছরে এ-মাসটাই তার মনে কেমন যেন একটা মোহ সৃষ্টি করে—কেমন অলস মন্থর ভাব তার সমস্ত শরীর ঘিরে ছড়িয়ে পড়ে—বেশ লাগে এইভাবে প্রচুর সময়ের বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার অনুভূতিকে! হে ঈশ্বর! আমাকে তা' বলে তুমি লঘু কোরো না—চৈত্র এসেছে—তাকে ভালো লাগছে, ব্যস্ এই পর্যন্তই যেন সেই ভালো লাগার সীমারেখা টানা থাকে—তার থেকে বেশী অগ্রসর গার্গী যেন একদিনো না হয়—সে পাদস্খলন থেকে তুমি তাকে রক্ষা কোরো। তোমার কাছে গার্গীর এখন এই চরমতম নিবেদন!

এখন ছুটী চল্‌ছে। দুপুর বেলাটা গার্গী নীচের তলায় থাকে। একটু বই নিয়ে পড়তে চেষ্টা করে কিন্তু পড়া হয় না—হয় 'ইলাষ্ট্রেটেড উইক্‌লী'র পৃষ্ঠা উল্‌টোয় অথবা তার 'পাজ্‌লে'র সমাধান খোঁজে—পড়তে এক রকম ইচ্ছেই করে না গার্গীর—নিস্তব্ধ নিঝুম দুপুর কাটে!

কোনোদিন মল্লিকা আসে। অনেক কথা হয়। কুমারী-কল্যাণের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা সুশৃঙ্খলে গঠন করার প্রয়োজন—বাংলার গ্রামে গ্রামে আরো বেশী প্রচার হওয়া দরকার। মল্লিকা তার যথাশক্তি চেষ্টা করছে। গার্গী উৎসাহ দেয়, আরো বড় হোক্—আরো প্রসারিত হোক তাদের 'কুমারী-কল্যাণ'!

আভা চিঠি দেয় মাঝে মাঝে। দিল্লীতে ওদের কাজ খুব ভালোভাবেই চল্‌ছে। লক্ষ্ণৌতে এবার একটা শাখা খোলবার বিশেষ দরকার হ'য়ে প'ড়েছে—মঞ্জুদিকে গার্গী যেন সব কথা ভালো ক'রে বুঝিয়ে দেয়—কাশীতে শোনা গেল বিশেষ সুশৃঙ্খলতায় কাজ অগ্রসর হ'চ্ছে না—মঞ্জুদির একবার এদিকে আসা দরকার।

এই নিয়ে কিছু পরামর্শও প্রয়োজন মঞ্জুদির সংগে। গার্গীর কয়েকদিন থেকে এই চিন্তাটাই প্রধান হ'য়ে উঠেছে।

কালও মল্লিকা এসেছিলো। নলিনীকান্ত আজকাল ওকে খুবই বিরক্ত আরম্ভ ক'রেছে। মল্লিকা যে কি করবে ঠিক ভেবে পাচ্ছে না—গার্গী যদি কোনো উপায় নির্দেশ ক'রে দিতে পারে! গার্গী সব শুনে হেসেছে। মানুষের সব পাগলামীরই একটা সীমা থাকে, সে কাল মল্লিকাকে এ রকম অভয় দিয়েছে, বলেছে, "ও নিজের থেকেই আবার ঠিক হ'য়ে যাবে—তুমি ভেবো না কিছু দিদি!"

মল্লিকা এ কথায় সামান্য একটু হেসেছিল, বলেছিল, "... হ'য়ে যে যাবে সে-কথা আমিও জানি, কিন্তু ...বারে নিরীহ ভদ্রলোকের মত ওকে ফিরে যেতে ...না—কিছু উপহার দেবো—যা ও চিরকাল মনে ...বে—মানুষের এই নিদারুণ অন্ধতারও তো একটা ...থাকে গার্গী?"

গার্গী মাথা নেড়ে শুধু আরো একটু হেসেছিল, ...পরে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ব'লেছিল, "তা'হ'লে ...নিশ্চয়ই কিছু উপহারের ব্যবস্থা ক'রে রেখেছো?"

"না, সেইটাই হয়নি—সেই পরামর্শই তো তোমার ...ছে চাইছিলাম" মল্লিকা বলেছিল।

"বেশ, তুমি খুব মানুষের কাছেই এরকম সৎপরামর্শ ...য়েছো যা হোক—জানো তো উনি কোনোদিন আমার ...স্টারমশাই ছিলেন?"

"তা জানি, তবু তুমিই এর ভালো বিহিত করতে ...রবে, আমার এ-রকম ধারণা আছে।"

"কেন, মঞ্জুদিই তো র'য়েছেন—এ বিষয়ে পরম ...দ্ধিমতী, উপযুক্ত পরামর্শদাত্রী!"

"না, তাঁর ব্যবস্থা বড়ো বেশী কঠিন হ'য়ে যাবে, তুমিই একটা কিছু ভেবে রেখো গার্গি।"

"আচ্ছা" গার্গী ব'লেছিল, "দু'একদিন সময় দেবে তো?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—তা' দেবো না" বলে মল্লিকা হেসেছিলো "খু—উ—ব কঠিন, বুঝলে তো?"

গার্গী মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিলো।

নিস্তব্ধ নিঝুম দুপুর। গার্গী ইজি-চেয়ারে আধ-শোওয়া হ'য়ে ইলাষ্ট্রেটেডের পাজ্‌লের মধ্যে ডুবে গেলো। এ-সপ্তাহেরটা মনে হ'চ্ছে অনেক সোজা—গার্গী এটা চেষ্টা করবেই। অবশ্য প্রথমে দেখে সবগুলিই সোজা মনে হয়, কিন্তু পরে ভেতরে প্রবেশ করলে বোঝা যায় কতখানি কঠিন—যাই হোক, একটা এ্যাটেম্পটই করে দেখা যাক্, কি হয়।

বাইরে কার যেন পায়ের শব্দ শোনা গেল। মল্লিকা আসছে বোধ হয়। গার্গী চোখ তুললে না, বললে, "দিদি নাকি? তোমার আর তর্ সইছে না দেখ্‌তে পাচ্ছি—এস—" ব'লেই সে দরজার দিকে চাইলে।

কিন্তু গার্গী ততক্ষণে পাথর হ'য়ে গেছে। একটা অস্ফুট আর্তনাদ তার গলা থেকে বেরিয়ে এল—তার পরে গার্গীর মনে হ'ল চারদিকে মৃত্যুর মত স্তব্ধতার মধ্যে সে দাঁড়িয়ে আছে। গার্গী নিজের চোখ দুটোকে বিশ্বাস করতে পারলো না।

বিদ্যুৎ দরজার ওপর থেকে এগিয়ে এল, বল্লে, "সম্পূর্ণ আকস্মিক আর অস্বাভাবিক আর অনভিপ্রেত আগমন, কি বলো?"

"হ্যাঁ—" গার্গী সামান্য মাথা নাড়লে, তার সমস্ত দেহ যেন কাঁপ্‌ছে, বল্লে, "তুমি—কি ক'রে এলে এখানে?"

"কেন?" বিদ্যুৎ হাস্‌লো, "আমি কি হাঁটতে শিখিনি ছোটবেলায়?"

গার্গী তখনও প্রকৃতিস্থ হ'তে পারেনি, কোনরকমে সোজা হ'য়ে বস্‌লো। বিদ্যুৎ একটা সোফার ওপরে নিজেকে এলিয়ে দিলে, বল্লে, "কাল সমস্ত রাত ঘুম হয়নি, সারা পথ ভীড়ের জন্যে দাঁড়িয়ে আস্‌তে হ'য়েছিল।"

"তোমার সঙ্গে কিছু নেই?" গার্গী অভিজ্ঞদের মত কথা বল্লে, "বেডিং টেডিং?"

"না—তো, কিছুই আনিনি—সময় আর পেলাম কোথায় বলো?"

"কোথা থেকে আস্‌ছো তুমি?" গার্গী প্রশ্ন করলে।

"আপাততঃ কাশী থেকে—" বিদ্যুৎ সোফার ওপরে শুয়ে পড়লো, "বড়ো বেশী ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি গার্গি।"

গার্গী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো—বিদ্যুতের রুক্ষ চুলের দিকে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ—কুঞ্চিত কুঞ্চিত সেই কালো চুল—ট্রেণের জানিতে বিপর্যস্ত, বল্লে "বসো, আমি আসছি" ব'লেই গার্গী ওপরে উঠে গেল, তারপরে সে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে বিছানার ওপরে উপুড় হ'য়ে পড়লো। সমস্ত দেহ তার তখন অবরুদ্ধ বেদনার বিপুল ক্রন্দনে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে।

দশ

চৌকাঠ পেরিয়ে এসে নলিনীকান্ত নমস্কার করলে, বল্লে, "অসময়ে এসে বোধ হয় খুব অসুবিধে করলাম, কিছু মনে করবেন না মল্লিকা দেবী।"

মল্লিকা রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায়ের মধ্যে ডুবেছিলো, তাড়াতাড়ি উঠে বল্‌লে, "আসুন—আসুন, কি সৌভাগ্য আমার—আপনার যে পায়ের ধূলো পড়বে এখানে, তা' কখনও—"

"আহা, কি যা-তা সব বল্‌ছেন"—নলিনীকান্ত আরাম ক'রে একটা ইজি-চেয়ারের মধ্যে ডুবে গেলো, "তারপরে ভালো আছেন তো ?"

মল্লিকা ততক্ষণে খাটের ওপরে সোজা হ'য়ে ব'সেছে—খোঁপাটা ভেঙে প'ড়েছিলো—দু'হাতে জড়াতে জড়াতে উত্তর দিলে, বল্‌লে, "দেখ্‌ছেনই তো কেমন আছি—অসুখ-বিসুখ হয় না আজ তিন বছর, দিব্যি সুখে আছি—ছাত্রী পড়াচ্ছি, আর যখন ইচ্ছে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

"তা' বটে" নলিনীকান্ত খুব আস্তে কথা বল্‌লেন। "ভালো কথা, আপনি আমার এখানকার ঠিকানা পেলেন কি ক'রে ?" মল্লিকা হঠাৎ প্রশ্নটা মুখের ওপরে ছুঁড়লে।

"ও, সে আর বল্‌বেন না—অনেক কষ্টে আমার এক পুরোণো ছাত্রীর কাছ থেকে জোগাড় ক'রেছি। আপনার আগের বাড়ীতে গিয়ে বহুবার চেষ্টা ক'রেছিলাম—কিন্তু কেউই এখানকার ঠিকানা বল্‌তে পারলেন না।"

"ওঃ তা' হ'লে খুব ঘুরেছেন বলুন ?"

"তা' আর বল্‌তে !" নলিনীকান্ত পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে সমস্ত মুখটা একবার মুছে নিলে।

"এঁ্যা, একটা জিনিষের জন্যে আমি আপনার কাছে ভারী লজ্জিত নলিনীবাবু—" মল্লিকা বল্‌লে।

"হ্যাঁ, সে কি ? —এ সব কি বল্‌ছেন ?" নম্রতায় নলিনীকান্ত গ'লে গেলেন।

"মানে—আপনার সেই নাটকটা—যেটা ম্যানাস্‌ক্রিপ্‌টে আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন—মানে সেটা কোথায় যে রেখেছি আর খুঁজে পাচ্ছি না—"

নলিনীকান্তের সমস্ত মুখে কে যেন অনেকখানি কালি মাখিয়ে দিয়ে গেলো, কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে থেকে হঠাৎ বল্‌লে, "কতোদিন খুঁজে পাচ্ছেন না ? —ভাল ক'রে দেখেছেন তো সব জায়গা ?"

"হ্যাঁ, তা' দেখেছি—তবে নীচের একটা বাক্স হয়নি—ওটার চাবীটা আবার হারিয়ে গেছে কিনা।"

নলিনীকান্ত যেন কিছুটা আশ্বস্ত হ'লেন, বল্‌লেন, "তাহ'লে ওই বাক্সের মধ্যেই আছে—কোথায় আর যাবে ?" একটু থেমে বল্‌লেন, "আর যায়ই যদি—থাকগে ও সেই দশ বছর আগের লেখা তো—যেতে দিন—ওঃ এখন যে একটা ওয়াণ্ডারফুল ড্রামা লিখেছি—সত্যি, তা' যদি শুনতেন ?"

"তাই নাকি ?" অত্যধিক আনন্দে মল্লিকা উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছে, "কবে শোনাচ্ছেন বলুন ? এবার আর আমি পড়বো না—একেবারে আপনার মুখ থেকে শুনবো।"

নলিনীকান্ত ইজিচেয়ারের ওপরে সোজা হ'য়ে বসলেন; বল্‌লেন, "যেদিন খুসী আপনার সেদিন বল্‌বেন। শুধু শোন্‌বার একদিন আগে আমায় জানিয়ে দেবেন। আমি সব ব্যবস্থা করবো।"

"একদিন আগে-টাগে আর কি ! —আগামী রবিবারে আপনি তো 'অফ্‌' আছেন সন্ধ্যের সময়ে ? সেইদিনই যাবো।"

"বেশ, বেশ, তাই ভালো—ছুটীর দিন বেশ অনেক গল্প-টল্পও করা যাবে, কি বলুন ?"

মল্লিকা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে। নলিনীকান্ত আবার ইজি-চেয়ারের মধ্যে ডুবে গেলেন।

আস্তে আস্তে বল্‌লেন, "তবে দেখ্‌বেন, আর কাউকে যেন নিয়ে টিয়ে যাবেন না—মানে আপনি বলেই শোনাচ্ছি—অন্য কারু কাছে ম্যানাস্‌ক্রিপ্‌টে আমি কখনও আমার লেখা শোনাই না—কাজেই বুঝ্‌তে পারছেন তো ?"

মল্লিকা আবারো সম্মতি জানালো, বল্‌লে, "আপনার কোনও ভয় নেই—আমি একাই যাবো।"

নলিনীকান্ত বিনীতভাবে হাস্‌লেন, বল্‌লেন, "আমিও তাই বলি—মানে পাঁচজন গেলে একটা অসুবিধে—মানে তাঁদেরও কষ্ট ক'রে ব'সে থাকতে হ'বে।"

"না—না, আপনি সে-সব কিছু ভাব্‌বেন না।" মল্লিকা উঠে দাঁড়ালো, "চা খাবেন ?"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ মানে তা সকাল বেলা এক কাপ্‌—" মল্লিকা ততক্ষণে চায়ের জন্যে নীচে নাম্‌তে আরম্ভ ক'রছে, চেঁচিয়ে বল্‌লে, "আপনি বসুন—আমি আস্‌ছি।"

শীতকালে বিশেষ ক'রে শীতকালে চায়ের মধ্যে বেশ নেশা ঘনিয়ে আসে। আস্তে আস্তে কাপের ভেতরে

নীকান্ত ঠোঁট ডুবিয়ে দিলেন, বল্‌লেন, "চমৎকার, ন সুন্দর ঠিকভাবে চিনি দিতে আমি আর কাউকে খিনি, আপনিই তো ক'রেছেন মল্লিকাদেবি?"

মল্লিকা মাথা নেড়ে হাস্‌লো, বল্‌লে, "আমার সৌভাগ্য আপনার ভালো লাগ্‌লো।"

"নাঃ—আপনাকে নিয়ে আর পারলাম না, কি যে লন ঐ সব বড় বড় কথা" নলিনীকান্ত চায়ের কাপে র একবার ঠোঁট ডুবালো, "নিন্‌, আপনারটাও যে ড হ'য়ে গেলো।"

মল্লিকা নিজের কাপটা টেনে নিলো, বল্‌লে. "এখন টা লিখ্‌ছেন, তার নামটাম ঠিক্ হ'য়ে গিয়েছে বোধহয় -মানে সেই নাটকটা?—"

"ও—হাঁ্যা, নিশ্চয়ই—নামটা কিন্তু ভারী রোম্যাণ্টিক 'য়েছে. মানে আপনাদের খুব ভালো লাগবে—আর ধুনিক কালের আবহাওয়া নিয়েই যখন আমার সমস্ত টকের চরিত্রগুলি ভ'রে উঠেছে, তখন—মানে, নামটাও কটু সেই রকম ষ্ট্রাইকিং হওয়া দরকার. কি বলুন, মানে লোকের চোখে সেটা কিছুদিনের জন্যে যাতে ভাসে,—মানে, দেখ্‌লেই যাতে ভুলে না যায়—"

"হাঁ্যা, তা' ঠিক—নামটা কিন্তু আপনি বলেন নি এখনও।"

"ও—হাঁ্যা, কিন্তু বড় বেশী রকম কাব্যিক হ'য়ে প'ড়েছে, মানে, হাস্‌বেন না অবশ্য শুনে—"

"না—না, কি আশ্চর্য্য" মল্লিকা সোজা হ'য়ে উঠে বস্‌লো, "হাস্‌বো কেন—আপনার নাটক, আপনি নামকরণ ক'রেছেন, এর মধ্যে হাসির কি আছে?"

"হাঁ্যা, তা তো বটেই—তা ঠিকই বলেছেন, তবে শুনুন মানে নামটা খুব ভালো হয়নি, তবে হাঁ্যা, আপনার কি রকম লাগ্‌বে জানি না, মানে—"

"হাঁ্যা, বেশ তো, বলুনই না।"

"—ধূসরচ্ছন্দা" নলিনীকান্ত জোরে কথাটা উচ্চারণ করলেন।

"ওরে বাব্‌ বাঃ—ভীষণ নাম—তা' সত্যি ভারী চমৎকার হ'য়েছে নামটা।—"মল্লিকা উৎসাহে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌লো, "কতখানি লিখেছেন?"

"শেষ হ'য়ে গেছে—এই দিন চারেক হ'ল শেষ ক'রেছি। রঙ্গমহলে খুব সম্ভবতঃ ষ্টেজ্‌ড্ হ'বে—এখন—"

"তাই নাকি?—ওঃ কন্‌গ্রাচুলেশান্‌স্—আসুন, আসুন রীতিমত বৈদেশিক প্রথায় মল্লিকা হাত বাড়িয়ে দিলে, "তা' এতদিন বলেন নি আমাদের?"

নলিনীকান্ত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌লেন, "হাঁ্যা, মানে, আপনার সঙ্গে দেখাই হয়নি কিনা—"

"বেশ, বেশ ভারী আনন্দের বিষয়. তা' আপনার এই নামটিকে আমি কিন্তু ঠিক 'ফলো' করতে পারছি না।"

"ও—হাঁ্যা," নলিনীকান্ত একটু হাস্‌লেন, "প্রথমে শুনলে একটু অদ্ভুতই শোনায় বটে—মানে আমার নাটকের প্রধান চরিত্রটীর নাম হ'চ্ছে 'ধূসর' আর নায়িকাটীর নাম 'ছন্দা'; বুঝ্‌লেন কিনা—"

মল্লিকা মাথা নাড়লো, বল্‌লে "ওঃ—তা'হ'লে ভারী সুন্দর হ'য়েছে।

নলিনীকান্ত সামান্য একটু হাস্‌লেন শুধু।

কয়েকটী মুহূর্ত্ত নীরবে কাট্‌লো। তারপরে সবার প্রথমে অতি ধীরে নলিনীকান্তই সে নীরবতা ভঙ্গ করলেন। বল্‌লেন, "বিকেলের দিকে আপনি 'অফ্' আছেন নাকি মল্লিকাদেবী?"

"কেন বলুন তো?"

"না—মানে, এম্‌নি জিজ্ঞেস করছিলাম—আছেন নাকি?"

"না, এমন বিশেষ কাজ কিছু নেই—আর আজ তো ছুটী আছে আমার।"

"তা'হ'লে" নলিনীকান্ত এক গাল ভ'রে হাস্‌লেন, "মানে তা'হ'লে আজ 'চিত্রা'য় দুটো সীট বুক্ ক'রেছিলাম —মানে যদি কিছু না মনে করেন অবশ্য।"

"কি আশ্চর্য্য—কেন মিছিমিছি—এই সব পয়সা খরচ করতে গেলেন বলুন দেখি. কি-কি বই আছে চিত্রায়?"

"জীবন-মরণ—এন্‌টির লেটেষ্ট বেঙ্গলী প্রোডাক্‌শান্ শুন্‌লাম খুব খারাপ হয় নি—দেখা যেতে পারে।"

"আমার তো জানেন, খুব বেশী আগ্রহ-টাগ্রহ নেই ফিল্মের দিকে, তা' যখন 'বুক্' ক'রেছেনই, একান্ত—" মল্লিকা সামান্য একটু সম্মতির হাসি হাস্‌লে।

নলিনীকান্ত এবারে একেবারে রীতিমত গ'লে গেলেন, বল্‌লেন, "বহু ধন্যবাদ আপনাকে, আমি ভেবেছিলাম আপনি রাজী হ'বেন না শেষ পর্য্যন্ত।"

"না—না এতে আর অ-রাজী হওয়ার কি আছে? আপনিই দেখাচ্ছেন—আমার তো আর পয়সা যাচ্ছে না?" মল্লিকা আরও একবার হাস্‌লো।

"না—না, তা নয়, মানে;—আচ্ছা তাহ'লে উঠি এখন —বিকেলে আপনি থাক্‌বেন, আমি এসে নিয়ে যাবো, একেবারে 'রেডী' হ'য়ে থাক্‌বেন কিন্তু—ঠিক পাঁচটার সময়ে কেমন?" নলিনীকান্ত একবার দেয়ালের ঘড়িটার দিকে চাইলেন।

মল্লিকা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে।

(ক্রমশঃ)

মার্কিনজাতির কর্ম্মবীর—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত। প্রকাশক—ইউ, এন, ধর এণ্ড কোং, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃঃ সংখ্যা ১৬০, দাম এক টাকা।

আলোচ্য পুস্তকে যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার কয়েকজন কর্ম্মবীর মনীষীর জীবন-কথা লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। এ্যাব্রাহাম লিঙ্কন, জন এডামস্, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন প্রভৃতি কর্ম্মশ্রেষ্ঠ মানবদের জীবন ও কর্ম্ম আমেরিকাকে অসামান্য গৌরবে মণ্ডিত করিয়াছে। এই ধরণের পুস্তকের এই সার্থকতা আছে যে, ইহা দ্বারা তরুণ ও কিশোরদের সুপ্ত কর্ম্মশক্তিকে জাগাইয়া তোলার সহায়তা হইতে পারে। জাতীয়তার উদ্বোধক এই পুস্তকের প্রতি আমরা বাংলার কিশোর ও তরুণদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

সাহসীর জয়যাত্রা—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। প্রকাশক—এস্, কে, মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, ১২, নারিকেল-বাগান লেন, কলিকাতা। পৃঃ ১৭৬, দাম এক টাকা।

চীন, রাশিয়া, তুর্কী, জার্ম্মানী, ইটালী প্রভৃতি জাতির স্রষ্টা বীর-পুরুষদের জীবনী পুস্তকটিকে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে। ভারতের প্রসঙ্গে গান্ধীজী, জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের জীবন-কথা লইয়া আলোচনা পুস্তকটির মূল্য বৃদ্ধি করিবে। পুস্তকটি যে বাঙলার পাঠক সাধারণ গ্রহণ করিয়াছেন তাহার প্রমাণ পুস্তকটির তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে।

দারিদ্র্য মোচন—ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার, ভাগবতরত্ন প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি.এ., প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃঃ সংখ্যা ১৩৮, দাম এক টাকা।

আমাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও তাহার প্রতিকার লইয়া যাঁহারা চিন্তা করেন তাঁহারা এই পুস্তকটির মধ্যে সাধারণের পক্ষে জ্ঞাতব্য বহু বিষয়ের সন্ধান পাইবেন। সাধারণভাবে কৃষি ও গো-জাতির উন্নতিকল্পে বহু তথ্য ও সংবাদ পুস্তকটিতে দেওয়া হইয়াছে। বিশেষ করিয়া ইংরাজী-অনভিজ্ঞ পাঠকেরা ইহারই মধ্যে আমাদের কৃষি, শিল্প ও গো-জাতির উন্নতিবিধায়ক বহু নির্দ্দেশের পরিচয় পাইবেন। অত্যন্ত সরল ভাষায় কৃষিশিল্পের সমস্যা ও সমাধানের উপায়গুলির যে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতে সাধারণের পক্ষে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করিয়া লইবার পক্ষে সুবিধা হইবে। আমরা পুস্তকটির প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

কায়া ও ছায়া—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক: দীপালী গ্রন্থশালা, ১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। পৃঃ সংখ্যা ১২০, দাম বার আনা।

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থ সুকবি বসন্তকুমারের কবি-জীবনের প্রথম যুগের রচনা। কবিতাগুলির মধ্য দিয়া তাঁহার পরবর্ত্তী কবি-জীবনের সাফল্যের একটি আভাষ যেন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ছন্দের ঝঙ্কার ও শব্দচয়নের সৌন্দর্য্য একাধিক কবিতায় কাব্যরস সৃষ্টি করিয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে বিবাহোপলক্ষে রচিত কতকগুলি কবিতা দেওয়া হইয়াছে। কবি-কল্পনার সুমধুর স্পর্শে এগুলি ভাবময় হইয়া উঠিয়াছে। গতানুগতিক কবিতা পাঠ করিয়া যাঁহারা ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছেন তাঁহারা পুস্তকটি পড়িয়া তৃপ্তি পাইবেন।

গীতা-মঞ্জরী—শ্রীহলধর চৌধুরী, বি, এল সম্পাদিত। পৃঃ সংখ্যা ১৭২, মূল্য নয় আনা।

গীতার ভাষ্য ও ব্যাখ্যা কখনও পুরোণো হয় না। বর্ত্তমানে সারা পৃথিবীর এই ধ্বংসলীলার বুকে নব সৃষ্টির একটি সুদূর স্বপ্ন ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে। এই ভাবী সভ্যতা ও সংস্কৃতির যুগে গীতার কর্ম্মবাদ, জ্ঞান ও ভক্তিযোগ জাতির অন্তরে সৃষ্টির সুষমা জাগাইয়া তুলিবে। সেই দিক হইতে গ্রন্থকারের বর্ত্তমান প্রচেষ্টার যে মূল্য তাহা মামুলী আলোচনার নিরিখে যাচাই করা চলিবে না। ইহার পাঠ ও ব্যাখ্যা আমরা যাহা দেখিয়াছি তাহাতে গীতামঞ্জরী যে সর্ব্বসাধারণের উপযোগী হইবে ইহা বলিতে পারি।

মর্ম্মবাণী (প্রথমাঞ্জলি)—শ্রীপুলিনবিহারী হালদার এম-এ প্রণীত, প্রাপ্তিস্থান—নীলমণি হালদার এণ্ড কোং ১১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা, মূল্য পাঁচ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে হিন্দুর প্রথা পদ্ধতির মূল্য নিরূপণ ও হিন্দুর অনুভূত সত্য ও তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে; দ্বিতীয় খণ্ডে তত্ত্বের ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত হিন্দুর নিয়ম পদ্ধতিসমূহ কোনরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাহার ব্যবহারিক কার্য্যকারিতার দিকগুলি আলোচিত হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডে সমাজ ও জাতির অস্তিত্ব রক্ষা ও তাহার ইভোলিউসনের দিক্ অংশত আলোচনা করা হইয়াছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি, ইহা ভাবী সমাজগঠন ও তাহার ইভল্যুসনের দিক্-নির্ণয়ে সাহায্য করিবে। হিন্দুর সমাজ সংস্কার ও সংগঠনের কথা যাঁহারা চিন্তা করেন তাঁহারা এই বৃহৎ গ্রন্থে যথেষ্ট চিন্তার উপাদান পাইবেন।

রাষ্ট্রীয় প্রহসন

ভাগলপুরের ব্যাপার একটা রাষ্ট্রীয় প্রহসন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য বিহার গভর্ণমেণ্ট যথেষ্ট মাথা খাটাইয়া বর্ত্তমান ভারতের রাষ্ট্র-রঙ্গমঞ্চে এই বিচিত্র প্রহসনটীর অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহার জন্য তাঁহারা না রাজশক্তি, না জনসাধারণ, কাহারও চক্ষেই সম্ভবতঃ ধন্যবাদার্হ হন নাই। একটী সহজ সাধারণ ব্যাপার কেমন ভাবে জটিল ও ঘোরাল হইয়া গুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, বিহার গভর্ণমেণ্টের আচরণ তাহারই দৃষ্টান্ত। অবশ্য হিন্দু মহাসভার কর্ত্তৃপক্ষও আপনাদিগকে প্রতিক্রিয়ামূলক জিদ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিতে পারেন নাই, ইহাও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে।

বিহার গভর্ণমেণ্ট হিন্দু মহাসভার অধিবেশন একটী নির্দ্দিষ্ট দিনে ও স্থানে হওয়ারই বাধা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, বিহার প্রদেশে ও পরিবর্ত্তিত তারিখে মহাসভার অধিবেশনে তাঁহাদের কোনই আপত্তি থাকে নাই—এই কথা বিহার গভর্ণমেণ্টের সরকারী বিবৃতি হইতে জানা যায়। তাঁহাদের উক্ত আপত্তির কারণ—হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কিত পূর্ব্ব ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি। এই আপত্তি কত দূর সঙ্গত ও সমূলক, তাহার বিচার করার অধিকার আমাদের নাই। ভাগলপুরের মুস্লিম লীগের সভাপতি শ্রীযুক্ত অনন্তদেবকে যে পত্র লিখেন, তাহা হইতে বুঝা যায়, স্থানীয় লীগের তথা মুসলমানদের হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে আপত্তি ছিল না। এইরূপ স্বীকারোক্তি গভর্ণমেণ্টের পূর্ব্বোক্ত মনোভাবনিরসনের পক্ষে যথেষ্ট না হইতেও পারে। এ কথাও সত্য যে, হিন্দু মহাসভা-ভঙ্গের জন্য গভর্ণমেণ্ট যত পুলিস ও সামরিক শক্তির সন্নিবেশ ভাগলপুরে করিয়াছিলেন তাহা সম্ভাব্য যে কোন অশান্তিদমনের পক্ষেই পর্য্যাপ্ত হইত। কিন্তু এ সকল কথা আমাদের মনে হয় অবান্তর। যে নীতি ধরিয়া চলার ফলে এইরূপ অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব, সেই নীতি বর্ত্তমান ক্ষেত্রে জাতীয় কল্যাণ তথা রাজশক্তির কতখানি অনুকূল, তাহাই বিচার্য্য। এই দিক্ দিয়া দেখিলে বিহার গভর্ণমেণ্টের কার্য্য সম্পূর্ণ রাজনীতি-বিরুদ্ধ বলিয়াই ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। ভারত গভর্ণমেণ্ট আজ জনসাধারণের সহিত যে বিশিষ্ট সম্পর্ক হইলে শুধু দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা-রক্ষা নহে, পরন্তু আসন্ন বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার সুব্যবস্থায় অগ্রসর হইতে পারেন, বিহার গভর্ণমেণ্টের কার্য্য তাহার একেবারেই অনুকূল নহে। বাংলার অর্থ-সচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ বিস্মিত কণ্ঠে এই মর্ম্মে সত্যই বলিয়াছেন "জাপানের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ইহা বিচিত্র আয়োজন বটে!"

গভর্ণর স্বয়ং বিহার শাসনতন্ত্রের নিয়ন্তৃরূপে এইরূপ ঘটনার জন্য মূলতঃ দায়ী, ইহা ভারতবন্ধু ষ্টেট্সম্যানের ন্যায় পত্রসম্পাদকও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ভারতের গভর্ণরগণ আজ জনমত নিয়ন্ত্রণ করিতে গিয়া যদি সন্ত্রাড়নার সংস্কার কাটাইয়া উঠিতে না পারেন, ভাগলপুরের নাটকীয় প্রহসন অন্যত্রও নানা রূপে ও ছলে পুনরভিনীত হওয়া অসম্ভব নহে। তাহা বর্ত্তমান সঙ্কটময় যুগের উপযুক্ত রাজনীতি নহে। আমরা এই কথাটুকুই রাজশক্তির কর্ণধারগণের কর্ণগোচর করিতে পারিলে সুখী হইব। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের ত্রুটি ও দুর্ব্বলতা ভারত গভর্ণমেণ্টও অনেক ক্ষেত্রে অগ্রণী হইয়া সংশোধন করিতে পারেন। ভাগলপুরের ব্যাপারে পূর্ব্বে না হউক, অন্ততঃ পরেও যেন ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রয়োজন হইলে হস্তক্ষেপ করিয়া ঘটনার জের আর অধিক দূর গড়াইতে না দেন এবং এই অরাজনৈতিক নীতির এইখানেই শেষ হয়, ইহাই সর্ব্বদা প্রার্থনীয়। এই ভাগলপুরের ঘটনায় হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দের, বিশেষভাবে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের স্বীয় মত ও আদর্শরক্ষায় যে অনুপম দৃঢ়তা ও চরিত্রের নির্ভীকতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা সগৌরবে উল্লেখযোগ্য।

শরৎচন্দ্রের গ্রেপ্তার

ভারত গভর্ণমেণ্টের পূর্ব্বোক্ত দায়িত্ব সম্পর্কেই বাংলার কংগ্রেসনেতা শরৎচন্দ্রের গ্রেপ্তারের কথা স্বতঃই উল্লেখযোগ্য হয়। বাংলার সম্মিলিত নব মন্ত্রিমণ্ডল-গঠনের ঠিক পূর্ব্বাহ্নে এই রাষ্ট্রনেতার গ্রেপ্তার ভারত গভর্ণমেণ্টের আচরণ সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে নানাবিধ শঙ্কা ও সংশয়েরই কারণ হইয়াছে, ইহা অস্বীকার্য্য নহে। ইহার উপর তাঁহাকে তাড়াতাড়ি মাদ্রাজে স্থানান্তর করায় এই বিক্ষোভ আরও বৃদ্ধি করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাংলার অর্থসচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের গ্রেপ্তারে বিহার গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বঙ্গীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিবাদ ও মুক্তি-চেষ্টা অতিশয় স্বাভাবিক ও সমীচিন হইয়াছিল। আমরা জানি, শরৎচন্দ্রের ব্যাপারেও মাননীয় প্রধান মন্ত্রী উদাসীন নহেন। কিন্তু মাদ্রাজে শরৎচন্দ্রকে স্থানান্তরিত করিয়া, ভারত গভর্ণমেণ্ট পক্ষে প্রধান মন্ত্রীর মুক্তিপ্রয়াস অযথা কণ্টকিত করিয়া তুলিলেন। ভারত গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে শরৎচন্দ্রের ন্যায় প্রতিপত্তিশালী রাষ্ট্রনেতাকে তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত গুরুতর অভিযোগ সম্বন্ধে আত্মরক্ষার উপযোগী সুযোগ না দেওয়া গভীর পরিতাপের বিষয়। আমরা তাঁহাদিগকে উপযুক্ত প্রমাণপ্রয়োগে শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অভিযোগ হয় স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করিতে নতুবা তাঁহাকে মুক্তি দিয়া দেশব্যাপী বিক্ষোভ দূর করিতে অনুরোধ করিব। অন্ততঃ বাংলা হইতে মাদ্রাজে স্থানান্তরিত করিয়া শরৎবাবুকে আত্মপক্ষসমর্থনে যে অসুবিধায় ফেলা হইয়াছে, তাহা হইতেও তাঁহাকে মুক্তিদান করা ভারত গভর্ণমেণ্টের আশু কর্ত্তব্য।

মহাত্মাজীর বিদায়

আমরা গত বারের "প্রবর্ত্তকে" কংগ্রেসের নূতন সুর লক্ষ্য করিয়া, বার্দ্দোলির অধিবেশনে মহাত্মাজীর প্রভাব-মুক্ত হইয়া স্বচ্ছতর জাতীয় রাষ্ট্রনীতির আবাহন হইবে, এইরূপ আশা প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমাদের সে আশা সফল হইয়াছে। বিগত বার্দ্দোলি অধিবেশনে কংগ্রেসের নেতৃমণ্ডলী রাষ্ট্রক্ষেত্রে অহিংসানীতির প্রয়োগ সীমাবদ্ধ করিয়া কংগ্রেসকে খাঁটি রাজনৈতিক আব্‌হাওয়ায় অতঃপর পরিচালনার মনঃস্থ করিয়াছেন ও সেই মর্ম্মে তাঁহারা যে সুদীর্ঘ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সবিস্তার দৈনিক সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে।• এই ঘটনায় মহাত্মাজীকে কংগ্রেস হইতে আর একবার তাঁহার আদর্শবাদ লইয়া সরিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে। মহাত্মাজীর এই বিদায়গ্রহণ কংগ্রেসের ইতিহাসে একটা নূতন যুগান্ত-পাত করিবে বলিয়াই আমাদের ধারণা।

তাঁহার এই বিদায়ের অর্থ ইহা নহে যে, মহাত্মার ব্যক্তিত্বের প্রতি কংগ্রেস তথা জাতির অকৃত্রিম শ্রদ্ধার বিন্দুমাত্র অপলাপ বা অবনতি ঘটিয়াছে বলিয়াই তাঁহাকে কংগ্রেস হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে হইতেছে। মহাত্মা অসামান্য পুরুষ—সমগ্র মানবজাতির জীবনেতিহাসে তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সমুজ্জল জ্যোতিষ্কের ন্যায় চিরদিন ভাস্বর হইয়া দিক্‌নির্দ্দেশ করিবে। কিন্তু ভারতের বস্তুতন্ত্র রাষ্ট্রক্ষেত্রে তাঁহার অহিংসামূলক আদর্শবাদ যুগোচিত ক্রমবিকাশ—বিশেষতঃ ভারতের রাষ্ট্রীয় পরিণতির বিশেষ বাধা সৃষ্টি করিতেছিল। তাঁহার এই আদর্শের আতপমুক্ত হইয়া ভারতের রাষ্ট্রসাধনা স্বচ্ছতর গতি পরিগ্রহ করার সমধিক সুযোগ পাইবে।

কিন্তু শুধু অহিংসাবাদই ভারতের রাষ্ট্রসাধনার ক্রম-বিকাশ প্রতিরুদ্ধ করিতেছিল, ইহা সত্য নহে। মহাত্মা জাতির জীবনে যে আত্মচেতনার সাড়া তুলিয়াছেন, তাহার সম্যক্ উন্মেষ প্রয়োজনীয়। এই আত্মচেতনা হিংসা ও অহিংসার নৈতিক দ্বন্দ্বে পরিচ্ছিন্ন নহে। আত্ম-চেতনা অধ্যাত্মবস্তু। তাহার শিক্ষা, দীক্ষা, সাধনায় ঔদাসীন্য জাতিকে শ্রেয়ঃ দিবে না; পরন্তু মহাত্মাজীর হিমালয়প্রতিম বিরাট্ ব্যক্তিত্বের আশ্রয়মুক্ত হইয়া জাতি কিছুদিনের জন্য সমষ্টিগত আত্মপ্রত্যয়ের অভাবে নিরুপায় ও দিশাহারা বোধ করিতে পারে। এই অবস্থা হইতে মুক্তির একমাত্র উপায়—নেতৃমণ্ডলীর মধ্যে একটা সমাহিত সমষ্টিচৈতন্যের উন্মেষ—সঙ্ঘশক্তিরই সাধনা। এই দিকে কংগ্রেসের নেতৃপুরুষগণ অবহিত হইলে আমরা সুখী হইব।

ডাঃ নাগের বন্ধন ও মুক্তি

জাপ-যুদ্ধঘোষণার পরেই ডাঃ কালিদাস নাগের গ্রেপ্তার আমাদিগকে যারপরনাই স্তম্ভিত ও মর্ম্মাহত

রিয়াছিল। ডাঃ নাগ একজন আন্তর্জ্জাতিক মনীষী, যিনি প্রাতঃস্মরণীয় মহাকবি রবীন্দ্রনাথের অন্যতম ভক্ত ও চর। কবীন্দ্রের আদর্শের অনুগামী হইয়াই তিনি তাঁর সহিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মধ্যে কৃষ্টি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সঞ্চরণ করিয়াছেন। তাঁহাকে এই ভাবে ভারতের একজন সাংস্কৃতিক দূতও অনায়াসেই বলা যায়। এরূপ একজন বিশ্বমনীষীর কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সূত্রেই জাপানের সহিত সংযোগ ও আদান-প্রদান থাকিবে, ইহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। ডাঃ নাগ এইভাবে যেমন জাপানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তেমনি মহাচীনের সহিতও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত ছিলেন। তবে তাঁহাকে জাপ-যুদ্ধঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্বপ্রথমেই গ্রেপ্তার করা হইল কেন, ইহা বাস্তবিকই রহস্যময়। আমরা গভর্ণমেণ্টের দপ্তরখানার এই নিগূঢ় রহস্যের মধ্যে নাক না ঢুকাইয়াও এই প্রশ্ন অনায়াসে করিতে পারি যে, যদি কৃষ্টি ও সংস্কৃতিমূলক সংযোগ ও আদান-প্রদান শত্রুজাতির সহিত দূষণীয় হয়, তবে মিত্রপক্ষীয়ের সহিত অনুরূপ সংযোগ-রক্ষা ও আদান-প্রদানের জন্য তাঁহাকে কিরূপ দৃষ্টিতে গভর্ণমেণ্টের দেখা উচিত, তাহাও তাঁহাদের ভাবা উচিত ছিল। আবার এইরূপ সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোনও সম্পর্ক যদি গভর্ণমেণ্টের গোচরীভূত থাকে, তবে পুনরায় তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়ার কি কারণ থাকে? আসলে এইরূপ বন্ধন ও মুক্তি শুধু গভীর রহস্যজনক নহে, ইহা জাতির চিত্তে নানা অকথিত সংশয় ও কুহেলিকারই সৃষ্টি করে। ভারতগভর্ণমেণ্ট এই সকল ক্ষেত্রে সরাসরি সামরিক রীতি প্রয়োগ করার পূর্ব্বে যথেষ্ট প্রমাণ-প্রয়োগ সহ আত্মকার্য্য সমর্থন করিলেই যথার্থ সঙ্গত ও সমীচিন হয়। নতুবা বিচারহীন বন্ধন বা মুক্তি দুইই শাসনশক্তির অব্যবস্থিতচিত্ততা ও দুর্ব্বলতারই লক্ষণ নির্দ্দেশ করে।

যাহা হউক, ডাঃ কালিদাস নাগকে আবার স্বগৃহে, সংসারে ফিরিয়া পাইয়া আমরা যারপরনাই আনন্দ অনুভব করিতেছি ও সর্ব্বান্তঃকরণে বিধাতাকেই তজ্জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

এই প্রসঙ্গে আমরা মহাবোধি সোসাইটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবপ্রিয় বলিসিংহের গ্রেপ্তার সম্বন্ধেও অনুরূপ মন্তব্য পোষণ করি ও তাঁহারও মুক্তিলাভে আনন্দিত হইয়াছি।

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর গণতন্ত্রনীতি

আমেরিকার রাষ্ট্রমহাসভায় আধা-মার্কিণ বৃটিশ মহামন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল তাঁহার আজন্ম গণতান্ত্রিক শিক্ষা ও আদর্শের কথা উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া সমগ্র আমেরিকা-বাসীর মনোরঞ্জন করিয়াছেন; কিন্তু ভারতবাসী তথা সমগ্র শ্বেতজাতির অন্তরে তাঁহার এই আদর্শের বিবরণ কিরূপ মানসিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে বা করিয়াছে তাহা সম্ভবতঃ তিনি ভাবেন নাই—ভাবা আবশ্যকই মনে করেন নাই। ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে ইহা লইয়া স্বাভাবিক হৈ চৈ আন্দোলন ও সমালোচনা হইয়াছে ও এখনও হইতেছে। মিঃ চার্চ্চিলের অতলান্ত ঘোষণার ন্যায় তাঁহার ডেমোক্র্যাসীর ধারণাও অতলান্ত মহাসমুদ্রেরই উভয় তট চুম্বন করিয়া নিরস্ত হয়—বড় জোর তাহা আটিক সমুদ্র ও প্রশান্ত মহাসমুদ্রে দুই একটা ঢেউ প্রেরণ করিলেও করিতে পারে; কিন্তু ভারতসমুদ্রের তীরে ইহাদের কঠোর প্রবেশ-নিষেধ আছে এবং চিরদিন থাকিবেই। ইহাই মিঃ চার্চ্চিলের বিশ্বাস এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের মহানায়ক হিসাবে তাঁহার এই বিশ্বাসের কেহ কোনরূপ মূল্য নির্দ্ধারণ করিলে তাঁহার তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না।

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ যে ফ্যাসিজমের ও নাৎসিজমের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিণ গণতন্ত্রবাদের যুদ্ধ, তাহা কেহ অস্বীকার করে না। মহারুষের অন্তর্প্রবেশে তাহার এই গণতান্ত্রিক রূপ যে আরও সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও অনেকেরই মনে হওয়া স্বাভাবিক এবং ইহা সত্যও। কিন্তু আসলে ইহা রাষ্ট্রের বা রাষ্ট্রপুঞ্জের বিরুদ্ধে অন্য রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রপুঞ্জের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক সংগ্রাম—এইটুকু ভাবিলেই বা ক্ষতি কি? এই উভয় পক্ষীয় যুধ্যমান রাষ্ট্রগুলির আদর্শবাদ তো মুখের জলুস, ইহা যে তাহাদের আসল স্বরূপ, আমাদের তাহা মনে হয় না। রাষ্ট্রগুলি যে শ্লোগ্যান লইয়া যুদ্ধ করিতেছে, তাহা অবশ্য তাহাদের স্ব স্ব জাতীয় প্রাণে ন্যায়াধিক বিশ্বাসের অনু-প্রেরণা ও উত্তাপ সঞ্চার করিতেছে, কিন্তু সে বিশ্বাসের

প্রয়োগক্ষেত্র বিশ্বমানবকে লক্ষ্য করিয়া কতটুকু, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। সুতরাং বৃটিশ মহামন্ত্রীর গণতান্ত্রিক চরিত্র ও ধারণা যদি ইংরাজভাষাভাষী জাতি-সমূহেরই মনে অনুপ্রেরণাসঞ্চারের কার্য্য করে, তাহাই তিনি যথেষ্ট মনে করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতবাসী তাহাদের জাতীয় জীবনে শক্তি ও অনুপ্রেরণা সঞ্চয় করিবে যে বিশ্বাসের উৎস হইতে, তাহাই তাহাদের অনুসন্ধেয়; বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর ধারণা ও উক্তি অতলান্তের উভয় পারে টানিয়া আনার প্রয়াস বৃথা চেষ্টা।

অনাচার

বড়দিনের রাত্রে বাঙালী মহিলার উপর গোরা সৈনিকের অনাচার সারা কলিকাতায় গভীর পরিতাপ ও ব্যাপক আতঙ্ক সঞ্চার করিয়াছে। রাজনগরীর সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে এই ঘটনা নিরতিশয় লজ্জাকর হওয়া উচিত, ইহাতে সন্দেহ নাই। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সহরে কতিপয় অষ্ট্রেলিয়ান সৈনিকের অনুরূপ দুর্ব্যবহারে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে, এই উপলক্ষে আমাদের তাহাই মনে পড়িতেছে। সেই সময়ে মহাত্মা গান্ধী ও সুতীব্র ভাষায় "হরিজন" পত্রে লিখিয়াছিলেন—"The menace should be seriously dealt with...... The question is what has the G. O. C. of the Australian contingent done with his men? Had he issued instructions to them as to their behaviour in the midst of a mild population? What did the Commissioner of Police do? What did the Collector do? And what did H. E. the Governor do? What has the Mayor done to vindicate the honour of the women living within his jurisdiction?"

আমরা কলিকাতানগরীর সেই সেই সামরিক ও বে-সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের নিকটও অনুরূপ প্রশ্নগুলিই সনির্ব্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছি। তাঁহাদের উত্তরের প্রতীক্ষা সমগ্র দেশবাসী করিতেছে।

সাময়িক সাহিত্য

মাসিক বসুমতী—অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮ঃ

সিংহ ডেপুটি—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

রিটায়ার্ড ডেপুটি গুরুপদ সিংহের পারিবারিক জীবনের কাহিনী লেখকের হাতে ভাল উৎরাইয়াছে। এই ধরণের হাল্কা সরস রচনায় লেখকের হাতযশ আছে। রিটায়ার্ড জীবনের পরমুখাপেক্ষিতা, বিশেষতঃ স্ত্রীর কাছে কর্ম্মহীন জীবনের শূন্যতা যে বিশেষ সহানুভূতির বস্তু হইয়া উঠে না, তাহার হাস্যকর ও করুণ দু'টি দিকের পরিচয় গল্পটিতে আছে। শেষের দিকে গুরুপদবাবুর ভায়রা-ভাই উকীল নীলমাধব ফ্যামিলি লাইফের গুণগান করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথের কোটেশন তুলিয়া যে কাণ্ড বাধাইয়াছে তাহাতে হাস্যরসের দিকটি বিশেষ বাড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আর একটী কথা, বসুমতীর আসরে রচয়িতার কয়েক ফর্ম্মা বাঁধা বরাদ্দ আছে। সাদার উপর কালির আঁচড়ে ইহাকে ভরিয়া তুলিতে হয় প্রতি মাসে, কাজেই সব দিকে নজর দেওয়ার মত সুবিধা ও সুযোগও থাকে না সব সময়। থাকিলে লেখক দেখিতে পাইতেন গল্পটির মধ্যে কয়েকটি অসামঞ্জস্য বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ব্যারিষ্টার মিত্তির-এর এটর্ণি রাধিকা সেন পর মুহূর্ত্তেই রমণী সেন হইয়াছেন, তারাচরণের সহিত নীলমাধবের পরিচয়ও কতকটা ভৌতিক ব্যাপার। তারাচরণ গুরুপদ বাবুকে assert করিতে বলিয়াছিলেন, ইহা নীলমাধব জানিল কি করিয়া? বেতার ঘটিত ব্যাপার যে নয় তাহা আমরা জানি, তথাপি সম্ভাব্য একটা কিছু কারণ দেওয়া তো উচিত ছিল।

ত্রিধারা—শ্রীমতী মায়াদেবী বসু। উপন্যাসটি ধারা-বাহিকভাবে চলিতেছে।

"হিমানী তাহার এই সুদীর্ঘ বিবাহিত জীবনের মাঝে

—এবে, কোনদিন সুধীশকে ভুলিতে পারিয়াছে? শুধুই কি চিন্তন, মনন, স্মরণ?" শুধুই ইহা নয়, ইহা ছাড়াও আর যাহা আছে তাহা ঠিক কাগজে কলমে-লেখা চলে না।

ছবি ও মৃণা হিমানীর দু'টি শিশু সন্তান অঘোরে ঘুমাইতেছে, হিমানী শুইয়া আছে, বোধহয় তন্দ্রাচ্ছন্ন।

সুধীশ সন্তর্পণে দুয়ার ভেজাইয়া দিয়া তাহার মাথার কাছে বসিয়া আস্তে আস্তে ডাকিল 'হিমন, হিমু'। হিমানী এবার মুখ তুলিল, ব্যাকুল ক্রন্দনের সুরে বলিল, আমায় আমার বাড়ী পাঠিয়ে দাও সুধীশ।

সুধীশ কোঁচার কাপড়ে তাহার প্রবহমান অশ্রু মুছাইয়া বলিল, বাড়ী যাবার জন্তে এত উতলা হয়েছো কেন? গেলেই তো একদিন।

হিমানী রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, কিছুই হয়নি, দুনিয়ার নিয়মই এই, লোকে ডাঙায় উঠে নৌকোয় লাথি মারে! আজ বাহাদুরী কাঠ পেয়েছে বলেই ঠাকুরঝি আমায় এমন অপমান করতে ভরসা পায়; কিন্তু এ ভেলা ধরে তাকে ভাসতে শেখালে কে?

হিমানীর কথাগুলি ঠিক সরলা বঙ্গললনার মত মনে হইতেছে না, সে 'বাহাদুরী কাঠ' চেনে, তাহার ব্যবসায়ে সে পাকা জহুরী। বেচারী সুধীশের ভাগ্যে বহু দুর্ভোগ আছে তাহা আমরা কল্পনা করিয়া লইতেছি। উপন্যাসটি বসুমতীর আসর মাৎ করিবে তাহা বলাই বাহুল্য।

আদর্শ শিল্প মূলধন যোগান প্রতিষ্ঠান—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। শিল্প - প্রতিষ্ঠানগুলিতে—মূলধন যোগান প্রভৃতি সমস্যা লইয়া লেখক আলোচনা করিয়াছেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে এই ধরণের প্রবন্ধ জনশিক্ষার সহায়ক।

স্বপ্ন—শ্রীইলারাণী মুখোপাধ্যায়। গল্প, রচনাটিতে সস্তা stunt ও প্যাঁচ আছে, শুধু গল্প পড়িয়া যাহারা খুশী তাহাদের ইহা ভাল লাগিতে পারে। আমাদের ভাল লাগে নাই, ইহাই বলিতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ—শ্রীকালিদাস রায়। রবীন্দ্র সম্বন্ধীয় বহু মূলী প্রবন্ধের মধ্যে ইহা একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। কবির পূর্ণাঙ্গ প্রতিভার যে পরিচয় লেখক দিয়াছেন তাহা সুন্দর হইয়াছে। একস্থানে লেখক বলিতেছেন—"keats ছিলেন ইন্দ্রিয়াত্মক সৌন্দর্য্যের (sensuous beauty) উপাসক—রবীন্দ্রনাথ যৌবনেই সে স্তর অতিক্রম করিয়াছেন। Shelly ছিলেন অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য্যের (Transcendental beauty) উপাসক, প্রৌঢ়ত্বের আগেই তিনি সে স্তর পার হইয়াছেন, Browning-এর জ্ঞানমিশ্র ভক্তিবাদ, বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ববোধ ও বিশ্বাত্মকতা তাঁহার খেয়া রচনার পূর্ব্বেই তাঁহার কাব্যে অসামান্য বাণীরূপলাভ করিয়াছে। কালিদাসের সৌন্দর্য্যাদর্শ ও রচনার অলঙ্কারাঢ্য পারিপাট্য তাঁহার সাহিত্য সৃষ্টির একটা অঙ্গমাত্র। রবীন্দ্রনাথের প্রৌঢ়কালের প্রথম যুগ পর্য্যন্ত যে সকল রচনা সেই সকল রচনার সহিত এই সকল কবির রচনার তুলনা চলে। তারপর যখন তিনি মহারহস্যময় mystic height-এ উত্তীর্ণ হইলেন—তখন তাঁহার প্রতিভার অভ্রভেদী গৌরীশঙ্করের সহিত আর কাহার তুলনা হইবে।"

চাকুরীর টান—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক। চমৎকার কবিতা।

কালমেঘ—শ্রীনীলকণ্ঠ দাশ শর্ম্মা। গল্পের শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া মনে হইল, লেখক কোথাও মাত্রাজ্ঞান ঠিক রাখিতে পারেন নাই। মঞ্জুর মৃত্যুর ব্যাপারটি যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, গল্পের সুরটি কিন্তু এই পরিণতির সহিত নিজেকে মিলাইতে পারে নাই। এই দিক দিয়া ইহা ব্যর্থ হইয়াছে। কয়েকটি ঘটনার মধ্য দিয়া সস্তা বটতলা-সুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় পাইয়াছি।

অতিথি—শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়। কবিতা

আসিলে তুমি উচ্চ হাসি হাসিয়া
নাড়িয়া চুল উড়ায়ে বায়ে অঞ্চল
জুড়িয়া দিলে আমোদ কত বাড়িতে
কাকীমাদের সঙ্গে হয়ে চঞ্চল

দোলায়মান অঞ্চল ও চুলের আঘাতে যাঁহারা মূর্চ্ছিত হন সেই ক্ষীণস্নায়ু কবিকুলের ঔষধ কি তাহা কেহ বলিতে পারেন? লেখক 'ছোলা ও ছাতুর' প্রচুর শ্রাদ্ধ করিয়া ছাড়িয়াছেন তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি কিন্তু 'অলিয়া গেল পিত্ত' ইহার তথ্য বোধগম্য হইতেছে না।

পিটুনী মাষ্টার—শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়। সেকালের পল্লীকথা। রচনাটি বেশ উপভোগ্য হইতেছে।

মামার কীর্ত্তি—শ্রীযামিনীমোহন কর। কীর্ত্তিমান মামার অভিযানের কাহিনী লেখক সুন্দর ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

—শূলপাণি

১৩৩৬ সালের ২২শে অগ্রহায়ণ প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের অধ্যাত্ম-জননী শ্রীশ্রীরাধারাণী দেবীর তিরোভাবের পর হইতে সঙ্ঘ-সন্তানমণ্ডলী প্রতি বৎসর ২২শে অগ্রহায়ণ তারিখে অশরীরিণী মাতৃশক্তির তিরোভাবোৎসব সম্পন্ন করিয়া আসিতেছিল। ১৩৪৭ সালের ২২শে পৌষ একাদশ বর্ষ পূর্ণ হওয়ায় চন্দননগর প্রবর্ত্তক আশ্রমে নবনির্মিত মাতৃমন্দিরে পুণ্যময়ী মাতৃপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হয়। মাতৃ-সাধনার দ্বাদশ বর্ষে বিশিষ্ট অধ্যাত্ম প্রেরণায় ২২শে

নব-নির্মিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা মাতৃ-প্রতিমা

অগ্রহায়ণের তিরোভাবোৎসব রূপান্তরিত করিয়া ২২শে পৌষ ইষ্ট ও ইষ্টশক্তির সংযুক্ত নবাবির্ভাবোৎসব সম্পন্ন করাই স্থির হয়। ইহাতে জড়দেহের মৃত্যু-সংস্কারমুক্ত হইয়া অতঃপর সঙ্ঘ পরিচ্ছন্ন চিন্ময়ী মাতৃশক্তিকে আশ্রয় ও আরাধ্য করিয়াই চলিবে।

এই হেতু এবার ১৭ই পৌষ হইতে ২২শে পৌষ এক অনাড়ম্বর স্বচ্ছ আধ্যাত্মানুভূতির মধ্য দিয়া এই সংযুক্ত উৎসব চন্দননগর প্রবর্ত্তক আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি-বৎসর এই সময়ে যে দীক্ষা-যজ্ঞ হয়, তাহাও বর্ত্তমান দুর্য্যোগের প্রতিকূলে আব্‌হাওয়ার জন্য বন্ধ থাকে। প্রায় অর্দ্ধ শত দীক্ষার্থী নরনারীকে সঙ্ঘগুরু যথাযোগ্য নির্দ্দেশ প্রেরণ করেন। ২১শে পৌষ পূজনীয় সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতার পৌরোহিত্যে যে প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ-শিক্ষক-সম্মেলন হয়, তাহাতে ভারতীয় সংস্কৃতিমূলক জাতিগঠনের অনুকূল মস্তিষ্ক-প্রস্তুতির যুক্তিসহ নির্দ্দেশ সভাপতি উপস্থিত শিক্ষক-মণ্ডলীকে প্রদান করেন।

২২শে পৌষ অপরাহ্নে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তী[র্থের] পৌরোহিত্যে সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল রায়ের ষষ্টিতম [বা]র্ষিকী উৎসব সম্পন্ন হয়। সঙ্ঘগুরুর জন্মতিথি উপল[ক্ষে] পল্লী নরেন্দ্র মল্লিক একখানি ত্রিবর্ণ ছবি উপহার দেন এ[বং] সময়োপযোগী সুচিন্তিত একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সঙ্ঘ[গুরু] ভারতীয় অমর সংস্কৃতির স্বরূপ ইতিহাস, দর্শন ও যুক্তি[র আ]কারে সকলের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন। তিনি বলে[ন], সংস্কৃতি সাম্প্রদায়িকতা নহে; পরন্তু অপৌরুষেয় মতবা[দের] ভূমার পটভূমিকার উপর এই বিশ্ব-মানবের গ্রহণযোগ্য সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত; ভারতীয় সংস্কৃতির উপর সত্যকার ভারত-জাতির অভ্যুত্থান শ্রেয়স্কর হইবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন। ন্যায়তীর্থ মহাশয় প্রাঞ্জল ভাষায় ভারত-সংস্কৃতির শাস্ত্রানুগ ব্যাখ্যা করেন।

সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল রায়

২৩শে পৌষ প্রাতঃকালে সঙ্ঘগুরু এক বৎসরের জন্য চন্দননগর প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ হইতে দূরে থাকিবার সঙ্কল্প লইয়া চন্দননগর পরিত্যাগ করেন। বিগত দশ বৎসর হইতেই তিনি এই সঙ্কল্পের কথা সঙ্ঘ ও সাধারণ্যে জানাইয়া আসিতেছিলেন। ইহা সঙ্ঘসন্তানগণের পক্ষে বিশেষ মর্ম্মন্তুদ বেদনাদায়ক ঘটনা। এই আসন্ন বিরহ-সন্তাপপূর্ণ আব্‌হাওয়ার মধ্যে এবারকার উৎসব আগাগোড়া অশ্রুসিক্ত ও করুণ হইয়া উঠিয়াছিল। সঙ্ঘসৃষ্টির স্রষ্টাপুরুষের পক্ষে স্বকীয় সৃষ্টিকে স্বপ্রতিষ্ঠ, স্বপুষ্ট, স্বাভিব্যক্ত ও আত্মনির্ভরশীল দেখিবার জন্য জীবিতকালেই শুধু সম্বন্ধের আন্তর প্রত্যয় লইয়া এইরূপ দূরে সরিয়া দাঁড়ান সৃজনের ইতিহাসে সত্যই অভিনব। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘকে পৌরুষবাদমুক্ত করিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির মর্ম্মনিহিত অপৌরুষেয় ভাবাশ্রয়ী ও সঙ্ঘবিজ্ঞানসিদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য তিনি যে নির্ভীক পদক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা সঙ্ঘসন্তানগণের সাধ্য হইলেও, ইহা সিদ্ধ করিয়া তোলাই হইবে সঙ্ঘগুরুর অভিপ্রায়সিদ্ধি। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের দায়িত্ব ইহাতে বহুগুণে বর্দ্ধিতই হইল।

ভাগলপুরে হিন্দু মহাসভা

শ্রীমনুজচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী

ভাগলপুরে হিন্দু মহাসভার ত্রয়োবিংশ বার্ষিক অধিবেশন নিষিদ্ধ করিয়া বিহার গভর্ণমেণ্ট উক্ত উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত প্যাণ্ডাল ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়া আমরা বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইলাম এবং আইন অমান্য করিব বলিয়া দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলাম। অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দ ডাঃ মুঞ্জে, শ্রীযুত দেশপাণ্ডে, শ্রীযুত খেতাস, কেৎকার প্রভৃতি কলিকাতায় ছুটিয়া আসিলেন; আমরা ওয়ার্কিং কমিটির এক সভায় নিজ নিজ ভার গ্রহণ করিয়া প্রস্তুত হইলাম।

২২শে ডিসেম্বর আমি এবং শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ী, এম, এল, এ, একত্রে ভাগলপুর অভিমুখে যাত্রা করি। পথিমধ্যে নলহাটি ষ্টেশনে আশুবাবু গোপনে অবতরণ করেন, কারণ নলহাটিতে আমাদের স্বেচ্ছাসেবক শিবির প্রস্তুত হইয়াছিল। কথা ছিল আশুবাবু তাহাদের বিভিন্ন পথে ভাগলপুর প্রেরণ করিবেন। রাত্রি আন্দাজ চারিটার সময় আমি ষ্টেশনে অবতরণ করিয়াই বুঝিলাম—গোয়েন্দা পুলিশ লক্ষ্য করিতেছে। আমার মাথায় টুপি ছিল, হিন্দিও ভাল বলিতে পারি, অতএব বাঙ্গালী বুঝা শক্ত ছিল। ষ্টেশনেই ছদ্মবেশে মহাসভার কর্ম্মী শ্রীযুত শরৎচন্দ্র গুহ অপেক্ষা করিতেছিলেন—তিনি পাশ দিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিয়া গেলেন "সাবধান।" আমি বিনা বাক্যব্যয়ে স্থানীয় লোকের ন্যায় স্বাভাবিকভাবে টমটমে চাপিয়া তিন মাইল দূরবর্ত্তী নাথনগর রওনা হইলাম। সকাল হইতেই দেখিলাম, দলে দলে অশ্বারোহী শাস্ত্রীদল তিন জন গোরা সৈনিকের নেতৃত্বে সমস্ত শহরে আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়া বেড়াইতেছে, কোথাও ভিড় দেখিলেই লাঠি লইয়া তাড়া করিতেছে। প্রত্যেক মোড়ে ৮ জন করিয়া সিপাহী। বৈকাল বেলা শুনিতে পাইলাম, কহলগাঁয়ে আশুবাবু গ্রেপ্তার হইয়াছেন। ষ্টেশনের দিকে বহু লোক ছুটিল। পুলিশ ঘোড়া হাঁকাইয়া সকলকে বিতাড়িত করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমশঃ প্রত্যেক ট্রেণেই বহু ডেলিগেট গ্রেপ্তার হইতে লাগিল, কেহই বিশেষ নিষ্কৃতি পাইলেন না। ২৩শে ডিসেম্বর এই ভাবেই গেল। পরদিন ২৪শে প্রাতঃকালেই দলে দলে প্রভাত ফেরী বাহির হইল, শহরের প্রত্যেক বাড়ীতে মহাসভার পতাকা উড়িতে লাগিল, এবং সমস্ত দোকান বাজার বন্ধ হইয়া "হরতাল" হইল। এ রকম হরতাল বড় একটা দেখা যায় নাই। দোকান বাজার বন্ধ অথচ পথে জনস্রোতের অবধি নাই।

পুলিশ এবং স্থানীয় 'সিভিক গার্ড'গণ শান্তিরক্ষার জন্য ছুটাছুটি করিতেছিল। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে খবর আসিল "গয়া" ষ্টেশনে পথিমধ্যে সভাপতি বীর সাভারকর একশত ডেলিগেটসহ গ্রেপ্তার হইয়াছেন। অতঃপর মিঃ এন্, সি, চ্যাটার্জি, ডাঃ মুঞ্জে ও প্রায় শতাধিক বাঙ্গালী ডেলিগেটকে Van-এ করিয়া পুলিশ ষ্টেশন হইতে লইয়া যাইতেছে দেখিয়া স্থানীয় জনগণ তুমুল 'বন্দে মাতরম' 'হিন্দু মহাসভা কী জয়' প্রভৃতি জয়ধ্বনিতে আকাশ কাঁপাইয়া তুলিল। সমগ্র সহরবাসী যেন উন্মত্ত হইয়া পথে পথে শোভাযাত্রা বাহির করিতে লাগিল। অবস্থা রাজশাসনের প্রায় বাহিরে। সন্ধ্যার মধ্যে প্রায় ৫০০ শত গ্রেপ্তার হইয়া গেল। সহরে ১৪৪ ধারাও জারী হইল।

রাত্রি ১২টার সময় প্রত্যেক প্রদেশ হইতে পাঁচজন করিয়া প্রতিনিধি গ্রহণ করিয়া গোপনে যে একটি 'ডাইরেক্ট্ এ্যাকশন্ কাউন্সিল' গঠিত হইল, তাহাতে লালা নারায়ণ দত্ত, সি, কলিকার এম, এল, এ, বালকৃষ্ণ শর্ম্মা, পান্নালাল বাস, সর্দ্দার গোবিন্দ সিং, মনুজচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী, মেধাবিৎ সিং, শরৎচন্দ্র গুহ, জি, ভি, সিকদার, পি, বি, ছিড়ে, মিঃ গোখলে, এন, কেলকার এবং রামকৃষ্ণ পাণ্ডে এই অধিবেশনের জন্য ডিক্টেটর নির্ব্বাচিত হইলেন। আগামী কাল ২৫শে ডিসেম্বর অধিবেশনের নির্দ্দিষ্ট তারিখ হইতে ২৭শে পর্য্যন্ত এই ডিক্টেটরগণ আইন অমান্যের জন্য প্রকৃত অপরাধী হইবে। পুলিশের এত ধরপাকড় সত্ত্বেও প্রায় ১২০০ প্রতিনিধি মিলিত হইতে পারিয়াছিল। প্রত্যেকে রাত্রি একটার সময় পরস্পর বিদায় লইয়া আসন্ন অধিবেশনের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

ভাগলপুর সহরের উৎকণ্ঠিত চেহারা। সকলেই ব্যগ্র, কি হয়, কি হয়। ২৫শে প্রত্যুষ হইতেই প্রভাত ফেরী আরম্ভ হইল। পথে দশ হাত অন্তর একজন করিয়া সিপাহী। যে পথ দিয়া যাই, কেবল সিপাহী আর সিপাহী। তাহারা লাঠি চালনা করিয়া বার বার জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দিতেছে, পুনরায় অন্যপথে তাহারা আবার মিলিত হইতেছে। সমস্ত সহর হিন্দু মহাসভার জয়-ধ্বনিতে প্রকম্পিত। খবর আসিল, অনারেবল ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি কহলগাঁয়ে আটক হইয়াছেন, তিনি বাংলার মন্ত্রী হিসাবে আসেন নাই, তিনি আসিয়াছেন অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং প্রেসিডেণ্ট হিসাবে; তিনি হয়ত মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিয়া সমস্ত বিহার প্রদেশ পরিভ্রমণ করিবেন। এই সংবাদের পর মানুষকে আর ঘরে রাখা গেল না—শত শত বিহারী, মাড়োয়ারী, জাঠ, পথে বাহির হইয়া "হিন্দু জাতি কী জয়" চীৎকার আরম্ভ করিল। পুলিশ কোন দিক সামলাইয়া উঠিতে পারিল না। আমাদের কার্য্যসূচীও তাহাদের অজ্ঞাত ছিল—অতএব আমরা বেলা ১টার মধ্যে সুজাগঞ্জে দেবীবাবুর ধর্ম্মশালায় বীর সাভারকর প্রেরিত ৫টি প্রস্তাব, প্রায় দেড় হাজার প্রতিনিধি ও দর্শকের সম্মুখে উত্থাপন করিয়া গৃহীত করিলাম। বেলা ২টা অবধি বক্তারা বক্তৃতা করিতেছেন, এমন সময় পুলিশ জানিতে পারিয়া সেখানে হানা দিল। কিন্তু তখন সভা শেষ হইয়া গিয়াছে, বীর সাভারকরের অটল সঙ্কল্প রক্ষিত হইয়াছে। হিন্দুর নিকট তখন প্রাণ তুচ্ছ, মানসম্ভ্রম রাখিবার স্থান নাই। জয়ধ্বনিতে দিক বিদীর্ণ করিতে করিতে বিরাট

শোভাযাত্রা "লজপত রায় পার্কের" সম্মুখে উপস্থিত হইল। অগণ্য অশ্বারোহী সৈন্য পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। শরীর বিপন্ন করিয়া মহারাষ্ট্র যুবক চোড়নকার ও তাঁহার সাত জন সঙ্গী ভীম বিক্রমে তাহাদের অতিক্রম করিয়া গিয়া, বেড়া ডিঙ্গাইয়া লজপত পার্কের মধ্যস্থলে হিন্দু মহাসভার গৈরিক পতাকা প্রোথিত করিলেন। এই অসাধ্য সাধন দেখিয়া রাজপুরুষগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। অতঃপর পুলিশ তাঁহাকে বিলক্ষণ প্রহার করিল বটে, কিন্তু চোড়নকার তাহা হাসিমুখেই সহ্য করিলেন। সহরের লোক মহাসভার এই সাফল্যে দলে দলে প্রত্যেক মোড়ে সভা করিতে আরম্ভ করিল ও প্রস্তাব সকল পাশ করিল। পুলিশ প্রতিবারই তাহাদের ছত্রভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিল, কিছু কিছু গ্রেপ্তারও করিল; কিন্তু বিপুল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জনতা তাহাদের আয়ত্বের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। সকলেই যেন উন্মত্ত, সকলেই চীৎকার করিতেছে 'হাম্‌কো পাক্‌ড়ো,' 'হাম্‌কো পাক্‌ড়ো!' ভারতবাসীর মৃতদেহে যেন প্রাণসঞ্চার হইয়াছে। বরিশালে অশ্বিনী দত্তের সভায় স্যার সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে এই দৃশ্যই একবার দেখা গিয়াছিল। পুনরায় ভাগলপুরে ১৯৪১ খৃঃ আর একবার যেন সেই দৃশ্যেরই পুনরাবৃত্তি ঘটিল। মহাসভার প্রতিনিধিগণকে আহার করাইবার জন্য সকলেই অর্থভাণ্ডার খুলিয়া দিলেন 'যো মাংতা খিলাও। দশ হাজার আদমি খিলাও।"

পরদিন ১০টায় বিষয় নির্ব্বাচনী সভা। আবার পুলিসের নিষ্ঠুর আত্মপ্রকাশ, সভা পণ্ড করিবার চেষ্টা, আবার শত শত ব্যক্তি গ্রেপ্তার; ঢাকার প্রতিনিধি শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় নির্ম্মমভাবে প্রহৃত হইয়া তৎক্ষণাৎ অচেতন হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, [illegible] নিষ্পন্নভাবে প্রোগ্রাম অনুযায়ী মহাসভার প্রত্যেকটি কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল। ২৭শে সকালেও তাহারই পুনরাবৃত্তি, কিন্তু এই [illegible] দিনই স্থানীয় রাজপুরুষগণ প্রায় হাল ছাড়িয়া দিলেন বলিয়া মনে হইল। সুজাগঞ্জ, নয়াবাজার, আদমপুর, বুড়ানাথ মন্দির, নানা স্থানে সভা হইয়া সগৌরবে মহাসভার ত্রয়োবিংশ বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন হইয়া গেল। রাজপুরুষের এমন নিদারুণ বিবেচনাহীন বাধা সত্ত্বেও এমন সফলতা ভারতবর্ষের ইতিহাসে নূতন বলিলে অন্যায় হইবে না। কলগ্রামে আটক অনারেবল্ ডাঃ শ্যামাপ্রসাদকে সমস্ত বিবরণ নিবেদন করিলাম এবং তাঁহার নিকট সানন্দে স্বীকার করিলাম, তিনি রাজসচিব হইয়াও বিহার সরকারের বন্দীত্ব গ্রহণ করিয়া ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিলেন।

বৈদেশিক সংবাদ

এ্যাক্সিস্‌-বিরোধী চুক্তি স্বাক্ষরিত :

ওয়াশিংটনের একটি সংবাদে প্রকাশ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, রাশিয়া, চায়না, নেদারল্যাণ্ডস এবং অন্যান্য এ্যাক্সিস্ বিরোধী ছাব্বিশটি রাষ্ট্র সমবেতভাবে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছে। এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ শত্রুর বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তি নিয়োজিত করিবে এবং এককভাবে কোনপ্রকার যুদ্ধ-বিরতি বা শান্তিপত্র স্বাক্ষর করিবে না। এই এ্যাক্সিস্‌-বিরোধী ঘোষণায় ভারতবর্ষ একজন স্বাক্ষরকারী, বর্ত্তমানে স্যার গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী ভারতের পক্ষে এই ঘোষণায় স্বাক্ষর করিয়াছেন।

কানাডা কর্ত্তৃক বৃটেনকে ঋণমুক্তি দান :

যুদ্ধের জন্য সাজ-সরঞ্জাম, খাদ্য এবং অন্যান্য কাঁচামাল বাবদ কানাডার বৃটেনের নিকট প্রায় ১৫০ কোটি ডলার পাওনা হইয়াছে। প্রকাশ কানাডা বৃটেনকে এই ঋণ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

মার্কিনের কাব্য-প্রীতি :

আমেরিকার প্রায় পঞ্চাশখানি সাময়িক পত্রে কেবলমাত্র কবিতা প্রকাশিত হইয়া থাকে, ইহা ছাড়াও কুড়িখানি সাধারণ সাময়িক পত্রে ও শতাধিক অনতি-প্রচারিত পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

স্বাদেশিক সংবাদ

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার তারিখ পরিবর্ত্তন :

বর্ত্তমানে যে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চ্যান্সেলার ও সিণ্ডিকেট পরামর্শ দিয়াছেন যে, কলিকাতা, চট্টগ্রাম ও আসানসোল এবং এই সকল স্থানের ত্রিশ মাইল ব্যাসার্দ্ধের মধ্যে অবস্থিত অনুমোদিত কলেজ ও স্কুলসমূহের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি আগামী ১৮ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত বন্ধ রাখিতে পারেন। তাঁহারা আরও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইণ্টারমিডিয়েট, ম্যাট্রিকুলেশন এবং বি-এ, ও বি, এস্‌-সি পরীক্ষা পূর্ব্ব ঘোষিত তারিখের পরিবর্ত্তে আই-এ ও আই, এস্‌-সি—১৬ই মার্চ্চ, ম্যাট্রিকুলেশন—১৫ই এপ্রিল, বি-এ ও বি এস্‌-সি—১লা মে আরম্ভ হইবে।

লীগ নেতার হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ :

আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের জনৈক প্রবীন নেতা এবং প্রচারক ২৮শে সেপ্টেম্বর শিলং সেণ্ট্রাল আর্য্য সমাজ মন্দিরে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। পণ্ডিত দীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী ইহাকে শুদ্ধি-যজ্ঞ দ্বারা গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন ও যজ্ঞোপবীত দান করিয়াছেন। ইহার বর্ত্তমান নাম হইয়াছে শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

কলিকাতার নলকূপের সংখ্যা :

প্রকাশ, কলিকাতায় ২ হাজার ৫ শত নলকূপ বসাইবার জন্য কর্পোরেশন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ১ হাজার ৫৬৭ নলকূপ ইতিমধ্যেই খনন করা হইয়াছে।

শান্তি ইন্‌ষ্টিটিউট—রচনা প্রতিযোগিতা :

২৬।১।এ, শশিভূষণ দে ষ্ট্রীটস্থ শান্তি ইন্‌ষ্টিটিউট কর্ত্তৃক রচনা প্রতিযোগিতার উদ্যোগ করা হইয়াছে। এই প্রতিযোগিতার জন্য ১১টি পদক দেওয়া হইবে। প্রতিযোগিগণকে রচনা বাংলা ভাষায় ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া ১৭ই মাঘ, ১৩৪৮ (ইং ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৪২) সালের মধ্যে পাঠাইতে হইবে। প্রথম স্থান অধিকার করিতে হইলে শতকরা অন্ততঃ পঞ্চাশ নম্বর পাইতে হইবে। সকলেই এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারেন, কোন প্রবেশ মূল্য নাই। বিস্তারিত বিবরণ ইন্‌ষ্টিটিউটের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জ্ঞাতব্য।

পরলোকে স্যার আকবর হায়দরী :

পক্ষাধিককাল রোগ ভোগের পর গত ৮ই জানুয়ারী, স্যার আকবর হায়দরী পরলোকগমন করিয়াছেন। রাইট অনারেবল্ স্যার আকবর হায়দরী গত জুলাই মাসে বড়লাটের সম্প্রসারিত শাসন পরিষদের সদস্য নিযুক্ত

পরলোকগত স্যার আকবর হায়দরী

হইয়াছিলেন। ভারত সরকারের প্রচার বিভাগের ভার তাঁহার উপর ছিল। তিনি হায়দরাবাদ রাজ্যের শিক্ষা ও অর্থ বিভাগের বহুল সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। বিদ্যোৎসাহী ও দার্শনিক হিসাবেও ইনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়া গিয়াছেন। ইনি শ্রীঅরবিন্দের একজন বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন।

বিবেকানন্দ জন্মোৎসব :

গত ৯ই জানুয়ারী শুক্রবার যুগাচার্য্য বিবেকানন্দের ৮০তম জন্মোৎসব শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা মঠে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে পূজাগৃহে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি লোকগুরুগণের আলোকচিত্র ও মর্ম্মরমূর্ত্তি পুষ্পমাল্যাদিতে ভূষিত হইয়া এবং পূজাগৃহ ধূপ-ধূনা ও চন্দনের গন্ধে আমোদিত হইয়া এক ভক্তিমিশ্র অপূর্ব্ব ভাবের উদ্রেক করিয়াছিল। মঠের সম্পাদক স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ 'রামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ' হইতে নির্ব্বাচিত অংশ পাঠ করেন। এই উপলক্ষে প্রায় ছয় শত দরিদ্র-নারায়ণ ও ভক্তগণকে প্রসাদ দানে তুষ্ট করা হয়। মঠের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য কর্ম্মীগণ দরিদ্রনারায়ণের ও ভক্তগণের সেবায় সর্ব্বদা যত্নপরায়ণ ছিলেন।

নূতন জরুরী বিধান :

সম্প্রতি কয়েকটি জরুরী বিধান জারী করিয়া প্রাদেশিক সরকারের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। একটি বিধানের বলে তাঁহারা ঘোষিত অঞ্চলে লুট, অগ্নিদান, অস্ত্রদ্বারা গুরুতর আঘাত, বিশ্বাসঘাতকতা এবং পাশবিক অত্যাচারের জন্য মৃত্যুদণ্ড বা বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। আর একটি বিধানে বলা হইয়াছে যে, বিশেষ জরুরী অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট যে কোন অঞ্চলে স্পেশাল কোর্ট গঠন করিয়া গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি অপরাধের দ্রুত ও সরাসরি বিচার করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। যাহাতে কেহই আতঙ্কজনক সংবাদ রটাইতে না পারে তাহার জন্য প্রাদেশিক সরকারকে সেন্সার নিয়োগের এবং ঐ সম্পর্কিত অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

আসামে শাসনতন্ত্র স্থগিত :

আসামে শাসনতন্ত্র স্থগিত রাখিয়া গবর্ণর স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, মিঃ রোহিণীকুমার চৌধুরী কংগ্রেসদলের সর্ব্বাপেক্ষা সমর্থন লাভ করিয়া কোন মন্ত্রি-সভা গঠন করিলে উহা স্থায়ী হইবে না এবং যুদ্ধ সম্পর্কিত ব্যাপারে মন্ত্রিসভার অস্থায়িত্ব অত্যন্ত গুরুতর বিষয় হইবে। পক্ষান্তরে স্যার মহম্মদ সাদুল্লা অবিলম্বে আইন সভার সম্মুখীন হইতে পারেন এইরূপ গরিষ্ঠসংখ্যক (majority) সদস্যের সমর্থন নাই। এইরূপে একটির পর একটি মন্ত্রিসভা গঠনের সকল সম্ভাবনা ব্যর্থ হওয়ায় গবর্ণর এই প্রদেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন।

কলিকাতায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা :

সম্ভাবিত বিমানাক্রমণে নিরাশ্রয়দিগের আশ্রয় ও আহারের ব্যবস্থার জন্য কলিকাতায় বিভিন্ন অঞ্চলে

কর্পোরেশন এ যাবৎ প্রায় ৪৫টি বাড়ী নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, কর্পোরেশন কর্ত্তৃক ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কলিকাতার বাহিরে শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদিগের জন্য ১২টি আবাসস্থল নির্ম্মাণের পরিকল্পনা বাংলা সরকার অনুমোদন করিয়াছেন।

* * * *

'ইউনাইটেড প্রেস' জানিতে পারিয়াছেন যে, কলিকাতা সহরে বিমানাক্রমণের ফলে যাহারা গৃহহীন হইবে, তাহাদিগকে সাহায্য দানের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশন যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহাতে এককালীন ২,৩৫,৩০০ টাকা এবং প্রতি মাসে ২,৭৯,০৬০ টাকা ব্যয় হইবে। এই পরিকল্পনায় কলিকাতা সহরকে ৩২টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করিয়া ওয়ার্ড কমিটি গঠিত হইয়াছে।

প্রবাসী-বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন:

গত ২৬শে, ২৭শে ও ২৮শে ডিসেম্বর কাশীতে প্রবাসী-বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। অনিবার্য্য

শ্রীযুত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কারণ বশতঃ নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উপস্থিত থাকিতে অসমর্থ হন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় অধিবেশনের প্রথম দিকে সভাপতিত্ব করেন। পরে শ্রীযুত অতুল গুপ্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সাহিত্য শাখার সভাপতি শ্রীযুত অতুল গুপ্তের অভিভাষণের মধ্য দিয়া প্রবাসী-বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ব্যাপকতর উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তার কথা পরিস্ফুট হইয়াছিল। ইতিহাস শাখায় ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন, বিজ্ঞান শাখায় ডাঃ অমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দর্শন শাখায় ডক্টর মহেন্দ্রনাথ

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ

সরকার, শিল্প শাখায় শ্রীযুত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, বৃহত্তর-বঙ্গ শাখায় শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত, মহিলা শাখায় শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী, রবীন্দ্র-স্মৃতিবাসরে শ্রীযুত ক্ষিতিমোহন সেন, শিশু সাহিত্যে শ্রীযুত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ও সঙ্গীত শাখায় শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর অভিভাষণ বিশেষ আকর্ষণীয় হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে ডাঃ ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রী সম্মেলনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। বর্ত্তমান অনিশ্চিত অবস্থার জন্য দর্শক ও প্রতিনিধি অল্প সংখ্যায় উপস্থিত হইলেও সম্মেলন বেশ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

ব্যায়ামবীর কৃষ্ণকালী বন্দ্যোপাধ্যায় :

রাঁচি যোগদা ব্যায়ামশালা শরীরচর্চ্চার দিক দিয়া বিহার অঞ্চলে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহার পরিচালক কৃতী ব্যায়ামবীর কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতার বিষ্ণুচরণ ঘোষের প্রিয় ছাত্র। ইহারই ঐকান্তিক চেষ্টায় ১৯৩৮ সাল হইতে 'অল বিহার বডি বিল্ডিং' প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমান অঞ্চলেও তাঁহার নেতৃত্বাধীনে কয়েকটি ব্যায়ামাগার চলিতেছে ইনি পরমহংস যোগানন্দের শিষ্য।

শ্রীযুত কৃষ্ণকালী বন্দ্যোপাধ্যায়

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক :

বারদোলীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটিতে গৃহীত প্রধান প্রস্তাবে মহাত্মা গান্ধীর উপর বোম্বাই প্রস্তাব অনুযায়ী যে দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছিল, উহা হইতে তাঁহাকে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। অপর এক প্রস্তাবে এই অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, কেবলমাত্র স্বাধীন ভারত জাতীয় ভিত্তিতে দেশরক্ষার ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইতে এবং মহাযুদ্ধ হইতে উদ্ভূত বৃহত্তর উদ্দেশ্যসমূহের পোষকতায় সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইতে পারে।

কমলালয় ষ্টোর্স-এ চিত্র প্রদর্শনী :

বড়দিনের অবকাশে কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন হইয়া থাকে। এ বৎসর যুদ্ধজনিত অনিশ্চয়তার জন্য কলিকাতায় বড়দিনের আসর ভাল জমে নাই। ইহা সত্ত্বেও ১৫৬ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটস্থ কমলালয় ষ্টোর্স-এর প্রচেষ্টায় যে চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন হইয়াছে তাহা নানা দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। এই প্রদর্শনীর মধ্য দিয়া বাংলা চিত্রশিল্পের একটা ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ পরিস্ফুট হইয়াছে এবং ইহা আনন্দ ও শিক্ষার প্রচুর রসদ যোগাইয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিত্রকলা বিভাগে বিভিন্ন খ্যাতনামা শিল্পীর কাজ স্থান পাইয়াছে। ইহা ছাড়াও ইনডিপেণ্ডেণ্ট গ্রুপে রবীন্দ্রনাথ, যামিনী রায় প্রভৃতির চিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তৈল চিত্র ও জল রং বিভাগগুলিতেও শক্তিশালী শিল্পী সমাবেশ হইয়াছে। এই চিত্রশালায় কয়েকজন উদীয়মান চিত্রশিল্পীর কাজ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ইহাদেরই মধ্যে শিল্পী শ্রীঅবনী সেনের চিত্রাবলী চিত্ররসিকগণের প্রশংসা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

সন্ধ্যা ৬টায় দোকান বন্ধ :

মাড়োয়ারী চেম্বার অফ কমার্স, স্বদেশী বস্ত্র ব্যবসায়ী সঙ্ঘ, ব্যবসায়ী সমিতি এবং দালালদের প্রতিনিধিবর্গের এক যুক্ত বৈঠকে বর্ত্তমান জরুরী অবস্থা বিবেচনায় সমস্ত দোকান এবং গদি সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় বন্ধ করার সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

যুগ্ম সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী
প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ কর্ত্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত
এবং প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৫২।৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

অমৃতের আকর্ষণ

শিল্পী: শ্রীইন্দু গুপ্ত

ষড়বিংশ বর্ষ
১৩৪৮ সাল

ফাল্গুন

দ্বিতীয় খণ্ড
৫ম সংখ্যা

সাধন

মহাশক্তির বিশুদ্ধ যন্ত্র হও। চিৎশক্তিই জগৎ-নিয়ন্ত্রী মহাশক্তি। এই জীবনযন্ত্রেরও তিনিই অধিষ্ঠাত্রী মহাদেবী। জীবনের পঞ্চপ্রতিষ্ঠানে তিনিই সর্ব্বাগ্রে সুপ্রতিষ্ঠিতা হউন।

দেহ, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান, আনন্দ—এই পঞ্চপর্ব্ব আমাদের আধার যন্ত্র। অন্নময় দেহ, পঞ্চপ্রাণ, চতুরঙ্গ অন্তঃকরণ, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ—ইহার প্রতি ক্ষেত্রে মাতৃশক্তি আবির্ভূতা হইবেন। তাহার পূর্ব্বে তাহাদিগকে তিনিই বিশুদ্ধ পরিচ্ছন্ন করিয়া তুলিবেন। শোধনের যুগই যোগশক্তির প্রথম লক্ষণ।

আমি সিদ্ধ যন্ত্র হইব—ইহাই সাধকের স্থির সঙ্কল্প। শুদ্ধি সিদ্ধিরই অমোঘ বিধান। একনিষ্ঠ সঙ্কল্প অন্তরে ধারণ কর। ধৃত সঙ্কল্পশক্তিই বীর্য্য-রূপে ভিতর হইতে কার্য্য করিবে। শুদ্ধ বীর্য্যের প্রকাশ শুদ্ধ দেহে।

ধীরে ধীরে প্রাণ, মন, বুদ্ধি শক্তিরই অনুগত হইবে। বিশুদ্ধ বীর্য্য দেহকে স্থির, তার প্রতি তনু, প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে মন্ত্রশক্তিময় করিয়া তুলিবে। অধ্যাত্মমন্ত্রচৈতন্যই শক্তিসাধনার প্রথম অধ্যাত্মসোপান।

অধ্যাত্মজাগরণ

যত ঘোরতর বিপদ্ আজ আমাদের সম্মুখে, তত উৎকৃষ্টতর সুযোগে আমরা ইচ্ছা করিলে তাহাকে পরিণত করিতে পারি। ভারতের আজ সেই সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। কাহারও অনুগ্রহের প্রতীক্ষা নয়, আত্মবীর্য্যেরই জাগরণ ও প্রয়োগের সাধনা প্রয়োজনীয়। আমি যদি জাগ্রত সত্য হই, আমার শক্তিও জাগ্রত সত্য; আমি সৎ, নিত্য শক্তিমান্। এই শক্তি জড় নহে, চিৎশক্তি। এই সসীম আধারে যতক্ষণ আমার সান্ত আত্মবোধ, ততক্ষণ চিৎ-শক্তিও সান্তা, সীমাময়ী। দেহযন্ত্রের সীমায় সন্নিবদ্ধা চিৎশক্তিকেই কুণ্ডলিনীশক্তি তন্ত্র বলিয়াছে! কুলে অর্থাৎ আধারে কুণ্ডলিতা, তাই কুলকুণ্ডলিনী। যথাযোগ্য সাধনে এই ব্রহ্মময়ী সুপ্তা শক্তির জাগরণ অবশ্যম্ভাবী। অধ্যাত্মজাগরণেরই আজ শুভ সন্ধিযুগ ভারতে উপস্থিত। রাষ্ট্রমুক্তির কুরুক্ষেত্র-সংগ্রাম সম্মুখে রাখিয়াই তাই আমরা আত্মচৈতন্যের গীতা উচ্চারণ করিতে বলি।

আমার ভাবের ন্যায়, শক্তিও আমারই। ভাব ধ্যেয় ও জ্ঞেয়। শক্তি সাধনময়ী। শক্তির সাধনা প্রত্যেক জীবেরই অবশ্য করণীয়। শক্তিসাধনা ব্যতিরেকে জীবের অস্তিত্বরক্ষাও অসম্ভব। শক্তিহীন জাতি জীবনসংগ্রামে পরাজিত, বিমূঢ় ও অবসন্ন হইয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাইতে পারে। আমি অনন্ত শক্তিমান্—এই বোধ সত্য। চিৎশক্তি যখন বুদ্ধিক্ষেত্রে এই আত্মচৈতন্যের প্রকাশ করেন, তখন তিনি বিদ্যাময়ী মাতৃশক্তি। শক্তিসাধক দেহে মাতৃশক্তিরই আবাহন করেন। বিশ্বাস, সঙ্কল্প, আকুলতাসহায়ে তাঁহার এই আকর্ষণ নিদ্রিতা কুণ্ডলিনীর সুপ্তিভঙ্গ করে। দেবী জাগ্রতা হইয়া জীবদেহের পরতে পরতে ঊর্দ্ধমুখী চৈতন্যের উন্মেষ ও পরিস্ফুরণ ঘটাইয়া তুলেন। জীব আশ্রয়। শক্তি আশ্রিতা। এই বোধ সাধনার প্রথম ভূমি। শক্তির তখন মন্ত্ররূপ। আধারে গুরুদত্ত মন্ত্র-শক্তিই স্থির আশ্রয় পাইয়া, অবধারিত কার্য্য করিয়া চলে। মন্ত্রসিদ্ধ জগজ্জননীর বরপুত্র নির্ভয়চিত্তে মাতৃ-কার্য্যে আত্মপ্রয়োগ করে।

আমি জ্ঞ-স্বরূপ জ্ঞানঘন চৈতন্য। এই জ্ঞান চতুর্বিধ প্রকরণে আত্মপ্রকাশ করে। আজ্ঞান, বিজ্ঞান, সংজ্ঞান ও প্রজ্ঞান—চতুর্বেদের ইহাই চতুস্তত্ত্ব। "অহং ব্রহ্মাস্মি", "সোঽহমস্মি", "তত্ত্বমসি", "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম"—চারি বেদের এই মহাবাক্য-চতুষ্টয়ে আত্ম-জ্ঞানেরই মন্ত্রধ্বনি মুখরিত। সম্বুদ্ধা চিৎশক্তি পূর্ণ আত্মসমর্পণযোগীর হৃদয়ে এই চতুর্দ্ধা চিৎ-কলারই মর্ম্মপ্রকাশ করেন।

আজ্ঞান—দিব্য প্রাণ, কেনোপনিষৎ যাহাকে "প্রাণস্য প্রাণঃ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। বিজ্ঞান—দিব্য মন। ইহাই "super-mind", উপনিষদের "মনসো মনঃ"। সংজ্ঞান—সিদ্ধ ইন্দ্রিয়শক্তি। এই ইন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয়—"চক্ষুষশ্চক্ষুঃ, শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্" ইত্যাদি। প্রজ্ঞানই "বাচোহবাচঃ" অর্থাৎ বাক্ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সিদ্ধশক্তি।

"জ্ঞ"—চৈতন্যময় পুরুষ। প্রকৃতি—ব্যক্তাব্যক্তময়ী মাতৃশক্তি। যোগী তাঁহার প্রকৃতি-রচিত এই ব্যক্ত দেহ-মন প্রমুখ যাবতীয় যন্ত্রনিচয় অব্যক্তা মাতৃশক্তির সমীপে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া দিলে, অব্যক্ত চিৎলোক হইতে অফুরন্ত শক্তিরাজি নিঃসরিত হইয়া সর্ব্বাধার অভিষিক্ত করে। পুরুষ তখন শুদ্ধ দ্রষ্টৃস্বরূপ হন। ইহাই কেবল-চৈতন্য। তখন প্রকৃতিও চৈতন্যের অভিষেকে পরিপূর্ণ চিন্ময়ী। এই পুরুষ ও প্রকৃতি চিৎ ও অচিৎ-রূপে নয়, সৎ ও চিৎ-রূপেই তখন জীবনক্ষেত্রে মিলনের লীলারসে বিভোর হইয়া থাকেন।

সৎ ও চিতের মিলিত দেব-লীলাই "সচ্চিদেকং ব্রহ্ম" মন্ত্রের প্রতিপাদ্য মন্ত্রচৈতন্য। আত্মসমর্পণযোগীর হৃদয়ে এই মন্ত্রচৈতন্যই উদ্ভাসিত ও নিত্য স্ফুরিত হইয়া তাহাকে সর্ব্বকর্ম্মে দক্ষ ও মুক্তিসাধনার সিদ্ধযন্ত্রে পরিণত করিবে।

যে অধ্যাত্মজাগরণে ভারতের মুক্তিবিধান পরিকল্পিত, তাহাই মন্ত্রোপাসক জাতির নিকট অচিরাৎ প্রকাশিত হইবে। অন্যথায় অন্ধ মানবচেষ্টা প্রসূত যত কিছু উত্তেজনা ও আন্দোলন, তাহা অধিকতর দুশ্চিন্তা ও জটিলতার কারণ হইবে।

স্বাধীনতাদিবস

যাঁহারা অধ্যাত্মযোগী, তাঁহাদিগকেই আমরা আজ ভারতে জাতিনির্মাণের অগ্রণীরূপে দাঁড়াইতে আহ্বান করি। ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রাম অভিনব উপায়ে বিশ্বশক্তিই নিয়ন্ত্রিত করিয়া চলিয়াছেন। যাহা আপাতদৃষ্ট পথ, তাহা ভারতের নয়- উহা মিশ্রণ। এই মিশ্র নীতি দীর্ঘ যুগ আমাদিগকে কালক্ষয় ও শক্তিক্ষয় করাইয়াছে। আজ শক্তি-সংযমই প্রয়োজনীয়। স্বাধীনতা-সঙ্কল্পের ঘোষণায় কি ফল, যদি না সঙ্কল্পের ঘনবিগ্রহ অটুট সংহতিবীর্য্য আমরা অধিকার করিতে পারি। এই অধিকার বাহিরের দান নহে, ইহা আত্মশক্তিরই মূর্ত্ত প্রকাশ—অধ্যাত্মসাধনারই অনিবার্য্য অভিব্যক্তি।

ভারত স্বাধীন হইবে, এ কথা বহু বর্ষ, দীর্ঘ যুগ ধরিয়া প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। জাতির রাষ্ট্রপুরুষগণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই সঙ্কল্প বৎসরের পর বৎসর বারম্বার ঘোষণা করিয়া চলিয়াছেন। সঙ্কল্প-বাক্যের ভাষা-সংস্কার হইলেও, ভাব-মর্ম্ম ঠিক সমানই আছে। একই সঙ্কল্প-মন্ত্রের পুনঃপুনরুচ্চারণ, "আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী" ন্যায়ে কিছু যে প্রভাব সৃষ্টি করে না, তাহা নহে; জাতির সাধারণ চেতনায় ইহা একটা সংস্কারাত্মক রেখাপাত করে। এই সংস্কার কর্ম্মের প্রেরণা বলবতী করিলে আমরা সুখী হইব। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহা না হইলেও, ক্ষতি নাই। যদি মুষ্টিমেয় রাষ্ট্রসাধকও অন্তশ্চেতনার সবখানি দিয়া সঙ্কল্প-মন্ত্র বরণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রদীপ্ত ভাব ও প্রেরণা সর্ব্বসাধারণের মনেও যথাসম্ভব উৎসাহ সঞ্চার করিবে।

সঙ্কল্পের সীমা বাক্য নহে। ভাব ভাষা পাইয়াই সিদ্ধ হয় না। বাক্যের নির্দ্দেশ যে কর্ম্ম, তাহার নীতি আছে, প্রকরণ আছে। জাতির স্বাধীনতা-সঙ্কল্পকেও যোগ্য নীতি ও প্রকরণ আবিষ্কার করিয়া আপনাকে সিদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। স্বাধীনতা-সঙ্কল্প জীবনে সাধন করিবার সর্ব্বোত্তম নীতি কি? প্রকরণ কি? ইহা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে। মতভেদে পথভেদও স্বাভাবিক। আজ নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসমিতি যে রাষ্ট্রসাধনার লক্ষ্য ও কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাহার মূল্য নেতৃগণেরই চিন্তা-বিচারে দেখা যায় বহুধাবিচিত্র ও বিভিন্ন। কিন্তু ইহাতেও ভাবনার কারণ নাই, যদি দেখি—প্রত্যেক মত ও পথের বহুসংখ্যক মানুষ এক একটি বিশেষ ভাবসাধনার যন্ত্রস্বরূপ সুদৃঢ় সংহতিচক্র নির্ম্মাণ করিয়া তুলিয়াছেন। আদর্শ সিদ্ধ করিতে হইলে, চাই উপযুক্ত সংহতি-যন্ত্র। ইহাই স্বাধীনতার সাধন—তাহার সর্ব্বপ্রথম কর্ম্ম-প্রকরণ। সংহতি সিদ্ধ হইলে, যে কোনও কর্ম্মনীতি সফল হওয়া সুসাধ্য হইবে।

স্বাধীনতা লক্ষ্য, উপায় সংহতি। তাই সঙ্কল্পের পর সংহতির আবির্ভাব যেখানে, সেখানে সাধনার দ্বিতীয় পর্ব্ব সূচিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। কংগ্রেস এক বিরাট্ সংহতি, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। এই রাষ্ট্রীয় সংহতি—স্বাধীনতা-সাধনারই জন্য। দেশব্যাপী স্বাধীনতাদিবস-পালনে এই সংহতিশক্তির প্রেরণা ও প্রভাব দেশময় বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। জাতির জীবনে তাহা একটা সাড়া তুলে। এই সাড়া অবশ্য সাময়িক। সঙ্কল্পের অগ্নিমূর্ত্তি যে সংহতি, তাহার অনুশীলন যদি সঙ্গে সঙ্গে সুনিয়ন্ত্রিত হয়, তবেই এইরূপ সাময়িক সাড়া জাতির জীবনময় সুস্থির ও স্থায়ী ফল প্রসব করিতে পারে। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিলেই, স্বাধীনতাদিবসপালনের সুফল অপরিমেয়। নতুবা তাহা বিশেষত্বহীন নিয়মরক্ষায় পর্য্যবসিত হয় মাত্র। বাংলায় রাষ্ট্রসাধনায় প্রথম যুগ অতিক্রান্ত হওয়ায়, বাঙালী আর সাধারণ উত্তেজনাকর রাষ্ট্রীয় বা অন্যবিধ আন্দোলনে সম্ভবতঃ তেমন করিয়া সাড়া দিবে না। বাঙালী ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে বিশিষ্ট নেতৃ-শক্তিকে ঘিরিয়া ইতিমধ্যেই সংহতি-সাধনার পর্য্যায়ে আপনাকে চালিতে পারিয়াছে। বাংলার দায়িত্বশীল তরুণগণ আজ গুচ্ছে গুচ্ছে নানা ক্ষেত্রে শ্রেণীবদ্ধ, সংহতি-নিষ্ঠ। এই সংহতি-বন্ধন কোনও সাধারণ রাষ্ট্রনেতার

ডাকে ভাঙ্গিবার নহে, শিথিল হইবার নহে। বাংলায় আজ একজন সর্ব্বজনমান্য রাষ্ট্রনেতা যদিও থাকেন, তাঁহার বাণী ও নির্দ্দেশ তাঁহার নেতৃত্বাধীন বিশিষ্ট রাষ্ট্রসংহতিরই জন্য, তাহা সর্ব্বসংহতির জন্য নহে, এমন কি সকল রাষ্ট্র-সংহতির জন্যও নহে। এই সত্য পরিস্থিতি আজ কোন মতে উড়াইয়া দিবার নহে। বাংলার সুসংহত, শক্তিশালী ধর্ম্মমণ্ডলীগুলি তাহাদের স্ব-স্ব বিশিষ্ট সঙ্ঘনেতা ভিন্ন আর কাহারও ডাকে ঘর-ছাড়া হইবে না, তাহারা অন্য নীতি-নির্দ্দেশ গ্রহণ করিবে না। এ অবস্থা ভাল কি মন্দ, সে বিচার ছাড়িয়া, যাহা সত্য তাহাকে সত্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। এই সত্য-ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াই আমাদের জাতীয় জীবন সুনিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

বাংলার মর্ম্মক্ষেত্রে আজ নিখিল ভারত কংগ্রেসের রাষ্ট্রমঞ্চ হইতে উচ্চারিত সঙ্কল্পমন্ত্রের ঘোষণা তেমন গভীর ও সর্ব্বজনব্যাপী সাড়া না তুলিলেও, বাঙালী স্বাধীনতার দ্বিতীয় প্রকরণস্বরূপ সংহতি-সাধনে এক দল জাগাইয়া দাঁড়াইয়াছে, এই কথা আমরা তরুণ জাতিকে স্মরণ করাইতে চাই। আজ সামান্য নহে, বিশেষ ব্রতেই স্বাধীনতাকামী তরুণগণের চিত্ত-মন-সর্ব্বেন্দ্রিয় সন্নিবিষ্ট। ইহারা সংহতিসাধনায় একনিষ্ঠ তপঃরত—তাই তাহাদের সম্মুখে স্বাধীনতার ঘোষণা নহে, জাতিনির্ম্মাণের কর্ম্মমূর্ত্তি ঝলমল দ্যুতি লইয়া বিকশিত—সেই সুনির্দ্দিষ্ট সাধনায় তাহাদের বিরামহীন নিত্য অভিযান। এখানে আর কোনও সাধ্যাসাধ্যের চিন্তায় ও ভাবনায় তাহারা না-ই বা চিত্তবিক্ষেপ করিল! বাংলার নবীন জাতি আজ গুরু ও সঙ্ঘ-শক্তি আশ্রয় করিয়া যে জাতিগঠনের নব সূত্র খুঁজিয়া পাইয়াছে, সেই অভিনব সাধনায় অনন্যচিত্তে অগ্রসর হইয়াই তাহাদের ঝটিকাবেগে মুক্তির সিংহদ্বারে উপনীত হইতে হইবে।

নব জাতি

বাংলায় জাতিনির্ম্মাণের আহ্বান ব্যর্থ হইবার নহে। চাই নূতন মানুষ, নব জাতি। যখন চারিদিকে প্রলয়-সংগ্রাম, নর-রক্তের প্লাবনে বসুন্ধরা রঞ্জিতা, অতলান্ত হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত বারিধিবক্ষেও রণদেবতার ডমরু মুহুর্মুহু ধ্বংস ও মরণেরই ডঙ্কা বাজাইতেছে, রাজ্য ও রাজা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, তখন আমাদের কণ্ঠে এমন বিচিত্র আহ্বানের প্রেরণা কেন?

মরণের মধ্য দিয়াই নূতনের আগমন হয়। পুরাতনের নির্ম্মম বিসর্জ্জনেই মানবাত্মা নূতন ভাব, সম্পূর্ণ নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। এইরূপে ইতিহাসের স্রোতঃ আবার নূতন খাতে প্রবাহিত হয়। বিশ্বের আসন্ন বা দূর ভবিষ্যৎ জীর্ণগলিত পুরাতনের বিদায়ে একটা অনাগত নূতন পরিস্থিতিরই আশা ও প্রতীক্ষা করিতেছে—তাই যুধ্যমান সকল বীরজাতিরই বুকে নব সৃষ্টির স্বপ্ন, কণ্ঠে নববিধানেরই ধ্বনি-মন্ত্র। সকল দেশের প্রসিদ্ধ মনীষিগণ শ্মশানকালীর আহুতি যোগাইবার সঙ্গে সঙ্গেই জগতের পুনর্গঠন বা একটা নূতন জগৎ-নির্ম্মাণের পরিকল্পনায় গভীরভাবে চিন্তারত। ভারতে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর ন্যায় ভাবুক ও দূরদর্শী নেতৃপুরুষও বর্ত্তমান বিশ্বযুদ্ধের আর দুই বৎসর স্থায়িত্ব-কাল অনুমান করিয়া লইয়া ইহারই মধ্যে একটা জগদ্ব্যাপী ভাব-বিপ্লব ও রাষ্ট্র-বিপ্লবের সূচনা হইবে, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। একটা খণ্ড যুগ পরিবর্ত্তনের আশা যে তাহার চতুর্দ্দিকেই উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে ও সম্ভাবনা ক্রমশঃ ঘনাইয়া আসিতেছে, ইহা আমরাও স্বীকার করি।

পুরাতনের আংশিক পরিবর্ত্তনে বিধাতার নিগূঢ় অভিপ্রায় পূর্ণভাবে সিদ্ধ হইবে কি না, আমাদের এ সংশয়ও স্বাভাবিক। গত মহাযুদ্ধের সন্ধিক্ষণেও অন্যতম রণনেতা জেনারেল স্মাট্সের ন্যায় মনীষী সেদিনের অভিজ্ঞতা হইতে বলিয়াছিলেন—

"I believe that a passion for peace has been born in this war which will prove greater than any passion for gain or conquest, and so far as is humanly possible such a war as this should never be tolerated again. However there is a danger in believing too much in treaties until we have a radical change in the hearts of men, but I think that change is coming."

সেদিন রাষ্ট্রপতি উইলসনও এই একই প্রকার অনুভূতি লইয়াই "লীগ অফ নেশনের" ভিত্তিপাত করিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতেই সে বিশ্ব-শান্তি ও হৃদয়-পরিবর্ত্তনের স্বপ্ন "তাতল সৈকতে বারিবিন্দুর" মতই

দেখিতে দেখিতে উপিতে স্বরু হয় ও পরিশেষে এক প্রকার শূন্যেই মিলাইয়া গেল। আজ বিশ বৎসর পরে আবার দ্বিতীয় বিশ্বসমর এবং তাহা ততোধিক বিভীষণ ও প্রলয়ঙ্কর "total war"-এর মূর্ত্তি লইয়াই আবির্ভূত হইল। কে জানে, আজিকার জগদ্ব্যাপী রক্তগঙ্গার মহাপ্লাবনেও ধরিত্রীর কলঙ্কমোচন হইবে কি না? মানবজাতির শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রপুরুষ যাঁহারা, তাঁহারা পূর্ব্ব রণনায়ক ও রাষ্ট্র-নায়কগণের পাপের প্রায়শ্চিত্তে এবার প্রস্তুত হইয়াছেন বা শীঘ্রই হইয়া উঠিবেন কি না?

মহাসমরের মধ্য দিয়াই বা তাহারই সুযোগ গ্রহণ করিয়া যাঁহারা আমূল রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন ও সেই সঙ্গে বিশ্বে নবীন শান্তিরাজ্য বা স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা কল্পনা করিবেন, তাঁহাদের হতাশ হইবারই সম্ভাবনা। পৃথিবীর রাষ্ট্রীয় বিবর্ত্তন বা পরিবর্ত্তনের ইতিহাস আমাদের সে আশায় প্রমাণের ইন্ধন যোগায় না। রাষ্ট্রশক্তি কর্ত্তৃক মানবের হৃদয়পরিবর্ত্তন বা মানবজাতির হৃদয়-পরিবর্ত্তনের ফলে রাষ্ট্রতন্ত্রের পরিবর্ত্তন পৃথিবীতে কিছু কিছু দেখা যায় বটে, কিন্তু প্রকৃতির চরম অভিপ্রায় এই পথে চরিতার্থ হইবার সুযোগ পাইবে কি না, তদ্বিষয়ে আমরা সন্দিহান। পৃথিবীর গত মহাযুদ্ধ বা বর্ত্তমান বিশ্বসমর সাম্রাজ্যভোগী জাতিদের সহিত সাম্রাজ্যলোভী জাতিসমূহের (Haves and have-nots) সংগ্রাম বলিয়া সুপরিচিত—সেদিন জার্ম্মাণ-নেতা হিটলার এই কথাই বক্তৃতামুখে সমর্থন করিয়াছেন। পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতের কুরুক্ষেত্র-সমরও কি সাম্রাজ্যের অধিকার লইয়াই নহে? মানবাত্মার হৃদয়ে এই সাম্রাজ্যলিপ্সা তবে প্রকৃতি-রোপিত এক দুর্জ্জয় ক্ষুধা বা প্রেরণা বলিয়াই আমরা গণ্য করিতে পারি। এই প্রেরণা সহস্র সহস্র যুগ ধরিয়া মানুষকে পরিচালিত করিয়া আসিতেছে; প্রেরণা আশ্রয় হইতে আশ্রয়ান্তরে ছিটকাইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তাহার নিবৃত্তি বা সমতার লক্ষণ কুত্রাপি দেখা যায় না। ইউরোপের দুর্দ্ধর্ষ জার্ম্মাণ জাতি দুইবার ২৫ বৎসরের মধ্যে ইহারই দুরন্ত উন্মাদনায় অসাধ্য সাধন করার চেষ্টা করিল। আজ পৃথিবীর পূর্ব্ব প্রান্তে নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় সূর্য্যলাঞ্ছিত পতাকা উড়াইয়া পীত জাপজাতি সেই একই স্বপ্ন-প্রেরণায় বিভোর। নূতন ভূমণ্ডলের বিরাট যুক্তরাষ্ট্র তার বিপুল ঐশ্বর্য্যসম্ভার লইয়া উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণতন্ত্র রাষ্ট্রগুলিকে একত্র সমবেত করিয়া মনরো-নীতির নূতন সংশোধিত সংস্করণ-প্রণয়নে চিন্তা ও চেষ্টারত। সূর্য্যাস্তহীন সাম্রাজ্যের অধিপতি বৃটিশ-সিংহের তো কথাই নাই। কোথায় আজ সাম্রাজ্যবাদ বা সাম্রাজ্য-গঠনের প্রেরণা নাই? একমাত্র মহারুশ একটা অভিনব সাম্যবাদের অপূর্ব্ব আদর্শ লইয়া আপনাকে সংগঠিত করিয়া তুলিতেছিল—তাহারও অন্তরে কি ছিল না বা নাই বিশ্ববিপ্লবের মহাস্বপ্ন? এ ভাবনা আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। মানবজাতির অন্তরে স্বয়ং প্রকৃতিদেবী যে মহাকামনার বীজ রোপণ করিয়াছেন, তাহার পূর্ত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত এমনি প্রলয়ঙ্কর সংঘর্ষ বারে বারে প্রকৃতি-বশেই দেখা দিবে। ইহা অমোঘ প্রাকৃতিক বিধান বলিয়াই হয়ত মানবজাতি তাহার প্রভাব বর্জ্জন বা অতিক্রম করিয়া শান্তিভোগ করিতে পারে না।

স্বপ্ন—ঐক্যের; মানবাত্মার অখণ্ড স্বাধিকারের। ইহাই একচ্ছত্র রাষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের রূপ লইয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতা, রণনেতা বা রাষ্ট্র-শক্তিকে আদর্শ-সাধনে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। যুগে যুগে একই প্রেরণা নানা ক্ষেত্রে নানা ভাবে কার্য্য করিয়াছে ও করিতেছে। ভারতও একদিন চাহিয়াছিল মহাভারত-গঠন করিতে; তাই অতীতে তাহারও অন্তরে খেলিয়াছে ধর্ম্মযুদ্ধের প্রেরণা। প্রকৃতির কোনও প্রেরণা ভোগ বা চরিতার্থতা না পাইলে সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয় না। আজ ইতিহাসের এই সন্ধিযুগে, তিনটী দেশের তিনটী মহাজাতির উপর মানবজাতির ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের সন্ধি-সূত্র সমর্পিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়—রুশ, চীন ও ভারতবর্ষ। মিত্র-শক্তি ও অক্ষ-শক্তির মধ্যে প্রচণ্ড সামরিক শক্তি-সংঘাতের ভার-কেন্দ্র পরিবর্ত্তন করিবার শক্তিধারণ করে এই তিন মহাজাতিই। পৃথিবীর অন্য যুধ্যমান রাষ্ট্র-শক্তিগুলির সামরিক জয়-পরাজয় আজ নির্ভর করিতেছে এই তিন মহাজাতিরই ইচ্ছা, প্রকৃতি, শক্তিসন্নিবেশ ও জাতীয় প্রস্তুতির উপরে। এই তিন ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের চেয়ে জাতি-রূপে আত্ম-পুনর্গঠনের একটা অভিনব অভিপ্রায় ও আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছে,

আমরা ইহা লক্ষ্য করিতে পারি। যেন এইখানেই প্রকৃতি চাহিয়াছেন রাষ্ট্র-পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে জাতীয়াত্মার নব পরিচ্ছদগ্রহণ—একটা জাতীয় নব-জন্ম। আর উক্ত তিন মহাজাতির মধ্যে ইহার জন্ম বিশ্বপ্রকৃতির করুণায় ভারতেরই আছে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অভিজ্ঞতা, সব চেয়ে মূল্যবান্ সঞ্চয়। ভারতবর্ষই ইচ্ছা করিলে, একা সমগ্র জগতের আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক উভয়বিধ প্রয়োজন পূরণ করিয়া মানব-জাতিকে নূতন পথের সঙ্কেত দিতে পারে। যথার্থ নববিধানের সন্ধান দেওয়ার অধিকার আছে এই নিঃস্ব, নিরুপায়, পরাধীন ভারতের, ভারত-জাতিরই।

তাহার জন্যও প্রস্তুতি আছে। জাতির শ্রেষ্ঠ পুরুষ যাঁহারা, তাঁহারা বাহিরের দিকে চাহিয়া, রাষ্ট্রীয় বা সাময়িক সুযোগের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিলে চলিবে না। জাতির অন্তর্নিহিত তপস্যার অগ্নি প্রধূমিত করিয়া তুলিতে হইবে অসাধারণ তপস্যায়। ভারতের অন্তরে যে যোগশক্তি নিহিত আছে, তাহাই উদ্দীপ্ত করিয়া তাহার জাতি-জীবনে চাই সর্ব্ব প্রথমে একটা ভাবান্তর ও রূপান্তর। এক কথায় ব্যক্তি, সংহতি—সমগ্র জাতি-সত্তারই আজ চাই একটা অভিনব নব-জন্ম। বাংলার নির্ব্বাণের ঋষি আত্মসমর্পণযোগে এই নবজন্মের বাণীই আমাদের শুনাইয়াছেন। উদীয়মান বাংলার তরুণ-তরুণী, এই যুগ-বাণী আত্মজীবনে অবধারণ করিয়া সিদ্ধ কর, আপনাকে যুগ-শক্তিরই ভাব-কেন্দ্র ও কার্য্যকেন্দ্রে পরিণত কর।

রাধিকার বিবাহ-রহস্য

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

একদা নন্দ স্বীয় নন্দনকে অঙ্কে ধারণ পূর্ব্বক গোচারণ করিতে করিতে আবাস হইতে দূরে কালিন্দী-তীর-সমীপবর্ত্তী সমীরকম্পিত ভাণ্ডীরবনে গমন করিলেন। কৃষ্ণেচ্ছায় বেগে বায়ু বহিতে লাগিল, আকাশ মেঘে স্নিগ্ধ হইল, তমাল-নীপ প্রভৃতি তরুপল্লব পতিত হওয়ায় বনস্থলী অতীব ভীষণ মূর্ত্তি ধরিল। বনভাগ ঘোরান্ধকারময় হইলে অঙ্কগত বালক অত্যন্ত ভয় পাইয়া কান্দিতে লাগিল ; নন্দও ভয় পাইলেন, তিনি শিশুকে ধারণ করিয়া পরেশ হরির শরণ লইলেন। কোটি অর্কতুল্য এক দীপ্তরাগ তথায় সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল ; নন্দরাজ তন্মধ্যে বৃষভানু-পুত্রী রাধাকে দর্শন করিলেন।.........নন্দ তাঁহার তেজে ধর্ষিত হইয়া তৎক্ষণাৎ কৃতাঞ্জলি প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন—ইনি ত সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম, আর তুমি ইঁহার সদা প্রিয়কারিণীদের মধ্যে মুখ্যাও বটে। রাধে, আমি গর্গমুখে গুপ্তভাবে ইহা শুনিয়াছি ; নিজ নাথকে গ্রহণ কর। ইনি মেঘ হইতে ভয় পাইয়াছেন, ইঁহাকে গৃহে লইয়া যাও। এই বালক সম্প্রতি মায়াগুণযুক্ত, তাই এরূপ বলিতেছি। রাধা 'তাহাই হউক' বলিয়া নন্দের ক্রোড় হইতে নিজ প্রিয় হরিকে করদ্বারা গ্রহণ করিলেন। প্রণত ব্রজেশ্বর নন্দ গমন করিলে, রাধা তখনই ভাণ্ডীরবনে প্রবেশ করিলেন। স্মরণ মাত্রে অভিনব বিলাসমণ্ডপ সমীপস্থ হইল। আর তখনই পুরুষোত্তম হরি কৈশোর বপু ধারণ করিলেন এবং প্রিয়ার করদ্বয় গ্রহণ করিয়া সুন্দর মণ্ডপে সমাসীন হইলেন। ইত্যবসরে ব্রহ্মা আকাশপথে পরমপুরুষের সম্মুখে সমাগত হইলেন এবং তাঁহার চরণ-বন্দনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে উজ্জ্বল বাক্যে চতুর্ম্মুখে বক্ষ্যমাণ চারুবাক্য বলিতে লাগিলেন।

* * * *

যদা যুবাং প্রীতিযুতৌ চ দম্পতী পরাৎপরৌ তাবনুরূপরূপিতৌ।
তথাপি লোকব্যবহারসংগ্রহাদ্বিধিং বিবাহস্য তু কারয়াম্যহম্।

শ্রীনারদ উবাচ।

তদা স উত্থায় বিধিহুতাশনং প্রজ্বাল্য কুণ্ডে স্থিতয়োস্তয়োঃ পুরঃ।
শ্রুতে করগ্রাহবিধিং বিধানতো বিধায় ধাতা সমবস্থিতোঽভবৎ।
স বাহয়ামাস হরিঞ্চ রাধিকাং প্রদক্ষিণং সপ্ত হিরণ্যরেতসঃ।
ততশ্চ তৌ তে প্রণময্য বেদবিত্তৌ পাঠয়ামাস চ সপ্তমন্ত্রকম্।
ততো হরের্ব্বক্ষসি রাধিকায়াঃ করঞ্চ সংস্থাপ্য হরেঃ করং পুনঃ।
শ্রীরাধিকায়াঃ কিল পৃষ্ঠদেশকে সংস্থাপ্য মন্ত্রাংশ্চবিধিঃ প্রপাঠয়ন্।

রাধাকরাভ্যাং প্রদদৌ চ মালিকাং কিঞ্জল্কিনীং কৃষ্ণগলেঽলিনাদিনীম্।
হরেঃ করাভ্যাং বৃষভানুজাগলে ততশ্চ বহ্নিং প্রণময্য বেদবিৎ॥
সংবাসয়ামাস সুপীঠয়োশ্চ তৌ কৃতাঞ্জলি মৌনযুতৌ পিতামহঃ।
তৌ পাঠয়ামাসতু পঞ্চমন্ত্রকং সমর্প্য রাধাঞ্চ পিতেব কন্যকাম্॥

গর্গসংহিতা, গোলোকখণ্ডম্, ১৬শ অঃ

আপনারা পরাৎপর ও প্রীতিযুক্ত দম্পতি এবং পরস্পর অনুরূপ তথাপি আমি লোকব্যবহার জন্য বিবাহ-বিধির অনুষ্ঠান করিব। নারদ বলিলেন,—তখন ব্রহ্মা উত্থিত হইয়া উপবিষ্ট রাধাকৃষ্ণের সম্মুখে কুণ্ডমধ্যে যথাবিধি অগ্নি প্রজ্জ্বালন করিলেন এবং বৈদিক বিধি অনুসারে পাণিগ্রহণ-ক্রিয়া সম্পাদন করাইয়া উপবিষ্ট হইলেন। বেদবিধিজ্ঞ ব্রহ্মা রাধাকৃষ্ণের সপ্তবার অগ্নি প্রদক্ষিণ ও তাঁহাদিগের দ্বারা প্রণাম করাইলেন এবং তারপর সপ্তমন্ত্র পাঠ করাইয়া বিবাহবিধি সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা রাধিকার হস্ত কৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে এবং কৃষ্ণের হস্ত রাধিকার পৃষ্ঠদেশে সংস্থাপন পূর্ব্বক মন্ত্র পাঠ করাইলেন। বেদজ্ঞ ব্রহ্মা রাধা-করদ্বয় দ্বারা কৃষ্ণের কণ্ঠে ও কৃষ্ণের কর-দ্বয় দ্বারা রাধার গলে কেশরযুক্ত কমল-মাল্য প্রদান করাইয়া তাঁহাদের উভয়কেই অগ্নি প্রণাম করাইলেন; তখন তাঁহাদের গললগ্ন মালায় মধুকরগণ লগ্ন হইয়া সুমধুর রব করিয়াছিল। অনন্তর পিতামহ কৃতাঞ্জলি মৌনযুক্ত রাধাকৃষ্ণকে উত্তম আসনে উপবেশন করাইয়া পঞ্চমন্ত্র পাঠ করাইলেন। পিতা যেমন বর-করে কন্যার্পণ করেন, পিতামহও তদ্রূপ করিয়া রাধাকে কৃষ্ণ-করে অর্পণ করিলেন।

তখন দেবগণ পুষ্পবর্ষণ ও অমর-নারীরা বিদ্যাধরীগণের সহিত নৃত্য করিলেন; গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, চারণ ও কিন্নরগণ কৃষ্ণ-মঙ্গল গান করিল। স্বর্গবাসী দেবগণ উচ্চরবে মঙ্গলময় জয়-শব্দ করিলেন।

উপরের 'লোকব্যবহারসংগ্রহাৎ' বাক্যাংশ লক্ষণীয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের বর্ণনাও প্রায় অনুরূপ (শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ড, ১৫শ অধ্য)। অধিকন্তু উহাতে শ্রীরাধা বিধাতা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-করে সমর্পিত হইবার পূর্ব্বেই রায়াণ বৈশ্যের সহিত তাঁহার বিবাহ-সংঘটন হয়।

রাধা জগাম বারাহে গোকুলং ভারতং সতি।
বৃষভানোশ্চ বৈশ্যস্য সা চ কন্যা বভূবহ।
অযোনিসম্ভবা দেবী বায়ুগর্ভা কলাবতী।
সুষাব মায়য়া বায়ুং সা তত্রাবির্বভূব হ।
অতীতে দ্বাদশাব্দে তু দৃষ্ট্বা তাং নবযৌবনাম্।
সার্দ্ধং রায়াণবৈশ্যেন তৎসম্বন্ধং চকার সঃ॥
ছায়াং সংস্থাপ্য তদ্গেহে সান্তর্দ্ধানং চকার হ।
বভূব তস্য বৈশ্যস্য বিবাহশ্ছায়য়া সহ॥
গতে চতুর্দ্দশাব্দে তু কংসভীতিচ্ছলেন চ।
জগাম গোকুলং কৃষ্ণঃ শিশুরূপী জগৎপতিঃ॥
কৃষ্ণমাতা যশোদা যা রায়াণস্তৎ সহোদরঃ।
গোলোকে গোপকৃষ্ণাংশঃ সম্বন্ধাৎ কৃষ্ণমাতুলঃ॥
কৃষ্ণেন সহ রাধায়াঃ পুণ্যা বৃন্দাবনে বনে।
বিবাহং কারয়ামাস বিধিনা জগতাং বিধিঃ॥ ১

ব্র-বৈ প্রকৃতি খণ্ড, ৪৯তম অঃ

রাধা বরাহকল্পে গোকুলনগরে বৈশ্যবর বৃষভানুর কন্যারূপে অবতীর্ণা হইবেন। বৃষভানু-কান্তা কলাবতী বায়ুগর্ভ ধারণ করিবেন। কালে রাজপত্নী বায়ু প্রসব করিলে, তথায় অযোনি-সম্ভবা রাধা আবির্ভূতা হয়। দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে বৃষভানু তাঁহাকে নবযৌবনা দেখিয়া রায়াণ বৈশ্যের সহিত তাঁহার বিবাহ-সম্বন্ধ করেন। রাধা সেই দেহের ছায়া সংস্থাপিত করিয়া অন্তর্হিতা হন; ছায়ার সহিত রায়াণের বিবাহ হয়। চতুর্দ্দশ বর্ষ গতে জগৎপতি কৃষ্ণ কংসভয়চ্ছলে শিশুরূপে গোকুলে গমন করেন। রায়াণ কৃষ্ণমাতা যশোদার সহোদর, সেই সুবাদে শ্রীকৃষ্ণের মাতুল; ইনি গোলোকে কৃষ্ণাংশসম্ভূত গোপ। জগৎস্রষ্টা পুণ্য বৃন্দাবনের বনে কৃষ্ণের সহিত রাধার যথাবিধি বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করেন।

রাধিকা পূর্ব্বে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষা বয়োধিকা।

পুরতো গমনেনৈব কিন্তু সা বয়সাধিকা।

বধূর বয়সাধিক্যে বিবাহে বাধে নাই। গর্গ বলিলেন, নন্দ, এই বৃন্দাবনে ইঁহাদের বিবাহ হইবে। জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা তাহার পুরোহিত হইবেন এবং সেই ক্রিয়া অগ্নি সাক্ষী করিয়া নিষ্পন্ন হইবে।

আয়াদবৃন্দাবনে নন্দ বিবাহো ভবিতানয়োঃ।
পুরোহিতো জগদ্ধাতা কৃতাগ্নিং সাক্ষিণং মুদা॥

ব্র-বৈ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ১৩শ অঃ ২

---

১ পাঠান্তর, 'বিবাহং কারয়ামাস বিধিনা জগতাং বিধিং'।

২ প্রমাণাদি প্রধানতঃ বঙ্গবাসী সংস্করণ গর্গসংহিতা ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ হইতে সঙ্কলিত।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, উত্তর খণ্ড, রাধাহৃদয়ের বর্ণনা কিছু বিচিত্র।

তত্রস্তাং চারুসর্ব্বাঙ্গীং বৃষোদিৎ সুতমীপ্সসঃ।
ধাত্রাকারৈব পুরোডাশমন্দিরে মাধবো রুষাঃ।
আয়ানাক্ষ-কৃষ্ণস্ত পুংস্ত্বাদপনয়ং তদা।

*　　*　　*　　*

প্রিয়ায়া লিপ্সিতং যত্তু বিধায়োরুক্রমস্তদা।
প্রসারিতকরো বাঢ়মুবাচ হৃদনন্তরম্।
সতস্তস্তে দদস্তাসু দক্ষিণা রত্নসঞ্চয়ম্।
নাজ্ঞাসীত্তস্থ তত্ত্বং কিঞ্চিত্রাজা তদা মুনে।

১৫শ অধ্যায় ৩

অনন্তর যজ্ঞীয় হবিঃ কাককে প্রদান করায় স্থায় বৃষভানু সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা আয়ানকে দান করিতে ইচ্ছুক হইলেন, অযোগ্য বিবেচনায় আয়ানক্রোড়স্থিত শ্রীকৃষ্ণ পরম রোষে তাহার পুরুষত্ব অপনয়ন করিলেন।............উরুক্রম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়ার অভিলষিত যাহা, তাহা পূর্ণ করিয়া (আয়ানকে পশ্চাতে রাখিয়া) আপনার দক্ষিণ-কর প্রসারিত করিলেন; এবং পাণিগ্রহান্তে 'বাঢ়ং' এই প্রতিগ্রহ সূচক বাক্য বলিলেন। হে মুনে (অঙ্গিরা), বৃষভানু, দক্ষিণাস্বরূপ কতকগুলি রত্নসঞ্চয় শ্রীকৃষ্ণের হস্তে প্রদান করিলেন; শ্রীকৃষ্ণ 'স্বস্তি' বলিয়া তাহা লইলেন, কিন্তু এই বৃত্তান্ত রাজা আদৌ জানিতে পারিলেন না।

মহাভাগবত পুরাণে শম্ভুর অবতার রাধার সহিত আয়ান ঘোষের বিবাহ হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবতীর অবতার শ্রীকৃষ্ণই রাধার প্রণয়াস্পদ (৪৯, ৫২, ৫৩)।[৪]

উদ্ধৃত বিবরণের স্থূলমর্ম, ভানুরাজ-কুমারী রাধা দ্বাদশ বর্ষ বয়সে যশোদার সহোদর আয়ানের সহিত পরিণীতা হন, পশ্চাৎ আয়ান (অভিমন্যু) নপুংসক নিশ্চিত হইলে শ্রীরাধার পুনর্ব্বার বয়ঃকনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ সহ যথাবিধি বিবাহ হয়।

নন্দরাজের ন্যায় বৃষভানুরাজ ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে, উহা একটা উপনাম বা উপাধি। যিনি অর্দ্ধকোটি গোধনে ধনী, তিনিই বৃষভানুবর।

নন্দঃ প্রোক্তঃ স গোপালৈর্নবলক্ষগবাং পতিঃ।
উপনন্দশ্চ কথিতঃ পঞ্চলক্ষগবাং পতিঃ।
বৃষভানুঃ...উক্তো যো দশলক্ষগবাং পতিঃ।
গবাং কোটি গৃহে যস্য নন্দরাজঃ স এবহি।
কোট্যর্দ্ধং চ গবাং যস্য বৃষভানুবরস্তু সঃ।

গর্গ- গোলো-৫ম অঃ

অপরত্র রাধা সাগর-দুহিতা; আয়ানের ক্লীবত্বও সুবিদিত (শ্রীকৃ-কীং জন্মঃ)। আবার উত্তর মথুরার রাজা সাগর শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য (ঘটজাতক, ৪৫৪)। রাধা অন্যপূর্ব্বা এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিকট সম্বন্ধ হেতু বহু প্রচলিত ও সমধিক মান্য শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে তৎপ্রসঙ্গ নিঃশেষে মুছিয়া ফেলা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না কি? আর যেখানে ঠাকুরাণীর কথা আছে, সেখানেই তাঁহার বায়ুগর্ভে জন্ম অথবা পদ্মবনে প্রাপ্ত ডিম হইতে উৎপত্তি, ছায়ার সঙ্গে মানুষের কারবার ইত্যাকার অলীক কিছু কল্পনার প্রয়োজন হইয়াছে। অথচ বিষ্ণুর অবতার কিংবা স্বয়ং ভগবানের গর্ভবাস কুণ্ঠার কারণ হয় নাই।

পুরাকালে রাজন্য-সমাজে মাতুল কন্যা বা পিতৃষস্-সুতার পাণিগ্রহণ অতি সাধারণ ব্যাপার ছিল। বিদেহ-রাজনন্দিনী সীবলি জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যপুত্র মহাজনক কুমারকে পতিত্বে বরণ করেন। এবং কুমার সহস্রপুরুষনম্য ধনুকে জ্যারোপণ করিয়া পিতৃরাজ্য ফিরিয়া পান। (মহাজনক জাতক ৫৩৯)। বৈমাত্রেয় ভগ্নী, এমন কি সহোদরার পাণিপীড়ন-দৃষ্টান্তও একান্ত বিরল নহে (উদয় জাতক ৪৫৮; দশরথ জাতক, ৪৬১)। রুচিতনয়া দক্ষিণা যমজ ভ্রাতা ভগবান যজ্ঞপুরুষকে বিবাহ করিতে অভিলাষ করেন এবং তদনুসারে তাঁহাদের উভয়ের পাণিবন্ধ সম্পন্ন হয় (ভগবত, ৪।১; মর্ক ৫০)। এবং পরাশর স্মৃতি কলিযুগের জন্য সুনির্দ্দিষ্ট হইলেও, যুগসন্ধিকালে উহার ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইয়া থাকিবে, অনুমান হয়। যাহা হউক, আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে, সামাজিক রীতি-নীতি দেবত্ব বা ঈশ্বরত্বনির্দ্ধারণের মাপ-কাঠি নহে। এই বিবাহরহস্য যেমন কৌতূহলোদ্দীপক, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং নিরপেক্ষ আলোচনা বাঞ্ছনীয়।

রাধাকে প্রথম ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে পাওয়া যায়, তাহা নহে। অন্যান্য পুরাণের কথা ছাড়িয়া দিলেও, আলঙ্কারিক

৩ নন্দকুমার কবিরত্নের সংস্করণ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, উত্তর খণ্ড, (১২৮৭)।
৪ বিদ্যালঙ্ক বিরচিত জীবনীকোষ।

আনন্দবর্দ্ধন (খ্রীষ্টীয় ৯ম শতক) বিরচিত ধ্বন্যালোকের দুইটি শ্লোকে রাধাকৃষ্ণলীলার ইঙ্গিত আছে। মহাকবি ভট্টনারায়ণ (৮ষ্ঠ শতক) তৎপ্রণীত বেণীসংহারে রাধিকার নাম লইয়াছেন। সাতবাহনরচিত গাথাসপ্তশতীর (২য়-৫ম শতক) একটি গাথায় রাধাকে পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে পঞ্চতন্ত্র, কৌলিক-রথকারের উপাখ্যানে বিবৃত শ্রীকৃষ্ণ-ভূমিকার 'সুভগে সত্যমভিহিতং ভবত্যা পরং কিন্তু রাধা নাম মেভার্য্যা গোপকুলপ্রসূতা প্রথমমাসীৎ' বাক্য* স্মর্তব্য। পণ্ডিতগণের মতে বিষ্ণুশর্ম্মা প্রণীত পঞ্চতন্ত্র খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২০০ হইতে খ্রীষ্টীয় ২০০ অব্দের মধ্যে কোন সময়ে রচিত এবং ৫ম শতাব্দীর পূর্ব্বেই উহার যাবতীয় সংস্করণ সঙ্কলিত হয়।

* Panchatantra Ed. by F. Kielhorn (Bombay Sanskrit Series, 1885), p. 38.

সংস্কৃত-সাহিত্যের নারী-কবি লক্ষ্মী রাজ্ঞী

অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, পিএইচ্, ডি (লণ্ডন)

বৈদিক যুগ থেকে বর্ত্তমান সময় পর্যন্ত ভারতবর্ষে উচ্চ নারী শিক্ষার ধারা অনবরত বয়ে চলেছে—কখনও বা খর, কখনও বা মৃদু গতিতে, কিন্তু প্রায় প্রতি যুগেই খুব উঁচু দরের মহিলা কবিরা ভারতভূমি অলঙ্কৃত করেছেন। বৈদিক ও পরবর্তী সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত প্রভৃতি সব সাহিত্যেই বড় বড় মহিলা কবিরা আছেন, যাঁদের জ্ঞান-গরিমা অনেক ক্ষেত্রে পুরুষদের সমতুল। সংস্কৃত কথ্য ভাষা না হইলেও বর্ত্তমান যুগেও অনেক মহিলা কবি সংস্কৃত ভাষায় রচনায় সুনিপুণ। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি সংস্কৃত-সাহিত্যের একজন আধুনিক মহিলা কবি সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করবো।

লক্ষ্মী রাজ্ঞী উত্তর মালাবারের কটট্টনট্টু রাজপরিবারের এটবলট্টু শাখার অন্তর্গত খ্যাতিসম্পন্না মহিলা ছিলেন। প্রায় ত্রিশ বছর আগে তিনি কালের করাল কবলে পতিত হইয়াছেন। তাঁর একটী মাত্র গ্রন্থ "সন্তানগোপাল" কাব্য আমাদের জানা আছে; তাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। এ কাব্য কবি প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্বে রচনা করেছিলেন। কবি তাঁর গ্রন্থের শেষ কবিতায় বলেছেন যে অসুস্থ শরীর সত্বেও, তিনি রাজপুত্র রবি বর্ম্মার প্রতি স্নেহ হেতু এ গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।[১]

সন্তানগোপাল-কাব্য তিন সর্গে সমাপ্ত।[২] এর প্রথম সর্গে ৪৩টী, দ্বিতীয় সর্গে ৩৭টী এবং তৃতীয় সর্গে ৫০টী—মোটের উপর সমুদয় গ্রন্থে ১৩০টী কবিতা আছে। এ গ্রন্থের বিষয়-বস্তু কবি-কল্পিত নয়; মূল গল্পটী ভাগবত-পুরাণে পাওয়া যায়।[৩] তবে কবি স্বীয় ইচ্ছানুসারে পৌরাণিক গল্পটী পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করেছেন।

প্রথম সর্গে দেখতে পাই যে, এক ব্রাহ্মণের একে একে আটটী পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হলো; ব্রাহ্মণ প্রতি বারই দ্বারকায় গিয়ে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হলেন ও অনেক কাকুতি মিনতি জানালেন, কিন্তু তাঁর থেকে কোনও আশ্বাস বাণী বা সান্ত্বনা ব্রাহ্মণ পেলেন না। ব্রাহ্মণের দশম পুত্র যখন মারা গেল, তিনি আবার কৃষ্ণের নিকট গিয়ে অনেক কাতর মিনতি জানালেন, কিন্তু কিছুই ফল হলো না। এবারে দ্বারকায় অর্জুন উপস্থিত ছিলেন; তিনি ব্রাহ্মণের কাতর-বিলাপে দয়াদ্রিত হ'য়ে তাঁকে বল্লেন যে, এবার যখন তাঁর দশম পুত্র জন্মগ্রহণ করবে, তিনি যে কোনও প্রকারে তাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবেনই। ব্রাহ্মণের তা'তে কিন্তু প্রত্যয় হলো না। অর্জুন তখন তাঁর পূর্ব গৌরব কাহিনী বিবৃত করলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন, যদি তিনি কোনও কারণে ব্রাহ্মণের দশম পুত্রকে

১। রোগতিরস্কৃতাপি রবিবর্ম-কুমারকস্য
আত্তাদরেণ মনসা বচসি প্রকামম্।
সৌখ্যং সমর্প্য বিশদং কৃতং ময়ৈতৎ
কাব্যং বুধ বুধ-বরাঃ পরিশোধয়ন্তু।১০

২। ঠিক এ নামের আরো একটী সংস্কৃত-গ্রন্থ আছে—সুব্রহ্মণ্য-বিরচিত। ঐ গ্রন্থের হস্তলিখিত পুঁথি আছে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে, পুঁথির নম্বর ৮১১৮।

৩। দশম স্কন্ধ, অধ্যায় ৮০।

রক্ষা করতে না পারেন, তা হ'লে তিনি জলন্ত চিতায় আরোহণ করে' প্রাণত্যাগ করবেন।

ব্রাহ্মণের দশম পুত্রের জন্ম-গ্রহণ সময়ে যাবতীয় সাবধানতা অবলম্বন করা হ'লো; অস্ত্রে শস্ত্রে গৃহ সুসজ্জিত হলো। স্বয়ং অর্জুন উপস্থিত রইলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'লো না। ব্রাহ্মণের দশম পুত্র জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই কালের করাল গ্রাসে পতিত হ'লো। তখন অর্জুন পূর্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে চিতা সজ্জিত করে' তাতে আরোহণ করতে প্রস্তুত হ'লেন। কৃষ্ণ তখন এসে বাধা দিলেন এবং বললেন যে, তিনি যে কোনও রকমে ব্রাহ্মণের পুত্রকে বাঁচিয়ে দেবেন।

দ্বিতীয় সর্গে দেখতে পাই, কৃষ্ণ ও অর্জুন লোকালোক পর্বত পার হ'য়ে চলেছেন নারায়ণের কাছে। তাঁর কাছে উপস্থিত হ'য়ে তাঁরা প্রথমে তাঁর স্তুতি পাঠ এবং পরে নিজেদের প্রার্থনা নিবেদন করেন। নারায়ণ তুষ্ট হ'য়ে বললেন—তাঁদের আশা পূর্ণ হ'বে। তিনি এ-ও বলে' দিলেন যে, কৃষ্ণ ও অর্জুনের কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধজনিত পাপ হয়েছিল; তাঁর কাছে আসায়, তাঁরা সে পাপ থেকে মুক্ত হলেন। নারায়ণ ব্রাহ্মণের দশটী ছেলেরই প্রাণ ফিরিয়ে দিলেন। কৃষ্ণ ও অর্জুন অত্যন্ত খুসী হ'য়ে বিষ্ণুলোক থেকে ফিরে এলেন।

তৃতীয় সর্গে কৃষ্ণ ও অর্জুনের ব্রাহ্মণের নিকটে আগমন, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর সকল পুত্র প্রাপ্তিজনিত মহা আনন্দ ও কৃষ্ণের স্তুতি প্রভৃতি বিষয় অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

রাণী লক্ষ্মীদেবী যুদ্ধ বিগ্রহাদি কত ঘৃণা করতেন, তা' এ থেকে বোঝা যায় যে, তিনি তাঁর গ্রন্থে স্পষ্ট বলছেন যে, কৃষ্ণ এবং অর্জুনের নরহত্যাদিজনিত পাপ থেকে বিমুক্ত হওয়ার জন্য বিষ্ণুলোকে যেতে হয়েছিল।[৪] ভাগবত পুরাণে এ সব উক্তি নেই; গ্রন্থের এ জাতীয় উক্তিগুলি, বিশেষতঃ স্তুতিগুলি সব কবির নিজস্ব অবদান।

এ পুস্তকের লোকালোক পর্বতের বর্ণন, শেষশায়ী বিষ্ণুর বর্ণন প্রভৃতি অত্যন্ত মনোরম। কৃষ্ণ ও অর্জুনের বিষ্ণুস্তুতি ও ব্রাহ্মণের কৃষ্ণস্তুতি স্তব-সাহিত্যে কবির স্থায়ী দান হিসাবে পরিগণিত হ'তে পারে।

কবির ভাষা প্রাঞ্জল ও ভাব সুমধুর। ভক্তি তাঁর কবিতার মুখ্য অবলম্বন। তাঁর রচনায় সমাসবদ্ধ শব্দের বাহুল্য নেই। প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গে অলঙ্কার-প্রয়োগ স্বল্প। তৃতীয় সর্গের পঞ্চাশটী কবিতার মধ্যে শেষের চারটী কবিতা ছাড়া আর সব কবিতার অন্ত্য পাদে কবি যমক অলঙ্কার প্রয়োগ করেছেন।

এ গ্রন্থ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে কাব্য, পুরাণ, প্রভৃতি শাস্ত্রে কবির গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। ছন্দোবৈচিত্র্যও এ গ্রন্থে সুসমৃদ্ধ।

কবির এ পুস্তক রচনার মূল উদ্দেশ্য কুমার রবি বর্মাকে ধর্ম বিষয়ে শিক্ষাদান করা এবং বলা বাহুল্য, কবির এ উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে তাঁর গ্রন্থ খুব সহায়ক হয়েছিল নিশ্চয়। স্নেহপ্রণোদিত হ'য়ে একজনের সাহায্যার্থ কবি কৃতিত্বের যে পরিচয় রেখে গেছেন, তা'তে তাঁর দেশবাসীর পরম কল্যাণ সাধিত হ'বে। রাণী রাজ্যভোগের চেয়েও ভক্তির প্রকর্ষ ও জ্ঞানের উৎকর্ষের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট যে ছিলেন, তা তাঁর এ গ্রন্থের বিষয়-নির্বাচন এবং গ্রন্থ-রচন থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। তদুপরি স্নেহ ও বাৎসল্যের যাদুমন্ত্রে দীক্ষিত জননী-হৃদয় যখনই পুত্রের ধর্ম-চর্চার সহায়তার জন্য উদ্বুদ্ধ হলো, তখনই সন্তান-সমাজের পরম কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে, এ স্বীকার্য্য। ভারতীয় সন্তানেরা লক্ষ্মীদেবীর কোমল স্নেহস্পর্শ অনুভব করবে তাঁর ভক্তিপূত কোমল হৃদয়ের পূর্ণ অভিব্যক্তিতে। তাঁর রচিত কৃষ্ণ ও বিষ্ণু স্তুতিতে তারা মাতৃস্নেহের সুধা-ধারার সন্ধান পেয়ে নিজেদের ধন্য মনে করবে। অতীত ভারতে সন্তানদের ধর্মশিক্ষায় ব্রতী হ'য়ে কবিতা রচনা করেছিলেন কবি মদালসা[৫]। তাঁর পুত্রের হিতচিন্তামূলক কবিতা ভারত-সন্তানমাত্রেরই গৌরবের বস্তু। ভারতীয় সন্তানের আদি শিক্ষা ঐ মদালসা, লক্ষ্মী রাজ্ঞীর মত কবি ধর্মপ্রাণা মহীয়সী জননীদের কাছেই—ভারতীয় সন্তান আজ তাই জগদ্বাসীকে বুঝিয়ে দিতে চায়।

৪। নারায়ণ বল্ছেন—

> কর্তুং যুবামদ্য মদংশভূতা—
> বনেক-হিংসা-জনিতাস্ত-যুক্তৌ।
> পদাবলোকায় তে কুমারা
> দ্বিজোত্তমস্যাত্র ময়ৈব নীতাঃ।
>
> দ্বিতীয় সর্গ, কবিতা ৩৫।

৫। পরলোকহিতং তাত, প্রভৃতি কবিতা, শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি, কবিতা ৬৭১, পৃষ্ঠা ১০৬; সুভাষিত-হারাবলী, হস্তলিখিত পুঁথি, পৃষ্ঠা ৫১ (ক), কবিতা ৪৬।

জেনারেলিসিমো চিয়াং কাই-শেক ও বর্ত্তমান চীন

শ্রীনিখিল সেন

চীনের জাতীয় গভর্ণমেণ্ট আজ ত্রিংশ বৎসরে পদার্পণ করেছে। গত ৩১শে অক্টোবর তার বর্ত্তমান ভাগ্য-নিয়ন্তা জেনারেলিসিমো চিয়াং কাই-শেকের পঞ্চপঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব সম্পন্ন হয়েছে। চীনের জাতীয় ইতিহাসে জেনারেলিসিমো চিয়াং কাই-শেকের স্থান নিরূপণ করতে গিয়ে মনে পড়ে কামাল আতাতুর্ক, পিলসুড্স্কি আর কাভুরের কথা। কামাল আতাতুর্ক ও পিলসুড্স্কি এ যুগের সুপরিচিত জাতীয় বীর নেতা; আর ইহারই পূর্ব্ব যুগে অষ্ট্রিয়া আর ফ্রান্সের কবল হতে পদানত ইটালীর মুক্তির বাণী—মাৎসিনী আর গ্যারিবল্ডীর স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করেছিলেন কাউন্ট কাভুর। মার্শাল চিয়াং কাই-শেকও আজ তাঁদের সমতুল্য। এ কথা বুঝতে হলে আমাদের আজ তাকাতে হবে চীনের ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের দিকে।

মহাচীন একদা ঘুমিয়ে পড়েছিল আফিং-এর নেশায়। তার এ দুর্বল মুহূর্ত্তের সুযোগ নিতে ভুল করলো না লুব্ধ বৈদেশিক শকুনির দল। দ্বিতীয় আফ্রিকায় পরিণত হতে যাচ্ছিল মহাচীনও। এমন সময়ে ঘুম ভাঙ্‌ল চীনা ড্রাগনের। ১৯১১ সালের বিপ্লবে তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ল বহু শত বৎসরের ঘুণে-ধরা মাঞ্চু-সাম্রাজ্য। শেষ সম্রাট হেনরী পুই (জাপ-তাঁবেদার মাঞ্চুকুয়োর যিনি বর্ত্তমান রাজা) বাধ্য হলেন সিংহাসনের গদি ছাড়তে। বহু সহস্র বৎসরের একচ্ছত্র রাজতন্ত্রের পর সেদিন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোল চীনে। রাজতন্ত্রের অবসান হলেও চীনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন। নিজদেশে থেকেও চীন তখন পরবাসী। তার সার্ব্বভৌম কর্ত্তৃত্ব তখন অপরের হাতে। ইংরাজ, ফরাসী, জার্ম্মানী, রাশিয়া, পোর্তুগিজ প্রভৃতি পরাক্রান্ত বৈদেশিক শক্তিরা তখন চীনা তৎমুল্লের ভাগবাঁটোয়ারা করে নিয়েছে নিজেদের মধ্যে। এক্স্‌ট্রাটেরিটোরিয়াল রাইটস্ আর ফ্রি পোর্টস্-এর গুরুভারে তখন চীনের শিরদাঁড়া নুয়ে পড়েছে। বৃটেন ও অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশের কবল হতে বিপ্রস্ত, বিচ্ছিন্ন চীনকে মুক্ত করে কুয়োমিটাং-এর ছত্রছায়ায় একত্র করতে তখন ব্রতী হয়েছেন চীনা-জাতীয়তাবাদের হোতা ডাক্তার সুন ইয়াৎ সেন। কিন্তু তাঁর আরব্ধ কর্ম্ম অসম্পূর্ণই রয়ে গেল। ১৯২৫ সালের ১২ই মার্চ্চ রক-ফেলার হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

চীনের তখন ঘোর দুর্দিন। আভ্যন্তরিণ অবস্থা আরও সঙ্গীন। দক্ষিণে বামপন্থী কম্যুনিষ্টরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে কুয়োমিটাং-এর বিরুদ্ধে। আর উত্তরে প্রবল পরাক্রান্ত 'টুচুনে'রা (প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা; মাঞ্চুরিয়ার চ্যাং সুয়ে লিয়াং সবার অগ্রগণ্য) নান্‌কিং সরকারের কর্ত্তৃত্ব খর্ব্ব করতে বদ্ধপরিকর।

চীনের এই মহাসঙ্কট মুহূর্ত্তে ডাঃ সুন ইয়াৎ সেনের আরব্ধ কর্ম্ম—তাঁর 'সান-মিন চু আই' বা জনসাধারণের তিনটি নীতিঃ যথা—জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও জীবন যাত্রার উপায়—এবং ৪০ কোটি চীনা নর-নারীর ভাগ্য যাঁর ওপর ১৯২৬ সালে ন্যস্ত হোল, তিনি হলেন স্বর্গীয় ডাঃ সুন ইয়াৎ সেনের পার্শ্বচর, তাঁর ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী ও হোয়াম্পোয়া (Whampoa Military Academy) সামরিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, মার্শাল চিয়াং কাই-শেক। ১৯২৮ সালে চিয়াং কাইশেকের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে নানকিং-এ জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হোল।

মার্শাল চিয়াং কাই-শেক, মাদাম চিয়াং কাই-শেক এবং পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু

বিচিত্র চিয়াং কাইশেকের জীবন। এত অল্প বয়েস থেকে তাঁর সামরিক-জীবন সুরু হয়েছে যে তাঁকে আজ পুরো মাত্রায় সৈনিক বলা যায়।

সাংহাইএর দক্ষিণে চুকিয়াং প্রদেশের ফিংগুয়া (Finghua) গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। সেখানেই তাঁর শৈশব অতিবাহিত হয়েছে। অতি শৈশবে মার্শাল চিয়াং পিতাকে হারিয়েছেন। মা নিরুপায় হয়ে তাঁকে নিংপোর এক আত্মীয়ের দোকানে পাঠাতে বাধ্য হলেন বিনা মাহিনায়। চীনের বর্ত্তমান ভাগ্যনিয়ন্তা ও প্রধান সেনাপতির কপালে সেখানে কেবল জুটল লাথি আর চড়। ক্রমে অসহ্য হয়ে চিয়াং সেখান থেকে পালিয়ে চুকিয়াং-এর প্রাদেশিক সৈন্য দলে

এসে ভর্তি হলেন। তখনও পর্য্যন্ত তাঁর অক্ষর পরিচয় হয়নি। কিন্তু একদিন যাঁকে রাষ্ট্রের প্রধান প্রতিনিধি হয়ে দেশ-বিদেশের নানান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে হবে, তিনি আর নিরক্ষর থাকবেন কি করে? তাই চিয়াংকাইশেক সৈন্য বিভাগের সংলগ্ন ইস্কুলে গিয়ে ভর্তি হলেন এবং প্রাদেশিক সামরিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করলেন। জেনারেল উয়ান শি-কাই তখন পাশ্চাত্য ধরণের এক শক্তিশালী আধুনিক চীনা বাহিনী

চীনের প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নেতা চ্যাং সুয়ে-লিয়াং

গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যে পিপিং-এ (পিকিং-এর পূর্ব নাম) নূতন এক সামরিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাছাই করে চিয়াং কাই-শেককে চুকিয়াং প্রদেশ থেকে নূতন সামরিক বিদ্যালয়ে পাঠান হোল। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে পোয়াটিংফুর এই সামরিক বিদ্যালয় থেকে তিনি গ্রেজুয়েট ডিগ্রি লাভ করলেন। সামরিক বিজ্ঞানে আরও উচ্চ শিক্ষার জন্য তখনকার মাঞ্চু সম্রাট কর্তৃক তিনি টোকিওর মিলিটারী কলেজে প্রেরিত হলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৯ বৎসর। পাঠ সমাপ্ত করতে তিনি জাপানে চার বৎসরকাল ছিলেন। জাপানী ভাষাকে তিনি এ সময় রপ্ত করে নিয়েছিলেন নিজের প্রয়োজনমত।

টোকিয়োতেই চিয়াং কাই-শেক প্রথম ডাঃ সুন ইয়াৎ সেনের সংস্পর্শে আসেন। এ সময় জাপানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল বহু বিপ্লবী চীন হ'তে বহিষ্কৃত হয়ে। একে একে তাদের সঙ্গে পরিচয় হ'ল চিয়াং কাই-শেকের। তখন যুবক চিয়াং কাই-শেকের চোখের ঠুলি একদিন খসে পড়ল। তাঁর চোখের ওপর ভেসে উঠল বৈদেশিকদের হস্তে শোষিত লুণ্ঠিত চীনের করুণ অসহায় মুখ। প্রাণ তাঁর কেঁদে উঠল হু-হু করে'। বুঝে উঠতে তাঁর আর বাকী রইল না; স্বর্গীয় Celestial) সাম্রাজ্যের গৌরবময় দিন আবার ফিরিয়ে আনতে হলে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিকট কাকুতি করে তার অবিচারের কোন ফল হবে না;—চতুঃশক্তি সন্ধি, নয় শক্তি সন্ধি, ওয়াশিংটন সন্ধি অথবা প্যারিস সন্ধির দ্বারা চীনের অভিযোগ দূরীভূত হবে না। ঋণ দানের বিনিময়ে বিদেশীরা পণ্যদ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক হতে আজ বঞ্চিত করেছে চীনকে। নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ করতে তারা মূলধন খাটাচ্ছে চীনে। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের শিরা-উপশিরার কাজ করে যে সব রেলপথ, তা' আজ বিদেশীদের হস্তে। চীনের প্রাকৃতিক সম্পদ্ আজ শোষণ করে নিচ্ছে বিদেশীরা। চীনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার আবার ফিরিয়ে আনতে হলে, চীনকে প্রথম এক হতে হবে, তারপর লড়াই করতে হবে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। একান্ত বন্ধুর এ পথ। মার্শাল চিয়াং কাই-শেকও জানেন সেটা। তাই তিনি তাঁর পঞ্চাশতম জন্মোৎসবে বলেছিলেন:—

"But inspite of this I still cherish great hope; I find despair neither in the defect of international justice nor in our own apparent importance. My hope lies in the revival of our old national traits of self-reliance, self-improvement, temperance and self-consciousness."

চীনকে আবার নূতন করে গড়ে তুলতে মার্শাল চিয়াং কাই-শেক আজ বদ্ধপরিকর। বৃটেন প্রভৃতি পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের মত জাপানও চীনে 'Divide & Rule' নীতির প্রয়োগ করে আসছিল। উত্তর ও দক্ষিণের—কুয়োমিনটাং ও কম্যুনিষ্টদের পারস্পারিক অন্তর্বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে চীন ক্রমশঃ হয়ে পড়ছিল দুর্বল, অসহায় ও পঙ্গু।

আর এ সুযোগে একটির পর একটি করে জাপান চীনের সমৃদ্ধশালী প্রদেশগুলো নিচ্ছিল গ্রাস করে। জেনারেল চিয়াং কাই-শেক জাতির দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন এদিকে। ১৯২৮ সালের চ্যাং সো-লিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র চ্যাং সু-লিয়াং এসে মিলিত হলেন চিয়াং কাই-শেকের পতাকা তলে। ভেদাভেদের সব জঞ্জাল বিসর্জ্জন দিয়ে মাঞ্চুরিয়া তখন মিলিত হোল সাধারণ শত্রু জাপানের বিরুদ্ধে।

চীনা কম্যুনিষ্টদের প্রতি তিনি প্রথম দিকে অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন। কিন্তু ১৯৩৪ সালে কম্যুনিষ্টদের প্রতি তিনি তাঁর নীতি পরিবর্ত্তন করেছেন। নানকিং আর ক্যাণ্টন আজ সাম্রাজ্যবাদী জাপানের বিরুদ্ধে একক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা, চিয়াং কাই-শেক এ কথা ভাল করে জানেন, চীনে নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তার করতে জাপানের মত আর কোন বৈদেশিক শক্তির তেমন কোন হীন লোলুপতা নেই। চীনকে তাই আজ বাঁচতে হ'লে নিজেকে মুক্ত করতে হবে জাপানের এই সাম্রাজ্যবাদী অক্টোপাশের কবল থেকে। তাই আজ গত দশ বৎসর ধরে জেনারেলিসিমো চিয়াং কাই-শেক গরিলা যুদ্ধ চালিয়ে আসছেন আধুনিক মারণ অস্ত্রে সুসজ্জিত প্রবল পরাক্রান্ত জাপানের সঙ্গে।

জাপ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গরিলা যুদ্ধ চালিয়ে এলেই শুধু নূতন চীন গড়ে উঠতে পারে না। জাতির অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও পুনরুদ্ধার করতে হবে। সে জন্ত আর্থিক ও ব্যবসা-বাণিজ্যিক সংস্কার ও উন্নতিসাধন সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। কেননা, চীন ভারতবর্ষের মত কৃষি-প্রধান দেশ। অর্থনৈতিক আধিপত্য ছাড়া রাষ্ট্রীয় শান্তি ও শক্তি অসম্ভব। কিন্তু চিয়াং কাই-শেক এ অসম্ভব কার্যে ব্রতী হয়েছেন। আর তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করছেন তাঁর সহধর্ম্মিণী ম্যাডাম সুং-মিং-লিং (Soong Mie-ling)। ইনি ম্যাডাম ডাঃ সুন ইয়াৎ-সেনের ভগ্নি। ১৯২৭ সালে এঁকে বিবাহ করেন মার্শাল চিয়াং কাই-শেক।

গত ৩০ বৎসরের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যেও চীনের অর্থনৈতিক জীবন আজ এগিয়ে চলেছে দ্রুত গতিতে। তার বৈদেশিক বাণিজ্য আজ বেড়ে উঠেছে সাড়ে তিনগুণ। আফিং আমদানী কমে এসেছে বহুল পরিমাণে। দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। রেলপথ বিস্তার ও রাজপথ নির্ম্মাণের কাজ সুরু হয়েছে। সুদূর পল্লীতে পল্লীতে আজ গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছে। অনেক গ্রামে চাষীদের ব্যাঙ্কও খোলা হয়েছে। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উন্নতিও চলেছে পূর্ণোদ্যমে।

নবীন চীনের নবগঠিত চীনা-বাহিনী। পণ্ডিত জহরলালের চীন-গমন উপলক্ষে নব-জাগ্রত চীনের পক্ষে তাঁহাকে অভিনন্দন দেওয়া হইতেছে

শান্তিই হোল চিয়াং কাই-শেকের পররাষ্ট্র নীতির একমাত্র শিরদাঁড়া। কুয়োমিনটাং কংগ্রেসের যে অধিবেশনে তিনি ঘোষণা করেছিলেন :—

"We shall not forsake peace unless the hope of peace is lost, nor shall we talk about sacrifice until we are driven to extremity."

চিয়াং কাই-শেকের এই শান্তির নীতিকে অনেকে একদিন ভুল বুঝেছিল দুর্বল নীতি বলে। কিন্তু শত শত বৎসরের শোষণ আর লুণ্ঠনের ফলে অসহায় দুর্বল চীনের এ ছাড়া যে আর কোন উপায় ছিল না। আপন উদ্যানের সংস্কার বিধানেই চীন যখন রত, তখন শক্তিশালী কোন বৈদেশিক রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ যতদূর সম্ভব পরিহার করাই চীনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পন্থা। স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্ম যুদ্ধ করতে তিনি কোন দিন পিছ্-পা হননি।

রোম একদিনে তৈয়েরী হয়নি। বহু শতাব্দীর তন্দ্রা-ঘোর কাটিয়ে চীনকে আবার নূতন ছাঁচে গড়ে তোলার কাজ সময়সাপেক্ষ। জেনারিসিমো চিয়াং কাই-শেক আজ এই মহৎ ব্রতে ব্রতী হয়েছেন। তাঁর বিশ্রামের এখনো সময় আসেনি। মহাচীনের ত্রাণকর্ত্তা হিসেবে এবং ভারতের সহিত চীনের সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের হেতু তিনি আজ আমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তির যোগ্য। মহাচীনের এই দারুণ দুর্দ্দিনে পরাধীন ভারতবাসীর পক্ষে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ভারতের হৃদয়ার্ঘ্য ও সহানুভূতি চীনে গিয়া জানাইয়া আসিয়াছেন। মার্শাল আজ চীন-ইতিহাসের এক সংকটজনক মুহূর্ত্তের সম্মুখীন হয়েছেন। প্রবল পরাক্রম জাপানের সঙ্গে চীন আজ একটানা সাড়ে চার বছর ধরে জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত। চীনকে আজ বাঁচতে হবে। নইলে ৪০ কোটি নর-নারীর কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য—চার সহস্র বৎসরের প্রাচীন 'স্বর্গীয় রাজ্যের' গৌরবময় মহিমা পৃথিবীর বুক হতে মুছে যাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে।

প্রাচ্যের তোরণ-দ্বার সিঙ্গাপুর

শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার

প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধ পরিচালনা ও সুদূর প্রাচ্যের নিরাপত্তার প্রশ্ন আজ সিঙ্গাপুর দ্বীপের হিতাহিতের উপর নির্ভর করিতেছে। আমরা এই প্রবন্ধে সিঙ্গাপুর নৌ ও বিমান ঘাঁটি নির্ম্মাণের সাম্প্রতিক ইতিহাস ও ইহার সামরিক অবস্থান সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

সিঙ্গাপুর দ্বীপ উত্তর হইতে দক্ষিণে ১৪ মাইল এবং পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ২৭ মাইল। জোহর প্রণালীর এক সঙ্কীর্ণ গমনাগমনের সেতু ইহাকে মালয়ের মূল ভূখণ্ডের সহিত যুক্ত করিয়াছে (সম্প্রতি বৃটিশ পক্ষ তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় এই দ্বীপ এক্ষণে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে)। ভৌগোলিক অবস্থান, বাণিজ্যিক প্রাধান্য ও সামরিক গুরুত্বের দিক দিয়া সিঙ্গাপুরের স্থান ব্রিটিশ বিশেষ প্রাচ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে প্রায় অদ্বিতীয়।

গত মহাযুদ্ধের পর সিঙ্গাপুর ঘাঁটির নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয়। ১৯১৯ সালে এ্যাডমিরাল লর্ড জেলিকো বৃটিশ উপনিবেশগুলিতে সফর করিয়া সিঙ্গাপুরে বৃটিশের প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবহরের ঘাঁটি নির্ম্মাণের জন্ম সুপারিশ করেন। ইহার পর পেনাংয়ে বৃটিশ নৌ-কর্ত্তৃপক্ষগণের যে বৈঠক হয় তাহাতে লর্ড জেলিকোর এই প্রস্তাব সমর্থিত হয়। ১৯২১ সালে লণ্ডনের সাম্রাজ্যিক সম্মেলনে লর্ড জেলিকোর সুপারিশ অনুযায়ী সিঙ্গাপুরে ঘাঁটি নির্ম্মাণ স্থির হয়। ইহার পরে ১৯২২ সালে ওয়াশিংটনে বড় বড় শক্তির মধ্যে যে নৌচুক্তি সম্পাদিত হয় তাহার ফলে ইঙ্গ-জাপানী চুক্তির অবসান ঘটে। এই সময় সিঙ্গাপুরে ঘাঁটি নির্ম্মাণ প্রশ্ন লইয়া ইংলণ্ড ও তাহার বাহিরে বিশেষ জাপানে যথেষ্ট সমালোচনার সৃষ্টি হয়।

সিঙ্গাপুরে ঘাঁটি নির্ম্মাণের সিদ্ধান্ত স্থির হইলেও ইংলণ্ডের বিভিন্ন গবর্ণমেণ্ট পরিবর্ত্তনের ফলে কাজ আরম্ভ করিতে বিলম্ব হইয়া যায়। কারণ ইংলণ্ডের শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট বরাবরই ইহার বিরোধী ছিলেন। অবশেষে ১৯২৪ সালে বৃটেনের শাসন-ক্ষমতা রক্ষণশীলদের হস্তান্তরিত হইলে সিঙ্গাপুর সামরিক ঘাঁটির নির্ম্মাণের কার্য্য সুরু হয় এবং এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, এই ঘাঁটি নির্ম্মাণে বৃটেনের ১৫ বৎসর কাল লাগিয়া যায়।

১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত কলকব্জা যন্ত্রপাতি প্রভৃতি বাবদে সিঙ্গাপুর ঘাঁটির জন্ম খরচ হইয়াছে প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। সৈন্য পোষণ, দুর্গরক্ষা প্রভৃতি বাবদ খরচ প্রথম হইতে ধরিলে এই ব্যয় প্রায় ৫ কোটি পাউণ্ডের মত হইবে। বৃটেনের তহবিল হইতে এই

বিরাট ব্যয়ের সামান্যই আসিয়াছে। সমস্ত খরচ যোগাইয়াছে হংকং, নিউজিল্যাণ্ড, ষ্টেটস্ সেটেলমেণ্ট এবং প্রাচ্য দ্বীপসমূহের সুলতানগণ।

স্বাভাবিক অবস্থায় সিঙ্গাপুর ঘাঁটির বার্ষিক খরচ পাঁচ লক্ষ পাউণ্ডের মত পড়ে, তন্মধ্যে ষ্টেটস্ সেটেল্‌মেণ্ট বা মালয়ের খাস উপনিবেশই যোগাইত ৪ লক্ষ ৬৪ হাজার পাউণ্ড। অহিফেন বিক্রয় এবং টিন ও রবারের উপর রপ্তানী শুল্ক বসাইয়া ইহার বেশীর ভাগ অর্থ আদায় হইত।

সিঙ্গাপুরের সামরিক ঘাঁটি সম্বন্ধে বলিতে গেলে প্রথমেই নৌ-ঘাঁটির কথা বলা দরকার। নৌ-ঘাঁটির সমগ্র এলাকা ধরিলে প্রায় ২১ বর্গ মাইল হইবে। ইহার দুইটি বিরাট ডক্, একটি ফ্লোটিং বা ভাসমান এবং

ব্রিটনের বিখ্যাত কোলিয়ার জেটি : সিঙ্গাপুর

মালয়ের আদিম অধিবাসী

অপরটি গ্রেভিং বা স্থাবর। একটির দূরত্ব অপরটি হইতে প্রায় আধ মাইল। ভাসমান ডকটিই প্রথমে সিঙ্গাপুরে বসান হয়, দৈর্ঘ্যে ইহা ৯০০ ফুট এবং প্রস্থে ২০০ ফুট। জগতে ইহা তৃতীয় বৃহত্তম ভাসমান ডক। যে কোন ব্যাটলশিপকেই ইহা বক্ষে ধারণ করিতে পারে। ইংলণ্ডে এই ডক নির্মাণ করাইয়া অংশে অংশে ১০।১২ হাজার মাইল সমুদ্র দিয়া ইহাকে টানিয়া আনা হয়। নূতন গ্রেভিং বা স্থাবর ডকটি খোলা হয় ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। দৈর্ঘ্যে ইহা ১০০০ ফুট। প্রায় দশ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ে এই ডক ছয় বৎসরে নির্ম্মিত হয়। ইহা নির্ম্মাণে ৫ লক্ষ স্কোয়ার ইয়ার্ড কংক্রীট লাগে। জগতের যে কোন জাহাজ অনায়াসে ইহাতে রাখিয়া মেরামত করা চলে। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, ইহাতে ৬ কোটি ৮০ লক্ষ গ্যালন জল ধরে। ভাসমান ডক প্রয়োজন হইলে অন্যত্র সরান চলে। এই দুই ডকের কাছেই রহিয়াছে মেসিন ঘর, বিদ্যুতের কারখানা, গুদাম ঘর এবং বিরাট ক্রেন বা কপিকল। সুয়েজ খালের পূর্ব্বে এত বড় ক্রেন আর নাই। প্রয়োজন হইলে জাহাজের বড় বড় কামান ইহার সাহায্যে তোলা যায়। সিঙ্গাপুর সহর হইতে প্রায় ১২ মাইল দূরে জোহর প্রণালীর দক্ষিণ তীরে এই নৌ-ঘাঁটি অবস্থিত।

নৌ-ঘাঁটির কিছু পূর্ব্বেই বিমান ঘাঁটি। সিঙ্গাপুরে সামরিক বিমান অবতরণের তিনটি প্রশস্ত ক্ষেত্র আছে। সিঙ্গাপুরের এই সুবিধা জিব্রাল্টারে নাই। সামরিক ঘাঁটি ছাড়াও সিঙ্গাপুরে একটি প্রথম শ্রেণীর সিভিল এয়ার পোর্ট আছে। সেখানে স্থলে ও জলে উভয় স্থানেই বিমান অবতরণ করিতে পারে। ইহার পর পূর্ব্বদিকে দুর-পাল্লার উপকূলরক্ষী কামানশ্রেণী আছে। বিশেষজ্ঞের মত, ঐ কামান-শ্রেণীর অগ্নিবর্ষণের আশঙ্কায় সমুদ্রবক্ষে ২৫ মাইলের মধ্যে কোন শত্রু-জাহাজ প্রবেশ করিতে পারিবে না। সিঙ্গাপুরের অস্ত্রাগার ভূগর্ভে এবং তৈলাধার বিশেষভাবে সুরক্ষিত। প্রকাশ সিঙ্গাপুরে প্রায় দশ লক্ষ টন তেল মজুত রাখার ব্যবস্থা আছে।

সিঙ্গাপুরের প্রাচীন নাম সিংহপুর। হিন্দু সংস্কৃতির সহিত একদা ইহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। বিষুবরেখার সন্নিকট বলিয়া বার মাসই

আধুনিক আলোকপ্রাপ্ত একটি মালয়ী পরিবার

এখানে গরম। চীনা, মালয়ী, জাপানী, ইরাণী, আফগানী, ফিলিপাইনি, ভারতবাসী, ইউরোপীয় প্রভৃতি বহু জাতির সংমিশ্রণে সিঙ্গাপুর বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। শহরের জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ মনোরম।

সংক্ষেপে ইহাই হইল সিঙ্গাপুরের আধুনিক ইতিহাস ও তাহার রণ ব্যবস্থা। বর্ত্তমানে অপ্রত্যাশিত নূতন কায়দায় জাপ-আক্রমণের ফলে এ

সাগরতীরের একটি নয়নমনোহর দৃশ্য : সিঙ্গাপুর

বিরাট সামরিক ঘাঁটির পতন হইয়াছে। পতনের ফলে প্রশান্ত মহাসাগ ও প্রাচ্যে সুদূরপ্রসারী পরিবর্ত্তনের সূচনা আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

ভেঙো মনোবাঁধ

শ্রীক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

গন্ধ পুষ্পগুলি থরে বিথরে,
প্রভাতকালে তুলিয়া প্রিয়।
ছন্দের অঞ্জলী এনেছি ভরে
খেলার ছলে, তুমি হাসিয়া নিও।

প্রস্ফুট হেনা যদি বাস্না বিলায়,
স্বর্ণ চাঁপার বনে সন্ধ্যা ঘনায়,
ছিন্ন মেঘেতে ঢাকে দ্বাদশীর চাঁদ
প্রিয়, তখন ক্ষণেক তরে ভেঙো মনোবাঁধ।

পূর্ব্বরাগ*

শ্রীবীরেন রায়

—তুই দেখি সবাইকে হার মানালি সেজদি! তোর মুখ দেখে কে বলবে, ওর কাছ থেকে এই নিমন্ত্রণ পাওয়ার জন্ম কাল পর্য্যন্তও তুই ঘর-বা'র করেছিলি? আমরা হলেও মনের চাঞ্চল্য গোপন করতেই চেষ্টা করতাম হয়ত, কিন্তু তোর মত এতটা!···ব্‌বাবাঃ, মুখখানা যেন একেবারে বিস্ফোটকের মত সূঁচালো করে' তুলেছিস্!

বীণা ক্রুদ্ধ বিদ্রূপের স্বরে সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, আমার মুখের পানে চেয়ে থাকতে তোমাকে তো কেউ বলেনি রিণা, তুমি···তুমি অন্য চেষ্টা দেখ!

রিণা বাধা দিয়ে বলল, অতটা রেগে যাওয়ার আগে আয়না দিয়ে একবার মুখখানা দেখলেই বুঝতে পারতিস, রূপ বর্ণনায় খুব বেশী অত্যুক্তি করি নি।

বীণা মরিয়া হয়ে বলল, আচ্ছা, এইবার অন্যের রূপচর্চ্চা ছেড়ে নিজের চরকায় তেল দাওগে, আমার মুখের দুর্ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না··

রিণা তবু আশা করেছিল, আয়না দিয়ে মুখ দেখার এই প্রস্তাব মেজদি বোধ হয় গ্রহণ করতেও পারে; কিন্তু বোঝা গেল আপাততঃ সে ইচ্ছাও বীণার নেই। সুতরাং কতকটা যেন কৃপাবশেই সে প্রসঙ্গ ত্যাগ করে' রিণা গুণগুণানি সুরে একটা দুরূহ রাগিণী আয়ত্ত করার চেষ্টা করতে লাগল।

রিণার যেন কুড়ির এপারে, অর্থাৎ প্রজাপতির পাখার দাপটে তার কুমারীজীবনের শান্তি এবং মনের আকাশে অনঙ্গদেবের সিংহাসন এখনও সপ্রতিষ্ঠ হয়ে ওঠেনি। সুতরাং কারও প্রতি, বিশেষতঃ বীণার এই সঙ্কটমুহূর্ত্তে তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করা তার পক্ষে কঠিন নয়।

কিন্তু বীণা গত বৈশাখে পঁচিশ পেরিয়েছে, তার সমস্যা স্বতন্ত্র···

মিঃ গুপ্তের চির মৌন প্রেম যেদিন থেকে প্রজাপতির পাখায় ভর করেছে, সেদিন থেকে মাঝে-মাঝেই বীণার মুখে জমে উঠেছে এই দুর্ব্বোধ্য ভ্রূকুটী এবং তার চোখের কোণে ও সুডৌল ললাটে দেখা দিয়েছে চিন্তার অস্পষ্ট রেখা···এবং যত বারই বীণার সেই দুর্ব্বোধ্য মুখচ্ছবি রিণার চোখে পড়ছে, ততবারই তার বুকের মধ্যে জাগছে একটা জটিল উদ্বেগের শঙ্কিত প্রতিধ্বনি। দুর্ব্বোধ্য বলে'ই এর প্রতি তার সন্দেহ ও বিরাগের অবধি নেই···কিন্তু তথাপি রিণা একে ঠিক উপেক্ষাও করতে পারছে না।

আমি বলছিলাম কি মেজদি, তুই যদি মুখের এমনি চেহারা করে' ওদের বাড়ী যাস্, তবে কি মিঃ গুপ্তের ওপর খুব অবিচার করা হবে না? তার চেয়ে বরং তা'হলে···

রিণা বলতে চাচ্ছিল, 'তা'হলে নাই গেলি'; কিন্তু তার মনে আশা ছিল মিঃ গুপ্তের সঙ্গে মেজদির বিয়ে হয়ে যাবেই, সুতরাং তাঁর জন্মদিনের নিমন্ত্রণ কোনও ছলে না রাখা যেতে পারে, বীণার মনে এ চিন্তার রেখাপাত করাও এই মুহূর্ত্তে সঙ্গত হবে না, এই ভেবে সে চুপ করতে বাধ্য হ'ল।

কিন্তু বীণা তার এই সহৃদয় ভাবনার প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে', তর্জ্জনের সুরে বলল, জেঠামির জন্ম ধন্যবাদ রিণা! এইবার চুপ করবে কি?

রিণার মনে হ'ল, বীণার কালো চোখে কি যেন একটা জটিল সন্দেহের সর্পিল শিখা বিদ্যুতের মত জলছে; কিন্তু তীব্র ভর্ৎসনায় কুণ্ঠিত হয়ে সে পাশের শয্যার উপরে বসে' পড়ল এবং কেশবিন্যাসের ফাঁকে ফাঁকে বীণার দিকে অপাঙ্গে চেয়ে ভাবতে চেষ্টা করল, কি করে এই ব্যাপারে মেজদিকে একটু সাহায্য করা যেতে পারে!···

বীণার মুখের বিব্রত ভ্রূকুটি-কুটিল ভঙ্গী তার প্রতি

---

* ডি. এইচ. লরেন্সে'র In Love হইতে—এই অনুবাদ প্রায় আক্ষরিক হলেও, আবহাওয়াটা যথাসাধ্য বাংলা গল্পের কাছে-ভিতে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এই জন্ম, গল্পের মধ্যে দু'একটি লঘু বিবরণে কিছু অন্যথা, এবং Hester (: বীণা), Henrietta (: রিণা), Joe (: মিঃ গুপ্ত) প্রভৃতি বৈদেশিক নাম বর্জ্জন করা হ'ল। —লেখক

রিণার স্নেহক্লিষ্ট মনকে অবিরত কশাঘাত করে' চলেছিল···

কিছুক্ষণ পরে সে আবার বলল, মেজদি, আমিও যদি তোর সঙ্গে মিঃ গুপ্তের ওখানে যাই, তবে কেমন হয়! ওঁরা অবশ্য আমাকে যেতে বলেন নি, কিন্তু, কিন্তু তোর জন্ত না হয় রবাহুতই গেলাম!

বীণা ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলল, যেতে চাস্ চল; কিন্তু তুই গেলে আমার কি লাভ হবে শুনি!

মানে, হাতের কাছে একজন সঙ্গী কেউ থাকলে, হয়ত তোরই কিছু কিঞ্চিৎ সুবিধা হ'তে পারে···

বীণা শূন্যগর্ভ বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল, মানে মনস্তত্বের সবগুলি অধ্যায়ই তোর পড়া হয়ে গেছে, না?

বেলা ৮ টার পর···স্কুলের বোর্ডিং-হাউস-সংলগ্ন তার কোয়ার্টার থেকে বীণা একাই রওনা হ'ল ষ্টেশনের দিকে···

মিঃ গুপ্তের প্রধান উপজীবিকা দমদম রোডের উপর তাঁর বিরাট্ পারফিউমারী ওয়ার্কস্। কারখানা-ঘরেরই এক নিভৃত প্রান্তে এত কাল স্বল্প সজ্জা ও নিরুদ্বেগের মধ্যে তার সঙ্গীহীন দিনগুলি কেটেছে অক্লান্ত চেষ্টার হেরফেরে।

কিন্তু কয়লা-ধূম-ধূসরিত নিরাভরণ কক্ষে দাম্পত্য-জীবন যাপন করা চলে না, তাই সম্প্রতি তিনি আগরপাড়া অঞ্চলে প্রায় ত্রিশ বিঘা জমির উপরে এক বিস্তৃত প্রমোদ-গৃহের পত্তন করেছেন।

এই প্রগতির যুগেও মেয়েরা বিয়ের আগে প্রায়ই জানতে পারে না, তার দাম্পত্যজীবন সুরু হবে কি পরিবেশের মধ্যে, কিন্তু বীণার সুযোগ হ'ল, পূর্ব্বাহ্নেই তার দিকে আড়চোখে দেখা নেওয়ার···

মিঃ গুপ্তের প্রমোদগৃহ প্রাসাদোপম ত' নয়ই; নাগরিক রুচিতে সজ্জিত আরামপ্রদ 'মডার্ণ ফ্ল্যাট'ও নয়। তবে এর পক্ষেও একথা বলার আছে যে, মিঃ গুপ্তের স্বকীয় ভঙ্গীতে নির্ম্মিত তৃণপত্রের বিস্তীর্ণ পটভূমে বাংলো ধরণের ক্ষুদ্র গৃহটী জীবনযাত্রার বিচিত্র বিন্যাসেও কখনও প্রস্তরীভূত নাগরিক প্রয়োজনের জটলা হয়ে দাঁড়াবে না; এবং যে নবীনতার শ্রী এর সঙ্গে আজ ঝলমল করছে, যত্নে লালিত হ'লে, দীর্ঘকাল ধরে তা অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে।

বীণার মুখে উদ্বেগের যে দুর্ব্বোধ্য ভ্রূকুটী দেখে রিণা শঙ্কিত হয়েছিল, তার প্রতি কর্ম্মচঞ্চল মিঃ গুপ্তের দৃষ্টি পড়ল না; অথবা তা' লক্ষ্য ক'রেই তিনি বললেন, বীণা, তোমাকে একটু শিথিল দেখাচ্ছে, মানে নাগরিক ক্লান্তি ·· যা' অজ্ঞাতে তোমাদের জীবনে তারুণ্যকে অবিরত প্রহার করে' চলেছে। এখানে দু'-চার দিন থাকার পর তুমি নিজেই তা' বুঝতে পারবে!

বীণা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে বলল, হয়ত, এখনও পারছি কিছু কিঞ্চিৎ···

বৃক্ষকাণ্ডের হৈমন্তিক পত্রমোচন সবে সুরু হয়েছে। ক্ষুদ্র বাংলোর চারিদিকের পরিষ্কৃত জমিতে, সুড়কি-বর্জ্জিত রাস্তার উপরে মৃদু পবনে তাড়িত বিবর্ণ হরিৎ পত্রের মন্থর সংক্রমণ, ইতিমধ্যেই বীণার চোখে একটা মোহ বিস্তার করেছিল:

তার স্মিত মুখের সম্যক্ প্রশংসায় মিঃ গুপ্ত খুসীতে কণ্টকিত হয়ে উঠলেন···

জন্মদিনে এই গৃহে বীণার আতিথ্যের জন্ত মিঃ গুপ্তকে নির্ভর করতে হ'ল তার নব নিযুক্ত সহকারী যুবকের উপরে। কাছে-ভিতেই কোথাও তাদের বাড়ী, সেখান হ'তে তার মাও নিমন্ত্রিতা হয়ে এলেন ভাবী প্রভু-পত্নীর জন্ত রান্নাবান্নার উদ্যোগ-আয়োজন করতে।

প্রৌঢ়া রান্নাঘরের সম্মুখে বীণাকে একবার নিভৃতে পেয়ে মৃদু হেসে বললেন, এর পর তোমাকেই তো এ সবের ভার নিতে হবে মা!

বীণা মৃদুকণ্ঠে প্রতিধ্বনির মত বলল, তাই না!

তারপর বহুক্ষণ ধরে' তার শুধুই মনে হ'তে লাগল, রান্নাঘরের উত্তপ্ত বাতাসে কথাগুলি যেন তপ্ত তরঙ্গের মরীচিকাই সৃষ্টি করে' চলেছে···

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর পুত্রসহ প্রৌঢ়া বিদায় নিয়ে গেলেন···

বীণা অপ্রতিভভাবে হেসে মিঃ গুপ্তের দিকে অপাঙ্গে একটী দৃষ্টি নিক্ষেপ করল…

তাঁর চোখে মুখে তখন ফুটে উঠেছে, যেন বহুদিনের প্রতীক্ষায় ক্লান্ত স্থির অথচ কঠোর কোন কর্ত্তব্যের ভাবনা।

তিন চার ঘণ্টা ওদের এখন কাটাতে হবে পরস্পরের সান্নিধ্যে এই নির্জ্জন গৃহের মধ্যে…

ছ'মাস আগেও এটা কখনও তাদের কাছে কোনও সমস্যার ব্যাপার বলে মনে হয় নি; রহস্যে, বিদ্রূপে কত দীর্ঘকাল তা'রা ইতিপূর্ব্বে নির্জ্জনে কাটিয়েছে বন্ধুর মত, এবং দুই পরিবারের মৌন সম্মতিক্রমে। তখন তাদের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার ছিল সৌজন্য ও শালীনতায় শোভনতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ…

তারপর কোন এক দুষ্ট গ্রহের চক্রান্তে মিঃ গুপ্ত সুদীর্ঘ মৌন ভঙ্গ করে' বীণার প্রতি প্রকাশ্যে প্রেম-নিবেদনের দুরাচরিত ভ্রমে পতিত হ'লেন…এবং বীণাও অতি দ্রুত সম্মতি দিয়ে ফেলল তাঁর সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবে!

কিন্তু বীণা যদি তখন ঘুণাক্ষরেও জান্‌ত, তার পরিণাম হবে…নির্জ্জন গৃহে এই প্রাণান্তকর অস্বস্তি… এবং কুণ্ঠিত, লজ্জাকর ও পঙ্কিল এই নীরবতা, তা' হলে সে কখনও সম্মতি দিত না তাঁর ঘৃণিত প্রস্তাবে; অকুণ্ঠ চিত্তে তাঁকে প্রত্যাখ্যান ক'রে বল্‌ত, নরনারীর মধ্যে, ভাবী স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের চেয়ে বন্ধুত্বের পরিচয়ই শত-সহস্র গুণে যুক্তিসহ!

বীণা মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠল, এই নির্জ্জন গৃহে, মিঃ গুপ্ত হয়ত এখনই তার কাছে প্রেমের পরীক্ষায় যে কোন দাবী করে বসতে পারেন…

তারপর বহুক্ষণ ধরে মনের এই অকারণ শঙ্কায় বিব্রত হয়ে, বীণা নিজেকে মনে মনে তীব্র ভৎ'সনা ক'রে বলল, তাতেই বা কি আসে যায়, তাদের বিয়ের প্রস্তাবই যখন চূড়ান্ত ভাবে স্থির হয়ে গেছে। তবু, তবু যদি তাঁর দাবী সে সহ্য না করতে পারে, তবে সে তো তারই অন্যায়…

কিন্তু সমস্ত যুক্তিতর্ক ছাপিয়ে বীণার সর্ব্বদেহ-মনে ভরে' উঠল একটা নিরাকার অস্বস্তি এবং ঘৃণিত দ্বিধা…

কিছুক্ষণ পরে মৌন ভঙ্গ করে' মিঃ গুপ্ত বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন, বীণা! আমি তোমার জন্য যতটা ব্যাকুল হয়ে উঠেছি, তুমি হয়ত আমার জন্য তার কণামাত্রও…

বীণা ক্ষণকালের জন্য স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, রুক্ষকণ্ঠে বলল, না হ'লেই বা কি—তাতে এই মুহূর্ত্তে কারও কোনও লোকসান হবে না, বরং লাভ…তাই না?

বীণার এই দোহারা উত্তর, মিঃ গুপ্তের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হ'ল মাত্র, কিন্তু কর্ণে প্রবেশ করল না। কারণ, কোনও কিছুই, এবং বিশেষ করে' ভাবী পত্নীর মনোভাবকে যথাযথ বিশ্লেষণ করে' দেখার মত ধৈর্য্য তাঁর নেই; সন্দেহের যা' কিছু, তাকে দৃষ্টির বাইরে রেখে দেওয়াই তাঁর রীতি, যা' মানসিক উদ্বেগ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার চরম পন্থা।

মিঃ গুপ্ত জানেন, তরুণীর মনস্তত্ত্ব থেকে মোটরগাড়ীর কলকব্জা বা গৃহের পরিদর্শনকার্য্যে তাঁর দক্ষতা সমধিক।

ভাবী পত্নীর সঙ্গে যথার্থ উপমা দেওয়া চলে এমন কোনও কিছুর চিন্তামাত্র তাঁর মনে উদিত হয় জটিল কলকব্জার ষ্ট্রীম-লাইনড্‌ মোটরগাড়ীর কথা…

তাঁর দৃঢ় ধারণা, বীণার সুন্দর বহিরঙ্গের সুষ্ঠু প্রসাধনের অভ্যন্তরে কোথাও নিশ্চয় গোপন আছে অগণিত ভাল্‌ভ, ম্যাগেনেটো ও এক্সিলারেটারের সূক্ষ্ম সমাবেশ: কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মোটরগাড়ীকে যেমন নিপুণ হস্তে চালিয়ে নেওয়া যায়, বীণাকে এখনও তা' সম্ভব হচ্ছে না, অথবা তার চেয়ে এই কথা বলাই বেশী সঙ্গত যে, তার জন্য চেষ্টা করার কোনও সূত্রই পাওয়া যাচ্ছে না…

বলা বাহুল্য, বীণার মত একটা জটিল যন্ত্রকেও দাম্পত্যের পথে বা'র করতে হ'লে, প্রথমতঃ তাকে চালিয়ে দেওয়া প্রয়োজন; অবশ্য এমন অনেক আধুনিক যন্ত্র আছে, যারা আপনিই চলে; কিন্তু তাদেরও প্রথমতঃ যথাস্থানে মোচড় লাগানো চাই। এবং বীণার সম্বন্ধে মিঃ গুপ্তের মোটের উপর অভিজ্ঞতা এই হয়েছে যে, একবার চালিয়ে দিতে পারলে হয়ত সে এত বেশী জোরে ছুটতে পারে, যে তাঁকে হাল ধরে' সতর্ক হয়ে থাকতে হবে পথের বাঁকগুলির জন্য। কিন্তু সে অনেক পরের কথা, প্রথম সমস্যা হচ্ছে তাকে চালিয়ে দেওয়া…

কিন্তু মিঃ গুপ্ত এতদিন পর্য্যন্ত শুধু নির্ব্বোধের

বীণার শুষ্ক কঠোর বহিরঙ্গের দিকে তাকিয়ে দাম্পত্যের পথে বহু দূর এগিয়ে চলার ভাণ করেছেন···কিন্তু ভবিতব্যই জানে তার গতিবেগ কোন অঙ্কে পৌছেছে···

দুপুর বেলাটা নির্ব্বিঘ্নে কাটল। বীণা স্বেচ্ছায় বৈকালিক জলযোগ এবং ঘরকন্নার খুঁটিনাটীতে মন দিয়েছিল; এবং সে যতক্ষণ কাজে ব্যস্ত ছিল, ততক্ষণ কখনও বা দূর থেকে, কখনও নিকট সান্নিধ্যেও মিঃ গুপ্তের সঙ্গ তাঁর ভালই লেগেছিল। তারপর হাত-মুখ ধুয়ে তাকে আবার সৌজন্যের খাতিরে প্রবেশ করতে হ'ল নির্জ্জন কক্ষে, মিঃ গুপ্ত যেখানে বসেছিলেন একটা প্রকাণ্ড শোফার উপরে প্রতীক্ষায় চঞ্চল হয়ে:

তার মুখে ফুটে উঠেছে কৃত্রিম শালীনতার একটা কপট অভিনয়: বীণা নৈরাশ্যে মরিয়া হয়ে ঘরে প্রবেশ করল···

মিঃ গুপ্ত চকিত হয়ে শোফাটার এক প্রান্তে সরে' বসে' বললেন, বীণা, এইখানে এসে বসো না!

তাঁর কণ্ঠে তীব্র আগ্রহের সুর বীণার কাণে মধু-বর্ষণ করল না; কিন্তু তার মনে হ'ল, অন্য কোনও মেয়ে হ'লে হয়ত এই আহবানে খুসীই হ'ত; তাই সে বহু যত্নে দ্বিধা ত্যাগ করে' সঙ্কুচিত দেহে তাঁর পাশে গিয়ে বসল বটে, কিন্তু তার রক্তপ্রবাহে একটা দুর্ব্বার ক্রোধ টগ্‌বগ্‌ করে' ফুটতে লাগল: কি দুঃসাহস!

অতি দ্রুত চিন্তায় সে মনে মনে স্থির করে' ফেলল, শোফাটাকেও তবে কেনা হয়েছে এই ঘৃণিত উদ্দেশ্যে···

ধীরে ধীরে কার যেন করাল গ্রাসের মত মিঃ গুপ্তের বাম বাহু তাকে বেষ্টন করল: পীড়িতদেহ বীণা মনে মনে চিন্তা করতে লাগল—হয়ত এরই নাম আলিঙ্গন: প্রেমের কি সকরুণ পরীক্ষা!

মিঃ গুপ্ত পূর্ব্বাহ্নেই তার চির সঙ্গী পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে রেখেছিলেন মেঝের উপরে: বীণা দ্রুত কটাক্ষে দেখে ভীত হ'ল, পৌরুষ ও সৌজন্যের এই শেষ প্রসাধন বর্জ্জন করে' মিঃ গুপ্তের মুখে ধরা পড়েছে যেন একটা নগ্ন মূঢ়তার দুরপনেয় ছায়া···গ্রীবার পার্শ্বে, উর্ণাবৃত পতঙ্গের উপর মাকড়সার দাঁড়ার প্রহারের মত অঙ্গুলীর উন্মত্ত নর্ত্তন অনুভব করে' বীণা কণ্টকিত হ'ল: তার মনে হতে লাগল, এরপর তাকে নিয়ে সুরু হবে, কোন এক জন্মমূঢ়ের আরও কি দুঃসহ প্রণয়কৌতুক!

বীণা অতি দ্রুত ভাবতে চেষ্টা করল, আচ্ছা, ডন জুয়ান, লর্ড বাইরণ বা অন্য এমন কেউ, বহু নারীকে যাঁরা প্রেম-ভঙ্গীতে মুগ্ধ করেছিলেন, তাঁরা কেমন করে' সুরু করতেন তাঁদের প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণ! নিশ্চয়ই ওর মত অক্ষম ও বর্ব্বর প্রথায় নয়!

সহসা ওষ্ঠপুটে মৃদু প্রহার অনুভব করে' বীণা চকিত হয়ে উঠল, কি ভয়ানক, এই বুঝি চুম্বন!

বীণা ধৈর্য্যচ্যুতির ভঙ্গীতে ক্লিষ্ট সুরে বলল, দেখুন, এর চেয়ে আপনি না হয় বেহালাটাই একটু বাজান···

এখন!

হ্যাঁ, এখনই। দয়া করে নিখাদে আলাপ ধরুন, কেমন যেন ঝিমুনি লাগছে!

কিছুক্ষণ কুণ্ঠিত নীরবতার পরে মিঃ গুপ্ত মন্থর পদে উঠে গিয়ে বেহালা এনে বাজানো সুরু করলেন, তাঁর হাতের মীড় ও মূর্চ্ছনাগুলি সূক্ষ্ম, বীণা উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল···

নিখাদে আলাপ মন্দ নয়, কিন্তু যে কোন রাগিণীতে হোক বেহালাটা বেজে ওঠাই বীণা তার চেয়ে বেশী প্রয়োজন মনে করেছিল এই ভেবে যে, তারপর মিঃ গুপ্তের প্রণয়াবেগ মন্থর হয়ে আসতে বাধ্য···

হ'লও তাই: বীণা মধুর কণ্ঠে বলল, ধন্যবাদ, এইবার দয়া করে' রবীন্দ্রনাথের ঐ গানটা: বর্ষা-বন্দনা···

মিঃ গুপ্ত প্রথম কলির পর বর্ষা-বন্দনার সুর-মূর্চ্ছনায় মুগ্ধ হয়ে অর্দ্ধমুদিত নেত্রে ছড়-চালনায় ব্যাপৃত হ'লেন; বীণা চকিতে খিড়কীপথে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বা'র হ'ল বাইরের মুক্ত প্রাঙ্গণে···

তখন রোদ পড়ে এসেছে: হৈমন্তিক অপরাহ্নের মৃদু পবন বীণার উত্তপ্ত দেহ-মনে বুলিয়ে দিল একটা স্নিগ্ধ স্পর্শ: তার মনে হ'ল, সূর্য্যদাহে তপ্ত পৃথিবী যেন উন্মুখ হয়ে আহ্বান করে' নিয়ে এল দিগন্তে প্রবাহিত হিমশীতল বিস্মৃতির ভাগীরথীধারাকে···

দূর থেকে কাণে এসে লাগছে বেহালার নিপুণ সুরে বর্ষার আবাহনগীতি: বীণা তৃপ্ত মন্থর দৃষ্টিতে তাকাল

বহুদূরবিস্তৃত তৃণাঞ্চলা ধরণীর পানে···তারপর সহসা চকিত হয়ে দ্রুতপদে অগ্রসর হ'ল অদূরবর্ত্তী বৃক্ষকুঞ্জের দিকে। মনে পড়ল মিঃ গুপ্তের তন্দ্রাভঙ্গের পূর্ব্বেই তাকে চলে যেতে হবে অন্ততঃ এত দূরে, যেখান থেকে তাঁর আহ্বান যেন তার কাণে না পৌঁছতে পারে···

পিঠের উপর দ্রুত পদক্ষেপে হিন্দোলিত দীর্ঘ বেণীর স্পর্শে তার মনে হ'তে লাগল, যেন কার অদৃশ্য কশাঘাতে সে মেজাজার ঘোড়ার মত ছুটে চলেছে নিরুদ্দেশের পানে:

অবশ্য নিরুদ্দেশ প্রয়াণের পথ মিঃ গুপ্তের গৃহসীমানার উচ্চ প্রাচীরে রুদ্ধ হয়েছে, এটা তার দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু তথাপি হৈমন্তিক অপরাহ্নের ক্ষীয়মাণ রৌদ্রে দিবাস্বপ্ন দেখতেই বীণার ভাল লাগছিল: আহা! আকাশের প্রান্ত বেয়ে যদি সে অবাধে চলে যেতে পারত দিগন্ত পার হয়ে অজানার রাজ্যে। যদি···

তারপর কল্পনার দৌরাত্ম্যে নিজেই বিব্রত হয়ে বীণা অস্ফুট মন্তব্য করল, আমি কি নির্ব্বোধ! কিন্তু আসন্ন সীমায় তার গতিপথ পরিবেষ্টিত দেখেও তার গতিবেগ শিথিল হ'ল না। এবং চলতে চলতে সে চিন্তা করতে লাগল, মিঃ গুপ্ত এবং তার রুগ্ন প্রেম ছাড়া জীবনের অন্য কোনও অর্থ যদি সে খুঁজে পেত···

'রুগ্ন প্রেম', কথাটা সে বারে বারে নানা ছন্দে আবৃত্তি করতে লাগল, এবং প্রতিবারেই তার সঙ্গে সঙ্গে তার কুমারীত্বের অভ্রভেদী গৌরব যে অবনমিত লাঞ্ছিত হয়ে ধূলায় লুটাতে লাগল···

এমন সময়ে তার চোখে পড়ল, প্রাচীরলগ্ন তৃণভূমির উপর থেকে বুনো চেহারার দুই তিনটা ঘোড়া তার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি প্রসারিত করে', যেন তার দুঃসাহসের পরিমাপ করার চেষ্টা করছে: সুতরাং তাকে অবিলম্বে গতিবেগ সংযত করতে হ'ল। কিন্তু তার ক্ষুব্ধ লাঞ্ছিত মনে ঘুরে ফিরতে লাগল একটা ক্রুদ্ধ আক্রোশ: হাঁ, এই হচ্ছে ওর রুগ্ন প্রেমের নৃশংসতম পরিচয়; ওর কাছ থেকে চলে আসার পথ ও স্বহস্তে রুদ্ধ করে' দিয়েছে নিপুণ কৌশলে!

বীণাকে বাধ্য হয়েই প্রত্যাবর্ত্তন করতে হ'ল বাংলোর দিকে···কিছুদূর অগ্রসর হয়েই বীণার মনে হ'ল, বেহালার সুরমূর্চ্ছনা আর শোনা যাচ্ছে না···তবে কি···

হায় ঈশ্বর! বীণা চারদিকে একটা ক্ষিপ্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করে' ব্যাধ-তাড়া হরিণীর মত দ্রুত পদে গিয়ে পৌঁছল এক ঘনশাখাপত্রবিবৃত বনস্পতির ছত্রতলে, এবং তারপর তাড়িত মার্জ্জারের মত ক্ষিপ্র লঘু গতিতে উঠে ওৎ পেতে বসল তার এক ঘনপল্লবিত শাখার আড়ালে···

কিছুক্ষণ পরেই চতুর্দিকে সন্ধানী দৃষ্টিপাত করতে করতে মিঃ গুপ্ত খিড়কির মোড় ঘুরে এসে দাঁড়ালেন পেছনের চত্বরে···

কি দুর্যোগ! নিশাচরের মত পল্লবিত শাখার অন্তরাল থেকে বীণা রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রতীক্ষা করতে লাগল।

মিঃ গুপ্ত এগিয়ে চলেছেন দৃঢ় পদে, তার উন্নত ললাট এবং দীর্ঘ দেহ থেকে আহত পৌরুষের একটা স্ফুরিত দম্ভ যেন ফুটে বার হচ্ছে···কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই বীণার মনে হ'ল: এ শুধু তার কল্পনা। ওর উদ্ধত পদক্ষেপ ব্যর্থতার একটা শোচনীয় পরাজয়ই শুধু প্রকাশ করছে। পৌরুষের যে দীপ্তি মন্ত্রবলে বীণাকে আকর্ষণ করে' পদপ্রান্তে নিক্ষেপ করতে পারত বহু দূর-দূরান্তর থেকে, সে দীপ্তি ওর নেই! ও কেন এত মন্থর এবং এত অক্ষম!

বীণা!

মিঃ গুপ্তর মৃদু কণ্ঠস্বরে তার অন্তরের দুর্জ্জয় অভিমান গোপন রইল না···

বীণার মনে হ'ল, এ যেন তার অজ্ঞাত কোন এক গ্রহান্তর থেকে প্রেমের আর্ত্ত সম্ভাষণ। কিন্তু এ আহ্বানে তার সাড়া দেবার প্রয়োজন নেই···কিন্তু, কিন্তু পাছে মনের অজ্ঞাতে সে কোনও চাঞ্চল্য প্রকাশ করে' ফেলে, এই ভয়ে বীণা রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করতে লাগল···

মিঃ গুপ্ত অস্থির অনির্দ্দিষ্ট মনে কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ পদচালনা করে' মোড়ের মুখে আবার অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সহসা বীণার কেমন যেন একটা পীড়া বোধ হ'তে লাগল। এবং কে যেন তার মনের মধ্যে থেকে কৌতূহলী গ্রীবা তুলে' বলল—বীণা, ইচ্ছা করলে তুমি ওর প্রতি আরও একটু দয়া করতে পার।

এবং পরক্ষণেই তার সমস্ত দেহতন্ত্রী যেন সেই স্বরে একসঙ্গে গুন্‌গুনিয়ে উঠল।

কিন্তু মন বিমুখ হয়ে বলল, ক্ষমা কর, ওর সঙ্গে স্থূল প্রেমলীলায় এই মধুর অপরাহ্ন আর তিক্ত করে' তুলতে আমার উৎসাহ নেই…এবং তার কল্পনাও আমার দুঃসহ মনে হচ্ছে। ওর প্রেমে পড়ার চেয়ে বরং পঙ্কে পড়ার অদৃষ্ট-বিড়ম্বনাতেও রাজী আছি। কারণ তা'ও ওর রূঢ় স্থূল প্রেমোত্তাপের চেয়ে সুসহ :

দ্রুত চিন্তায় কথাটা হঠাৎ যেন তীরের মত বীণার বুকে বিঁধে রইল : ওর এই রুগ্ন প্রেমতৃষ্ণা থেকেই কি চূড়ান্তভাবে প্রমাণ হয় না, যে ও আমাকে ভালবাসে না! ভালবাসলে কি সে তার উৎক্লান্ত দেহে অত রূঢ়ভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারত…তার মনের উপর করতে পারত এই ঘৃণিত উৎপীড়ন!

ভাবতে ভাবতে বীণার দুই চোখে জল ভরে' এল এবং তা মুছে ফেলার জন্য জ্যাকেটের মধ্য থেকে কৌশলে রুমালখানি বা'র করার চেষ্টা করতে গিয়ে, সহসা আশ্রয়-চ্যুত হওয়ার উপক্রম হ'তেই তার সম্বিৎ ফিরে এল…

দূর থেকে সে দেখতে পেল, বাইরের ঘরে অনুসন্ধানের পর মিঃ গুপ্ত এইবার ব্যর্থ ক্লান্ত মনে ফিরে যাচ্ছেন তাঁর বাংলোতে…

তিক্ত মনে, যেন অদৃশ্য ভবিতব্যকে লক্ষ্য করে' বীণা ক্ষীণ কণ্ঠে বিলাপ করতে লাগল, কেন তুমি আমাকে নিক্ষেপ করেছ এই বিসদৃশ দুর্ভাবনার মধ্যে? বিয়ের প্রস্তাবে তো আমার কিছু প্রয়োজন ছিল না, কেউ আমার প্রেমে পড়বে তার জন্যেও আমি কখনও কোনও সস্তা প্রশ্রয়ের ধার দিয়ে যাইনি; তবু কেন আমাকে এই দুঃখ দিচ্ছ! হয়ত অন্য মেয়েরা এই রকম স্থূল প্রেম-সম্ভাষই পছন্দ করে, তা' না হ'লে পুরুষরাই বা কেন এমন হবে? হয়ত আমিই শুধু সবার থেকে স্বতন্ত্র, অদ্ভুত! তাই প্রেমার্ত্ত পুরুষের গৃহত্যাগ করে' আমাকে আশ্রয় নিতে হ'ল তার গৃহসীমানার বৃক্ষকোটরে…কে আমার দেহ-মনে বপন করেছিল এই ঘৃণিত দ্বিধা! কেন শুধু আমার মনে হচ্ছে, ওর সঙ্গে আমার যা' কিছু ছিল সহৃদয় সম্পর্ক, তাকে চিরদিনের জন্য দলিত বিপর্য্যস্ত করে' দিয়েছে ওর ঐ রূঢ় প্রেমতৃষ্ণা; ওকে বিয়ে করতে হলে, তা'ই আমাকে প্রতি দিন ওর কাছ থেকে গ্রহণ করতে হবে হাসি-মুখে এবং নত মস্তকে! নারী-জীবনের উপর অদৃষ্টের বা প্রেমের এ কি দুঃসহ, ঘৃণিত পরীক্ষা!

তরুশয্যা আর তার স্বচ্ছন্দ মনে হচ্ছিল না। বাতাস হয়ে উঠেছে হিমমন্থর, এর পর হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগলে হয়ত সম্পূর্ণ শীতকালটা তাকে সর্দ্দিজ্বরে ভুগতে হবে! বাংলোর পর্দ্দা-টানা বাতায়নগুলি ঘরের উষ্ণ পরিবেশের ইঙ্গিত বহন করে আনছে,…বীণা আপন মনে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিল। তারপর অন্য মনে কি যেন ভাবতে ভাবতে তরুশয্যা থেকে নামতে গিয়ে হঠাৎ তার পদস্খলন হ'ল; এবং বৃক্ষতলের তৃণভূমি থেকে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে সে দেখতে পেল, হাতের কব্জির সামান্য একটু ছড়্ লাগা ছাড়া দেহে আর কোনও আঘাত লাগেনি বটে, কিন্তু তার বহু-প্রশংসিত জর্জ্জেট শাড়ীর আঁচলটা ছিঁড়ে গেছে। মৃদু স্বরে একটা কঠিন শপথ উচ্চারণ করে' বীণা ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে অগ্রসর হ'ল বাংলোর দিকে, মনে মনে মিঃ গুপ্তের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার জন্য প্রস্তুত হ'ল…

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সে শুনতে পেল সদর দেউড়ীতে একখানা দ্রুত চল্‌তি মোটরের হঠাৎ টানা ব্রেকের শব্দ এবং হর্ণের সতর্ক মৃদু ধ্বনি : তারপর মন্থরগতি মোটরের হেড-লাইট থেকে প্রতিফলিত অস্তরাগরঞ্জিত সূর্য্যালোকের একটা ক্ষীণ প্রতিধ্বনি দেখা গেল বাংলোর সম্মুখভাগের সিমেণ্ট-বাঁধানো প্রাঙ্গণে…

বীণার সমস্ত দেহ-মন আলোড়িত করে' অস্ফুট চাপা কণ্ঠে দ্রুত প্রশ্নের মত ধ্বনিত হ'ল, রিণা! ··

চঞ্চল পদে বীণা ছুটে এল সদর দেউড়ীর কাছে…

গাড়ীর মধ্য থেকে রিণার স্নিগ্ধ উদ্বিগ্ন প্রশ্ন ভেসে এল, এই সেজদি, কি খবর তোর!

বীণা সদর দেউড়ী ভর করে' দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌ল, রিণা, তুই…

রিণা স্নিগ্ধ কণ্ঠে আবার প্রশ্ন করল, সেজদি, তোর খবর কি বল!

বীণা ক্রোধের ভাণ করে' বল্‌ল, তার মানে?

রিণা অকারণে বিব্রত হয়ে বল্‌ল, মানে আবার কি!

এলাম, তাই ; কিন্তু তোকে দৌড়ে আসতে না দেখলে, মোটর থামাতেই ভরসা হচ্ছিল না ; এসেছিলাম দীপ্তির বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেতে, এখন চলছি লেকে বেড়াতে··· চমৎকার দিনটা পড়েছে না ?

দীপ্তি রিণার নবপরিণীতা সহপাঠিনী ; তার স্বামীও সম্প্রতি এই অঞ্চলে এক বাসগৃহ পত্তন করেছেন। সুতরাং মিঃ গুপ্তকে এ অঞ্চলের নিঃসঙ্গ রবিন্‌সন্ বলা চলে না।

বীণা কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করল, তোরা কে-কে

"আমি, দীপ্তি, আর·· আর মিঃ সেন।"

"মিঃ সেন কে ?"

রিণার পাশ থেকে এক তরুণ যুবক মুখ বা'র করে' সহাস্যে বলল, মিঃ গুপ্ত আমাকে খুব জানেন, সঙ্গে আমার বৌদিও আছেন !

বীণা অপ্রতিভ হয়ে মৃদু কণ্ঠে বলল, রিণা, ওঁদের নামিয়ে নিয়ে আয়, চা খেয়ে যাবেন···

এইবার দীপ্তি সহাস্যে উত্তর দিল, চা খেয়েই বেরিয়েছি ; আপনি ব্যস্ত হবেন না। রিণাকে দিয়ে যাচ্ছি, তবে আমরা নামতে পারছি না বলে' কিন্তু রাগ করবেন না ; একটু বাধা আছে !

বীণা ভ্রূকুটী করে' বলল, বাধা ! কেন ?

"সেজদা হয়ত মনে ভাববেন, আমরা গুপ্তচর্য্যায় বেরিয়েছি···"

বীণা বিমূঢ়ার মত তার দিকে তাকাল ; রিণা তীক্ষ্ণ হাস্যে ঝঙ্কার দিয়ে বল্‌ল, তার মানে, তোর বুদ্ধিটা এখন সহজ নেই, নইলে বুঝতে কষ্ট হ'ত না যে, দীপ্তি মিঃ গুপ্তের···

বীণা চকিত বিস্ময়ে দীপ্তির দিকে মুখ ফিরিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলল, ওঃ, নামুন, সেজদা মনে ভাববেন না···

মিঃ সেন সহাস্যে বলল, তা' ছাড়া বৌদি যে অন্যত্রও একটু আবদ্ধ আছেন, মানে···বড়দা পাঁচটা থেকে লেকে প্রতীক্ষা করে' থাকবেন···

"তা' হলে আমাকেই আপনাদের সঙ্গে যেতে হ'ল।"

এই বলে' বীণা দেউড়ী খুলে গাড়ীর দিকে অগ্রসর হ'ল···

কিন্তু রিণা তীব্র কৌতূহল কোন ক্রমেই চাপতে না পেরে' ব্যস্ত হয়ে নেমে পড়্‌ল, এবং পড়ন্ত রৌদ্রে মূর্চ্ছিত ক্ষুদ্র বাংলোটার দিকে উৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' বল্‌ল—, একবার নামাই যাক না, লেক থেকে ফিরতে যদি এর পর রাত হয়ে যায় !

মিঃ সেন আচমকা গাড়ীতে ষ্টার্ট দিতে দিতে সহাস্যে বল্‌ল—আগেই তোমাকে বলেছিলাম বৌদি, ওঁকে ধরে' রাখা যাবে না।

বীণা বিব্রত হয়ে বলল, আপনারা নামবেন না !

"সব শুদ্ধ নামলে, বড়দাকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করতে হবে, তার চেয়ে, আপনিই ইতিমধ্যে দেখে ফেলুন কি সব আপনার দ্রষ্টব্য আছে এখানে" : তার কথার সুরে ক্ষুন্ন অভিমানের রেশ গোপন থাকল না।

দীপ্তি মৃদু হেসে বল্‌ল, আচ্ছা দিদি, তুই এর মধ্যে দেখে আয়, আমরা চার-পাঁচ মিনিট পরেই আবার আসছি, তোকে তুলেও নিয়ে যাব ! ঠাকুরপো, দোক্তার কৌটা ফেলে এসেছি, একটু বাড়ীর দিকে চল না ভাই !

গাড়ী মোড় ঘুরে' দীপ্তিদের বাড়ীর দিকে ছুটে' চলল।

ওদিকে পথের উপরে, দুই বোন পরস্পরের দিকে একবার অপাঙ্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে', মৌন মন্থর গতিতে প্রবেশ করল মিঃ গুপ্তের ক্ষুদ্র বাংলোর বিস্তীর্ণ চত্বরে···

পরক্ষণেই রিণা বীণার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে চাপা কণ্ঠে বল্‌ল—তারপর সেজদি ! বীণা ভ্রূকুঞ্চিত করে' নীরবে পথ চলতে লাগ্‌ল।

রিণা উদ্বেগের সুরে বল্‌ল—বোধ হয় আমি হঠাৎ এসে পড়াতে, তুই মনে ভাবছিস্···

বীণা নৈরাশ্যের ভঙ্গীতে শুধু বল্‌ল—না, ভাবিনি !

কিন্তু সেজদির কাছ থেকে মিঃ গুপ্ত সম্পর্কে যা' হোক একটা কিছু মন্তব্য না শোনা পর্য্যন্ত রিণার মনের উদ্বেগ দূর হচ্ছিল না ; মনঃপীড়ার দ্রুত সমাধানের আশায় সে আর একবার বীণার হাতে মৃদু চাপ দিতেই বীণা দুই চোখে বিদ্যুৎ বর্ষণ করে' বলল : আঃ রিণা···তোর

ইতিমধ্যে তারা বাংলোর কাছে এসে' পৌঁছল : এবং কথা অসমাপ্ত রেখে'ই বীণা লঘু পদে একেবারে দুই তিনটা সিঁড়ি পেরিয়ে বাহির ঘরের ভেজানো দরজা ধাক্কা দিয়ে

খুলে' ফেল্‌ল : দেখা গেল, মিঃ গুপ্ত দ্বারের দিকে পেছন ফিরে আর্ম্ম-চেয়ারের উপর নিশ্চল পাথরের মূর্ত্তির মত বসে' আছেন, দরজা খোলার শব্দ যেন তাঁর কাণেই প্রবেশ করেনি।

বীণা কোন রকম ভূমিকা না করে'ই বলল, রিণা এসেছে : কিন্তু তার চাপা দ্রুত কণ্ঠের আবেগ বেজে' উঠ্‌ল একটা অতিরিক্ত এবং অনুচ্চারিত প্রশ্ন, দরজা বন্ধ করে' এমন নিশ্চল হয়ে বসে' আছেন কেন, অদ্ভুত তো!

মিঃ গুপ্ত ত্রস্ত হয়ে উঠে' দাঁড়ালেন, কিন্তু তাঁর কঠিন মুখে এবং চক্ষুতে দুর্দ্দান্ত ক্রোধের উত্তাপ গোপন রইল না।

প্রায় রুক্ষ-স্বরে তিনি প্রশ্ন করলেন—রিণা, তুমি হঠাৎ…

কিশোরী রিণা নিরীহ কণ্ঠে বল্‌ল—এই এলুম!

বীণা টিপ্পনী কর্‌ল, মিঃ সেন আর দীপ্তির সঙ্গে…

মিঃ গুপ্ত অধিকতর রুক্ষস্বরে প্রশ্ন কর্‌ল, তাঁরাও আস্‌ছেন নাকি!

বীণা মৃদু হেসে বল্‌ল, না, তাঁরা বাইরে প্রতীক্ষা করছেন। আপনি না গেলে আস্‌বেন না।

মিঃ গুপ্ত তার কথার উত্তর দিলেন না, কিন্তু অতিথিদের অভ্যর্থনা করতে যেতে তিনি প্রস্তুত নন, এটা তাঁর ভাবে বোঝা গেল।

রিণা নম্রকণ্ঠে বলল, না জানিয়ে এসে পড়ে' অযথা বিব্রত করে' তুলেছি বোধহয়। তারপর সুসজ্জিত ঘরের চারদিকে কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বল্‌ল,—বাইরে, তপোবনের বেশটাই জাঁকালো, দেখে মনে হয়েছিল, ঘরের মধ্যে এসেও দেখব গৈরিক পাট ও রিক্ত সজ্জার সমারোহ…কিন্তু দেখছি, আপনার বাহিরটা একটু রূঢ় হ'লেও, ভেতরের রুচিটা প্রশংসার যোগ্য : আশা করি, এইবার একটু বসতে পারি।

মিঃ গুপ্ত সপ্রতিভ হয়ে আর্ম্মচেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে অস্ফুটে কি মন্তব্য করলেন, বোঝা গেল না…

রিণা দুই হাত দিয়ে জানুদ্বয় বেষ্টন করে' আল্‌তো হয়ে বসে'ই আবার উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌ল,—অবশ্য আমি আবার একটু পরেই চলে' যাচ্ছি!

বীণা বিচিত্র সুরে বলল,—না, কোথাও যেতে হবে না।

রিণা বিস্মিত হয়ে বলল—কিন্তু ওঁরা যে বল্‌লেন, আমাকে নিতে আস্‌বেন!

পরমুহূর্ত্তেই পথের মোড় থেকে মোটরের হেড-লাইট থেকে প্রতিফলিত রক্তাভ আলো ক্ষণকালের জন্য তার মুখখানা রক্তিম করে' দিল।

বীণা ত্রস্তে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌ল,—আচ্ছা, আমি ওদের বলে' আসছি…

মিঃ গুপ্ত দুই বোনের দিকে পর্য্যায়ক্রমে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে' বললেন,—তোমাদের কথাবার্ত্তায় যেন একটা ঘরোয়া চক্রান্তের আভাস পাওয়া যাচ্ছে,…

বীণা ক্রুদ্ধ স্বরে বল্‌ল,—মোটেই না, রিণা যখন এসে'ই পড়েছে,…ওকে আমি ছেড়ে দিতে চাইছি না—এই মাত্র!

রিণা বিব্রত বোধ করে' বলল,—কিন্তু সেজদি, ঘণ্টা দুই পরেই তো আবার ফিরে আস্‌তুম, তবে যাই না!

বীণা তার দিকে দৃঢ় চক্ষু তুলে' সংক্ষেপে বল,—না।

মিঃ গুপ্ত মৃদু হেসে বললেন,—হয়ত এই রকম হঠাৎ চলে' আসার কথা নিয়ে ইতিপূর্ব্বেও তোমাদের একবার ঘরোয়া যুদ্ধ হয়ে গেছে, তাই না রিণা?

তার কথায় একটা জ্বালার আভাস ফুটে' বার হ'ল।

রিণা ব্যস্ত হয়ে বল্‌ল,—কথখোনো না, মিঃ গুপ্ত। কলেজ-ছুটীর পর দীপ্তিটা একরকম জোর করে'ই আমাকে টেনে এনেছে! …জানিস্ সেজদি, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে' আমিই বরাবর মোটর চালিয়ে এলাম…

কিন্তু তার এই কৈশোর-উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে বীণা মিঃ গুপ্তের দিকে দ্রুত কটাক্ষ নিক্ষেপ করে', ক্রোধগম্ভীর স্বরে বল্‌ল,—আমিই যদি তোকে আসতে বলতুম, তা' হ'লেও কোন অপরাধ হ'ত না, আর এসে' পড়েছিস্ বলে' তোকে লজ্জাই পেতে হবে, তারও কোনও মানে নেই।

এই পরোক্ষ সম্ভাষণে রিণা বিব্রত বোধ করে' বলল,—কিন্তু, সত্যিই তো আর তুইও আমাকে আস্‌তে বলিস্ নি, আর আমিও আগে থেকে কিছু ঠিক করে' আসিনি। মিঃ সেন ঠিকই বলেছিল, একেবারে লেক থেকে ফিরে' আসার পথেই আমাদের এখানে নামা উচিত ছিল,

কিন্তু দেউড়ী থেকে তোকে দৌড়ে আস্‌তে দেখেই, কেমন যেন একটা কৌতূহল হ'ল, মানে মনের ফলকে লেখা পড়ে' গেল একটা প্রশ্নচিহ্নের যতি,—সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য্য হয়ে দেখলাম মনের অজ্ঞাতসারে ব্রেক চেপে দিয়েছি··· যাক্, এইবার চললাম।

এই বলে' রিণা দ্বিধান্বিত ভাবে উঠে' দাঁড়িয়ে শাড়ীর আঁচলটা একবার টেনে ঠিক করে' নিল, এবং তারপর দরজার দিকে অগ্রসর হ'ল···

বোধহয় তার অতি ক্ষীণ অস্ফুট কণ্ঠে শোনাও গেল, এবার হয়ত গিয়ে দেখব, মিঃ সেনের কলকণ্ঠেও ভাঁটা পড়েছে···

কিন্তু বীণা ত্রস্ত হয়ে তার পথরোধ করে' ক্রুদ্ধ চাপাকণ্ঠে বল্‌ল,—কোথায় যাস্ রিণা, তা' হ'লে আমিও চল্লুম তোর সঙ্গে।

রিণা মিঃ গুপ্তের দিকে মৌন প্রশ্নের একটা তড়িৎ-কটাক্ষ নিক্ষেপ করে', বীণাকে সম্বোধন করে'ই বলল,—কি হ'ল তোদের!

মিঃ গুপ্ত মৃদুস্বরে কি যেন একটা স্পষ্ট শপথ উচ্চারণ করলেন, কিন্তু তাঁর প্রস্তরবৎ কঠিন মুখ দেখে' পূর্ব্বাপর কিছুই ধারণা করা গেল না: রিণা ব্যস্ততায় উগ্রকণ্ঠে বল্‌ল,—জান্‌তুম, তোরা এমনি একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসবি,—এই সেজদি, বল্‌না, কি হয়েছে!

বীণা বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বল্‌ল,—কি হ'তে পারে, দেখনা ভেবে!

রিণা মুখ ফিরিয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠে বল্‌ল,—মিঃ গুপ্ত, সম্ভবতঃ আপনিও এ পর্য্যন্ত কিছু বুঝতে পারেন নি, তাই না!

বিদ্যুৎ ঝলকের মত রিণার এই স্নিগ্ধ উদ্বেগ অধিকার করে' বস্‌ল মিঃ গুপ্তের মন, এবং বীণা নির্ব্বাসিতা হ'ল ক্রুদ্ধ আক্রোশের অতলে—

"শুধু এই পর্য্যন্ত জানি, আমাকে বেহালায় বর্ষা-বন্দনা বাজাতে অনুরোধ করে' তোমার সেজদি হঠাৎ বনদেবীর মত ঘর থেকে অদৃশ্য হয়েছেন···সম্ভবতঃ তারপর থেকে ওঁর যন্ত্রসজ্জা বিকল হয়ে পড়েছে···

বীণা অতি উচ্ছ্বাসে অলীক হাস্যে ফেটে' পড়ে' বল্‌ল,—বাহিরের বাতাসে হাঁপ ছেড়ে' বাঁচার গভময় চেষ্টাকে 'বনদেবীর অন্তর্দ্ধান' বলে' কল্পনা করলে কথাটা মন্দ শোনায় না বটে, কিন্তু যন্ত্রসজ্জা বিকল হয়েছিল আমার না আপনার, সেটা ঠিক ঠাহর করতে পারছি না···

মিঃ গুপ্ত উত্তপ্ত কণ্ঠে বল্‌লেন,—যার যন্ত্র বিকল হয়েছে, বাইরের বাতাসের জন্য সেই হাঁপিয়ে মরে···

বীণা দুই চোখে বিদ্যুৎ বর্ষণ করে' বল্‌ল, তাই হবে! কিন্তু বাইরের বাতাস দরকার হয়েছিল কেন, সেটা বোধ হয় জানেন!

"আমি?···না। তবে তোমার কোন ব্যবহারের সঙ্গত কারণ খুঁজতে যাওয়া বিড়ম্বনা, এটা এতদিনে বুঝতে পেরেছি!

বীণা নিবিড় ঘৃণায় ওষ্ঠ কুঞ্চিত করে' বল্‌ল,—কিন্তু বা'র হয়ে যাওয়ার সঙ্গত কারণই ছিল!

বীণার এই অপ্রত্যাশিত উক্তিতে এক মুহূর্ত্তের জন্য ঘরের মধ্যে একটা বিমূঢ় বিস্ময়ের আব্‌হাওয়া ঘন হয়ে উঠ্‌ল।

রিণা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করল,—তার মানে?

বীণা ক্রোধে, অবজ্ঞায়, ঘৃণায় নির্ব্বাক্ হয়ে রইল···

বাহির থেকে মোটরের হর্ণের একটা মৃদু শব্দ শোনা গেল; রিণা চঞ্চল পদে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌ল,—ওরা ডাক্‌ছে, আমি চল্লুম!

বীণাও মথিত বিদ্যুল্লতার মত তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বল্‌ল,—চল, আমিও যাচ্ছি!

"কিন্তু কেন?" রিণা বজ্রাহতের মত থমকে দাঁড়াল।

মিঃ গুপ্ত প্রস্তরের মত কঠিন মৌনতায় বীণার উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগ্‌লেন।

বীণা সুগভীর ঘৃণায় ঠোঁট দু'টী বাঁকাল মাত্র, কিন্তু তার চোখে মুখে প্রচণ্ড ক্ষোভ উদ্যত হয়ে উঠ্‌ল।

মিঃ গুপ্ত যেন তার রন্ধ্রগত দ্বিধার সন্ধান পেয়ে রিণাকে লক্ষ্য করে' মৃদু ব্যঙ্গের স্বরে বল্‌ল,—বোন, তা' সম্ভবতঃ তোমার সেজদিও জানেন না···

বীণার রুদ্ধ হাস্য বন্ধনচ্যুত জলোচ্ছ্বাসের মত খর তরঙ্গে দুর্ব্বার হয়ে উঠ্‌ল: তারপর হঠাৎ প্রচণ্ড ক্রোধে জলে' উঠে সে বল্‌ল,—জানি, এবং আপনাকে সে কথা বলতেও আর দ্বিধা বোধ করা প্রয়োজন মনে করি না,—আপনার

ঐ স্থূল, দুঃসহ, রুগ্ন প্রেমসম্ভাষণ কি আমাকে সহ্য করতে বলেন!

বিদ্যুদ্দীর্ণ আকাশ থেকে বহুক্ষণ শঙ্কিত প্রতীক্ষার পর বজ্রনির্ঘোষের মত বীণার এই কঠিন মন্তব্য উচ্ছ্বিত শোণিতপ্রবাহে মিঃ গুপ্তের মুখখানাকে যেন জোয়ারের বেগে ক্ষণকালের জন্য রঞ্জিত করে' দিয়ে, রেখে গেল একটা বিবর্ণ পাণ্ডুর হরিদ্রাভা···

রিণা শুধু বলল,—তা' হ'লে ওঁর সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব···

বীণা ঝঙ্কার দিয়ে বল্‌ল,—না, বিয়ের নামে যদি কেউ প্রেমে পড়তে চায়, তবে বিয়েতে আমার উৎসাহ নেই।

রিণা মধ্যবর্ত্তিনী দেবদূতীর মত বল্‌ল,—কিন্তু প্রেমে না পড়লে কি তুই ওঁকে বিয়ে করতে রাজী হ'তিস্!

নিশ্চয় হ'তাম, আমার সঙ্গে প্রেমে পড়ার আগে ত কখনও ওঁর সঙ্গ আমার দুঃসহ মনে হয় নি!

এক মুহূর্ত্ত কথাটা ভেবে নিয়ে রিণা মৃদুস্বরে বল্‌ল,—কিন্তু সেজদি, কোনও মেয়ের সঙ্গে স্বয়ং বিয়ের প্রস্তাব করার ঝুঁকিটা বোধ হয় কেবল তারাই নিতে পারে, যারা তার সঙ্গে কিছু কিঞ্চিৎ প্রেমে পড়ে গেছে,—তাই না!

মনে মনে যত ইচ্ছা প্রেমে পড়তে পারে, তাই বলে'···

নিবিড় ঘৃণায় বীণা ক্ষণপূর্ব্বের পীড়িত স্মৃতি যেন দুই হাতে দূরে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করতে লাগ্‌ল।

মিঃ গুপ্ত লজ্জায় ও ক্রোধে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে বীণার এই অভিনয় দেখতে লাগ্‌লেন। ধীরে ধীরে তাঁর মুখের প্রতিটী রেখা যেন কঠিন প্রস্তরফলকে রূপান্তরিত হ'তে লাগ্‌ল···

"কিন্তু সেজদি, কেউ তোর প্রেমেও পড়তে পারবে না, এ দাবী কি তোরই কিছুটা অদ্ভুত বলে' মনে হচ্ছে না?"

"কিছুমাত্র না, মানে প্রেমে পড়ার অর্থ কি, তুই জানিস্ না, তাই ওকথা বলছিস্!"

রিণা একটা মৃদু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ক'রে বলল,—তা'হলে এতদিন পরে তোদের বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গেই দিতে হবে?···কি লজ্জার কথা!

বীণা কিছুক্ষণ মৌন ক্রোধে তার দিকে চেয়ে থেকে বল্‌ল,—ঈশ্বর না করুন, কিন্তু তুই যদি এক মুহূর্ত্তের জন্যও সহ্য করতিস্ এই ঘৃণিত, স্থূল, রুগ্ন উচ্ছ্বাস, যাকে প্রেম বলা হয়, তবেই বুঝতিস্ কোনটা বেশী লজ্জার কথা!"

রিণার যেন মন্তব্যটা সম্পূর্ণ পছন্দ হ'ল না; সে মিঃ গুপ্তের দিকে একটা কঠিন কটাক্ষ নিক্ষেপ করে' বল্‌ল—তা' হলে হয়ত নির্ব্বাচনেই তোর ভুল হয়েছে। অত দ্রুত ওঁর সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাবে রাজী না হয়ে, তোর বেছে নেওয়া উচিত ছিল এমন কাউকে, যে তোর ··

বীণা অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল—সেও হয়ত প্রেমেই পড়ত! আর তার আগে তো ওঁর সঙ্গও আমার কখনও দুঃসহ মনে হয়নি: কি ভয়াবহ ও হাস্যকর; তুই হয়ত তার ধারণাই করতে পারবি না, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর দ্রুত সরীসৃপের মত প্রেমের সেই স্থূল, ঘৃণ্য, লুব্ধ আক্রোশ···

রিণা ম্লান মুখে ক্ষণকাল চিন্তা করে' বলল, হাঁ, ঠিক বাঘের যেমন শাবকের গা-চাটা অথবা কোনও কুকুরের সামনে এক খণ্ড মাংসের কিমা ছুঁড়ে' ফেললে, সে সেটাকে উদরস্থ করার আগে যেমন কিছুক্ষণ সস্নেহে লেহন করতে থাকে···সন্দেহ নেই, ব্যাপারটা পূর্ব্বাপর অতি জঘন্যভাবে লজ্জারজনক···

বীণা ভ্রূকুঞ্চিত করে' বলল—হাঁ, এবং প্রেম সম্বন্ধে তা' আরও বিশেষ করে' এই জন্য যে ধর, যার সঙ্গ ক্ষণকাল পূর্ব্বেই ছিল সংযম, সৌজন্য ও শালীনতায় স্নিগ্ধ, সেই হঠাৎ প্রেমের রসায়নে রূপান্তরিত হ'ল যেন এক ঘৃণিত, ভয়াবহ, এবং লুব্ধ···

রিণা মাথা নেড়ে' বলল—সত্যি, দুঃসহ!

বাহির থেকে মোটরের হর্ণ এবার পুনঃ পুনঃ বাজ্‌তে লাগ্‌ল যেন ধৈর্য্য হারিয়ে।

রিণা তির্য্যক্ ভঙ্গীতে উঠে দরজা খুলে' বাহিরের দিকে মুখ বাড়িয়ে তীব্র কণ্ঠে চীৎকার করে' বলল, আমার জন্য দেরী করবেন না···আমি এখন যেতে পারছি না···

বাহির থেকে বাতাসে কার ক্ষুব্ধ কণ্ঠ ভেসে' এল, কত দেরী হবে আপনার!

"জানিনে!" বলে' রিণা যেন তার মুখের উপরেই সজোরে দরজা বন্ধ করে' দিল, এবং বিমর্ষ মুখে এবং নীরবে ফিরে' এসে' বসল আর্ম-চেয়ারটার উপরে, যদিও তার ইচ্ছা

হয়েছিল, মধ্যবর্ত্তিনীর ভণিতা ছেড়ে এইবার সেজদির পাশে গিয়ে দাঁড়াতে। কিন্তু সে বিস্মিত হয়ে দেখল ইতিমধ্যে নিহত পশুর মত নির্ব্বোধ দৃষ্টি বিস্ফারিত করে' মিঃ গুপ্ত বীণার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন...

বাহির থেকে এতক্ষণে মোটর ছাড়ার শব্দ শোনা গেল। রিণা ক্লান্ত ভগ্নকণ্ঠে বলল, ঠিক বলেছিস্ সেজদি, পুরুষ-জাতটাই বোধহয় অমনি ঘৃণিত লুব্ধ প্রকৃতির!

মিঃ গুপ্ত এতক্ষণে বীণাকে লক্ষ্য করে' যেন তাঁর মৌন ক্রোধের তূনীর থেকে একটী বিষাক্ত শরযোজনা করলেন, কিন্তু বীণা, আমার প্রেম সম্বন্ধে এতটা কৃতনিশ্চয় হওয়ার আগে, তোমার মত নিপুণার ভেবে দেখা উচিত, তুমি প্রেমে পড়ার যোগ্য কিনা?

যেন কার অদৃশ্য মন্ত্রবলে মরণাহত কুষ্ঠরোগী নবজীবন লাভ করে' উঠে দাঁড়িয়েছে, দুই বোন এমনি বিস্ময়বিমূঢ় ভাবে তাঁর দিকে তাকাল।

মিঃ গুপ্ত স্পষ্ট অনুভব করলেন যে, তাঁর কপিল চক্ষু থেকে লজ্জা, ক্রোধ ও ব্যর্থ বাসনার একটা উগ্র জ্বালা বিচ্ছুরিত হচ্ছে: সেই জ্বালায় অস্থির হয়ে তিনি আবার দংশন করলেন: "মানে, আমার তো মনে হচ্ছে প্রেমের পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হ'তে পারনি।"

বীণা উদাসীন কণ্ঠে বলল, তা' হ'লে শুধু এই তার প্রত্যুত্তরে বলা যায় যে, আপনি মিথ্যা দম্ভ করছেন!

কিন্তু রিণা তিক্ত কণ্ঠে বলল, তার মানে আপনি এতক্ষণ ওর সাথে শুধু একটা অভিনয় করছেন!

মিঃ গুপ্ত ক্রুর হাস্যে বললেন, হাঁ। আমার ধারণা হয়েছিল, বীণা তার জন্ম প্রতীক্ষা করে' আছে।

তার মুখে এতক্ষণ পরে এই অবজ্ঞার হাসি দুই বোনকে যেন যুগপৎ বিকল করে' দিল। সে যদি সহসা কালসর্প হয়ে দংশন করতে উদ্যত হ'ত, তবু হয়ত তারা এত বিমূঢ়া হ'ত না...

কিন্তু মিঃ গুপ্ত তাদের দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে' ব্যঙ্গের সুরে বললেন, অর্থাৎ আমি ভেবেছিলাম, ঠিক ঐ ধরণের অভিনয় না করতে পারলে বীণা ক্ষুব্ধ হবে...

বীণা তীব্রভাবে তাঁর দিকে তাকাল।

রিণা কটু ভর্ৎসনার সুরে বলল—এই রকম ভাবাটাও আপনার ইতরবৃত্তির একটা দৃষ্টান্ত মাত্র...

কিছুক্ষণ নীরন্ধ্র নীরবতার পর বীণা রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, জানিস্ রিণা, সত্যিই যদি ও হ'ত অভিনয়, তা'হলেও আমি কুণ্ঠিত হ'তাম না, কিন্তু আমি দেখেছিলাম, ওর চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে একটা ঘৃণিত উল্লাস...

রিণা একই সঙ্গে প্রশ্ন ও সমাধানের ভঙ্গীতে বলল, তাই না!

মিঃ গুপ্ত নির্ব্বোধের মত কুণ্ঠিত স্বরে বললেন, আমি ভেবেছিলাম, বীণাও সে অভিনয়ে সাড়া দেবে...

অর্থাৎ সেও করবে অভিনয়! অর্থাৎ "গৃহপ্রবেশের" ডুয়েট নাট্য, এমন না হ'লে প্রেম..., এই বলে' নিবিড় ঘৃণায় রিণা ওষ্ঠ কুঞ্চিত করল।

বীণা প্রচণ্ড ক্রোধে ভেঙ্গে পড়ার ভঙ্গীতে বলল, তা' হ'লেও হয়ত কিছু সুবিধা হ'ত রিণা, অন্ততঃ এই রুগ্ন প্রেমের অভিনয় সেরে, নব পর্য্যায়ে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করা যেত বীরাঙ্গনার মত তরবারি হাতে...

রিণা ক্ষুব্ধ হাস্যে বলল, সেই হ'ত ওঁর যোগ্য সম্ভাষণ!

মিঃ গুপ্ত হাসির উচ্ছ্বাসে বিব্রত হয়ে বললেন, কেন? না হয় বীণার এই কঠোর কুমারীব্রতভঙ্গের যোগ্যতা আমার নেই; কিন্তু তোমাদের মত এই তুলতন্দ্র আধুনিকা তরুণীদের প্রিয়তম বলে' যার খ্যাতি রটেছিল, সেই চিত্ত-গগনবিহারী রুডল্ফ ভ্যালেন্টিনোই বা ও-ছাড়া প্রেমের আর স্বতন্ত্র কি অভিধা দিয়ে গেছেন! কিন্তু তাঁর প্রতি করতালির পুষ্পাঞ্জলি দিতে তো তোমাদের কার্পণ্য দেখি না...

বীণা ভ্রূকুঞ্চিত করে' বলল, মৃত্যুর পর তাঁর কথা নিয়ে কাজ নেই, কিন্তু প্রেম সম্পর্কে তাঁর অভিধাকে আমি ঘৃণার যোগ্য মনে করি...

"কিন্তু এর আগে ত কখনও তা' করনি।"

"করেছি কিনা জানি না, কিন্তু তা' হ'লেও আপনাকে তাঁর ভূমিকায় দেখতে চাইনি।

"তার প্রয়োজনও হবে না, কারণ, আমারও ধৈর্য্যের হয়ত একটা সীমা আছে।

"শুনে অত্যন্ত আশ্বস্ত হয়েছি।" এই বলে' বীণা তার

চতুর্দ্দিকে রচনা করল একটা কঠোর মৌনতার গণ্ডী… মিঃ গুপ্তের সাধ্য হ'ল না তাকে অতিক্রম করতে…

কিছুক্ষণ পরে রিণা মৃদুকণ্ঠে বল্ল, ৯টার আগে ফিরে যাওয়ার ট্রেণ নেই, কিন্তু ততক্ষণ আমরা দীপ্তির ওখানে গিয়েও থাক্তে পারি…

বীণা দম্ভের সুরে বল্ল, তাই যাওয়া উচিত, কিন্তু…

মিঃ গুপ্ত ক্ষিপ্রকণ্ঠে বলল, কিন্তু দয়া করে' এখানে আর এক মুহূর্ত্তও থাকার প্রয়োজন নেই। তবে এটা বল্তেই হবে বীণা, যে এইভাবে এতদিন আমাকে প্রতীক্ষা না করিয়ে, এর বহু পূর্ব্বে তোমার মনোভাব আমাকে জানতে দেওয়াই উচিত হ'ত।

বীণা প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে' বল্ল, তখন কি জান্তুম আপনি প্রেমের মহড়া দিচ্ছেন, হয়ত কি মনে করতে পারেন, এই ভয়ে বলিনি।

মানে, তুমি আমাকে কষ্ট দিতে চাওনি?

বীণা জলে' উঠে' বল্ল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত শুধু প্রেমের অভিনয়ই করেছেন, তার তাতে কি আসে যায়!

মিঃ গুপ্ত প্রতিধ্বনির মত বল্লেন, তা' যায় না।

দেওয়ালে টাঙানো ক্লক-ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটাগুলি যেন ক্ষণকালের জন্য কথার চাপ থেকে অব্যাহতি পেয়ে অতি দ্রুত কিছু দূর অগ্রসর হয়ে গেল…

মিঃ গুপ্ত করুণ স্বরে বল্লেন, বীণা, তা' হলে এতদিন পরে আমি তোমার কক্ষচ্যুত হয়ে গেলাম…

বীণা ভ্রূকুটী করে' বল্ল, হাঁ। এইবার আপনি অভিনয়মঞ্চের ধারকরা প্রেমের মুখোস খুল্তে পারেন…

তার সেই ভ্রূকুটীলাঞ্ছিত মুখের দিকে অপাঙ্গে চেয়ে মিঃ গুপ্তের তীব্র অনুশোচনার মত মনে হ'ল, ওর সঙ্গে বহু দিনের নিবিড় পরিচয়ের মধ্যে সহসা নির্ব্বোধের মত এই ক্ষণিক প্রণয়-চাঞ্চল্য সমর্থন করে' দেখবার চেষ্টা না করাই হয়ত তাঁর উচিত ছিল।

তাঁর বিস্ফারিত চোখে জ্বলতে লাগ্‌ল বীণার প্রতি অসীম ধৈর্য্যে লালিত স্নেহের স্থির দীপ্ত শিখা এবং তাকে বেষ্টন করে' কেমন যেন দুর্ব্বোধ্য, কেন্দ্রগত, ধূমায়িত বাসনার মণ্ডলী, যা' যৌবনের দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর তাঁর পরিণত মনে সংক্রামিত হয়েছে বিদ্যুৎগর্ভ মন্থর মেঘের মত…

বীণা চকিত হ'য়ে অনুভব করল সর্ব্ব দেহ-মনে তার ক্ষিপ্র সংক্রমণ এবং সহসা উন্মুখ হ'ল যেন বিদ্যুদ্দাহের প্রতীক্ষায়…

রিণা অধীর সুরের বল্ল, সেজদি!

বীণা তার দিকে পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' বলল, রিণি, শোন…

কিশোরী রিণা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বল্ল, কেন তবে তুই আমাকে ওদের সঙ্গে যেতে দিলি না! এবং তার দিকে একটা অর্থপূর্ণ কটাক্ষ ফেলে', ক্ষিপ্র হরিণীর মত বাহির হ'য়ে এল সম্মুখের বিস্তীর্ণ চত্বরে…

ঘরের মধ্য থেকে মিঃ গুপ্ত যেন বহু দূর থেকে ডাক্‌লেন—বীণা!

বীণা দুই চোখে বিদ্যুৎ ভরে' বল্ল, আশা করি, এবারেও অভিনয় করছেন না…

স্বপ্ন-সাধ

শ্রী…নাথ সেন

প্রিয় যেন হারায়ে গিয়াছ, সীমাহীন আকাশের বুকে
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকায় যেথা জলে থাকে শতাব্দীর কামনা
মৌন তাপসীর মত নির্ম্মম, সুনির্ম্মল হাসি লয়ে মুখে
ফুটি' আছে বাহিরের আবরণে অন্তহারা বেদনা।
পশ্চিমের নভে যেথা খেলে নানা রঙীন মেঘমালা
দিবসের শেষে গোধূলি বেলায়, তব কলহাস,
তব মোহন বাঁশরী মধু রবে করে খেলা
হৃদয়ের কাজল জলে খেলে তব স্মৃতির বিলাস।

সিন্ধুর অনন্ত প্রেম লাগি যেথা জাগি রয় ক্লান্ত শশী,
দিগন্তের উদ্ভাসিত আলোকের সাথে, সুনিপুণ হাতে
রচেছ সৌন্দর্য্যের দীপালীতে শুভ্র মুক্ত দিবানিশি
উদ্বেলি' চিত্ত মম সুবিমল মধুর আবেশেতে;
সেথা মোর ক্ষুব্ধ মন চলে অসীম পথেতে বহি
ত্যজি বাস্তবের হাহাকার, মর্ম্মত্রাসি করুণ ক্রন্দন
সুশোভিত আলোকের দেশে, সকল কলুষ রাশি
রহে মোর পিছু, সঙ্গী শুধু প্রেমপূর্ণ মধুর স্বপন।

ভারতীয় শিল্পীর চোখে মাতৃমূর্ত্তি

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মল্লিক

কথিত আছে বার্গর্স তাঁর দার্শনিক চিন্তার প্রেরণা পেয়েছিলেন ম্যাডোনার ছবি থেকে।

ইউরোপে মধ্যযুগে মাতৃ-উপাসনা প্রচলনের জন্য যে ভাবে ছবি ও মূর্ত্তির চলন হয়েছিল, ভারতে সে ধরণের ব্যাপকভাবে ছবি অথবা মূর্ত্তির দ্বারা মাতৃ-উপাসনার প্রচলন হয় নি। এমন কি ইউরোপের মত মাতৃ-অর্চ্চনা কোনদিন সম্ভব হয় নি; শক্তি-অর্চ্চনাই মাতৃ-অর্চ্চনায় রূপান্তরিত হয়েছিল। ইতিহাসে দেখা যায়—পৃথিবীতে নারীকে শক্তির আধার কল্পনা করে' মাতৃপূজা সর্ব্বত্র স্বীকৃত হয়েছিল। ইজিপ্ত, আসিরিয়া প্রভৃতি আদি সভ্য দেশ বহুকাল পর্য্যন্ত নারী-শক্তিকে সম্মান দেখিয়ে তার অর্চ্চনা করেছে। পরবর্ত্তী যুগেও সেই শক্তি পৃথিবীর দুই মহাদেশে দুইটী বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে অর্চ্চিত হয়ে আসছে।

ইউরোপ নারীশক্তিকে কুমারী মাতা এবং পরে মাতৃত্বের মধুর রূপকে অর্চ্চনা করেছে। শিল্পীর দৃষ্টিতে সেই মাতৃমূর্ত্তি নিতান্ত মাটীর মায়ের রূপ ধরে' উপাসকের কাছে মহনীয় রূপে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু ভারতীয় শিল্পীর দৃষ্টিতে ঠিক তার উল্টো রূপই কল্পিত হয়েছিল। যদিও প্রাচীন ভারতের সাহিত্যে, কাব্যে মাতৃত্বের মানবীয়রূপ খুব সহজভাবেই কল্পিত হয়েছিল, তবুও কেন ভারতীয় শিল্পীর চোখে মাতৃ-রূপের রচনা একটা বিভীষিকায় রূপান্তরিত হয়েছিল, এ প্রশ্ন স্বভাবতই উঠতে পারে। এর উত্তর পেতে হ'লে মাতৃ-পূজার প্রচলন বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন।

"মা" এই কথাটার মধ্যে এমন একটা দুর্ব্বলতা ও আবেগ আছে, যা' কেহই অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু আমরা যদি এই দুর্ব্বলতাকে বাদ দিয়ে দেখি—তা'হলে মা ও ছেলের সম্পর্ক খাদ্যান্বেষণ ও সংরক্ষণের পরিবর্ত্তিত রূপ ছাড়া অন্য কিছু নয়। কথাটা রূঢ় হ'লেও, একটু বিশদভাবে আলোচনা করলে আমরা তা বুঝতে পারি। জীবসৃষ্টির পর, সৃষ্ট-জীবের আত্মরক্ষায় চেষ্টা যখন প্রবল ভাবে দেখা দিয়েছিল, তখন তার একমাত্র এষণা ছিল খাদ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের। প্রথম যুগের অভিজ্ঞতায় জীব অনুভব করেছিল, জীবন-সংগ্রামে আপনাকে বাঁচতে

গৌরীমূর্ত্তি—ভুবনেশ্বর

হলে খাদ্যসংরক্ষণের বিশেষ প্রয়োজন। তাদের সেই ভাবনার মধ্যে ছিল নিজের সৃষ্টির প্রতি টান। ইতর প্রাণীর মধ্যে আমরা দেখতে পাই সন্তানের প্রতি যে

টান—সে তার স্নেহ বা বাৎসল্য নয়; কতকটা বলা যেতে পারে নিজের জিনিষ বেহাত হওয়ার ভয়ের জিঘাংসা। সেই ভাবনা উর্দ্ধতন জীবের মধ্যে দেখা দিয়েছিল বাৎসল্যরূপে। আদিম সমাজে যখন গোত্রে গোত্রে সংঘর্ষ হ'ত এবং নারী বিশেষভাবে লাঞ্ছিতা হ'ত—তখন নারীর একমাত্র এবং সর্ব্বপ্রধান যে ইচ্ছা তাঁর চিন্তার মাঝে দেখা দিয়েছিল, তা' ছিল নিজের সৃষ্টির দ্বারা লাঞ্ছনার প্রতিশোধ এবং আত্মরক্ষা করা। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর, সেই দমিত ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হয়ে মা শিশুকে পালন করতে সুরু করেছিল। সভ্যতার স্পর্শে এসেও আমরা সেই দমিত এষণার আভাষ পাই উপনিষদের বাণীতে—"পুত্র প্রিয়—কারণ তার মধ্যে আত্মকামনা-পূর্ত্তির আভাস আছে বলে'।" মা ও ছেলের এ সম্পর্ককে বহুকাল পর্য্যন্ত পুরুষসমাজ মেনে নিয়েছিল। এই সম্পর্ক ছাড়া পুরুষ নারীকে আর এক ভাবে দেখেছিল—যা' থেকে নারীর শক্তিরূপে পূজার প্রচলন সম্ভব হয়েছিল। সন্তান-লালন ছাড়াও নারীর মধ্যে এমন একটা শক্তি আছে, যাকে পুরুষের পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। নারীর এই 'শক্তিময়ী' স্বরূপকে অর্চ্চনার প্রথম সুরু হয়েছিল আসেরিয়াতে—দমুজির ও আদুনেইয়ের সকাম প্রবৃত্তি-মার্গের আরাধনায়। এই অর্চ্চনার রীতি কতকটা তন্ত্রের মাতৃমুখ-পিতৃমুখ পূজার মত, লিঙ্গযোনির পরিবর্ত্তে দেহ-দেহীর উপাসনা। এই অর্চ্চনার একটী বিশেষ অঙ্গ ছিল, পুরোহিতের অঙ্কশায়িনী হতে হ'ত নারীকে। কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন, দাক্ষিণাত্যের লিঙ্গ-উপাসনা আসেরিয়ার উপাসনার ভগ্নরূপ। বংশবিস্তার ও কায়িক প্রয়োজনে পুরুষচিত্তে নারীর অস্তিত্ব প্রবলভাবে আধিপত্য করেছিল এবং নারীচিত্তে দমিত পুরুষ-জিঘাংসা-বৃত্তি—এই দুয়ের সংমিশ্রণে নারীশক্তির অর্চ্চনার প্রচলন হয়েছিল অনুমান করা যেতে পারে।

বৈদিক যুগের সামাজিক বিধিতে দেখা যায়, কন্যা মাতৃলক্ষণযুক্তা হ'লেই মাতৃমুখ অর্চ্চনার মত ব্যবস্থা দিয়ে ঋষি বলছেন—"গর্ভং দেহি সিনিবালি"; এবং ঋকে দেবী-সূক্তে স্পষ্টতঃ স্বীকার করে' নেওয়া হচ্ছে বা নেবার চেষ্টা হচ্ছে—

"ময়াসোহন্নমত্তি যো বিপশ্যতি
যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্
অমন্তবো মান্ত উপক্ষীয়ন্তি
শ্রুধী শ্রুত শ্রদ্ধিবন্তে বদামি।"—

এই শ্লোকে দেখা যায়, নারীকে শক্তি স্বীকার করলেও, বৈদিক সমাজ মাতৃভাবে নারীকে দেখার কোন চেষ্টা করেনি। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের একটী শ্লোকে বলা হয়েছে :—

"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজা
সৃজমানাং স্বরূপঃ।
অজোহ্যেকো জুষমানোহনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্ত
ভোগঃ অজোন্য॥"

'শুক্ল-কৃষ্ণ-রক্তবর্ণা অনন্তসম্ভবা এক অপূর্ব্বা-নারী; অনন্তসম্ভব এক পুরুষের সহিত সংযুক্ত হয়ে বহু প্রজা সৃজন করেছেন। বস্তুতঃ বৈদিক ভারতে নারীর বিশেষ স্থান শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—মাতৃভাবে হয়নি। প্রথম স্তরে কন্যা—অর্থাৎ সৃষ্টির সাহায্যকারিণী শক্তি, দ্বিতীয় স্তরে জায়া কল্পনায় নারী অর্চ্চিতা হয়েছিল। ভারতের আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যখন নারীকে জায়া ও কন্যারূপী শক্তি ভাবনা করা হয়েছে, সমসাময়িক বহির্ভারতে কিন্তু তখনও নারীকে সৃষ্টির সাহায্যকারিণী তামসী শক্তিতে ভাবিতা ও অর্চ্চিতা হ'তে দেখা যায় এবং এই তামসিক শক্তির উপাসনাতে যোনি বিচার ছিল না। 'নূহবংশীয় লটের দুহিতাদ্বয় পিতার দ্বারাই পুত্রসম্ভবা হয়েছিল, (Genesis xiv 30-28)

প্রকৃতপক্ষে নারীর মাতৃভাবের অর্চ্চনা তন্ত্রের পূর্ব্বে স্পষ্টতঃ হয় নি। রামায়ণ, মহাভারত এবং বৌদ্ধ জাতকে মায়ের কল্পনা অস্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছিল। ধর্ম্মের মধ্যে মাতৃভাবের প্রসার না থাকাতে, আমরা ছবির মধ্যে তার প্রকাশ দেখতে পাই না। বৌদ্ধ গুহা, মন্দির প্রভৃতিতে বৌদ্ধ জাতকের ছবির মধ্যে দু'একটা মাতৃমূর্ত্তি দেখা যায়, সেগুলিকে নিতান্ত প্রক্ষিপ্ত বলে'ই অনুমান করা যেতে পারে। ভারতের এবং শুধু ভারতের কেন, এক সময়ে শিল্পধর্ম্মকে অবলম্বন ক'রেই ইহা গড়ে উঠেছিল। ধর্ম্মে যেখানে মাতৃভাবের সূচনা হয়নি, সেখানে শিল্পীর

তুলিও সংহত হয়েছিল আমরা ধরে' নিতে পারি। বৌদ্ধপূর্ব্ব যুগে উহার স্থান নেই এবং বৌদ্ধযুগে বুদ্ধের স্থানই প্রধান, সেখানে বুদ্ধমাতা আসেন নি। এর কারণ গোড়াতে গৌতম বুদ্ধের মত নারী-বর্জ্জিত ছিল। কিন্তু শিল্পীর মনে মায়ের রূপ একটা নিশ্চয়ই ছিল—এবং ধর্ম্মের অনুশাসনে সে কল্পনা তুলির রেখায় প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু যেখানে প্রকাশ করার সুযোগ সে পেয়েছে, সেখানে মায়ের ঐশ্বর্য্যের চেয়ে বুদ্ধের দুঃখবাদই প্রবল হয়ে উঠেছে। অজন্টার প্রাচীরচিত্রে—ভিক্ষার্থী তথাগতকে পুত্রের কল্যাণকামনায় ভিক্ষাদান দৃশ্যে শিল্পী যে মাতৃমূর্ত্তি রচনা করেছেন, তাতে তাই অত করুণা ফুটে' উঠেছে। বৌদ্ধ যুগের পর মাতৃমূর্ত্তির একটা বীভৎস রূপের কল্পনা তন্ত্র করেন, কিন্তু সে মূর্ত্তিতে মায়ের যথার্থ রূপের চেয়ে একটা বিকৃত রূপের কল্পনাই তন্ত্রকার করেছিলেন। মা বলতে আমাদের মানসপটে যে অনুভূতি জাগে—'করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং' জগদম্বার রূপ তার ধার দিয়েও যায় না। এই সব কল্পনার মধ্যে যে একটা তামসিক ভয়ঙ্কর-ভাবপ্রকাশই তন্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল, এ স্বীকার করতেই হবে। তন্ত্রের রতিক্রিয়ার দ্বারা মনের তামসীবৃত্তি দিয়ে ঐশী শক্তির সান্নিধ্যলাভ করাই উহার উদ্দেশ্য ছিল। তাই দেখা যায় যে, তন্ত্রের মাতৃকাশক্তির মধ্যে বিরাট্ বুভুক্ষা আর তার স্বরূপ ধ্যান করতে গিয়ে সাধক ভয়ঙ্কর মূর্ত্তির কল্পনা করেছে। এর ফলে ঐশী শক্তির সান্নিধ্যের চেয়ে ব্যভিচার এসেছিল অনেকখানি। শিল্পী এই মাতৃরূপের প্রতিচ্ছবি রচনা করতে গিয়ে একটা বীভৎস রসের অবতারণাই করেছিল। এই ধরণের তান্ত্রিক 'মাতৃশক্তির' মূর্ত্তিতে শিল্পীর ভাবের চেয়ে শৈল্পিক রীতির প্রতি টান বেশী দেখা যায়।

শ্রীচৈতন্তের আবির্ভাবের পরই বাংলায় মাতৃমূর্ত্তির একটা মাধুর্য্যপূর্ণ কল্পনার সূচনা দেখা দেয়। যদিও বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে মাতৃমূর্ত্তির যে কল্পনা শিল্পীর মানস দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছিল, তার সঙ্গে আমাদের মাটীর মায়ের সম্পর্ক দেখা যায়। তা'হলেও বলা যায়—বাংলায় রসক্ষেত্রে চৈতন্তের আবির্ভাবের পরই, শিল্পীর তুলিতে আমাদের ঘরের মাকেই দেখতে পাই। এবং এর পরই দেখতে পাই, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি যে ত্রিশক্তির প্রধানাশক্তিকে ভয়ঙ্করী প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে উপাসনা করেছেন, বাংলার পটুয়ার হাতে তিনি নিতান্তই আমাদের ঘরের

মাতৃমূর্ত্তি—জগন্নাথ মন্দির মা ও ছেলে—অরদার দেউল-মন্দির

মা-রূপে চলাফেরা করছেন। শিবায়নের কবি যা কল্পনা করলেন, পটুয়া তুলিতে সেই চণ্ডী, সেই অন্নপূর্ণাকে গৃহলক্ষ্মীর আসনে বসালেন। যদিও বৈষ্ণব ধর্ম্মের পর—যশোদা, চণ্ডী, শচীমাতার কল্যাণীয়া স্নেহপরায়ণা রক্তমাংসের জননীরূপে দেখা দিয়েছিল। তাহলেও পাশ্চাত্যে যেমন যীশু মাতার রূপ শিল্পীর তুলিতে এক অনন্তলোকের আভাস এনেছিল এবং ধর্ম্মের অঙ্গ হয়ে অর্চ্চিত হয়েছিল, ভারতে ঠিক সেরকম ভাবে পূজা পায় নি। এর কারণ ভারতের অধ্যাত্মবাদ। ভারতীয়েরা মনের

এবং চিত্তের দৃষ্টিতে সর্ব্বদাই একটা বিরাট্ কিছুর কল্পনা করে' এসেছে। সেখানে অতি নিকৃষ্টতম বস্তুতেও তারা শক্তির কল্পনা করেছে, একটা আধিভৌতিক ব্যাখ্যা করেছে;—সেখানে আমরা নিতান্ত বাস্তবের প্রতিচ্ছবি আশা করতে পারি না। কারণ ভারতের মা

"মাতা ও সন্তান"—র‍্যাফেল

যেখানে পূজা পেয়েছেন, সেখানে আর তিনি জননী নন, জগজ্জননী—

"ত্যজি সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা।
শ্রীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে,
ওরে আঁখি অন্ধ দেখ মাকে—তিমিরে তিমিরহরা।"

এই আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য ভারতের, বিশেষ করে' বাংলার নিজস্ব জিনিস। যে ক্ষেত্রে' এই বিরাট্ আধিভৌতিক দৃষ্টি দিয়ে জীবনকে, ধর্ম্মকে মণ্ডিত করা হয়েছে, সেখানে নিতান্ত মাটীর জননীর কল্পনা যে শিল্পীর তুলিতে প্রকাশ পাবে, এ আশা আমরা করতে পারি না। তাই দেখা যায়, ভারতের যেখানেই নারী-শক্তিকে পূজা করা হয়েছে, সেই মন্দিরের পার্শ্ব বা আলঙ্কারিক মূর্ত্তিতে মাতৃরূপের স্নেহ, বাৎসল্য প্রভৃতি মানুষী মূর্ত্তি রচনা করে' শিল্পী মনের ক্ষুধা মিটিয়েছে। এই সব মূর্ত্তির মধ্যে শিল্পীর যে প্রাণের স্পর্শ, হৃদয়ের স্পর্শ ফুটে' উঠেছে, তা' এইসব দিকে চাইলেই বোঝা যায়। কারণ শিল্পী হচ্ছে প্রাণধর্ম্মী; তার প্রকাশ হবে স্বচ্ছ এবং অপ্রতিহত গতিতে। তাই দেখি—শিল্পী হিমালয়দুহিতার রক্তাম্বরা জগৎপ্রকরণার বিভূতিকে ভুলে' গিয়ে রচনা করে' বসল অপূর্ব্ব কল্যাণময়ী ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী পৃথিবীর জননীকে। আনন্দমুখরিত শারদ সপ্তমীর অম্লান জ্যোৎস্নায় বাংলার সবুজ শ্যামল প্রান্তরবুকে, ধূপ-ধুনায় আচ্ছন্ন চণ্ডীমণ্ডপে—সন্ধ্যারতির কম্পমান দীপ-শিখায় যে অপরূপ মূর্ত্তি ধরা দিয়েছিল বাংলার শিল্পীর মনে—যাকে অবধূত ভারত ভেবেছিল—স্নেহহীনা, প্রেমহীনা, শোকহীনা, নিষ্কামা, নির্লোভা—শিল্পীর তুলিতে সেই অপরূপ রূপ ধরা দিয়েছিল —করুণারূপিণী, আনন্দময়ী, হিরণ্ময়ী মাতৃমূর্ত্তিরূপে। তাকে বাস্তব বলা যায় না, কিন্তু বাস্তবে প্রকাশিত হ'ল—

"সর্ব্বরূপময়ী দেবী সর্ব্বং দেবীময়ং জগৎ।
অতোঽহং বিশ্বরূপাং তাং নমামি পরমেশ্বরীম্।"

ভুল ও সত্য

বন্দ্যোপাধ্যায়

ভুলের পিছনে ছুটেছি বলিয়া
ভুলে যদি করি ভয়
ভুল মোরে আরো এনে দেবে ভুল
এনে দেবে পরাজয়।

এ জগতে যত আছে মহাভুল
ভুল কেবা তারে বলে
সৃষ্টি লয়ের লীলার ছন্দে
তাহারা নিয়ত চলে।

ভুলেরে যাহারা ভাবে শুধু ভুল
জানে না ভুলের তথ্য
তাহারা জানুক ভুলই একদিন
লভিবে পরম সত্য।

এগারো

দিদিমা একেবারে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌লেন, বল্‌লেন, "এস ভাই, এস, ওঃ অনেকদিন পরে তোমার সংগে দেখা হ'ল ; তারপরে, ভাল আছ ?"

বিদ্যুৎ প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়ালো, বল্‌লে, "হ্যাঁ, আপনি ভাল আছেন ?"

দিদিমা সামান্য একটু হাস্‌লেন, বল্‌লেন, "বেঁচে আছি এই পর্য্যন্ত—অনেক পাপ করেছিলুম তাই বেঁচে আছি —আমার মরণ নেই ভাই—মরবার মতো পুণ্য আমি করিনি কোনোদিন।"

"কি যে বল্‌ছেন, আপনি মরবেন কেন, এমন কি দুঃখ আছে আপনার ?"

দিদিমা আবার হাস্‌লেন, তারপরে খাটের এক প্রান্তে এসে বস্‌লেন, "সে তোমরা বুঝ্‌বে না ভাই, তোমরা পুরুষ—"

বিদ্যুৎ অপেক্ষাকৃত সচেতন হ'য়ে উঠ্‌লো, সোজা হ'য়ে ব'সে বল্‌লে, "কেন দিদা, কি হ'য়েছে ?"

"শুন্‌বেই ?" দিদিমা অতি ধীরে প্রশ্নটা ছুঁড়লেন, "তা শোনো—আমি আর ভেবে ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছি না।"

"কি হ'য়েছে ?" বিদ্যুৎ উৎসুক আগ্রহে দিদিমার দিকে চাইলে।

"এই গার্গীর কথা বল্‌ছিলুম—"

বিদ্যুৎ এতক্ষণে মাটীতে পা দিতে পারলো। দিদিমা তখনো ব'লে চ'লেছেন, "আমি আর ক'দিন ? তারপর মেয়েটা যে কি করবে, তা সেই জানে, [illegible] কি মানুষে শেখে না ভাই ? শেষ কা[illegible]কম কথার অবাধ্য হ'তে হয়—আমরা কি [illegible]র মন্দ করতেই এসেছিলাম ?"

"দিদা—" বারান্দার ওপরে থেকে গার্গীর গলা ভেসে এল, "ধোপা এসেছে—তোমার কি কি যাবে একবার দেখিয়ে দিয়ে যাও।"

দিদিমা মুহূর্তে চুপ করলেন, তারপরে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

"কেমন লাগ্‌ছে এখন ?" আস্তে, অতি ধীরে গার্গী ঘরে ঢুক্‌লো, "সুস্থ বোধ করছো একটু ?"

বিদ্যুৎ মাথা নাড়লো, বল্‌লে, "বসো, তোমার সংগে অনেকগুলো কথা ছিল গার্গি—"

"সে কথা শুন্‌বোই—তার আগে আমারো কয়েকটা প্রশ্ন আছে।"

"জানি—" বিদ্যুৎ অদ্ভুত ভাবে একটু হাস্‌লো, "জানি, তুমি আমায় যা জিগ্যেস করবে, কিন্তু তার সব উত্তরই কি দেওয়ার শক্তি আমার আছে ?—আজ শুধু একটা কথা জানাবার জন্যেই এতক্ষণ ব'সেছিলাম।"

গার্গী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বিদ্যুতের দিকে চাইলো, কথা বল্‌লে না।

"কাল আমি থাকবার জায়গা দেখে এসেছি—তোমাকে আরো দীর্ঘ দিন বিরক্ত করতে হ'ল না। বেঁচেছি মনে হ'চ্ছে।" একটু থেমে বল্‌লে, "এইটেই আমার বেশ লাগে, যা চাই, তা হয় না—যা চাই তাই যদি হ'ত তাহ'লে আমার আজকের এই আনন্দ অনস্তিত্ব থাকতো। গার্গি, আর সত্যি কথা বল্‌তে কি, আমি 'দুঃখ' কথাটাকে মর্য্যাদা দিইনে, কথাটাকে অভিধান থেকে বহিষ্কৃত করা উচিৎ ছিল।"

"সে আমি জানি—" গার্গী ধীরকণ্ঠে উত্তর দিলে, "তুমি যা ভাবো তাও আমি জানি, কিন্তু এতো তাড়াতাড়িই ? [illegible] পরে তুমি অনায়াসেই যেতে পারতে এ-তিতিক্ষার আমি অন্য অর্থও করতে পারতাম তো ?"

"করোনি যে, তার জন্যেই আমি বাধিত রইলাম" বিদ্যুৎ হাস্‌লো—"জীবনের বিচিত্র গতি-ভংগীটাই আমাকে সব থেকে বেশী আনন্দ দেয়—তার আনুসংগিক সমস্ত কিছুকেই আংশিক অর্থহীন ব'লে ভেবে নিতে পেরেছি।"

"এবং তুমি যে ভুল ভাবোনি—এ কথাও হয়তো ঠিক, কিন্তু তুমি তো জানো তোমার চিঠি আমি পেয়েছিলাম।"

বিদ্যুৎ হাসলো, বললে, "তুমি পাবে, এই জন্যেই সরকার বাহাদুরের ডাক-বিভাগকে মূল্য দিয়েছিলাম—আশ্চর্য্য, কিছু ঘটেনি এতে।"

"আশ্চর্য্য কিছুই ঘটেছে বলতে পারো—আমি সেই চিঠির পর থেকে সবই যেন বুঝতে পারছি।"

"এতদিন তাহ'লে না-বুঝে এসেছিলে?" বিদ্যুৎ হাসলো।

"হয়তো তাই—" গার্গী বললে, "হয়তো বুঝতাম, কিন্তু অতি সামান্য—আজ সেই বোধ-শক্তি আমার অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ।"

"আরো একবার বাধিত হ'লাম" বিদ্যুৎ গার্গীর চোখের দিকে চাইলে, "সেই বুদ্ধির শানিত দীপ্তিতে যা তুমি আবিষ্কার করেছো সেটাকে প্রকাশ করলে কৃতার্থ হ'ব।"

"এটা উপহাস নয় বিদ্যুৎ" গার্গী কৌচের ওপরে সোজা হ'য়ে বসলো, "তোমার এই স্বেচ্ছাচারিতার ওপর আমার কোনো হাত নেই বলেই আমি নীরব থাকবো, এ কথা ভেবো না—"

"তোমার আজ এ আর একরূপ দেখছি গার্গী" অতি সহজে—অতি স্বাভাবিক কণ্ঠে বিদ্যুৎ উচ্চারণ করলো, "তোমাকে আমার সেই জন্যেই মাঝে মাঝে দুর্ব্বোধ্য মনে হয়, ভারী লোভনীয়, আর সুন্দর মনে হয়—"

গার্গী কথার উত্তর দিলে না। বিদ্যুৎ ওর মুখের দিকে চেয়ে আবার হাসলো, "খুব রাগ হ'চ্ছে, না?"

গার্গী এবার মাটীর দিকে চোখ নামালো, বললে, অতি আস্তে বললে, "আমার রাগ নেই, তা তুমি বিশ্বাস করো?"

"করি—" বিদ্যুৎ সেইভাবেই উত্তর দিলে, "না হ'লে তুমি আজ আমার সামনে থাকতে না।"

অনেক বেলা হ'য়েছে। গত রাত্রির মৃত পথ জেগেছে। থেকে থেকে কাণে আসছে সেই জাগরিত পথের জনকোলাহল—ট্রামের আর বাসের অবিরাম ঘর্ঘর শব্দ! জানলার ওপর সূর্য্যের সোণালী আলো এসে বিদ্যুতের পায়ের কাছে পড়েছে। নিস্তব্ধ ঘর—শুধু ঘড়িটা টিক্ টিক্ শব্দ ক'রে সময়ের অতল সমুদ্র পার হ'চ্ছে—দিক্-চিহ্নহীন সেই দিগন্ত-প্রসারিত সমুদ্র—মেঘ আর নীল আকাশ যেখানে এক হ'য়েছে—এক হ'য়েছে যেখানে সময় আর জীবনের একান্ত সান্নিধ্য-কামনা—যেখানে শুধু স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে থাকবারই কথা!

একেক সময়ে সেইটাই খুব ভালো লাগে, এই চুপ ক'রে স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে থাকা। এই কথা না-বলার অনন্ত মাধুর্য্য—অনির্বচনীয় অনুভূতি!

"গার্গী—" অনেক অপরিচয়ের অন্ধকার থেকে, অনেক দূর-পথের প্রান্ত সীমা থেকে, বিদ্যুৎ যেন কথা কইলে—মনে হোল কোনো দক্ষিণ সমুদ্রোপকূল হ'তে এল বাতাস, এল ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা পরম প্রেরণা—সে বাতাস যেন সকলকেই ইংগিতে ডাকে, ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা অবারিত দাক্ষিণ্যে সে যেন পাখা মেলেছে।

"কি?" আর কিছু গার্গী বলতে পারলো না। শুধু 'কি?'—কী সে জিগ্যেস করছে গার্গীকে—কোন্ মহাপ্রশ্ন? কোন্ প্রশ্নের অতলান্তিক গভীরতায় গার্গীকে আবার ডুব দিতে হ'বে—বলুক, স্পষ্ট করে বলুক বিদ্যুৎ!

"গার্গি—" বিদ্যুৎ আবার ডাকলে, "আমার দুঃখ" একটু থেমে বললে "আমার দুঃখ, তুমি আমায় ভুল করলে, আমায় সময় দিলে না তাকে সংশোধন করবার।"

গার্গীর মনে হ'ল সে বলে, কোথায় ভুল ক'রেছে, কোন মুহূর্তে—বিদ্যুৎ দেখিয়ে দিক্—সে শোধন করবে, কিন্তু তাই বলে সে থাকবে এত নিদারুণ, এত কঠিন, এত নির্ম্মম একটা আবরণের ভেতরে—কেন সে বেরিয়ে আসবে না সূর্য্যের আলোকদীপ্ত প্রখর প্রাঙ্গণে!

আশ্চর্য্য, তবু গার্গী কথা বলতে পারলে না।

বিদ্যুৎ গার্গীর মুখের দিকে চেয়ে রইলো: "সেইটাই আমার দুঃখ গার্গী, তবু, তবু তুমি ভুল করবে না এই রণাই আমার আছে। তাই মনে হয় আমিই যেন তোমাকে [illegible] চিনতে পেরেছি—যেখানে আর কারো দৃষ্টি পৌঁছয়না, [illegible] সেইখান থেকে তোমায় লক্ষ্য ক'রেছি, দেখেছি—মহামহিমা তুমি, তুমি রমণীরা—তোমার প্রতি তাই তো আমার অন্তরের চরমতম শ্রদ্ধা গার্গি!"

গার্গী কথার উত্তর দিলে না, শুধু মাটীর দিকে চেয়ে ব'সে রইলো—বুকটা তার অসম্ভব বেগে স্পন্দমান। বিদ্যুৎ আরো কি বলে সেই কথা শোনবার জন্যে গার্গীর

প্রত্যেকটী মুহূর্ত উন্মুখ—সমস্ত প্রাণ-চেতনা দিয়ে সে যেন সে-কথা শুনবে।

"আমি জানি" বিদ্যুৎ বললে, "আমার সে ধারণা, আমার সেই অপূর্ব কল্পনাময়ী মূর্তি তোমার মধ্যে ব্যর্থ হয়নি, তুমি সেই মহাশক্তির মধ্যে দিয়ে সময়ের রাজপথে পা ফেলেছো, অপূর্ব তোমার পথ-চলার ছন্দ, অপূর্ব তোমার দৃষ্টি ভংগীমা। আর সেই অপূর্ব গতিভংগী দেখেই আমি মুগ্ধ হ'য়েছি—তাইতো তোমার প্রতি আমার একান্ত ভালবাসা, গার্গি!"

তবু গার্গী চুপ ক'রে রইলো, এবার তার সমস্ত শরীর শিহরায়মান, কী সে বলবে এখন, কী সে বলবে? কী সে বলতে পারে?

"তবু" বিদ্যুতের কথা তখনো শেষ হয়নি, "তবু কোথায় যেন একটু সামান্য ছন্দপতন ঘটলো, আর তারই সংস্কারের প্রয়োজনে সমস্ত জীবনের মূল্য হিসেব করছি—আরো করতে হ'বে হয়তো!"

"তুমি—তুমি কি বলছো বিদ্যুৎ?" গার্গী হঠাৎ কথা কইলে, "আরো একটু সহজ হও—আরো একটু সরল!" কান্নায় যেন কেঁপে কেঁপে উঠলো সে, "আমাকে তুমি ভুল বোঝোনি একথা আমি জানি, তবু তারি মধ্যে কোথায় ঘটেছে দ্বন্দ্ব—একটু সামান্য অথচ সুদৃঢ় অস্বীকার।"

বিদ্যুৎ সোফার ওপরে এলিয়ে পড়লো "আমারো সেই প্রশ্ন গার্গি—একটানা স্রোতোচ্ছন্দে এ যেন অস্বাভাবিক যতিঃপতন!"

"তাই, তাই-ই হ'বে হয়তো, না হ'লে কেন আবার আসবে তুমি, যে স্রোত, যে পথ এঁকে দিয়ে গেলে—তাই ধ'রেই তো আমি চলতে পারতুম—আবার কেন সেখানে বাজলো পিছনে ফেরার সুর—গৃহমুখী মনের সেই একান্ত অবাধ্যতা?"

বিদ্যুৎ হাসলো। বললে, "[illegible] আমার ভারী বিচিত্র লাগে গার্গী, এই মুহূর্তে [illegible] আমি চাইলাম না, চেয়ে দেখি তাই পেলাম—বিশ্বাস করো এ কথার মধ্যে আমার কাব্যের সামান্যতম ফেনপুঞ্জও নেই। নয়তো—" বিদ্যুৎ একটু থেমে সেই একই সুরে বললে, "নয়তো আজ হঠাৎ তোমার এখানেই এসে তোমাকে এই আবর্তের মধ্যে ফেললাম কেন? আমার কি যাওয়ার আর কোনো দ্বিতীয় পথ ছিল না?—না সে পথে পদক্ষেপের কোনো বিঘ্ন ছিল?—কিছুই নয়—শুধু খেয়াল, কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে মনে হ'ল ফেরা প্রয়োজন, দ্বিধা না ক'রেই ফিরলাম—তারপরে কি হ'বে, বা কি হোল, অতটা ভেবে দেখবার অবকাশ কোথায় আমার?"

গার্গী উত্তর দিলে না, মাটীর দিকে চেয়ে নিশ্চল পাথরের মতো ব'সে রইলো। টিক্ টিক্ ক'রে ঘড়ি এগিয়ে চ'লেছে—আর কোথাও কোনো শব্দ নেই—কেমন যেন একটা রূঢ় নৈঃশব্দের যবনিকা প'ড়েছে চারদিকে—তাকে অপসারিত ক'রে গার্গী যেন আর কোনো কথাই এখন সহজে বলতে পারলো না।

কয়েকটী মুহূর্ত পার হ'ল। তারপরে ধীরে, অতি ধীরে গার্গী কথা কইলে, বললে "আমার প্রশ্নকে তুমি বড়ো সহজে এড়িয়ে যাও—তার সহজ উত্তর পাবার মতও ভাগ্য কি আমার নেই?"

"এই জন্যেই আমি তোমাকে সব থেকে শ্রদ্ধা করি গার্গী" সোফার ওপরে বিদ্যুৎ উঠে বসলো: "এমনভাবে গুছিয়ে কথা বলতে পারো যে, আমি না উত্তর দিয়ে পারি না, কী তুমি জানতে চাইছো, বলো?

"বোঝোনি? —আজো জানতে পারোনি?" গার্গী অপলক দৃষ্টিতে বিদ্যুতের চোখের দিকে চাইলো।

"গার্গি—"

"বলো—" অবিচলিতভাবে গার্গী প্রশ্ন করলো, "শুনবো বলেই আজ তোমার কাছে এসেছিলাম।"

"তোমাকে আমি যা ভাবি," বিদ্যুৎ সেই একই সুরে কথা বলে চললো, "তার থেকে এক কণা কম যে কোনো [illegible] ভাবতে পারি না! গার্গি, তুমি যে আমার কী তা আমি কি ক'রে বোঝাই আজ! তুমি তো জানো না কোন্ মহা-প্রেরণায় আমি তিলে তিলে অগ্রসর হচ্ছি, আমার সেই সাধনার শিখর-সীমায়, কে আমাকে উদ্বুদ্ধ করছে? কে করলো মহীয়ান্? গার্গী, আমাকে তুমি সে ইংগিত ক'র না—আমি তা বুঝি—আমি তা বুঝি!

বিদ্যুৎ একটু চুপ করলো, তারপরে বললে, "জানো, আমার সামনে জ্বলছে সেই অভ্রভেদী শিখর-চূড়া,

প্রতিভার দীপ্ত দীপ্তিতে ঝলমল করছে—আমাকে সেখানে যেতে হবে, সেই উত্তুঙ্গ পর্বত পার হ'য়ে সেই নিদারুণ দুঃখের মরু-ঝঞ্ঝাকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে সেই অপ্রতিহত গতিতে আমাকে সেখানে পৌছতে হ'বে গার্গি! তুমি দেবে উৎসাহ—তুমি আমার মধ্যে আনবে সেই প্রেরণা, তোমার স্ফুরিত ওষ্ঠাধরে থাকবে তারই বিজয়ী ঘোষণা! আমি ছুটে চলবো দুর্বার বেগে, আমার সম্মুখে সেই খ্যাতির অভ্রভেদী গিরি-চূড়া শোভমান, আমাকে তা পার হ'তে হ'বে—আমাকে তা পার হ'তে হ'বে—আর এই বিজয়ী মূর্তিতেই আমি একদিন অনায়াসে তা পার হ'য়ে যাবো—তখনো তুমি থাকবে আমার পাশে—আমার সমস্ত প্রাণ-চেতনাকে, আমার সমস্ত কর্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে'। তারপরে একদিন দেখবো, খ্যাতিতে আমি ঝলমল্ ক'রে উঠেছি; কিন্তু—" বিদ্যুৎ হঠাৎই বিনয়ে দ্রবীভূত হ'ল যেন, "কিন্তু, আমি মিনতি করি, তার মধ্যে আমাদের বিয়ের প্রশ্নকে টেনে এনো না—সে বড়ো মর্মান্তিক—সে বড়ো দুঃসহ হ'বে গার্গি!

গার্গী সেইভাবেই মাথা নীচু ক'রে রইলো, তারপরে সোজা হ'য়ে উঠে বসলো, বললো, "বুঝলাম সব, কিন্তু তোমার সেই একান্ত সাধনাকে ফলবতী ক'রে তোলার স্বপক্ষে তুমিই কেন আনছো বিরুদ্ধ যুক্তি? তুমিই তা নিজের হাতে ভাঙছো কেন বিদ্যুৎ?"

"তাই কি? ঠিক সেই কাজই কি করছি আমি?"

"না হ'লে ওদেশে যাওয়ার এমনি সুযোগ পায়ে ঠেলে ফেলে আবার তুমি কেন ফিরে এলে তোমার সেই কূপমণ্ডুকতায়, তোমার এই নির্জন একাকীত্বে—এ তোমার কি রকম পথ চলার গতি, ঠিক বুঝলাম না।"

বিদ্যুৎ এবারে হো-হো ক'রে হেসে উঠলো, হাসিতে আগের গম্ভীর আবহাওয়াটাকে কিছুটা যেন লঘু ক'রে দিলে, বললে, এও একটা খেয়াল—হঠাৎই তোমাকে মনে প'ড়ে গেল—ছুটে এলাম, কতোদিন আর একা থাকা যায় ব'ল? তারপর তোমার ওই দুটী চোখ—ঐ টানা টানা দুটী ভুরু—"

"থামো" গার্গী উঠে দাঁড়ালো, "ছেলেমানুষী করারো তো একটা সীমা থাকে মানুষের—"

"কোথায় আর থাকে?" বিদ্যুৎ সোফার ও[illegible] ক্লান্তভাবে আবার এলিয়ে পড়লো তারপরে কেস [illegible] ক'রে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে, "আমরা তো [illegible] ছেলেমানুষই—তা বুঝি জানতে না?"

গার্গী আর দাঁড়ালে না, আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

বারো

ওধারে মাঠের মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত অন্ধকার যে[illegible] পুঞ্জীভূত হ'য়ে নেমেছে, আকাশে কয়েকটা তারা—গংগার ওপরে জাহাজের মাস্তুলের আলো, ফোর্টের রক্তচক্ষু আকাশস্পর্শী দীপদণ্ড—দূরে চৌরংগীর আলোকিত পথ। এরই মধ্যে মাঠের ভেতরের এই গাঢ় আর নিকষ অন্ধকার যেন কেমন অদ্ভুত লাগে। ট্রাম থেকে নেমে সোজা আস্তে আস্তে আপনি যদি এই গাঢ় আর ঘনো অন্ধকারের মধ্যে আসেন, তাহলে কিছুক্ষণ পরে আপনি অনায়াসেই মনে করতে পারেন যে, পৃথিবীর এক নিদারুণ অন্ধকারময় স্থানে এসে প'ড়েছেন। ওদিকে ভূতের মতো স্থির আর নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে র'য়েছে মনুমেণ্ট, তার পিছনে—অনেক পিছনে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ঝিমোচ্ছে—সে অন্ধকারে আপনার তার অস্তিত্ব অনুভব করা রীতিমত কঠিন। তাই বলছিলাম এই অন্ধকারের দিকে চেয়ে সত্যিই অদ্ভুত লাগে—চারদিকে আলোর পরম প্রকাশ আর মাঝখানে সমস্ত মাঠটা জুড়ে অভিশাপের মতো এই গহন অন্ধকার সমস্ত শরীর মেলে প'ড়ে র'য়েছে এই ঘন আর নিকষ অন্ধকারকে যেন হাত দিয়ে ছোঁওয়া যায়!

কার্জন পার্কের মধ্যে দিয়ে নলিনীকান্ত অগ্রসর হ'তে লাগ[illegible] একটু পিছিয়ে প'ড়েছিল, তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল, [illegible] "খুব যে হাঁটছেন, না হয় একটু রোধই করলেন আ[illegible]দের অগ্রগতিকে!" সমস্ত পুরুষ জাতের ওপরে যেন মা[illegible]কা এই সুযোগে একটা নিদারুণ কটাক্ষ করলে, নলিনীকান্তর নাটকীয় পরিস্থিতিতে বাঁধা মন সে কথা মুহূর্তে মধ্যেই বুঝতে পারলো—ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "ছি ছি কি যে বলেন, সব সময় একটু আঘাত

না ক'রে আপনারা কথা বলেন না—মানে আপনাদের মনের এ হচ্ছে একটা বড়ো মনঃস্তত্ত্ব!"

মল্লিকা হাস্‌লো, বল্‌লে, "তাহ'লে আমাদের আপনি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছেন, কি বলেন?—পুরুষের কাছে আমরা যে চিরকাল দুর্বোধ্য এ অপবাদ আশা করি আপনি আর অন্ততঃ দেবেন না।"

নলিনীকান্ত এবারে কৃতজ্ঞতার হাসি হাস্‌লেন, বল্‌লেন, "ও-সব নিছক কবিতা, বুঝ্‌লেন কিনা, ভাবের আতিশয্যে আমাদের মস্তিষ্কের কোষগুলিতে মাঝে মাঝে এই রকম স্নায়ুবিকার ঘটে, তাতেই আমরা বলি, তোমরা দুর্বোধ্য, তোমরা রহস্যময়ী—তোমরা ভীষণা—তোমরা অনুপমা, তোমরা রাক্ষসী—"

একটা মোটর কোন রকমে নলিনীকান্তকে বাঁচিয়ে তীব্রবেগে পাশ দিয়ে চ'লে গেল—আর একটু হ'লেই তিনি রাস্তার মাটীর ওপর আছড়ে প'ড়েছিলেন আর কি! মল্লিকা একেবারে নলিনীকান্তর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বল্‌লে, "পথটা আপনার নিজের মনের মত নাটকীয় নয়—একটু অসাবধান হ'লেই সেখানে বিপদ ঘটে, দেখে শুনে এবার থেকে রাস্তা চল্‌বেন, বুঝেছেন?"

ওপারে এসে নলিনীকান্ত নিঃশ্বাস ফেল্‌লেন। বল্‌লেন, "কলকাতার রাস্তায় হাঁটা একটা নিদারুণ বিপদ মল্লিকা দেবী; জীবনটা হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে প্রত্যেক পা'টী ফেল্‌তে হয়—যে কোনো মুহূর্তে হাতের মুঠো থেকে তাকে দিয়ে দেবার জন্যে আমরা প্রস্তুত—কখন যে কি ঘটে কিছুই বলা যায় না।"

দু'জনে বড়ো রাস্তাটা পার হ'য়ে ততক্ষণে অন্ধকারময় সেই নির্জন আর অদ্ভুত মাঠের মধ্যে নেমে এসেছে—খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একটা গাছের তলায় বেঞ্চিতে এসে দু'জনে ব'স্‌লো।

"কতোক্ষণ থাক্‌বেন এখানে?" মল্লিকা আস্তে, অতি ধীরে প্রশ্ন করলো।

"এই খানিকক্ষণ থাকা যাক,—বসুন না, কতোই বা রাত হ'য়েছে এখন?"

মল্লিকা উত্তর দিলে না, চৌরংগীর আলোকিত পথের দিকে চেয়ে রইলো।

"হ্যাঁ, কেমন লাগলো বলুন ফিল্মটা" নলিনীকান্ত এবারে একটা গভীর প্রসংগের অবতারণা করলো। "মানে, সমস্ত এ্যাটমস্‌ফিয়ারটা—মানে যা ওরা রচনা ক'রেছিলো, মোটামুটি মন্দ নয়, কি বলুন?"

মল্লিকা এবারে নলিনীকান্তর দিকে সোজা হ'য়ে ফিরে বস্‌লো—বল্‌লে, "খুব যে ভালো হ'য়েছে এ কথা স্বীকার করা মূঢ়তা, তবে মন্দ নয় বলা যেতে পারে। বাংলা নাটকে—বাঙালীর চিত্র রচনায় এর থেকে আর বেশী কী আশা করতে পারেন, খানিকটা ফ্লার্টিং, খানিকটা কান্না, কিছুটা বিরহ, তারপরে শত দুঃখ কষ্টের মধ্যে সেই চির চেনা মিলন—বিয়ে। বাস্ তারপরে আর কিছু নেই, আপনারা আস্তে আস্তে চেয়ার থেকে উঠে ভারাক্রান্ত মনে অথবা হাস্‌তে হাস্‌তে প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে আসুন—ওইখানেই ফিল্‌ম্ অথবা নাটকের সমস্ত সার্থকতার শেষ!"

নলিনীকান্ত সামান্য একটু হাস্‌লেন, মৃতের মুখেই যেন সে হাসি মানায়। সাম্প্রতি মল্লিকা দেবীর কাছে তাঁর যে নাটকটীর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না তাতেও এই রকম একটী বিরহ-করুণ ঘটনার উল্লেখ আছে, এবং প্রায় সব নাটক অথবা চিত্র-কথার যা পরিণতি হয়, ঠিক সেই ভাবেই মিলনের 'সুন্দর একটী' (নলিনীকান্তের ভাষায়) সমাপ্তি আছে। নলিনীকান্তর মনে হ'ল, মল্লিকা সেই নাটকটীকেই যেন নির্মমভাবে এইমাত্র ইংগিত করলো।

নলিনীকান্ত ম্লান হেসে বল্‌লেন, "তা বটে—যা বলেছেন—"

"নয় তো দেখুন" মল্লিকা তখনো নিজের কথার শেষে এসে পৌছয়নি: "এই সব ছবি আর নাটক দেখ্‌বার জন্যে ব্যাক চিত্রগৃহে আর নাট্যালয়ে কি রকম ভীড় হয়, —যেমন এ দেশের ভিজে মাটী, ঠিক তেমনি রচিত হয় ভিজে কাহিনী—একটু মাতৃস্নেহ, একটু চোখের জল—একটু সকরুণ আত্মহত্যা—বাস্, তারপরেই আপনি সার্থক—আপনার সমস্ত রচনার যথেষ্ট মূল্য পেয়ে গেলেন তখনি একথা ধ'রে নিতে হ'বে।"

নলিনীকান্ত সময়সাময়িক হাস্‌লেন। বল্‌লেন, "যা বলেছেন—এদেশের মাটীতে বড়ো চিন্তা করবার অবকাশ

কোথায়—যে হানাহানি, যে সাম্প্রদায়িকতা, যে অশান্তি, আর যে স্বার্থের কলহ, তাতে একান্ত মনে বড়ো কিছু গ'ড়ে তোলাই তো রীতিমত কঠিন—তাইতো আমার সময়ে সময়ে মনে হয়" : নলিনীকান্ত মুহূর্তের জন্যে একবার থাম্‌লেন : "যে রবীন্দ্রনাথের মত এত বড় একটা বিরাট প্রতিভা এই বাংলার ভিজে মাটীতে কি ক'রে সম্ভব হ'ল —কি ক'রে সম্ভব হ'ল এই মহানগরীর অভ্যন্তরে তাঁর জ্যোতির্ময় আবির্ভাব!"

মল্লিকা মাথা নাড়লো, বল্‌লে, "ঠিক এই কথাই আমাকেও দোলা দিয়েছে—আমিও অনেকদিন একথা ভেবেছি, আর অবাক হ'য়েছি, একেক সময়ে পৃথিবীর সমস্ত বাঁধা নিয়মকে অতিক্রম ক'রে আকস্মিক উল্কাপাতের মতো কতোগুলি ঘটনা ঘটে যায়—আর সেই সব ছোট এবং বড় ঘটনাগুলি পৃথিবীর ইতিহাসে যে গভীর দাগ কাটে তা বহু শত বৎসরের প্রবল ঝঞ্ঝাতেও ম্লান হয় না —যে কীর্তি গ'ড়ে ওঠে তা সময়ের প্রবল পেষণেও ঝ'রে ঝ'রে ধূলির সংগে মেশে না—সেই সব ব্যতিক্রম, সেই সব ঘটনার মধ্যে আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের, নিঃসংকোচে তুলনা করা যেতে পারে এবং সত্যিই সে তুলনা উপযুক্ত হয়—" মল্লিকা থাম্‌লো।

সমস্ত মাঠ ভ'রে রাত্রির ঘনো অন্ধকার ক্রমশঃই ঘনোতরো হ'য়ে উঠ্‌ছে, নলিনীকান্ত মাথা নেড়ে কথাটা স্বীকার করলেন, বল্‌লেন, "সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই আমাদের—এই বাংলা দেশবাসীর থাকা উচিৎ নয়। প্রথমে, তাঁর সাহিত্য-সাধনার প্রথম যুগে যে আঘাত, যে বাধা পেয়েছিলেন, এ দেশের যুগ-যুগ সঞ্চিত নিদারুণ মূঢ়তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যেভাবে তিনি তাঁর স[illegible] প্রচার ক'রেছিলেন, আজ সে-কথা ভেবে আমরা রীতি[illegible] বিস্মিত হই। তাঁর সেই অ-সাধারণ ব্যক্তিত্ব আর আত্ম-বিশ্বাসের শক্তি আজ তাঁকে এই দূর-দুর্গম খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছিয়ে দিয়েছে!—এর মূলকে, এর প্রথম অবস্থাকে আমরা যে বিরুদ্ধতায় তিলে তিলে কি ভাবে নষ্ট করতে উদ্যত হ'য়েছিলাম সেই কথা ভেবে তাঁর কাছে আমাদের আ-জীবন লজ্জিত থাকা উচিত—ভুল করলেও তার সংশোধন আছে—আমাদের সেই সংশোধনের সুযোগ যেন এখন কিছুতেই অবহেলিত না হয়।" নলিনীকান্ত এবারে থামলেন। ও'দিকে গীর্জার ঘড়িতে সাড়ে ন'টা বেজে গেল, মল্লিকা চুপ ক'রে রইলো—একথার আর কোনো উত্তর দিলে না। মাথার ওপরে অনন্ত আকাশ —আর আশে পাশে সেই তীতিময় অন্ধকার—দূরে জাহাজের লাল আলো—মল্লিকা গংগার দিকে চেয়ে রইলো।

এই রকম গভীর একটা প্রসংগের পর নলিনীকান্ত কি যে বল্‌বেন, তা ঠিক আন্দাজ করতে পারছিলেন না—অথচ মল্লিকা দেবীও যে তাঁর পাশে ব'সে মূক হ'য়ে থাক্‌বেন এও কেমন অসহ্য—অথচ কি বলা যায়, আরকি বলা যায়! কেমন একটা অসহায় ভ'য়ে তাঁর সমস্ত বুকটা দুলে উঠ্‌লো—মল্লিকা দেবীর কাছে কোনো অসতর্ক মুহূর্তে নিজের দুর্বলতাকে তিনি যেন প্রকাশ না ক'রে ফেলেন, নলিনীকান্ত সোজা হ'য়ে বস্‌লেন। অনেকক্ষণ সেইভাবেই কাট্‌লো।

অথচ এই রাত্রি, এই ঘন নীল রাত্রি আর আকাশের তারা, আর চৌরংগীর আলো—আর ওধারে জাহাজের মাস্তুল—কি ভালই যে লাগে দেখ্‌তে—এই মুহূর্তে, এই অন্ধকার ঘন, শান্ত আবহাওয়ায় কেউ যদি তার অন্তরের গোপনতম কথা এতো সুযোগ পেয়েও প্রকাশ করতে না পারলো—তাহ'লে তার মতো অসুখী কে? তার মতো সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে হতভাগ্য কে? কথাগুলি যেন নলিনীকান্তকে চঞ্চল ক'রে তুল্‌লো, অথচ কী তিনি করবেন? —কী-ই বা তিনি করতে পারেন এখন?

খোলা মাঠের ওপর দিয়ে হু-হু ক'রে ঠাণ্ডা বাতাসের স্রোত আস্‌ছে—ভারী সুন্দর। নলিনীকান্ত দেখ্‌তে পেলেন—বেশ স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলেন, মল্লিকার দীর্ঘ [illegible]র কয়েকটা কেশ এলোমেলো হ'য়ে কপালের ওপরে ঝুলে [illegible] সুন্দর-ই যে দেখাচ্ছে ওকে—নলিনী-কান্ত প্রাণপণে [illegible]ক সংবরণ করলেন, তাঁর সেই কথা বলা থেকে, হঠাৎ-আসা প্রেরণার নির্লজ্জ প্রকাশ থেকে, তিনি সেই মুহূর্তে আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে নিজেকে অতি কষ্টে রক্ষা করলেন বলা যায়!

অথচ কী সুন্দর-ই যে লাগ্‌ছে মল্লিকাকে আজ! চোখ দুটীতে যেন ঘনিয়ে এসেছে বিশ্বের বিস্ময়, মাথার

ওপরে অপূর্ব তারা ভরা রাত্রি—নলিনীকান্তর মনে হ'ল তাঁর নিজের লেখা কোনো নাটকে ঠিক এই ভাবে নায়ক এবং নায়িকাকে তিনি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলের মাঠের কাছাকাছি আনিয়েছিলেন, কিন্তু তারা তো এ-রকম নির্বাক ছিল না, তারা তো অনর্গল কথা বলে গিয়েছিল—নলিনীকান্ত হঠাৎই অনুভব করলেন, বাস্তব এবং কল্পনার মধ্যেকার বিরাট্ প্রভেদের সমুদ্রকে। বুঝ্‌লেন, একেকটা সময় আসে, যখন কথা বলাই অত্যন্ত ক্লেশকর—অত্যন্ত অ-সাধারণ ব্যাপার—তখন যেন চুপ ক'রে থাকাটাই একমাত্র যুক্তিযুক্ত, তারপরে আরেকটা সময় আসে যখন, যখন সামান্য—মাঝে-মাঝে দু'একটা ভাঙা-ভাঙা কথা আর চুপ ক'রে থাকা ;—কথা না বলার অনন্ত দিক্‌চিহ্নহীন সমুদ্রে কথা বলার সামান্য ঢেউ—বেশ লাগে, নলিনীকান্ত যেন ক্রমশঃ ধীরে ধীরে একটা নতুন অনুভূতিতে ভ'রে উঠ্‌তে লাগ্‌লেন।

গংগার দিক থেকে মল্লিকা চোখ ফেরালে, হঠাৎ নিজের কপালের দুটো পাশ আঙুল দিয়ে চেপে ধরলো বল্‌লো, "উঃ, মাথাটা যা ধ'রেছে—"

"এঁ্যা, বলেন কি ?" নলিনীকান্ত এই হঠাৎ-আসা আবেগকে সংশোধন করতে পারলেন না, বল্‌লেন, "এতক্ষণ বলেন নি আমাকে ?"

মল্লিকা সামান্য একটু হাস্‌লো। বল্‌লে, "ভেবেছিলুম ঘুরতে ঘুরতে মাঠের হাওয়া লেগে, আস্তে আস্তে ছেড়ে যাবে—বদ্ধ ঘরের ভেতরে এতক্ষণ থাকা আমার অভ্যেস নেই কিনা—"

"তাই হ'বে" নলিনীকান্ত মাথা ধরার একটা সহজ যুক্তি আবিষ্কৃত হ'য়েছে দেখে বাধিত হ'লেন, "আর ওই হলের মধ্যে বিড়ি, সিগারেট আর চুরুটের ধোঁ[illegible] এতোগুলো লোকের নিঃশ্বাস—বাস্তবি[illegible] [illegible]া ধরাই অস্বাভাবিক !"

মল্লিকা চুপ ক'রে রইলো[illegible] নলিনীকান্ত ঘড়ি দেখ্‌লেন—প্রায় দশটা বাজে[illegible]এবারে ওঠা উচিৎ, বল্‌লেন "গংগার ধারে একটু যাবেন, হয়তো মাথাটা ছাড়তে পারে তাহ'লে ?"

মল্লিকা উঠে দাঁড়ালো, বল্‌লে, "দরকার নেই, ট্রামের হাওয়াতেই ছেড়ে যাবে এখন—আর এরকম তো আমার মাঝে মাঝে হয়-ই।"

"তাই না'কি". নলিনীকান্ত যেন পৃথিবীর একটা করুণতম দুঃসংবাদ এই মাত্র শুন্‌লেন। "এই রকম হয় আপনার মাঝে মাঝে ? —ওঃ কি আশ্চর্য ! ডাক্তার-টাক্তারও দেখান না মোটে তো, বাস্তবিক" নলিনীকান্ত প্রায় স্বগতোক্তি করলেন, "নিজেদের ওপরে আপনাদের এতো ঔদাসীন্য !"

মল্লিকা তখন আস্তে আস্তে মাঠের ওপর দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ ক'রেছে—নলিনীকান্তও এগিয়ে চল্‌লেন, আগের কথার জের টেনে বল্‌লেন, "নিজেদের কথা মোটেই ভাবেন না আপনারা !"

"বরং আপনারাই তো ভাবেন না—" ছোটো মেয়ের মতো মল্লিকা অতি সহজে হেসে উঠ্‌লো, "না হ'লে দেখুন তো তখন রাস্তা পার হওয়ার সময় কিভাবে আর একটুর জন্যে মোটর থেকে বেঁচে গেলেন—দিন—" মল্লিকা নলিনীকান্তর ডান হাতটা শক্ত করে ধরলে, "দেখুন, সাম্‌নে আবার সেই রাস্তা—।" নলিনীকান্তর সমস্ত শরীরে যেন অপূর্ব একটা প্রাণস্রোত ব'য়ে গেল—আঃ—নলিনীকান্ত কি যে করবেন বুঝ্‌তে পারলেন না, অসহ্য পুলকে নলিনীকান্ত ভ'রে উঠ্‌লেন—এই মুহূর্তে—এই মুহূর্তে যেন তিনি মরে যাবেন—আর এই রাত্রি, আর এই আকাশ, আর এই মোটোর দীপদীপ্ত চৌরংগী যেন সেই মুহূর্তে শিউরে উঠ্‌বে।

সমস্ত কার্জন পার্কটা তারা নীরবে পার হ'ল, মল্লিকা সেই ভাবেই নলিনীকান্তর হাত ধরে রইলো,—আর নলিনীকান্ত মনে মনে ঈশ্বরকে প্রার্থনা জানালেন, "হে [illegible]—এই মুহূর্তকে—এই রাত্রির অপূর্ব মুহূর্তকে আরো দীর্ঘ করো, আরো দীর্ঘতরো করো তুমি, এ-যেন শেষ না হয়—এই হাত ধরা, এই এক সংগে পা ফেলে চলা !"

কিন্তু ট্রাম লাইন এসে প'ড়েছে, ট্রাম দাঁড়িয়ে, নলিনীকান্ত এগিয়ে গেলেন—এখনি ট্রাম ছেড়ে দেবে, এবারে নলিনীকান্তই হাত বাড়িয়ে দিলেন, তারপরে মল্লিকার হাত ধ'রে তিনি তাকে ট্রামে ওঠালেন। দশটা

বেজে গেছে—মেট্রোর বাইরের আলো নিভে গেলো, চৌরংগীটা যেন মুহূর্তে'ই ম্লান হ'য়ে গেছে! নলিনীকান্ত মল্লিকার পাশে এসে বসলেন। ট্রাম ছেড়ে দিয়েছে—অপূর্ব মসৃণ গতিতে ট্রামটা এগিয়ে চ'লেছে—হু-হু ক'রে জান্‌লা দিয়ে আস্‌ছে বাতাস—মল্লিকা জান্‌লার ওপরে মাথা এলিয়ে দিলে। কি সুন্দর ঘনো আর কালো চুল ওর! নলিনীকান্ত একবার সেই ঘনো আর কালো চুলের দিকে চাইলেন—বাইরেও ওর চুলের মতো আকাশভরা সেই ঘনো আর কালো রাত্রি—হু-হু ক'রে মাঠের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার অসহ্য গতিতে ট্রামটা কাঁপ্‌ছে!

(ক্রমশঃ)

কুম্ভমেলা

শ্রীমৎ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী

পুণ্যতোয়া গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সুপবিত্র সঙ্গমস্থল শ্রীপ্রয়াগধামে (এলাহাবাদে) দ্বাদশ বৎসর পরে এবার যে সুপ্রসিদ্ধ কুম্ভমেলা হইয়া গেল, তাহা গত ৩০শে পৌষ মকর-সংক্রান্তি বাসরে আরম্ভ হইয়া ২৯শে মাঘ কুম্ভ-সংক্রান্তিতে সমাপ্ত হইয়াছে। ঐ দুই দিবস ব্যতীত ২রা মাঘ পৌষী অমাবস্যা, ৭ই মাঘ শ্রীপঞ্চমী এবং ১৮ই মাঘ পূর্ণিমা তিথি স্নানের বিশেষ বাসর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কাহারো কাহারো মতে এবারের কুম্ভমেলার আরম্ভ-বাসর ছিল ১৮ই পৌষ পূর্ণিমা তিথি।

বিশ্বব্যাপী মহাসমরের ফলে যে অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে বহু ব্যক্তি ইচ্ছা সত্বেও এবার কুম্ভ উপলক্ষে শ্রীপ্রয়াগধামে যাইতে পারেন নাই। কারণ রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করিতে অসমর্থ বলিয়া পূর্ব্বাহ্নেই বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। কুম্ভ-যোগের সংঘটনাদি বিবরণ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আ[illegible] করিতেছি।

দেবাসুরের যুদ্ধে সমুদ্র মন্থনে যে অমৃত-কুম্ভের উদয় হইয়াছিল তদ্বিষয়ে আমরা সকলেই কিছু কিছু সংবাদ অবগত আছি। শ্রীমদ্ভাগবতে ঐ বিষয় সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। ঐ কুম্ভ গ্রহণের জন্য সুর ও অসুরগণের মধ্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা হইলে শ্রীভগবান্ মোহিনীমূর্ত্তিতে তাহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া সকলকে মোহিত করেন এবং ঐ কুম্ভ দেবতাগণকে প্রদান করেন। শ্রীভগবানের আবির্ভাবের পূর্ব্বে অসুরগণের ভয়ে দেবতাগণ উক্ত অমৃত-কুম্ভ (১) গোদাবরীর তীরবর্ত্তী নাসিক ও ত্র্যম্বক, (২) নর্ম্মদার সন্নিহিত সিপ্রা নদীর তীরবর্ত্তী উজ্জয়িনী, (৩) গঙ্গা ও যমুনার দ্বারা বেষ্টিত প্রয়াগ এবং (৪) গঙ্গাবিধৌতচরণ হরিদ্বার—এই চারিটী স্থানে লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য ঐ সকল স্থানে কুম্ভমেলা হইয়া থাকে, ইহাই সাধারণ বিশ্বাস; কিন্তু এতদ্বিষয়ে কোনও শাস্ত্রপ্রমাণ পাওয়া যায় না। যাহা হউক ইহাদের প্রত্যেকটী স্থানেই সাধারণতঃ দ্বাদশ বৎসর পরে একবার পূর্ণকুম্ভযোগ উপস্থিত হয়। কচিৎ কোন স্থানে দ্বাদশ বৎসরের পরিবর্ত্তে তাহার পূর্ব্বেও কুম্ভযোগ উপস্থিত হইতে পারে। বিগত ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে হরিদ্বারে একাদশ বৎসর পরে পূর্ণকুম্ভযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। এই সময় পরিবর্ত্তনের কারণ এই যে, বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় পূর্ণকুম্ভযোগ সৌর ও চান্দ্র মতে গণিত [illegible]বার পরিবর্ত্তে প্রাচীন প্রথানুসারে বৃহস্পতি গ্রহের গতি অনুসা[illegible] হইয়া থাকে। বর্ত্তমান পঞ্জিকাসমূহ সেই প্রাচীন প্রথা [illegible] করেন না বলিয়া বোধ হয় আমরা বর্ত্তমান দিন-পঞ্জীতে [illegible]যোগের কোন উল্লেখ দেখিতে পাই না। বৃহস্পতি ঠিক দ্বাদ[illegible] বৎসরে নহে, প্রায় দ্বাদশ বৎসরে রাশিচক্রের দ্বাদশ রাশি একবার পরিভ্রমণ করেন। ইহার কারণ, 'অতিচার' ও 'মহাতিচার' বশতঃ গ্রহের গতি কখনও মন্দ, কখনও বা দ্রুত হয়। সূক্ষ্মবিচারে একাদশ

বৎসর কয়েক মাস ও কয়েক দিনে বৃহস্পতি গ্রহ রাশিচক্র পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। প্রতি দ্বাদশ বৎসরে যে কয়দিন কম থাকে, প্রায় ষষ্টি বর্ষে তাহাদের সমষ্টি এক বৎসর হইয়া দাঁড়ায়। তজ্জন্য কচিৎ এক বৎসর পূর্ব্বে পূর্ণকুম্ভ যোগের উদয় দেখা যায়, ইহা কোন কোন পণ্ডিতের মত; কিন্তু এতদ্বিষয়েও কোনও শাস্ত্রপ্রমাণ দৃষ্ট হয় না।

বৃহস্পতি যখন আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক পূর্ণিমার মধ্যে সিংহরাশিস্থ হন, তখন নাসিক ও ত্র্যম্বকে; যখন বৈশাখে বৃশ্চিকরাশিস্থ হন, তখন উজ্জয়িনীতে; যখন মাঘ মাসে বৃষ রাশিস্থ হন, তখন প্রয়াগে এবং যখন চৈত্র ও বৈশাখে কুম্ভ রাশিস্থ হন, তখন হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত যখন বৃশ্চিকস্থ হন, তখন মাঘ মাসে প্রয়াগে এবং যখন সিংহরাশিস্থ হন, তখন হরিদ্বারে অর্দ্ধকুম্ভমেলা হইয়া থাকে।

স্বর্গের সুখভোগপ্রাপ্তির আশায় পুণ্যসঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে কর্ম্মিগণ কুম্ভমেলায় গমন করিয়া থাকেন, কিন্তু স্বর্গ ত্রিগুণময় ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত একটী ভুবন। তাহাতে নিত্যকাল কেহ বাস করিতে পারে না। পুণ্যক্ষয় হইলেই পুনরায় তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্ত্যলোকে আসিতে হয়। যদি সত্য সত্যই অমৃতলাভ করিতে হয়, তাহা হইলে অশোক, অভয় ও অমৃতের আধার শ্রীভগবৎপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া তৎসেবনে জীবনযাপনই একমাত্র কৃত্য। শ্রীভগবান্ বিভু সচ্চিদানন্দ; তাঁহার নাম নিত্য, রূপ নিত্য, গুণ নিত্য, পার্ষদগণ নিত্য, লীলা নিত্যা, তাঁহার ধাম নিত্য এবং নিত্যধামে তাঁহার সেবায় পরামৃতের নিত্য নব-নবায়মান উৎস উত্থিত হইয়া থাকে। অমৃতের পুত্র আমরা ভব-কারাগারে ত্রিগুণশৃঙ্খলদ্বারা শৃঙ্খলিত থাকিয়া ত্রিতাপ ভোগ করিব কেন? তৎপরিবর্ত্তে উত্তরাধিকারিসূ[illegible] আমরা যে চমৎকার অমৃতের অধিকারী [illegible]ন্ধান করিব। সেই অমৃতের সন্ধানই মনু[illegible]তঃ বিকাশ। জড়বিজ্ঞানের অপব্যবহারে যে বিষ[illegible]ক্রিয়া হইয়া থাকে, তাহা বর্ত্তমান বিশ্বসমরে আমরা বিশেষভাবেই লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইতেছি। শ্রীপ্রয়াগধামে আমরা যে অমৃত-কুম্ভের সন্ধান পাইয়াছি, তাহা শ্রীবিন্দুমাধবের সেবা এবং 'শ্রীরূপশিক্ষামৃত'। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম-স্থল শ্রীপ্রয়াগধামের দশাশ্বমেধঘাটে উপবিষ্ট হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীরূপ গোস্বামীকে যে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, তাহাই 'শ্রীরূপ-শিক্ষা'-নামে অভিহিত। শ্রীরূপপাদ আমাদের প্রতি করুণা করিয়া তাঁহার রচিত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', 'উজ্জ্বলনীলমণি', 'বিদগ্ধমাধব', 'ললিতমাধব' 'উপদেশামৃত' প্রমুখ গ্রন্থমালায় মহাপ্রভু হইতে প্রাপ্ত শিক্ষা-প্রসূনমালা অতি সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই শিক্ষা অনুসরণ করিলেই গোলোকের অমৃত-কুম্ভ লাভ হইবে। সেই শিক্ষার অনুসরণফলে অপ্রাকৃত ভূমিকায় উপস্থিত হইয়া চিদ্বিলাসবৈচিত্র্যের অনুশীলনরূপ অমৃত-ধারায় নিত্য অভিষিক্ত থাকিবার সৌভাগ্য পাইব। ক্রমপন্থায় সেই অমৃত লাভ করিতে হয়। জড় ভাবকেলি কিছু গোলোকের সামগ্রী নহে। পক্ষান্তরে উহা চিদ্বিলাসের হেয় বিকৃত প্রতিফলন মাত্র। শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ ও ভজনক্রিয়ার ফলে অনর্থ-সমূহ নিবৃত্ত হইলে—প্রাকৃত কামভাব হৃদয় হইতে সমূলে দূরীভূত হইলেই ভজনে নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তির উদয়ে ভাব-ভক্তির উদয় হয়। ভাবই গাঢ় হইয়া অপ্রাকৃত প্রেমামৃতরূপে প্রকাশ পায়। এই অমৃতলাভের জন্য যত্নশীল হওয়াই আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশ্বে বর্ত্তমানে যে ধ্বংসলীলা দেখিতেছি, তাহাতেও ভারতের প্রাচ্য গগনে যে পরমার্থ-সূর্য্যের উদয় নিত্যকাল বর্ত্তমান, তৎপ্রতি চিন্তাশীল জনগণের দৃষ্টি অবশ্যই আকৃষ্ট হইবে। পাশ্চাত্ত্য[illegible]র কোন কোন মনীষীও প্রাচ্যের পরামৃতধারা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। দেশের জনগণের দৃষ্টি সেই নিত্য সেবামৃতের দিকে আকৃষ্ট হইলে বড়ই আনন্দের বিষয় হয়। কুম্ভের পুণ্যস্নানও তবেই সার্থক হইবে।

যুদ্ধের পরিণাম

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

যুদ্ধহেতু চিরস্মরণীয় ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে, অপ্রতিহতগতি কালচক্রের আবর্ত্তনে বিবর্ত্তনে, ঘটনাবহুল ধ্বংস-বিপুল দীর্ঘ দুইটি বৎসর অনাদি কালের অতল গহ্বরে অনন্ত কালের নিমিত্ত নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে। এই দুই বৎসর কালরূপী জার্ম্মাণীর অধিনায়ক হিটলারের কুচক্রে ও কূটনীতির কুটিল কলা-কৌশলে কত নরনারী, কত বালকবালিকা, কত যুবকযুবতী, কত বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, কত শত-সহস্র বলিষ্ঠ ও কর্ম্মিষ্ঠ সৈন্যসামন্ত অকালে কালকবলে নিপতিত হইয়াছে; কত দেশ, কত রাজ্য, স্বাধীনতা ও স্বায়ত্ত-শাসনের গৌরব-গরিমা হইতে বিচ্যুত হইয়া, পরাধীনতা ও পরবশতার গাঢ় অন্ধকারে অবসাদ ও অবসন্নতার মসীলিপ্ত কলঙ্ক-কালিমা অর্জ্জন করিয়াছে; কত ধন-জন-সম্পদ্-সমৃদ্ধ নগর, গ্রাম ও পল্লী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে; কত অর্থ অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছে—কে তাহার ইয়ত্তা করিবে! কোন কোন পণ্ডিত শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুযায়ী নিদর্শনের সহিত দেশ-কাল পাত্রের সামাঞ্জস্য-সমন্বয়ের বিচার করিয়া হিটলারকে কল্কী অবতার সন্দেহ করিতেছেন! হিটলার যে একটি অবতার, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই; কিন্তু তিনি ধ্বংসের অবতার—হিংসার প্রতিমূর্ত্তি—প্রতিহিংসার প্রেত-প্রতীক। মুখে প্রেমাবতার ঈশ্বরের নাম,—বক্তৃতায় মঙ্গল-নিদান শান্তির ভাষণ; কিন্তু আচার-আচরণে নররক্ত-লোলুপ শ্বাপদের ভীষণ হিংসা-প্রবৃত্তি! মুখে নব বিধানের ধুয়া—অন্তরে জিঘাংসার প্রচণ্ড অগ্নি-গর্ভ অশনির জ্বালা!

যাহারা স্বেচ্ছাবলে, ভ্রান্তিবলে, অথবা দৈববলে, কূটনীতির ফলে, অথবা আত্মরক্ষার ছলে, [illegible] গত্যন্তরের অভাবে, এই ভীষণ লোকক্ষয়কর, সহায়সম্পদ্-বিনাশক, ঘোর-অনাচার ও অত্যাচার-কলুষিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের সকলের মুখেই শুনিতেছি, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই মহৎ উদ্দেশ্য, এই অনাচার, অত্যাচার ও অবিচারপ্রপীড়িত জগতে নব বিধানের (New Order) চিরশান্তির অক্ষয় প্রতিষ্ঠা! সকলেই যুদ্ধ করিতেছেন,—লাভের জন্য নহে, লোভের জন্য নহে, রাজ্যবৃদ্ধির জন্য নহে,—মান, সম্ভ্রম, পশার-প্রতিপত্তির প্রসারের জন্য নহে; নিছক শান্তির জন্য। সে শান্তি কে ভঙ্গ করিয়াছে, কেন করিয়াছে, কোথায় করিয়াছে, তন্নির্ণয় ও নিরাকরণের কোন চিন্তা নাই। চিলে কাণ লইয়া গিয়াছে বলিয়া, কেহই কাণে হাত দিয়া কাণ আছে কি না, না দেখিয়াই, স্বকপোলকল্পিত চিলের অনুসরণ করিতেছে, চোরও অনুসরণকারীদিগের সহিত মিলিয়া, "চোর, চোর" বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে ছুটিয়াছে—তাহার স্থান সর্ব্বাগ্রে, তাহার কণ্ঠস্বর সর্ব্বোচ্চ গ্রামে! এ এক অপূর্ব্ব প্রহেলিকা! কে জানে ইহার গতি কোথায়—উদ্দেশ্য কি?

এই প্রহেলিকা হইতে আর এক প্রহেলিকার কথা মনে হয়। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ধরিত্রীর দুর্ব্বহ অধর্ম-ভার লাঘব করিবার নিমিত্ত দেবতাদের আসন টলিয়া ছিল। এখন যেমন অনাচার, অত্যাচার ও অবিচারে পৃথিবী জর্জ্জরিত, দুর্ব্বলের উপর প্রবলের পীড়নে নিরীহ নিরপরাধ নির্য্যাতিত, তখনও তাহাই ঘটিয়াছিল। প্রভেদ এই, এখনকার কাহিনী যেমন প্রত্যক্ষীভূত ঐতিহাসিক সত্য, তখনকার কাহিনী আমাদের পক্ষে তেমন প্রত্যক্ষীভূত ঐতিহাসিক সত্য নহে। কিন্তু এখন হইতে সহস্র সহস্র বৎসর পরে, বর্ত্তমানের এই বাস্তব ঘটনা যেমন তখনকার লোকের প্রত্যক্ষীভূত বাস্তব সত্য হইতে পারিবে না; অথচ বুয়ার যুদ্ধ, রুশ-জাপান যুদ্ধ, বিগত মহাযুদ্ধ প্রভৃতি যেমন আমাদের নিকট অতি বাস্তব প্রত্যক্ষীভূত ঐতিহাসিক সত্য, তদ্রূপ রামায়ণ-মহাভারত-বর্ণিত যুদ্ধও অতি সত্য; তাহা অস্বীকার না করিয়া স্বীকার করিয়া লওয়াই কর্ত্তব্য। কখনও কখনও ঐতিহাসিক সত্য [illegible] মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, যেমন অন্ধকূপ হত্যা; অ[illegible]সে লিপিবদ্ধ নাই, এমন ঘটনাও ঐতিহাসিক সত্য [illegible] অবিসংবাদিত রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, যেমন অজন্তা, মোহেনজো দাড়ো এবং হরপ্পার লোকচক্ষুর অন্তরালে স্থিত বহুদিন বিলুপ্ত কীর্ত্তি। যাহা লিপিবদ্ধ নহে, তাহা যখন সত্য হইতে পারে, তখন যাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত এবং লিপিবদ্ধ, তাহাই বা সত্য

বলিয়া স্বীকার করিব না কেন? এরূপ বিবৃতি অতিরঞ্জন হইতে মুক্ত না হইতে পারে; কিন্তু তাহার মূলে যে প্রচুর সত্য নিহিত আছে, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। এই হেতু লঙ্কাধিপতি রাবণের বিষম অত্যাচার হইতে পৃথিবীকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত রামায়ণবর্ণিত রাম-রাবণের যুদ্ধ যেমন ঐতিহাসিক সত্য, কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল এবং দুর্য্যোধন-প্রপীড়িত পৃথিবীর ভার-মোচন করিবার নিমিত্ত মহাভারতবর্ণিত কুরুক্ষেত্রে সংঘটিত কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধও তদ্রূপ সত্য। সুতরাং ধর্ম্ম-রাজ্যসংস্থাপনার্থ শ্রীকৃষ্ণের আকিঞ্চন এবং অনুষ্ঠান এবং তাহার পরিণামও আমাদের নির্ব্বিকার চিত্তে গ্রহণ করিতে বাধা নাই। যাঁহার অমর লেখনীমুখে ভগবদ্‌গীতা নিঃসৃত হইয়াছে, তাঁহার লেখনীপ্রসূত অন্যান্য ঘটনা প্রক্ষিপ্ত-দোষে দুষ্ট হইলেও মূলতঃ যে সত্য, তদ্বিষয়ে কোন প্রশ্নের অবকাশ নাই। সকল দেশের ইতিহাসেই সত্যের সহিত মিথ্যা এবং অতিরঞ্জন আশ্রয় লাভ করে। বর্ত্তমান সভ্যতার উৎকর্ষের সময়েও যখন এরূপ ভ্রম-প্রমাদ নিত্য ঘটনা, তখন সুদূর অতীতে, যখন ভারতে যথারীতি ইতিহাস লিখিবার এবং মুদ্রণ করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই, সেই সময়ে যে এরূপ ভ্রম-প্রমাদ বহুল পরিমাণে ঘটিবে, সে বিষয়ে সংশয় মাত্র নাই। তথাপি, রামায়ণ-মহাভারত মহাকাব্য মাত্র নহে, বিশ্বাসযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য ইতিহাসও বটে।

পৃথিবী দৈত্যভারাক্রান্তা এবং নিতান্ত নিপীড়িতা হইয়া তৎপ্রতিকারার্থ বিশ্বনির্ম্মাতা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, এ বিবৃতি হয়ত রূপক হইতে পারে; কিন্তু ইহার অন্তর্নিহিত নিগূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান্ হইবার কোন কারণ নাই। সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশ লইয়াই সংসারচক্র। সৃষ্টি ব্যতীত যেমন সংসার [illegible], নাশ ব্যতীতও তেমনি সংসার অচল [illegible]বীতে সকল পদার্থেরই সীমা আছে। মূল প্রকৃ[illegible] ব্যতিরেকে সকলেই সীমান্তর্গত। সীমা অতিক্রম করিলেই সৃষ্টির নাশ প্রয়োজনীয়। ইহা প্রাকৃতিক সত্য সুতরাং নূতন যুগে সৃষ্টির সহিত নাশও প্রয়োজনীয়। সৃষ্টি, স্থিতি ও নাশ—এই তিন কার্য্যের সামঞ্জস্য-বিধান হেতু আমরা এই জগতের অনাদি কারণকে ত্রিমূর্ত্তিতে কল্পনা করি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র। যখনই নাশের প্রয়োজন হয় তখনই দৈববলে, ঘটনাচক্রে, যুদ্ধ-বিগ্রহে, ঝঞ্ঝা-প্লাবন-ভূমিকম্প ও মহামারী উপস্থিত হইয়া প্রকৃতির অতি-প্রাকৃত নাট্য সম্পন্ন করে। সুতরাং যুগে যুগে, পৃথিবীর আবেদন-নিবেদনে অভিভূত ভগবানের আদেশে যে, দেবতাগণ অংশক্রমে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া ভূভারহরণ পূর্ব্বক শান্তিরাজ্য সংস্থাপন করেন—এ বিবরণ লোকশিক্ষার নিমিত্ত রূপক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, এ কথা মনে করিলে কিছুমাত্র অন্যায় হয় না।

কোন্ এক স্মরণাতীত যুগে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, ক্ষত্রিয়েরা এই অদ্রি-অটবি-সমাকীর্ণা, সসাগরা পৃথ্বীকে ধর্ম্মানুসারে শাসন করিতে আরম্ভ করেন। ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হইলেও, মানুষ বড় দুর্ব্বল। ক্ষমতা-দৃপ্ত হইলেই, লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্যে মানুষ অভিভূত হয়; এবং ন্যায়ের সহিত অন্যায়, এবং ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের আচরণে প্রবৃত্ত হয়। ফলে, অত্যাচারে, অনাচারে, অবিচারে জগতের সুখ-শান্তি, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য ক্ষুণ্ণ হয় এবং গুরু পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয়। কালক্রমে, বলদৃপ্ত ক্ষত্রিয়ের অত্যাচার এরূপ প্রবল হয় যে, ধ্বংসের সাহায্যে পৃথিবীকে সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ করিতে হয়। এই কারণেই বোধ হয় পরশুরাম পৃথিবীকে একবিংশতি বার নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-সহযোগে ক্ষত্রিয়-বংশ পুনর্ব্বার ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইলে, এই সসাগরা ধরা পুনরায় দীর্ঘজীবী প্রজাপুঞ্জে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু এই সদা পরিবর্ত্তনশীল জগতে রাম-রাজ্যও চিরস্থায়ী [illegible]ই। যুগে যুগে অসুরের জন্ম হইতেছে এবং [illegible]য়োজনানুযায়ী যুগাবতার যুগে যুগে ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়া ভূভারহরণ করিতেছেন। আবহমানকাল চক্রের আবর্ত্তনে-বিবর্ত্তনে এই প্রক্রিয়া চলিয়াছে। এই কাল কে? গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—'অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহহং বিশ্বতোমুখঃ।'

"আমি অক্ষয় কাল, আমি সর্ব্বকর্ম্মফলদাতা ঈশ্বর।"

কিন্তু কেবলমাত্র সৃষ্টি-স্থিতি তাঁহার কার্য্য নহে। সংহারও তাঁহার কর্ত্তব্য। তাই পুনরায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

'কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।'

"আমি লোকক্ষয়কর্ত্তা অনন্ত কাল; লোক সকলকে সংহার করিতে ইহলোকে প্রবৃত্ত রহিয়াছি।"

যদুকুল-ধ্বংস এবং কৃষ্ণ-বলরামের মহাপ্রয়াণের পর, দ্বারকা হইতে হস্তিনানগরে প্রত্যাবর্ত্তনকালে, পথে দস্যু কর্ত্তৃক পর্য্যুদস্ত অর্জ্জুনকে মহাপ্রস্থানে ইঙ্গিত করিয়া বেদব্যাস বলিয়াছিলেন—

"কালই জগতের বীজস্বরূপ। কালপ্রভাবেই সমুদায় সমুৎপন্ন ও বিলীন হইয়া থাকে। কালই বলবান্ হইয়া আবার দুর্ব্বল এবং ঈশ্বর হইয়াও আবার অন্যের আজ্ঞাবহ হয়।"

লোকের মঙ্গললাভের সময় সমুপস্থিত হইলেই সুবুদ্ধি ও সমৃদ্ধি ঘটে; আবার অমঙ্গল-সময় উপস্থিত হইলেই তাহার ক্ষয়ও সংঘটিত হয়। এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া দেবরাজ দৈত্য বিনাশ করিয়া স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন; রাক্ষস নিধন করিয়া শ্রীরামচন্দ্র ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরও অধর্ম্মের নাশ দ্বারা ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক যুগেও যে সকল মহাসমরের অভিনয় হইয়াছে, তাহার মূলেও ছিল নাশ দ্বারা সৃষ্টি-রক্ষাই, বোধ হয়, বিধাতার অভিপ্রেত মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু, ধ্বংসের আপাত পরিণাম ভয়াবহ। অজ্ঞ আমরা, ঈশ্বরের গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি না; শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়ি। কুরুক্ষেত্রের অবসানে ধীমান্ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকেও এরূপ বিচলিত হইতে হইয়াছিল যে, বেদব্যাস, শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম প্রভৃতি মহামনীষী ব্যক্তিগণকেও তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে বিলক্ষণ বেগ [illegible] হইয়াছিল। শোকের বিশেষ কারণও ছিল। জ্ঞাতি[illegible] কুল নির্ম্মূল হইয়াছিল এবং বসুন্ধরা বসু ও বীরশূন্যা হইয়াছিল। যাহাদের লইয়া রাজত্ব করিতে সুখ, যাহাদের উপর প্রভুত্ব করিলে তৃপ্তি, তাহাদের কেহই জীবিত ছিল না। ক্ষত্রিয় রাজাদিগের বহিরঙ্গণ পুরুষ-শূন্য এবং অন্তঃপুর বিধবাপূর্ণ হইয়াছিল। অশ্বমেধ যজ্ঞানুষঙ্গিক দিগ্বিজয়েও ক্ষতি কম হয় নাই; যদিও যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে বিশেষ সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন, যাহাতে ক্ষয়িষ্ণু ক্ষত্রিয়কুলের কুরুক্ষেত্রে-হতাবশিষ্ট বীরগণের সংখ্যা অধিকতর হ্রাস না পায়। এই যে ক্ষত্রিয়-বিনাশে ক্ষাত্রতেজের ক্ষয়, ইহাই ভারতের ভবিতব্য অবনতি এবং পরাধীনতার মূল এবং মুখ্য কারণ।

ক্ষাত্রশক্তিবিহীন ভারতবর্ষ তাহার পর আর বহিঃশত্রুর আক্রমণ নিবারণ করিতে পারে নাই। পৃথ্বীরাজ, পুরু, চন্দ্রগুপ্ত, সংগ্রামসিংহ, রাণা প্রতাপ প্রভৃতি পরবর্ত্তী পুরুষসিংহের সম্পদ্‌বিহীন ক্ষীণপ্রচেষ্টা বিলয়-ভূয়িষ্ঠ জল-বুদ্বুদের ন্যায় অচিরে বিলীন হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়-পুরুষের অভাবে এবং অত্যাচারাশঙ্কায় আতঙ্কিতা ক্ষত্রিয়-রমণীগণের জলন্ত-চিতায় আত্মসমর্পণের ফলে, ক্ষত্র-প্রজননের মূলোচ্ছেদ হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়-নায়ক-বিহীন ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র,—রাজ্যরক্ষা দূরের কথা, আত্মরক্ষায় সমর্থ ছিল না। শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে রাজত্ব দুর্য্যোধনের রাজত্বের ন্যায় বীর বিক্রমে বিপুল ছিল না। যদুকুলের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই, ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম ও বলবীর্য্য অন্তর্হিত হইয়াছিল, এবং তৎকালের প্রধানতম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপন-স্বপ্ন সত্য হইয়াও ক্ষণভঙ্গুর হইয়াছিল। হয়ত, ইহাও সেই সর্ব্ববিজয়ী কালের চক্র, অথবা লীলা!

প্রলয়ের পর প্রভব, উৎসাদনের পর উৎপাদন, ধ্বংসের পর সৃষ্টি প্রাকৃতিক নিয়মে ঘটে; কিন্তু ধ্বংসের ক্ষতি বর্ত্তমানে কিংবা ভবিষ্যতে সৃষ্টির সাহায্যে সম্পূরিত হয় না। গ্রীক্ [illegible]লুপ্ত হইয়াছিল, আর তাহা ফিরিল না। রোমক সাম্রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল, আর তাহার পুনরুত্থান সম্ভব হইল না। ভারতের শৌর্য্যবীর্য্য ও [illegible]-বিজ্ঞান বিলোপ পাইয়াছিল, আর তাহা মাথা উঁচু করিতে [illegible] না। যাহা যায়, তাহা আর ফিরিয়া আসে না। [illegible] অতীতেই লীন থাকে; বর্ত্তমান তাহার ছায়া লইয়া [illegible] বিষ্যতের কায়া গঠন করে বটে; কিন্তু অতীতের ঐশ্বর্য্য ফিরাইয়া আনিতে পারে না।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বল—জনবল। প্রত্যেক দেশের প্রধান শক্তি—জনশক্তি। সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে জনসম্পদই প্রকৃষ্ট সম্পদ—মুখ্য; অর্থবল, অস্ত্রবল, বুদ্ধিবল এবং যন্ত্রবল

—এ সকলই গৌণ। যুদ্ধে প্রজনন-ক্ষম পুরুষের সংখ্যাই অতিমাত্রায় হ্রাস পায় এবং সে ক্ষতি যুগে যুগেও পূর্ণ হয় না। বিগত মহাযুদ্ধের জনক্ষয় পঞ্চবিংশতি বর্ষেও পূর্ণ হয় নাই। ঐ মহাযুদ্ধের অবসানে, ভারতের প্রাচীন কৌলীন্য প্রথার আত্মঘাতী নীতির অনুসরণ করিয়া বিলাতে প্রজনন-সৌকর্য্যার্থ Visiting Husbands প্রথা প্রচলনের আন্দোলন চলিয়াছিল। এই প্রথার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, প্রত্যেক সমর্থ পুরুষ একাধিক বিবাহ করিবে কিন্তু একটিকে লইয়াই ঘর-সংসার করিবে; এবং অবস্থানুযায়ী অন্যগুলিকে দূরে রাখিয়া ভরণ-পোষণ করিবে। এ প্রথা অবশ্য প্রকাশ্যে কার্য্যে পরিণত হয় নাই। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের জনক্ষয় যে পূর্ব্ব যুদ্ধাপেক্ষা কত অধিক, তাহা সহজেই অনুমেয়।

যেমন জনক্ষয়ের, তেমনি ধন-সম্পত্তিক্ষয়ের পূরণও দুঃসাধ্য। সুতরাং একনায়কগণের নববিধান-স্বপ্ন যে দুঃস্বপ্ন, দিবা স্বপ্নাপেক্ষাও অলীক, বস্তুতন্ত্রতা হীন এবং বাস্তবতাবিহীন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশমাত্র নাই।

ধ্বংস বিনাশের ভিত্তি—পুনর্গঠনের নহে। গড়িয়া ভাঙ্গা সহজ; কিন্তু ভাঙ্গিয়া গড়া কেবলমাত্র আয়াস-সাধ্য নহে, কোন কোন ক্ষেত্রে অসম্ভব। যুদ্ধ ধ্বংস ও ধর্ষণ—ক্ষয় ও ক্ষতির হেতু। ধন-জন, শক্তি-সামর্থ্য, সহায়-সম্পদ্ বিহীনা হইয়া ধরিত্রী দীনতা প্রাপ্ত হয়। যাহা যায়, তাহা আর হয় না; যাহা থাকে, তাহা হীন ও ক্ষীণ হয়; নূতন যাহা গড়িয়া উঠে, তাহা বিপুল ও বিচিত্র হইলেও, পুরাতনের মহিমা-মর্য্যাদা ও গৌরব-গরি[illegible] চির-বিচ্যুত হয়।

আমি যে কালের উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি, কেহ কেহ সেই কালের দোহাই দিয়া বলিবেন, ধর্ম্ম-সাক্ষী কা[illegible] নাশের নিদান। তাহার কেহই [illegible] নাই। যুদ্ধাদি ব্যাপার নিমিত্ত মাত্র। [illegible]বেই লোকে হিংসাজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। [illegible]-নির্ম্মিত যন্ত্র যেমন পরিচালকের অধীন, তদ্রূপ এই জগৎ কালকৃত কর্ম্মেরই সম্যক্ আয়ত্ত। অতএব বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রবর্ত্তক হিট্‌লার নিমিত্ত মাত্র। এ মত অদৃষ্টবাদীর। পুরুষকারবাদী এ মতে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন না। তাঁহারা বলিবেন, যদিও দৈব ও পুরুষকার পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া আছে, তথাপি শৌর্য্যবীর্য্যশালী সাহসী পুরুষেরা এই উভয়ের মধ্যে পুরুষকারকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করেন; আর দুর্ব্বল ভীরু ব্যক্তি দৈবকেই বলবান্ জ্ঞান করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকে। অতএব, দৈব অবলম্বন না করিয়া পরাক্রমসহকারে পৌরুষ-প্রয়োগ করাই বিধেয়। অহিংসার ক্ষেত্রে—জনহিতকর কার্য্যে এ নীতি অমোঘ; কিন্তু হিংসা ও ধ্বংসের ক্ষেত্রে এ নীতি শ্বাপদ্-নীতি, বুদ্ধি-বিবেকহীন পশুবলদৃপ্ত জীব-জন্তুর আচরণীয়—বুদ্ধি-বিবেকশীল মানবের নহে।

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানব। বিধাতা তাহাকে বহুলাংশে আত্মানুরূপ করিয়া সৃজন করিয়াছেন; বলবীর্য্যের সহিত তাহাকে বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়াছেন। মানুষ প্রবৃত্তির দাস নহে; তাহার হিতাহিত জ্ঞান আছে; সে বিবেক-বৈরাগ্যের অধিকারী ও অধিপতি। সুতরাং মহাক্ষয়ের হেতু যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া তাহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করাই অধিকতর মানবোচিত। যুদ্ধ না করিয়া অতি অল্পমাত্র লাভও শ্রেয়স্কর। যুদ্ধ রৌদ্র কর্ম্মের পরাকাষ্ঠা; নৃশংসতার চরম অভিব্যক্তি। নৃশংসব্যক্তি দুরদৃষ্টবশতঃ সৈন্যসংগ্রহ করিয়া পরস্পরাহরণে প্রবৃত্ত হয়; তাহাতেই যুদ্ধের সৃষ্টি ও অস্ত্র-শস্ত্রের আবিষ্কার। বল ও নীতির তারতম্যানুসারে যুদ্ধে জয় বা পরাজয় ঘটে। এককালে উভয় পক্ষের জয় অথবা পরাজয় সম্ভবে না। যুদ্ধে জয়-পরাজয়ও দৈবায়ত্ত। জয়লাভও অনেক ক্ষেত্রে পরাজয়ের তুল্য। যে পক্ষ পরাজিত হয়, কেবল যে সেই পক্ষেরই অনিষ্ট ঘটে, তাহা নহে; বিজেতৃ পক্ষকেও অনেক অপকার ভোগ করিতে হয়। যুদ্ধে বৈরের অবসান ঘটে না। পরাজিত পক্ষ বৈরনির্য্যাতন [illegible] সুযোগ ও সুবিধার প্রতীক্ষা করে মাত্র। অতএব [illegible] পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তিমার্গ অবলম্বনই শ্রেয়ঃ।

বসুন্ধরা বীরভোগ্যা সন্দেহ নাই; কিন্তু এই সমগ্র পৃথিবী কখন একজনের অধিকৃত হইতে পারে না। ইতিহাস তাহার প্রকৃষ্ট সাক্ষী। অতএব পরস্পর সামঞ্জস্য সহকারে সদ্ভাবে এই ভূমণ্ডলে স্ব-স্ব স্বাভাবিক অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বাস করাই সমীচীন। এই নিমিত্ত হিংসাত্মক ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত না হইয়া, আন্তর্জ্জাতিক মন্ত্রণাবৈঠকে যুক্তি-তর্ক ও বুদ্ধি-বিবেচনা

দ্বারা বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসা শ্রেয়স্কর। মানব-সভ্যতার চরম উদ্দেশ্যও তাহাই। যিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক জগতের শান্তিভঙ্গ করিয়া যুদ্ধবিগ্রহের সূচনা করেন, তিনি স্বদেশ, বিদেশ ও জগতের শত্রু। যুদ্ধের পরিণাম ভীষণ—ধনক্ষয়, জনক্ষয়, সহায়, সম্পদ্ ও সম্পত্তির ক্ষয় ও ক্ষতি; নিরবচ্ছিন্ন ধ্বংস ও মৃত্যু! বিজেতা ও বিজিত উভয় পক্ষই এই ক্ষয় ও ক্ষতির অংশ গ্রহণ করে এবং ধ্বংস ও মৃত্যুজনিত ক্ষয় ও ক্ষতির কোনদিন পূরণ হয় না; শোক এবং স্মৃতিমাত্র পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। সমর্থ ও শক্তিমান্ পুরুষের অত্যধিক ক্ষয়হেতু নর-নারীর সংখ্যা বিপর্য্যয়ের ফলে, সর্ব্বজাতির কুল, শীল, ধর্ম্ম ও রাজ্য বিপন্ন হয়।

আধুনিক জলযান

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

জলযানের জন্ম ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে মাঘ সংখ্যা "প্রবর্ত্তকে" আলোচনা করিয়াছি। বস্তুতঃ জলযানের ইতিহাসে কলাম্বাস কর্ত্তৃক আমেরিকা আবিষ্কারকে যুগান্তরানয়নকারী ঘটনা বলা চলে। কলম্বাস 'স্যান্টা মেরিয়া' নামক জাহাজে আরোহণ করিয়া তাঁহার অসমসাহসিক অভিযানে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই পোতখানি স্পেনে প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহা একশত ফিট দীর্ঘ ছিল এবং একশত টনের অধিক ভার বহন করিবার সামর্থ্য ইহার ছিল না। অষ্টম ও নবম শতকে নর্সদিগের দ্বারা নৌ-নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইবার পর প্রায় পাঁচ শত বৎসর পরে এই পোত প্রস্তুত হইলেও নর্সদিগের নির্ম্মিত জাহাজ অপেক্ষা ইহা সকল বিষয়ে হীন ছিল। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে জগতে যুগান্তরানয়নকারী এই জলযানের জীবনযাত্রা আরম্ভ হয়। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, কলাম্বাসের অভিযানের বহু পূর্ব্বে নির্ভীক ভিকিং ভ্রমণকারীরা আতলান্তিক অতিক্রম করিয়াছিল। কলাম্বাস [illegible] পতির পৃষ্ঠপোষকতায় উৎসাহিত হইয়া স্পেনীয় [illegible] স্যান্টামেরিয়ায় চড়িয়া কোন অভিনব মহাদেশাবিষ্কারের আশায় অগ্রসর হ'ন নাই। ভারতবর্ষে আসিবার উপযুক্ত জলপথ খুঁজিবার জন্যই তিনি বাহির হইয়াছিলেন; কিন্তু বিধাতার নিগূঢ় অভিপ্রায়ে তাঁহার অভিযান অন্যরূপ পরিণাম প্রসব করিয়াছিল। কলাম্বাসের পূর্ব্বে চৈনিক নাবিকগণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে পৌছিয়াছিল, এই ঘটনারও প্রমাণ আছে। কলাম্বাস স্পেনীয় নহেন, জেনোয়াবাসী ইটালীয়ান। তখন নাবিকরূপে না হউক, বণিক্‌রূপে ইটালীয়ানগণ জলপথে নানা দেশে গমন করিয়া সাহস ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছিল। তখন ভেনিস ও জেনোয়া প্রভৃতি ইটালীয় গণতান্ত্রিক নগরগুলিই পৃথিবীর প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে, এক সময়ে ভারতবর্ষের সহিত রোম বা ইটালীর বিশেষ বাণিজ্যসম্পর্ক ছিল। কলাম্বাসেরও পূর্ব্বে ভেনিসবাসী ইটালীয় ভ্রমণকারী মার্কো পোলোর দ্বারা নানা দেশের রহস্য-যবনিকা উত্তোলিত হইয়াছিল। যাঁহার নাম হইতে আমেরিকার নামকরণ হয়, সেই ভ্রমণকারী আমেরিগো ভেস্পুসিও ফ্লরেন্সবাসী ইটালীয়ান ছিলেন।

পর্ত্তুগীজরা কলাম্বাসের পূর্ব্বেই নাবিকরূপে নৈপুণ্য ও নির্ভীক[illegible]য় দিয়াছিল। কলাম্বাস কর্ত্তৃক আমেরিকার আ[illegible]রের আগেই পর্ত্তুগীজ নাবিকরা আফ্রিকার উপকূল আবিষ্কার করিয়াছিল। পর্ত্তুগীজ নৌ-পর্য্যটক বার্থলমিউ [illegible] উত্তমাশা অন্তরীপে সর্ব্বপ্রথম পৌছিয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজ [illegible] ভাস্কো-ডা-গামা উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করি[illegible]হৃতি ভারতের উপকূলে উপনীত হইয়া কলাম্বাসের ও [illegible]রোপের সুখ-স্বপ্নকে সফল করিয়াছিলেন বলা চলে। পর্ত্তুগীজ ম্যাগেলানকে প্রথম ভূমণ্ডল-ভ্রমণকারী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কলাম্বাসের অদ্ভুত অভিযান ও আবিষ্কার বারিধিবক্ষে হিস্পানিয়া বা স্পেনের বিজয়-বৈজয়ন্তী উত্থিত করিয়াছিল। আজ যে স্পেন

তৃতীয় শ্রেণীর শক্তি বলিয়াও স্বীকৃত হইবে কিনা সন্দেহ, একদিন সমুদ্রবক্ষে তাহারই অপ্রতিহত আধিপত্য প্রসারিত ছিল। বর্ত্তমানে বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য্যাস্ত হয় না বলিয়া কথিত; কিন্তু একদিন এইরূপ স্পর্দ্ধা শুধু স্পেনই করিতে পারিত। তখন আমেরিকাবিজয়ী স্পেনই ছিল পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৌ-শক্তি। স্পেনের সেই বারিধি-বক্ষ-বিজয়ী দুর্জ্জয় শৌর্য্যবীর্য্যও আজ অতীতের কীর্ত্তি হইয়া কাব্যে ও কাহিনীতে পরিণত, অপরূপ রূপ-কথায় রূপান্তরিত। ইংরেজ আজ যে সুবিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী, তাহা যে জলযানের সাহায্যে লাভ করিয়াছে বলিলে ভুল হয় না। ড্রেক, কুক প্রভৃতি নির্ভীক নাবিকরাই বৃটিশ সাম্রাজ্যসৌধের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন, এই সত্যে সন্দেহ করিবার অবকাশ কোথায়? বর্ত্তমানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৌশক্তি বারিধি-বেষ্টিত বৃটেনের বিপুল সমরোপকরণে সজ্জিত প্রকাণ্ড পোতশ্রেণীকে অপরাজেয় জানিয়াই হিটলারের মত দুঃসাহসী ও উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিও জলপথে বৃটেন-আক্রমণ যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন নাই।

রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময় হইতেই পোত প্রস্তুতি-ব্যাপারে ইংলণ্ড দ্রুত গতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে এবং সেই সময়েই সার ফ্রান্সিস ড্রেক্ প্রভৃতি নৌ-বীরগণ বৃটিশ সাম্রাজ্য-বৃক্ষের বীজ রোপণ করেন। স্পেনিশ আর্ম্মাডা ধ্বংস হইবার পর হইতে বৃটেনের সৌভাগ্য-তরণী অনুকূল বাতাসে আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য বা গন্তব্যের অভিমুখে বেগে আগাইয়া যায় এবং ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের ফলে দক্ষিণ আমেরিকার [illegible] ঐশ্বর্য্যের অধিকারী স্পেন পয়োধিবক্ষে প্রসা[illegible]তিহত প্রাধান্য হারাইয়া দিন দিন দুর্ব্বলতর হইতে থাকে। যোড়শ শতকের স্পেনীয় ও বৃটিশ পোতগুলির ম[illegible] পার্থক্য দেখা যাইত। স্পেনীয় জাহাজগুলি [illegible]রে বৃহত্তর হইত এবং এই সকল জা[illegible]নটি হাজার টনের, কোনটি বা ১২ শত টনে[illegible]ল বলিয়া আমরা জানিতে পারি। ঐ যুগের বৃটি[illegible] জাহাজগুলি আকারে স্পেনীয় জাহাজের চতুর্থাংশ ছিল কিনা সন্দেহ, কিন্তু ক্ষিপ্রতায় ও পারিপাট্যে বৃটিশ পোত স্পেনীয় পোতকে অতিক্রম করিয়াছিল। ষ্টীমার বা বাষ্পীয় পোত আবিষ্কৃত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৃহদাকার ও গুরুভার জাহাজের স্থান লঘু অথচ দ্রুতগামী ক্ষুদ্রকায় পোত গ্রহণ করিয়াছিল। এই সময় ৩০ হইতে ৫০টি পর্য্যন্ত কামানবহনকারী ফ্রিগেডজাতীয় যুদ্ধ-জাহাজের জন্ম হইয়াছিল। জাহাজ ক্ষুদ্র ও ক্ষিপ্র হইলে, ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ ঊর্ম্মিমালার সহিত তাহার সংগ্রাম করিবার শক্তি অধিকতর হয়।

বৃটিশজাতি ক্ষুদ্র ও ক্ষিপ্রগামী জাহাজনির্ম্মাণে নৈপুণ্য প্রদর্শন করিলেও, অতি দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইবার উপযুক্ত পোত আমেরিকানরাই প্রথম প্রস্তুত করিয়াছিল। আমেরিকানদিগের দ্বারা নির্ম্মিত "জর্জ্জ অফ স্যালেম" নামক জাহাজ ১৮২১ খৃষ্টাব্দে ৯৫ দিনে কলিকাতা হইতে বোষ্টন নগরে গমন করিয়াছিল এবং পর বৎসর ৮৫ দিনে এই দেশে ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশের পক্ষে এই দ্রুতগামিতা অল্প বিস্ময় বা প্রশংসার বিষয় নহে। তৎকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জাহাজগুলির পক্ষে লণ্ডন হইতে কলিকাতায় আসিতে পাঁচ মাস হইতে আট মাস পর্য্যন্ত সময় লাগিত। পাঁচ মাসে আসিলে খুব শীঘ্র আসিল বলিয়া মনে করা হইত। ইহার পর 'ক্লিপার' আখ্যায় অভিহিত ক্ষিপ্রগামী জাহাজের জন্ম হয়। প্রকৃত পক্ষে এই জাতীয় জাহাজের মধ্যে "রেন্‌বো"কেই প্রথম বলা চলে। যখন এই জাহাজ প্রথম যাত্রা করে, তখন সমুদ্র তীরে বহু লোক দর্শকরূপে দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিল ঝড়ের প্রথম ঝাপটাতেই সেই হাল্কা জাহাজ উল্টাইয়া যাইবে। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে এই জাহাজখানি চীন [illegible]থে রওনা হয় এবং সেপ্টেম্বর মাসে নির্ম্মাণব্যয় [illegible]ণ দ্বিগুণ মূল্যের পণ্যদ্রব্য লইয়া নিরাপদে স্বদেশে ফিরিয়া আসে। ক্লিপার জাতীয় জাহাজ কিরূপ দ্রুত গতিতে যাইতে পারিত, তাহার দৃষ্টান্ত "জেম্‌স বেনেস্" নামক পোতের বৃত্তান্ত হইতে জানা যায়। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এই জাহাজ সমুদ্রবক্ষে যাতায়াত করিত। ইহা ঘণ্টায় ২১ নট যাইতে পারিত। এক নট এক সামুদ্রিক মাইলের সমান। এক সামুদ্রিক মাইল আমাদের এক মাইল এবং উহার সপ্তাংশ বা সাত ভাগের এক ভাগের

তুল্য। বাষ্পের সাহায্য না লইয়া শুধু প্রসারিত পালের সহায়তায় এরূপ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হওয়া সামান্য ব্যাপার নহে।

"আটলাণ্টিক" নামক আমেরিকান ইয়াচ্ট এই জাতীয় জাহাজের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছে। অবশ্য এখানে বাষ্পীয় এঞ্জিনবিহীন ইয়াচ্টের কথা বলা হইতেছে। এই জাহাজ ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২৪ মে আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের বুকের উপর দিয়া অগ্রসর হইয়াছিল। ইহা প্রতিদিন ৩ শত ৪১ সামুদ্রিক মাইল অতিক্রম করিতে পারিত। অর্থাৎ ঘণ্টায় ১৪ নটেরও কিছু অধিক আগাইয়া যাইত। বৃটিশদিগের নির্ম্মিত "রেনবো" নামক এই জাতীয় জাহাজের গতি ঘণ্টায় ১৬ নট পর্য্যন্ত ছিল।

খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বে আবির্ভূত হেরো নামক আলেক-জেন্দ্রিয়াবাসী পণ্ডিত বাষ্পের শক্তি সম্বন্ধে চিন্তা ও আলোচনা করিলেও, এই শক্তিকে কার্য্যতঃ মানুষের কল্যাণে নিযুক্ত করা হইয়াছিল বহুকাল পরে উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায়। যিনি বাষ্প-চালিত জলযান প্রথম আবিষ্কার বা নির্ম্মাণ করেন, তিনি একজন আমেরিকান। ইঁহার নাম রবার্ট ফাল্টন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ইঁহার পরিকল্পনানুযায়ী "ক্লারমণ্ট" নামক প্রথম বাষ্পতরী প্রস্তুত হয়। সে-দিন নিউইয়র্কবাসীরা সেই বাষ্পচালিত নৌকার পানে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়াছিল, সন্দেহ নাই। তাহারা সেইরূপ বিস্ময়কর দৃশ্য দেখিবার কল্পনাও পূর্ব্বে করে নাই। এই প্রথম বাষ্পতরী প্রস্তুত হইবার দ্বাদশ বৎসর পরে "স্যাভানা" নামক বাষ্পীয় পোত আটলাণ্টিক অতিক্রম করিয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে কোন বাষ্পীয় পোত আটলাণ্টিক অতিক্রম করে নাই। এ সম্বন্ধে একটি [illegible] আছে। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে "কণ্ট্রাক্ট" নামধারী বৃটিশ (স্কুনার জাতীয়) জাহাজ যখন আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের মধ্য দিয়া যাইতেছিল, তখন উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দর্শকদের মনে হয় বুঝিবা জাহাজখানিতে আগুন লাগিয়া থাকিবে। আরও আগাইয়া গেলে তাহারা সবিস্ময়ে দেখিতে পায় যে, জাহাজের উপরিস্থিত দীর্ঘাকৃতি নল হইতে ধূম্ররাশি স্তম্ভাকারে নির্গত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে সেই বিস্ময়কর বিচিত্র পোত তাহাদের দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া যায়। বলা বাহুল্য, ধূম্রোদ্গারী জাহাজখানিই আটলাণ্টিক অতিক্রমকারী প্রথম বাষ্পীয় পোত "স্যাভানা"।

বাষ্পের বিস্ময়কর শক্তির সাহায্যে বিরাট্ বারিধি-বক্ষে বড় বড় জাহাজও সহজে চালাইয়া লইয়া যাওয়া যায়, এই সত্য প্রমাণিত হইবামাত্র বহু ব্যবসায়ী বাষ্পীয় পোতপ্রস্তুত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। অবশ্য এ বিষয়ে আমেরিকাই পথ-প্রদর্শক হইল। আমেরিকার পদাঙ্ক বা আদর্শ অনুসরণ করিয়া বৃটিশরাও ষ্টীমারনির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করিল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে "সিরিয়াস" নামক ৭ শত টনের জাহাজ কর্ক বন্দর হইতে নিউ-ইয়র্কের দিকে অগ্রসর হইল। উহার যাত্রা করিবার চারিদিন পরে "গ্রেট ওয়েষ্টার্ণ" নামক (১ হাজার ৩ শত ৪০ টনের) আর একখানি জাহাজ বৃষ্টল হইতে নিউ-ইয়র্ক অভিমুখেই রওনা হইল। একটি অপরটির চারদিনের ব্যবধানে যাত্রা করিলেও, উভয়ে একই দিবসে নিউ-ইয়র্কে পৌঁছিল। এই ব্যাপারের নয় বৎসর পরে বৃটিশ সরকার বাষ্পীয় পোতের সাহায্যে বৃটেন হইতে আমেরিকায় ডাক লইয়া যাইবার সঙ্কল্প করিয়া ঐরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হইবার উপযুক্ত বাষ্পীয়পোতপ্রস্তুতকারক বা পোতাধিকারী খুঁজিলে, নোভা স্কোটিয়ার অন্তর্গত হ্যালিফাক্সের স্যামুয়েল কুনার্ড নামক উদ্যমশীল ব্যক্তি উক্ত কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন। তিনি ইংলণ্ডে আসিয়া তথাকার সার জর্জ্জ বার্ণস্ এবং মিঃ ডেভিড [illegible]-ইভারের সহিত পরামর্শ করিলেন এবং তিন [illegible] ২ লক্ষ পাউণ্ড মূলধনে কুনার্ড কোম্পানী নামক একটি জাহাজ নির্ম্মাণ করিবার উপযোগী বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিলেন। এই পোত-প্রস্তুতকারক প্রতি[illegible] বৃটানিয়া" "একেডিয়া" "ক্যালিডোনিয়া" এবং "কলা[illegible] বাষ্পীয় পোত-চতুষ্টয় প্রস্তুত হইল। এই পোতগুলির [illegible]কটিই ১ হাজার টনের যৎকিঞ্চিৎ মাত্র অধিক ছিল। [illegible]ই ভাসমান নগরের ন্যায় বিপুল-বপু জাহাজের যুগে ঐ সকল জাহাজকে ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু তখনকার দিনে উহার গুরুত্ব বা কার্য্যকারিতা অতুলনীয় ছিল, সন্দেহ নাই। উহারা কাষ্ঠ-

নির্মিত ছিল এবং চক্রাকার দাঁড়ের দ্বারা পরিচালিত হইত। উহারা ঘণ্টায় আট নট করিয়া চলিত এবং তিন সপ্তাহে আটলান্টিক অতিক্রম করিতে সমর্থ ছিল। এইরূপে বিশ্ব-বিখ্যাত বিশাল কুনার্ড-লাইন প্রবর্ত্তিত হয়। আটলান্টিক বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া এই লাইনই আজিও বৃটেন হইতে আমেরিকায় ডাক লইয়া গিয়া অদম্য উদ্যমশীল প্রবর্ত্তক স্যামুয়েল কুনার্ডের কীর্ত্তি-কাহিনীর সাক্ষ্য দিতেছে। সেইরূপ ক্ষুদ্রকায় পোত আর নাই, আজকাল যে সকল প্রকাণ্ডকায় জাহাজে আমেরিকায় ডাক লইয়া যাওয়া হয়, তাহাদিগকে ভাসমান প্রসাদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বাষ্পীয় পোত প্রবর্ত্তিত হইবার পরে অল্পকাল ধরিয়া কাষ্ঠই পোত প্রস্তুত করিবার প্রধান উপকরণ ছিল। পরে কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে লৌহ ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। লৌহ ব্যবহৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজগুলি ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ উর্ম্মিমালার বা জলমগ্ন পাহাড়ের আঘাতে ভাঙ্গিয়া যাইবার আশঙ্কাও অনেক কমিয়া যায়। লৌহের এই কার্য্যকারিতা উপলব্ধি হইবার পরেও কিছুদিন জাহাজ-নির্ম্মাণে প্রধানতঃ কাষ্ঠই ব্যবহৃত হইয়াছিল। পরে দেখা গেল, কাষ্ঠ-নির্ম্মিত জাহাজ বেশী বড় হইলে তাহা চালাইবার পক্ষে অসুবিধা আছে। যাঁহারা মনে করিয়াছিলেন লৌহে বেশী ব্যয় হইবে, তাঁহারাও বুঝিলেন যে, ঐ ধারণা ভুল। লৌহে অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে উৎকৃষ্টতর ও উপযুক্ততর পোত প্রস্তুত করা যায়, এই সত্য ব্যবসায়ীরা উপলব্ধি করিলেন। পরে ইস্পাত লৌহ অপেক্ষা লঘু অথচ দৃঢ়তর প্রতীত হওয়ায় পরে লৌহের পরিবর্ত্তে ইস্পাত ব্যবহৃত হইতে লাগিল। ইস্পাত-নির্ম্মিত প্রথম বাষ্পীয় পোতের নাম "মারবার্ট"। ইহা উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে পৃথিবী-প্রসিদ্ধ প্রচারক ও পর্য্যটক ডেভিড লিভিংষ্টোনের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছিল। তিনি এই জাহাজে আরোহণ করিয়া আফ্রিকার বিখ্যাতনামা নদী জাম্বেসীর বক্ষে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। অবশ্য নদীবক্ষে ব্যবহৃত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকারের এই সকল বাষ্পীয় জলযানকে ষ্টীমার বলিলেই ঠিক হয়। বিপুল বারিধি-বক্ষে ব্যবহৃত বিশেষ বৃহদাকার জলযানকেই সাধারণতঃ শিপ্ বা জাহাজ বলা হইয়া থাকে। জাহাজ নানা শ্রেণীর। আটলান্টিক বক্ষে ব্যবহৃত ইস্পাত-নির্ম্মিত বৃহদাকার বাষ্পীয় পোতের মধ্যে "সার্ভিয়া"কে প্রথম বলা চলে। এই ৭ হাজার টনের জাহাজ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে প্রস্তুত হয়। ইহার গতি ছিল ঘণ্টায় ১৭ নট। ইহা বৃটেন হইতে আমেরিকা পর্য্যন্ত প্রসারিত প্রসিদ্ধ কুনার্ড লাইনের জলযান ছিল। এই পোত প্রস্তুত হইবার দশ বৎসর পর হইতে প্রায় সকল নূতন পোতই ইস্পাতেই নির্ম্মিত হয়। সমুদ্রগামী জাহাজগুলি ক্রমশঃ আকারেও বৃহত্তর হইতে থাকে। বাষ্প ও ইস্পাত পোত-প্রস্তুত ব্যাপারের যে উন্নতি ও পরিণতি ক্রমশঃ সাধন করিল, তাহাকে বিচিত্র ও বিস্ময়কর বলা চলে। বর্ত্তমানের ৫০ হাজার বা ৬০ হাজার টনের জাহাজগুলিকে এক একটি ভাসমান সহর বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

বাষ্পীয় পোত প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে যাত্রীবাহী জাহাজের ন্যায় যুদ্ধজাহাজ সম্পর্কেও বহুল পরিবর্ত্তন সম্পাদিত হইল। বৃটিশ সামুদ্রিক সমরবিভাগ কর্ত্তৃক যে তিনখানি সামরিক বাষ্পীয় তরণী প্রথম প্রস্তুত হইল, তাহাদিগের নাম মক্সি, ম্যাক্টিভ ও লাইটনিং। ইহাদের প্রত্যেকটিই আকারে ক্ষুদ্র। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে সীয়ারনেস নামক স্থানে প্রস্তুত কিঞ্চিদধিক হাজার টনের জাহাজ "র‍্যাটলার"কে প্রথম ও প্রকৃত যুদ্ধ-জাহাজ বলা চলে। চক্রাকার দাঁড়ের পরিবর্ত্তে স্ক্রু সাহায্যে পরিচালিত যুদ্ধ-জাহাজের মধ্যেও ইহাই প্রথম। ইহার পর প্যাড্‌ল হুইল বা দাঁড়-চক্র চালিত এবং স্ক্রু চালিত জলযানের মধ্যে গতি-সম্পর্কীয় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কাহার গতি দ্রুততর তাহা পরীক্ষার জন্যই এই প্রতিযোগিতা করা হইয়াছিল। এই পরীক্ষায় স্ক্রু-চালিত জলযানই জয়লাভ করে। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে লৌহ নির্ম্মিত যুদ্ধ-জাহাজ সর্ব্বপ্রথম ইংলণ্ডেই প্রস্তুত হয়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ নৌ-বাহিনী-বিভাগ "ওয়ারিয়র" আখ্যায় অভিহিত যে লৌহ-মণ্ডিত ৬ হাজার টনের জাহাজ নির্ম্মাণ করে, তাহা ১ হাজার ২ শত ৫০ অশ্ব-শক্তি ধারণ করিত। "ওয়ারিয়র"কে শেষ ফ্রিগেট-জাতীয় জাহাজ বলা চলে। ইহা ফ্রিগেট হইলেও, আকারে নৌ-বীর নেলসনের সময়ের

বৃহত্তম রণ-পোত অপেক্ষাও তিন গুণ বৃহত্তর ছিল। আমেরিকায় ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে সঙ্ঘটিত তুমুল আভ্যন্তরীণ সঙ্ঘর্ষের সময়ে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, কাষ্ঠনির্ম্মিত যুদ্ধ-জাহাজ লৌহপ্রস্তুত রণপোতের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে আদৌ সমর্থ নহে। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় কাষ্ঠ-নির্ম্মিত জাহাজ, বিশেষ রণ-পোত প্রায় সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হইল এবং সমুদ্রের সন্নিকটবর্ত্তী শক্তিশালী-দেশসমূহের নৌ-বাহিনী-বিভাগ অতি দ্রুতগতি-সম্পন্ন ইস্পাত-নির্ম্মিত বহু বাষ্পীয়পোত-নির্ম্মাণে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। যেমন প্রতীচীতে বারিধি-বেষ্টিত বৃটেন, তেমনই দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে ধাবমান প্রাচীর দ্বৈপায়ন দেশ জাপান আত্মরক্ষার জন্য বিশাল রণপোতসমূহ রচনা করিতে সুরু করিল।

সাব্‌মেরিণের ব্যবহার বর্ত্তমান যুগের সামুদ্রিক সমরে এক অভিনব সমস্যা সংযোগ করিয়াছে। যে সকল যুদ্ধ-জাহাজ বহুক্ষণ ধরিয়া জলে ডুবিয়া থাকিতে পারে, তাহাই সাব্‌মেরিণ। যিনি বাষ্পীয় জলযানের স্রষ্টারূপে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, সেই রবার্ট ফাল্‌টন্ ১৮০১ খৃষ্টাব্দে প্রথম সাব্‌মেরিণ প্রস্তুত করেন। ফালটন্ আমেরিকাবাসী; কিন্তু তিনি ফ্রান্সে অবস্থানকালে ইহা নির্ম্মাণ করেন। বৃটিশদিগের সহিত যুদ্ধে তাহাদিগের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইবার জন্য এই জলতলবিহারী বিচিত্র পোত প্রস্তুত করা হয়। অদ্ভুতকর্ম্মা নেপোলিয়ন ফালটনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বটে, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, এই অভিনব সৃষ্টি তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত হয় নাই। এ বিষয়ে ফালটন্ তাঁহার সম্মতি ও সহায়তা লাভ করেন নাই। নেপোলিয়ন ইহার বিস্ময়কর কার্য্যকারিতা ও সম্ভাবনার বিষয় উপলব্ধি করিলে, পৃথিবীর নৌ-ইতিহাসের গতি পরিবর্ত্তিত হইত বলিয়া অনেকে মনে করেন। আধুনিক ধরণের সাব্‌মেরিণ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে জন্মলাভ করে বলা চলে। এই প্রথম আধুনিক সাব্‌মেরিণের নাম "জিম্‌নোট"। ইহার স্রষ্টা লেদে নামক একজন ফরাসী। এই অভিনব প্রণালীর সাব্‌মেরিণখানির দৈর্ঘ্য ৬০ ফীট এবং ইহা বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে পরিচালিত হইত। ইহাই প্রথম হাইড্রোপ্লেনযুক্ত সাব্‌মেরিণ। এই জাতীয় জলযান হাইড্রোপ্লেনের সাহায্যেই সহসা জলমগ্ন হইয়া থাকে।

হুড নামক বৃটিশ যুদ্ধ-জাহাজই বর্ত্তমান যুগের বৃহত্তম রণ-পোত। এই ৪১ হাজার ২ শত টনের জাহাজখানি ১৯২০ খৃষ্টাব্দে প্রস্তুত হয়। হুড এত বড় যে, ইহার ডেকের উপর ঘোড়-দৌড় চলিতে পারে। তবে বৃহদাকার জাহাজের যুগ শেষ হইয়া আসিতেছে। এখন ক্ষিপ্রতার দিকেই সকলের লক্ষ্য। ক্ষুদ্র হউক ক্ষতি নাই, কিন্তু ক্ষিপ্রগামী হওয়া চাই, তবেই যুগোপযোগী প্রতিযোগিতায় জয়লাভ সম্ভব হইবে। ইদানীং বৈমানিক যুদ্ধ বিমান-পোতের গুরুত্ব বাড়াইয়া সমর-সম্পর্কে এক প্রবল পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে। তবে যুদ্ধ ব্যাপারে যাহাই হউক, পর্য্যটন ও বাণিজ্যের দিক্ দিয়া বৃহত্তম জলযানের প্রয়োজনীয়তা ও কার্য্যকারিতা অবশ্যই দিন দিন বাড়িতেছে। পণ্যবাহী পোত ও যাত্রীবাহী জাহাজ যতই বৃহৎ হইবে এবং সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণে যতই সজ্জিত রহিবে, ততই প্রবল ও প্রতিকূল বাহ্য-প্রকৃতির [illegible] মানুষের বিজয়-লাভের বার্ত্তাই বিজ্ঞাপিত হইবে। [illegible] ক্রমোন্নতিতে আদিম জলযান যে আধুনিক রূপ ও শক্তি পাইয়াছে, তাহা সত্যই বিস্ময়কর।

সুখ দুঃখ

শ্রীদুর্গাদাস ঘোষাল

কত ভাঙ্গি কত গড়ি যথা কারিগর,
মনোমত বস্তু তার করয়ে গঠন;
সুখ দুঃখ কত তাই দিয়ে পর পর,
করিছ তেমতি তুমি আমারে আপন।

স্কটল্যাণ্ডে কয়েকদিন

শ্রীমতিলাল দাশ

৫

১১ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার। সকালে উঠিয়া মোটর বাসে উঠিবার পথে কর্পোরেশনের ইলেকট্রিক্ প্রদর্শনীগৃহ দেখিয়া লইলাম। মানুষের দুঃস্বপ্ন আজ সফল হইতে চলিয়াছে। অদৃশ্য বিদ্যুৎ আজ তার দাস; বিদ্যুৎ তাহার রান্না করিবে, ঘর পরিষ্কার করিবে এবং অন্যান্য বহু কাজ করিবে। নানাপ্রকার আস্‌বাব সাজানো রহিয়াছে—প্রদর্শক আমাকে সবগুলি দেখাইয়া বুঝাইয়া দিল, কাজকে লঘু, স্বল্পকালসাধ্য এবং আরামপ্রদ করিয়া তুলিবার জন্যই এই আয়োজন। আমি প্রশ্ন করিলাম—"এই সব আস্‌বাব সাধারণ গৃহস্থের জীবনে যে অবসর আনছে, সে অবসর সে কি করে' কাটায়?"

এই দার্শনিকের প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য প্রদর্শক তৈরী ছিল না, কিন্তু পরাজয় স্বীকার তাহার ধাতুতে লেখে নাই। সে প্রফুল্ল বদনে উত্তর দিল—"কেউ কেউ এই অবসর সময় সৎকাজে ব্যয় করে, কেউ কেউ অপব্যয় করে।"

ভাবিবার বিষয়। আমাদের পিতৃ[illegible] সরল সহজ অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন, সে জীবন [illegible] ফিরিবে না। চারিদিকে প্রগতির বন্যা—কিন্তু এই বন্যা-স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে মানুষ যদি তাহার চরিত্র-[illegible] ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে খুবই অন্যায় [illegible] বিজ্ঞানের যেমন অগ্রগতি হইতেছে, সেই সঙ্গে [illegible] হৃদয়ের অগ্রগতি হইতেছে না।

আলডুস হাক্সলি একজন চিন্তাশীল লেখক। তিনি তাঁহার 'লক্ষ্য ও পথ' নামক সুন্দর নিবন্ধ গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, মানুষ তাহার আদর্শের দিকে না গিয়া পতনের গহ্বরে দ্রুত নামিতেছে। সাম্প্রতিক জীবনে মানুষের চিত্তবৃত্তিতে

স্কটল্যাণ্ডে বিশেষ হাইল্যাণ্ডের বিখ্যাত গোধন

দয়া ও অনুকম্পা প্রতিরুদ্ধ হইতেছে—মানুষ সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইতেছে, মানুষ ঈশ্বরপ্রেম ত্যাগ করিয়া রাষ্ট্রকে, সম্প্রদায়কে, এমন কি রাষ্ট্রপতিকে দেবত্বে আরূঢ় করিতেছে।

আলডুস গীতা পড়িয়াছেন কিনা জানি না, কিন্তু বর্ত্তমানের জিঘাংসার কলকোলাহলের মধ্যে তিনি গীতার আদর্শকে গ্রহণ করিয়াছেন। সর্ব্বভূতের অদ্বেষ্টা, মিত্র এবং করুণ মানুষ যখন অনাসক্ত জীবন যাপন করে, তখনই সে আদর্শ মানুষে পরিণত হয়। এই নিষ্কাম কর্ম্মের আদর্শই তিনি বর্ত্তমান মানুষকে দিতেছেন। যন্ত্র যখন [illegible]লাচল যখন দ্রুত, তখন সর্ব্ব মানুষের কল্যাণের জন্য নূতন ধর্ম্ম ও নূতন নীতির প্রয়োজন। আজ আর্ত্ত পৃথিবী বিধাতার আবির্ভাবের জন্য কাঁদিতেছে। ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে, এখনই ত তিনি আসিবেন। হিংসা ও বিরোধের মাঝেই তিনি প্রেম ও মৈত্রীর অমৃত পরিবেশন করিবেন।

'বাস' আমাদের তিনটি স্থান দেখাইবে, Dryburgh, Melrose, Abbotsford. রাস্তার দৃশ্য চমৎকার—এডিনবরা হইতে সীমান্ত প্রদেশের দিকে যাত্রা করিলাম—

উচ্চাবচ সুন্দর রাস্তা—নির্জ্জন প্রান্তর, নির্জ্জন বনস্পতি, তরুলতা ও গুল্ম—পথচারী পথিক খুবই কম, নাই বলিলেই হয়, কেবল পথে টুইড নদীর সেতুর নিকটে মেষপালক ও তাহার মেষ পাল এবং প্রহরী সারমেয়ের সাক্ষাৎকার পাইলাম। এখানকার মেষ ও গোধন দেখিয়া মনটা খুসীতে ভরিয়া উঠিল। টুইড নদীর উপর বাস অনেকক্ষণ থামিল, আমরা নামিয়া এই পার্ব্বত্য নদীর স্বল্প জলের মাঝে খানিক হাঁটিয়া আনন্দলাভ করিলাম। ছোট নদী—খুব সম্ভব শাখা, এখানে ট্রাউট মাছ পাওয়া যায়—একজন যাত্রী আমাদিগকে ট্রাউট মাছ দেখাইল—সরপুঁটীর মত রূপালি

স্কটের স্মৃতিবিজড়িত মেলরোজ গীর্জ্জা

মাছ। এই সীমান্ত প্রদেশ ফোর্থ উপসাগরের শীতল বায়ুতে স্নিগ্ধ, শস্যশ্যামল এবং সমৃদ্ধ। ইহার গ্রাম ও নগর অতীত পুরাণের স্মৃতিরঞ্জিত—বীরত্ব ও মহত্ত্বের [illegible] যেমন আছে—দানবিকতা এবং পাশবিকতার কথাও তেমনই আছে—সর্ব্বোপরি সার ওয়াল্টার স্কটের পুণ্যস্মৃতি-সৌরভিত এই দেশ।

ড্রাইবরো গির্জ্জায় অতীতের ধ্বংসস্তূপ বর্ত্তমান—প্রাচীন কালে এই মাঠ বহু যাজক ও সন্ন্যাসীর লীলা-নিকেতন ছিল, ভগ্নাবশেষ হইতে অতীতের সেই সৌন্দর্য্য চোখে পড়ে। যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী?—হায় সমস্ত বৈভব ও সমারোহ মৃত্যুর লেলিহান্ গহ্বরের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। এইখানে স্কটের সমাধি আছে। তাহা ছাড়া আর্ল হেগের সরল অনাড়ম্বর কবরও এখানে দেখিলাম।

যাত্রীদের মধ্যে মেয়েরা অর্দ্ধেকের উপর—মেয়েরা বন্ধনহীন আবহাওয়ায় আপনাদিগকে প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইতেছে। কয়েকজন আমার সঙ্গে আলাপ করিল—তার মধ্যে একজন বুড়ী বার্মিংহাম হইতে আসিতেছে—একজন এডিনবরার। একটী তরুণী আমার একটী ছবি তুলিল। লাঞ্চ খাইতে ৩ শিলিং দিতে হইল, অথচ পেটও ভরিল না। এত খরচে মন খারাপ লাগিল।

লাঞ্চের শেষে আমরা মেলরোজ এবিতে গেলাম। স্কটের শেষ চারণ-গীতি নামক কাব্যের সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে। চারণ ছিল অতীতের কবি দলের শেষ ব্যক্তি—

The last of all the Bards was he
Who sung of Border Chivalry.

ব্রাক্সাম দুর্গের দুর্গাধিপতি নিহত—দুর্গাধিকারিণী তাহার প্রতিশোধ নিতে প্রস্তুত—কিন্তু দুর্গাধিপতির কন্যা মার্গারেট বিপক্ষের একজন সেনানীকে ভালবাসেন—একদিন রাত্রে দুর্গাধিকারিণী একজন বিশ্বস্ত নায়ককে মেলরোজ এবিতে পাঠাইয়া দিলেন। স্কটের বর্ণনা তুলিতেছি—

It thou wouldst view fair Melrose aright
Go visit it by the Pale moonlight
For the gay beams of lightsome day
Gild, but to flout, the ruins grey.

মেলরোজের ভগ্নাবশেষের ছবির সহিত এই বর্ণনা মিলাইয়া পড়িবার উপযুক্ত। অবশ্য স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে মেলরোজ দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই, কিন্তু অপরাহ্ণের ম্লান [illegible] স্কটের বর্ণনা বারংবার মনে জাগিতেছিল।

যখন বাগেরহাট কলেজে অধ্যাপক ছিলাম, তখন ছাত্রদিগকে 'The Lay of the last ministrel' পুস্তক-[illegible] পড়াইয়াছিলাম। তাই মেলরোজ ভ্রমণের সময়ে ইহার [illegible] স্মৃতি ও ঐতিহ্য আমার মনে ছিল। মেলরোজের [illegible] লোকে অনেকে স্কটল্যাণ্ডের মধ্যে সুন্দরতম বলেন। [illegible] দের অত্যাচারের পরেও যাহা আজিও আছে, তাহা সত্যই অপূর্ব্ব!

মেলরোজ হইতে তিন মাইল দূরে এবটস্ফোর্ড—স্কটের শেষ বাসভবন। টুইড নদীর তীরে সুন্দর শোভন বাড়ী—ইহা ধীরে ধীরে, অংশে অংশে নির্ম্মিত হইয়াছিল। স্কট

যে সব স্থাপত্যরীতি ও ভঙ্গীকে শ্রদ্ধা করিতেন, তাহাদের বিচিত্র অনুকরণ এই বাড়ীতে দেখিতে পাওয়া যায়। বাড়ী দেখিতে এক শিলিং লাগে—বাড়ীর সম্মুখে সুন্দর উদ্যান। তাঁহার পাঠকক্ষ স্কট যে ভাবে ব্যবহার করিতেন, সেই ভাবে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে—তাঁহার লাইব্রেরী ও ড্রয়িংরুম অনুরূপ যত্নে রক্ষিত—তাঁহার শস্ত্রশালায় নানা বিচিত্র আয়ুধ ও অস্ত্রের সমাবেশ দর্শককে মুগ্ধ করে। যখন এম-এ পড়ি, তখন স্কটের সমস্ত উপন্যাস পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম—স্কট রোমান্টিক যুগের লেখক, কিন্তু তাঁহার লেখায় ধোঁয়া নাই—সমস্তই ওজস্বী ভাষায় ও চারু স্বচ্ছতায় দীপ্ত ও সমুজ্জ্বল।

স্মৃতির মধ্যে এই সব প্রাচীনতা একটা সুকরুণ প্রভাব বিস্তার করিল। এখান হইতে আর কোথাও যাইবার প্রবৃত্তি হইল না। সোজা বাসায় ফিরিলাম।

১২ই সেপ্টেম্বর শনিবার। সকালে উঠিয়া মেলভিল ক্লার্কের নিকট গেলাম। কুঁড়েমি করিয়া ওভার-কোট নিলাম না। তার ফল ভুগিতে হইল, বৃষ্টিতে ভিজিতে হইল। ক্লার্ক ওদের ছাপা নথি কতকগুলি দিল। সেগুলি আমার ভগিনীপতি এডভোকেট রাজেনবাবুকে বুকপোষ্টে পাঠাইয়া দিলাম। তিনি অবশ্য ইহা নাড়াচাড়া করিবার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। ফিরিয়া আসিয়া এই সকলের সাহায্যে "স্কচ আইনের অলিতে গলিতে" নামক একটী প্রবন্ধ নবশক্তি নামক সাপ্তাহিকে লিখিয়াছি। আজ আবার Castle দেখিলাম—আমাদের চোখে ইহার চমৎকারিত্ব বেশী নয়, তবে [illegible] জাতির শতাব্দীর ইতিহাসের দুঃখ-সুখের গাথায় ধ্বনিত [illegible] তাহারা ইহাকে অতি গৌরবময় করিয়া তোলে। সেখান হইতে out-look tower দেখিতে গেলাম। [illegible] হইতে Lady stair's house দে[illegible]—এর রক্ষক একজন বুড়ী। বুড়ী আমা[illegible] আলাপ করিল। সে বলিতেছিল যে, একজন ভা[illegible] নারী শাড়ী পরিয়া আসিয়াছিল, তাহার মেয়ে বিদেশী গাউন পরিয়াছিল, কিন্তু বুড়ীর চোখে মাকে সুন্দর দেখাইতেছিল। স্বাভাবিক নিজস্ব পোষাকে আমাদের যে শালীনতা ও সৌষ্ঠব ফোটে, বিদেশী পোষাকে তাহা ফোটে না। এখানে দেখিবার মত বিশেষ কিছু নাই—দ্রষ্টব্য তালিকায় ইহাদের নাম আছে তাই এখানে আসিলাম, কিন্তু মনে রাখিবার মত কিছু নাই। সেকালের জীবনের ছবি আছে, কিন্তু আমাদের চোখে তাহার দাম নাই।

এখান হইতে ভিজিতে ভিজিতে Queen Street নামক রাস্তায় আসিলাম। সেখানে চিত্রশালা এবং কলাভবন দেখিলাম। শ্রান্ত হইয়াছিলাম। তাহা ছাড়া বাহিরে বৃষ্টি পড়িতেছিল। তাই কলাভবনের চাপরাশির সঙ্গে আলাপ জুড়িলাম।

সুপ্রাচীন স্মৃতির নিদর্শন ষ্টারলিং প্রাসাদ : স্কটল্যাণ্ড

বৃদ্ধ বলিলেন—"আমি Coal-cutter ছিলাম, খাদে কাজ করতাম—সেখানের সেই কর্মঠ জীবনের পরে অলস জীবন ভাল লাগে না—"

"তা' ঠিক, সেখানে কি সুখী ছিলে?"

"সুখ বলতে পারি না, তখন আশাতুর যুবক ছিলাম, দুঃখ যা ছিল তা অনুভব করতে পারিনি—তবে খনির মালিকের ব্যবহার সুবিধা ছিল না—"

ধনতন্ত্র ও শ্রমিকের চিরন্তন কলহ। ইহা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাসায় ফিরিয়া আর বাহির হইলাম না। রাশিয়া সম্বন্ধে কতকগুলি বই পড়িলাম। সিডনি ওয়েবের বইখানি চমৎকার লাগিল—দেশে আসিয়া বইখানি পুনরায় পড়িব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা আর হইয়া ওঠে নাই।

আনন্দের অভিব্যক্তি

শ্রীঅক্ষয়কুমার রায়

বিগত ৺বিজয়া উপলক্ষে বন্ধুবর নন্দলাল বসুর এক প্রীতি সম্ভাষণ-পত্র পাইলাম। সারা কার্ডখানি জুড়িয়া নৃত্যরত এক সাঁওতালের ছবির নীচে লেখা: ইহাদের এ আনন্দের জোর তারা কোথা হ'তে পেল যে, যুগ যুগ ধরে' চল্‌ছে? আমরা এত বঞ্চিত কেন—নন্দ?

চমৎকার সম্ভাষণ! কিন্তু এই প্রশ্নের মর্ম্ম ৺বিজয়ার অন্তর্নিহিত চিরন্তন জিজ্ঞাসা। সত্যই আমাকে ভাবাইয়া তুলিল। নন্দলালের ছবির প্রশংসা শুধু অবান্তর নয়, অপ্রয়োজনীয়। খেয়ালের বশে পাঁচ মিনিটে আঁকা-ছবির যে সজীব প্রাণ-চঞ্চল বলিষ্ঠ ভঙ্গী, তাহা তাঁহার দরদী জিজ্ঞাসু মনের সুগভীর অনুভবেরই প্রতিচ্ছবি। আজিকার বিশ্বের এই নির্ম্মম নৃশংস লীলার পটভূমিকায় তথাকথিত সভ্য ও অসভ্য মানুষের জীবন-সম্পর্কিত এই সমস্যা অধিকতর চিন্তনীয়।

এই যাবতীয় বিশ্বসৃষ্টি যদি আনন্দেই জাত, আর আনন্দেই সঞ্জীবিত হয়, তবে আমরা, সভ্য মানুষেরা, তাহা হইতে বঞ্চিত কেন? ইহা নিঃসন্দেহ যে, দিবারাত্র আমরা সুখের মরীচিকার পশ্চাতে ঘুরিয়া মরি, কিন্তু অতৃপ্তি ও তৃষ্ণা আমাদের অপসারিত হয় কৈ? তেমন আত্মভোলা প্রাণখোলা হাসি-আনন্দ আমাদের জীবনে অদৃষ্টপ্রায় বলা যায়। সভ্য জীবনের উৎকট বাসনা-কামনাময় দুরন্ত গতি যে স্নায়বিক উত্তেজনা সৃষ্টি করে, তাহা আপাত সুখের কারণ হয় বটে, কিন্তু প্রতিক্রিয়ায় দুঃখ আর অবসাদই আনিয়া থাকে। সাড়ম্বর উপচার-উপকরণ-প্রাচুর্য্যে জীবনের আনন্দোৎসব হইয়া পড়ে ভারাক্রান্ত,—কৃত্রিমতার আড়ালে দূরে সরিয়া যায় আসল জিনিষটি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সত্যই—

> "দেখবে বলে' করেছ পণ
> দেখবে কারে জান না মন।"

সভ্যতার এই অভিশাপবর্জ্জিত অসভ্য বর্ব্বর কোল, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতির অনাড়ম্বর জীবনে যে আনন্দোচ্ছল প্রাণপ্রাচুর্য্য, নৃত্য-গীত, চলাফিরা, হাসি-খেলার মধ্য দিয়া তাঁহাদের চিত্ত-মন সর্ব্বাঙ্গ উপচিয়া পড়ে, তাহা যে ফাঁকী নয়! নির্ঝরিণী-ঘেরা বনের ধারে, নক্ষত্রখচি[illegible] চন্দ্রালোকে, পুষ্প-পাতা-পালক-সজ্জায় মাদলের গুরু গু[illegible]

[illegible]নন্দের নৃত্যাভিব্যক্তি : শিল্পী—নন্দলাল বসু

বাঁশের বাঁশী বাজাইয়া আবালবৃদ্ধবনিতা সাঁওতালী নারী-পু[illegible] আপনভোলা নৃত্যের মাঝে যে অকপট আন[illegible]ব্যক্তি, তাহা যিনি দেখিয়াছেন, তিনি নন্দলালের এই [illegible]ত্র ও প্রশ্নের অভিপ্রায় মর্ম্ম দিয়া অনুধাবন করিতে পারিবেন।

মনে হয়, বর্ত্তমানের জ্ঞান-বিজ্ঞানগর্ব্বিত সমাজ-মানুষের আজ নূতন করিয়া জীবনকে বুঝিবার ও উপলব্ধি করিবার দিন আসিয়াছে।

সংবেদনা

শ্রীঅন্নপূর্ণা গোস্বামী

মিশ্ কালো বেড়ালটা···নীরিহ গোবেচারী

তা' হোক,- কিন্তু লতিকার কি যে বিশ্বাস যেন ওর জন্যই প্রতি সোয়া বৎসর অন্তর একটি অথবা এক জোড়া শিশু তার মাতৃত্বকে ফলবতী করে' তুলে। মা ষষ্ঠীর এই অপর্য্যাপ্ত করুণার প্রতি লতিকার ঘনায়মান বিতৃষ্ণা ক্রমে আতঙ্কে পরিণত হ'ল। একদা আদরের পুষীটা ইদানীং লতিকার দু' চক্ষের বালাই হয়ে উঠলো।

অথচ এমন একদিন ছিল যেদিন লতিকা ছিল এই সংসারে নববধূ। স্বামীর নূতন চাকুরী আর বাসা-বাড়ী। নিরালা পরিবেশের মধ্যে ছোট্ট রেল-ষ্টেশন-কলোনি। সমবয়সী দ্বিতীয় সঙ্গীর অভাব হেতু লতিকার অবগুণ্ঠিত জীবনের দুঃসহ রিক্ত নিঃসঙ্গতার লাঘব করেছিল এই পুষীরই আকস্মিক আগমন। সেদিন পুষীর সৌভাগ্যের সীমা ছিল না। একান্ত পাশটিতে নিয়ে লতিকা সোহাগভরে বিড়ালটীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিত, আদর করে ঘুম পাড়াতো। পুষীর যত্ন-পরিচর্য্যার এতটুকু এদিক্-সেদিক্ হবার যো ছিল না।

আর আজ···

সেদিন আর এ দিনের আকাশ-পাতাল তফাৎ। দু'টি উচ্ছিষ্ট অন্ন, এক ফোঁটা ছিট্‌কে-পড়া দুধ, পরিত্যক্ত কাঁটা পুষীর বরাতে জোটে না। একটা অসীম বিরক্তিতে লতিকা ওগুলোকে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেয় যেন বিড়ালটাকে বঞ্চিত করার জন্যই। লতিকার স্বামী [illegible] না, এই গৃহপরিবেশকে পুষীর সান্নিধ্য মুক্ত করতে [illegible]র এমনি অহৈতুক আর অশোভনীয় আতিষ্ঠতা।

লতিকার এই বিরক্তি অবশ্য বরাবর ছিল না। লতিকার তৃতীয় সন্তান হবার পর থেকে[illegible]। স্বামীর সামান্য মাইনে। আঁতুর-[illegible] সামনে নিজেই লতিকাকে হাঁপিয়ে উঠতে হ[illegible] আর দু'টি ছেলের দুধের যে স্বল্পমাত্র বরাদ্দ, তাও [illegible] কমাতে বাধ্য হ'ল। অর্দ্ধপুষ্ট হ'য়ে ছেলে দু'টিকে জীবনের পথ-বেয়ে চলতে দেখা ছাড়া আর লতিকার গত্যন্তর রইলো না। অবচেতন মনের তার এই ব্যথিত মাতৃত্বের সকল আক্রোশ বুঝিবা লতিকার অজ্ঞানায়ই গিয়া পড়িল হতভাগা পুষীর উপর। লতিকার কেমন যেন ধারণা জন্মিল যে, মা-ষষ্ঠীর এই বাহনটির শারীরিক উপস্থিতিই তার এই অবাঞ্ছিত সন্তান-বাহুল্যের এবং দারিদ্র্যের হেতু। সন্তান-বৃদ্ধির সঙ্গে আয়ের অসামঞ্জস্য লতিকার সংসারে কয়েক বৎসরের মধ্যেই উৎকট হয়ে দেখা দিল। পুষীকে নিয়ে তাই লতিকার অনর্থ-অঘটনও ক্রমশঃ বিসদৃশ হয়ে উঠ্‌তে লাগলো। পুষীকে নিমিত্তস্বরূপ সামনে পেয়ে লতিকার মনের ঝাল মিটানোর একটা উপলক্ষ মিললো।

একদিনের ঘটনা :

রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে লতিকা সারাটি বাড়ী পলায়মান পুষীর পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে এসে ঘরে ঢুকলো। বিড়ালটি প্রাণভয়ে জোড়া-তক্তপোষের নীচে আশ্রয় লইলে লতিকাও বেহুঁস হয়ে পুষীকে আচ্ছা করে' গোটাকতক ঘা লাগিয়ে যেমন উঠতে যাবে, অমনি উদ্যত লাঠীর অপর প্রান্ত গিয়ে পঠনরত স্বামীর চশমায় আঘাত করলো। শৈলেনের চশমার কাঁচ ভেঙ্গে চুরমার হ'ল; কিন্তু চোখ দুটো এতটুকুর জন্য সে-যাত্রা রক্ষা পেল।

শৈলেশ বিরক্তির সঙ্গেই অনুযোগ করলে, "এ কি রকম আচরণ তোমার বলতো লতা? মেয়েমানুষ তুমি, একটু দয়ামায়া কি দেহে নেই। হাজার হোক ওটাতো একটা অসহায় প্রাণী বটে।"

ক্রুদ্ধকণ্ঠে লতিকা প্রত্যুত্তর করলে, "প্রাণী যদি হয় আর প্রাণের মমতাই যদি থাকে তো এত লাঞ্ছিত হয়েও যায় না

[illegible]লেশ বল্‌লো—"যায় না, যেহেতু মায়ামমতার টান ও এত শীগ্‌গীর ভুলতে পারেনি। দানের মর্য্যাদা রক্ষা করতে এত সহজেই ওরা অকৃতজ্ঞ হ'য়ে উঠতে পারে না। তুমি একদিন ওকে ভালবেসে আজ বেমালুম ভুলে যেতে পারলে, কিন্তু ওর পক্ষেও আসবে হয়তো সেদিন—কিন্তু একটু দেরী হবে বৈকি।"

বাস্তবিকই তাই। এত প্রহার, তাড়না ও তিরস্কারেও লতিকার স্নেহ ভুল্‌তে পুষী পারেনি। এ গৃহের মায়া

পরিত্যাগ করতে বুঝি সে অন্তরে অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। ক্ষিদে পেলে ইদানীং যেখান থেকে হোক কিছু খেয়ে এসেও, এই সংসারকেই সে নিবিড়ভাবে আঁকড়ে ধরে' আছে। এত মার খেয়েও ও আবার একটু পরেই লতিকা যেখানে কাজকর্ম্ম করে, তার খানিকটে দূরে বেশ নিশ্চিন্তায় ব'সে তারই দিকে মিট্‌ মিট্‌ করে তাকায়, হাই তোলে এবং মাঝে মাঝে চোখ দুটি গভীরভাবে কুঞ্চিত করে' একাগ্র দৃষ্টি লতিকারই মুখের ওপর নিবদ্ধ রাখে। ওর আঁখির তারার যেন প্রশ্ন জাগে: ওগো আমি কি অপরাধ করেছি, আমায় বুঝিয়ে দাও না? এমন ক'রে আমায় তাড়িয়ে দিও না।

কিন্তু পুষী পশু হলেও তারও সহ্যের একটা সীমা আছে। সত্যিই এমন একদিন এল—সেদিন ও নিজেই এ বাড়ীর প্রতি মায়ামমতা সব বিসর্জন দিয়ে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘটনাটি এইরূপ:

শৈলেশের মেজো মেয়েটার অসুখে অনেক ঋণ জমেছে। লতিকাকে কিছু কিছু করে' সেই দেনা শোধ করতে হচ্ছে। আয় বাড়েনি কিন্তু বেড়েছে ব্যয়। তার উপর যুদ্ধের বাজার। লতিকাকে ব্যয় সংক্ষেপ করতে অনেক নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষও বন্ধ করতে হয়েছে। অল্প দামের শুধু কাঁকরভরা চাল খায় ওরা।

মেজো মেয়েটা দীর্ঘ দিন পরে অসুখ থেকে উঠে অন্ন-পথ্য করছে। বার্লির জল খেয়ে-খেয়ে ওর জীর্ণ তালু হয়েছিল লোভাতুর, পাতে মাছ না দেখে ওর সর্ব্বাঙ্গ রি-রি করে' জলে উঠলো এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাতশুদ্ধ থালা দিল ছুঁড়ে ফেলে। ক্রোধান্ধ লতিকা মেয়েটাকে বেদম মারতে সুরু করলে। লীলা উবু হয়ে থালার উপর [illegible] পড়ে। ঠোঁট কেটে রক্ত ঝরতে লাগলো। শৈলেশ উপস্থিত না থাকলে শোচনীয় একটা অনাসৃষ্টি কাণ্ড হয়তো ঘটতো।

বাপ মেয়েকে নিয়ে চলে গেল, মা সেইখানেই স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো। অনুশোচনার একটা তীব্র দহনে লতিকার বুকের ভিতরটা বুঝি পুড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ এক সময়ে তার চোখে পড়লো, অনতিদূরে উনুনের ঠিক পাশটীতে বিড়ালটী অকাতরে ঘুমুচ্ছে। শোবার ভঙ্গীটা ক্লান্তিতে শিথিল। ছড়ানো পুষীর পা-চারখানি। লতিকা বুঝলো সদ্যজাত শাবককে স্তন্যদান করছে পুষী।

প্রতিশোধের একটা পৈশাচিক মত্ততায় লতিকার রক্ত-কণা উল্লম্ফন করে উঠলো। অতি সন্তর্পণে লতিকা এগিয়ে গেল। দেখলো সদ্যপ্রসূত শাবক দুটি পরম নির্ভয়ে মায়ের বুকের কাছে ঘুমুচ্ছে। লতিকা ভাবলো, হয়তো বা মুখপুড়ি এখনই জেগে উঠবে। লতিকা কয়েকটা মুহূর্ত্তমাত্র ঘুমন্ত প্রাণী দুটীর পানে তাকালো, তারপর অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মায়ের কোল থেকে বাচ্চাগুলিকে অকস্মাৎ ছিনিয়ে নিয়েই সোজা জানালা গলিয়ে দিল ফেলে। বিড়াল ছানার নরম দেহের উত্তাপ বুঝি বা লতিকার মনকে আরও উদগ্র করে' তুলেছিল। প্রায় এক রকম ছুটতে ছুটতেই সে নিজের ঘরে ফিরে এল। নিঃশ্বাস তখন তার ঘন ঘন পড়ছে। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থেকে হঠাৎই সে উচ্চকণ্ঠে খিল্‌ খিল্‌ করে' হেসে উঠলো। বিছানায় শৈলেশ মেয়েটাকে কতকটা সান্ত্বনা দিয়ে গল্প করে' ভুলাচ্ছিল। লতিকা বিনাভূমিকায় আচমকাই বলে' উঠলো, "আপদটাকে বিদায় হবার পথ করে' দিয়ে এলুম, বুঝলে?"

"তার মানে" নির্লিপ্ত কণ্ঠে শৈলেশ জিজ্ঞাসা করলো।

ঘটনাটী আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করে' লতিকা তেমনি নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললো—"আমি জানি বাচ্চা হারালে বেড়ালগুলো পাগলের মত হ'য়ে যায়। খুঁজতে খুঁজতে হয়রাণ হয়, তবু তাদের খোঁজা শেষ হয় না। এবার নিশ্চয়ই মুখপুড়িকেও এ-আরামের ঘর ছাড়তে হবে।"

শৈলেশ এ কথার কোনও উত্তর দিল না। বাইরে কতগুলো কুকুর ভীষণ কলরব করছিলো। জানালার ভিতর দিয়ে শুধু সে মুখ বাড়িয়ে দেখলো, যেন কিসের একটা মাংসপিণ্ড নিয়ে কুকুরগুলো কলহ সুরু করেছে।

লতিকা [illegible] অনুমান ক'রেছিল। বিড়ালটী সারা বাড়ী তন্ন তন্ন ক'রে [illegible] যেন খুঁজতে লাগলো এবং মাঝে মাঝে লতিকার দিকে অত্যন্ত করুণ রবে ম্যাঁও ম্যাঁও করে' ডাকতে লাগলো। পুষীর করুণ কণ্ঠস্বরে প্রিয়হারার আর্ত্তনাদ। যেন সে ভিক্ষা চাইছে: ওগো আমার সন্তানকে ফিরিয়ে দাও।

দিন দুই পরে সত্যিই বেড়ালটা কোথায় উধাও হ'য়ে গেল। কত লাঞ্ছিত এবং নির্য্যাতিত হ'য়েও এতদিন সে এ গৃহের মমতা বিসর্জন দিতে পারেনি, আর আজকে অপত্যস্নেহ ওকে অনিচ্ছায়ই ঘর ছাড়া করলো।

লতিকা এবার সত্যকার একটী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌লো। ফেললেও প্রায়ই মধ্যে মধ্যে তার মনটা কেমন যেন অনাকারণেই খচ্ খচ্ করে। পুষীর নির্ম্মম স্মৃতি তার চিত্তকে বিহ্বল অবসন্ন করে' তুলে। সময়ে অসময়ে মাংসপিণ্ড বেড়ালছানা দু'টির প্রেতায়িত মূর্ত্তি তার অন্তরে অহেতুক ছায়াপাত করে' যায়। এমনি ভারাক্রান্ত মানসিকতার মধ্য দিয়ে লতিকার মাস পাঁচ-ছয় অতিবাহিত হ'ল।

একদিন বেড়ালটা অকস্মাৎ বিনা আমন্ত্রণেই ফিরে এল। অত্যন্ত শীর্ণ দেহ। প্রতি পদক্ষেপে দুর্বলতার একটা ক্লান্তি। পুষীকে দেখেই লতিকার বুকের ভেতরটা দ্রুত স্পন্দনে কেঁপে উঠলো। কে যেন রক্তে দিল দোলা। ভাবলে, কেন—কেন ঐ পাপ আবার ফিরে এল? ওরই অন্তর্ধানে বুঝিবা লতিকার ষষ্ঠী-জননীর দয়া বর্ষণের নির্দিষ্ট মরশুমটী পার হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে মনটা ব্যথায় উদাস হয়ে ওঠে। ভাবে, হয়তো বা মিশকালো এই ষষ্ঠীর বাহনটি গৃহে থাকলে অকালে তার বড় ছেলেটি মারা যেত না!

কেন বা এবার আর লতিকা পূর্বের মত নির্দয় আচরণে পুষীর প্রতি তেমন নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারলো না। একটু অনুশোচনা হয়তো বা তার মনের আড়্[illegible]রমান হয়ে উঠছিলো। তাই সে এক সময় শৈলেশকে ব[illegible]—"মুখপুড়িটা কী রকম রোগা হয়ে গেছে দেখেছ? ওর বোধ হয় বাচ্চা হবে,—শুধু শুয়ে শুয়ে বেড়াচ্ছে।"

একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে শৈ[illegible]লো "হয়তো বা হবে—তোমরা মা, [illegible] অভিজ্ঞতাও তোমাদেরই বেশী। তবে নির্ভরের [illegible]টা কিন্তু ও বেশ ভালই নির্ব্বাচন করেছ, কি বলো?"

লতিকা স্বামীর প্রশ্নের কিছু উত্তর দিল না। দীর্ঘদিন পরে বিড়ালটীর এই অচিন্তনীয় প্রত্যাবর্তনে সেও একটু বিস্মিত হয়েছিল বৈকি। সমস্ত পৃথিবীটাতে সে কি সন্তান-প্রসবের আর যোগ্য ঠাঁই খুঁজে পেলো না, যার জন্য আবার তাকে এই বাড়ীতেই ফিরে আসতে হ'ল। তবে কি সে তাকে সত্যই বিশ্বাস করে? এমনি রাজ্যের ভাবনা লতিকার মনে ভীড় করে' আসতে লাগলো।

সেইদিন রাত্রেই সেই রান্নাঘরের উনুনের পাশটীতেই আবার পোড়াকপালী সন্তান প্রসব করলো। কিন্তু এবার আর বিড়ালটী গভীর ঘুমে অচেতন নয়। বড় বড় চোখ দু'টি মেলে সর্বদাই তাকিয়ে রয়েছে। আঁখীর তারায় ওর একটা চকিত ও সন্ত্রস্ত ভাব। একটা পাশবিক হিংস্রতায় পুষী যেন ভীষণরকম ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। ও যেন পণ করেছে, বিশ্বাস ও আর কাউকে করবে না। কৌতূহল-বশতঃ লতিকার ছেলে মেয়েরা কাছে গেলে পুষী রীতিমত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, আঁচড়াতে না হয় কামড়াতে উদ্ধত মূর্ত্তিতে ছুটে আসে। বেগতিক দেখে শৈলেশ স্ত্রীকে বল্‌লো—"কি মুস্কিল বলত? ঘরে ঢুকাই তো দায়। পুষীটা পাগল হ'য়ে গেল না তো?"

"আমারও তাই যেন মনে হয়": লতিকা অন্যমনস্ক ভাবেই যেন বলে চললো: "বিশ্বাসই যদি না করতে পারবি, তবে আবার আসা কেন?"

শৈলেশ বল্‌লো, "ওর মনের অবচেতনে তোমার প্রীতির প্রতিক্রিয়া ছিল চাপা—সঙ্গোপনে মস্তিষ্কে তাই বিকাশের ফলে মাথাটা গেছে খারাপ হ'য়ে। নচেৎ ভাবতো তুমি কতদিন কত নিষ্ঠুর হয়েছ—সে তো কখনও একটুও রাগ করেনি। যাই হোক, এ অবস্থায় কুকুর-বেড়ালের বিষ বড় সাংঘাতিক। ছেলেমেয়েদের খুব সাবধানে রেখো, আমি ফিরে এসেই ওটাকে গুলি করবার ব্যবস্থা করবো।"

[illegible]ালটীর সম্বন্ধে মনের মধ্যে একটা উদ্বেগ নিয়েই [illegible]লেশ অফিসের কাজে অন্যত্র সফরে বের হ'ল। দিন তিনেক পর শৈলেশ ফিরলো। এবং ঠিক সে যা আশঙ্কা করেছিল, দেখলে তাই ঘটেছে। লতিকা প্রবল জ্বরে বিছানায় ছট্‌ফট্ করছে। বারো তেরো বৎসরের একটী প্রতিবেশীর ছেলে তার শুশ্রূষারত।

শৈলেশকে দেখে ছেলেটীর ধড়ে যেন প্রাণ এল: "কাকাবাবু কি বিপদ বলুন তো? সেদিন আপনি লাইনে যাবার কিছুক্ষণ পরেই লীলাকে ওই হতভাগা বেড়ালটা

এমন তাড়া ক'রে এল! কাকীমা যেমন তাকে সাম্‌লাতে গেছেন অমনি কাকীমার পায়ে কামড়। কি রক্ত! কাল সকাল থেকে জ্বর আর কি অবসাদ!"

লতিকার পায়ের ক্ষতস্থানে ন্যাকড়ার ফালি জড়ানো। শৈলেশ ক্ষণবিলম্ব না করেই ডাক্তারকে ডেকে আনলেন। সঙ্গে বন্দুক।

ঘরে ঢুকে রোগিণীকে পরীক্ষা করতে করতে ডাক্তার বাবু বল্‌লেন—"কি সর্বনাশী চিজই ঘরে পুষেছেন, বলুন তো? ঘা'টা যে বিষাক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোথায় সেটা বলুন, তারই আগে চিকিৎসা করি।"

শৈলেশও রোগীর শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। প্রতিহিংসার উত্তাপ তার মুখটাকে রাঙিয়ে তুলেছে।

লতিকা অতি কষ্টে পাশ ফির্‌লো। মিনতির কণ্ঠে স্বামীকে সম্বোধন করে বললে, "কোথায় যাচ্ছ? একটু কাছ্‌টাতে বস না। আমার বুকটা যে ফেটে যাচ্ছে! কিসের গ্লানি অনুশোচনায় সারা চিত্ত আমার আচ্ছন্ন আর অবসাদগ্রস্ত।" বলতে বলতে লতিকা শৈলেশের মণিবন্ধ আঁকড়ে ধর্‌লো।

"বসছি, আগে পুষীকে গুলি করে' তোমাকে কামড়ানোর প্রতিশোধ নিয়ে আসি": 'ঝট্‌কা টানে হাতটা ছাড়িয়া নিয়েই শৈলেশ গমনোদ্যত হ'ল।

ধড়মড় করে উঠে বসে'ই লতিকা চীৎকার করে' উঠলো: "ওগো, পুষীকে মেরো না—মেরো না। ওর কি অপরাধ বলো! সন্তানহারা মায়ের ব্যথা যদি বুঝতে তো এমন নিষ্ঠুর হ'তে পারতে না": লতিকার কণ্ঠস্বর কান্নায় সিক্ত।

বিস্মিত শৈলেশ যেন স্বগতই বলে' চললো, "এ দুষ্টাকে নিয়ে ঘর করায় বিপদ্ আছে। আপদকে চির বিদায় করাই শ্রেয়ঃ।"

"তা' হ'লে যে আমিই খুন হব।" লতিকা ডুক্‌রে কেঁদে উঠলো।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় শৈলেশ নির্ব্বাক্ এসে পুনরায় শয্যার উপর বসলো। লতিকার আকুল কণ্ঠের মিনতি রুদ্ধকক্ষে প্রতিধ্বনি তুলে মিলিয়ে গেল। কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক মাতৃত্বের মহিমা শৈলেশের সম্বিৎ ফিরিয়ে আনলো।

শ্রীশ্রীগুরু অষ্টকম্

শ্রীইন্দুবালা রায়

[প্রথম চরণের প্রথম পঙ্‌ক্তি প্রত্যেক চরণের প্রথমে ও শেষে আবৃত্তি করিতে হইবে]

১। স্ফুরতু হৃদে সদা শ্রীগুরু নবগৌরাঙ্গরূপ,
ভকতমোহন বর তনুখানি
মদন-শরণ চরণ দু'খানি
অনুপম আহা অতুলন জানি ভকতচিত মধুপ।
স্ফুরতু হৃদে সদা শ্রীগুরু নবগৌরাঙ্গরূপ॥

২। কোটী কাঞ্চন কষিত কান্তি।
কোটী চন্দ্রমা সুধা নিষ্যন্তি॥
কোটী নয়নে বিমল শান্তি ভেদিয়া আঁধার কূপ।

৩। বঙ্কল-চাঁচর চিকুর-বন্ধ
বদনকমল নয়নানন্দ
কোটী কোটী শারদচন্দ্র উজলিছে অপরূপ।

৪। বিস্ফারিত কমলনেত্র
কলিত-ললিত-সুচারু-গাত্র
পবিত্রচিত প্রেমপাত্র, রসরাজ, রসভূপ।

৫। সদা সদয়, মধুর মূর্ত্তি,
প্রচুরগুণগভীর কীর্ত্তি,
[illegible]সে পুলকে দীপ্তি বিনাশে তমের স্তূপ।

৬। [illegible]চরিত্র, প্রকৃতি মধুর
চিদ্বিলাসী অতীব ধীর,
অনাথবন্ধু করুণাসাগর মঙ্গলস্বরূপ।

৭। [illegible]চার সর্ব্বশ্রুতিসার
বিতরে [illegible] করুণা অপার,
হৃদিকন্দরে নব দিবাকর তত্ত্বমসি মূর্ত্তিরূপ।

৮। মম দুর্গতি ত্রাণকর্ত্তা,
এ মোর জীবন-মরণ-ভর্ত্তা
শুদ্ধ প্রেমময় আনন্দ-নিলয় মম অন্তর-ভূপ।

ব্রহ্মসূত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

(তৃতীয় পাদ)

শ্রীমতিলাল রায়

অতঃপর ব্যাসদেব বলিতেছেন—

প্রতিজ্ঞাঽহানিরব্যতিরেকাচ্ছব্দেভ্যঃ ॥৬॥

অব্যতিরেকাৎ (অব্যতিরেক যুক্তিতে অর্থাৎ সমস্ত বস্তুতে ব্রহ্মসত্তাতিরিক্ত সত্তার অভাব হেতু) শব্দেভ্যশ্চ (শ্রুত্যুক্ত কার্য্যকারণ-অভেদের যুক্তিতে) প্রতিজ্ঞায়া (এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-প্রতিজ্ঞা অথবা ব্রহ্মকে জানিলে সমস্ত জানা যায়, এই প্রতিজ্ঞা) অহানিঃ (আকাশের উৎপত্তিস্বীকারে ইহার অভাব হয় না)।

আকাশ অনুৎপন্ন বস্তু নহে, তাহার প্রমাণ হেতু ব্যাসদেব অব্যতিরেক যুক্তি, কার্য্যকারণ অভেদের যুক্তি ও এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মপ্রতিজ্ঞা যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। আকাশ উৎপদ্যমান বলিলে এই তিন যুক্তির অপলাপ হয় না। প্রথম অব্যতিরেক যুক্তি—ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই। অতএব এই হিসাবে, আকাশও ব্রহ্ম; কেননা, ব্রহ্মই আকাশ হইয়াছেন। এই অব্যতিরেক যুক্তির আরও দৃষ্টান্ত আছে। শ্রুতি অন্নকেও ব্রহ্ম বলিয়াছেন। গীতায় আছে অন্ন হইতে ভূতাদির জন্ম, পর্জ্জন্য হইতে অন্ন, যজ্ঞ হইতে পর্জ্জন্য জন্মে, যজ্ঞ কর্ম্ম-সমুদ্ভব, কর্ম্ম ব্রহ্ম-সমুদ্ভূত। আবার এই ব্রহ্ম অক্ষর হইতে উদ্ভূত হয়। ব্রহ্মই যখন যাবতীয় পদার্থের বীজস্বরূপ, তখন ব্রহ্মই সর্ব্বগত। ব্রহ্ম সর্ব্বগত বলায় অন্নাদি ব্রহ্ম নহে, অন্নাদি উৎপদ্যমান। এই অব্যতিরেক যুক্তিতে আকাশকেও ব্রহ্ম [illegible] কিন্তু আকাশও উৎপদ্যমান। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে আকাশের উৎপত্তির কথা নাই বটে; কিন্তু ইহা আছে যে, তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন। এই তেজের অধিকরণ বায়ু, বায়ুর অধিকরণ আকাশ। অতএব ছান্দোগ্যে[illegible] এইরূপ করা যায় যে, তিনি আকাশ ও বায়ু [illegible] করিয়া তেজঃ সৃষ্টি করিলেন। এইরূপ অর্থ করিলে, তৈত্তিরীয় উপনিষদের সহিত ছান্দোগ্যের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে "ব্রহ্ম আকাশ-শরীর", এইরূপ থাকার হেতু ব্রহ্মের ও আকাশের অভিন্নতা অব্যতিরেক যুক্তি দ্বারাই সূচিত হয়।

অব্যতিরেক যুক্তিতে সকল বিজ্ঞেয় ব্রহ্মাতিরিক্ত নয়, এইরূপ কার্য্যকারণেরও অব্যতিরেক দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—সৃষ্টির পূর্ব্বে সকল সৎস্বরূপ ছিল। তাহা এক ও অদ্বিতীয়। সেই সতের ঈক্ষণে তেজঃ-সৃষ্টি হইল। তারপর শ্রুতি বলিয়াছেন, এ সমস্তই তদাত্ম অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব। এক্ষণে এই আকাশ যদি ব্রহ্মকার্য্য না হয়, তাহা হইলে এক ব্রহ্মজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান অবগত হওয়ার প্রতিজ্ঞার হানি হয়। আকাশ অবগত হইলে, ব্রহ্ম অবগত হওয়া যায় না, কারণ আকাশ ব্রহ্মের কারণ নহে। ব্রহ্মই বেদ-প্রতিপাদ্য, এই হেতু ব্রহ্ম হইতেই আকাশ সমুৎপন্ন। আকাশ স্বয়ং অনুৎপন্ন পদার্থ নহে।

অতঃপর তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আকাশের উৎপত্তি প্রসঙ্গে প্রতিবাদী উহা গৌণার্থে গ্রহণের কথাও জ্ঞাপন করিয়াছেন। তদুত্তরে বলা হইতেছে—

যাবদ্বিকারন্তু বিভাগো লোকবৎ ॥৭॥

তু (তু-শব্দ পূর্ব্বপক্ষের মতবাদ দ্বারা যে সংশয়সৃষ্টি হয়, তাহার দূরীকরণার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে) লোকবৎ (ইহলোকের ন্যায়) যাবদ্বিকারম্ (যত কিছু উৎপন্ন পদার্থ) বিভাগঃ (তৎসমস্তই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থিত)।

অর্থাৎ যাহা কিছু জন্মবান্, তাহা পরস্পরবিভক্ত হইয়াই অবস্থান করে। যাহা অবিকৃত, অনুৎপন্ন, তাহাই ও সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকে। আকাশ কি পৃথিবী হইতে পৃথক্ নহে? অবশ্যই আকাশকে পৃথিবী [illegible] পৃথক্ স্বীকার করিতে হইবে। অতএব আকাশ উৎপদ্যমান। প্রতিবাদী বলিতে পারেন—আত্মাকেও তো একের সহিত অন্য পৃথক্ বলিয়া উহাও জন্মবান্ বলা যাইতে পারে? উত্তরে বলা যায়, আত্মা আকাশের ন্যায় কিছুর দ্বারা অনুভব্য নহে। আত্মা দিয়াই আত্মাকে জানার কথা শাস্ত্রাদিতে কথিত হইয়াছে। আত্মাই সকল বস্তুর আশ্রয়স্বরূপ। আত্মাকে কোনও বস্তু দিয়া প্রমাণ করা যায় কি? আকাশ কিন্তু প্রমাণের বিষয়। এই হেতু আকাশকে যে কারণে জন্মবান্ বলা যায়, আত্মাকে সেই

কারণে জন্মবান্ বলা সঙ্গত নহে। আত্মার নিত্য-বিদ্যমানতার কথা সর্ব্বজনবিদিত। ভূতপ্রপঞ্চ বিনষ্ট হইলেও, আত্মার অবিনশ্বরত্ব স্বীকার করিতে হয়। আকাশ ঠিক আত্মার মত বস্তু নহে।

আকাশকে নিত্য বস্তু বলার সর্ব্বপ্রধান যুক্তি এই যে, এক তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ছাড়া আর কোন শ্রুতিতে আকাশের উৎপত্তির কথা নাই। অন্যান্য শ্রুতিতে—আকাশকে অমৃত, নিত্য বলা হইয়াছে। শ্রুতি "ইদং খল্বিদং ব্রহ্ম", এইরূপও বলিয়াছেন। দেবতারা অমর, ইহাও শ্রুতির কথা। তাই বলিয়া ব্রহ্মের ন্যায় ভূতাত্মক পৃথিবী অথবা দেবতারা নিত্য হন না। এক শ্রুতি যাহা বলিয়াছে, অন্য শ্রুতি তাহা পরিহার করিয়াছে বলিয়া শ্রুতিতে আকাশসৃষ্টির বিষয় কথিত হয় নাই, এরূপ বলা সঙ্গত নহে। দেবদত্তের অনেক পুত্রগণের মধ্যে কোন একটী পুত্রের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া কেহ যদি বলে, এইটী দেবদত্তের পুত্র, তাহা হইলে অন্যান্য পুত্রগণ দেবদত্তের পুত্র নহে, অথবা ঐ একটী পুত্রই দেবদত্তের বুঝিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন 'জ্যায়ানাকাশাৎ' অর্থাৎ ব্রহ্ম আকাশ হইতে বড়। তবুও যে বলা হইয়াছে—ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী, তাহার কারণ মানুষের প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য বিপুল বিষয় দর্শন করাইয়া ব্রহ্মের অসীমতাপ্রদর্শনের জন্যই আকাশের দৃষ্টান্ত শ্রুতিতে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে আকাশ ও ব্রহ্ম একার্থবাচক হয় না। আকাশ নিরুৎপন্ন, ইহার প্রমাণের জন্য যে কারণত্রয়ের অভাব পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, তাহাও ঠিক নহে। সমবায়ী কারণ, অসমবায়ী কারণ ও নিমিত্তকারণ দ্রব্যোৎপত্তির মূলে থাকার যে যুক্তি, তদুত্তরে বলা যায় যে, কণাদে অভ্রান্ত নহে, ইহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। তবুও হইবে—সমান জাতীয় বস্তুই সকল সময়ে দ্রব্যোৎপত্তির কারণ হয় না—সূত্র ও সংযোগ, একটী সমবায়ী কারণ, অন্যটি অসমবায়ী কারণ, কিন্তু দ্রব্য ও গুণ সমানজাতীয় নহে, একথা কণাদমতেও স্বীকৃত হইয়াছে। নিমিত্ত কারণও সমজাতীয় নহে। তন্তুবায় যে বস্ত্রবয়নের জন্য যন্ত্রাদি ব্যবহার করে, তাহাও সমজাতীয় নহে। সমজাতীয় বহু কারণ দ্রব্য একত্র না হইয়াও দ্রব্যোৎপন্ন হয়। সূতা ও পশুর লোম রজ্জু নির্ম্মাণ করে। দ্রব্যের স্বাজাত্য আছে বলিয়া যে তর্ক, তাহার মূল কোথায়? এই স্বাজাত্য সর্ব্বত্রই আছে, যে হেতু সৃষ্টির উপাদান এক ও অদ্বিতীয়।

আকাশোৎপত্তির পূর্ব্বে ইহা কিরূপ ছিল? এ কথারও মূল্য নাই। যখন কিছুই ছিল না, তখন পৃথিব্যাদির যে অবস্থা, আকাশেরও তদবস্থা হইবে। তিনি "অনাকাশ", এই শ্রুতিই প্রমাণ করিতেছে যে, আকাশের পূর্ব্বে তিনি ছিলেন। আকাশের স্রষ্টা ব্রহ্ম, আকাশ ও ব্রহ্ম এক নহে; আকাশ উৎপন্ন বস্তু।

এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ ॥৮॥

এতেন (আকাশের উৎপত্তি সম্বন্ধে যুক্তির দ্বারা) মাতরিশ্বা (বায়ু) ব্যাখ্যাতঃ (প্রদর্শিত হইল)।

অর্থাৎ যেভাবে শ্রুতি-বিরোধের মীমাংসা করিয়া আকাশের উৎপত্তি প্রমাণ করা হইয়াছে, সেই ভাবে বায়ুর উৎপত্তি-বিষয়ে শ্রুতিবিরোধ ভঞ্জন করিয়া বায়ুও অনুৎপন্ন নহে, পরন্তু উৎপন্ন পদার্থ, পূর্ব্বোক্ত আকাশের জন্ম-নিরাকরণের ন্যায়ই তাহা প্রমাণ করা যাইবে। অতএব বায়ুও যে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, এই কথা ব্যাখ্যাত হইল।

অসম্ভবস্তু সতোঽনুপপত্তেঃ ॥৯॥

সতঃ (সৎস্বরূপ ব্রহ্মের) অসম্ভবঃ (উৎপত্তি সম্ভব হয় না) [কুতঃ? (কি হেতু?)] অনুপপত্তেঃ (যাহা কেবল মাত্র সৎ, তাহার উৎপত্তি যুক্তিসিদ্ধ নহে)।

বস্তুবিচারের জন্য এক পক্ষে সংশয়, অন্য পক্ষে সংশয়নিরসনের প্রচেষ্টা ব্রহ্মসূত্রের বিশেষ

আকাশসৃষ্টি সম্ভব নহে, এই সংশয় বিচারের দ্বারা নিরসিত হইল, সেইরূপ ব্রহ্মের উৎপত্তিবিষয় উল্লেখ করিয়া [illegible] বলিতে পারেন, শ্রুতিতে তো স্পষ্টই লিখিত আছে, [illegible]তঃ সজ্জায়েত' অর্থাৎ পূর্ব্বে সবই অসৎ ছিল, পরে সতের জন্ম হয়। আবার শ্রুতিতে ইহাও আছে 'সদেবসৌম্যেদমগ্র আসীৎ' অর্থাৎ 'হে সৌম্য, সর্ব্বাগ্রে সৎই ছিল'—অতএব এই শ্রুতিবিরুদ্ধ মতবাদের মীমাংসা কিরূপে হইবে? এই কথার প্রধান বক্তব্যটী অবধারণীয়। সৎশব্দের অর্থে অনুৎপত্তি বুঝিতে হইবে। সৎ হইতেই

উৎপত্তি হইতে পারে। যাহা অসৎ, তাহার সৃষ্টিসামর্থ্য কিরূপে হইবে? তবে শ্রুতি এমন কথা বলেন কেন? তদুত্তরে বলা যায়—প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টিবর্দ্ধন করেন। অব্যক্ত অরূপ সতের বর্দ্ধনপ্রচেষ্টার পর্য্যায়ে অসৎশব্দের ব্যবহার হইয়াছে। পরন্তু এই অসৎশব্দ ব্রহ্মবাচী। শ্রুতিতে এইরূপ আছে। দেবতাদিগের পূর্ব্ব যুগে সবই অসৎ ছিল, তারপর সৎ হইল। ব্রহ্মই অসৎ প্রাণস্বরূপ। প্রাণই মহান্। এই কথা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, আদি, অজ, শাশ্বত সৎই পর্য্যায়ক্রমে বিকার হইতে বিকারান্তরে নানা নামে ও রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। সতের জন্ম-কারণ নির্দ্ধারণ করার অপপ্রচেষ্টা অনবস্থাদোষের কারণ হইবে। ব্রহ্ম নিত্য সৎস্বরূপ। তাঁহার উৎপত্তি উপপন্ন হয় না। এই জন্য শ্রুতিও আপত্তি তুলিয়াছেন—"কথমসতঃ সজ্জায়েত", অসৎ হইতে সতের জন্ম কিরূপে হইবে? শ্রুতি উত্তর দিয়াছেন—"স কারণং কারণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ইতি"—তিনিই কারণ, কারণাধিপের অধিপতি; তাঁহার জনকও নাই, অধিপতিও নাই। সৃষ্টির মূল কারণ ব্রহ্মই। তাহার যে নামই দেওয়া হউক, বেদান্তবাদী তাহার নাম ব্রহ্মই দিবে। উৎপত্তির অন্বেষণ যেখানে শেষ হয়, তাহাই সৎস্বরূপ ব্রহ্ম।

তেজোঽত স্তথাহ্যাহ ॥১০॥

অতঃ (এই হেতু) তেজঃ (বায়ু হইতেই তেজের উৎপত্তি) হি (যে হেতু) তথাহ (বায়ু হইতে অগ্নির উৎপত্তির কথা শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে)।

ছান্দোগ্য বলিয়াছেন "তত্তেজোঽসৃজত" [illegible] তেজঃ সৃষ্টি করিলেন। আবার তৈত্তিরীয় [illegible] হইতে তেজের উৎপত্তি। এই উভয় বাক্যের সিদ্ধান্ত কি? ইহার একমাত্র সিদ্ধান্ত—প্রত্যক্ষ সৃষ্টিক্রম। শ্রুতিতে অত্র বাদও আছে। কিন্তু তাহাতে ক্রমবা[illegible] বাধিত হইতেছে না। শ্রুতি বলিয়াছেন "[illegible] আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইয়াছে।" আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি, কেননা তৎপরে তেজের সৃষ্টি বায়ুপ্রভব বলা হইয়াছে। আকাশ, বায়ু ও তেজঃ, এই সৃষ্টিক্রম অবশ্যই স্বীকার্য্য। ছান্দোগ্যে ব্রহ্ম হইতে তেজের সৃষ্টির কথা উল্লেখ আছে। ইহাতে ব্রহ্ম হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু ও বায়ু হইতে তেজঃ এই সৃষ্টিক্রমের আপত্তি হইতে পারে না, যে হেতু ব্রহ্মই আকাশ ও বায়ুর জন্ম-কারণ, সেই হেতু ব্রহ্মই তেজঃ-সৃষ্টির কারণ বলা অসঙ্গত নহে। তেজঃ বায়ু-মূলক। আকাশ ও অগ্নির মধ্যে বায়ুসৃষ্টির কথা সকল শ্রুতিতে আছে। এইরূপ—

আপঃ ॥১১॥

'তদপোঽসৃজত' অর্থাৎ জল তেজঃ হইতে জন্মিল। তেজঃ যেমন বায়ুপ্রভব, জলও তেমনি তেজোমূলক। 'অগ্নেরাপঃ', শ্রুতির এই বিস্পষ্ট বচন ক্রমসৃষ্টির সংশয় নিবারণ করে। সাধারণতঃ ইহার পরই পৃথিবীসৃষ্টির কথা আসিয়া পড়ে।

পৃথিব্যধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যঃ ॥১২॥

পৃথিবী (মৃত্তিকা) অধিকার (অধিকার হইতে অর্থাৎ প্রকরণক্রম) রূপ (রূপের নির্দ্দেশ হইতে) শব্দান্তরেভ্যঃ (নানা শ্রুতির দ্বারা নির্ণীত হয়)।

অর্থ হইতেছে—যেমন আত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে অগ্ন্যাদি, এইরূপ প্রকরণের দ্বারা পৃথিবীও সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রুতিতেও ইহার রূপনির্দ্দেশ আছে।

এই সূত্ররচনার কারণ "তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃস্যাম প্রজায়েমহীতি তা অন্নমসৃজন্ত"। ছান্দোগ্য বলিতেছেন—সেই জলেরা 'আমরা বহু হইব ও জন্মিব, এইরূপ আলোচনা করিল। অনন্তর তাহারা অন্নের সৃজন করিল। আবার তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলিতেছেন—"অদ্ভ্যঃ পৃথিবী", জল হইতে পৃথিবীসৃষ্টি হইল। এই শ্রুতি-বিরোধের মীমাংসা কি? "বিরোধে বাক্যয়োর্যত্র না প্রামাণ্যং তদিষ্যতে। যথা বিরুদ্ধতা ন স্যাৎ তথার্থঃ [illegible]তায়ারিতি।" অর্থাৎ কূর্ম্মপুরাণকার বলিতেছেন—[illegible] বাক্যবিরোধ হইবে, সেইখানে ঐ সকল বাক্য অপ্রামাণ্য বলিয়া ত্যাগ করিবে না। যেরূপ করিলে বাক্যবিরুদ্ধতা না হয়, সেইরূপ অর্থ কল্পনা করিয়া লইবে।

এইক্ষেত্রে এক শ্রুতি বলিতেছেন, 'জল হইতে অন্ন-সৃষ্টি হইল।' অন্য শ্রুতি বলিতেছেন 'জল হইতে পৃথিবী-সৃষ্টি হইল।' এক্ষণে অন্ন ও পৃথিবী এই দুই শব্দের বিচার প্রয়োজনীয়। পৃথিবী, শব্দের অর্থ সুস্পষ্ট, এবং ইহা প্রকরণক্রমেও পাওয়া যাইতেছে। অন্ন-শব্দের অর্থ

খাদ্যদ্রব্যবিশেষ। এক্ষণে ছান্দোগ্য এই অন্ন-শব্দ কি পৃথিবী অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন ?

অবশ্য শব্দশাস্ত্রে অন্ন-শব্দের অর্থ পৃথিবী পাওয়া যায় না। বেদ অপৌরুষেয়, অতএব শ্রুতি হইতেই অন্ন-শব্দ পৃথিবী অর্থে ব্যবহার করার কথা আছে কিনা জানিতে হইবে। শ্রুতিতে আছে 'আপশ্চপৃথিবীচান্নম্'—এই শ্রুতি-বচনে অন্ন ও পৃথিবী একার্থবাচী হইতেছে।

ব্যাসদেব বলিতেছেন—প্রকরণক্রমে জল হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি সুসমঞ্জস। শ্রুত্যাদিতে পৃথিবীর রূপের কথাও বলা হইয়াছে। "যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যেতি", যাহা কৃষ্ণরূপ, তাহা অন্নেরই। কিন্তু অন্ন কৃষ্ণমূর্ত্তি নহে, পরন্তু পৃথিবীকেই কৃষ্ণমূর্ত্তি বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে। সংশয়-পক্ষে বলা যায়, অন্নও তো কৃষ্ণমূর্ত্তি হইতে পারে ? হইতে পারে সত্য, কিন্তু তাহা অন্নের স্বাভাবিক রূপ নহে। তদুত্তরে তর্কচ্ছলে বলা যায়—পৃথিবীরও অন্যরূপ পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু পৃথিবীর কৃষ্ণরূপই অধিক এবং অন্নের কৃষ্ণবর্ণ অনধিক, ইহা প্রত্যক্ষ। পুরাণকারেরা স্পষ্টই বলিয়াছেন—"কৃষ্ণৈব পৃথিবীস্বতঃ", পৃথিবী স্বভাবতঃ কৃষ্ণবর্ণ। অতএব ছান্দোগ্যের অন্নপ্রকরণক্রমে এবং শ্রুতি ও পুরাণের রূপবর্ণনায় অন্ন-শব্দ পৃথিবী অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে।

তদভিধ্যানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎ সঃ ॥১৩

তু শব্দ শঙ্কানিবারণের জন্য উক্ত হইয়াছে। শঙ্কা—ঈশ্বর নিয়ন্তা, না ভূত নিয়ন্তা ? তদুত্তরে বলা হইতেছে 'সঃ এব' (সেই পরমেশ্বরই) তদভিধ্যানাৎ (ভূতাদিরূপে অবস্থান করিয়া অভিধ্যানপূর্ব্বক সৃজন করিয়া) [কুতঃ ? (কি হেতু)] তল্লিঙ্গাৎ (সকল কার্য্যে পরমেশ্বরবোধক চিহ্ন আছে)।

সংশয় হইতে পারে, শ্রুতি যখন বলিতেছেন—'আকাশাৎ বায়ু' 'তত্তেজৈক্ষত' প্রভৃতি অর্থাৎ আকাশ হইতে বায়ুসৃষ্টি হইল, তেজঃ আলোচনা করিল। তখন অচেতন ভূতগ্রামেরই নিয়ন্তৃত্বের কথা বলা হইতেছে, এই ধারণা অসঙ্গত নহে। কিন্তু শ্রুতির এই কথায় এইরূপ তর্কের স্থান নাই। শ্রুতি স্পষ্টই বলিতেছেন—'যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ যঃ পৃথিব্যা অন্তরো, যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরোযময়তীত্যেব" অর্থাৎ যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন অথচ পৃথিবী হইতে অন্তর; পৃথিবী যাহাকে জানে না অথচ পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি পৃথিবীর অন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে শাসন করেন। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা" অর্থাৎ তিনি ভিন্ন দ্রষ্টা আর কেহ নাই। এই কথার পর বীজ অঙ্কুরিত হইল, জলস্রোতঃ বহিল, কুসুম প্রস্ফুটিত হইল, জীব মরিল বা জন্মিল, এইরূপ বাক্য-প্রয়োগ ব্যবহারতঃ প্রচলিত থাকিলেও সর্ব্বক্ষেত্রে একব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় নিয়ন্তা নাই, তাহা বলাই বাহুল্য।

বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোঽত উপপদ্যতে চ ॥১৪॥

অত (অতঃপর উৎপত্তিক্রমে যাহার জন্ম) বিপর্য্যয়েণ (বিপরীতক্রমে লয়প্রাপ্ত হয়) উপপদ্যতে (ইহা যুক্তিসঙ্গত)।

অর্থাৎ সৃষ্টির জন্মক্রম যেরূপ, তদ্বিপরীত ক্রম ধরিয়া সৃষ্টিলয়ও হয়, ইহা যুক্তিযুক্ত।

সৃষ্টিক্রমের কথা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। এইবার সংহারক্রমের কথা আলোচিত হইতেছে। সৃষ্টির ন্যায় সংহারের নিয়মিত ক্রম আছে। শ্রুতি বলিতেছেন—'যতো বা ইমানি ভূতানি' প্রভৃতি। অর্থাৎ "যাহাতে সকল ভূত জন্মে, যাহাতে স্থিত হয় ও লয়প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান।" এখানে ক্রম-নিয়মের কথা নাই। এক ব্রহ্মে লয় হয়, এই কথাই রহিয়াছে। পুরাণ [illegible] কোন বিষয়ের সিদ্ধান্তে আসিতে হইলে বিচারের প্রয়োজন, এই জন্য পূর্ব্বপক্ষের প্রশ্ন—শ্রুতিতে যখন [illegible]-নিয়ম নাই—তখন কি প্রমাণে বিপরীতক্রমে লয়ের কথা [illegible] যায় ? তাহার উত্তরে বলা যায়, স্মৃতিতে বিপরীতক্রমে লয়ের কথা প্রকৃষ্টরূপে বর্ণিত আছে। যথা—

> জগৎপ্রতিষ্ঠা দেবর্ষে পৃথিব্যপ্সু প্রলীয়তে।
> জ্যোতিষ্যাপঃ প্রলীয়ন্তে জ্যোতির্ব্বায়ৌ প্রলীয়তে।

অর্থাৎ হে দেবর্ষে, পৃথিবী জলে, জল তেজে, তেজঃ বায়ুতে লয়প্রাপ্ত হয়। ইহা ব্যতীত সৃষ্ট সকল বিষয় স্ব-স্ব প্রত্যক্ষ কারণে লয় পাইতে দেখা যায়; যেমন ঘটের লয়

মৃত্তিকায় হয়। করকা জলেই লয় পায়। অতএব সৃষ্টির ন্যায় সংহারও একটী ক্রম ধরিয়া হয়, ক্রম-লঙ্ঘন করে না।

অন্তরা বিজ্ঞানমনসীক্রমেণ তল্লিঙ্গাদিতি-
চেন্নাবিশেষাৎ ॥১৫॥

তল্লিঙ্গাৎ (সৃষ্টিবাক্যে আছে, এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি) ইত্যাদি রূপ শ্রুত্যুক্তি হেতু) অন্তরা (আত্মা হইতে ভূতোৎপত্তি বিরুদ্ধ হইতেছে); ক্রমেণ বিজ্ঞানমনসী (বিজ্ঞান ও মনের ক্রমোৎপত্তির দ্বারা) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বলি) ন (না, তাহা বলিতে পার না) [কুতঃ (কেন?)] অবিশেষাৎ (বুদ্ধি, মন প্রভৃতি ভূতাদি হইতে বিশিষ্ট নহে, এই হেতু)।

অর্থাৎ অনুলোম-বিলোমক্রমে পঞ্চভূতের উৎপত্তি ও লয়ের কথা স্বীকৃত হইয়াছে। আবার শ্রুতিতে বিজ্ঞানাদির ক্রমোৎপত্তির কথাও রহিয়াছে, ইহাতে কি ভূতোৎপত্তির ক্রম ক্ষুণ্ণ হইতেছে না? উত্তরে বলা হইতেছে—না, কেননা ইন্দ্রিয়গণ ভূতাদি হইতে পৃথক্ নয়। শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন—'অন্নময়ং হি সৌম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাক্'—হে সৌম্য, অন্নময় মন, আপোময় প্রাণ, তেজোময়ী বাক্। অতএব ইন্দ্রিয়গণও ভূতবিশেষ ও ইন্দ্রিয় দুইই। ইন্দ্রিয়গণ ভূত হইতে বিশেষ নহে বলিয়া ইন্দ্রিয়োৎপত্তির ক্রম শ্রুতিতে থাকায় ভূতাদি সৃষ্টির ক্রম বাধিত হয় না।

চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু-তদ্ব্যপদেশোভাক্তস্তু-
দ্ভাবভাবিত্বাৎ ॥১৬॥

তু-শব্দ শঙ্কানিবারণের জন্য। কি শঙ্কা? ভূতগ্রামের ন্যায় জীবেরও কি জন্ম-মরণ আছে? তদুত্তরে বলা হইতেছে—চরাচরব্যাপাশ্রয়ঃ (জন্ম ও মরণ, স্থাবর ও জঙ্গম লক্ষ্য করিয়াই) তদ্ব্যপদেশঃ স্যাৎ (ঐরূপ উক্তি কথিত হইয়াছে, পরন্তু) ভাক্তঃ (গৌণত্ব হেতুই বলা হইয়াছে, এই জন্মমৃত্যু মুখ্যার্থে বলা হয় নাই) তদ্ভাবভাবিত্বাৎ (দেহের ভাবাভাব লক্ষ্য করিয়াই ঐ শব্দদ্বয় প্রযুক্ত হয়)।

জীবের জন্মও নাই, মরণও নাই। ভূতাদির ন্যায় জীবের জন্ম-মরণ থাকিলে, 'ন কশ্চিজ্জায়তে ম্রীয়তে' এইরূপ অসংখ্য শাস্ত্রোক্তি নষ্ট হইয়া যায়। ইহা ব্যতীত শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ বিধিনিষেধ দ্বারা উপদেশাদির কোনই অর্থ থাকে না। দেহপাতের সঙ্গে আত্মার যদি নিপাত হয়, ঐহিক ও পারত্রিক জগৎসম্বন্ধীয় ইষ্টানিষ্ট কর্ম্মাদির উপদেশ নিষ্প্রয়োজন। শ্রুতি তাই বলিয়াছেন "স বা অয়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরমভিসম্পদ্যমানঃ স উৎক্রামন্ ম্রিয়মাণঃ", এই পুরুষ শরীরপ্রাপ্তিতে জায়মান ও শরীরত্যাগে ম্রিয়মাণ হয়।

অতএব জন্ম ও মরণ দেহের, জীবের নহে। দেহের প্রাদুর্ভাব ও তিরোভাবেই জন্ম-মৃত্যুর প্রশ্ন। শরীরসম্বন্ধহীন জীবের জন্ম-মরণ নাই, এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। জীব নিত্য, অমর।

(ক্রমশঃ)

গান

শ্রীসুনীলকুমার দাশগুপ্ত

ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,
দাঁড়াও আঁখির আগে—
প্রেমের কাঙ্গাল আমায় হইয়া
তোমার দরশ মাগে।
আমার মনের তুলসীতলে
তোমার সুরের প্রদীপ জ্বলে;
আমার মনের আঁধার ঘরে
আলোর পরশ লাগে।

বুলবুলির ঐ কণ্ঠে বাজে
মধু মেঠো গান
নীল নয়নের কাণায় কাণায়
উছলে ওঠে বান;
তোমার দেওয়া বেদন যত
আমার প্রাণের মধু তত,
আমার বুকের গোপন নীড়ে
তোমার স্মৃতি জাগে।

সাময়িক সাহিত্য

প্রবাসী—মাঘ, ১৩৪৮ঃ

পুণ্য স্মৃতি—শ্রীসীতা দেবী। কবিগুরুর স্মৃতিকথা লেখিকা আলোচনা করিতেছেন। এই ধরণের ব্যক্তিগত খুঁটিনাটি হইতে কবিচরিত্রের আসল দিক্‌গুলি সম্বন্ধে পরিচিত হইবার সুযোগ ঘটে। অবশ্য অনেকে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর বহু কথাই লিখিতেছেন, যাহার সবগুলি গলাধঃকরণ করা সম্ভব নয়। কবিগৌরবে গৌরবান্বিত হইবার তাড়াহুড়ায় অনেক ক্ষেত্রে হয়তো সত্যমিথ্যার সীমান্তরেখা মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া যাইতেছে। যাচাই করিবার উপায় নাই, অথচ রবীন্দ্রজীবনীর উপকরণ হিসাবে এগুলি মারাত্মক রকমের বাধার সৃষ্টি করিতেছে।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি চিঠি—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত চিঠিগুলির তৃতীয় সংখ্যক চিঠি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমালোচনা করিতে বসিয়া আমরা যে জিনিষটি সর্ব্বদা ভুলিয়া গিয়া অনর্থের সৃষ্টি করি, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অনুকরণীয় ভাষায় কবি সেদিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়াছেন। "......সাহিত্যকে একান্তভাবে কোন বৈজ্ঞানিক তত্বের দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করাই তার প্রতি একমাত্র সঙ্গত ব্যবহার নয়। সাহিত্য প্রকাশধর্ম্মী—সেই প্রকাশের মূলে যে শক্তি কাজ করে, সে থাকে অগোচরে রন্ধনশালার উপকরণ ও রন্ধনতত্ত্বের মতো। ভোজনে যে স্বাদ পাই রসগ্রাহীর পক্ষে সেইটেই, ... সেই স্বাদের বিশ্লেষণ চলে না, কেবল আছে তার উপলব্ধি···।"

পরিচয়—ভাস্কর। পুনির মা'র সহিত টুনির মা'র পরিচয় হইল, টুনির সহিত পুনির আগেই হইয়া গিয়াছে, বাকী ছিল টুনির বাবার সহিত পুনির বাবার পরিচয়। শেষ পর্য্যন্ত তাহাও হইল, কিন্তু ইহার জন্য টুনীর বাবাকে কিঞ্চিত আক্কেল সেলামী দিতে হইয়াছিল। টাক ও কপালের নিরীহ সঙ্ঘর্ষে মিলনের নহবৎ বাজিলেও যে কিঞ্চিৎ শরীরপীড়ার কারণ ঘটিয়া থাকে, তাহার প্রমাণ লেখক দিয়াছেন।

"কপালে হাত দিয়া দেখি, একটা জায়গা ফুলিয়া আস্ত সুপারীর মত উঁচু হইয়া উঠিয়াছে।" আমরা টুনির বাবার প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

নীলাঙ্গুরীয়—লেখক শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। একটি নিরীহ উপন্যাসের মধ্যেও কত তথ্য ও সমস্যা থাকিতে পারে, তাহা দেখিবার সাধ থাকিলে উপন্যাসটি আপনারা অনুসরণ করিতে পারেন। আলোচ্য সংখ্যায় লেখক কতকগুলি সমস্যা ও প্রশ্ন তুলিয়াছেন, যাহার সমাধান পাইলে আশ্বস্ত হইতাম।

"মীরা আসিয়া বসিল, তরু রহিল মাঝখানে।" তরুকে মাঝখানে রাখিবার চক্ষুলজ্জা হইল কেন বুঝিলাম না। ৩৯৪ পৃষ্ঠায় এই চক্ষুলজ্জার অন্ত্যেষ্টি হইয়াছে দেখিলাম। অবশ্য বিভূতিবাবুর পক্ষে একটা যুক্তি আপনারা দিতে পারেন; কারণ তরু কখনও 'চাষা' দেখে নাই, এ ক্ষেত্রেও সে হয়তো অনেক কিছুই দেখিবে না। সোজা কথা, তরু যে এখনও চক্ষুষ্মতী হইয়া ওঠে নাই, লেখক কলমের এক আঁচড়ে তাহা বুঝাইয়াছেন।

"কী ... একটা রজনী যে আসিয়াছিল জীবনে" সত্য ... চমৎকার! শুধু চমৎকার নয়, এমন উতলা রজনীর মাদকতা প্রাচীনকেও যে নবীন করিয়া তোলে, তাহার পরিচয় 'প্রবাসী' ইদানীং যেরূপ ঘন ঘন দিতেছেন, তাহাতে শঙ্কিত ... উঠিতেছি। হয়তো আপনারা বলিবেন, ছাত্রীর যুবতী ভগ্নীকে লইয়া টিউটরের ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত সান্ধ্যভ্রমণ কিরূপ কথা? সংস্কৃতে একটি কথা আছে 'মনসা মথুরাং গচ্ছতি', কল্পনায় যদি মথুরায় যাওয়া যায়, তাহা হইলে উপন্যাস লিখিতে বসিয়া ডায়মণ্ডহারবার পাড়ি দেওয়া যাইবে না কেন? একটু রোমান্স বা রোমান্স, তাহাই বা মন্দ কি?

আমাদের জীবনে সুযোগ বহু আসে কিন্তু সদ্ব্যবহার কটা হয় জীবনে? ব্যর্থতা তো এইখানেই।

"এ সুযোগের সৃষ্টি করিয়াছিল মীরা, যতটা পারিলাম সদ্ব্যবহার করিলাম (টিউটার সত্যই বাহাদুর)। এর পরে বিধাতা একটু সুযোগ সৃষ্টি করিলেন।" সুযোগ ও সদ্ব্যবহারের অমূল্য তথ্যটি ধোঁয়া রহিয়া গেল, একটু খুলিয়া বলিলে ল্যাঠা চুকিয়া যাইত।

তরু ব্যগ্র কণ্ঠে বলিল, "চাষা কখনও দেখিনি দিদি; কেমন দেখতে?" দু'জনেই হাসিয়া উঠিলাম। মীরা বলিল, "মন্দ নয়, ওরা মোটর দেখেনি, তুমি চাষা দেখনি—অবস্থা প্রায় একই দাঁড়াল।……যাও।" লেখকের লিপি কৌশলে অনেক কিছুই গলাধঃকরণ করিতে হইবে দেখিতেছি!

"তরুর কৌতূহল মিটাইতে অনেকক্ষণ লাগিল"—ইহা যে লাগিবেই তাহা পূর্ব্বে জানা ছিল, আশ্চর্য্যের কিছুই নাই, সুযোগ ও সদ্ব্যবহারের আসল তথ্যই তো এখানে! ইহার পর চরম মুহূর্ত্ত (climax)।

(মীরার) আঙুল কয়টি হালকা মুঠির মধ্যে গুটাইয়া লইয়া ডাকিলাম, "মীরা…… "

"কি বলছেন?"—বলিয়া মীরা স্বপ্নালু দৃষ্টি আমার পানে ফিরাইল।

কি বলি—কি ভাবেই বা বলি?—মীরার হাতটা বুকের আরও কাছে টানিয়া কি একটা বলিব, এখন ঠিক মনে পড়িতেছে না, তরু ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "দিদি, ড্রাইভার বলছে মেঘ উঠেছে দক্ষিণ দিকে, [illegible]ই আর সে গোপন কথাটি বলা হইল না, এতখানি প্রাইভেট টিউটারের কপালে সহিবে কেন? বিধাতা বাদী হইলেন।

কোন মহিলার বৈধব্যের সংবাদ পাইলে সাধারণতঃ সেটা সুখবর বলিতে পারি না, কিন্তু 'নীলাঙ্গুরীয়'—এর লেখক সেই সুখবর আমাদের দিয়াছেন।

অনিলের চিঠি। লিখিয়াছে—একটা সুখবর আছে সৌদামিনী বিধবা হইয়াছে। সৌদামিনীর বিধবা হইবার সুখবরের ইতিহাস ভাল করিয়া জানিতে হইলে, আপনাকে ৩১৬ পৃষ্ঠার প্যারাটি দেখিতে হইবে। অতি প্রাঞ্জল ভাষায়, আপনাকে সন্দেহের অবকাশ না দিয়া লেখক বলিতেছেন,—"সৌদামিনী দুর্লভ স্ত্রীরত্ন, গলায় হার ক'রে পরবার জিনিষ, ওর মত মুক্ত প্রকৃতির স্ত্রীলোক কটা পাওয়া যায় সংসারে?"

বেশী পাওয়া যায় না বলিয়াই এই পোড়া সংসারটা এখনও কোনমতে টিকিয়া আছে।

শেষ অর্ঘ্য—শ্রীঅবনীনাথ রায়। রচনাটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। রচনার কয়েকটি পংক্তি আমরা উদ্ধৃত করিলাম—"আজ রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় আমাদের দেশের ললিতকলার সৌজন্যের, সহৃদতের এবং সংস্কৃতির একটা অধ্যায় নিশ্চিতরূপে শেষ হইয়া গেল। গত অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক, শুধু বাঙালী কেন, ভারতবাসীই বা বলি কেন, জগতের লোক মানব-চরিত্রের এই শোভন এবং সুন্দর দিকের জন্য রবীন্দ্রনাথেরই মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিত।"

হাসি ও অশ্রু—শ্রীরুচিবালা সেনগুপ্তা। গল্পটি অচল বলিয়া মনে হইল।

রবীন্দ্র কাব্যে প্রেমের অভিব্যক্তি—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র। রচয়িতার বলিবার ভঙ্গী আকর্ষণীয়, কিন্তু বক্তব্য স্থানে স্থানে অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে।

বিবিধ প্রসঙ্গে 'বঙ্গের নূতন মন্ত্রিসভা' সম্পর্কে কয়েক লাইনে যাহা বলা হইয়াছে তাহার রহস্য ঠিক বোধগম্য হইল না। এক স্থানে আছে, "নূতন মন্ত্রিসভায় যে-যে মন্ত্রীকে যে-যে দপ্তর দেওয়া হয়েছে, তারা তার যো[illegible]ন কিছু বলা আমাদের অভিপ্রেত নয়।" লেখক এই ধরণের নেগেটিভ উক্তির দ্বারা সাংবাদিক কূটনীতির পরিচয় দিয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের বিনীত অভিমত এই যে, ইহার পরিবর্ত্তে বাংলার মন্ত্রিসভা সম্বন্ধে নীরব থাকিলে বিশেষ কিছু আসিয়া যাইত না।

শান্তম্, শিবম্ অদ্বৈতম্

কার্ত্তিকের 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকায় 'রবীন্দ্রনাথের অন্তর্ম্মুখীন সাধনার ধারা' নামক প্রবন্ধে কবিগুরুর আত্মোপলব্ধির একটি বিশেষ স্তরের পরিচয় পাওয়া যায়। শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্-এর অনুভূতির মধ্য দিয়া কবির আধ্যাত্মিক রসলোকে যে পরম সত্যের আবির্ভাব হইত, কবিগুরু নিজের অতুলনীয় ভাষায় তাহার রূপ দিয়াছেন :

এই যে পৃথিবীর অতি পুরাতন দিন, একে প্রত্যহ প্রভাতে নূতন করে জন্মলাভ করতে হয়। প্রত্যহই একবার করে আদিতে ফিরে আসতে হয়, নইলে তার মূল সুরটা হারিয়ে যায়। প্রভাত তাকে তার চিরকালের ধুয়োটা বার বার করে ধরিয়ে দেয়, কিছুতেই ভুলতে দেয় না। দিন ক্রমাগতই যদি একটানা চলে যেত, কোথাও যদি তার চোখে নিমেষ না পড়ত, ঘোরতর কর্ম্মের ব্যস্ততা এবং শক্তির ঔদ্ধত্যের মাঝখানে একবার করে যদি অতলস্পর্শ অন্ধকারের মধ্যে সে নিজেকে ভুলে না যেত এবং তারপরে আবার সেই আদিম নবীনতার মধ্যে যদি তার নবজন্মলাভ না হোত, তাহলে ধুলার পর ধুলা, আবর্জ্জনার পর আবর্জ্জনা কেবলি জমে উঠতো—চেষ্টার ক্ষোভে, অহঙ্কারের তাপে, কর্ম্মের ভারে তার চিরন্তন সত্যটি আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। তাহলে কেবলি মধ্যাহ্নের প্রখরতা, প্রয়াসের প্রবলতা, কেবলি কাড়তে যাওয়া, কেবলি লক্ষ্যহীন যাত্রা—এরই উন্মাদনার তপ্ত বাষ্প জমতে জমতে পৃথিবীকে যেন একদিন বুদ্‌বুদের মতো বিদীর্ণ করে ফেলত।

এখনো দিনের বিচিত্র সঙ্গীত তার সমস্ত মূর্চ্ছনার সঙ্গে বেজে ওঠেনি। কিন্তু এই দিন যতই অগ্রসর হবে কর্ম্ম-সংঘাত [illegible] ড়ে উঠতে থাকবে, অনৈক্য এবং বিরোধের সুরগুলি ক্রমেই উগ্র হয়ে উঠতে চাইবে, দেখতে দেখতে পৃথিবী জুড়ে তীব্র ক্ষুধা-তৃষ্ণার ক্রন্দনস্বর প্রবল এবং প্রতিযোগিতার ক্ষুব্ধ গর্জ্জন উন্মত্ত হয়ে উঠবে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্নিগ্ধ প্রভাত প্রতি দিনই দেবদূতের মতো এসে ছিন্ন তারগুলিকে সেরেসুরে নিয়ে যে মূল সুরটিকে বাজিয়ে তোলে, সেটি যেমন সরল তেমনি উদার, যেমন শান্ত তেমনি গভীর, তার মধ্যে দাহ নেই, সংঘর্ষ নেই, তার মধ্যে খণ্ডতা নেই, সংশয় নেই—সে একটা বৃহৎ সমগ্রতার, সম্পূর্ণতার সুর—নিত্য রাগিণীর মূর্ত্তিটি অতি সৌম্যভাবে তার মধ্যে থেকে প্রকাশ পেয়ে ওঠে।

এমনি করে প্রতিদিন প্রভাতের মুখ থেকে ফিরে এই একটি কথা শুনতে পাই যে, কোলাহল যতই বিষম হোক না কেন, তবু সে চরম নয় ; আসল জিনিষটি হচ্ছে শান্তম্। সেইটিই ভিতরে আছে, সেইটিই আদিতে আছে, সেইটিই শেষে আছে। সেই জন্যই দিনের সমস্ত উন্মত্ততার পরও প্রভাতে আবার যখন সেই শান্তকে দেখি, তখন দেখি তাঁর মূর্ত্তিতে একটু আঘাতের চিহ্ন নেই, একটু ধূলির রেখা নেই। সে মূর্ত্তি চিরস্নিগ্ধ, চিরশুভ্র, চিরপ্রশান্ত। সমস্ত দিন সংসারের ক্ষেত্রে দুঃখ দৈন্য মৃত্যুর আলোড়ন চলেইছে, কিন্তু রোজ সকাল বেলায় একটি বাণী আমাদের এই কথাটিই বলে যায় যে, এই সমস্ত অকল্যাণই চরম নয়, চরম হচ্ছেন শিবম্। প্রভাতে তাঁর একটি নির্ম্মল মূর্ত্তিকে দেখতে পাই—চেয়ে দেখি সেখানে ক্ষতির বলিরেখা কোথায়? সমস্তই পূর্ণ হয়ে আছে। দেখি যে বুদ্‌বুদ যখন কেটে যায়, সমুদ্রের তখনো কণামাত্র ক্ষয় হয় না। আমাদের চোখের উপরে যতই ওলট পালট হয়ে যাক না, তবু দেখি যে সমস্তই ধ্রুব হয়ে আছে, কিছুই নড়েনি। আদিতে শিবম্, অন্তে শিবম্ এবং অন্তরে শিবম্।

সমুদ্রে ঢেউ যখন চঞ্চল হয়ে ওঠে তখন সেই ঢেউয়ের কাণ্ড দেখে সমুদ্রকে আর মনে থাকে না—তারাই অসংখ্য, তারাই প্রকাণ্ড, তারাই প্রচণ্ড, এই কথাই কেবল মনে হোতে থাকে। তেমনি সংসারে অনৈক্যকে বিরোধকেই সব চেয়ে প্রবল বলে মনে হয়—তাছাড়া আর যে কিছু আছে তা কল্পনাতেও আসে না। কিন্তু প্রভাতের মুখে একটি মিলনের [illegible] আছে যদি তা কান পেতে শুনি, তবে শুনতে পাব এই বি[illegible]ক্যই চরম নয়—চরম হচ্ছেন অদ্বৈতম্। আমরা চোখের সামনে দেখতে পাই হানাহানির সীমা নেই, কিন্তু তারপরে দেখি ছিন্নবিচ্ছিন্নতার চিহ্ন কোথায়? বিশ্বের মহাসেতু লেশমাত্রও টলেনি। গণনাহীন অনৈক্যকে একই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে বেঁধে চিরদিন বসে আছেন সেই অদ্বৈতম্, সেই একমাত্র এক। আদিতে অদ্বৈতম্, অন্তে অদ্বৈতম্, অন্তরে অদ্বৈতম্।

মানুষ যুগে যুগে প্রতিদিন প্রাতঃকালে দিনের আরম্ভে প্রভাতের প্রথম জাগ্রত আকাশ থেকে এই মন্ত্রটি অন্তরে বাহিরে শুনতে পেয়েছে শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্। একবার তার সমস্ত কর্ম্মকে থামিয়ে দিয়ে তার সমস্ত প্রবৃত্তিকে শান্ত করে নবীন আলোকে এই আকাশব্যাপী বাণীটি তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্—এমন হাজার হাজার বৎসর ধরে প্রতিদিনই একই বাণী তার কর্ম্মারম্ভের এই একই দীক্ষামন্ত্র।

আসল সত্য কথাটা হচ্ছে এই যে, যিনি প্রথম তিনি আজও প্রথম হয়েই আছেন। মুহূর্তে মুহূর্তেই তিনি সৃষ্টি করছেন, নিখিল জগত এইমাত্র সৃষ্টি হোলো একথা বললে, মিথ্যা বলা হয় না। জগত একদিন আরম্ভ হয়েছে তারপরে তার প্রকাণ্ড ভার বহন করে তাকে কেবলি একটা সোজা পথে টেনে আনা হচ্ছে একথা ঠিক নয়;—জগতকে কেউ বহন করছে না, জগতকে কেবল সৃষ্টি করা হচ্ছে—যিনি প্রথম, জগত তাঁর কাছ থেকে নিমিষে নিমিষেই আরম্ভ হচ্ছে—সেই প্রথমের সংস্রব কোন মতেই ঘুচছে না—এই জন্যেই গোড়াতেও প্রথম, এখনো প্রথম, গোড়াতেও নবীন, এখনো নবীন। বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ—বিশ্বের আরম্ভেও তিনি, অন্তেও তিনি, সেই প্রথম, সেই নবীন, সেই নির্বিকার।

এই সত্যটিকে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে—আমাদের মুহূর্তে মুহূর্তে নবীন হোতে হবে—আমাদের ফিরে ফিরে নিমিষে নিমিষে তার মধ্যে জন্মলাভ করতে হবে। কবিতা যেমন প্রত্যেক মাত্রায় মাত্রায় আপনার ছন্দটিতে গিয়ে পৌঁছয়—প্রত্যেক মাত্রায় মাত্রায় মূল ছন্দটিকে নূতন করে স্বীকার করে এবং সেই জন্যই সমগ্রের সঙ্গে তার প্রত্যেক অংশের যোগ সুন্দর হয়ে ওঠে, আমাদেরও তাই করা চাই। আমরা প্রবৃত্তির পথে, স্বাতন্ত্র্যের পথে একেবারে একটানা চলে যাব, তা হবে না, তা হবে না—আমাদের চিত্ত বারম্বার সেই মূলে ফিরে আসবে—সেই মূলে ফিরে এসে তাঁর মধ্যে সমস্ত চরাচরের সঙ্গে আপনার যে অখণ্ড যোগ সেইটিকে বারবার অনুভব ক'রে নেবে, তবেই সে মঙ্গল হবে, তবেই সে সুন্দর হবে।

এ যদি না হয়, আমরা যদি মনে করি সকলের সঙ্গে যে যোগে আমাদের মঙ্গল, আমাদের স্থিতি, আমাদের সামঞ্জস্য; যে যোগে আমাদের অস্তিত্বের মূলে তাকে ছাড়িয়ে নিজে অত্যন্ত উন্নত হয়ে ওঠবার আয়োজন করবো, নিজের স্বাতন্ত্র্যকেই একেবারে নিত্য এবং উৎকট করে তোলবার চেষ্টা করবো, তা কোন মতেই সফল এবং স্থায়ী হোতে পারবেই না। একটা মস্ত ভাঙ্গাচোরার মধ্যে তার অবসান হোতেই হবে।

জগতে যত কিছু বিপ্লব, সে এমনি করেই [illegible]নি প্রতাপ এক জায়গায় পুঞ্জিত হয়েছে, যখনি বর্ণের, কুলের, ধনের, [illegible] ভাগ-বিভাগ, ভেদ-বিভেদ পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানকে একেবারে দুর্লঙ্ঘ্য ক'রে তুলেছে তখনই সমাজে ঝড় উঠেছে। যিনি অদ্বৈতম্, যিনি নিখিল জগতের সমস্ত বৈচিত্র্যকে একের সীমা লঙ্ঘন করিতে দেন না, তাঁকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে একাকী জয়ী হোতে পারবে, এত বড়ো শক্তি কোন্ রাজার বা রাজ্যের আছে। কেননা সেই অদ্বৈতের সঙ্গে যোগই শক্তি—সেই যোগের উপলব্ধিকে শীর্ণ করলেই দুর্বলতা। এই জন্যই অহঙ্কারকে বলে বিনাশের মূল, এই জন্যই ঐক্যহীনতাকেই বলে শক্তিহীনতার কারণ।

দিব্য-সমাজ

বিগত কাশী প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের দর্শন-শাখার সভাপতি ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার দর্শন সম্বন্ধে যে সুচিন্তিত অভিভাষণ পাঠ করেন তাহার প্রকাশভঙ্গী, যেমন সহজ ও সুন্দর, গভীরতার দিক দিয়াও উহা তেমনি অনুধাবনযোগ্য। সমগ্র দর্শনের মর্মকথা তিনি অল্প পরিসরের মধ্যে বেশ গুছাইয়া বলিয়াছেন :

বস্তু (existence) প্রাথমিক সত্তা, তাহার স্ফূর্তি হয় জ্ঞানে। সত্তা ও জ্ঞানের মধ্যে সত্তারই অস্তিত্ব প্রাথমিক। তাহার প্রতিভাস হয় সংবেদনায়। সম্বেদনা তারই মানসিক প্রতিরূপ। জীবন রূপ নেয় প্রতিমুহূর্তে—পারিপার্শ্বিকতার অনুরূপ বাস্তব পরিবেষ্টনী ভিন্ন তার স্বরূপস্ফূর্তি হয় না, তার অস্তিত্ব থাকে না। জ্ঞান ও প্রচেষ্টার বাস্তব সম্বন্ধ ও সংযোগের অবশ্যম্ভাবিতা আছে। তাকে বাদ দিয়ে প্রবৃত্তিও নাই, প্রচেষ্টাও নাই।

এই বাদকে অবলম্বন করে বলা হয়, জীবনের অর্থ সক্রিয়শীলতা যা বাস্তবেষ্টনীকে অবলম্বন করে ক্রমে ঊর্ধ্ববিকাশের দিকে ধাবিত। সত্তার সত্তার ভিন্ন নিত্যবোধ নাই—বোধের স্ফুরণ হয় ঘাতপ্রতিঘাতে। এই বোধের একবার উৎপত্তি হলে সহসা আর তা বিনষ্ট হয় না, কারণ আবেষ্টনীর অধিকার নিরন্তর। এই অধিকারের স্বরূপানুযায়ী বোধের স্তর নির্ণীত হয়—ক্রমিকরূপে অভিব্যক্তির সমন্বয়সূত্রে বোধ ঊর্ধ্ব অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যারা জ্ঞানের এরূপ সত্তা—আশ্রিতত্ব স্বীকার করেন, তারা সত্তাকে ও শক্তিকে আশ্রয় করে সত্তা হতে প্রাণ, প্রাণ হতে মন, মন হতে সমষ্টি-চেতনার অভিব্যক্তি ধারণা করে থাকেন। মানুষের অন্তর্নিহিত দিব্যশক্তির বা দিব্যজগতের অভিব্যক্তি পূর্ণরূপে এখনও হয় নাই। ক্রম অভ্যুদয়ে কোন দিন হয়ত এমন একটা সমাজ সৃষ্ট হবে, যাতে সত্যই হবে মর্ত্যে অমৃতলোকের উদ্ভব। মানুষের মধ্যে এমন একটা অমৃতত্বের চিরন্তন স্পৃহা আছে, যা রূপ নিয়েছে এরূপ মতবাদেও। বিশ্বের সকল সংঘর্ষের বিশ্রান্তি হবে সেদিন, যেদিন নবীন এরূপভাবে স্ফূর্ত হবে যে, তাতে থাকবে না কোন দ্বন্দ্ব। [illegible]র ভিতর দিয়ে হবে সকল সংঘর্ষের লয়। অভ্যুদয়ে নবীন এদিকে [illegible] হচ্ছে। অভ্যুদয়ের গতি যত ঊর্ধ্বে আরোহণ করছে ততই বিশৃঙ্খলার স্থানে শৃঙ্খলা প্রতিফলিত হচ্ছে। বিশ্বচেতনার আবির্ভাবে ঈশ্বর-দৃষ্টি খুলে যাবে। এটা আকস্মিক কিছু নয়, অভ্যুদয়ের পূর্ণ পরিণতি। বিশ্বময় এক অখণ্ড মানব সমাজ গড়ে উঠবে যা প্রতিষ্ঠিত হবে সাম্যে, মৈত্রীতে, বিশ্বকল্যাণে ও বিশ্বদৃষ্টিতে। এরূপ মতবাদ একেবারে নূতন নয়, প্রাচীন অভিব্যক্তিবাদেরই নবীন ছায়া, পুনরাবৃত্তি।

Temple of Inspiration—By Sri Motilal Roy Authorised translation from the original Bengali by D. S. Mahalanobis. With a foreword by Arun Chandra Dutta. Prabartak Publishing House, 61, Bowbazar street, Calcutta. Price Rs. 2/- only.

আলোচ্য পুস্তকের ত্রিশটি অধ্যায়ে শ্রীমতিলাল রায়ের উদ্দীপনাময়ী বাণী একত্র গ্রথিত হইয়াছে। একটি সুদূর-প্রসারী জীবনচাঞ্চল্য ভারতীয় কৃষ্টি ও সাধনার অমৃতবাণীর আবরণে যেন উচ্ছ্বল হইয়া উঠিয়াছে—গ্রন্থের প্রতিছত্রে সেই জীবনাদর্শের গভীর উদাত্ত সাগর-কল্লোল আমরা শুনিতে পাই। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া প্রবর্ত্তকের পৃষ্ঠায় সঙ্ঘের অধ্যাত্মগুরু আধুনিক জীবনের অগভীর খাতে যে জীবনীশক্তি সঞ্চার করিতেছিলেন, তাহার শ্রেষ্ঠ পরিচয় আলোচ্য গ্রন্থখানিকে চিন্তাশীল পাঠকের নিকট পরম উপভোগ্য করিয়া তুলিবে। এই পুস্তকের পৃষ্ঠাগুলির মধ্যে হৃদয়াবেগ ও আদর্শনিষ্ঠার যে পরিচয় আমরা পাই, তাহা হইতে এই মনীষীর আধ্যাত্মিক চিন্তাপ্রণালীর পূর্ণাঙ্গ ঐশ্বর্য্য আহরণ করা হয়তো সম্ভব নয়, তথাপি আধুনিক জীবনের এই প্রারাঙ্ককার পটভূমিকায় তাঁহার বাণীর অন্তর্নিহিত শক্তি আমাদের রুদ্ধ হৃদয়ের নিঃসীম শূন্যতায় অপরূপ আলোকসঞ্চার করিবে। পুস্তকের অনুবাদকার একটি ঋজু ও বলিষ্ঠ ভাষার আধারে এই অমৃতোপম ভাবধারাকে আবদ্ধ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার যে কৃতিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। ইংরাজী অনুবাদের মধ্যে প্রাচীন অচলিত শব্দপ্রয়োগের কৌশল সমস্ত গ্রন্থখানিতে যে আব্‌হাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে উপাসনা-মন্দিরের আরত্রিক ও হোমানলের স্নিগ্ধ সৌরভ যেন ভাসিয়া আসিতেছে। সুদৃশ্য রেক্সিন চামড়ায় বাঁধাই ও মূল্যবান্ আর্ট কাগজে মুদ্রিত এই পুস্তকটি গঠন-পারিপাট্যের দিক্ দিয়াও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

Thailand—By Swami Sadananda. Published by Birendra Kumar Banerjee, 20, Cornwallis street, Calcutta. P. P. 128.

প্রাচ্য ভূখণ্ডে শ্যাম দেশের সংস্কৃতি ও প্রাচীনত্ব ঐতিহাসিকের ঔৎসুক দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। আধুনিককালে ইউরোপীয় সভ্যতা ও রাষ্ট্রনীতির আঘাত ও প্রতিঘাতে শ্যামের নিভৃত জীবন-যাত্রায় পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। ১৯৩৯ সালের ১লা জুলাই অকস্মাৎ এই রাষ্ট্রের পরিবর্ত্তিত নাম 'থাইল্যাণ্ড' জগতে ঘোষিত হয়। এই নামপরিবর্ত্তনের পশ্চাতে শ্যামের আধুনিক জীবনের দাবী স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, সেদিন অনেকেই ইহা লক্ষ্য করেন নাই। পুস্তকটির মধ্য দিয়া শ্যাম রাজ্যের ঐতিহাসিক ও সংস্কৃতিগত পটভূমিকাটি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্যাম-এর আধুনিক রাষ্ট্রীয় জীবনের চঞ্চলতার অনেক তথ্যই হয়তো ইহার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের নিকট পুস্তকটির যথেষ্ট মূল্য আছে। শ্যাম দেশীয় প্রাচীন মূর্ত্তিশিল্পের কয়েকটি চিত্র পুস্তকটির মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয় শিক্ষাপরিষদের পক্ষ হইতে পরিষদের সম্পাদক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক ৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। পৃঃ সংখ্যা ১৯৮, মূল্য এক টাকা।

বাংলাদেশের শিক্ষা-বিভাগ সাম্প্রদায়িক নীতির পীঠস্থানরূপে গত দশ বৎসরে কি করিয়াছে, না করিয়াছে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আছে পুস্তকটিতে। শিক্ষার মধ্য দিয়া এই সাম্প্রদায়িক বিষ যেভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তরে সঞ্চারিত হইতেছে তাহাতে দেশের হিতার্থী মাত্রেই শঙ্কিত হইবেন। লেখক সাম্প্রদায়িক প্রচার কার্য্যের ব্যাপক নমুনাগুলি তুলিয়া দিয়া জনসাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। পুস্তকটির অধিকাংশ প্রবন্ধ ইতিপূর্ব্বে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইলেও গ্রন্থাকারে ইহার প্রকাশ বিশেষ সময়োপযোগী হইয়াছে। প্রত্যেক শিক্ষাব্রতী ও চিন্তাশীল পাঠক ইহার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিবেন। মূল্যও বেশ সুলভ।

প্রভু[illegible]দ—ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ পরিমল বন্ধু দাস প্রণীত। প্রাপ্তি স্থান—শ্রীশ্রীজগবন্ধু—হরি লীলামৃত কার্য্যালয়, ২৯ নং রামকান্ত মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা। পৃঃ সংখ্যা ১৮৯, মাধুকরী ১৲ টাকা মাত্র।

মানবের কল্যাণ চিন্তা ও হিন্দু সমাজের গ্লানি দূরীকরণ প্রভৃতি কার্য্যে শ্রীশ্রীপ্রভু জগবন্ধু তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। যুগে যুগে মনুষ্যত্বের গ্লানি হইতে সমাজ ও সংসারকে মুক্ত করিতে যাঁহারা এদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন শ্রীশ্রীজগবন্ধু ছিলেন সেই সাধকদলের অগ্রগণ্য। পুস্তকটি তাহারই পুণ্য কথার মনোহর লিপি-চিত্র। ধর্ম্মানুরাগী পাঠকগণ পুস্তকটি পড়িয়া শান্তি ও তৃপ্তিলাভ করিবেন।

জাতিগঠনের ক্ষেত্রে মহাত্মা

দেশ-বরেণ্য মহাত্মা গান্ধীজি কংগ্রেস হইতে সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম-পরিচালনার ভারমুক্ত হইয়া অতঃপর তাঁর স্বক্ষেত্র জাতি-সংগঠনের ক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি তাঁহার "হরিজন" পত্রও পুনঃপ্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রচার-পত্রে আবার তাঁর অমৃত-নিঃসন্দিনী সংগঠন-বাণী সপ্তাহে সপ্তাহে বাহির হইতেছে। আমরা চিরশ্রদ্ধাভাজন জাতিগুরুকে তাঁহার এই যোগ্য সাধনক্ষেত্রে স্বমহিমায় পুনরাসীন দেখিয়া সত্যই পুলকিত ও তাঁহাকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইতেছি। তাঁহার এই গঠন-মন্ত্র জাতিকে এবার সত্য সত্যই অন্তরে বাহিরে প্রস্তুত করিয়া তুলুক।

পল্লী-প্রত্যাবর্ত্তনের আহ্বান

মহাত্মাজী তাঁর নব পর্য্যায়ের প্রথম সংখ্যা "হরিজনে" পল্লী-সংগঠনের যে সঙ্কেত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেশকর্ম্মী মাত্রেরই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিতেছেন—আজ নাগরিক যুগ শেষ হইয়া আসিতেছে। আজ পল্লী-প্রত্যাবর্ত্তের বাণী এমনভাবে আর কখনও সত্য হইয়া দেখা দেয় নাই। তাঁহার কথা—

"The best, quickest and most efficient way is to build up from the bottom. The psychological moment has come. 'Back to the villages' has become a necessity from every point of view. [illegible] the time to decentralise production and distr[illegible]ry village has to become a self-sufficient republic. Th[illegible] does not require brave resolutions. It requires brave, corporate and intelligent work. As far as I know, there is common ground between the rulers and the people."

ইহার মর্ম্ম—জাতিকে গড়িয়া তোলার কাজ নীচে থেকে আরম্ভ করাই সর্ব্বোত্তম, সব চেয়ে ক্ষিপ্রতম ও প্রকৃষ্ট ফলপ্রদ উপায়। শুভযোগ আজ উপস্থিত। আজ সব দিক্ দিয়াই প্রয়োজনীয়—'গ্রামে ফির।' উৎপাদন ও বণ্টনের কাজ আজ বহু কেন্দ্রে ছড়াইয়া দেওয়ারই সময় আসিয়াছে। প্রত্যেক গ্রামকে হইতে হইবে এক একটি স্বয়ংপূর্ণ গণ-রাষ্ট্র। ইহার জন্য দুঃসাহসিক প্রস্তাব-গ্রহণের দরকার নাই। দরকার সাহসপূর্ণ, সংহতিবদ্ধ ও সুচিন্তিত কাজ। আমি যতদূর জানি, বর্ত্তমানে শাসকগণ ও জাতির মধ্যে এইখানেই মিলন-ভূমি রহিয়াছে।

মহাত্মা পল্লীগঠনের মন্ত্র ঠিক সময়েই উচ্চারণ করিয়াছেন। তিনি নানা দৃষ্টি-ভঙ্গী দিয়া কথাটী বিচার করিয়া বলিয়াছেন ও আরও বলিবেন। পল্লী-সংগঠনের একটী রাজনৈতিক দিক্ আছে। কংগ্রেসের সম্মুখে যখন তিনি গঠন-নীতির গুরুত্ব স্থাপন করেন, তখন তাহার রাজনৈতিক মূল্যই তাঁহার কণ্ঠে ফুটিয়া উঠে। অহিংস অসহযোগ-সাধনার মূলশক্তি উদ্বোধন করিতে হইলে গঠন-কার্য্যেরই প্রয়োজন। তাঁহারই অতুলনীয় ভাষায়—

"The power of non-co-operation comes only through solid, incessant constructive work. Non-violent strength comes from construction, not destruction, Hence to-day the constructive programme is the only thing before the Congress. And in this all parties are one."

এই গঠনের কাজ ধীর, অবিশ্রামভাবে করিতে পারিলে, কংগ্রেস-কর্ম্মিগণ রাজনৈতিক সংগ্রামের শক্তিলাভ করিবেন, শুধু তাই নয়, কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলিরও সমাধান হইতে পারে। কারণ, মহাত্মাজী মনে করেন, সকল শ্রেণীর রাষ্ট্রসাধকই অন্ততঃ ভিত্তিস্বরূপ কয়েকটী গঠনমূলক কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিবেন। তাঁহার এই বিশ্বাস কত দূর সত্য, তাহা বর্ত্তমান কংগ্রেসের বিভিন্ন রাজ-[illegible]লের মতামতের সহিত যিনি সম্পূর্ণ পরিচিত [illegible] বলিতে পারেন। এই সমভূমি যদি কংগ্রেসের মধ্যে থাকে, তাহা হইলে তাহার উপর দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া কংগ্রেস অনায়াসে সংগঠনের মধ্য দিয়া আত্মরক্ষার ও জাতীয় কল্যাণের অমোঘ বীর্য্য লাভ করিবে।

তাঁহার কয়েকটী সঙ্কেত—

এই সংখ্যা "হরিজনে"র স্তম্ভেই বর্ত্তমান সঙ্কটকালে গঠন-মূলক কার্য্যনীতির উপযোগিতা বিশ্লেষণ করিয়া

দেখাইয়াছেন। তাঁহার এই প্রসঙ্গে কথাগুলিও সবিস্তার উদ্ধরণযোগ্য। তিনি বলিতেছেন—

"Ceaseless occupation in constructive programme is the best preparation to face danger. For it means concentration in villages of the city people and their being occupied and occupying the villagers in productive and educative work. This removes unemployment and with it fear. Such movement on a large scale at once inaugurates a new social order. It will constitute the greatest contribution to internal peace and should render nugatory formidable panicky ordinances just issued."

ইহা গঠন-সাধনার সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনীয়তার কথা। দেশে আজ নাগরিক-জীবনের ছন্দঃ ভাঙ্গিয়া যে যুদ্ধাতঙ্ক-সম্ভূত পরিস্থিতি দেখা দিয়াছে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই মহাত্মাজী বর্ত্তমান সামাজিক ও বিশেষভাবে অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ের প্রতিকার চিন্তা করিয়াছেন এবং গঠনকার্য্যে মনের অভিনব প্রস্তুতির সঙ্গে যে জনসাধারণের বেকার-সমস্যারও সমাধান হইতে পারে, তাহার প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার চিন্তা যে জাতির এই সুগভীর দুর্ব্বলতার দিকে পুনরায় রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ হইয়া আকৃষ্ট হইয়াছে, ইহা অবশ্যই সুখের কথা। তাই দ্বিতীয় সংখ্যাব "হরিজন" পত্রে "খাঁটি যুদ্ধ-চেষ্টা" শীর্ষে লিখিলেও, তিনি ক্ষুধিতের অন্ন ও বস্ত্রহীনের বস্ত্র-সংস্থানের সমস্যাই আজ সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন ও তাহারই সমাধান-চেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন।

এই সূত্রে তিনি খাদ্য বিষয়ে ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে সংযম ও সঞ্চয় ও সেই সঙ্গে নূতন নূতন সহজ-সাধ্য ফল-মূলাদির চাষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং সূতা নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এদেশের সঙ্গতিসম্পন্নগণ সময়ে বেশী খান বা খাদ্যের অপচয় করেন, ইহা লক্ষ্য করিয়া তিনি উপদেশ দিয়াছেন—ডাল জাতীয় একটী মাত্র খাদ্য গ্রহণ করিতে। যাহারা দুধ, পনীর, ডিম বা মাংস খায়, তাহা হইলে তাহাদের ডাল না খাইলেও চলিতে পারে। দরিদ্র যাহারা আমিষ জাতীয় কম খাইতে পায়, তাহাদের জন্য সেই ডাল ছাড়া পাইবে। এইরূপ অন্যান্য খাদ্য-সংস্কারেরও নির্দ্দেশ তিনি দিয়াছেন। এগুলি গৃহস্থ সাধারণ বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন, দেখিলে উপকৃত হইবেন।

বস্ত্রসমস্যার ব্যাপার তিনি অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য মনে করেন। এদেশে তুলার উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণেই হয় ও বর্ত্তমানে রপ্তানীর ব্যবস্থা অপ্রচুর হওয়ায়, মজুত তুলার উপযোগই বড় প্রশ্ন হইয়া উঠিয়াছে। দেশীয় মিলগুলি এই তুলার সবখানি নিঃশেষ করিতে পারিবে না। একমাত্র জাতি যদি সূতা-কাটা ব্যাপকভাবে বরণ করে, এই সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু ইহা গ্রহণ করিতে হইবে—লাভের জন্য নয়, পরন্তু বিশেষভাবে বস্ত্রহীনের লজ্জানিবারণের জন্যই। দরিদ্র বেকার মজুরী লইয়া সূত্র কর্ত্তন করুক; তাহাদের সংখ্যা পরিমিত। তাহাদের মধ্যেও যে সংগঠনের কাজ, তাহা বহু অর্থসাপেক্ষ। পক্ষান্তরে জাতীয়ভাবে সূতা-কাটা ব্রত গ্রহণ করিতে হইলে, এই সংগঠনের ব্যাপার খুবই সরল হইয়া যাইবে—শুধু লাভাকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জিত দেশসেবার আগ্রহই এক্ষেত্রে যথেষ্ট। সারা ভারতে বর্ত্তমানে যত সংখ্যক তাঁত চলিতেছে, তাহাদের সকলেরই সূতা যোগান দেওয়া এইরূপেই সম্ভবপর হইতে পারে। মহাত্মা বলিয়াছেন—এই লক্ষ লক্ষ দেশীয় তাঁতগুলি আজ সূতার অভাবেই বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। বস্ত্রসমস্যার সমাধান করে মহাত্মাজীর এই নির্দ্দেশ আমরা মূল্যহীন মনে করি না। তিনি চরকার চেয়ে ধানুষ তকলি বা সাধারণ তকলীই এইজন্য ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন। শুধু প্রত্যেক কংগ্রেসকর্ম্মী কেন, দেশসেবক মাত্রেই এই কর্ম্মে সহায়তা করি[illegible]

ভারতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার প্রভাব এই ক্ষেত্রে নাই। মহাত্মাজী জিন্না সাহেবের চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়াছেন—নিছক মানবসেবা-রূপেও এই অরাজনৈতিক, খাঁটি জাতীয় কর্ম্মে মুসলমানগণ কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করিতে পারেন। এই সূত্রে তিনি জানাইয়াছেন, নিখিল ভারত চরকা সঙ্ঘে ২০০০০ মুসলমান সূতা-কাটুনীর কাজে নিযুক্ত আছে, এই সংবাদটুকু শ্রীজিন্নার সংশয়মোচনের পক্ষে যথেষ্ট হওয়া

মহাত্মীর আর একটী গঠনমূলক সঙ্কেত, মুদ্রার পরিবর্ত্তে সূতাকে পণ্যবিনিময়ের মধ্যস্থতায় প্রয়োগ করার প্রস্তাব। এই প্রস্তাবটী চিন্তাশীল মাত্রের কৌতূহল ও আশাকরি, চিন্তারও উদ্রেক করিবে। আমরা অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞগণের বিশেষ অভিমত এই প্রসঙ্গে আহ্বান করিতেছি। তাঁহারা এই বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণা করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলে দেশবাসী উপকৃত হইবে।

শিক্ষায় বিপর্য্যয়

বর্ম্মায় জাপ আক্রমণ ও রেঙ্গুন সহরে বোমাবৃষ্টির পরে, কলিকাতায় জরুরী পরিস্থিতি যে ক্রমশঃ সামরিক পর্য্যায়ে দ্রুত ঘনাইয়া চলিয়াছে, তাহা সকলেই বিদিত। ইহার ফলে রাজধানীর আর্থিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাট্রিক ও অন্যান্য পরীক্ষার শুধু দিন-পরিবর্ত্তন নহে, কেন্দ্র-পরিবর্ত্তনেরও ব্যবস্থা করিয়া বিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন। ইহার উপর, এ-আর-পি ঘটিত ব্যবস্থাগুলি না হওয়া পর্য্যন্ত কলিকাতার স্কুল-কলেজগুলি এক প্রকার বন্ধ করাই কার্য্যতঃ ঘটিবে। এইরূপ হইলে, ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ ও শিক্ষকদের বেতনসমস্যা প্রভৃতি নানা সমস্যারই জটিলতা অনিবার্য্য।

স্কুলে এ-আর-পির নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা অর্থসাপেক্ষ। এই অর্থ কোথা হইতে আসিবে, তাহাও বিবেচ্য। কি কলিকাতা, কি মফঃস্বল, সরকারী বিদ্যালয় ছাড়া সাধারণ বিদ্যালয়গুলির আর্থিক অবস্থা যে ব্যয়সঙ্কুল এ-আর-পি নির্দ্দেশপালনের পক্ষে অনুকূল নহে, [illegible] সহজেই অনুমেয়। অধিকাংশ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি [illegible]ঘটিত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা করেন নাই, এই প্রকার যে অনুযোগ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মূলে যে অনিচ্ছা নহে, পরন্তু অর্থেরই প্রশ্ন, তাহা আমরা অনায়াসেই বলিতে পারি। ইটের দর গভর্ণমেণ্ট বাঁধিয়া দেওয়ায়, ইষ্টক-প্রাচীরনির্ম্মাণ খুব ব্যয়সাপেক্ষ। এই সকল সমস্যার প্রতিকার কি, তাহা গভর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় উভয়কেই চিন্তাপূর্ব্বক নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

মফঃস্বলে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী চলিয়া যাইতেছে, তাহাদেরও শিক্ষা-সমস্যা চিন্তনীয়। আমরা মফঃস্বলের বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাসগুলির সম্প্রসারণ হওয়াই বর্ত্তমানে বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করি। তাহা হইলে অন্ততঃ এই সমস্যার কথঞ্চিৎ স্থায়ী প্রতিকার সম্ভবনীয় হয়। সম্পর্কিত, শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত অভিভাবক গৃহস্থগণও আশা করি, এই দিকে দৃষ্টি দিবেন।

মিঃ চার্চ্চিলের আস্থা প্রস্তাব

দুর্বিপাকেই বুদ্ধিভেদ উপস্থিত হয়। ইংরাজজাতির ন্যায় আত্মচেতন জাতিও এই স্বাভাবিক ত্রুটি হইতে একেবারে মুক্ত নহেন। সুদূর প্রাচ্যের শোচনীয় সামরিক পরিস্থিতি বৃটিশ পার্লামেণ্টের বহু সদস্যের মনে যে গুরুতর আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছে, প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিলের আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর, তাহার অভিব্যক্তি পাওয়া গেল—পার্লামেণ্টের তিন দিনের বিতর্কে ও আলোচনায়। মনে হয়, মিঃ চার্চ্চিল এই 'ডিবেটের' সুযোগ দান করিয়া পুঞ্জীভূত রাজনৈতিক বিক্ষোভের একটা নিরাপদ্ বহির্গমনেরই ব্যবস্থা করিলেন। জাতীয় ভিত্তির সঞ্চিত বিষবাষ্প এইরূপ safety-valve-এর মধ্য দিয়া লঘু করিয়া তোলা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য; প্রধান মন্ত্রী এইরূপ বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যে শুধু একজন প্রতিভাশালী রাজনৈতিক বক্তা ও ইংরাজ জাতির তেজস্বী রাষ্ট্রপ্রতিভূ নহেন, অতি কৌশলী কূটনৈতিক রাষ্ট্রবিদ্রূপেও যে তিনি অদ্বিতীয়, তাহা এই ঘটনায় আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। পার্ল্যামেণ্টের সদস্যগণও নানা তিক্ত কথা শুনাইবার পরও তাঁহাকে উন একমাত্র ভোটে সর্ব্বসম্মতিক্রমে আস্থাভূষিত করিয়া সঙ্কটে জাতীয় সংহতিশক্তিরই অপূর্ব্ব পরিচয় দিয়া [illegible]নির্ব্বিশেষে সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছেন।

জাতির বাঁচিবার আশা ও ভরসার মূল উৎসশক্তি এইখানেই। প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং যেমন উদার ও নির্ভীক চিত্তে স্বীয় সহকর্ম্মীদের সকল দায়ভার নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া মন্ত্রিসভার সমষ্টি দায়িত্ববোধের (collective responsibility of the cabinet) উপর দৃঢ় পদে দাঁড়াইয়াছেন, তেমনি ইংরাজ প্রতিনিধিগণও সকল মতভেদ ও মনোভেদ ভুলিয়া যে জাতীয় কল্যাণেরই জন্য একচিত্ত ও একবুদ্ধি হইতে পারেন, ইহাও বিশেষ লক্ষ্য

করিবার বিষয়। একটা জাগ্রত জাতির এই সবল সুস্থ আত্মচৈতন্যের দৃষ্টান্ত যে কোনও দেশপ্রেমিক রাষ্ট্র-সেবকের অভিনন্দনীয়। আমাদের ন্যায় পরাধীন জাতির পক্ষে এই শিক্ষা সত্যই অনুকরণীয়।

সাময়িক পত্র ও বিক্রয়কর আইন

বর্ত্তমানে যুদ্ধকালীন অবস্থার ব্যয়নির্ব্বাহ করিতে সাময়িক পত্রগুলিকে যে দারুণ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, তাহাতে অধিকাংশ পত্রিকার টিকিয়া থাকার সমস্যাই আজ দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। কাগজ ও ছাপাখানার আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির মূল্য বাড়িয়াছে বলিলে সব বলা হয় না, এই মূল্যের ক্রমস্ফীত অবস্থা ব্যবসায়ীর পূর্ব্বকল্পিত প্রত্যাশাকে পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত করিয়াছে। ছোটখাট অধিকাংশ পত্রিকা উঠিয়া যাইতেছে, বড়গুলির পক্ষেও অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা ছাড়াও বর্ত্তমান আশঙ্কাজনক অবস্থার জন্য সাময়িকপত্রের আয় নানাদিক্ দিয়া কমিয়া যাইতেছে। সাময়িক পত্রগুলির এই দুরবস্থায় বাঙলা সরকার পত্রিকাগুলির নিকট হইতে বিক্রয়-কর আদায় করিবার সিদ্ধান্ত করিয়া আরও কঠিনতর পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছেন। বর্ত্তমানে মাসিকপত্রগুলি ভারতসরকারের ডাকবিভাগ কর্ত্তৃক সাধারণভাবে 'নিউজ্‌পেপার' শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে এবং এসম্বন্ধে নিউজ্‌পেপারের যে সূত্র (definition) তাঁহারা দিয়াছেন, তাহাতে মাসিকগুলিও যে 'সংবাদপত্রে'র পর্য্যায়ে পড়ে, তাহা বলাই বাহুল্য। বাংলা সরকারের 'বিক্রয়কর' আইনে এই দিক্ দিয়া যে ব্যতিক্রম করা হইয়াছে, তাহা কোন রকমেই সমর্থনযোগ্য নয়। বর্ত্তমানে মাসিকগুলি গল্প, উপন্যাস বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে বিধিনিষেধ মানিয়া লইয়া সাধারণ সংবাদপরিবেশণেও যথেষ্ট অবহিত। রয়টার বা বিভিন্ন নিউজ এজেন্সি কর্ত্তৃক পরিবেশিত সংবাদের সারসংগ্রহ প্রকাশ করা ছাড়াও, পত্রিকাগুলি সরাসরিভাবে ভারতসরকার কর্ত্তৃক প্রদত্ত ইস্তাহার, পুলিস্ ইস্তাহার ও সাময়িক কার্য্যাবলী সংক্রান্ত ইস্তাহার নিয়মিত পাইয়া থাকেন। ভারতের বর্ত্তমান যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সাময়িকগুলির দান কোন মতেই উপেক্ষণীয় নয়। আইনগত প্রশ্ন ছাড়াও ব্যবহারিকভাবে মাসিকের উপর এই ধার্য্য করের দ্বারা সরকারী তহবিলের আর্থিক অল্পমূল্য যাহা আনুকূল্য হইবে, তাহাও সামান্য। অপরপক্ষে এই আইনের অপপ্রয়োগ দ্বারা পত্রিকাব্যবসায়ের একাংশে যে সঙ্কট উপস্থিত হইবে, তাহা কর্ত্তৃপক্ষ কোন মতে উপেক্ষা করিতে পারেন না। সম্প্রতি ভারতীয় সাংবাদিক সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীযুত তুষারকান্তি ঘোষ মহাশয়ের নেতৃত্বে কলিকাতা মাসিক পত্রিকাগুলির পক্ষ হইতে শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (প্রবাসী), শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (ভারতবর্ষ), শ্রীযুক্ত রাধারমণ চৌধুরী (প্রবর্ত্তক) প্রভৃতি সাংবাদিক মাননীয় অর্থসচিবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বর্ত্তমান সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। জানা গিয়াছে—মাননীয় অর্থসচিব ব্যাপারটি সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন।

শ্রীজনরঞ্জন রায়

ব্রজদুলাল নন্দলাল খেলিছে মোহন হোরি,
নীপ নিকুঞ্জে বিজুরি কিরণ হাসিতেছে বামে প্যারী।
কোয়েল কণ্ঠ ঋতু বসন্ত অসীম উৎস, নাহিক অন্ত
ভুঞ্জে হৃদয় প্রেমপুঞ্জ মধুকর রাধাকান্ত।
প্রীতি অনুরাগে মাধব-অঙ্গে খেলিছে আবীর গৌরী,
বিলম্বিত ভয় ভরম ভামিনী উনমত গোপনারী।

পুষ্পিত বন লাল তমাল, লাল সে শ্যামচাঁদ,
গীতমুখর চপল চটুল আভীরাণী রূপ-ফাঁদ।
নেহারি নবীন জলদ বরণে, (যত) তড়িতবরণা শিহরে সঘনে,
অম্বর ঢাকা জ্যোৎস্না—অরুণ কুঙ্কুম রাগ কিরণে।
রসিক-শেখর কোড়ে কোড়ে ঢুলিল সোহাগ আগরি,
অধরে প্রাণে কুসুমবাণে মিলিল চকোরচকোরী।

রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চ

শ্রীতারাকিশোর বর্দ্ধন

প্রাচ্য রণাঙ্গনঃ

সুদূর প্রাচ্যের রণ-রঙ্গমঞ্চে চরম অঙ্কের রোমাঞ্চকর সমরাভিনয় চলিয়াছে। বস্তুতঃ পূর্ব্ব এশিয়ার বৃহত্তম ঘাঁটি, ভারতের পূর্ব্বদ্বার দ্বীপদুর্গ সিঙ্গাপুর জাপান কর্ত্তৃক বিস্ময়কর ঝটিকাবেগে আক্রান্ত ও অধিকৃত হওয়ায় প্রাচ্যের যুদ্ধ এক যুগান্তকারী সঙ্কট-সীমায় উপনীত হইয়াছে। পৃথিবীর বৃহত্তম কামানশ্রেণী ও রণতরণী পরিরক্ষিত সিঙ্গাপুরের এতশীঘ্র পতন অপ্রত্যাশিত ছিল। সিঙ্গাপুরে জাপানী সৈন্যের অবতরণের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তাহারা মালয়ের শেষ প্রান্তে আসিয়া উপনীত হইয়াছিল। কিন্তু এই পনের দিনের মধ্যে সিঙ্গাপুরে কোনও উল্লেখযোগ্য সাহায্য আসিয়া পৌছিতে পারে নাই। সিঙ্গাপুরকে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট নৌঘাঁটী-রূপেই ব্যবহার করিতেছিলেন। কোনও নৌবহরের পক্ষে সিঙ্গাপুর আক্রমণ করিবার সম্ভাবনা ছিল না। জাপানী নৌবহরের পক্ষেও সিঙ্গাপুর দখল করা অসম্ভব বলিয়াই জাপান এই ক্ষেত্রে মালয় দখল করিয়া স্থল যুদ্ধের ষ্ট্রাটেজি অবলম্বন করিয়াছে। রণনীতির দিক্ দিয়া উহা অভ্রান্ত। যাহারা সিঙ্গাপুরের নৌঘাঁটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই, যে স্থলপথে উহার বিপদ্ হইতে পারে। অবশ্য সে যাহা হউক সিঙ্গাপুরের পতন হইলেও জাপানের যুদ্ধ জয় শেষ হইল, এ কথা বলা যায় না।

ফ্রান্সের পতনেও জার্ম্মানী সমরে চরম জয়লাভ করে নাই। সিঙ্গাপুরের পতনে এই মাত্র সম্ভাবনা আসিয়া যায় যে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে জাপানের [illegible]ার সংহত হইলেই সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধের প্রথম অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটিবে।

তারপর প্রশ্ন এই যে জাপানের পরবর্ত্তী অভিযান কোন্ পথে পরিচালিত হইবে। এ প্রশ্নের তিনটি উত্তর দেওয়া যাইতে পারে:—(১) ব্রহ্ম ও ভারতবর্ষের পথে, (২) সাইবেরিয়ার পথে ও (৩) অষ্ট্রেলিয়ার পথে। যদি সাইবেরিয়া বা অষ্ট্রেলিয়া জাপান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তবে আপাততঃ ভারতবর্ষের আশঙ্কা বিদূরিত হয়। অষ্ট্রেলিয়ার বাসস্থানের উপযুক্ত ভূমির প্রাচুর্য্য ও তাহার অফুরন্ত ধনসম্পদ জাপানকে প্রলুব্ধ করিতে পারে। কিন্তু ইহাও ভাবিবার বিষয় যে, জার্ম্মাণীর সঙ্গে জাপানের যে সামরিক মিতালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে ঐ উভয় শক্তির এক স্থানে মিলিত হইবার প্রয়াসও স্বাভাবিক। যদি উহাদের সৈন্যবাহিনী পরস্পর মিলিত হইতে চায় তাহা হইলেও জাপানকে হয় সাইবেরিয়া আক্রমণ করিয়া উভয়ে মিলিয়া রুশিয়াকে পর্য্যুদস্ত করিয়া রুশিয়ার মধ্যে সম্মিলিত হইতে হইবে। অথবা ভারতবর্ষের মধ্য দিয়া জাপান এবং তুরস্কের মধ্য দিয়া জার্ম্মাণ আসিয়া মধ্য প্রাচ্যে উপনীত হইবার চেষ্টা করিতে পারে।

সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতির পতন হইলে, মিত্রশক্তি অষ্ট্রেলিয়ায় শক্তি সমাবেশ করিয়া জাপানকে আক্রমণ করিবার অবশ্যই চেষ্টা করিবে। এ ক্ষেত্রে জাপান ঐরূপ আক্রমণের প্রতিরোধ করিয়া চীনকে মিত্রশক্তিপুঞ্জ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য সচেষ্ট হইবে। বর্ত্তমানে রাশিয়া ও চীনই বস্তুতঃ অক্ষশক্তির সহিত সম্মুখ সংগ্রাম করিতেছে। অতএব অক্ষশক্তির পক্ষে রাশিয়া ও চীন তথা ভারতবর্ষকে যদি মিত্রশক্তিপুঞ্জের সংহতি হইতে অপসৃত বা অবরুদ্ধ করা সম্ভব হয়, তবে তাহাদের পশ্চাৎ হইতে আক্রান্ত হইবার ভয় অনেকখানি অপসারিত হয়।

এদিকে বসন্ত সমাগতপ্রায়। ঐ সময়ে হিটলার যদি রুশিয়াকে পদানত করিবার জন্যই তাহার সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় মনে করেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই জাপানকেও সাইবেরিয়া আক্রমণ করিতে উত্তেজিত করিতে পারেন। ইতিমধ্যে অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে জাপান ধীরে ধীরে তাহার শক্তি সংহত করিয়া লইবারই চেষ্টা করিবে।

[illegible] বিষয়ে আর একটা দিক্ ভাবিবার আছে। জাপানীগণ অষ্ট্রেলিয়া বা সাইবেরিয়ায় ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেও, তাহার নৌবাহিনী আন্দামান দখল করিতে পারে। তাহা হইলে বঙ্গোপসাগরের পথে ভারতীয় উপকূল বাণিজ্য পর্য্যন্ত ব্যাহত হইবে এবং কলিকাতা, মান্দ্রাজ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি বন্দরে প্রচণ্ড বিমান আক্রমণও হইতে পারে। আর যদি অষ্ট্রেলিয়া বা সাইবেরিয়ার পথে জাপানী অভিযান পরিচালিত না হয়, তবে আন্দামান ঘাঁটি হইতে নৌবহরের সাহায্যে তাহাদের ভারতীয়

উপকূলের স্থানে স্থানে অবতরণ পর্য্যন্ত করিবার সম্ভবনা আসিয়া যায়, উহাই ভারতের পক্ষে আশঙ্কা। কিন্তু ঐ প্রকার অবতরণ দ্বারা উহারা এখানে স্থায়ী ফল লাভ করিতে পারিবে না। ভারতের বিরাট বাহিনী যথাসময়ে শত্রু পক্ষকে পর্য্যুদস্ত করিতে পারিবে। কোনও বৈদেশিক শক্তি ভারতবাসীকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিবে—তাহা ভারতবাসী আর সহ্য করিবে না। পণ্ডিত নেহেরু প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এ কথা বার বার ঘোষণা করিয়াছেন।

নিকট প্রাচ্য রণাঙ্গন ঃ

লিবিয়ার রণক্ষেত্র বায়োস্কোপের মতন দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল। এই ত সেদিন মাত্র মিত্রপক্ষীয় সেনাদল শত্রুবাহিনীকে ট্রিপোলী পর্য্যন্ত হটাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে আবার খবর আসিয়াছে যে, জেনারেল রোমেলের নেতৃত্বে পরিচালিত ইটালো-জার্ম্মাণ সৈন্যদল পুনরায় বেনগাজি অতিক্রম করিয়া ডের্ণা দখল করিয়াছে এবং উহারা দ্রুতগতিতে ইজিপ্টের দিকে ধাবিত হইতেছে। এবারের যুদ্ধ প্রথম আরম্ভ হইবার কিছু পরেই বেন্‌গাজি মিত্রপক্ষের দখলে আইসে। সেদিন সমগ্র মিত্রপক্ষীয় দেশে আড়ম্বর সহকারে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তার কয়েক দিন পরেই আবার শত্রুপক্ষ বেন্‌গাজি পুনরধিকার করিয়া ইজিপ্টের সীমানায় উপনীত হয়। গত ডিসেম্বর মাস হইতে আবার মিত্রপক্ষের প্রবল বিক্রমে জেনারেল রোমেলের সৈন্যদল পশ্চাদপসরণ করিতে থাকে, বেনগাজি মিত্রপক্ষের দখলে আসে ও শত্রুসৈন্য ত্রিপোলী পর্য্যন্ত বিতাড়িত হয়। কিন্তু ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতেই আবার ঘটনার স্রোত ফিরিয়া যায়। হিটলার রুশিয়ায় আত্মরক্ষায় ব্যবস্থা করিয়া লিবিয়াতে সৈন্য প্রেরণ করায় জেনারেল রোমেল আবার বৃটিশ [illegible]কে ইজিপ্টের দিকে হটাইয়া লইয়া যাইতেছেন। এ পর্য্যন্ত বেনগাজির অদৃষ্টে চারিবার প্রভু-পরিবর্ত্তন ঘটিল। ঐ হতভাগ্য সহরের আরও কত লাঞ্ছনা আছে কে বলিতে পারে! সমস্ত লিবিয়া পুনরধিকার করিয়া জেনারেল রোমেল ইজিপ্ট আক্রমণ করিবেন না, আত্মরক্ষার ট্যাক্‌টিক্‌স্ অবলম্বন করিয়া বক্রী সৈন্যদল রুশিয়ায় পাঠাইয়া দিবেন তাহা ভাবী ঘটনাবলীর উপর নির্ভর করিবে।

রাষ্ট্রীয় কূটনীতিক মহলের ধারণা—এবারে নিকট প্রাচ্য রণাঙ্গনেই হিটলার অধিকতর মনোনিবেশ করিবেন। কেহ কেহ বলেন, রুশিয়াতে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা সংহত করিয়া হিটলার জিব্রালটার, মাল্টা ও সুয়েজ খাল যুগপৎ আক্রমণ করিবেন—উহাতে তুরস্কের ভিতর দিয়া ইরাক, সিরিয়া ও ককেসাস্ আক্রমণের এবং পারস্য অতিক্রম করিয়া ভারত আক্রমণেরও ইঙ্গিত আছে। আবার এ সময় হিটলারের সঙ্গে সঙ্গে জাপানও ভারতবর্ষ এবং সমগ্র ব্রহ্মদেশ যুগপৎ আক্রমণ করিয়া বসিতে পারে। অর্থাৎ শত্রুপক্ষ সাড়াশীর ন্যায় আক্রমণ করিয়া ভারতবর্ষ গ্রাস করিবার চেষ্টা করিতে পারে। কূটনীতি-বিদ্‌গণের প্রতিভা অনন্যসাধারণ—তাঁহাদের কল্পনা শক্তিও বিচিত্র। তাহাদের কথার আলোচনা করা আমাদের শক্তির বাহিরে। আমরা কিন্তু মনে করি যে, হিটলার রুশিয়ার সঙ্গে একটা হেস্তনেস্ত না করিয়া অন্য রণাঙ্গনের সৃষ্টি করিবেন না। হিটলারকে তাঁহার মতবাদ হইতে পৃথক করিয়া দেখার হেতু এখনও হয় নাই। ইউরোপকে সংহত ও নিরাপদ করিয়া তাঁহার নববিধান পরিকল্পনাকে রূপ দিবার চেষ্টা হিটলারের পক্ষে স্বাভাবিক। তাঁহার সমস্ত কার্য্যের ধারা আজ পর্য্যন্ত ঐ একই উদ্দেশ্যের খাতে প্রবাহিত। সোভিয়েট-রুশিয়া তাঁহার নববিধান প্রতিষ্ঠার প্রবলতম বিঘ্নস্বরূপ। সুতরাং হয় হিটলার সোভিয়েট রাশিয়াকে বিধ্বংস করিবেন, নতুবা সোভিয়েট রুশিয়া নাৎসীবাদকে উৎপাটন করিয়া ইউরোপে বলশেভিকবাদের নববিধান প্রবর্ত্তন করিবে। উহার মধ্যে আর অন্য পথ নাই, কূটনীতির মারপ্যাচ্ নাই, আপোষ নাই—আছে কেবল বিরামবিহীন সংগ্রাম। সুতরাং বসন্ত সমাগমে হিটলারের পক্ষে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নবোদ্যমে অভিযান করাই [illegible]ত হয়। রুশিয়ার বিপক্ষে যদি হিটলার তাঁহার সম[illegible] প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে [illegible]য়েজ বা জিব্রাল্টারে আপাততঃ জার্ম্মাণ আক্রমণ হইবে না এবং জেনারেল রোমেলও ইজিপ্টের সীমান্তদেশে আত্মরক্ষার ঘাঁটি স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতে থাকিবেন। কিন্তু রুশিয়া জয় করিতে যদি হিটলার আংশিক শক্তি প্রয়োগই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করেন তাহা হইলে জার্ম্মাণ বাহিনীর একবাহু ককেসাস্ আক্রমণ করিতে পারে ও অন্য বাহু সুয়েজ খাল অভিমুখে ধাবিত হইতে পারে। তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল রোমেলও ইজিপ্ট আক্রমণ করিবেন।

মোটের উপর ইহা সুনিশ্চিত যে, আগামী বসন্তকালে একটা চরম বুঝাপড়ার মহড়া এখন জগৎ জুড়িয়া ভালভাবেই চলিয়াছে।

বারাণসী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়ন্তী:

সম্প্রতি বারাণসী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত-জয়ন্তী উৎসব হইয়া গেল। ১৯১৬ সালে ইহার ভিত্তি স্থাপিত হইলেও পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় ১৯০৫ সালেই ইহার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। মিসেস্ বেসান্টের 'সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ'কে কেন্দ্র করিয়া এই জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্য্য আরম্ভ হয় ১৯২১ সাল হইতে।

রাজভিক্ষু পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজী

আধুনিক কালে ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার এত বড় ...ট পরিকল্পনা বোধ হয় দেখা যায় নাই। মনে হয় নালন্দা ও তক্ষশীলার ঐতিহাসিক আদর্শ এই আধুনিক মহাবিদ্যালয়ের মধ্য দিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। প্রায় ১৩০০ একর অর্থাৎ তিন হাজার নয় শত বিঘা জমির উপর প্রাচ্য স্থাপত্যের অনুসরণে এই বিরাট শিক্ষায়তনটি নির্ম্মিত হইয়াছে। ইং ১৯১৬ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বাসন্তী পঞ্চমীর দিন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তাহার পর গত ২৫ বৎসরের মধ্যে যেরূপ দ্রুত গতিতে ইহার প্রসার হইয়াছে তাহা সত্যই বিস্ময়কর। গত ২১শে জানুয়ারী শ্রীপঞ্চমীর দিন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত-জয়ন্তী উৎসব আরম্ভ হয়, উৎসব-মণ্ডপ প্রায় ২৫ সহস্রাধিক অতিথির সমাবেশে মুখরিত হইয়াছিল। প্রথমে মহাত্মা গান্ধী ৪৫ মিনিটকাল তাঁহার অভিভাষণী বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর মালবীয়জীর বক্তৃতার পর ভাইস্ চ্যান্সেলার স্যার্ রাধাকৃষ্ণন্ উপসংহার বক্তৃতা করেন।

সংবাদপত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ:

ভারত সরকার ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠা সংখ্যা ও মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এই নির্দ্দিষ্ট দাম অনুসারে ৪ পৃষ্ঠার কাগজ দুই পয়সা, ৬ পৃষ্ঠার কাগজ তিন পয়সা এবং ৮ পৃষ্ঠার কাগজ এক আনা মূল্যে বিক্রয় করিতে হইবে। গত ২রা ফেব্রুয়ারী হইতে এই আদেশ বলবৎ হইয়াছে।

বঙ্গীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বিল:

প্রকাশ বাংলা দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা-নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিসভা 'বঙ্গীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বিল' নামে যে বিল রচনা করিয়াছিলেন, তাহা পরিত্যক্ত হইবে। ইহার পরিবর্ত্তে নূতন মুখবন্ধসহ একটি নূতন বিল বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশনে উত্থাপন করা হইবে।

চন্দননগর পুস্তকাগার:

গত ২৫শে জানুয়ারী বিখ্যাত সাহিত্যিক এবং সাহিত্য-সমালোচক শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে চ... পুস্তকাগারের বার্ষিক উৎসব সুসম্পন্ন হয়। পুস্তকাগারের সম্পাদক শ্রীনারায়ণচন্দ্র দে কার্য্যবিবরণী পাঠ করিলে পর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরিত হয়। অতঃপর সভাপতি মহাশয় 'সাহিত্য' সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত বক্তৃতা করেন। শ্রীযুত মণীন্দ্রনাথ নায়েক কর্ত্তৃক সভাপতিকে ধন্যবাদের পর সভার কার্য্য শেষ হয়।

বাঙ্গালার শিক্ষার অবস্থা:

বাংলা সরকারের ১৯৩৯-৪০ সালের শিক্ষাবিভাগের যে বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা

যায় যে, আলোচ্য বৎসরে বাংলা দেশে অনুমোদিত ও অনমুমোদিত মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৬৩,৩০৫টি এবং উহাতে মোট ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৩৬,৮৮,৫৩২ জন, তন্মধ্যে ছাত্র সংখ্যা ২৮,৮৬,৪৫৯ জন এবং ছাত্রী সংখ্যা ৮,০২,০৭৩ জন। এই বৎসরে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৪০৯টি এবং মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২,১৮১টি। ইহাতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা মোট ৬,৩৪,১৬৪ জন দেখা যায়। আলোচ্য বৎসরে ভারতীয় বালিকাদের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৮৭, তন্মধ্যে সরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬টি। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯,৬৬৫ হইতে ২৪,৭৮২ হইয়াছে। এই বৎসর ৩,৩৪৭ জন বালিকাকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পাঠানো হয় তন্মধ্যে ১,৮২৭ জন বালিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

চট্টগ্রাম প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে মাননীয় অতিথি :

গত ২৪শে জানুয়ারী অপরাহ্নে বঙ্গীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসু মহোদয়,

চট্টল-সঙ্ঘে মাননীয় মন্ত্রী সন্তোষকুমার বসুকে অভিনন্দন দেওয়া হইতেছে। বাম হইতে (চেয়ারে উপবিষ্ট) মিঃ এ, এ, ইনস্ (ম্যানেজার ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ), শ্রীমতী নারায়ণজী, মিঃ ও, জে, মার্টিন (বিভাগীয় কমিশনার), মাননীয় মন্ত্রী সন্তোষকুমার বসু, মিঃ জে, বি, আমসন্ (জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট) ও মিঃ এ, এজিম বায়-এট্-ল (জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান)।

চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক সমভিব্যাহারে স্থানীয় প্রবর্ত্তক আশ্রম পরিদর্শন করেন। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ মাননীয় বসু মহাশয়কে মানপত্র দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করে। মানপত্রের উত্তরে তিনি বলেন : সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতিলাল রায়ের ভাব ও কর্ম্মধারার সহিত তাঁহার পরিচয় দীর্ঘদিনের। সঙ্ঘের চন্দননগর-কেন্দ্র পরিদর্শন করিয়া তিনি আনন্দ ও প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। ভারতের সনাতন ধর্ম্মকে কর্ম্মের ভিতর দিয়া সঙ্ঘ রূপায়িত করিয়াছে। তিনি আরও বলেন আধুনিক যুগে ভারতের সনাতন প্রতিভা স্বামী বিবেকানন্দের পরে শ্রীমতিলালের মধ্যে মূর্ত্ত হইয়াছে। মাননীয় বসু মহাশয় সঙ্ঘের সভ্য ও কর্ম্মীদিগকে তাঁহার অন্তরের অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

ভারতে মার্শাল চিয়াং কাইসেক :

৯ই ফেব্রুয়ারীর নয়া দিল্লীর এক ইস্তাহারে প্রকাশ, মার্শাল চিয়াং কাইসেক নয়া দিল্লীতে আসিয়া পৌছিয়াছেন। তাঁহার সহিত মাদাম চিয়াং কাইসেক এবং একদল অফিসারও আসিয়াছেন। চীন ও ভারতের সাধারণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কতকগুলি ব্যাপারে ভারতের প্রধান সেনাপতির সহিত পরামর্শের জন্য মার্শাল চিয়াং কাইসেক ভারতে আসিয়াছেন। এখানে অবস্থান কালে ভারতের জনসেবকদের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় আছে।

কলিকাতার ভূগর্ভে জলাধার :

কলিকাতা কর্পোরেশনের এ, আর, পি, কমিটির আলোচনায় প্রকাশ, বিমান আক্রমণের ফলে যে সব অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইবার আশঙ্কা আছে তাহা নির্বাপণের জন্য অতিরিক্ত জলসরবরাহের ব্যবস্থা হিসাবে কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে ভূগর্ভে ১৩০টি জলাধার নির্ম্মাণ করা হইতেছে। জলাধারগুলি নির্ম্মাণ করিতে আনুমানিক ২ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। এইগুলির প্রত্যেকটিতে ৮ হাজার গ্যালন করিয়া জল ধরিবে। এই জলাধারগুলির মধ্যে ৬টির নির্ম্মাণকার্য্য ইতিমধ্যেই শেষ হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত :

বর্ত্তমান সঙ্কটজনক অবস্থায় স্কুল কলেজসমূহ খোলার প্রশ্ন সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট এইরূপ

সিদ্ধান্ত করেন যে, কলিকাতা ও উহার চতুঃপার্শ্বস্থ ৩০ মাইলব্যাপী স্থান এবং চট্টগ্রাম ও আসানসোল লইয়া গঠিত ১নং বিপজ্জনক স্থান সমূহের কোন স্কুল ও কলেজই প্রয়োজনীয় যথোপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা অবলম্বিত না হওয়া পর্য্যন্ত এবং ঐরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে—এই মর্ম্মে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে সার্টিফিকেট না পাওয়া পর্য্যন্ত খোলা হইবে না। সিণ্ডিকেট ১নং এলাকায় বর্ণিত বিপজ্জনক স্থানসমূহের ম্যাট্রিক, আই-এ, এবং আই, এস্‌সি পরীক্ষার্থিগণকে অনতিবিলম্বে তাহাদের স্ব স্ব পরীক্ষাকেন্দ্র পরিবর্ত্তন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের পরামর্শ দেন।

খবরাখবর :

জেনারেল স্যার্‌ অ্যালান ফ্লেমিং হার্টলী জেনারেল ওয়াভেলের স্থানে ভারতের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন।

* * *

সম্প্রতি 'ডিউক অফ কনট' ৯২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার তৃতীয় পুত্র।

* * *

শ্রীযুত মহাদেব দেশাইএর সম্পাদনায় মহাত্মা গান্ধীর 'হরিজন' পত্রিকা পুনরায় প্রকাশিত হইতেছে।

* * *

কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে 'ডক্টর' উপাধি প্রদান করা হইয়াছে।

পরলোকে পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ :

সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় ৬৮ বৎসর বয়সে বারাণসীধামে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য গত ৯ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে আর, জি, কর রোডস্থ সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ ভবনে পণ্ডিতমণ্ডলীর এক সভা হয়। মহামহোপাধ্যায় অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরলোকগত তর্কবাগীশ মহাশয়ের আচারনিষ্ঠা, ধর্ম্মপ্রাণতা, পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞানের উল্লেখ করিয়া বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা করেন।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন :

ওয়ার্দ্ধায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বার্দ্দৌলী প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি বলেন যে, ওয়ার্কিং কমিটির সহিত মতভেদ ঘটিলেও কংগ্রেসের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটে

মহাত্মাজীর নির্ব্বাচিত ভারতের ভাবী রাষ্ট্র-নেতা পণ্ডিত জওহরলালজী

নাই। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেন, "পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুই আমার উত্তরাধিকারী।" মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতার পূর্ব্বে রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, "যতদিন পর্য্যন্ত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মনোভাব অপরিবর্ত্তিত থাকিবে, ততদিন যুদ্ধ ও যুদ্ধে যোগদান সম্পর্কে কংগ্রেসের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এমন কিছু করেন নাই, যাহাতে আমাদের মনোভাব সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করার কারণ ঘটিয়াছে। মোট ২১১ জন সদস্যের মধ্যে ১৫ জন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ও ২৫ জন পক্ষে ভোট দেন, অবশিষ্ট সকলেই নিরপেক্ষ ছিলেন।

মহিলা সংবাদ :

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ মহিলা কবি শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু মহাশয়াকে ১৯৪১ সালের জন্য জগত্তারিণী পদক দিতে মনস্থ করিয়াছেন। কাব্যকুসুমাঞ্জলি, বীরকুমার বধ প্রভৃতি গ্রন্থের ইনি রচয়িত্রী।

* * * *

বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য দানের কথা বিবেচনা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ ১৯১১ সালের জন্য শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীকে "ভুবনমোহিনী দাসী" সুবর্ণ পদক দানে ভূষিত করিয়াছেন।

* * * *

রামপুরহাটে (বীরভূম) অনুষ্ঠিত ই, আই, ইন্‌ষ্টিটিউট্ এবং শিবতলা এই দুইটি সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় কুমারী আশালতা প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ও কলিকাতা অনুষ্ঠিত বিবিধ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় কুমারী আশালতা অনেকবার প্রথম হইয়া বহু পদকের দ্বারা সম্মানিতা হইয়া[illegible] কলিকাতার বিখ্যাত মৃদঙ্গ-বাদক শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ দে (সুবোধবাবু) মহাশয়ের পৌত্রী।

কুমারী আশালতা দে

বর্ত্তমান সঙ্কটে আমাদের কর্ত্তব্য :

পাইকপাড়া প্রেমভক্তি হরিসভার পক্ষ হইতে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে পৃথিবীব্যাপী এই মহাসঙ্কটের সময়ে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে আমাদিগকে বিশ্বপিতার নিকট বিশ্বকল্যাণ ও শান্তির জন্য নিরন্তর প্রার্থনা করিতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে গৃহে গৃহে, পল্লীতে পল্লীতে জাতীয় সংকীর্ত্তনদল গঠিত করিয়া শ্রীভগবানের নাম-সংকীর্ত্তন করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

শেঠ যমুনালাল বাজাজ :

গত ১১ই জানুয়ারী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ও কোষাধ্যক্ষ শেঠ যমুনালাল বাজাজ তাঁহার ওয়ার্দ্ধা বাসভবনে পরলোকগমন করায় ভারতীয় রাষ্ট্র ও সমাজক্ষেত্রে একজন অকপট ত্যাগী নিষ্ঠাবান্ বিশিষ্ট সেবক-নেতার অপূরণীয় অভাব হইল। দেশ ও জাতির জন্য তিনি বারম্বার কারাবরণ, অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট হাসিমুখে বরণ করিয়া লইয়াছেন। দেশের সেবায় মহাত্মাজীর পার্শ্বে থাকিয়া তিনি তাঁর অগাধ ধন-ভাণ্ডার উৎসর্গ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে সংগঠন কর্ম্মে বিশেষ গো-সেবায় তিনি আত্মনিয়োগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। দানবীর দেশসেবক বাজাজজীর নাম জাতির রাষ্ট্রসাধনার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

শেঠ যমুনালাল বাজাজ

যুদ্ধভাণ্ডারে বাংলার দান :

ভারতে[illegible] ১১টি প্রদেশ, সামন্তরাজ্য ও কেন্দ্রীয় শাসনা[illegible] অঞ্চলসমূহ ভারতীয় ডিফেন্স লোনে যে [illegible]পরিমাণ সাহায্য প্রদান করিয়াছে তাহার সর্ব্বশেষ সংবাদে জানা গিয়াছে যে, বাংলা দেশ এ বিষয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। এ সম্পর্কে সর্ব্বভারতীয় দানের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৯৭,৯০,৫২,৩৮৭৲ টাকা এবং বাংলার একক দানের পরিমাণ হইতেছে ৩২,৩৯,৫৬,৩৫৭৲ টাকা।

প্রবর্ত্তক ধর্ম্ম সংগঠন সমিতি :

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের গৃহী ও ভক্ত শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের আদর্শ লক্ষ্য রাখিয়া বিভ্রান্ত হিন্দুদিগের মধ্যে ধর্ম্মচেতনা ও

আত্মোন্নতির জন্ত খুলনার গোটাপাড়া গ্রামে 'প্রবর্ত্তক ধর্ম্ম সংগঠন সমিতি' নামক একটি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে।

শরৎ-স্মৃতিবার্ষিকী:

অপরাজেয় কথাশিল্পী বাংলার জনপ্রিয় সাহিত্যিক পরলোকগত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চতুর্থ স্মৃতি বার্ষিকী উপলক্ষে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও কলিকাতা ও হুগলী জেলার বিশিষ্ট সাহিত্যসেবকবৃন্দ এবং দেবানন্দপুর ও নিকটবর্ত্তী গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণ শরৎচন্দ্রের জন্মভূমি ও বাল্যনিকেতন দেবানন্দপুর গ্রামে সমবেত হইয়া গত ১লা ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি অর্পণ করেন। দেবানন্দপুর শরৎস্মৃতি সমিতি ও পল্লীসেবক সমিতির উদ্যোগে ও কলিকাতাস্থ রবিবাসরের সহযোগিতায় এই স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হয়। অধ্যক্ষ শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবানন্দপুরে শরৎস্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণের জন্য

৺শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শরৎস্মৃতি সমিতির সভাপতি শ্রীযুত তারকনাথ মুখার্জ্জী এম, এল, এ, অর্থ সাহায্যের আবেদন করেন। অনুষ্ঠানটি বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

বালক যাদুকর দেবকুমার ঘোষাল:

যাদুকর গণপতির প্রিয়তম শিষ্য বাংলার বালক যাদুকর শ্রীমান্ দেবকুমার ঘোষাল ইতিমধ্যেই তাঁহার ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত

দেবকুমার ঘোষাল

হইয়াছেন। সম্প্রতি পার্ব্বতীপুর রেলওয়ে ইন্‌ষ্টিটিউটে খেলা দেখাইয়া ইনি ডুয়ার্সের দিকে আমন্ত্রিত হইয়া গমন করিয়াছেন। অল্প বয়সেই যাদুবিদ্যায় ইনি যেরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল সন্দেহ নাই।

নগেন্দ্র স্মৃতি-বার্ষিকী:

বিগত ১লা ফেব্রুয়ারী মহাবোধি সোসাইটি হ ভারতে ফুটবল, রাগবি ও ক্রীকেট খেলার প্রতিষ্ঠা এটর্ণী নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর প্রথম বার্ষিক স্মৃতিস

৺নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। মাননীয় বিচারপতি শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস, সি, আই-ই মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতে চাউল আমদানী:

ব্রহ্মদেশ হইতে প্রত্যেক বৎসর ভারতবর্ষ ও সিংহলে প্রায় ৩২ কোটী টাকা মূল্যের ২২ লক্ষ টন চাউল রপ্তানী হইয়া থাকে। উহার শতকরা ৯৭ ভাগ চাউলই ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ কর্ত্তৃক রপ্তানী হয়। এই ব্যবসায়ে ভারতীয়দের ৮ হইতে ১০ কোটী টাকা মূলধন খাটিতেছে এবং উহার মারফতে ২ লক্ষ লোকের অন্নসংস্থান হইতেছে।

—শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার

যুগ্ম সম্পাদক: শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ কর্ত্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত এবং প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৫২।৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

আকাশ ও পৃথিবী

শিল্পী : শ্রীপ্রমোদকুমার চ

ষড়বিংশ বর্ষ
১৩৪৮ সাল

চৈত্র

দ্বিতীয় খণ্ড
৬ষ্ঠ সংখ্যা

ঈশ্বর-কাম

ধর্ম্ম এ জাতির ভিত্তি ; কিন্তু মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার যোগ্যতা কর্ম্মের মধ্য দিয়াই মিলে।
কর্ম্মের মূলে আছে কাম-বীজ। এই কাম—ঈশ্বর-কাম। এ বীজের শোধন হয় সাধনায়। অশোধনে
বিকৃত সৃষ্টি ; শোধনেই দিব্য জগৎ গড়িয়া উঠিবে।

যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই এই মহাবীর্য্যের প্রকাশ হয়। যেখানে বীর্য্য ম্লান বা অবনত, বুঝিতে
হইবে সেখানে যথার্থ ধর্ম্ম নাই—যাহা আছে, তাহা ধর্ম্মের নামে মিথ্যার উপাসনা।

ঈশ্বরকামী শক্তিধর হয়। সে অলস, উদাসীন নয়। নিত্যানন্দে তার চরণ নৃত্যচঞ্চল হইয়া
উঠে। হৃদয় উল্লাসময় হয়। ধমনীতে ধমনীতে বিদ্যুৎ বহে। কামের বীর্য্য সতত স্ফুরিত হইতে
চাহে নানা ছন্দে ও ভঙ্গিমায়। আত্মসমর্পণযোগী আর সব কামনা ত্যাগ করে, এমন কি মোক্ষ-মুক্তি
কামনাও তর্পণ করিতে হয়, সাযুজ্য-স্বারূপ্য-লা[illegible]ভিলাষও বিসর্জ্জন দিতে হয় ; কিন্তু একটা
অক্ষয় সৃষ্টি-বীজ রক্ষা করিয়াই যোগী চলে। সে সৃষ্টি নিত্য সৃষ্টি। নিত্য স্থির অপরিণামী সত্ত
কিন্তু যুগে যুগে ভগবানকে জগতে মূর্ত্ত করার আনন্দই তাহার স্বভাব। ইহা ঈশ্বর ভাব। ভূত
ভাবোদ্ভবকর বিসর্গ অর্থাৎ দিব্য কর্ম্ম এই স্বভাব-নিহিত ঈশ্বর-কামেরই সহজ স্বতঃস্ফূর্ত্ত লীলামূর্ত্তি।

করার কিছু নাই, ব্রহ্মমূর্ত্তি স্বভাব-বশেই যেমন রূপ পরিগ্রহ করে, তেমনি যোগ-বীর্য্য যথাসম
রূপবন্ত হয়। এই বীর্য্য-চৈতন্ত স্বয়ং ভগবানের দান। যোগীর জীবনযন্ত্রে চৈতন্তের সা
শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ স্পর্শে। সে আনন্দের সীমা নাই। সবই ভাগবত বীর্য্য। সবই তাঁর ঐশ্বর্য
যোগযুক্ত জীবনেই তাহা নিত্য রস ও অমৃতরূপে উথলিয়া উঠে।

অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব

সৎ এক। কিন্তু সত্য বহু-বিচিত্র। সৎ হইতেই সত্য। সত্য কখনও দুই, কখনও বহু বা অসংখ্য। দুই লইয়া যেমন এক পূর্ণ, তেমনি সেই এক ও দুই হইতেই আবার দিব্য গণিতের অনুক্রমে বহুধা-বিভক্ত অসংখ্য সৃষ্টি বিসৃষ্ট হইয়া পূর্ণকে যেন পুনঃ পূর্ণতর করে। এমনই করিয়াই পূর্ণ হইতে পূর্ণ অথবা পূর্ণ দিয়াই পূর্ণ আপনাকে পুনঃ পুনঃ পূর্ণতর করার নিত্য লীলা সম্পন্ন করিয়া চলে। এই তত্ত্ব শুধু চিন্তা-জগতেরই নিয়ম নহে, ইহা বিশ্ব-জীবনেরও উত্তম রহস্য। বাঙালীর মৌলিক দার্শনিক আবিষ্কার যদি কিছু থাকে, তাহা এই অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব। ইহা বাঙালীজাতিরই অপরূপ জীবনদর্শন। সঙ্ঘের সৃষ্টি ও পুষ্টি, জাতির সংগঠন—জীবন-সাধনার সকল সূত্রই এই জীবনদর্শনে মিলিবে।

সৎ আছেন। তিনি নিত্য অস্তি-স্বরূপ। তাঁর সবখানি কিন্তু চৈতন্য দিয়া অনুলিপ্ত। সৎ ও চিৎ তাই অভিন্ন তত্ত্ব। কিন্তু সৎকে, চিৎকে পৃথক্ কল্পনা করিয়া না ভাবিলে, ভাবনার স্পষ্টতা হয় না। তাই ভাবলোকে বা কল্পলোকে সৎ-চিৎ পৃথক্ তত্ত্ব। এইখানেই ভেদ আসিয়া অভেদকে বিশিষ্ট করিল। ভেদাভেদ জীবনদর্শনে এই চিন্তা-সূত্রে যে বিশেষণ, তাহা স্বয়ং কিন্তু অচিন্তনীয় অর্থাৎ তর্কবুদ্ধির অগম্য।

যাহা সচ্চিৎ, তাহা তত্ত্বহিসাবে নির্ব্যক্তিক অর্থাৎ অপৌরুষেয়। কিন্তু তত্ত্ব লইয়া ভাবনা চলে, জীব[illegible] না। আমাদের হৃদয় চাহে অব্যক্ত তত্ত্বের ব্যক্তিরূপে অভিব্যক্তি—তত্ত্বের আত্মবিগ্রহ। সৎ যখন জ্ঞাতা, চিৎ তখন ইচ্ছাময়ী জ্ঞানশক্তি। ইহা বিদ্যাবিদ্যাময়ী। জ্ঞাতা শিবস্বরূপ; শক্তি চিন্ময়ী—ইহাই তন্ত্রমূল শিব-শক্তি-রহস্য। আবার সৎ যখন ভোক্তা, আনন্দভুক্ পুরুষ, চিৎ তখন তাঁহারই হ্লাদিনী প্রকৃতি। ইহাই প্রেমানন্দঘন রাধাকৃষ্ণের তত্ত্বমূর্তি। বৈষ্ণব শাস্ত্র ও সাধনায় তাহাই যুগলোপাসনার নিগূঢ় রস-রহস্য।

সৎ ও চিতের এই হরগৌরী বা রাধাকৃষ্ণ ভাব চিন্তা ও আরাধনায় বিভিন্ন হইলেও, আবার মূলতঃ অভিন্ন। যাহা তত্ত্বতঃ এক, তাহাই উপাসনায় বিচিত্র। এখানেও আবার সেই অচিন্ত্যভেদাভেদ দর্শনই চিন্তালোকে ও সাধন-জগতে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য বিধান করে। তন্ত্রে, ভাগবত শাস্ত্রে কোনও অধ্যাত্মবিরোধই আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

যেমন জ্ঞাতা ও জ্ঞান লইয়াই চিন্তাজগৎ, তেমনি প্রেম ও আনন্দ লইয়াই রসজগতের উদ্ভব ও বিলাস, সৃষ্টি ও পরিচয়। বলিয়াছি—জ্ঞাতা শিবস্বরূপ, চিচ্ছক্তিই চণ্ডী বা শিবশক্তি। কখনও দুর্গা, কখনও কালী। এখানেও ভাবভেদে নামভেদ ও রূপভেদ—আবার সেই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব। রাজা সুরথ দুর্গামূর্তিতে চণ্ডিকার আরাধনা করিয়া হৃত স্বরাজ্য ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। রামপ্রসাদ, ঠাকুর রামকৃষ্ণ "কালী, কালী" নামে দিব্যোন্মাদ হইয়া সাধনজগতে নব সৃষ্টির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ভাবুক শাক্ত বা তান্ত্রিক যে কোনও ভাবেই শক্তির আরাধনাপূর্ব্বক দেবীর কৃপায় সিদ্ধকাম ও সর্ব্বার্থ-সিদ্ধির অধিকারী হইতে পারেন।

রস-সাধকের মার্গ বিভিন্ন; কিন্তু সাধনরহস্য প্রায় একই। রসপিপাসু ভক্ত সৎকে রসঘন, আনন্দঘন পুরুষরূপে চিন্তা করিতে ভালবাসেন। আনন্দ-বীজই কাম্য। চিচ্ছক্তি তাঁহার হৃদয়ে প্রেমময়ী রাই-রূপে ফুটিয়া উঠেন। এই প্রেমময়ী প্রকৃতিই শ্রীরাধা। আনন্দ-বীজই কৃষ্ণ-তত্ত্ব।

বাংলার রসিক সাধক গাহিয়া গিয়াছেন—

> বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
> কাম-গায়ত্রী, কাম-বীজে যার উপাসন॥

ইহা রস-তত্ত্বেরই বীজ-মন্ত্র। নবীন মদন আর কেহই নহেন, নিখিল আনন্দ-বীজ, সেই রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ। কাম-বীজ আর আনন্দ-বীজ একই কথা। সৎকে কাম-বীজ-

রূপে চিনিতে ও পাইতে হইলে, কাম-গায়ত্রীরূপা শ্রীরাধিকারই শরণাপন্ন হইতে হয়।

কাম-রাধা, প্রেম-রাধা, নিত্য-রাধা—একই আত্ম-প্রকৃতির ত্রিধা-বিভিন্ন রূপ। ইহা সাধনারই স্তর-বিশ্লেষণ মাত্র। কাম-ভাব প্রেমভাবে শুদ্ধ ও রূপান্তরিত করিয়াই নিত্যানন্দময়ী দিব্য প্রকৃতির অধিকারী হইতে হয়।

বাংলায় তন্ত্র ও ভাগবত নাম ও রূপ লইয়া ফুটিয়াছে। বাঙালী শক্তি ও রস-সাধনার সিদ্ধ অধিকার লইয়া জন্মিয়াছে। হে উদীয়মান জাতি, শক্তির উপাসনায় ঋদ্ধি-সিদ্ধি, দিব্য জীবন, প্রেমের আরাধনায় দেবগোষ্ঠী, সঙ্ঘ ও জাতি-চক্র-সংগঠনের বৈজ্ঞানিক সাধনকৌশল অবগত হইয়া অগ্রসর হও—শ্রীগুরু-প্রসাদে এই ঘোরতর দুর্দ্দিনেও সকল দুর্যোগ সুযোগে পরিণত হইয়া, অচিরাৎ তোমাদের কৃতকৃতার্থ করিবেই।

উপাসনা

উপাসনা—অধ্যাত্মযোগ। অধ্যাত্ম—কেননা, আত্মার মধ্যে যোগের অনুভূতি পাইতে হয়। গীতায় আছে—স্বভাবোঽধ্যাত্ম উচ্যতে। স্বভাবই অধ্যাত্ম। স্ব-ভাব নিজের ভাব, যাহা নিজের মধ্যেই পাওয়া যায়। উপাসনা আসলে তাই অন্তরের বস্তু। যোগ—ঈশ্বরের সঙ্গে। আত্মাই স্ব-প্রকৃতির ঈশ্বর। বিশ্ব-প্রকৃতির ঈশ্বর যিনি, তিনি বিশ্বেশ্বর, পরমাত্মা বা পরম পুরুষ। যোগ আমার সহিত তাঁহার অর্থাৎ জীবে ও পরমেশ্বরে যুক্তি। এই সংযুক্তিরই বিধান বা প্রকরণ—উপাসনা।

উপাসনার সহায় মন্ত্র। মন্ত্র ঈশ্বরের নাম। ইহা ইষ্টেরই প্রতীক বা শব্দমূর্ত্তি। শব্দ ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত; আবার শব্দই ব্রহ্ম। যেমন আমাদের ভাব ভাষাকে প্রকাশ করে; আবার ভাষাকে আশ্রয় করিয়াই ভাব নিজেও পরিস্ফুট হয় বলিয়া ভাষাকে ভাব-রূপও বলা যাইতে পারে। মন্ত্র-রূপ শব্দব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া উপাসনার বিধান শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। সর্ব্বদেশের, সর্ব্বযুগের সাধন-সমাজেই ইহার প্রচলন আছে।

উপাসনা—সাধন। সাধ্য—ঈশ্বরযুক্তি। মন্ত্রশক্তির সহায়ে সাধকের চিত্ত একাগ্র হয়, সমাহিত হয়। শান্ত-সমাহিত চিত্তেই ঈশ্বর-স্বরূপ প্রকাশিত হয়। মন্ত্রের বিজ্ঞান আছে। বেদ স্বয়ং মন্ত্রময়। মন্ত্র বর্ণরূপে দৃশ্য; ইহা শব্দশক্তির লিখিত মূর্ত্তি। কিন্তু আসল শব্দশক্তি বাক্ ও শ্রুতিগ্রাহ্য ভূতক্রিয়া। ক্রিয়ামাত্রের মূলে আছে চৈতন্য বা চিৎশক্তির স্পন্দন। শব্দশক্তির ভৌতিক স্পন্দন চিত্ত-মধ্যে যে চিন্ময় স্পন্দনের প্রতিক্রিয়া তুলে, তাহাই জীবচৈতন্যের জাগরণের সহায়ক হয়। মানবের চিন্তাযন্ত্র ইহাতে উদ্বুদ্ধ ও ক্রিয়াশীল হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র প্রকাশ প্রবুদ্ধ চিন্তাযন্ত্রের মধ্য দিয়াই মানবের নিকট ধরা দেয়। উপাসনার সাহায্যে একাগ্রচিত্ত সাধক ঘুমন্ত চেতনার জাগরণ ও তৎফলে অসাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রকাশ আপনার অন্তরে প্রত্যক্ষ করে।

উপাসনা চিন্তাসৃষ্টিও করে। এই চিন্তা ভাবঘন কল্পসৃষ্টি। ভাবনা স্বারূপ্য দান করে। যে যাহা ভাবে, সে তাহাই হইতে পারে। এক দিনেই সব কিছু হয় না; ধীরে ধীরে অব্যক্ত আদর্শ কল্পনায় রূপ গ্রহণ করে। স্রষ্টার সৃষ্টিকার্য্য চিন্তারই কল্পনা ও রচনা বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক মানুষই স্রষ্টা; কেননা, সকলে সেই একই পরম স্রষ্টার বিশেষ চিন্তাকেন্দ্র মাত্র। আমরা যাহাকে বস্তু বা পদার্থ বলি, তাহা যেমন সত্য, চিন্তাও তেমনি অথবা ততোধিক সত্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। চিন্তার আকর্ষণে বস্তুশক্তির সন্নিবেশ অথবা বিকর্ষণে বস্তুশক্তির বিচ্ছুরণ—ইহা খুব অলৌকিক ঘটনা নহে। উপাসনা বিশুদ্ধ চিন্তার উদ্বোধনেই মন ও ইন্দ্রিয়ক্রিয়ার পরিশুদ্ধি বিধান করে; ধীরে ধীরে আমাদের স্নায়ু ও দেহকোষগুলি [illegible] ও স্বচ্ছ হইয়া উঠে।

উপাসক ইষ্টের বাণী পায়, প্রেরণা পায়। উপাসকের হৃদয়ে গুরুশক্তির জ্যোতির্ম্ময় রূপ প্রতিবিম্বিত হয়। উপাসনার মধ্য দিয়া অন্তর্জ্জীবন ও বহির্জ্জীবনের বহু সমস্যার সুমীমাংসা আপনি ফুটিয়া উঠে, জীবনের গতি সুনিয়ন্ত্রিত হয়। উপাসকের কর্ম্মজীবনে যে সাফল্যের বিদ্যুচ্ছক্তি সহজ স্বতঃসিদ্ধ ক্রমে ও ছন্দে বিকশিত হয়, এমন আর কিছুর দ্বারা হয় না।

সাধকসমষ্টির মধ্যে প্রেম ও ঐক্যনীতির বিকাশও উপাসনার অপরা সিদ্ধশক্তি বলিয়া আমরা পরীক্ষায় অনুভব করিয়াছি। উপাস্যকে উপাসকে যে সহজ, সত্য সম্বন্ধের বন্ধন প্রীতি ও আনন্দ-রসের ঝরণায় নিষিক্ত ও অমৃতময় হইয়া উঠে, এমনও আর কিছুর দ্বারা সম্ভবপর নহে। মণ্ডলীগঠনে তাই উপাসনার প্রয়োজন ও স্থান সর্ব্বপ্রথমে, ইহা আমরা জোর করিয়াই বলিব। বাঙালী ব্যষ্টিশক্তির সমাহারে যদি অপরিমেয় বীর্য্যসম্পন্ন সমষ্টিশক্তির সংগঠনে সত্যই উৎসুক হইয়া থাকে, তাহার সর্ব্বাগ্রগণ্য প্রকরণরূপে উপাসনার আচার-নীতি গ্রহণ করিতেই আমরা পরামর্শ দিব।

বাংলার তরুণ-তরুণী দেশের কেন্দ্রে কেন্দ্রে, পল্লীতে পল্লীতে জাতি-সাধনার প্রকৃষ্ট সাধন এই অমোঘ বিধির উপযোগিতা উপলব্ধি ও তাহা আশ্রয় করিলে, প্রেম ও ঐক্যপূত যে অধ্যাত্মবীর্য্য লাভ করিবে, তাহা আমাদের মুক্তির সুদিনই আসন্ন সন্নিকট করিয়া তুলিবে।

চীন-দিবস

৭ই মার্চ্চ নিখিল ভারত চীন-দিবস পালন করিয়াছে। রাজা ও প্রজা, শাসক-শাসিত উভয়ের আন্তরিক সহযোগিতায় এরূপ ভারতব্যাপী উৎসবের দৃষ্টান্ত ইহাই প্রথম বলিলে অত্যুক্তি হয় না। স্বাধীনতাকামী ও স্বাধীনতাপ্রিয় দুই জাতির স্বার্থ ও আদর্শের যুগপৎ সম্মিলন ও সাহচর্য্যেরও ইহা প্রথম নিদর্শন বলিয়া আমরা ধারণা করিতে পারি। মহাচীনের রাষ্ট্রপতি ও তদীয় সহধর্ম্মিণী স্বাধীনতাসংগ্রামে অগ্নিশুদ্ধ এক মহাজাতির প্রতীকরূপে এদেশে আগমন করিয়া এই শুভযোগ ঘটাইয়াছেন, তাই তাঁহারা ভারত ও ইংরাজ, উভয়েরই আজ সমভাবে ধন্যবাদার্হ। ৭ই মার্চ্চের উৎসবে উভয় জাতির প্রতিভূগণের কণ্ঠে এই উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতারই মুখর বাণী শুনিয়া আমরা সত্যই পুলকিত।

চীন-দিবসের বাণী—জাতীয়তা ও স্বাধীনতারই বাণী। ভারতের পক্ষে এই বাণী আজ গভীর অনুপ্রেরণাময়। পক্ষান্তরে এই ঘটনায় স্বাধীনতাপ্রিয় বৃটনের সত্তা আজ রাজনৈতিক ও সমরনৈতিক হেতুর সমাবেশে এর প্রতি আচরণেও আপনার সত্য খুঁজিয়া পাইল কিনা বলিবে? কিন্তু প্রকৃতির নিষ্ঠুর আঘাতে ও সংঘাতেও কখনও কখনও মানবের চৈতন্যোদয় হইতে দেখা যায়—ইহাও এক প্রাকৃতিক বিধান। হয়ত বৃটিশ জাতির এইরূপে চক্ষু খুলিতেছে ধীর মন্থরে—চীন-দিবস তাহারই প্রমাণ। এই দিবসপালনের শিক্ষা ও প্রেরণা তাই রাজনীতির বাহিরে দাঁড়াইয়াও একটু দেখিবার ও বুঝিবার আছে। কি ইংরাজ, কি ভারতবাসী চীন-দিবস-পালনের মধ্য দিয়া সেই শিক্ষা ও প্রেরণায় অভিষিক্ত হইলে ফল অপূর্ব্ব হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

মুমূর্ষু, অন্তঃকলহে ক্ষতবিক্ষত, কিন্তু মহাপ্রাণ চীন আজ দুর্ভাগ্যের নিষ্ঠুরতম আশীবিষ-দংশনে জর্জ্জরিত হইয়াই নূতন জন্ম পরিগ্রহ করিতে ছুটিয়াছে। মরিয়া হইয়াই সে বাঁচার সত্য পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে। এ দৃষ্টান্ত সমুজ্জল, এ শিক্ষা অমর। চীনের এই অমর প্রাণের সত্য উৎস কোথায়? কেমন করিয়া সে এই অসাধারণ জীবনীশক্তি অর্জ্জন করিল? এ সঞ্চয় কত যুগের কৃষ্টি ও সাধনার ফল, তাহাও এই সঙ্গে ভাবিবার বিষয়। কনফুসিয়স, লাও-ৎসে ও ভারতের বুদ্ধ এবং বুদ্ধ-শিষ্যগণ চীনকে যে অমৃত পান করাইয়া গিয়াছেন, তাহা চীনজাতির মগ্নচৈতন্যে অপরিসীম বীর্য্যরূপে নিগূঢ়ে কার্য্য করিয়া আসিতেছে—এই বীর্য্যই তাহাকে কঠিন ভাগ্যবিপর্য্যয়েও অবিচলিত ধৈর্য্য, অশেষ দুঃখসহ মার বিরাট্ সহিষ্ণুতা ও প্রসিষ্ণুতা সহায়ে জীবনের জাগরণ-প্রেরণায় রূপান্তরিত করার শক্তি দান করিয়াছে। চীনের এই নীতিপ্রাণ ও ধর্ম্মপ্রাণকে আমরা আজ তাহার স্বাধীনতা-সাধনার জ্যোতির্ম্ময় ঘৃতপ্রদীপে অফুরন্ত ঘৃত-স্বরূপ বলিয়াই চিনিয়া লইতে যেন বিস্মৃত বা অক্ষম না হই। স্বাধীনতার কামনা আছে সব মানুষের, সকল জাতিরই; কিন্তু তাহার সাধন-বীর্য্য অর্জ্জন করিতে হইলে, এই সাংস্কৃতিক ভিত্তি অস্বীকার বা উপেক্ষা করা কোন মতেই সমীচিন নয়।

সংস্কৃতি প্রেরণার উৎস। এই সংস্কৃতি যত শুদ্ধ ও গভীর হয়, প্রেরণাও তত স্থায়ী ও দুর্জ্জয় প্রভাবসম্পন্ন

হয়। জাতির চরিত্রে ইহাই অসাধারণ ধৃতি ও সর্ব্বাবস্থা-জয়ী সঙ্কল্পশক্তি প্রদান করে। চরিত্রের এই স্থিতিস্থাপক-গুণ-সম্পন্ন ধৃতি ও সঙ্কল্পবীর্য্যকেই আমরা ধাতুশক্তি (stamina) বলিতে পারি। যে জাতি যত পরিমাণে নীতি ও ধর্ম্ম-সংস্কৃতিপরায়ণ, সে জাতি তত পরিমাণে এই মৃত্যুঞ্জয়ী ধাতুশক্তির অধিকারী হয়। মহাচীনের জাতীয় প্রাণে এই মহনীয় ধাতুশক্তির প্রকাশ পঞ্চবর্ষ শিনো-জাপ সংগ্রামে অতিশয় প্রকটরূপে সর্ব্বজাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বিশ্বমানবের ইহা বিস্ময় ও শ্রদ্ধারই সামগ্রী।

মহাচীনকে আমরাও আজ আত্মজয় ও শুভাগ্রহের অন্যতম প্রতীকরূপে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইতেছি। তাহার নব জাগরণের জাতীয় গুরু ডাঃ সান ইয়াত সেনের ত্রি-নীতি—জাতীয়তা, গণতন্ত্র ও জনশক্তির অন্ন-বস্ত্র-ঋদ্ধি আজ প্রকৃতির অগ্নিপরীক্ষায় যাচাই হইয়া স্বাধীনতা-সাধনার গতিনির্দ্দেশ করিতেছে। মার্শ্যাল চ্যাং কাইজেক তাঁহার নেতৃ-জীবনের প্রথমাঙ্কে চৈনিক জাতীয়তা-রক্ষার নীতিটীকেই প্রধান ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অকপট প্রেরণাই তাঁহাকে চীনের নবজাগ্রত গণশক্তির উপাসক কমিনিউষ্ট দলকে দমন ও উৎখাত করিতে প্রণোদিত করিয়াছিল। সেই সাম্যবাদী দল কিন্তু রুশের সহায়তায় অথবা প্ররোচনায় ডাঃ সানেরই অপর দুই নীতির অনুবর্ত্তনে নিরত ছিল। জেনারেল চ্যাং সুয়ালিঙের সুকৌশল চেষ্টায় জাতীয় নেতা চ্যাং কাইজেক অচিরে অকুণ্ঠচিত্তে তাঁহার খণ্ডনীতির সংশোধন করিলেন ও এইরূপেই মহাচীনের বিচ্ছিন্ন ক্ষাত্রশক্তি ঐক্যলাভের পথ আবিষ্কার করিল। প্রতিবেশী জাপানের দোর্দ্দণ্ড আক্রমণ, তাহার জিগীষু যান্ত্রিক অভিযানে এই ঘুমন্ত জাতির নব জাগ্রত প্রাণ এইরূপেই সংহত ও অখণ্ড ব্যূহবদ্ধ হওয়ার প্রথম সুযোগ পাইল—মার্শ্যাল চ্যাং-এরই নেতৃত্ব আশ্রয় করিয়া।

এই চীনের ঊর্দ্ধদিকে সাম্যবাদী স্বাধীন রুশ, নিম্নে ধর্ম্মপ্রাণ পরাধীন ভারতবর্ষ—এশিয়ার দুই প্রান্তে দুই মেরুর ন্যায় চীনের পৃষ্ঠরক্ষা করিতেছে অথবা চীনই উভয়ের সংযোগে আত্মরক্ষা করিতে চাহিতেছে। রুশের অবদান বস্তুগত; ভারতবর্ষ এতদিন শুধু হৃদয়ের সহানুভূতি জানাইয়াই ক্ষান্ত ছিল, তাহার আর কিছু করার অধিকার ও সুযোগ ছিল না। আজও ভারত এইটুকু ছাড়া আর কিছু স্বাধীনভাবে করিতে সমর্থ বা অধিকারী নহে, ইহা কে না জানে! পক্ষান্তরে, ভারত নিজেই আজ চীনের সহানুভূতি ও সাহায্যপ্রার্থী। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তন এই তিন স্থিতিস্থাপক ধাতুসম্পন্ন জাতিকে আজ পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আকৃষ্ট করিয়া তুলিতেছে। একদিকে ইউরোপজয়ী জার্ম্মাণ, অন্যদিকে এশিয়াজিগীষু জাপান উভয়ের দুর্ব্বার শক্তিসাধনাই ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্ত শক্তিসমবায়কে তদীয় স্বার্থ-সূত্রেই উপরোক্ত ত্রি-শক্তির সাহায্য ও আশ্রয়ক্ষেত্র করিয়াছে। জার্ম্মণী-জাপানকে প্রতিহত করার ধাতুবীর্য্য যদি কাহারও থাকে, তবে তাহা ইহাদেরই আছে। সাম্রাজ্যপতি বৃটন কি ইহা পাঠ করিয়াছে? ঘটনাই উত্তর দিবে। স্বাধীন রুশ ও চীনের ন্যায় স্বাধীন ভারতকে মিত্র-রূপে পাইলে, ইঙ্গ-মার্কিণ যুক্তশক্তি অক্ষশক্তিকে অনায়াসে পরাভূত ও জগতে মুক্তির বিধান প্রতিষ্ঠা করিতে পারে।

এই সঙ্গে এশিয়ার সংস্কৃতি-রক্ষার প্রশ্নও চিন্তাশীল মনে নূতন প্রশ্ন জাগাইয়া তুলে। এশিয়ার সংস্কৃতি-রক্ষার প্রকৃত অধিকারী কে? চীন, জাপান, এশিয়াবাসী রুশ না ভারতবর্ষ? আন্তর্জ্জাতিক শক্তি-সন্নিবেশ এশিয়ার শতকোটী মানবসন্তানকে ধীরে ধীরে এক পক্ষে ব্যূহবদ্ধ করিয়া তুলিতেছে। অন্যপক্ষে পাশ্চাত্যের মূর্ত্ত প্রতিক্রিয়ায়, [illegible] জাপ-সন্তান প্রভুবুদ্ধি ও যন্ত্রবলে বলীয়ান্ হইয়া বন্ধুবেশে আজ এশিয়ার সর্ব্বত্র বাহুবিস্তার ও নব বিধান প্রচার করিতেছে। প্রাচ্যের সংস্কৃতি-রক্ষায় ভারত কোন পক্ষ শ্রেয়ঃ করিবে? ভারতের হৃদয় চীন-দিবসে সাড়া দিয়া জানাইয়াছে—সে মিত্রপক্ষেই। কিন্তু ইহারও চরম উত্তর ভারত-বৃটন সমস্যার চূড়ান্ত সুমীমাংসার উপরেই নির্ভর করিতেছে।

সংস্কৃত ও পালি-সাহিত্যে নারী-কবি

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, পি. এইচ. ডি. (লণ্ডন)

আধুনিক, মধ্যযুগের ও অতীত ভারতের প্রায় প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য সাহিত্যেই অতি উচ্চ স্তরের নারীকবিদের সন্ধান পাওয়া যায়। এ প্রবন্ধে পালি-সাহিত্যের নারী-কবিদের সম্বন্ধে কিছু বলব।

থেরী-গাথা নামক পালি-গ্রন্থে ৭১ জন[১] নারী-কবির পাঁচ শতের অধিক শ্লোক আছে। শ্লোকগুলি নারী-কবিদের কিনা বা কোনও পুরুষ-কবিরা কবিতাগুলি লিখে মেয়েদের নামে চালিয়েছেন কিনা—এ প্রশ্ন হয়ত বা কেহ করতে পারেন। এ সম্পর্কে বলা যেতে পারে—জাল-জুচ্চোরি ধর্মজগতের বরণীয় জিনিষ নয়। থেরী-গাথা ধর্মপুস্তক এবং এ সমস্ত গ্রন্থই জুচ্চোরি হ'বে—এমন ভাবা যায় না। বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে বহু উচ্চশিক্ষিতা রমণীদের বিবরণ ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। সুতরাং নারীরা কবিতারচনাতেও সুদক্ষা ছিলেন, যেমন বৈদিক যুগেও ছিলেন—এ কিছু আশ্চর্য হওয়ার কথা নয়। এ সব নারীকবিদের লেখায় নারীদের মনোগত ভাব, ভাষায় নারীজনসুলভ উচ্ছ্বাসাদি বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়।

সংস্কৃত সাহিত্যের নারী-কবিদের সঙ্গে পালি-সাহিত্যের নারী-কবিদের তুলনা করলে প্রথমেই কবিতার মূল উপজীব্য বিষয় সম্পর্কে অনৈক্য আমাদের চোখে পড়ে। সংস্কৃত-সাহিত্যের নারী-কবিরা ভালবাসেন আমাদের এই সুন্দর জগৎ; আমাদের এই চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, ফল, পুষ্প, লতা, পাতা—আমাদের এই ধরিত্রীর সব কিছু; তার বহিরে যাবার চেষ্টা তাঁরা করেননি। তাঁদের জগৎ জুড়ে' আছেন প্রাণপ্রিয়েরা; বিশ্বপতি যদি থাকেন, ভালই; কিন্তু নিজেদের পতি (বা প্রেমিক) নিয়ে তাঁরা এত ব্যস্ত যে, বিশ্বপতির কথা তাঁরা যে চিন্তাও করেন, এমন ইঙ্গিতও প্রাপ্ত কবিতা-গুলিতে পাওয়া যায় না। অন্যদিকে বৌদ্ধ নারী-কবিদের রচনা আধ্যাত্মিকভাবে পরিপূর্ণ; ধর্মজীবনের উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়, নির্বাণ প্রভৃতি পাওয়ার জন্য তাঁরা ব্যাকুল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বৈচিত্র্য তাঁদের কাছে বড় কথা নয়। অবশ্য পুত্রের শোকে বিহ্বলা জননী, স্বামীর অত্যাচারে জর্জরিত পত্নী প্রভৃতির চিত্র তাঁদের রচনায় আমরা পাই; সেগুলি প্রাসঙ্গিক বিষয় মাত্র। মানুষ যে সব চেয়ে বড় সত্য, আমাদের এ জগৎ যে পরম আনন্দের হেতু, এ সব তাঁরা যেন কখনও ভাবেননি।

সংস্কৃত নারী-কবিদের কাছে প্রেম চিরকালের সর্বস্ব—তার চেয়ে অধিকতর কাম্য বস্তু আর কিছু নেই। আর বৌদ্ধ থেরীদের মতে ঐ প্রেম জিনিষই বন্ধনের হেতুরূপে বর্জনীয়, প্রেম-বস্তুটার প্রতি বৌদ্ধ নারী-কবিরা অত্যন্ত বিরূপ; জাগতিক প্রেমের প্রতি তাঁদের আক্রোশ এত বেশী যে, উহার ব্যর্থতা, অঘন্যতা দেখানোই যেন তাঁদের জীবনের কাম্য বলে' মনে হয়।[২] বৌদ্ধ নারী-কবিরা হ'তে চান জিতেন্দ্রিয়; নারীত্ব বা পুরুষত্বের সীমারেখার সম্পূর্ণ বাইরে তাঁরা থাকতে চান, সত্যদ্রষ্টা ঋষিরূপে পরিচয়ই তাঁদের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। তাই নরনারীর প্রেম তাঁদের কাছে উপেক্ষণীয়।

সংস্কৃত সাহিত্যের নারী-কবিদের রচনা বিবিধ রসে, বিবিধ বর্ণনায়, বিবিধ ভাবে ভরপুর; পালি-সাহিত্যের নারী-কবিদের রচনা বৈচিত্র্যহীন। সংস্কৃতের নারী-কবিরা জাগতিক ব্যাপার, জাগতিক বস্তু নিয়ে ব্যাপৃত, পালি-সাহিত্যের নারী-কবিরা অপার্থিব বস্তু নিয়ে বিব্রত। সংস্কৃতের নারী-কবিরা রূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে, শব্দে অপূর্ব রসের আস্বাদন করেন; পালির মহীয়সীরা এ সব কিছুরই অতীত—পঞ্চতন্মাত্রের অতীত বিষয় নিয়ে ব্যাকুল। সংস্কৃতের নারী-কবিরা ষোল-আনা নারী—রমণী, কামিনী, হাসি-কান্নায় সজীব; প্রাণের অলিগলিতে তাঁদের নিত্য আনাগোনা; কখনও বা বিরহিনী, কখনও বা খণ্ডিতা, মানিনী, বাসকসজ্জা প্রভৃতি বিভিন্নভাবে সকলের হাসি-কান্নার কারণস্বরূপা; আর পালি-সাহিত্যের নারী-কবিরা হাসি-কান্নার অতীত, উদাসীন—ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকতেই তাঁদের আনন্দ। এ বিরুদ্ধপন্থী নারী-কবিদের

১। পটাচারার অনুসরণকারিণীদের দুটী কবিতা বাদ দিয়ে।

২। তুলনা করুন—খেমা, ৫২নং গাথা; ভদ্রা, ৬০নং গাথা; উপ্পলবন্না, ৬৪; সুভা কম্মারধীতা, ৭০; সুভা জীবকম্ব—বণিকা, ৭১ নং, সুমেধা, ৭৩নং গাথা, ইত্যাদি।

কি তবে কোনও বিষয়ে সাদৃশ্য নেই? নারীত্বের দিক থেকে, মনুষ্যত্বের দিক্ থেকে, হৃদয়ের দিক্ থেকে—কোনও দিক থেকে এঁদের সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না?

বস্তুতঃ, এ-বিরুদ্ধ মার্গাবলম্বী নারী-কবিদের মধ্যে একটী বিশিষ্ট বিষয়ে মিল আছে। পুরুষদের বিরুদ্ধে এ উভয় দলের কারও কোনও অভিযোগ নেই। শুচিত্ব, আধ্যাত্মিক জগতে উন্নতি, বৈরাগ্য প্রভৃতি বিষয়ে বল্‌তে গেলে তো কথাই নেই—অন্য সময়েও পুরুষ কবিরা নারীদের বিষয়ে অনেক সময়ে কটাক্ষ করে ক্ষান্ত হন না, অপমানসূচক বাক্যপ্রয়োগ করতেও বিমুখ নন। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের নারী-কবি বা বিরুদ্ধমার্গাবলম্বী, বিরুদ্ধভাবাবলম্বী থেরী—কেহই পুরুষদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা সমীচীন মনে করেননি। এমন কি, পুরুষেরা যখন অত্যাচারে তাঁদের জর্জরিত করে' তুলেছেন, তখনও তাঁরা নারীসুলভ সৌজন্যে, হৃদয়ভরা অনুকম্পায়—পুরুষদের বিষয়ে কোনও কটূক্তি করেননি। বরং নিজের কপালের দোষ বলে' সব দোষ নিজের ঘাড় পেতে নিয়েছেন, নীরবে সব লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন। ইসিদাসীর[৩] কাহিনী এ বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পর পর তিনটী স্বামীর ঘরকন্না তিনি করেছেন, মনঃপ্রাণ সমর্পণ করে' তাঁদের সেবা করেছেন, সর্বতোভাবে তাঁদের সুখী করার জন্য তিনি তিলে তিলে নিজের জীবন দুঃখের অনলে দগ্ধ করেছেন—তবু কারও কাছ থেকে কিছুমাত্র সহানুভূতি, কিছুমাত্র সুখ পাননি। ইসিদাসীর তবু কারও সম্বন্ধে অভিযোগ নেই, তাঁর মতে সব দোষ তাঁর নিজের, তাঁর ভাগ্যের—এত সেবাতেও যে স্বামি-মহাশয়েরা তুষ্ট হলেন না, সেও তাঁর দোষ, এ তাঁর মত। পুরুষেরা মনে করেন—সংযমের অভাব যদি তাঁদের ঘটে, তার জন্য তাঁরা দায়ী নন, তার জন্য দায়ী ঐ অ-বলা নারীরা। অপরাধ—তাঁরা আছেন কেন, না থাকলে তো জঞ্জাল মিটিয়ে যেতো; আর আছেনই যখন, —তখন পুরুষদের ত্রুটিবিচ্যুতির গুরু পসরা তাঁদের মাথায় নিয়ে বেড়াতে হ'বে। নারীরা মাথা নেড়ে বলেন —ঠিক তো; সবি আমাদের দোষ—তোমরা সর্বতোভাবে সুখী হও—আমাদের কোনও রকম সুখের বালাই নেই; তোমাদের সুখ হ'লেই আমাদের সুখ, সব ভাল। পুরুষ ভাবেন—ঐ ভাল। নিজের দোষ পরের ঘাড়ে, পুরুষের ঘাড়ে, চাপাবার বদ্ রোগ নারীদের নেই। নারী বলেন —চিত্তচাঞ্চল্য যদি ঘটে, দোষ যদি হয়, তার জন্য পুরুষেরা দায়ী নন, দায়ী নারী নিজে।[৪]

নিজের চিত্তচাঞ্চল্যের জন্য নিজকে দোষী সাব্যস্ত করে' সীহা আত্মহত্যা করতে কৃতসঙ্কল্পা হ'লেন, পুরুষদের তিলমাত্র দোষারোপ করলেন না।[৫] বিমলাও ভূতপূর্ব দোষের জন্য নিজকেই একমাত্র অপরাধী ভেবে গুরু প্রায়শ্চিত্তের জন্য ব্রতী হ'লেন; পুরুষদের বিরুদ্ধে তাঁরও কোনও অভিযোগ নেই।[৬] এমন কি, যখন তাঁদের মনে হচ্ছে যে প্রেমিকের বেশে[৭] বা অন্য কোনও ছলে[৮] মার তাঁদের উপর আধিপত্য বিস্তার করছে, তাঁদের সর্বনাশের চেষ্টা করছে, তখনও পর্যন্ত তাঁরা নিজেদের দৈন্য স্বীকার করে' নেন, সব দোষ নিজের বলে' মেনে নেন—তা'তেও পুরুষদের কোনও দোষের কোনও সন্ধান পান না। শুধু তা' নয়—যে সুন্দর চোখ তাঁদের মতে পুরুষদের চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ হয়, তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট করে—সে চোখ উপড়িয়ে ফেল্‌তেও তাঁরা দ্বিধা করেন না; সুভা জীবকম্ববনিকা স্বহস্তে নিজের সুন্দর চোখ উপড়িয়ে ফেলে নিজের সৌন্দর্য বিনষ্ট করলেন।[৯] সুমেধার প্রেমিক তাঁর তপস্যায় নিরন্তর বাধা দেওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁকে কোনও দিন তিরস্কার করেননি; বরং অতি শান্তভাবে, যথাসাধ্য কোমলতায় ভরপুর হয়ে তাঁকে তাঁর অভিপ্রায়, তাঁর সাধনমার্গে অগ্রসর হওয়া প্রভৃতির বিষয়ে বোঝালেন, কঠোরতা বা কটূক্তির আশ্রয় তিনি গ্রহণ করেননি।[১০]

[illegible] দোষ নিজের মাথায় পেতে নেওয়ায় নারীদের যে কত বড় মহত্ত্ব, তা' থের-গাথা নামক পুস্তক তুলনা করলেই

৩। ৭২নং গাথা।

৪। এ গাথাগুলি দেখুন—সামা, ২৯নং; উত্তমা, ৩০; বড্ঢেসী, ৩৮ প্রভৃতি।

৫। ৪০নং গাথা।

৬। ৩৯নং গাথা।

৭। যথা, অনোপমা, ৫৪নং গাথা।

৮। যথা, খেমা, ৫২নং গাথা; জন্তা, ৫৬নং গাথা; উপচালা, ৬০নং; সিসুপচালা, ৬১; ইত্যাদি।

৯। ৭১নং গাথা।

১০। ৭৩নং গাথা।

বোঝা যায়। এ গ্রন্থ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের রচিত। এ গ্রন্থের সর্বত্র দেখা যায়—পুরুষদের সব রকম দোষের জন্য নারীরা দায়ী; তাঁরাই পুরুষদের সর্বনাশের হেতু, ইত্যাদি। কিন্তু থেরী-গাথার কোথাও পুরুষের বিরুদ্ধে কিছুমাত্র অভিযোগ নেই। সংস্কৃত বা প্রাকৃত সাহিত্যের নারী-কবিদের কবিতাতেও নারীদের এই বিশেষত্ব সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ দেখা যায়। পুরুষদের নিয়ে যাঁদের ঘর-সংসার, যাঁদের সব কিছু, সেই সংস্কৃত বা প্রাকৃত সাহিত্যের নারী কবিদের পুরুষদের বিষয়ে অভিযোগহীনতা স্বাভাবিক। প্রাকৃত কবি রোহা তো স্পষ্টই বলেছেন যে, পুরুষদের না হলে যখন নারীদের চলে না, তখন পুরুষ খারাপ বলে' ঘোষণা করে' বা পুরুষদের দোষারোপ করে' কোনও লাভ নেই নারীদের; আগুন নগর পোড়ালেও উহা কায় না প্রিয়?[১১] প্রাকৃত কবি শশিপ্রভাও এ সত্য মেনে নিয়েছেন।[১২] কিন্তু থেরী-গাথার কবিদের বিষয়ে এ সত্য খাটে না। তাঁরা তো পুরুষদের সঙ্গপ্রত্যাশী নন, তাঁদের প্রশংসারও কাঙ্গাল নন। সুতরাং তাঁরাও যখন পুরুষদের কোনও দোষারোপ করেন নি, তখন এ বলা যেতে পারে, নারীরা নারীদের দোষসন্ধানে যতই তৎপর হউন না কেন, পুরুষদের দোষ দেখতে বা দেখলেও বল্‌তে তাঁরা সর্বদা পরাঙ্মুখ। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, বৈদিক নারী-ঋষিরাও কোথাও পুরুষদের দোষারোপ করেন নি কিছুর জন্য—যদিও নিজেদের সগোত্রাদের দোষপ্রদর্শনে তাঁরা বিমুখ হন নি।

সংস্কৃত-সাহিত্যের নারীকবিদের সঙ্গে পালি-সাহিত্যের নারীকবিদের আরও একটী বিষয়ে বিশেষ মিল আছে। থেরীরা "নির্বাণ" প্রভৃতি অধ্যাত্মবাদ বরণীয়, অনুসরণীয় মনে করে' সাধনমার্গে অগ্রসর হয়েছেন বটে; কিন্তু তাঁরা কি সত্যি জগতের প্রতি বিরক্ত? তাঁরা কি সত্যি সাংসারিক জীবন উপেক্ষণীয় মনে করেন? তাঁদের বৈদিক, সংস্কৃত, প্রাকৃত সাহিত্যের অন্তর্গত কবি-ভগিনী[illegible] তাঁরাও কি সত্য মনে করেন না যে, ভালবাসাই জগতের প্রকৃষ্ট বস্তু; প্রেমই জীবনে মরণে সব কিছুর সেরা জিনিষ? অবশ্য নির্হেতুক বৈরাগ্যহেতু থেরীদের মধ্যে কয়েকজন যে প্রেম উপেক্ষা করেছেন, এমন কি, অত্যন্ত সৎপাত্রেরও—তার উদাহরণ থেরী-গাথাতেই আছে।[১৩] ধম্মা স্বামীর প্রিয়পাত্রী হয়েও সংসার ত্যাগ করে' ভিক্ষুণী হবার চেষ্টা করেন; স্বামীর জীবিতাবস্থায় তাঁর আদেশ না পেয়ে তাঁর মৃত্যুর পর তিনি সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করেন।[১৪] ধনিকন্যা সুন্দরী অনোপমার বহু করপ্রত্যাশী এল গেল, কিন্তু তিনি বিবাহে সম্মতি দিলেন না।[১৫] শুভা[১৬] ও রোহিণীর[১৬] ধনদৌলতের কিছুই অভাব ছিল না, কিন্তু বিবাহে তাঁদের সম্মতির অভাব। সুমেধা রাজপুত্র পাণিগ্রহণার্থীকে বিফলমনোরথ করে' নিজে হলেন সন্ন্যাসিনী, মাতাপিতাকে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত করে নিলেন।[১৭] কিন্তু এ থেরীগাথাতেই দেখ্‌তে পাই বেশীর ভাগ নারীরা থেরী হয়েছিলেন প্রেমহারা হ'য়ে, শোকাতুর হ'য়ে বা [illegible] অন্য কোনও কারণে সংসারের কাছ থেকে আঘাত পেয়েই তাঁরা সংসার ত্যাগ করেছিলেন, তার আগে নয়। গুরুতর শোকে, দুঃখে বা স্নেহ-মায়া-মমতা ভালবাসার বিপর্যয়ে নারী থেরী হন। সুখের সংসার প্রাণভরা ভালবাসা, আদর-সোহাগ, স্নেহের পুত্তলি পুত্রকন্যা ছেড়ে জগতে বেশীর ভাগ নারীই সাধনমার্গ অবলম্বন করে' কৃচ্ছ্রসাধনাদি অভিলাষ করেননি থেরীদের অনেকের কবিতা থেকেই এ সত্য যে সুস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে, তা' অস্বীকার করার উপায় নেই।[১৮]

পালি-সাহিত্যের নারী-কবিরা সহেতুক বৈরাগ্যবশত হোক, বা নির্হেতুক বৈরাগ্যবশতঃ হোক—ধর্ম-জীবন অবলম্বন করেছিলেন এবং জীবনের উচ্চ আদর্শ অনুসরণ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টাও করেছিলেন। তাঁদের কবিতাগুলি উচ্চ আদর্শপ্রসূত। বৌদ্ধ ধর্মের পূর্ণ সত্য তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন এবং তা' অতি সুন্দর ভাষায় প্রকাশ করে গিয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনে আধ্যাত্মিক পরিপুষ্টির দিক থেকে থেরীদের কবিতা অনবদ্য। জগতের প্রত্যো[illegible] ধর্ম নারীদের কল্যাণে পরিপুষ্টি লাভ করেছে। নিজেদের বলি দিয়াও তাঁরা ধর্ম রক্ষা করেছেন, সঙ্ঘ রক্ষা করেছেন ধর্মের সর্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টি সংসাধিত করেছেন।

১১। গাথা-সপ্তশতী, ২।৬৩, জেন বিণা ন জিবিজ্জই ইত্যাদি
যেন বিনা ন জীব্যতেঽনুনীয়তে স কৃতাপরাধোঽপি।
প্রাপ্তেঽপি নগর-দাহে ভণ কস্য ন বল্লভোঽগ্নিঃ॥

১২। গাথা-সপ্তশতী ৩।৪, জহ জহ বাঅই, ইত্যাদি—
যথা যথা বাদয়তি [illegible] তথা তথা প্রত্যানি চকমে প্রেমি।
[illegible]

১৩। ১৭ নং গাথা।

১৪। ৫৪ নং গাথা। ১৫। ৫৬ নং গাথা। ১৬। ৬৭ গাথা। ১৭। ৭৩ নং গাথা। ১৮। ইসিদাসী ৭২ নং, মুত্তা, ১১ নন্দা, ১৯; বড্ডমাতার জননী, ৬৫ নং, সামা, ২৮ নং; উব্বিরি, ৩৩ নং পটাচারা, ৪৭ নং; [illegible], বাসিট্‌ঠি, ৫১ নং, কিসা গোতমী ৬৩ নং; তথা সুজাতা[illegible], উব্বরী, ৬২ নং, ইত্যাদি।

ঘর ও বাহির

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

মঙ্গলা কেবলমাত্র বৃন্দাবনে যাওয়ার ব্যবস্থা ঠিক কর্‌ছিল, এমনই সময়ে এসে পড়ল নীলমণি। মঙ্গলা তাতে একদিক্ দিয়ে যেমন খুসি হতে পারলে না, অন্য দিক্ দিয়ে তার মাথা হতে যেন দারুণ একটা বোঝা নেমে গেল।

বৃন্দাবনে যাওয়ার সখ তার কোন দিনই হয় নাই, এখনও হতো না। চিরটাকাল তার এক ভাবেই কেটেছে, আজও ঠিক কেটে যেতো। লোকে বলতো সে একা, মুখে সেটা স্বীকার করতে বাধ্য হলেও মঙ্গলা জানতো বাস্তবিক সে একা নয়। যার সংসারে পাঁচটা গরু, গোটা ছয়েক কুকুর-বিড়াল, সে একা কখনই নয়। তার সারা দিন ছুটি নাই শুধু এদেরই জন্য—খাটনি লেগেই আছেই।

লোকে বলে—বেচারা বাড়ীতে কারও সঙ্গে কথা বলতে পায় না, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা নয়, কারণ যে কেউ তার বাড়ীর কাছ দিয়ে গেলে স্পষ্ট শুনতে পাবে, সে কথা বল্‌ছেই—কখনও গরুর সঙ্গে, কখনও কুকুর-বিড়ালের সঙ্গে। বিকেলে-সকালে ঘাটে গেলে দেখা হয় পড়সীদের সঙ্গে, কথাও হয়—ঝগড়াও বাধে এবং সে ঝগড়ায় জয়লাভ করে' সগর্ব্বে সে ফিরে আসে বাড়ীতে। অতএব মানুষের সঙ্গে কথা বলার অভাব তার নাই, ক্ষোভও নাই এতটুকু।

যেদিন বাইরে পরাজিত হয়ে আসে, সেদিন সে ঝাল ঝাড়ে নিতান্ত অবোলা এই পোষা প্রাণীদের উপর—বিড়ালগুলো ঝাঁটা খায়,' গরুগুলো হাম্বারবে পাড়া মাত করে।

লোকে জানে মঙ্গলার হাতে বেশ দু' পয়সা আছে, অনেকে তার খোসামোদ করে মন ভুলিয়ে যাতে কিছু বাগাতে পারে, তার চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু সে বড় কঠিন ঠাঁই—মঙ্গলার কাছে কেউ পাত্তা পায়নি। একবার সিঁদ কেটে চোরও ঘরে ঢুকেছিল এবং মঙ্গলাই সে চোর ধরেছিল। গায়ে তার শক্তি প্রচুর, বেচারা রামধন তা জেনেও কেবল স্বভাবদোষে আর মেয়েছেলে কিছু করতে পারবে না ভেবেই সিঁদ দিয়েছিল। মঙ্গলা যে পেছন হতে তাকে অমন করে সাপটে ধরবে এবং সঙ্গে সঙ্গে দড়ির ফাঁদ দিয়ে আটক করে উপর্য্যুপরি নূতন তৈরী নারকেলের ঝাঁটা বসিয়ে কাবু করবে, তা সে স্বপ্নেও ভাবেনি।

যাই হোক, অবশেষে মঙ্গলাই তাকে অশেষ দয়া করে ছেড়ে দিয়েছিল। চোর ধরার শক্তি তার থাকলেও সে মেয়ে, তাই ম্যালেরিয়ায় আধখানা দেহ শক্তিহীন রামধনের কাতর রোদনে তার মন গলে গিয়েছিল এবং ব্যাপারটা বাইরে জানাজানি না করে সে রামধনকে করুণা করেছিল।

সে কাউকে কিছু না বললেও কথাটা কিন্তু গোপন থাকেনি, রামধনের গায়ে ঝাঁটার দাগ এবং ক্ষতগুলোই তাকে ধরিয়ে দিলে।

এরপর রামধন আসক্ষোচেই স্বীকার করে, মা ঠাকরুণের গায়ে যে অমন হাতীর মত জোর আর বুকে অতটা সাহস আছে, তা যদি সে জানতো তবে লাখ টাকা পাওয়ার জন্যও সে ও-বাড়ী যেত না।

যাই হোক, তারপর হতে যারা এরকমভাবে মঙ্গলার টাকা নেওয়ার চিন্তা করছিল, তারা সাবধান হল, এবং রামধন হয়ে পড়লো মঙ্গলার পরম ভক্ত। আজকাল মঙ্গলার যা কিছু বাইরের কাজ রামধনই করে দেয়, সকালে গিয়ে আগে প্রণাম করে আসে।

লোকে তাকে দাগী চোর বলে জানে, কাজেই কেউ কিছু বললে সে হাসে, স্পষ্টই বলে—"বাপরে, মা-ঠাকরুণের হাতের জোর আছে বটে! আমার মত একটা লোককে কায়দা করে অমনভাবে বাঁধা—অমন বেদম ঝাঁ[illegible]ড়ি-মারা আর কেউ পারতো না। উনি আমার [illegible] মা ছিলেন তাই ঝাঁটা মেরে বদ অভ্যেসটাকে ছাড়িয়ে দিলেন।"

ঠিক এমনই সময়ে কোথা হতে উপনীত হলেন মঙ্গলার শ্বশুর বংশের গুরুদেব।

কোন্ কালে সাত বৎসর বয়সে বিবাহ হয়েছিল, তার পরই বিধবা হয়ে মঙ্গলা পিত্রালয়ে চলে আসে, শ্বশুরালয়ে কে আছে না আছে তাও সে জানে না। গুরুদেব গন্ধে গন্ধে সম্পর্ক বার করে কোন্ দূর নবদ্বীপ হতে এসে উপস্থিত হয়েছিল দেখে সে মোটেই খুসি হতে পারলে না।

বৃদ্ধ গুরুদেব যেমন তেমন করে মন্ত্রটা দিয়ে ফেললেন। বেশ বুঝেছিলেন, শিষ্যার সংসার-আসক্তি এই সব গরু বিড়াল নিয়ে, তাই তিনি বুঝালেন সংসার অনিত্য। মঙ্গলার বয়স হয়েছে, এখন আর গরু-বেড়ালের মায়ায় জড়িয়ে না পড়ে বৃন্দাবনে যাওয়াই উচিত। মায়া সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন; রাজা ভরতের গল্পটাও শুনালেন।

মঙ্গলা ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

এক হরিণ-শিশু পুষে সর্ব্বত্যাগী রাজা ভরতের সে কি লাঞ্ছনা! মঙ্গলার বুক কাঁপে। পায়ের কাছে বিড়াল-শিশুগুলো নির্ভাবনায়, নিরুপদ্রবে ঘুমায়। গোয়ালে গো-শাবক হাম্বা রবে চীৎকার করে।

সময় বুঝে গুরুদেব জলদ্‌গম্ভীর কণ্ঠে আবৃত্তি করলেন—'কা তব কান্তা কাস্তে পুত্রঃ' ইত্যাদি। অর্থ না বুঝলেও মঙ্গলা স্তব্ধ হয়ে থাকে।

গুরুদেব দীক্ষা দিয়ে নিজের দক্ষিণা নিয়ে নবদ্বীপ যাত্রা করেন নিতান্ত বাধ্য হয়ে, পত্র এসেছে তাঁর ছেলেটার খুব অসুখ। কাতরা মঙ্গলা তাঁর পা জড়িয়ে ধরে চোখের জলে ভিজিয়ে দিয়ে বল্‌লে, "আমার উপায় কি হবে গুরুদেব?"

গুরুদেব নামাবলীর প্রান্ত দিয়ে চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে সজল কণ্ঠে বল্‌লেন, "যাওয়ার সময় বাধা দিয়ো না মা, তোমার উপায় কৈবল্যদায়িনী রাধারাণীই করবেন। দু' দিন অপেক্ষা কর, আমি একমাস পরে ওদের নিয়ে এখানে আসব, তখন যা হয় করা যাবে।"

মঙ্গলার [illegible] ঘরবাড়ী, কুড়ি পঁচিশ বিঘা প্রচুর ফলন্ত ধানের জমি, পুষ্করিণী, বাগান প্রভৃতি গুরুদেবকে আকর্ষণ করেছে বড় কম নয়। এখানে এসে মাসখানেক সপরিবারে কাটিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা তিনি করেছে[illegible] হলে হয়।

মঙ্গলা আশায় রইলো গুরুদেব শীঘ্রই ফিরবেন আর উপায় যা হয় কিছু ঠিক হবেই।

সেই পরম সংসারী মঙ্গলা আজ সম্পূর্ণ অনাসক্ত। ভাগ্যে রামধন আছে তাই গরু কয়টা খেতে পায়, বিড়ালগুলোও মরে নাই।

মঙ্গলা বলে—তার আর সংসারের মায়ায় বদ্ধ হতে ইচ্ছা নাই, যে কোন রকমে সে এখন মুক্তি চায়।

মঙ্গলার গলায় তুলসীর মালা, হাতে হরিনামের ঝোলা ও মালা। সে সকালে বসে সন্ধ্যাহ্নিক করে, নাম জপ করে, আবার সন্ধ্যাতেও তাই চলে। পড়সিদের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ এক রকম বন্ধ, পাছে অবাধ্য রসনাকে সংযত রাখতে না পারে, সেই ভয়ে সে ঘাটেও যায় না। অদ্ভুত পরিবর্ত্তন মঙ্গলার!

ঠিক এই সময়েই এসে পড়লো নীলমণি।

সঙ্গে এলো তার বাবা—মঙ্গলার দেওর গোবর্দ্ধন।

কোন্ কালে মঙ্গলা তাকে দেখেছিল—সমবয়সী গোবর্দ্ধনের সঙ্গে খেলাও করেছিল, সে সব কথা সে ভুলে গেছে। রুক্ষ মূর্ত্তি, শীর্ণ দেহ গোবর্দ্ধন যখন নীলমণির হাত ধরে এসে দাঁড়ালো, তখন মঙ্গলা বিস্মিত চোখে তার পানে চাইলো।

কোন কথা বলবার আগেই গোবর্দ্ধন একেবারে কান্নায় ভেঙে পড়লো—।

অনেক জিজ্ঞাসার পরে মঙ্গলা জানতে পারলে—নীলমণির মা সম্প্রতি মারা গেছে, গোবর্দ্ধন কিছুদিন মনের জ্বালা মিটাতে তীর্থে যেতে চায়, সে কয়টাদিন বউদি যদি ছেলেটাকে রাখে।

মঙ্গলা আকাশ হতে পড়লো। সে-ই বৃন্দাবনে যাওয়ার উদ্যোগ করছে। সঙ্গী পেয়েছে গ্রামেই, মাস তিনেক বাদে আবার ফিরবে। এই মাস তিনেকের জন্য গরু-বিড়াল প্রভৃতির ব্যবস্থাও হয়ে গেছে।

গম্ভীরভাবে সে জানালে—"তা তো হয় না ঠাকুরপো!"

গোবর্দ্ধন একেবারে আকাশ হতে পড়লো,—"হয় না মানে? না রাখলে চলবেই না বউদি। আমি কি চিরকালের মত ছেলের বোঝা তোমার মাথায় চাপাচ্ছি নে কথা দিচ্ছি—ঠিক দিন কুড়ির মধ্যে আমি ফিরব, ওকে ঠিক নিয়ে যাব।"

একটা দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে মঙ্গলা রাজি হয়ে গেল।

যাই হোক গোবর্দ্ধন পরম নিশ্চিন্তে ছেলেটাকে তার হাতে দিল এবং পরম ভক্তিভরে বয়ঃজ্যেষ্ঠা বউদির পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে বিদায় নিলে।

দিন বয় যায়, মঙ্গলা ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠে।

সেই যে বামুনটা বুঝি দিনের মধ্যে ফিরে আসবে বলে গেছে, বুঝি দিনের জায়গায় এক মাস অতীত হয়ে গেল, সে ফিরে এলো না, একখানা পত্রও দিলে না।

নীলমণির ছেলেটা যেন ভিজে বিড়াল। প্রথম কয়টা দিন কেমন শান্ত ও ভদ্রভাবে ছিল, যা বলা যেত তাই শুনতো। দিন যত যাচ্ছে, সে নিজমূর্ত্তি ধারণ করছে। উপস্থিত গ্রামে তার জুড়ি মেলা ভার। এ ছেলেকে নিয়ে দিন যে কি করে কাটবে মঙ্গলা শুধু তাই ভাবে।

গুরুদেব পত্র দিয়েছেন—তিনি কাশী যাচ্ছেন। মঙ্গলাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চান—যেন প্রস্তুত থাকে।

বৃন্দাবন গেল—এবার কাশীযাত্রা—

মঙ্গলা বারাণ্ডায় পা ছড়িয়ে বসে গোবর্দ্ধনকে গালাগালি করছিল—"বসে ভাত দেওয়ার কেউ নয়—কিল মারবার গোঁসাই। কোনকালে নাকি পোলাও খেয়েছি আজও তার গন্ধ শুঁকে ভাত খাব—পোড়াকপাল আমার! এত লোককে যমে নেয়—আমায় তো নেয় না—তাই না আমার মাথায় এই বোঝা চাপে—আরও চাপাচ্ছে। কোনকালে সাত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল—দুটো মাস যায় নি, সিঁথের সিঁদুর মুছে ফিরে এলুম এখানে—সেই গন্ধে গন্ধে কিনা এসে জুটেছে এখানে—ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে এই এক অনামুখো হতচ্ছাড়া ছেলেকে। আমার জাতজন্ম সব খেল, আমার ধর্ম্ম-কর্ম্ম রসাতলে দিলে—কি কাল শত্তুরই যে আমার হয়েছে—মাগো—"

কাল শত্তুর ছেলেটা তখন বারাণ্ডার একধারে পা ছড়িয়ে বসে এক বাটি মুড়িতে আচ্ছা করে তেল-নুন মেখে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে খাচ্ছিল। জেঠাইমার মন্তব্যে একবার মুখ তুললে। মুড়ির গ্রাসটা গলায় করে গোঁ গোঁ শব্দে বললে—"তুমি আমাকে গাল দেবে দাও, বাবাকে গাল দিয়ো না জেঠাই মা—আমার বাবা—"

কথা শেষ না হতেই মঙ্গলা চেঁচিয়ে উঠলো—"ওরে আমার বাবা রে—তবু যদি বাপের মত বাপ হতো—। মা মরতে না মরতে যে ছেলেকে দিয়ে গেল পরের কাছে, কি হল না হল সে খোঁজটা একবার নিলে না, সেই বাবার ভালবাসায় একেবারে যে গলে গেলেন! হতভাগা শত্তুর কোথাকার, আমার সব পণ্ড করতে এসেছিস, আমার তীর্থ-ধর্ম সব গেল তোর জন্তে?"

নীলমণির অন্তরে বিলক্ষণ উষ্মার সঞ্চার হয়েছিল, শুকনো মুড়ি সে খেতে পারলে না, তাই খানিকটা জল মুড়ির মধ্যে হড় হড় করে ঢেলে দিলে। মুড়িগুলো নরম করে নিয়ে সহজভাবে খেতে লাগলো।

আড়চোখে সেদিকে তাকিয়ে মঙ্গলা যেন কতকটা স্বগতভাবেই বললে, "আহা মরে যাই, রেতো ভূত কিনা তাই মুড়িতে কতকটা জল ঢেলে গিলছে দেখ। সবই বিচ্ছিরি, একটা যদি সুচ্ছিরী থাকে—"

নীলমণি রাগ করে খাওয়া ফেলে উঠে গেল। মঙ্গলা উঠে বাটিটা দেখলে—অনেক মুড়ি পড়ে আছে।

স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ কর্কশকণ্ঠে সে চেঁচিয়ে বললে—"বলি, খাওয়া ফেলে নবাবপুত্তুর চললে কোথায়? কোন কথা তোমায় বলা হয়েছে শুনি—যাতে মান করে গেল? বিষ নেই কুলোপানা চক্কর,—তবু যদি কিছু থাকতো। বলি ও নবাবপুত্তুর—"

উত্তর না পেয়ে সে একবার বিষ উদ্গীরণ করলে—"এই যে গেরস্তর এতগুলো মুড়ি নষ্ট করলি, এ ক্ষতিপূরণ করবে কে শুনি? এ কি তোদের বাপের ধানের মুড়ি যে যত পারবি খাবি—নষ্ট করবি?"

নীলমণির সাড়াশব্দ নাই।

অত্যন্ত রাগ করে মঙ্গলা মালা জপ করতে বসলো। ঘন ঘন মালা ঘুরাতে ঘুরাতে নাম জপের বদলে বলছিল, "আমার কি, আজ বাদে কাল কাশী যাব, বৃন্দাবনে যাব, [illegible] জন্তে তো ঘর আগলে বসে থাকতে পারি নে? [illegible]র পরে একমুঠো ভাতের জন্তে। এ আমি নির্ঘাত [illegible] বলে রাখছি। মা লক্ষ্মীকে এত হেনস্থা—এ আমি সইলেও মা লক্ষ্মী সইবেন না, তুই দেখে নিস।"

নীলমণি ফিরলো না।

পাছে কুকুর বিড়ালে মুখের খাবারটায় মুখ দেয় তাই মঙ্গলা মালা জপ বন্ধ করে আগে খাবারটা তুলে রাখলে।

বারো বছরের ছেলে দুষ্টামীতে সে কুড়ি বছরকে ছাড়িয়ে যায়।

মঙ্গলা অস্থির হয়ে উঠলো—

নীলমণিকে জিজ্ঞাসা করে—"তোর বাবার ঠিকানা জানিস? কুড়ি দিন বলে গিয়ে আজ যে তিন চার মাস হয়ে গেল—সে মানুষ আজও ফিরলো না; একটা সন্ধান নিতে হবে তো?"

নীলমণি দা দিয়ে একটা বাঁশ চেঁচে সমান করছিল—বারাণ্ডায় খুঁটি বসাতে হবে। একটা খুঁটি যে পচে গেছে তা সে লক্ষ্য করেছে। মঙ্গলার প্রশ্নের উত্তর সে দিলে না।

মঙ্গলা ক্রুদ্ধকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো—"বলি, দাসী বাঁদির কথা কি কাণে যাচ্ছে না? ওগো নবাবপুত্তুর গাড়োয়ান—ওগুলো হবে কি জিজ্ঞেস করি? বাঁশ কাটছিস কি আমায় শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার জন্যে, না তোর মুখাগ্নি করবার জন্যে?

নীলমণি বারাণ্ডার পচা খুঁটিটা দেখিয়ে দিলে, বললে, "কোনদিন ঘরচাপা পড়ে মরতে হবে যে, সেটা তো দেখ না জেঠাইমা; এই খুঁটিটা পরাতে হবে আর সেটা আমি আজই পরিয়ে দেব—দেখো।"

মঙ্গলা খানিকক্ষণ নির্ব্বিয়ে তার পানে চেয়ে রইলো, তারপর বললে, "তোর বাবার ঠিকানাটা—"

নীলমণি মুখ বিকৃত করে বললে, "সে সব আমি জানি নে, তুমি খুঁজে দেখ গিয়ে—"

কিছুতেই গোবর্দ্ধনের ঠিকানা পাওয়া গেল না।

মঙ্গলার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো।

গুরুদেব একদিন এসে পৌছালেন—

নীলমণিকে দেখে তিনি মোটেই খুসি হতে পারলেন না, গম্ভীরমুখে বললেন, "সাধন ভজন কতদূর এগুলো মা?"

মঙ্গলা বিমর্ষমুখে সবেগে উত্তর দিলে, "কিছু [illegible] বাবা, কিছু না। কি কাল শত্তুর যে এসেছে—খাল কেটে কুমীর এনে এখন প্রাণ যায়।" কথাটা বলে সে অদূরে দাঁড়ারত নীলমণির পানে তীব্র দৃষ্টিতে তাকালো।

গুরুদেব কেবল মাত্র বললেন, "হুম—" খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে একটা হাই তুলে আড়া-মোড়া ভেঙ্গে বললেন, "সবই রাধারাণীর ইচ্ছে, না হলে এই উড়ো আপদ ঘাড়ে চাপবে কেন, যাই হোক ওকে না হয় তুমিই ঘাড়ে করে নিয়ে যাও, না হলে তো উপায় নেই।"

মঙ্গলা যেন পথ দেখতে পেল, পরম উৎসাহে বলে উঠলো—"ঠিক কথা বলেছেন গুরুদেব, আমি কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারছিলুম না। আমি ওকে কালই নিয়ে যাব, আর একটা দিনও পাপ বাড়ীতে রাখব না। আমার জপ তপ, পুজো আহ্নিক সব মাথায় উঠেছে, কেবল ওর ভাত রাঁধো, ফরমাস খাটো—কেন, কি আমার দরকার?"

নীলমণি আড়চোখে তার পানে চাইলে—গুরুদেবের পানে আগুনজ্বালা চোখে চাইলো,—পারলে সেই আগুনে তাঁকে সে ভস্ম করে ছাড়তো। তার দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা গুরুদেব মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করলেন, তাই সে সরে যেতে যেতে শিষ্যাকে লক্ষ্য করে বললেন, "এ ছেলে জ্যান্তো অমঙ্গল টেনে আনবে মা, ওকে আর রেখো না, বিদায় করে দাও।"

মঙ্গলা উত্তর দিলে না।

সকালবেলা নীলমণি অন্যদিন ওঠে, আজ এমনভাবে পড়ে রইলো, ডাকলে সাড়া মেলে না।

মনটা বিষিয়ে উঠলো—মঙ্গলা গোটাকত কিল চড় দিয়ে তাকে টেনে তুললো।

বেশ বুঝা যায় নীলমণির যেতে মোটেই ইচ্ছা নাই সে খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরলো, তারপর বাধ্য হয়ে তাকে তার ছোট লাল সুটকেশটা ঘাড়ে নিয়ে রামধনের সঙ্গে বেরুতে হল।

আসার সময় মঙ্গলাকে সে একটা কথাও বললে না একটা প্রণামও করলে না। মঙ্গলা গুম হয়ে বসে রইলো সেও একটা কথা বললে না। বাড়ীটা বড় ফাঁকা বলে মনে [হ]তে লাগলো। সেই গরু বিড়াল সবই আছে তবু মনে [হ]য় কেউ নাই, কিছু নাই। মঙ্গলা বাড়ীতে টিকতে না পেরে ঘাটে গিয়ে বসে। যাদের সঙ্গে চিরকাল কেবল ঝগড়াই করে এসেছে আজ তাদেরই সঙ্গে ডেকে আলাপ করে: "জান গো কেষ্টর মা, ওই আমাদের নীলমণি গো—বাবাঃ, কি নেমকহারাম ছেলে! এই যে সাত আট মাস এখানে রইলো, যাওয়ার সময় কিনা একটা কথাও বলে গেল না? ওর জন্যে আর আমার বেন্দাবন যাওয়া হল না, কাশী যাওয়া হল না, আমার মালা জপ সন্ধ্যে আহ্নিক স[ব]

মাথায় উঠে গিয়েছিল, সে কিনা একটীবার যাওয়ার সময় কাছেও এলো না ?"

মঙ্গলার কণ্ঠস্বর কেমন যেন বেসুরো হয়ে ওঠে। তার চোখের সামনে যা কিছু, আস্তে আস্তে ঝাপসা হয়ে আসে।

সারাদিন তবু পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে কাটানো যায়, সন্ধ্যার সময় হতে আর যেন সময় কাটে না। মঙ্গলা মালা জপ করতে বসে, মনে জাগে নীলমণির কথা। বেচারা একটা দিনও মঙ্গলার কাছে ভাল কথা পায়নি; সে জেনে গেছে মঙ্গলা ভাল কথা বলতে জানে না।

রামধন পরদিন এসে পৌঁছালো। তার মুখে সব কথা শুনে মঙ্গলা একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেল।

গোবর্দ্ধন নাকি আবার বিবাহ করেছে। নীলমণিকে এখানে রেখে সে নাকি বিবাহ করতে গিয়েছিল। এই সাত আট মাস সে সুখেস্বাচ্ছন্দ্যে ঘর-সংসার করছে। নীলমণিকে দেখে সে নাকি মোটেই খুসী হতে পারেনি। তার নব-বিবাহিতা স্ত্রী নাকি রীতিমত মড়াকান্না সুরু করেছে; গোবর্দ্ধন তাকে আগে জানায়নি তার পুত্র আছে।

রামধন তারপরে কতকটা স্বগতঃভাবেই জানালে—আহা, ছেলেটা কাল হতে জলস্পর্শও করেনি, কেই বা খেতে দেবে ?

মঙ্গলা বল্লে, "তুমি এরকম দেখে তাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এলে না কেন রামধন ?"

সচকিত হয়ে রামধন বল্লে, "ওমা, তা আমি কখনও পারি মা ঠাকরুণ। আমায় হুকুম না করলে আমি কখনও তাকে আনতে পারি ?

মঙ্গলা চুপ করে রইলো।

হঠাৎ সে এমন স্তব্ধ হয়ে গেল যা কেউ কল্পনাতে আনতে পারে না।

কেঁউ কেঁউ করে নীলমণির কুকুরটা দরজা আঁচড়ায়।

এতটুকু কুকুরছানা দিন পনেরো আগে নীলমণি কোথা হতে এনেছিল। অস্পৃশ্য কুকুর ছানাকে দেখে মঙ্গলার সর্ব্বাঙ্গ ঘৃণায় রি-রি করে উঠেছিল, সে তখনই সেটাকে দূর করে দিয়েছিল।

নীলমণি বাড়ীতে সেটা না রেখে লুকিয়ে রামধনের বাড়ী রেখে এসেছিল, দিনের বেশীর ভাগ সময়ই যে সে রামধনের বাড়ী কাটাতো, মঙ্গলা তা জানতো না !

সেই কুকুর-শিশু মনিবকে না পেয়ে নিজেই তার কাছে এসেছে। মঙ্গলা রুদ্ধ দরজা খুলে রুদ্র মূর্ত্তিতে বা'র হল।

যত সব জঞ্জাল—হতভাগার কুকুরটা পর্য্যন্ত এসে তার সাধনভজনে বাধা দেয়।

কিন্তু বা'র হয়েই অসহায় কুকুর-ছানার পানে তাকিয়ে সে হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল।

তাকে দেখেই কুকুরটা জড়োসড়ো হয়ে পড়েছে। লেজটা গুটিয়ে এক কোণে সরে গিয়ে থর থর করে কাঁপছে, তার মুখে অস্ফুট কেঁউ কেঁউ শব্দ, চোখে তার জলধারা—

অবুঝ কুকুরশিশু—

মঙ্গলা মারতে পারলে না, তাড়াতে পারলে না, বরং অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে ডাকলে—"শনি—"

শনিবারে তাকে পাওয়া যায় বলে নীলমণি তার নাম রেখেছে শনি।

কুকুর-শিশু একবার আগায় আবার পিছায়।

কাছে আসতেই মঙ্গলা—তপস্বিনী মঙ্গলা হঠাৎ তাকে কোলের কাছে টেনে নিলে।

অকস্মাৎ তার চোখ ছাপিয়ে অঝোরে জল ঝরে পড়লো।

গুরুদেবের পত্রখানা সেই দিনই এসেছিল। তিনি লিখেছেন, সামনের সোমবারে তিনি সপরিবারে আসছেন।

তখনই মঙ্গলা তার উত্তর দিয়ে দিলে—

সে জানালে—তার ঘরে জায়গার উপস্থিত বড় অভাব, নীলমণি ও তার গুটি তিন-চার কুকুর সেই ঘরটায় রয়েছে। [illegible]ধনকে ডাকিয়ে এনে তার হাত দু'খানা দু'হাতে [illegible]রে চোখের জলে ভেসে মঙ্গলা বললে, "তুমি এখনই একবার রতনপুরে যাও রামু, ছেলেটাকে নিয়ে এসো, সে আমার কাছেই থাক্, আর ওকে ওখানে রাখব না, যা হবার এখানেই হোক—"

রামধনও নীলমণিকে ভালবাসে—

গদগদকণ্ঠে সে বললে, "এখনই যাব মা-ঠাকরুণ ?"

"হাঁ, তুমি এখনই যাও রামধন, তার জিনিসপত্র, তার জীবজন্তুর তার সে এসে নিক, আমি নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি।"

মঙ্গলা চোখ মুছলো।

মলমাস ও ক্ষয়মাস

শ্রীফণিভূষণ দত্ত

এক সৌর বৎসরের সূর্য সিদ্ধান্তীয় পরিমাণ ৩৬৫'২৫৮৮ দিন এবং চান্দ্র বৎসরের পরিমাণ ৩৫৪'৩৬৭১ দিন। চান্দ্র বৎসর অপেক্ষা সৌর বৎসর ১০'৮৯১৭ দিন বা ১১'০৬৪৮ তিথি অধিক হওয়ায়, প্রতি সৌর বৎসরের শেষে একটি চান্দ্র বৎসর অতীত হইয়া পরবর্তী চান্দ্র বৎসরের ১১ তিথি অতীত হইতেছে। এইরূপে তিন সৌর বৎসরে প্রায় ৩৩ তিথি অধিক হয়। এই স্থলে সৌর ও চান্দ্র বৎসরে সাম্য রক্ষার জন্ত ৩ বৎসরে একটি মলমাস গণনা করিয়া, ৩ তিথি অতীত হইয়াছে ধরা হয়। এইরূপে মলমাস গণনা না করিলে ঋতু ও চান্দ্র মাসের মধ্যে সাম্য থাকিত না, এবং আমাদের পূজা পার্বণগুলি চান্দ্র মাস অনুযায়ী সাধিত হওয়ায়, বৎসরের সকল ঋতুতেই সংঘটিত হইত।

এক সংক্রান্তি হইতে পরবর্তী সংক্রান্তী পর্যন্ত সময় সৌর মাস, এবং অমাবস্যান্ত হইতে পরবর্তী অমাবস্যান্ত পর্যন্ত সময় মুখ্য চান্দ্র মাস। অতএব শুক্ল প্রতিপদে চান্দ্র মাসের আরম্ভ হইতেছে। সৌর বৈশাখে সূর্য যখন মেষ রাশিতে অবস্থান করেন, তখন যে চান্দ্র মাসের আরম্ভ হয়, তাহার নাম চান্দ্র বৈশাখ; সৌর জ্যৈষ্ঠে যে চান্দ্র মাসের আরম্ভ তাহার নাম চান্দ্র জ্যৈষ্ঠ। এইরূপে সৌর মাসের নামানুসারে চান্দ্র মাসের নামকরণ হইয়া থাকে। চান্দ্র মাসের দিন পরিমাণ সৌরমাস অপেক্ষা অল্প হওয়ায়, কোন সৌরমাসে দুইটি শুক্ল প্রতিপদের আরম্ভ হইলে দুইটি চান্দ্রমাসের আরম্ভ হয়। তখন সৌরমাসের নামানুসারে দুইটি চান্দ্রমাসেরই নামকরণ হইয়া থাকে। কিন্ত [illegible] নামের দুইটি মাস কি প্রকারে সম্ভব হইতে [illegible] সুতরাং, এস্থলে প্রথম চান্দ্রমাসটি অধিক হইয়াছে মনে করিয়া, তাহাকে অধিমাস বা মলমাস বলা হয়। দ্বিতীয়টি সাধারণ চান্দ্র মাস। উভয়ের নামই সৌরমাসের নামানুযায়ী হইয়া থাকে। সৌর ও চান্দ্রমাসের পরিমাণ নিয়ত নহে। যখন চান্দ্রমাসের পরিমাণ সৌরমাস অপেক্ষা অধিক হয়, এবং সংক্রান্তির পূর্বেই এক অমাবস্যার শেষ ও পরবর্তী সংক্রান্তির পরে আবার অমাবস্যার শেষ হয়, তখন উক্ত সংক্রান্তির মধ্যবর্তী সৌরমাসে কোন চান্দ্রমাসের আরম্ভ না হওয়ায় উক্ত সৌরমাসের নামানুযায়ী চান্দ্রমাসের কোন নামকরণ হইতে পারে না। এইরূপ চান্দ্রমাস ক্ষয়মাস নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যে বৎসর ক্ষয়মাস হইবে, সেই বৎসর ক্ষয়মাসের পূর্বে একটি ও পরে একটি মলমাস হইয়া থাকে।

বর্তমান কালে সৌর মাসগুলির পরিমাণ যেরূপ দেখা যায় তাহা লিখিত হইল। এই সারণীতে সৌরমাসের পরিমাণ—

প্রথম সারণী—মাসমান

মাস	দিন পরিমাণ	মাস	দিন পরিমাণ
বৈশাখ	৩০'৯৫৬৭	কার্ত্তিক	২৯'৮৮১৪
জ্যৈষ্ঠ	৩১'৪২৬৪	অগ্রহায়ণ	২৯'৫৮৪২
আষাঢ়	৩১'৬৪২২	পৌষ	২৯'৩২০৩
শ্রাবণ	৩১'৪৬৫৬	মাঘ	২৯ ৪৫৬৯
ভাদ্র	৩১'০০৫৬	ফাল্গুন	২৯'৮৩৪৪
আশ্বিন	৩০'৪২৭৮	চৈত্র	৩০'৩৩৭৫

হইতে জানা যাইতেছে যে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, ফাল্গুন ও চৈত্র—এই নয় মাসের পরিমাণ চান্দ্রমাসের মধ্যমান ২৯'৫৩০৬ দিন হইতে অধিক। সুতরাং এই নয় মাসে মলমাস হওয়া সম্ভব। সৌর অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ মাসের পরিমাণ চান্দ্রমাসের পরিমাণ হইতে অল্প হওয়ায় এই তিন মাস কখন মলমাস হয় না—ইহারা ক্ষয়মাস হইবার যোগ্য। উক্ত নয় মাসে মলমাস হইলেও, প্রথম ছয় মাসেই উহার আধিক্য দেখা যায়। ক্ষয়মাস সচরাচর দেখা যায় না, মলমাস কিন্ত [illegible] মাস ১৬ দিন অন্তর হইয়া থাকে। ভাস্করাচার্য্য [illegible]হগণিতের মধ্যমাধিকারে অধিমাসাদি নির্ণয় প্রকরণের [illegible]শ্লোকে বলিয়াছেন, ১৪১ বৎসর অন্তর এবং কদাচিৎ ১৯ বৎসর অন্তর ক্ষয়মাস হইয়া থাকে। তিনি উদাহরণ স্বরূপ অতীত ও ভবিষ্যৎ—৯৭৪, ১১১৫, ১২৫৬ ও ১৩৭৮ শকাব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ সকল শকে ক্ষয়মাস হইয়াছিল।

সূর্যসিদ্ধান্ত (১।৩৮) বলিয়াছেন ৪৩২০০০০ বৎসরে ১৫৯৩৩৩৬ গুলি অধিমাস হইয়া থাকে। এই গণিত

হইতে আসন্নমান নিরূপণ প্রক্রিয়ায় নিম্নলিখিত ভগ্নাংশগুলি পাওয়া যায়—$\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৩}$, $\frac{২}{৫}$, $\frac{৩}{৮}$, $\frac{৪}{১১}$, $\frac{৭}{১৯}$, $\frac{১২৩}{৩৩৪}$, $\frac{১৩০}{৩৫৩}$, $\frac{২৫৩}{৬৮৭}$, $\frac{৩৮৩}{১০৪০}$ ইত্যাদি। অর্থাৎ, ২ বৎসরে ১টি, ৩ বৎসরে ১টি, ৫ বৎসরে ২টি, ৮ বৎসরে ৩টি ইত্যাদি ক্রমে অধিমাস হইয়া থাকে। আমরা নিম্নে দ্বিতীয় সারণী দিলাম তাহাতে ১৯ বৎসরে ৭টি অধিমাস কি প্রকারে সংঘটিত হয় তাহা জানা যাইবে। সারণীর প্রথম তিন স্তম্ভে পর পর খৃষ্টাব্দ, বঙ্গীয় সন ও শকাব্দের অবশেষ দেওয়া হইয়াছে এবং চতুর্থ স্তম্ভে কোন্ বৎসরে কোন্ মাস মলমাস হইবে তাহা লিখিত হইয়াছে। বৎসর সংখ্যাকে ১৯ দিয়া ভাগ করিলে অবশেষ পাওয়া যাইবে, এবং * তারকাচিহ্নিত অঙ্ক শেষে মলমাস হইবে। উদাহরণস্বরূপ আমরা ১৩৪৬ সন বা ১৮৬১ শকাব্দ গ্রহণ করিলাম। ১৩৪৬ সন ÷ ১৯, অ = ১৬। ∴ দ্বিতীয় সারণী হইতে জানা যাইতেছে যে, ঐ বৎসর শ্রাবণ মাস মলমাস ছিল। পুনরায়, ১৩৪৯ সনে জ্যৈষ্ঠ মাস মলমাস হইবে।

দ্বিতীয় সারণী—মলমাস চক্র

অবশেষ			সম্ভাব্য	অবশেষ			সম্ভাব্য
খৃষ্টাব্দ	সন	শকাব্দ	মলমাস	খৃষ্টাব্দ	সন	শকাব্দ	মলমাস
০	১৫	১৭		১০	৬	৮	
১*	১৬*	১৮*	শ্রাবণ	১১	৭	৯	
২	১৭	০		১২*	৮*	১০*	আষাঢ়
৩	১৮	১		১৩	৯	১১	
৪*	০*	২*	জ্যৈষ্ঠ	১৪	১০	১২	
৫	১	৩		১৫*	১১*	১৩*	জ্যৈষ্ঠ
৬	২	৪		১৬	১২	১৪	
৭*	৩*	৫*	বৈশাখ	১৭*	১৩*	১৫*	আশ্বিন
৮	৪	৬		১৮	১৪	১৬	
৯*	৫*	৭*	ভাদ্র				

কোন কোন সময়ে দেখা যায়, আমাদের সারণী নি[illegible] মাসের পূর্বমাসে মলমাস হইতেছে। যেমন, ১৩১[illegible] সনে (১৮৩১ শক) শ্রাবণ মাসে মলমাস ছিল, কিন্তু আমাদের সারণী হইতে পাওয়া যায় ভাদ্র মাস। এইজন্তে সারণী হইতে প্রাপ্ত মলমাসের তিথি-নিরূপণ করিয়া দেখা উচিত—সেই মাসে দুইটি অমাবস্তার শেষ হইতেছে কিনা। এইরূপ দেখিয়া লইলে, কোন্ মাস মলমাস হইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইবে।

মলমাসের ন্যায় ক্ষয়মাস নিত্য ঘটে না। অনুসন্ধান দ্বারা দেখা যাউক, কোন্ কোন্ বৎসর ক্ষয়মাস হইয়াছিল। ভাস্করাচার্য ক্ষয়মাসযুক্ত যে বৎসরগুলির উল্লেখ করিয়াছেন তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। মাধবাচার্য কালবিবেকে ভাস্করের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তদীয় ক্ষয়মাসিক অব্দগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। গোবিন্দানন্দ শুদ্ধি-ক্রিয়াকৌমুদীতে ১২৫৬ ও ১৩৯৭ শকে ক্ষয়মাস ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জগদীশ পঞ্চানন ১৪৬২ শকে ক্ষয়মাস ছিল বলিয়াছেন। (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৮, ১ম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের জগদীশ পঞ্চানন প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। গোবিন্দানন্দ ও জগদীশ পঞ্চানন ক্ষয়মাস ও তৎসহ মলমাস দুইটির নামও বলিয়াছেন। এই শকগুলি লইয়া একটি সারণী প্রস্তুত করিয়া দেখা যাউক, কোন্ বৎসরে ক্ষয় ও মলমাস ছিল। এই সারণীকে একটু প্রসারিত করিয়া বলা যায় ১৭৪৪ শকে ক্ষয়মাস ছিল, এবং অদূর ভবিষ্যতে ১৮৮৫ শকে ক্ষয়মাস হইবে। ক্ষয়মাসের পূর্ববর্তী অধিমাসকে ভানুলঙ্ঘিত মাস এবং পরবর্তীকে মলমাস বলে। সূর্যসিদ্ধান্তীয় গণনায় ভাস্করাচার্যের উল্লিখিত ১৩৭৮ শকে ক্ষয়মাস পাওয়া যায় না।

তৃতীয় সারণী—ক্ষয় মাস

শক	ভানুলঙ্ঘিত মাস	ক্ষয়মাস	মলমাস	মন্তব্য
৯৭৪	আশ্বিন	অগ্রহায়ণ	ফাল্গুন	ভাস্কর
১১১৫	আশ্বিন	পৌষ	চৈত্র	ভাস্কর
১২৫৬	আশ্বিন	পৌষ	ফাল্গুন	ভাস্কর ও শুদ্ধি-কৌমুদী
১৩৯৭	আশ্বিন	মাঘ	ফাল্গুন	শুদ্ধি-কৌমুদী
[illegible]	আশ্বিন	পৌষ	চৈত্র	জগদীশ পঞ্চানন
[illegible]	আশ্বিন	পৌষ	চৈত্র	
[illegible]	আশ্বিন	পৌষ	চৈত্র	
১৮৮৫	আশ্বিন	পৌষ	চৈত্র	
১৯০৪	আশ্বিন	মাঘ	ফাল্গুন	

গণিত যুক্তিতে দেখা যায় যে, যে বৎসর মেষ-সংক্রমণের পর ১১শ দিবসের পূর্বে অমাবস্তান্ত হয়, সে বৎসর মলমাস থাকিবে। মেষ-সংক্রমণ হইতে ৩০.৯৪৬৭ দিনে সৌর বৈশাখ মাস শেষ হইতেছে। ইহা হইতে চান্দ্রমাসের পরিমাণ বিয়োগ করিলে ১.৪১৬১ দিন অবশিষ্ট থাকে।

সুতরাং, বৈশাখের ১'৪১৬১ দিনের পূর্বে অমাবস্যান্ত হইলে বৈশাখ মলমাস হইবে। পুনরায়, বৈশাখের আরম্ভ হইতে জ্যৈষ্ঠের শেষ পর্যন্ত ৬২'৩৭৩১ দিন হইতে দুইটি চান্দ্র মাসের দিনসংখ্যা ৫৯'০৬১২ বিয়োগ করিলে, ৩'৩১১৯ দিন অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং, বৈশাখের ৩'৩১১৯ দিনের পূর্বে অমাবস্যান্ত হইলে জ্যৈষ্ঠ মলমাস হইবে। এইরূপে মেষ-সংক্রমণের পর অমাবস্যান্তের সময় অবগত হইলে মলমাস ও ক্ষয়মাসের সীমা নির্ধারণ করা যায়।

চতুর্থ সারণী

মেষ-সংক্রমণের পর অমাবস্যান্ত

দিনের পূর্বে হইলে	মাস মল হইবে	দিন পরে ও	দিন পূর্বে হইলে	মাস মল হইবে
১'৪১৬১	বৈশাখ	৯'৭৫১২	১০'০৫৫১	ফাল্গুন
৩'৩১১৯	জ্যৈষ্ঠ	১০'০৫৫১	১০'৮৯১৮	চৈত্র
৫'৪২৩৫	আষাঢ়			
৭'৩৫৪৫	শ্রাবণ			
		দিন পরে ও	দিন পূর্বে হইলে	ক্ষয়মাস হইবে
৮'৮৩৩৪	ভাদ্র	১০'০৩৫০	১০'০৮১৪	অগ্রহায়ণ
৯'৭৩০৬	আশ্বিন	৯'৮২৪৭	১০'০৩৫০	পৌষ
১০'০৮১৪	কার্ত্তিক	৯'৭৫১২	৯'৮২৪৭	মাঘ

গণনা দ্বারা দেখা যায় ১৮৮৫ শক বা ১৩৭০ সনে মেষ-সংক্রমণের পর ৯'৯১১৪ দিনে অমাবস্যা শেষ হইতেছে। সুতরাং ঐ বৎসর পৌষ ক্ষয়মাস হইবে। ইহার ১৯ বৎসর পরে ১৩৮৯ সনে মেষ-সংক্রমণের পর ৯'৯৯৩৪ দিনে অমাবস্যা শেষ হওয়ায়, ঐ বৎসরও পৌষ ক্ষয়মাস হইবে। গণনা দ্বারা আরও পাওয়া যায় যে, প্রথম বৎসর আশ্বিন ও চৈত্র, এবং দ্বিতীয় বৎসরে আশ্বিন ও ফাল্গুন মলমাস হইবে।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ

শ্রীমতী অরুণা সিংহ এম. এ.

তোমার আলোক-রেখা জাগরণ প্রথম উন্মেষে
ললাটে পড়েছে মোর এসে
শুচিস্নাত অন্তরের তুচ্ছতম প্রেরণায় ছিলে
একমাত্র তুমি এ নিখিলে।
চিত্তে ছিলে নিতান্ত আপন
তোমার প্রকাশ দিয়ে আপনারে করেছি মনন
হেরি নাই সম্মুখ-সভায়
তোমার জ্যোতির দীপ্ত প্রখর উজ্জ্বল মহিমায়—
দূর হ'তে ধেয়ানের শান্ত গাত্র'পরে
আঁকিয়া গিয়াছ স্তরে স্তরে
তন্ময়টি দীপ্তায় তব
তব রচা অন্তর বৈভব।

আজি হেরিলাম
পূর্ণ মানবতা মাঝে প্রশান্ত সুন্দর পরিণাম
নির্মল ললাট তলে তব
নিষ্কম্প অনন্ত বার্তা শুভ্র অভিনব
তোমার গৌরব মহিমায়
পেয়েছে চরম অধিকার
হোমাগ্নির হুতাশনে সগৌরবে সকল অক্ষয়—
সঁপিয়াছ প্রতিদিন তিলেক কর নি অপচয়
সে প্রণতি প্রশান্তির সমাহিত ছায়া
[illegible] কি অন্তরে দিল লোকান্তের কায়াহীন মায়া?

হে অপরাজেয়—
দুর্জ্জেয় কঠিন নহ, তবু তুমি মহা অনির্দেশ
বাস্তবের পরিমাপহীন
অখণ্ড সত্যের ছন্দে সুন্দরে বিধৃত চিরদিন;
তাই বুঝি কীর্ত্তিপুঞ্জ এ জীবন জীর্ণবাস সম
তেয়াগি' জীবন হ'তে লোকান্তরে—পথিক প্রথম
চিরযাত্রা করিয়াছ নগারে নির্মোক
নিরঞ্জন হে বৈরাগী, আমার আত্মীয় বীতশোক।

দার্জ্জিলিং

শ্রীদুর্গাশঙ্কর মহলানবীশ

পৃথিবীর সীমার পারে, মর্ত্ত্যের প্রাংশু শিয়রে, মেঘেরা আসিয়া যেখানে 'রঙিন ওড়না গায়ে' নিত্য ভোরে লুকোচুরি খেলিয়া যায়, হাসি-কান্নার জগৎকে ইঙ্গিতে ইশারায় ডাকে, দার্জ্জিলিং আসিতে আসিতে সেই প্রহেলিকা রাজ্যের কথাই প্রথম মনে জাগে। স্বর্গও নহে, মর্ত্ত্যও নহে—মানুষের অভিজ্ঞতায় একদিন যাহা অনাগত ছিল, আজও সে অনাগত, অনাহূত—এই অজানা দেশ। দূরের মানুষ ছিন্ন কুহেলিকার ফাঁকে দৃষ্টি মেলিয়া যেখানে দেখে, সীমা শেষ অর্ঘ্য হাতে আকাশের চরণ ছুঁ[illegible] অসীমে আপনাকে নিঃশেষিত করিয়া দিতে চাহিতেছে, সেখানেই সেই প্রান্ত ভূমি—পৃথিবীর বহু বিশ্রুত; [illegible] শুনিয়াছি—ধূর্জ্জটি উমার সাথে এখানে নিত্[illegible] করেন। মানুষ এখানে পাদক্ষেপ করিতে [illegible] বিপদকেই ডাকিয়া আনিয়াছে। কোথায় আ[illegible] আর্জিন্!

দার্জ্জিলিং আসিয়া ঘরে বসিয়া থাকা একরূপ [illegible]। ভোরের আলোকেই পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। বাংলায় নববর্ষকে অভিনন্দিত করিয়া সবুজ কানন-ভূমির ঘন ছায়ার কোলে দার্জ্জিলিং শহরখানি ছবির মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ, মনোরম—আলোকে ঝলমল। এমন সদ্যস্নাত পরিচ্ছন্ন শহর আমি আর একটীও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। পথের ধারে, পাহাড়ে, জঙ্গলে বড় বড় ওক্, ক্রিপ্টোমেরিয়া, পাইন জাতীয় গাছ; আর তাদের পাশে অযাচিত ভাবে বিক্ষিপ্ত বিলাতী ফুলের অভিনব সমাবেশ—ম্যাগ্নোলিয়া, রোডোডেন্‌ড্রোন আরও কত বনারা ফুল। সমতলবাসীর কাছে এ সমস্তই নূতন।

দার্জ্জিলিংই বাংলার একমাত্র শহর যেখানে পুরুষ-মেয়ের অবাধ বিহার চোখে পড়ে। দেখিলাম—বাঙালী মেয়েরাও এখানে ঘোড়ায় চড়ে। অভাব-অভিযোগ-জীর্ণ জাতির এই প্রাণের পরিচয় ভালই লাগিল। হিমালয়ের [illegible] আসিয়া আভিজাত্যের বন্ধন আপনা হইতেই যেন [illegible] হইয়া পড়িয়াছে, মানুষের অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে। মানুষ মানুষের ভিতর দিয়া ভগবানকে পাইতে চাহে, তার আগল-ভাঙা চিত্ত-বাতায়নে নূতন সুর বাজে।

এভারেষ্ট দেখিতেই চলিয়াছি—টাইগার হিলে। সাথে একজন পথ-প্রদর্শক। জানিতাম এখন এভারেষ্ট-শৃঙ্গ দেখিতে পাওয়া দুরাশা। সকলে রাত তিনটায় উঠিয়া হিমালয়ের উচ্চতম শিখরে তরুণ রবির উদয়-রাগ দেখিতে যাত্রা করে। আমার সময় ও সুযোগ ছিল অল্প, আর

উৎসাহও ছিল ক্ষীণ এই শীতের রাতে অপরিচিত স্থানে একাকী যাওয়ার। দিনের আলোকেই চলিলাম।

শহরের উপকণ্ঠে ঘুমে একটী বৌদ্ধ মঠ আছে, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত। এখানে বুদ্ধদেব, দীপঙ্কর ও গুরু পেমার মূর্ত্তি দেখিয়া দূরাগত বৌদ্ধ শ্রমণগণ নিজেকে ধন্য মনে করেন। গুরু পেমার অপর নাম পদ্ম-সম্ভব। দীপঙ্কর (অতীশ) এবং পদ্মসম্ভব বাঙালী বৌদ্ধ, আত্মগৌরবে সুপরিচিত। গভর্ণমেন্টের খরচে এই বিহারটী একটী সমিতি কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়।

বটানিক্যাল গার্ডেনের একটি দৃশ্য

ঘুম ষ্টেশন ছাড়াইয়া চড়াইয়ের পথে কেভে[illegible] ভেইরী পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শহরে কে[illegible] রেস্তর্যাঁ আছে, এক পোয়া দুধের দাম দশ পয়সা। স্থানীয় গোয়ালার দুধের সের দুই আনা। গোয়ালার দুধ কিছু খারাপ নয়, সুতরাং কেভেণ্টারের এই দুর্ম্মূল্য শুধু চলার পথেই দেওয়া সম্ভব। লণ্ডনেও শুনিয়াছি দুধের এত দাম নয়।

রোদ বেশ উঠিয়াছে, আকাশ পরিষ্কার। পাহাড়ের গা বাহিয়া উপরে উঠিয়া যাইতে হয় ক্রমোন্নয়মান রাস্তা দিয়া। দুই ধারে ওক্, ম্যাগ্নোলিয়ার গাছ। প্রায় দেড় মাইল পথ উঠিয়া [illegible] ডান দিকে ক্রিপ্টোমেরিয়ার ঘন বন। ডালে ডালে, পাতায় পাতায় মিশিয়া বনের ভিতরে অন্ধকার, মানুষের পক্ষে দুষ্প্রবেশ্য।

হঠাৎ তীব্র বেগে ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে সুরু হইল, ওভারকোট আঁটিয়া পরিলাম, তাহাতেও শীত মানাইতে চাহে না। উঠিবার সময়ে সূর্য্যের রশ্মিগুলি সারা গায়ে কুশাঙ্কুরের মত বিঁধিতেছিল। ক্ষণ পরেই এ বেশ ছাড়িয়া হিমালয়ের ক্ষণ-চঞ্চল প্রকৃতি ধরা দিল তার তুহিন-প্রসাধনের আয়োজনে। টাইগার হিলের চূড়ায় আসিয়া যখন পৌঁছিলাম, উত্তর হইতে মেঘ হু হু করিয়া নামিয়া আসিল আমার চারিদিক ঘিরিয়া। শ্বেত জলকণার ঘন আবরণ ভেদ করিয়া সম্মুখে এক পাদভূমিও দেখিতে পাওয়া যায় না। পথ-প্রদর্শকের কথাগুলি মেঘের আড়াল হইতে যেন শ্রুত হইল। মনে একটা কৌতুক অনুভব করিলাম, যেন মেঘ-লোকে উঠিয়াছি। শীতের তীব্রতা বাড়িতে লাগিল। আর বেশীক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়, এখনই হয়ত বৃষ্টি আসিবে। এভারেষ্ট ও পাহাড়ান্তরে সিঞ্চল হ্রদ পড়িয়া রহিল।

নামিতে সুরু করিয়াছি, কিন্তু শিলাবৃষ্টি হইতে নিস্তার নাই। প্রায় তিন মাইল রাস্তা ভিজিয়া, শিলাহত হইয়া, পাখীর মত কাঁপিতে কাঁপিতে ঘুম ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। এভারেষ্ট মায়াবী। মাত্র ৮,৫১৪ ফুট উপরে উঠিয়াছিলাম। যাহারা ২৯,১৪৬ ফুট শৃঙ্গটী জয় [illegible]তে চাহেন, তাহাদের চরম লাঞ্ছনার একটু পূর্ব্বাভাষ [illegible] দুর্য্যোগ উপেক্ষনীয় নহে।

[illegible]লিঙে ফিরিয়া আসিলাম। দুই দিন শহরের [illegible] ঘুরিয়া দেখিতে চাই। সন্ধানে জানিলাম—[illegible]খিবার মত যাহা আছে, তার মধ্যে সিঞ্চাপং প্রপাতে [illegible]তেয়ারী, শ্মশান, বার্চহিল, ম্যাল্, বটানিক্যাল্ [illegible] মহা যাদুঘর, ভিক্টোরিয়া প্রপাত, অব্জারভেটরী [illegible]হাকাল, কালাপাহাড়, কাটাপাহাড় ও লেবং।

পাহাড়ের গা-[illegible] সাত মাইল রাস্তা পশ্চিমে নামিয়া গেলে সিঞ্চাপং। শহরের অপর দিকে দার্জ্জিলিং (৬,৮১২´) হইতে ৮৪২ ফুট নীচে লেবং। গোরা পল্টনের ব্যারাক ও ঘোড় দৌড়ের মাঠ। এ যাত্রায় এ দুইটী জায়গাই বাদ পড়িল।

ম্যাল্ পাহাড়ের উপরে একটা মিলন-কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রোজই পথচারী নরনারী বেশভূষা করিয়া এখানে বেড়াইতে আসে। আমার কাছে প্রিয় ছিল লয়েড্ বটানিক্যাল্ গার্ডেন। পাহাড়ের স্তূপ-সহিষ্ণু শ্যাম তরুলতা, বর্ণ-মুখর মরসুমী ফুলের বুকের আগুনে ঋতুর পূজা, বিদেশিনী শাখিনীর বিরহ-বাস বর্ণে, বৈচিত্র্যে, বিষাদে, আনন্দে চিত্তের অলিতে গলিতে চমক লাগাইয়া দেয়। সন্তর্পণে এই লীলায় যোগ দেওয়া বা হইাদের পাশ দিয়া নিঃশব্দ-বিচরণে যে বিভোরতা, তাহা শুধু অনুভূতি-গ্রাহ্য।

শহরের ছয় মাইল পূর্ব্বে রঙ্গিরণে প্রথমে বটানিক্যাল্ গার্ডেন স্থাপিত হইয়াছিল ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে। তারপর লয়েড্‌স্ ব্যাঙ্কের সত্ত্বাধিকারীর দেওয়া একখণ্ড জমিতে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান লয়েড্ বটানিক্যাল্ গার্ডেনের সূচনা। এখন এই বাগান ১৪ একর জমি লইয়া বিস্তৃত।

আর একটী নির্জ্জন স্থান বার্চহিল পার্ক। জঙ্গলের একখণ্ড জমি পরিষ্কার করিয়া উত্তরাঞ্চলের দৃষ্টিপথে এই পার্ক। ছায়াচ্ছন্ন, জনবিরল, নিস্তব্ধ এই স্থানটী শহর ছাড়াইয়া নিঃসঙ্গ ভ্রমণের বেশ উপযোগী।

যাদুঘরে উল্লেখযোগ্য বেশী কিছু নাই। বিভিন্ন প্রজাপতির সংগ্রহ, কয়েকটী মৃত জীবজন্তু আর পুরাতন বৃক্ষাগ্রের নমুনা কিছু আছে।

অব্জারভেটরী হিলে উঠিয়া অঙ্কিত মানচিত্রের নির্দ্দেশানুযায়ী উত্তরে কাঞ্চন-জঙ্ঘা, কাব্রু, জন্নু, চুমলারী, পন্দিম প্রভৃতি গিরিমালা দেখা যায়। শিখরগুলি কুয়াসার অন্তরালে আমার চোখে ধরা দিল না। এই তুষার রাজ্যের কথা পরে বলিতেছি।

শরৎচন্দ্র দাস দার্জ্জিলিং-এর তিব্বতী মানে করিয়াছেন—"বজ্রকপালিক ভূমি।" হিন্দুর দুর্জ্জয়-লিঙ্গ তিব্বতী শব্দটীরই প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে হয়। শিবের সাথে ইহার সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাইলাম না।

দার্জ্জিলিং ঐতিহাসিক শহর নহে। শত বৎসর পূর্ব্বে এখানে কয়েকখানি কুঁড়ে ঘর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। নেপালীরা সিকিম রাজা হইতে ইহা জয় করিয়া লয়। কিন্তু নেপালের সাথেও বৃটিশ গভর্ণমেন্টের বিবাদ বাধে। সেই যুদ্ধে জেনারেল অক্টারলোনী একবার পরাজয়ের পর ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে নেপাল হইতে দার্জ্জিলিং বিচ্ছিন্ন করিয়া সিকিমের রাজাকে পুনরার্পণ করেন।

ইংরাজের জন্য একটা স্বাস্থ্য-নিবাসের প্রয়োজন ছিল। লেফ্‌টেন্যান্ট জেনারেল লয়েড ও জি, ডবলিউ গ্রান্ট দার্জ্জিলিংকে ইহার উপযোগী

পাইন-শোভিত আঁকা-বাঁকা পাহাড়-পথ : দার্জ্জিলিং

অবজারভেটরীর পাশেই মহাকাল বা দুর্জ্জয়-লিঙ্গ, হিন্দু ও বৌদ্ধের পূজিত দেবস্থান। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে এখানে সিকিমের দোডাং কি[illegible] কর্ত্তৃক একটী মঠ নির্ম্মিত হইয়াছিল। গভর্ণমেন্টের আদেশে ১৮[illegible] খৃষ্টাব্দে ইহা সেন্ট এণ্ড্রু গীর্জ্জার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে সরিয়া [illegible] বৎসরের পুরাতন মঠ সরাইয়া দেওয়া শুধু অধিকার-বঞ্চিত দে[illegible] সত্তর বৎসর পরে ইহাকে ভুটিয়া বস্তিতে উঠিয়া যাইতে বাধ্য [illegible] পূর্ব্ব মঠের স্মৃতি লইয়া এখনও মহাকাল তাহার পূর্ব্বে [illegible] স্মরণ করাইয়া দেয়। এখন এখানে বৌদ্ধ পতাকাকীর্ণ [illegible] মন্দির দেখা যায়।

দার্জ্জিলিং নামের উৎপত্তি হয়ত এখানেই হইয়াছিল। জেনারেল মেইনওয়ারিং-এর মতে দোর্জ্জে মানে মহামূল্য প্রস্তর; ইহা বজ্রের প্রতীক। লিং অর্থ স্থান। ভাষা-বিশেষজ্ঞ তিব্বতী অভিধান প্রণেতা এইচ্-কে অ্যালেক্জেণ্ডার সোমা ডা কোরোসি বলেন—দার্জ্জিলিং একটী তিব্বতী শব্দ, মানে গুহ্যভূমি। রেভারেণ্ড লাঙ্গে ও রায় বাহাদুর

মনে করেন। পরে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মতানুসারে সিকিম রাজার নিকট হইতে বাৎসরিক তিন হাজার টাকা বৃত্তির [illegible] দার্জ্জিলিং-এর ১৩৮ মাইল জঙ্গলা জমি অধিকৃত হয়। বৃত্তি [illegible] বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু সিকিম রাজ এই উপকার [illegible] মনে রাখেন নাই। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ডাঃ হুকার ও ডাঃ [illegible]কে অন্যায়ভাবে বন্দী করার অপরাধে ইংরাজ গভর্ণমেন্ট [সম]গ্র দার্জ্জিলিং জেলা অধিকার করেন। পরে কালিম্পংও ভুটান রাজ্য হইতে ইংরাজদের হাতে আসে।

দার্জ্জিলিং শহরের পরিকল্পনাটী তৈয়ারী করেন লেফ্‌টেন্যান্ট ন্যাপিয়ার এবং গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড হইতে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত ১২০ মাইল ব্যাপী প্রথম রাস্তাটীও তাঁহারই কৃতিত্বের পরিচয়। কার্ট রোড প্রস্তুত হয় ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে। প্রথম রাস্তাটীর জন্য মাইল প্রতি ১১,১৫১৲ টাকা ও দ্বিতীয়টীর জন্য প্রতি মাইলে ৯০,০০০৲ টাকা ব্যয় পড়ে। ৪০ মাইল দীর্ঘ অকল্যাণ্ড রোডটী নির্ম্মিত হয় ৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে। ষাট বৎসরের উপর

হইল দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান রেল সুরু হইয়াছে। যে রাস্তার উপর দিয়া রেল গিয়াছে তাহা এবং রেল লাইনের জন্য প্রতি মাইলে ১ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা খরচ হইয়াছিল।

• পাহাড় জঙ্গল কাটিয়া এই শৈলাবাসটী নির্ম্মাণ করিতে যে বিপুল ব্যয় পড়িয়াছে, তাহা এখন কল্পনার বস্তু। সাহেবদের প্রয়োজনেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। ইহার জলবায়ু লণ্ডনের ন্যায় বলিয়া সাহেবদের এই স্থানটী অতি প্রিয়। গড়ে তাপ ৫৮ হইতে ৪৮ ডিগ্রীর মধ্যেই থাকিত, লণ্ডনেরই মত।

আঁকিয়া বাঁকিয়া গিরিবক্ষে রেলগাড়ী উঠিয়াছে—সে দৃশ্য অতি মনোরম।

দুই তিন দিনে দার্জ্জিলিং দেখা শেষ করিয়া যখন ফিরিয়া আসি, তখন মনে একটা বাসনা ছিল, আর একবার দার্জ্জিলিং ভাল করিয়া দেখিব। সম্ভাবনা ছিল অল্পই। কিন্তু আবার দার্জ্জিলিং আসিতে হইল অভাবনীয়রূপে। বিগত পূজার ছুটীতে দেওঘর যাইব ভাবিয়াছিলাম, আসিয়া উপস্থিত হইলাম দার্জ্জিলিংএ। সঙ্গে প্রবর্ত্তক-সম্পাদক।

আমার পথে দেরী হওয়ায় রাধারমণ বাবু আগেই আসিয়াছিলেন। ষ্টেশনে নামিয়া দেখিলাম, তিনি আমার সন্ধানে আসিয়াছেন। আনন্দ হইল। জিনিষপত্র বাসায় রাখিয়া তখনই বাহির হইয়া পড়িলাম। এখানকার আব্‌হাওয়ায় এমনি একটা সঞ্জীবনী যে, সারাদিনের ক্লান্তির পরেও ঘরে বসিয়া থাকিতে পারা গেল না।

পূর্ণিমা বহিয়া গিয়াছিল। অন্ধকারে গাছের আড়ালে, পাহাড়ের গায়ে গায়ে সারা শহরে দীপালীর মত উৎসব। নিশীথিনীর বন-ভবনে এই জাগরণের পথিকেরা মাতোয়ারা, ঘরে মন টিকিতে চা[illegible] ক্ষণপরে কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার চাঁদ উঠিল। দূর[illegible] প্রকৃতির অবগুণ্ঠন যেন সহসা খুলিয়া গেল। অপরূপা এ[illegible] নারীর স্তব্ধিত কলমর্ম্মরে অভিষিক্ত হইয়া হিমালয় নিথর হইয়া গিয়াছে। দূরের নিঃশব্দতা কাণে আসে, চিত্তে শিহরণ জাগে। বনে-কুঞ্জে বিসারিত হৃদয়খানি কুড়াইয়া লইতে মায়া হয়। কিন্তু আর বাহিরে থাকা চলে না— এই শ্রান্ত দেহখানি লোকালয়ের বন্দীশালায় রাতের অতিথি। বাহিরের জগৎ বাহিরেই পড়িয়া রহিল।

প্রকৃতির দুর্য্যোগ সুরু হইয়াছে তিন দিন ধরি[illegible]— ঝোড়ো হাওয়া, থাকিয়া থাকিয়া অলস বর্ষণ, মেঘের [illegible]। মনে পড়িল "বাংলা মা তোর শ্যামল গায়ে বাদল [illegible] দিন রজনী।" যতদূর চক্ষু যায়, গাছপালাগুলি [illegible] জড়সড় হইয়া যেন পাহাড়ের গায়ে থিতাইয়া পড়িয়াছে। উতলা হওয়া হঠাৎ ছুটিয়া আসে এই নিবিড় শ্যাম বনে, আর ডালপালাগুলি কাতরে কলরব করিয়া উঠে। বর্ষণের অক্লাস্তে যাঁহারা বাহির হইয়াছিলেন, তাদের কাহার কাহার ফ্লু লাগিল। পরে শুনিলাম, সারা বাংলায়ই এই তিন দিন সাইক্লোনিক বাতাস বহিয়া গিয়াছে।

বাদল কাটিয়া গেল। দার্জ্জিলিং আবার উদ্ভিন্ন-যৌবন লইয়া পূজার অতিথিদের নিমন্ত্রণের ডাক পাঠাইল। পথে পথে নারী-পুরুষেরা আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে। কাঞ্চনজঙ্ঘার শুভ্র-কিরীট উত্তরে বনরাজীর মাথার উপর দিয়া স্বর্গপুরীর চূড়ার মত দেখা দিল।

কাঞ্চন-জঙ্ঘার তুষার-শৃঙ্গে উষার প্রথম আলোক লাগিয়া আবার মেঘে ঢাকিয়া যায়। তাই ভোরেই উঠিয়াছিলাম, হিমালয়ের তুহীন-সম্পদ্ একবার নয়ন ভ্রান্ত করিয়া দেখিতে চাই। প্রভাতের ধূসরতা সবে ধরণীর উপর পড়িয়াছে; নগরের নরনারী এখনও সুখ-শয্যা ছাড়িয়া উঠে নাই। ক্বচিৎ দুই একজন পাহাড়ী জনবিরল রাস্তা দিয়া চলিয়াছে। অদূরে একখানি মূর্ত্তিমতী রাগিণী চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল— "আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ওই।" তার [illegible]স্ফুট শুভ্র তনু-রেখা ক্ষীণ কুয়াসার অন্তরালে ঝিকিমিকি দেখা যায়। একটু পরেই তন্দ্রালস মরাল-তুষার দেহখানি তরুণ রবির প্রথম অনুরাগে চুম্বনের রক্ত-রাগে রাঙিয়া, বর্ণে, বৈচিত্র্যেরূপে [illegible]অঙ্গ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল বিশ্বের নমিতা [illegible]দৃষ্টিতে। রবির করাঘাতে দেহ-প্রান্তে এলাইয়া [illegible] তার অঙ্গের কুহেলি বাস। এ দৃশ্য দেখিলে [illegible] অস্তিত্ব ভুলিয়া মেঘ-লোকে হারাইয়া যাইতে হয়। কাঞ্চন-জঙ্ঘার এই গৌরবে দার্জ্জিলিং গৌরবান্বিত। কিন্তু এ সৌন্দর্য্য, এত রূপের অভিনবত্ব আর দেখা গেল না। আকাশ পরিষ্কার থাকিলে শুভ্র তুষার শৃঙ্গ অনেক সময়েই চোখে পড়ে।

কাশ্মীর ভূ-স্বর্গ আখ্যা পাইয়াছে। দার্জ্জিলিং ভূ-স্বর্গ নয়—"শিশুর নন্দন" (Children's Paradise)। ইহা ইউরোপীয়ানদের দেওয়া নাম। তাদের মতে দার্জ্জিলিং-এর মত ভারতের আর কোথাও নাকি শিশুরা এত সুন্দরভাবে বাড়ে না।

ইংরাজ রাজপুরুষগণ দার্জ্জিলিংকে বিলাস-কানন করিয়াই গড়িতে চাহিয়াছিলেন, যেমন মোগল বাদশাহগণ করিয়াছিলেন কাশ্মীরকে। দার্জ্জিলিং ও কাশ্মীরের তুলনা হয় না, ইহাদের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। তুষারের এইরূপ-ঐশ্বর্য্য কাশ্মীরে দেখা যায় না, যদিও কাশ্মীর রাজ্যে বরফের অভাব নাই। সে সব স্থান দুর্গম। শ্রীনগর পাহাড়, নদী, হ্রদ ও বনের কোলে সমতল উপত্যকায় পাঞ্জাবের সীমা ছাড়াইয়া দুই শত মাইল দূরে বহু ঐতিহাসিক স্মৃতি-বিজড়িত একটা শহর। দুই শত মাইল বনপথে অবিরাম মোটর অভিযানের পর শ্রীনগরে আসিয়া মনে হয়, মানুষের সভ্যতাকে দূরে ফেলিয়া প্রকৃতির নিজের নিকেতনে আসিয়াছি।

ভাওয়ালের কুমারের রহস্যময় মৃত্যু-কাহিনী পড়িতে পড়িতে দার্জ্জিলিং-এর শ্মশানের চিত্র মনে উঠিয়াছিল। শ্মশান দেখিতে গেলাম। শহরের পশ্চিমে ভিক্টোরিয়া রোড হইতে অনেকটা নামিয়া প্রয়াণ-পথ। তাহার শেষে নির্জ্জন প্রান্তে বেড়ায় ঘেরা একটা ছোট বাগান। বাগানের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত স্মৃতি-সমাধিতে দুই এক ছত্র লেখা বুকে [illegible] মানুষের বেদনা অতীতকে ভুলিতে না পারিয়া স্তব্ধ [illegible] রহিয়াছে। পৃথিবীর শেষ চিহ্নটুকু জীয়াইয়া [illegible] যাহাদের সামর্থ্য আছে, তাহাদের চেষ্টা চ[illegible] যাহাদের ভাগ্য ছিল না, তাহাদের দেহ নিঃশেষে[illegible] গিয়াছে। এখানে সেখানে দুই একটা কলার [illegible] ঘাসে স্মৃতি-পাষাণগুলিকে মানুষের দৃষ্টির আড়া[illegible] রাখিতে কালের চেষ্টারও অন্ত নাই। মাঝে মাঝে [illegible] পাশে কেহ কেহ ছিন্ন ফুলের সাথে দুই এক বিন্দু অশ্রু ফেলিয়া গিয়াছেন। এই বিষাদ-ঘন বাতাসে ছন্নছাড়া ভাবে উপ্ত কয়েকটা ফুলের গাছ পরিমল ঢালিয়া দুঃখের আবহাওয়াকে যেন আরও তীব্র করিয়া তুলিয়াছে। একটা বকুল গাছকে খুঁজিতেছিলাম কল্পনায়, কোথাও দেখিলাম না, হয়ত এখানে জন্মে না।

পুরাণ শ্মশানের সন্ধান করিলাম—যেখানে ভাওয়ালের কুমার পৃথিবীর বিস্ময় জাগাইয়া জীবন-মৃত্যুর অপূর্ব্ব ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন রূপকথার চেয়েও অদ্ভুত বাস্তব হেঁয়ালিতে। রাধারমণবাবু অদূরে একটা বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের ওপারে দেখাইয়া দিলেন। সেখানে নাকি আগে ভয়াবহ জঙ্গল ছিল। প্রভাতের আলোকেই দেখিলাম স্থানটী নির্জ্জন, কিন্তু জঙ্গল আর নাই বলিলেই চলে। একটু পরে কলিকাতার এক ধনিক পরিবার আসিয়া আমাদের মতই পুরাণো শ্মশানের খোঁজ করিলেন।

মিলনকেন্দ্র ম্যালের আরামোদ্যান

[illegible]াদের সঙ্গিনী দুইটী তরুণীর অনভ্যাস পথ চলার কষ্ট-[illegible]মনের ব্যর্থ প্রয়াস দেখিয়া আমরা দ্রুত উপরে উঠিয়া [illegible]ম।

[illegible]নে দেশবন্ধু দাশের মৃত্যু আর একটা স্মরণীয় [illegible]টনা। একদিন তাঁর অন্তিম-আবাস "Step Aside" দেখিতে গেলাম। রাধারমণবাবু, অজিত এবং নেপালী ভৃত্য বাহাদুর এক সঙ্গেই চলিয়াছি। বেলা পড়িয়া আসিয়াছে, মেঘে ঢাকা সূর্য্য রঞ্জিত রোডের বামে পাহাড়ের আড়াল দিয়া অলক্ষ্যে অস্ত-পথে নামিয়াছে। "Step Aside" কাহাকেও স্পর্শ করিতে অনিচ্ছা জানাইয়া রাস্তা হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরাও পাশ কাটাইয়া চলিলাম। আগে লেবং-এর রাস্তা

ঝাঁকিয়া বাঁকিয়া প্রায় ৯০০ ফুট নীচে চলিয়াছে। আমরা ইতস্ততঃ করিতেছিলাম সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া। অজিতের উৎসাহে দ্বিধা ভাঙ্গিয়া গেল। ক্রমাগত নামিয়া চলিতেছি পাহাড়ী বস্তির পাশ দিয়া। পথের ধারে বৌদ্ধমঠ ফেলিয়া চলিলাম দেখিবার সময়াভাবে। শহরের পরিচ্ছন্নতা ছাড়াইয়া অরক্ষণীয় ভগ্ন শিলাখণ্ডতলে রাস্তার

মায়াপুরী দার্জ্জিলিং শিল্পী—

কঙ্কাল বাহির হইয়া জানাইয়া দিতেছে, ইহা অধিকার বঞ্চিত অঞ্চল। দূরে বার্চ্চ হিল ঘুরিয়া কার্ট রোড। এই রাস্তায় মোটর চলে লেবং পর্য্যন্ত। নীচে বস্তি ছাড়াইয়া জঙ্গলের ফাঁকে দুই একখানি কুটীর দেখা যায়। এই নিরালা-বাস কল্পনায় তপোবনের স্মৃতি জাগাইয়া তোলে। হয়ত ইহার আশে পাশে হরিণ, বাঘও চলাফেরা করে।

লেবং পৌছিতে সন্ধ্যা পার হইয়া গেল। ঘোড়দৌড়ের মাঠের কাছে আসিয়া দেখিলাম—দোকানীরা বাতি জালিয়া দিয়াছে। সে বাতি দূরান্তবাহী অন্ধকারের এক কোণে পড়িয়া যেন রুদ্ধ হইয়া মরিতেছে। দুই একটি লোকের ক্ষীণকণ্ঠের ক্ষীণতর আওয়াজ রাতের শুব্ধ সমুদ্রে ঠেকিয়া নিঃশব্দে ঝরিয়া যায়, আমাদের কাণে আসিয়া আর পৌছায় না, দৃশ্যমান অন্ধকারে দেখি শুধু তাদের চেহারা ও মূক অভিনয়। পল্টনদের ব্যারাক ও মিলিটারী কোয়ার্টারগুলি দূরে ছায়ার মত নির্জ্জীব হইয়া রহিয়াছে। এই তমো-বিষায়িত বিশীর্ণালোকে নিজেকেও নিজের কাছেই একটা কায়াহীন জীব বলিয়া ভাবিতে বাধে না।

লেবং দেখিলাম যমপুরীতে গিয়া এক দণ্ডে নিরালোকে ছায়ামূর্ত্তির বিদেহ রূপ দেখার মত। ফিরিতে হইবে। শনিবার, নিশান্তে ভূতচতুর্দ্দশী শেষে কালিকা-রাত্রি। এই ঘোরা সন্ধ্যায় নয়শত ফুট চড়াই ভাঙ্গা সহজ হইবে না। অনেক বাদানু-বাদের পর রাধারমণবাবুর আগ্রহাতিশয্যে কার্ট রোড দিয়া যাওয়াই স্থির হইল। অজিতের এই দীর্ঘ রাস্তায় যাইতে মন উঠিতেছিল না, তাহার বিশ্বাস এই পথ ৮।৯ মাইলের কম নয়, সুতরাং রাত অনেক হইবে। বাহাদুরও তাহাই বলিল। শহরের সীমার বাহিরে রাতের নির্জ্জনতায় দীর্ঘ অচেনা রাস্তায় যাওয়া মন সায় দিতে চাহে না, বিশেষতঃ দেরী দেখিয়া বাসায় সবাই উদ্বিগ্ন হইবে। রাস্তা ভাল, কিন্তু পথিপার্শ্বের আলোক কিছু দূর আসিয়া থামিয়া গেল।

মাইলখানিক পরে পাশ দিয়া দুইজন লোক শ্বাসে দৌড়িয়া গেল, চেহারা দেখা গেল না। ...সের একটা অস্ফুট শব্দ, মনে হয় কাণে আসে। ইত্যবসরে মেঘ ঘনঘটা করিয়া আসিয়াছে। ...র বিদ্যুৎ চমকাইয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতে ...। অজিত কহিল—রাস্তা এখনও তিন-চতুর্থাংশ বাকী। একে শীতের রাত, অন্ধকার, নিকটে আশ্রয়ের সম্ভাবনা নাই, তাতে সম্মুখে দুর্য্যোগের আসন্ন চিহ্ন। একটা অনিশ্চয় আশঙ্কার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলাম। ভাগ্যে চারিটী প্রাণী একসাথেই চলিয়াছি! অগ্রসর হইয়া

দেখিলাম, একখানি গরুর গাড়ী। বাহাদুর ডাকিয়া কহিল—বৃষ্টি নামিলে এই গাড়ীতে আশ্রয় লইতে হইবে। অবশ্য গো-শকটে দার্জ্জিলিং যাওয়া সম্ভব ছিল না, ইহার গতিবেগ রাস্তায় রাত কাটাবার মত। একটু পরে দার্জ্জিলিং হইতে দ্রুত ছুটিয়া-চলা একখানি মোটরের আলোকে কয়েকজন লোককে রাস্তা কাটিয়া পাশে যাইতে দেখা গেল। অজিত এখনও নিরাশ হইয়া কহিল—দশটার আগে পৌছান যাইবে না, পথের অনেক বাকী। বাহাদুর এবার রাস্তা চিনিল, উত্তর দিল—অর্দ্ধেক রাস্তা পার হইয়া আসিয়াছি। সন্দেহ ছিল। ক্ষণপরে পাহাড়ের বাঁক ঘুরিতেই শহরের আলোকগুলি দীপের মত পাতায়-পাতায় ডালে-ডালে ঝাঁকে-ঝাঁকে ফুটিয়া উঠিল। এতক্ষণে প্রাণে সাহস আসিল অন্ধকারের ভ্রূকুটী উপেক্ষা করার মত। একটু দূরে গিয়া দেখিলাম—মাইল পোষ্টে লেখা "লেবং ৩½ মাইল।" ঘড়িতে তখন সবে আটটা বিশ (ষ্ট্যাণ্ডার্ড)। তর্কযুক্তির অবকাশ রহিল না। কল্পনার দুঃসাহসিক নৈশ অভিযান হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেল। শুধু খেদ রহিল, দার্জ্জিলিং যাত্রার কাহিনীতে একটাও রোমাঞ্চকর নাটকীয় ঘটনার যোগাযোগ ঘটিল না।

স্কট্ল্যাণ্ডে কয়েকদিন

শ্রীমতিলাল দাশ

৬

১৩ই সেপ্টেম্বর, রবিবার। পথ-চলা পান্থ—বসিবার সময় নাই। গতি আকর্ষণ করিতেছে—দুর্ব্বার দুরতিক্রম্য তাহার টান। সকালে উঠিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া তৈরী হইলাম। তাহার পর পাচককে বলিয়া প্রাতরাশ গ্রহণ করিলাম। মিস টমসনের কাছে টাকা দিয়া বিল শোধ করিতে গেলে তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "আমাকে না বলে' প্রাতরাশ কেন খেলেন।" মেয়েটির শুষ্কতা আঘাত দেয়। নারী যখন তার সত্যকার আসন পায় না, ত[illegible] তার সহজ কোমলতা হারাইয়া ফেলে।

ডানকানের সঙ্গে আলাপ হইল। সে এবাড়ি[illegible] বাপের কাছে চিঠি দিল। মানুষটির অন্তরে [illegible] শোভনতা আছে। তাহার হৃদ্যতার সহিত মিস [illegible] নিষ্ঠুর দুর্ব্যবহার স্মরণ করিলে মিসের প্রতি [illegible] এবং কৃপা জন্মে।

গাড়ীতে পার্থ সহরের একজন মালির সঙ্গে আ[illegible] হইল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই যন্ত্রযুগে তোমরা কেমন আছ?"

লোকটি লেখাপড়া জানে। সে বলিল—"যন্ত্র আমাদের জীবনকে বিরূপ করেছে—ঘোড়ার গাড়ীর বদলে আমরা পেয়েছি দ্রুতগামী বাষ্পযান—কিন্তু হৃদয়ের [illegible] বাড়ে নাই—তাই জীবন শুষ্ক হয়ে উঠছে।"

কথাটি মনে লাগিল। ষ্টার্লিং সহরে গাড়ী বদল করিতে হইল। যে কামরায় উঠিলাম—সেখানে এক দম্পতি ও দুটি ছোট ছেলে ছিল। ছোট ছেলেটি আমায় দেখিয়া আলাপ জুড়িয়া দিল; পাশের এক বুড়ী ডাকিল—তাহার নিকট গেল না।

[illegible] স্কটল্যাণ্ডের পুরাতন রাজধানী—এখানেও [illegible] মত উচ্চ শৈলশিরে দুর্গ অবস্থিত—আপনা [illegible]হার সুন্দর ছবিটি মনে আঁকিয়া যায়। ইহারই [illegible]কবার্গের যুদ্ধ হয়। চতুর্থ জেমস্ কর্তৃক হলিরুড [illegible]সাদ নির্ম্মিত না হওয়া পর্য্যন্ত এইখানেই স্কটল্যাণ্ডের রাজারা বাস করিতেন। তাহাদের নৃত্যমুখর এবং দুঃখময় কাহিনীতে এই রম্য নগর পরিপূর্ণ। এখানকার নৈসর্গিক শোভা অতিশয় লোভনীয়।

উত্তর-পূর্ব্ব স্কটল্যাণ্ডের এই সুন্দর স্বভাব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আনন্দে চলিলাম। একটা ষ্টেসনের পাশে ফুলের বনে মৌচাকের ঘর দেখিলাম। ওদেশে আমাদের দেশের মত মৌমাছির বাঁধা বুনো চাক হইতে মৌ আহরণ করা

হয় না—মৌমাছিকে রীতিমত যত্নের সহিত পালন করা হয়। ষ্টেসনের প্রাচীর চিত্রে wallace marement সম্বন্ধে ছবি বিলম্বিত ছিল। তাহাও মনে ছাপ দিল।

ওয়ালেস একজন অতিপ্রসিদ্ধ স্বচবীর। জাতীয় জীবনের সন্ধিক্ষণে তিনি আবির্ভূত হইয়া জাতীয় স্বাধীনতার জন্য প্রাণত্যাগ করেন। বিজয় অভিযানের গর্ব্ব তাহার নাই, তথাপি জাতি তাহাকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করিয়া রাখিয়াছে। এবার্ডিতে গিয়া Y. M. C. A. তে গেলাম—তারা মিসেস কুটস্ নামক একজনের বাড়ীতে বাসার ব্যবস্থা করিয়া দিল। জিনিষপত্র রাখিয়া এক শিলিং দিয়া অবাধ ভ্রমণের টিকিট কিনিলাম। প্রথমে হোজানউড নামক সহরের আরামোদ্যানে গেলাম।

এখানে রডোডেনড্রন নামক পুষ্পের বৃক্ষ দেখিলাম—তখন ফুল ছিল না—শুধু গাছ দেখিয়াই তৃপ্ত হইতে হইল। বিস্তীর্ণ পুরোদ্যান—নর ও নারী যত্র তত্র বিচরণ করিতেছে—ঘুরিয়া ফিরিয়া বেশ আনন্দ লাগিল। কিন্তু বিক্ষেপহীন গভীর আরাম উপভোগ করিবার মত সময় আমার নাই—তাই সহরটিকে বৃত্তাকারে ঘুরিয়া ক্যানল ষ্ট্রীটে আসিলাম—এইটাই এখানকার প্রধানতম রাজপথ—নগরের নয়নমনোহর বিপনী প্রভৃতি সবই এই পথের পার্শ্বে অবস্থিত। এখান হইতে সমুদ্রতীরে গেলাম। সেখান হইতে ফিরিয়া ম্যানোফিল্ড নামক স্থানে গেলাম—ঐখান হইতে ঘুরিয়া ডি নদীর সেতুর উপর গেলাম—তারপ[illegible] অন্তদিকে ডন নদীর সেতু দেখিতে চলিলাম—[illegible] হইতে ফিরিয়া বৃত্তাকার চক্র দিয়া Woodsi[illegible] স্থানে গেলাম—সেখান হইতে Garden city [illegible] Bay of Niga—এই ছোট উপসাগরের তীরে [illegible] উপর খানিক বসিয়া সমুদ্রের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলা[illegible]

আমরা কূলের প্রাণী—অকূলকে ভয় করিয়া জীবন-যু[illegible] পরাস্ত হইতেছি। মুক্তা ও মণি সমুদ্রের বক্ষে—যে [illegible]নী [illegible] তাহার গলাতেই মুক্তামালা দোলে। এখান হইতে রোল- ডিলা দিয়া বাসায় ফিরিলাম। সমস্ত নগরের উপর চোখ বুলাইয়া লইলাম এক শিলিং মাত্র ব্যয় করিয়া; দরিদ্রের পক্ষে এই আয়োজন প্রশংসার্হ।

এবার্ডিন উত্তর সাগরের তরঙ্গ-বিধৌত উপকূলে গ্রাণাইট পাথরের স্বপ্নপুরী—ইহার এক প্রান্ত বাহিয়া কুলু কুলু করিয়া বহিতেছে স্বচ্ছতোয়া ডি, অপর প্রান্তে বহিতেছে ডন—এই দুই নদীর মাঝে এই আনন্দ নিকেতন পর্য্যটকের মিলনভূমি। ষ্টেসন হইতে বাহির হইলেই ইউনিয়ন ষ্ট্রীট—চমৎকার রাজপথ! এই সুন্দর রাজপথের দুই পাশে ততোধিক সুন্দর সৌধরাশি—নয়ন জুড়ানো তার রূপ। রৌদ্রকরোজ্জ্বল অপরাহ্নে এই নগরীর সঙ্গে যে দৃষ্টি বিনিময় হইয়াছিল—সে ছিল প্রীতি ও অনুরাগের—সে প্রীতি এই পর্য্যটনে দৃঢ় হইল। রূপসী বিদেশিনী নগরীর চোখের যাদু আমায় সত্যই মুগ্ধ করিয়াছিল। যেন কবি-গান শুনিতেছিলাম—অশিক্ষিত সেই যে পল্লীকবি গাহিয়াছিল, 'সই তোর রূপসাগরে ডুবলো আমার আঁখি-মীন'। ইহা যেন আমারই মুগ্ধ হিয়ার প্রতিধ্বনি।

এবার্ডিনে আহারের প্রথা অন্যরূপ—সকালে প্রাতরাশ, মধ্যাহ্নে ভোজন, অপরাহ্নে 'হাই টি' আর রাত দশটায় সান্ধ্যভোজন—আমাদের দেশের বিধানের সঙ্গে অনেক মিল আছে। কিন্তু কাজ করবার দিক হইতে এবং পথিকের দিক হইতে ইংরাজের বিধান অধিকতর উপযোগী। কাজের চাপেই ইংরাজদের আহারপ্রথার [illegible] হইয়াছে—দিনান্তের কর্ম্মক্লান্তির শেষে ইংরাজ [illegible] করে—এবার্ডিনের ডিনার কিন্তু দ্বিপ্রহরে। [illegible]র আসিয়া ডিনার খাইতে পাইয়াছিলাম—শুধু এক [illegible]মলেট, রুটি আর চা—তাহাই দিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি [illegible]মণ করিতে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া সান্ধ্যভোজন [illegible] কিন্তু তাহার আয়োজনও স্বল্প—পেট ভরে না [illegible] হয়। আমি নিরামিষাশী তাই আহারে সর্ব্বত্রই [illegible]বিধা ভোগ করি।

(ক্রমশঃ)

তেরো

মঞ্জুদি মাথা তুললেন। সমস্ত ঘরটা নিস্তব্ধ, একটা কিছু ঘটবার গুরুতর আশঙ্কায় ঘরের প্রত্যেকটা ইট্ কাঠ কড়ি বরগা জান্‌লা পর্য্যন্ত যেন স্তব্ধ হ'য়ে র'য়েছে। পূবের জান্‌লা দিয়ে সকাল আটটার স্নিগ্ধ উষ্ণ রোদ পিছ্‌লে প'ড়েছে মঞ্জুদির ছোট ঘরের মেঝের ওপরে। ঘরটা পরিপাটী আর সুন্দর ক'রে সাজানো। মঞ্জুদি আস্তে আস্তে উঠে এসে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলেন।

"গার্গী"—মঞ্জুদি অতি ধীরে অথচ অতি সহজেই ডাক্‌লেন, "গার্গী—তোর সংগে আমার কথা ছিল"। ওধারে খাটের একপাশে কতকগুলো বই ছড়ানো, ঘরে আর কেউ নেই—আগামী ঝড়ের প্রতীক্ষায় সমস্ত ঘরে যেন শঙ্কার ছায়া ফুটে উঠেছে।

কিন্তু আশ্চর্য্য, ঝড় উঠ্‌লো না—যে মেঘকে সারা আকাশ ভ'রে একটা বিরাট দুর্য্যোগ-দূতের মত দেখা গিয়েছিল, হঠাৎই একটা হালকা হাওয়ায় সেই বিরাট অকল্যাণ যেন ভেসে গেল—সমস্ত আকাশ ভ'রে অনন্ত নীল আবার ঝলমল ক'রে উঠ্‌লো, গার্গীর একটা হাত মঞ্জুদি নিজের হাতের ভেতরে টেনে নিলেন, "আমাকে তোর খুব ভয় করে গার্গী?"

গার্গী কথার উত্তর দিলে না। যেমন বসেছিল [illegible] ভাবেই, প্রায় পাথরের মূর্তির মত বসে রইলো।

"তুই যদি আমায় বিশ্বাস করিস—" মঞ্জুদি [illegible] আরো একটু কাছে ঘন হ'য়ে এলেন, "তুই যদি আমায় বিশ্বাস করিস, তাহ'লে আমি মেনে নি[illegible] কোনো দিন অপমান করবি না আমায় আর য[illegible] যদি আমায় ভালবাসিস, তাহ'লে এটুকু দা[illegible] কাছ থেকে নিশ্চয়ই আশা করতে পারি গার্গী।"

গার্গী শুধু একবার মাথা তুললো, তারপরে [illegible] মুহূর্তের জন্তে চাইলো জান্‌লার দিকে। কিন্তু এবারেও কোনো কথা বল্‌তে পারলো না—কেমন যেন একটা পাথরের মত ভারী নীরবতা তার সমস্ত কণ্ঠকে চেপে ধ'রেছে—সমস্ত বর্ণীমতা তার যেন আজ মুহূর্তেই মূক হ'ল।

মঞ্জুদি গার্গীর পিঠের ওপরে অতি আস্তে একটা হাত রাখ্‌লেন, "কথার উত্তর দে গার্গী, আমি তোর কোনো দিনই অকল্যাণের চিন্তা করিনি, তোকে যে আমি কী ভাবি, তা যদি জান্‌তিস—" মঞ্জুদি মধ্য পথে থাম্‌লেন।

"মঞ্জুদি—" গার্গী মঞ্জুদির চোখের দিকে চাইলে, দুই চোখ তার ছল ছল ক'রে এসেছে। "আমাকে এভাবে তুমি ব্যথা দিও না—আমি জানি তুমি আমায় কত ভালবাস—" গার্গী অসমাপ্ত কথাকে আর টেনে নিলে না, জান্‌লা দিয়ে বাইরের দিকে চাইলে—"শুধু আমি জানি না কি ক'রে তোমাকে ভালবাস্‌তে হয়; আমার সেই দুর্বার ত্রুটী—" গার্গী হঠাৎই থামলো।

মঞ্জুদি হাস্‌লেন, বল্‌লেন, "হ্যাঁ, তোর সেই দুর্বার ত্রুটি—কিন্তু জানিস—" মঞ্জুদি গার্গীকে আরো কাছে টেনে আন্‌লেন, "জানিস্, আমি সব বুঝি,—আমিও তো মানুষ গার্গী—আমার মনেও তো একদিন সব কিছু ছিল; তোর মত, তোর মতই আমিও ভালবাস্‌তে জান্‌তাম—কোনো মেঘ-মন্থর-বর্ষণ-ভারাক্রান্ত দিনে আমারো মন হা হা করতো, আমিও চেয়ে থাকতাম [illegible]কাশের দিকে—গার্গী, আমারো তো সবই ছিল [illegible]"

[illegible] ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে প'ড়েছে সেই গভীর নৈঃশব্দ [illegible] তারি ভেতরে মঞ্জুদির গলা কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে [illegible]—বাইরে উষ্ণ রোদ্দুরে সমস্ত পৃথিবী ভ'রে উঠেছে —জান্‌লা দিয়ে তীর্য্যক রেখায় একটা সরু সূর্য্যরশ্মি এসে গার্গীর মুখের ওপরে পড়লো। মঞ্জুদি তখনো ব'লে চ'লেছেন, "কি আমার ছিল না বল? একদিন আমিও আশা ক'রেছিলাম, যে ফলে-ফুলে ভ'রে উঠ্‌বো—অপূর্ব শোভায় আমারো সমস্ত দেহ মঞ্জরিত হ'য়ে উঠ্‌বে, সার্থকতায় আমিও হ'ব ঝলমল, কিন্তু তা হ'ল না —কিন্তু তা হ'ল না—যেভাবে সমস্ত পৃথিবীকে গ্রহণ

ক'রেছিলাম, ভাল ক'রে চেয়ে দেখি সেই 'গ্রহণ'টাই আমার ভুল হ'য়েছে—আমি ব্যর্থ হ'য়েছি—কঠিন মাটীতে কঠিন ভাবেই পা ফেলার প্রয়োজন, গার্গী। আমি বুঝি না তোর দুঃখ?" মঞ্জুদি মুহূর্ত্তের জন্যে একবারে থাম্‌লেন, গার্গী সেইভাবেই মাথা নীচু ক'রে ব'সে রইলো, মঞ্জুদি গার্গীর পিঠের ওপরে হাত বুলোতে লাগ্‌লেন, "তবু—কি করবি বল, নিজের ভবিষ্যতের দিকেও তোর ভাবা দরকার বোন্—তুই কি ভাবিস্, সেই একটা ভবঘুরে, ছন্নছাড়া আর খেয়ালীর ওপরে তোর সমস্ত জীবনের কর্ম্মশক্তিকে বলি দিবি?—তোর সমস্ত জীবনের কর্ম্মময়তা, তোর সমস্ত প্রেরণা?—সে তোর কি-ই বা বুঝ্‌বে?—শুধু একদিক ছাড়া—তোর জীবনের কোন্ অংশ সে ভরিয়ে তুলতে পারবে? তাও তুই পাবি—সে সাময়িক—সে ক্ষণিক, তা' থেকে সমস্ত দীর্ঘ জীবন হাঁটবার পাথেয় নিশ্চয়ই জুটবে না, একথা বিশ্বাস করিস্।" মঞ্জুদি আবার সামান্য একটু থাম্‌লেন, তারপরে বল্‌লেন, "তা ছাড়াও আরো একটা দিক আছে গার্গী, আজ তুই ভাল ক'রে ভেবে দেখ, সে তোকে কি দিল,—তুই তো সারাজীবন ধ'রে তার কাছে হাতই পেতে রইলি, কিন্তু সে তোকে কি দিল দেখ—কোন্ মহা অবজ্ঞা, কি রূঢ় অস্বীকার, তবু তুই সেই মোহকে পারলি না অতিক্রম করতে—তবু তোর সমস্ত স্নেহ আর ভালবাসা তাকে ঘিরে তোর সমস্ত মন ছেয়ে রইলো—এ ভুলকে ভাঙ্, গার্গী, আমি তোর এ অপমৃত্যু বেঁচে থাকতে দেখ্‌তে পারবো না। মান্‌লাম সে লেখক এবং বড়ো লেখক, আর [illegible] বাঙলা সাহিত্যে সে আসন পেয়েছে; কিন্তু [illegible] মানুষকে বিচার করবার সেইটাই কি চরম মানদণ্ড [illegible] তার অন্য সমস্ত দিককে অবাধে বাদ দিয়ে যাবার [illegible] হ'বে যুক্তি?—আমি তো কল্পনা করতে পারি না, [illegible] এইভাবে সমাজের ভেতরে অবাধে ঘুরে বেড়ায় সাধুতার মুখোষে নিজেকে আবৃত ক'রে, যে নিজেকে নিঃসংশয়ে সুপ্রচারিত ক'রে প্রতিষ্ঠা করে মেয়েদের আসরে—আর নিঃসন্দেহে তাদের করে বঞ্চনা—তার সমস্ত গতি লক্ষ্য করেও কি ক'রে—কি ক'রে তোর মোহ থাকে, তা আমি আজো ভেবে পাই না গার্গী?"

"মঞ্জুদি—" গার্গী যেন ভেতর থেকে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌লো, "আমায় ক্ষমা কর, ওভাবে—ওভাবে তুমি আর ব'লনা আমাকে।"

মঞ্জুদি হাস্‌লেন; ম্লান সন্ধ্যার অন্ধকারে ডুবে-যাওয়া আকাশের গায়ে বিবর্ণ লাল মেঘের মত সে হাসি—বল্‌লেন, "তা আমি জানি—আমি জানি তুই তাকে কতখানি ভাবিস, আর সেই জন্যই তো তোর এই দুর্গতি গার্গী—নয়তো, একটু ভাল ক'রে ভেবে দেখ, তুই যে-ফুল পূজার উপচারে নিয়ে এলি মাথায় ক'রে, তাকে সে অনায়াসেই পায়ে ঠেল্‌তে পারলো, একটুও ভাবলো না—একটুও তোর দিকে চাইলো না, অনন্ত ব্যথায় যে আকাশ কেঁপে উঠ্‌লো—তোর অনন্ত ক্রন্দনে যে ধরিত্রী ভিজে উঠ্‌লো—তার দিকে সে ভ্রূক্ষেপও করলো না—সে তার নিজের চরিতার্থতায়—নিজের স্বার্থপরতায়—নিজের পাশবিকতায়ও বলা যায়—ডুবে রইলো।"

"মঞ্জুদি—" গার্গী যেন এবারে চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠ্‌লো, "আমাকে তুমি ক্ষমা কর—আমাকে তুমি ক্ষমা কর—বার বার আমাকে ও-কথা শুনিও না, তুমি যা বল্‌বে, আমি তাই কোরবো। আমার আর কোন সংস্কার নেই—আমার আর কোন মোহ নেই। আমি, —আমি তোমার প্রত্যেকটী কথা শুনে চল্‌বো মঞ্জুদি।"

মঞ্জুদি আবার হাস্‌লেন, "সে আমি জানি, তুই [illegible]কে কোন দিনও অস্বীকার করতে পারবি না, [illegible] না অসম্মান করতে, আর সে কথা জানি বলেই [illegible] কাছে আজ এত কথা বল্‌লাম গার্গী।"

[illegible] মাথা নীচু করলো।

[illegible] এ ছাড়া অন্য আরেকটা দিক্‌ও তোর ভাববার [illegible] গার্গী", মঞ্জুদি আবার আস্তে আস্তে কথা বল্‌তে [illegible]লেন, "ও যে-রকম ছেলে তাতে তুই ওকে [illegible] দিনও হাতের কাছে পাবি না, চিরকালই ও [illegible] থাক্‌বে ঘুরে ঘুরে—আর তোকে দিনরাত কষ্ট দেবে, আর নিজে হাস্‌বে মনে মনে, হাস্‌বে তার বিদ্রূপে—ওদের পায়েতে আমরাই আগে মাথা কুটি, এই গর্ব্বে ওর সমস্ত বুক তখন ভ'রে উঠ্‌বে গার্গী; আর তুই আমার সঙ্গের

কজন অন্যতমা হ'য়ে সেই সম্মানকে ক্ষুণ্ণ করবি? একটু বে দেখ—একটু ভেবে দেখ আমি কতখানি মর্মবেদনায় এ কথার উল্লেখ করছি—আর": মঞ্জুদি য়েক মুহূর্ত্তের জন্যে একটু থামলেন: "আর হাতে তোর খন এত কাজ—এত কাজ যখন ছড়িয়ে র'য়েছে তোর রিদিকে তখন ভাবনা কি? নিজেকে তার মধ্যে ড়িয়ে দে গার্গী, নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ কর, দেখবি কদিন তুই মহীয়সী হ'য়ে উঠেছিস্—হ'য়ে উঠেছিস্ সমস্ত ভ্য সমাজের বরণীয়া—তোকে ঘিরেই জেগেছে সমস্ত নসমাজের স্তুতি—তুই তখন দেবী—আমার সঙ্ঘের প্রধানা সহযোগিনি। গার্গী, আমি মাঝে মাঝে সে-কথা ভাবি—কোন কোন রাত্রিতে—অনেক রাত্রিতে যখন কিছুতে ঘুম আসে না, তখন তোর সেই দীপ্ত ভবিষ্যতের বিজয়িনী মূর্ত্তিকে আমি স্পষ্ট চোখের ওপরে দেখতে পাই; আর আমি সমস্ত শরীরে-মনে যেন ভ'রে উঠি। আমার কি ভালই যে লাগে! কল্পনা করতেও যেন সমস্ত শরীরে অপূর্ব শিহরণ ব'য়ে যায়—আমার হাতে-গড়া তুই—আমার প্রত্যেকটি কার্য্যে একান্ত সহকর্মিনী তুই, এ কি আমার কম গৌরব গার্গী? একেক সময়ে মনে হয়, আমার এই নারী জন্মের এই তো চরম সার্থকতা, আর আমি কিছু চাই না। জীবনে অনেক মরুভূমি, পাহাড় আর সাগর পার হ'লাম, অনেক দুঃখকেই বৈশাখ-মধ্যাহ্নের চিতার মত জ্বলতে দেখলাম আমার পথে, কিন্তু তবু—তবু তারই মধ্যে সান্ত্বনা... তোকে আমি সেই পথের মাঝখানে কুড়িয়ে পে... তাই তো ভাবি, তাই তো ভাবি একেক সময় তো... হঠাৎই এইভাবে না পেতাম তা হ'লে কি হ'ত ... কোন্ অন্ধকারে আমার দিন কাটতো! তাই ... হয় ঈশ্বরের পরম নির্মল আশীর্বাদের মত তুই ... কাছে এসেছিস্—আর তোকে পেয়ে আমার ... ভ'রে উঠেছে। প্রথম দিন তোকে দেখেই আমি ... বুঝেছি, তোর চোখে দেখেছিলাম যে আভা, যে ... তাতেই বুঝেছিলাম, তুই উপযুক্তা—তুই আমার এই ব্যর্থ জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশে হয়তো ফোটাতে পারবি আলোর আভাস, হোক্ না সে যতই কম, তবু তাতেই আমি ধন্য হ'ব। একেক দিন কত রাত পর্য্যন্ত জেগেছি, ঘুম আসেনি, বিছানা ছেড়ে উঠে সমস্ত ঘরের মধ্যে পায়চারী ক'রেছি আর তোকে ভেবেছি—আর তোকে আমি কি ক'রে গড়ে তুলবো সেই চিন্তায়—সেই ভাবনাতেই আকাশের রঙ ফিকে হ'য়ে এসেছে—জান্‌লা দিয়ে চেয়ে দেখেছি ভোর হ'য়ে গেল।" "গার্গী" মঞ্জুদি এক মুহূর্ত্তের জন্যে থামলেন, "গার্গী, আমার সেই আশা, আমার সেই ভবিষ্যৎ সব তুই দু' পায়ে গুঁড়িয়ে দিয়ে চ'লে যাবি—আমার প্রতি তোর এতটুকু করুণাও কি নেই!"

"মঞ্জুদি—" গার্গী তাঁর দুই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে, "আমাকে তুমি এভাবে ব'ল না—বোঝো না কতো দুঃখ পাই আমি এতে—আমি কি জানি না তোমাকে? আমি বুঝি না তোমাকে? যা তুমি ব'লে এসেছো তাইতো ক'রে এসেছি—যা তুমি বলবে, আমি মাথা নীচু ক'রেই করবো—তুমি তো জানো না মঞ্জুদি যে তুমি আছ বলেই আজ আমি নিজের মনে কতখানি জোর পেয়েছি—তোমাকে অস্বীকার ক'রে এক মুহূর্ত্তও কি বাঁচা আমার সম্ভব?"

মঞ্জুদি হাসলেন, অবাধ—অতিশয় আর সুন্দর সেই হাসি—সমস্ত দুশ্চিন্তার ছায়া যেন সেই হাসির হাওয়ায় দূরীভূত হ'ল। বললেন "সে আমি জানি তবু শেষ পর্য্যন্ত আমরা মানুষই তো, কে বলতে পারে কোন্ প্রলোভনে কখন আমরা স্খলিত হই—কে বলতে পারে? আমাদের চারদিকে সেই প্রলোভন অপূর্ব্ব লোভনীয় ... ক'রে র'য়েছে—আমাদের সব সময়েই তাদেরকে ...'রে চলা—সব সময়েই তাদের সেই আপাতঃ ...তির অন্তরালে সুগভীর বেদনায় কংকালকে ...না—প্রতি মুহূর্ত্তেই নিজেদের সাবধান আর ...শোধন করা গার্গী, এ না হ'লে জীবনে প্রতিষ্ঠা সুদুর্লভ, ...সম্ভবও হয়তো বলা যায়!"

"তা আমি বুঝি" গার্গী ধীরে, অতি সংযতভাবে উচ্চারণ করলো।

"শুনলাম" মঞ্জুদি বিছানার ওপরে সোজা হ'য়ে বসলেন, "শুনলাম কাশীতে যে শাখা খোলা হ'য়েছে তাতে ঠিক মত কাজ হ'চ্ছে না—আমার মনে হয় একবার সেখানে যাওয়া দরকার—তুইও চল্ আমার সংগে। একটা ভাল

ব্যবস্থার অত্যন্ত প্রয়োজন সেখানে, তারপরে ওখান থেকে একবার দিল্লীর দিকেও ঘুরে আসা যাবে—আভাটার অনেক দিন কোন খবর পাইনি—সেই গত মাসে একটা চিঠি দিয়েছিল, তুই কি বলিস্ ?"

গার্গী মাথা নাড়লে, "আমার কি আর বলার আছে এতে, আর তা ছাড়া পরীক্ষা তো হ'য়েই গেছে—এখানে থাকার তো কোন দরকারই নেই—এক দিদা আছেন—ভাব্ছি—" গার্গী থেমে গেল।

"বল্—থাম্লি কেন ?"

"ভাব্ছি ওঁকেও নিয়ে যাব ওখানে—কাশীবাস করবার নিদারুণ ইচ্ছে হয়েছে ওঁর।"

"বেশ তো, ওখানেই স্বচ্ছন্দে ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া যাবে। শিপ্রা আছে, সেই সব দেখাশুনো করবে।"

"আর—" গার্গী আরেকটা কথা বলার সূত্রকে টেনে আন্লে—"আর ভাব্ছি এই বাড়ীটা একেবারে ভাড়া দিয়ে যাব—কলকাতায় আর এখন ফিরবো না, এখন আমার কিছুদিন বাইরে থাকাই দরকার।"

"বেশ—যা তোর ভাল লাগে করিস, আমার তাতে কণামাত্র আপত্তি নেই; তবে মনে রাখিস্ আমি যা বল্লাম—আমি যা বোঝালাম! আমার সেই ভবিষ্যৎ স্বপ্নকে সফল ক'রে তুলিস্ তুই।"

গার্গী চুপ ক'রে রইলো।

"বোস্" মঞ্জুদি উঠে দাঁড়ালেন, "অনেকক্ষণ এসেছিস্, একটু চা নিয়ে আসি—মল্লিকাটা বোধহয় এখনো ঘুম[illegible] আজকাল অনেক রাত জেগে কি যেন লেখে, মহ[illegible] প'ড়েছি। ওর জীবনে আবার নাটকীয় প্রভাব[illegible] কিনা কে জানে।"

"এইখানেই তো তোমার ভুল মঞ্জুদি—" [illegible] দিয়ে[illegible] মল্লিকা সোজা মূর্ত্তিমতী ঋজু একটী বিদ্যুৎলতার মত [illegible] প্রবেশ করলো—"আর ওইখানেই তো বারে বারে তুমি ভুল কর, উঁকি মেরে রাত একটা পর্য্যন্ত কি যে লিখি তা দেখবার সামান্য সাহসও তো তোমার নেই; খালি পেছন থেকে কী যে লিখি তাই নিয়ে গবেষণা! তোমার মল্লিকা প্রেমপত্র রচনার ভেতরে ডুবে' রাত্রির ঘন অন্ধকার পার হ'চ্ছে, না, শ্রীমান্ নলিনীকান্তের কথা ভেবে এক বিরহ-করুণ দীর্ঘ নাটকীয় গাথা লিখছে—সেটা অন্ততঃ সংঘের সম্পাদিকা হিসেবেও খোঁজ নেওয়া উচিৎ ছিল অনেক আগে, মঞ্জুদি। এখনো মনটাকে পাকাতে পারলে না তুমি।"

মঞ্জুদি হাস্লেন, বল্লেন, "তোর সংগে যে দিন আমি কথায় পারবো, সে দিনের এখনো অনেক দেরী; বোস্—আমি আস্ছি" বলে মঞ্জুদি নীচে নেমে গেলেন।

মল্লিকা এগিয়ে এসে খাটের ওপরে বস্লো: "তারপরে কি খবর ভাই গার্গী দেবী—আমাদের তো একরকম ভুলেই গেছ, শুনলাম" গার্গীর আরো একটু কাছে ঘন হ'য়ে এসে অপেক্ষাকৃত নীচু গলায় বল্লে, "তোমার রাজকুমার নাকি ফিরে এসেছেন, এবং তিনি নাকি ফিরে এসেই নতুন ক'রে ঝড় তুলেছেন তোমার মনে? তাই তো এত সহজে ভুলে যেতে পেরেছো আমাদের—"

গার্গী মাথা তুল্লো, হেসে বল্লে, "একটু ভুল করলে দিদি, রাজকুমাররা অবশ্য ঠিকই আসেন বা এসেছেন, কিন্তু নতুন ক'রে ঝড় তুল্বার জন্যে তাঁদের অন্য রকম সাধনা থাকা দরকার, সেই সাধনা থেকেই তাঁরা বঞ্চিত এ তো তুমিও বোঝো ?"

মল্লিকা সামান্য অপ্রতিভ হ'ল—বল্লে, "হ্যাঁ সে কথা অবশ্য জানি কিন্তু ইদানিং তোমার এই আমাদের এখানে নিদারুণ অনুপস্থিতি লক্ষ্য ক'রে এই রকম ধারণাই করেছিলাম, কিন্তু যা-ই ব'ল" মল্লিকা গার্গীর একটা হাত [illegible] কোলের ওপরে টেনে নিলো, "তোকে দেখে [illegible]মি হিংসে হয়, সত্যি ?"

[illegible]র অপরাধ ?"

[illegible]াধ ? ওঃ—" মল্লিকা সামান্য একটু হাস্লো, [illegible]রের নির্ব্বাচন মানুষের এত ভাল হ'তে হয় [illegible] হিংসে হয় না ? সে দিন ওঁর 'নীল রাত্রী' [illegible]—কি স্বচ্ছ চিন্তা আর দৃঢ় মনোবিকলন, ভারী [illegible]লাগলো; আমার মনে হয় ওঁকে পেলে তুই ভ'রে উঠবি—শুনেছি দেখতেও নাকি খুব…"

"থামো দিদি—" গার্গী হঠাৎই বাধা দিলে, "তোমাদের শোনার যে কি মূল্য আছে, তা আমি আজও ভেবে পাইনি। যত আজেবাজে কথা নিয়েই সময়

কাটাতে ভাল লাগে, তারপর গার্গী জোর ক'রেই বর্ত্তমান প্রসংগের ওপরে যবনিকা টানলো, "তারপর তোমার ওদিকের খবর কি ব'ল ?"

"আর খবর! বিরহানলে সারাটী হিয়া হ'ল যে জরো জরো" তোর কথা তো আর শুনতে দিলি না নিজের কথাই বলি এখন পাঁচ কাহন ক'রে।" মল্লিকা খাটের ওপরে এলিয়ে পড়লো, "নলিনীকান্তকে না পেলে আমি আর বাঁচবো না, গার্গী!"

"তাই নাকি ?" হো হো ক'রে গার্গী হেসে উঠলো: "এতোদুর ? আমাকে তো কিছুই জানাওনি দিদি ?"

"জানাবো কিরে, এ যে অনুভূতির ব্যাপার, এ কি আর লোককে গিয়ে বলে' দেওয়ার দরকার হয় ? মোট কথা ভী—ষ—ণ, ভীষণ প্রেমে প'ড়েছি আর কি!"

গার্গী হাসলো, বললে, তা হ'লে তোমার সেই প্ল্যানের কি হ'ল, সেই যে, মনে আছে ?" মল্লিকা শুয়ে শুয়েই মাথা নাড়লো, বললে, "তা আর মনে নেই, সে প্ল্যান তো আমার আছেই—ওটা যে অংগ, অবিচ্ছেদ্যভাবে প্রেমের সংগে ওতঃপ্রোত জড়িত—প্রয়োজন হ'লেই প্রয়োগ করবো। 'প্রেম ও পাদুকা' পড়িসনি বইটা ?"

। মন্দ নয়"—গার্গী সেই ভাবেই হাসলো, বললে, "শুনলাম আজকাল খুব সিনেমা টিনেমা দেখছো ওঁর সংগে ?"

"আর বলিস না—প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহেই, সে দিন তো ভদ্রলোক ভাবের আতিশয্যে মোটরের তলাতেই পড়েছিলেন আর একটু হ'লে!"

"ব'ল কি ?—"

"হ্যাঁরে, ভাগ্যে আমি ছিলুম সংগে, হাতটা পেছন থেকে চট্ করে টেনে ধরলাম—এমন ওয়ার্থলেশ—সত্যি ওর জন্যে মাঝে মাঝে আমার এত দয়া হয়!"

হাতে একটা কাগজ নিয়ে দরোয়ান এসেছিল, মঞ্জুদি দরজার সামনে থমকে দাঁড়ালেন, "দেখি—" দরোয়ানের কাছ থেকে ছোট কাগজের টুকরোটা তিনি হাতে ক'রে নিলেন, পড়ে বললেন, "বোলাও—"

মল্লিকা বিছানার ওপরে তাড়াতাড়ি সংযত হ'য়ে উঠে বসলো, "ব্যাপার কি ? কে আসছে আবার ? নলিনীকান্ত নাকি ?" চোখ তার খানিকটা উপস্থিত শান্তি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় কাঁপছে, "আচ্ছা জ্বালাতনে পড়েছি বাবা!—দেখি ?" বলে মঞ্জুদির হাত থেকে মল্লিকা কাগজটা টেনে নিলে—গার্গীও ঝুঁকে পড়লো, দেখলো, ছোট ছোট ক'রে লেখা 'বিদ্যুৎ বসু' তার নীচে আরও ছোট একটু কলমের দাগ!

(ক্রমশঃ)

শার্দ্দূল-পর্ব্বত

(Tig[illegible]ling)

শ্রী[illegible]

শীতের হিমেল বায়ু স্পর্শ দেয় সমগ্র [illegible] [illegible]রয়েছে রাতি, জ্বলে বাতি আকাশে তারার,
আপাদ মস্তক ঢাকা তবু কেঁপে ওঠে সা[illegible] [illegible]কী দেখায় পথ, ঝিঁঝিরা বাজায় নহবৎ;
কেহ চলে খরবেগে কেহ বা চলিছে অতি[illegible] [illegible]পাশে গাছের শ্রেণী ছোট বড়, পাতার বাহার;
কেহ বা গাহিছে গান, সুরাসার পান ক[illegible] [illegible]সমুখে দাঁড়ায়ে আছে অতিকায় শার্দ্দূল-পর্ব্বত।

পায়ে-পায়ে প[illegible]ত্রীর স্তনাগ্র চূড়ায়,
তরলিত অন্ধকার[illegible]চলে আলোর আভাস
আঁকিছে রঙের ছা[illegible] অপরূপ, নয়ন জুড়ায়,
দেখিলাম সূর্য্যোদয়, পূর্ণ হ'ল মোর অভিলাষ।
পায়ে-পায়ে ফিরে এনু অপূর্ব্ব আনন্দে ভরা মন;
বাতাসে উত্তাপ আসে, নীলাকাশে জ্বলিছে তপন।

ব্রহ্মসূত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

(তৃতীয় পাদ)

শ্রীমতিলাল রায়

ন আত্মা অশ্রুয়তেঃ নিত্যত্বাৎ চ তাভ্যঃ ॥১৭

আত্মা (জীব) ন (উৎপদ্যমান নহে) [কস্মাৎ] (কি হেতু) অশ্রুয়তেঃ (যে হেতু উৎপত্তিপ্রকরণে আত্মার উৎপত্তিবাক্য শ্রবণগোচর হয় না। আরও) তাভ্যঃ (শ্রুতিতে) নিত্যত্বাৎ (আত্মার জন্মরহিত অজরত্বাদির কথা উক্ত হইয়াছে)।

কোন কোন শ্রুতিতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় জীবের উৎপত্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। আবার কোন কোন শ্রুতি জীবভাবে বস্তুতে অনুপ্রবেশের কথাও বলিয়াছেন। এই কারণে জীব উৎপন্ন কি অনুৎপন্ন, এই সংশয় স্বাভাবিক হয়।

শ্রুতির অনেক স্থানে বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় আত্মার উৎপত্তির কথা আছে বটে, কিন্তু এমন শ্রুতিবচনও পাওয়া যায়—যথা, 'ন জীবোম্রিয়তে' 'আত্মা' 'অজো-নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ম্ পুরাণঃ'। জীবের উৎপত্তিবিষয়ক যে সকল শ্রুতিবাক্য, তাহা ঔপাধিক। শ্রুতিই ইহার প্রমাণ। শ্রুতি বলিতেছেন 'প্রজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যোভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি' অর্থাৎ প্রজ্ঞানঘন এই সকল ভূত হইতে উত্থিত হইয়া পুনঃ ভূতের বিনাশে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। উপাধির বিনাশে স[illegible] পর্য্যন্ত থাকে না।

এই বিনাশ যে আত্মার বিনাশ নহে, শ্রুতি [illegible] করার জন্য বলিতেছেন "অত্রৈব মা ভগবান্মহাস্তম[illegible] বা অহমিমং বিজানামি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি"—হে ভগব[illegible] আত্মা বিজ্ঞানঘন অথচ সংজ্ঞাহীন হয়, আপনার এ[illegible] বাণী আমি বুঝিতে পারিতেছি না। মোহপ্রাপ্ত হইলাম। ঋষি উত্তরে বলিতেছেন—'ন বা অরে ব্রবীম্যবিনাশি বা অরেঽয়মাত্মানুচ্ছিত্তিধর্ম্মামাত্রাসংসর্গস্তস্য ভবতি' অর্থাৎ আমি মোহবাক্য বলি নাই। আত্মা অবিনাশী। আত্মার উচ্ছেদ হয় না, মাত্রাসংসর্গ হয় মাত্র। অর্থাৎ যে উপাধিতে আত্মা অবস্থান করেন, সেই উপাধিনিবন্ধন তাঁহার জন্ম-মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ করিতে গিয়া শ্রুতি আত্মার উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন। শ্রুতির মুখ্য বাণী সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ। আত্মা অনুৎপন্ন, ব্রহ্মস্বরূপ, নিত্য বস্তু।

জ্ঞোঽতএব ॥১৮॥

অতএব (এই হেতু অর্থাৎ আত্মার যখন উৎপত্তি প্রলয় নাই), [তস্মাৎ (সেই হেতু)] জ্ঞঃ (আত্মা নিত্য চৈতন্যস্বরূপ)।

আত্মা নিত্যচৈতন্য। সংশয় হয়, আত্মা যদি নিত্য চৈতন্যস্বরূপ হইবে, তাহা হইলে সুষুপ্তিকালে অথবা গভীর নিদ্রায় চৈতন্যাভাব ঘটে কেন? বৈশেষিকেরা বলেন—আত্মা নিত্যচৈতন্যস্বরূপ নহেন। আত্মা উদিত-চৈতন্য বা আগন্তুক চৈতন্য। লৌহদণ্ড অগ্নিসংযোগে যেমন লৌহিত্য-গুণ প্রকাশ করে, এইরূপ মনের সহিত আত্মার সংযোগ হইলে, তবেই চৈতন্যাগম হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রুতি এ কথা স্বীকার করেন না। শ্রুতি বলেন—তিনি পূর্ণ এবং জ্ঞানঘন। তাঁর যে অপ্রকাশের কথা বলা হয়, উহা সত্য নহে। সুপ্তিকালে বা গভীর নিদ্রায় পুরুষের চৈতন্য থাকে না, ইহা অনুমান মাত্র। এই অবস্থায় পুরুষে চৈতন্যাভাব যদি ঘটিত, তাহা হইলে [illegible] ও জাগ্রত অবস্থায় আমি প্রসুপ্ত ছিলাম বা [illegible] নিদ্রাগত ছিলাম, এই চেতনা আসে কোথা [illegible] সুষুপ্তিতে চৈতন্যের অভাব হয় না। বিষয়ের [illegible]। দ্রষ্টব্য না থাকিলে, দ্রষ্টার অভিব্যক্তি কেমন [illegible] হইবে? অতএব আত্মার স্বরূপচৈতন্য অবশ্যই [illegible]

উৎক্রান্তি গত্যাগতীনাম ॥১৯॥

[illegible] যথা [illegible] [illegible]ক্রান্তি, গতি ও অগতি, জীবধর্ম্মের এই তিন গুণ শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে।

যথা—'স যদাস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রামতি সহৈবৈতৈঃ সর্ব্বৈরুৎ-ক্রামতি' অর্থাৎ যখন জীব এই শরীর হইতে বাহির হয়, তখন এই সকলের সহিত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-প্রাণের সহিত

প্রস্থান করেন। ইহা উৎক্রামণের কথা। শ্রুতি গতির সমর্থন করিতেছেন—'যে বৈ কে চ অস্মাল্লোকাৎ প্রয়ন্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি' অর্থাৎ যে কেহ এই লোক হইতে প্রয়াণ করেন, তাঁহারা সকলেই চন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকেন। আগতির কথাও শ্রুতি বলিয়াছেন —'তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে' অর্থাৎ সেই চন্দ্রলোক হইতে পুনর্ব্বার এই লোকে তাঁহারা কর্ম্মহেতু আগমন করেন।

জীব যদি ব্রহ্ম হইবে, তবে তাঁহার উৎক্রামণ, গতি ও অগতির কথা শ্রুতি সমর্থন করিবেন কেন? জীব ব্রহ্ম হইলে, জীবও সর্ব্বব্যাপী হইবেন, এই অবস্থায় তাঁহার উৎক্রমণাদি ব্যাপার সম্ভব হইতে পারে না। অতঃপর জীব কি পরিমিত? পূর্ব্বে জীবের মধ্যমপরিমাণ বা দেহ-পরিমাণ অপ্রমাণিত হওয়ায়, এই শ্রুতিপ্রমাণে জীব যে কোন ভাবেই হউক, পরিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছেন। জীব মধ্যমপরিমাণ না হউক, অণুপরিমাণ হইতে পারেন কিনা, তাহাই বিচার্য্য। পরবর্ত্তী সূত্রে পরপক্ষের সংশয় ব্যক্ত করিতেছে।

স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ ॥২০॥

উত্তরয়োঃ (গতি ও অগতির সহিত) স্বাত্মনা (স্বয়ং আত্মার সম্বন্ধ আছে)।

শ্রুতিতে আছে—জীব ইন্দ্রিয়দিগকে গ্রহণ করিয়া হৃদয়ে গমন করেন। আবার স্ব-স্ব স্থানে আগমন করিয়া থাকেন। এই শ্রুতিতে জানা যায়—জীবের উৎক্রমণই [illegible] গতি নহে। জাগ্রত জীবনেই দেহমধ্যে জীবের [illegible] বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল প্রমাণে জীবকে [illegible] না বলিয়া বিভু বলা যায় কি প্রকারে? তাহ[illegible] দেখান হইতেছে।

নাণুরতচ্ছ্রুতেরিতি চেন্নেতরাধিকারাৎ ॥[illegible]

ন অণু (জীব অণু নহে) [কেন?] অত[illegible] (শ্রুতিতে অণুর বিপরীত পরিমাণের কথাই কথিত হইয়াছে) ইতি চেৎ (এইরূপ যদি বলি) ন (না, তাহাও বলিতে পার না) ইতরাধিকারাৎ (ঐ শ্রুতিবচন ব্রহ্ম-প্রকরণ হেতু বলা হইয়াছে, জীব হেতু নহে)।

জীবের যখন গত্যাগতি আছে, আর যখন তাঁহাকে মধ্যমপরিমাণ বলা যায় না, তখন তিনি অণু। যদি বেদান্তবাদীরা বলেন—এ কথা ঠিক নহে, কেননা শ্রুতিতে স্পষ্টই আছে, 'সবা এষ মহানজ আত্মা', ইত্যাদি। অর্থাৎ সেই আত্মা মহান্ অজ প্রভৃতি; তদুত্তরে বলা যায় যে, এ শ্রুতি জীবপক্ষে নহে, পরন্তু ব্রহ্মপ্রকরণে অভিহিত। এ কথা স্বীকার করার আরও হেতু আছে—

স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ ॥২২॥

স্ব শব্দ চ উন্মানাভ্যাম্ (শ্রুতিতে অণুবাচক শব্দ ও উন্মান অর্থ হইতে জীবের অণুত্ব সিদ্ধ হয়।)

শ্রুতি বলিতেছেন—'এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সম্বিবেশ' অর্থাৎ এই অণু সেই আত্মা, যাহা চিত্তের দ্বারা বেদিতব্য; যাহাতে পঞ্চপ্রাণ বিভক্ত হইয়া আবিষ্ট আছে। উন্মান শব্দের অর্থ অল্প—শ্রুতি বলিতেছেন—কেশাগ্র শত ভাগে বিভক্ত হইলে, এক ভাগকে জীব বলিয়া জানিবে।

অতএব জীব অণু না হইয়া ব্রহ্ম হন কেমন করিয়া? বেদান্তবাদী তর্ক তুলিতে পারেন, জীব যদি অণু হন, উহার সর্ব্বশরীর জুড়িয়া থাকিতে পারে না। তাহার উত্তর আছে।

অবিরোধঃ চন্দনবৎ ॥২৩॥

চন্দনবৎ (চন্দনের ন্যায় দৃষ্টান্তে) অবিরোধঃ (অণু [illegible]ত্মা দেহব্যাপী হইতে বাধে না।)।

[illegible]পুরাণে স্পষ্টই লেখা আছে 'হরিচন্দনবিপ্রুষ [illegible]তায়ং সর্ব্বশরীরব্যাপ্তিঃ'—একবিন্দু চন্দন এক [illegible]লে সমুদয়কে চন্দনবিপ্লুষ বলা যায়। সেইরূপ [illegible] সর্ব্বশরীরব্যাপ্ত বলিতে বাধা কি? বিষয়টী [illegible]রও পরিষ্কার করা হইতেছে।

অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতিচেন্নাভ্যুপ-
গমাদ্ধৃদিহি ॥২৪॥

অবস্থিতিবিশেষাৎ (চন্দনবিন্দু কোন একটী নিশ্চয়-স্থানে থাকা হেতু আত্মার সহিত ইহার তুলনা হয় না। কেননা আত্মা সর্ব্বশরীরব্যাপী) ইতি চেৎ (এইরূপ যদি বলি) ন (না চন্দনদৃষ্টান্ত নির্মূল) (কেন?) অভ্যু-

পগমাৎ (আত্মা ও শরীরের এক স্থানে অবস্থিতির কথা শ্রুতিতে থাকা হেতু) হৃদিহি (ছান্দোগ্যে স্পষ্টই আছে 'হৃদিহ্যেষ আত্মা')।

চন্দন শরীরের এক স্থানবর্ত্তী দৃষ্টান্তে আত্মা সপ্রমাণ হয় না ; এইরূপ সংশয়ের উত্তর দিতে গিয়া বলা হইতেছে, শ্রুতিতেও তো আত্মার এক দেশে অবস্থানের কথা বলা হইয়াছে। একাঙ্গে চন্দন লিপ্ত হইলে সর্ব্বাঙ্গ যেমন শীতলতা অনুভব করে, আত্মাও সেইরূপ একদেশস্থ হইয়া দেহব্যাপী চেতনার সঞ্চার করে। জীবের অণুত্ব পক্ষে আরও যুক্তি প্রদর্শন করা হইতেছে।

গুণাদ্বালোকবৎ ॥২৫॥

বা শব্দে চন্দনদৃষ্টান্ত আত্মার অণুত্ব প্রমাণপক্ষে যদি অপরিতোষের কারণ হয়, এই জন্য বলা হইয়াছে গুণাৎ (গুণপ্রভাবহেতু। তাহা কিরূপ ?) আলোকবৎ (প্রদীপের ন্যায়)।

প্রদীপও একস্থানে থাকে। কিন্তু তাহার আলোকচ্ছটা ব্যাপক স্থান অধিকার করে। আত্মাও সেইরূপ অণু হইয়া চৈতন্যগুণে দেহব্যাপী হয়।

কিন্তু এ দৃষ্টান্ত আত্মার অণুত্ব প্রমাণ করে না। কেননা, প্রদীপ আত্মার ন্যায় গুণমাত্র নহে। নিবিড় তেজঃ নামক দ্রব্যের নাম দীপ। আর উহার প্রভাব তেজের বিরলতা মাত্র। আত্মা এইরূপ পরিচ্ছিন্ন বিষয় নহেন। এই আপত্তির খণ্ডনের জন্য পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা হইতেছে।

ব্যতিরেকো গন্ধবৎ ॥২৬॥

ব্যতিরেকঃ (জীবের চৈতন্যগুণ ব্যতিরেকে [illegible] (গন্ধের ন্যায়) অর্থাৎ গন্ধ যেমন নিজের আশ্রয় ব্য[illegible] অবস্থান করিতে পারে, আত্মাও তদ্রূপ আশ্রয় ব্যতিরেকে [illegible] সর্ব্বব্যাপী হন।

জীব অণু, তাঁহার চৈতন্যগুণ সমস্ত দেহে বিস্তারিত হইতে বাধে না।

চন্দন অথবা দীপ দ্রব্য ও গুণ দুইই। আত্মা এই দুইয়ের সহিত তুলিত হইবে না কেন ? জীব অণু ও নিরবয়ব, এ কথা সত্য। কিন্তু তাহার চৈতন্যগুণ অস্বীকৃত হয় না। যদি এইরূপ স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, এই অণু আত্মা হইতে চৈতন্যের বিস্তার গন্ধ ও আলোর মত ব্যাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে বলা যায়—এমন হইলে আত্মার তো ক্ষয়নিবারণ হয় না। গুণ গুণীকে পরিত্যাগ করে না—পরমাণু আশ্রয় করিয়া গুণ-প্রকাশ হয়। এই হেতু দেখা যায় গুণাধার কালে ক্ষীয়মাণ হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই হেতু জীবের অণুত্বপ্রমাণ যুক্তিসঙ্গত নহে। তদুত্তরে বলা যায়—

তথা চ দর্শয়তি ॥২৭॥

তথা চ (শ্রুতিতে তো এইরূপই) দর্শয়তি (প্রদর্শিত হইয়াছে)।

শ্রুতি, বলেন 'হৃদয়াতনত্বমণুপরিমাণত্বাত্মনঃ' অর্থাৎ আত্মার স্থান হৃদয়। আত্মার পরিমাণ অণু। এই উক্তি থাকায় চৈতন্য "আলোমভ্য আনখাগ্রেভ্য" ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। শ্রুতি-প্রমাণ পাইয়াও আত্মাকে অণুপ্রমাণ না বলার হেতু কি ? আত্মা যে অণুপরিমাণ, তাহার আরও প্রমাণ আছে।

পৃথগুপদেশাৎ ॥২৮॥

পৃথক্ (আত্মা ও প্রজ্ঞা পৃথক্ রূপে) উপদেশাৎ (উপদিষ্ট হইয়াছে, এই হেতু)।

শ্রুতি বলিতেছেন "প্রজ্ঞয়া শরীরম্ সমারুহ্য" অর্থাৎ প্রজ্ঞার দ্বারা শরীরে সমারূঢ় হইয়া। এই কথার অর্থ— আত্মা ও প্রজ্ঞা দুইটী পৃথক্ বস্তু। যেমন দীপ ও দীপের [illegible]ভার। এইরূপ শ্রুতি প্রমাণ থাকিতে আত্মাকে অণু [illegible]দোষ হয় না। কিন্তু বেদান্ত-মতে আত্মা অণু [illegible]তু। পূর্ব্বপক্ষের এইরূপ সিদ্ধান্তের উত্তরে [illegible]ছে—

[illegible]গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ ॥২৯॥

[illegible] পূর্ব্বপক্ষনিষেধার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে) তদ্গুণ- [illegible] (সেই বুদ্ধির প্রাধান্য হেতু) তদ্ব্যপদেশঃ [illegible] অনুরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে) প্রাজ্ঞবৎ (পরমাত্মা সগুণ উপাসনার জন্য যেমন নানারূপে অভিহিত হন)।

শ্রুতিতে আত্মা অণু বলিয়া যে উল্লিখিত হইয়াছেন, তাহার কারণ আত্মা জীবাধারে সুখ-দুঃখ কর্ম্মাদি ভোগ

করেন যে বস্তুর আশ্রয়ে, সেই আশ্রয়-বস্তু বুদ্ধি নামে প্রসিদ্ধ। এই বুদ্ধির প্রাধান্তঘোষণার জন্ত ইহাকেই আত্ম-বোধে নানারূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। আত্মা নিত্যমুক্ত। আশ্রয়-গুণানুসারেই আত্মার পরিমাণ ব্যপদিষ্ট হইয়া থাকে।

আত্মাকে অণু বলিয়া প্রমাণ করার শ্রুত্যুক্ত বাণী আত্মার উদ্দেশে যে উল্লিখিত হয় নাই, তাহা এই শ্রুতি-বচনেই প্রমাণিত হইবে। "বালাগ্রশতভাগস্য" ইত্যাদি শাস্ত্রবাণীর শেষে এই কথা আছে—'স চ আনন্ত্যায় কল্পতে' সেই জীবকে অনন্ত বলিয়া জানিবে। 'কেশাগ্রের শতধাবিভক্ত একভাগ পরিমাণ জীব', এইটুকু মাত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে অণু বলা চলে না। তার পরেই বলা হইয়াছে—তিনি অনন্ত। একই শ্লোকে অণু ও অনন্ত বলায়, কোনটী ঔপচারিক ও কোনটী পারমার্থিক ইহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য নহে। শ্রুতির অভিপ্রায় ব্রহ্মত্বভাব প্রতিপাদন করা। যেখানে শ্রুতি আত্মাকে অল্প বা অণু বলিয়াছেন, সেইখানে আত্মা কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা বুঝিতে হইবে। আত্মা মহান্ জন্মরহিত। আত্মাই জীব। ব্রহ্মই জীবভাব প্রাপ্ত হন, এইরূপ প্রচুর শ্রুতি-বচন আছে—"বুদ্ধের্গুণেনাত্মগুণেন চৈব আরাগ্রমাত্রো হ্যবরোঽপি দৃষ্টঃ' অর্থাৎ বুদ্ধিগুণের দ্বারা ও আত্মগুণের দ্বারা আত্মা 'আরাগ্র মাত্র' অবরের ন্যায় পরিদৃষ্ট হন। আরও বলা হইয়াছে 'এষোঽণুরাত্মা চেতসাবেদিতব্যঃ' এই অণু-আত্মা চিত্তের দ্বারা জ্ঞেয়। আবার এই শ্রুতিই বলিয়াছেন—'ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাক্ ন মনঃ'; [illegible] উপরোক্ত শ্রুত্যুক্তি অণু-আত্মা বলিতে উপাধিযুক্ত [illegible] কথাই বলিয়াছে। জীব নিজে অনন্ত; কিন্তু গুণ[illegible] এই আত্মা আপনার নির্ম্মলস্বভাবভ্রষ্ট হন। এই [illegible] আত্মাই অবর অর্থাৎ অপকৃষ্ট ও আরাগ্র (লৌ[illegible] সর্ব্বাগ্র ভাগকে আরাগ্র বলে)। প্রকৃতপক্ষে [illegible] নহেন। উপাধিযুক্ত আত্মাকে অণু বলা [illegible] আত্মার উৎক্রমণ সম্বন্ধেও কথা আছে। আত্মা 'ন [illegible] ন ম্রিয়তে' তিনি জন্মেনও না, মরেনও না। তবে আবার শাস্ত্রাদিতে পুনর্জ্জন্ম না হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয় কেন? উপাধিযুক্ত আত্মা গুণাভিভূত হইয়া সুখ-দুঃখাদিতে অভিভূত হইয়া জন্মাদি ক্লেশ হইতে মুক্তি চায়। জন্ম হইতে মুক্তির প্রার্থনা মায়াপরিচ্ছন্ন আত্মার বা গুণীভূত আত্মার স্বভাবপ্রেরণা। পরিচ্ছন্ন আত্মার ইহা প্রকৃত স্বভাব নহে। এইজন্য আত্মজ্ঞানেই জন্মমৃত্যুর অতীত হওয়ার কথা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। উপাধিগুণপ্রাধান্যে আত্মা জন্ম-মৃত্যুর অধীন বলিয়া ভ্রম হয়। এই ভ্রম দূর করার উপদেশই শাস্ত্রে আছে। শাস্ত্র স্পষ্টই বলিয়াছেন, কাহার উৎক্রান্তিতে আমার উৎক্রান্তি? কাহার অবস্থানে আমার অবস্থান? ইহা চিন্তা করিয়া 'স প্রাণমসৃজত' তিনি প্রাণ সৃষ্টি করিলেন।

যাহা সৃষ্ট, তাহাই বিনষ্ট হয়। যাহা অজ, তাহা শাশ্বত। আত্মা অমৃত। উপাধিভূত হইয়া তিনি জন্ম-মৃত্যুর লীলারত। প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বব্যাপী সনাতন আত্মার জন্ম-মৃত্যুর বন্ধ নাই। সৃষ্টি মাত্রেই ভেদ-ব্যপদিষ্ট। আত্মা প্রতি সৃষ্টিতে অনুস্যূত হইয়া সৃষ্ট বস্তুর উপাধিভূত হন। এই পরম জ্ঞানের অনুশীলনই শাস্ত্রাদিতে হইয়াছে। আত্মার অণুত্ব ঔপচারিক। ব্রহ্মত্বই পারমার্থিক।

আত্মা অণুও নহেন, মধ্য-পরিমাণও নহেন। তিনি মহান্।

যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ ॥ ৩০ ॥

যাবদাত্মভাবিত্বাৎ (যত কাল আত্মা দেহযুক্ত থাকিবে ততদিন) তদ্দর্শনাৎ (শাস্ত্র তাহা দেখিয়া আত্মার সমস্থায়িত্ব দেখাইয়াছেন, যেহেতু) ন দোষঃ (উপরোক্ত আত্মাকে অণু বলায় দোষপ্রাপ্ত হয় না) অর্থাৎ অণু [illegible]বুদ্ধিসংযোগবশতঃই ঘটে। বুদ্ধি ও আত্মা, এই [illegible] সংযোগ যেমন আছে, তদ্রূপ বিয়োগও তো [illegible]রে? আশ্রয়হীন অবস্থায় আত্মার অসদ্ভাব [illegible]ব না?

বক্ষ্যমাণ সূত্রে আত্মার এই দোষ হয় না, ইহাই বলা [illegible]য়াছে। কি হেতু দোষ হয় না? যেহেতু নিত্যমুক্ত সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন পৃথক্ চেতন বস্তু শ্রুতি-প্রমাণে পাওয়া যায় না। আত্মা বুদ্ধিগত হইয়া অহংবোধ প্রাপ্ত হয়। এই বোধ হইতে বিচ্ছিন্ন আত্মাই শ্রুতির মন্ত্রে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। যথা—'অহং ব্রহ্মাস্মি,' আমিই ব্রহ্ম। আত্মার জীবত্বপ্রাপ্তির কথা শ্রুতিতে আছে—যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ

স সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব।' এই যে পুরুষ প্রাণে বিজ্ঞানময়, হৃদয়ে অন্তর্জ্যোতিঃ স্বরূপ, ইনিই বুদ্ধির সহিত একীভূত হইয়া লোক-মধ্যে বিচরণ করেন—ধ্যানের ভান করেন, ক্রীড়ার অভিনয় করেন। এই বুদ্ধি হইতে আত্মার বিযুক্তি অথবা সংযুক্তি আত্মার বিভুত্বকে লঙ্ঘন করে না। বুদ্ধিযুক্ত হইয়া তিনি লোক-লীলাদি করিয়া থাকেন। এই বুদ্ধি দেহাদির বিনাশে পরিসমাপ্ত হয় না। এইরূপ হইলে তিনি লোকান্তর গমন করিবেন, আবার ঐহিক জীবনলাভ করিবেন কি প্রকারে? এই বুদ্ধ্যুপাধিযুক্ত আত্মাই ধ্যানচ্ছলে বলিয়া থাকেন "বেদাহমেতং পুরুষম্"—আমি এই পুরুষকে জানিয়াছি। "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি"—জীব তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যু অতিক্রম করে।

এই 'তমেব' ব্রহ্ম বা আত্মা ভিন্ন আর কিছুকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হয় নাই। বোধাশ্রিত আত্মাই ধ্যানাদি করেন, লোকাদি কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট থাকেন। শ্রুতি এই জন্যই "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" যেন ধ্যান করেন, যেন লীলা করেন, এইরূপ বলিয়াছেন। এই যেন শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য আত্মা আত্মাকে ধ্যান করিবে—অগ্নিকে অগ্নি দগ্ধ করার ন্যায় এইরূপ অসদৃশ ঘটনার পরিহারকল্পে উক্ত হইয়াছে। এই বোধ ও আত্মা দুইটী পৃথক্ পদার্থ। আত্মা অবিনাশী। তিনি বোধের আশ্রিত হইয়াছেন। বোধ আত্মসৃষ্ট; দেহাদির বিনাশে তাহার বিনাশ নাই—তবে তাঁহার লয় আছে। বোধের লয়ে, আত্মার [illegible] হয় না। আত্মার জন্ম-মৃত্যু নাই, ইহা বল[illegible] বুদ্ধির লয় হইলে আত্মা উপাধিহীন হন; আ[illegible] স্বরূপ-লক্ষণ। বুদ্ধ্যতিরিক্ত আত্মার অনুভূতি বুদ্[illegible] কল্পিত হয়। আত্মা আত্মাকে জানিতে চা[illegible] না[illegible] শাস্ত্রাদিতে যে অনুবৃত্তির প্রশংসা আছে, ইহা বুদ্ধিগ[illegible] আত্মার বিলাস-স্বপ্ন। আসলে আত্মার জন্ম বা অনাবৃত্তি কল্পনাই করা যায় না। বুদ্ধি-ব্যতিরিক্ত আত্মার স্বরূপ কল্পনা করিয়াই শাস্ত্র বলিয়া থাকেন—আত্মজ্ঞান হইলে জীবের অনাবৃত্তি হয়। বস্তুতঃ বুদ্ধির অনুশীলনের ইহা চরম আদর্শ। আত্মার 'কিবা দিবা, কিবা রাত্রি'—দুইই তুল্য কথা। আদর্শ সকল সময়ে সাধ্য নহে।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে, মুক্তিকালে বা প্রলয়ে আত্মা বুদ্ধিসংযোগ ত্যাগ করেন কিনা। এইরূপ হইলে সূত্রে যে আছে 'যাবদাত্মভাবিত্ব', আত্মার জীবত্ব এই সময়ে তো রক্ষা পায় না। তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

পুংস্ত্বাদিবত্ত্বস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ ॥৩১॥

পুংস্ত্বাদিবৎ (পুংধর্ম্মদৃষ্টান্তের ন্যায়) অস্য (বুদ্ধি-সম্বন্ধের) সতঃ (বিদ্যমান্ থাকে) অভিব্যক্তিযোগাৎ (জাগ্রত-কালে প্রকট হয়, এই হেতু)।

অর্থাৎ জীবত্ব অনন্তত্বেরই নামান্তর। লোকদৃষ্টান্তে দেখা যায় যে, পুংধর্ম্ম বীজাকারে থাকে। তখন তাহার পরিণতি প্রতীত হয় না। কিন্তু কালে পুংশ্চিহ্নাদি অভিব্যক্ত হয়। বীজে এই সকল না থাকিলে, এইরূপ প্রকাশ হইতে পারে না। সুষুপ্তিকালে ও প্রলয়ে বুদ্ধিও এইরূপ প্রসুপ্ত থাকে। ব্রহ্মের জাগরণে যথাযথ সৃষ্টি-বুদ্ধির আশ্রয়ে পুনঃ প্রকাশিত হয়। মনু মহারাজ তাই বলিয়াছেন—ব্যাঘ্র-সিংহাদিও যে যেরূপ থাকে, সে সেইরূপই পুনরাবির্ভূত হয়। এই সকল দৃষ্টান্তে বুঝা যায়, আত্মা কোনদিনই উপাধিরহিত নহেন। যখন অনুৎপন্ন উপাধি তখন তিনি নিরাকার অক্ষর-স্বরূপ, আর যখন তিনি উপাধিযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হন, তখন তিনিই আবার সাকার ক্ষর-পুরুষ। ক্ষর হইয়া তিনি আত্মবুদ্ধিতে অনাবৃত্তি কামনা করেন। যেন জন্ম-মৃত্যু কতই না ক্লেশের বিষয়। আবার অক্ষর হইয়া আলোচনা করেন [illegible] বহুস্যাং প্রজায়েয়"। আত্মা তাই শুধুই অক্ষর, শুধুই [illegible]ন, তিনি পুরুষোত্তম। উপাধিভূত বুদ্ধি-চৈতন্যে [illegible]জ্ঞান জন্মিলে, জীব জন্ম ও মৃত্যু তুল্য করিয়া [illegible]থাকেন।

[illegible]ত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গোঽন্যতর-নিয়মোবান্যথা ॥৩২॥

[illegible]ত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ (হয় নিত্যোপলব্ধি, নয় অনুপলব্ধির প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে) [কুতঃ কেন?] অন্যথা (বুদ্ধির বীজভাব অস্বীকার করিলে) বা অন্যতর নিয়মঃ (অথবা অন্যতর নিয়ম হয়, আত্মা অথবা বুদ্ধ্যাদি এই দুইটীর একটী শক্তির প্রতিবন্ধক হয়)।

অর্থাৎ আত্মার উপাধি স্বীকার না করিলে, নিত্য অনুপলব্ধির প্রসক্তি আসিয়া পড়ে। কিন্তু নিত্য অনুপলব্ধি দেখা যায় না। আর আত্মা সেন্দ্রিয় হইলে, নিত্য উপলব্ধি হইত। এইরূপ ঘটনাও দৃষ্টিগোচর হয় না। এই হেতু আত্মা ও ইন্দ্রিয় ব্যতীত অন্য পদার্থ স্বীকার করিতে হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন, "অন্যত্রমনা অভূবং নাদর্শমন্যত্রমনা অভূবং নাশ্রৌষম্" ইতি "মনসা হ্যেব পশ্যতি মনসা শৃণোতি ইতি"—মন অন্যত্র ছিল সেই জন্য দেখি নাই। অন্য মনে ছিলাম, তাই শুনি নাই। আমরা মনের দ্বারাই দেখি, মনের দ্বারাই শুনি।

এই মনই বোধ নামে প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে যে বুদ্ধির কথা বলা হইয়াছে, তাহা এই মনের নামান্তর। মন বিজ্ঞান ও চিত্ত নামেও অভিহিত হয়। মনের বৃত্তি চারি ভাগে বিভক্ত। সংশয়াত্মিকা বৃত্তিই মনের লক্ষণ। নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি বুদ্ধি নামে খ্যাত। অহং-বোধ বিজ্ঞানের বৃত্তি। চিত্তের বৃত্তি স্মৃতি। এই মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার বা বিজ্ঞান ও চিত্ত অন্তঃকরণ নামে কথিত হয়। জীবের উপাধি এই অন্তঃকরণকে লইয়া। জীবের সঙ্কল্পবিকল্প, কামনা ও শ্রদ্ধা মনের বৃত্তিরূপে প্রকাশ হয়। আত্মার অন্তঃকরণ-প্রাধান্যে অভিনিবেশ বশতঃ সেই অবস্থাকে শ্রুতির ভাষায় অণু বলা হইয়াছে। আসলে আত্মা ব্রহ্মই।

(ক্রমশঃ)

যুদ্ধোত্তর শিক্ষা-ব্যবস্থা

শ্রীসন্তোষকুমার দে এম. এ., এইচ্. ডিপ্. এড্. (ডাবলিন)

মানুষের যুগযুগান্তের সাধনার ধনকে কুৎসিৎ বিদ্রূপ করিয়া দানবিকতা যে বিভৎস লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া সারা ইউরোপ ও আফ্রিকাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে ও যাহার প্রলয় শিখার বহ্নিতে সম্প্রতি এশিয়া ও আমেরিকা ঝাঁপাইয়া পড়িল; সেই যুদ্ধের অবসান একদিন হইবেই; কিন্তু যে দুঃখ দৈন্য, আর্ত্তনাদ ও বেদনা সে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইবে, তাহার তুলনায় যুদ্ধকালীন [illegible] ক্লেশ সম্ভবতঃ তত অসহনীয় নহে। যুদ্ধাবসানে[illegible] সঙ্গেই আসিবে মানুষের মনে ঘোর অবসাদ [illegible] দারিদ্র, দুর্ভিক্ষ, বেকার-সমস্যা, স্ত্রী-পুরুষ [illegible] শ্রমিকের নূতন অধিকার সমস্যা, নূতন নূতন [illegible] সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি।

"We shall be faced after war with under[illegible]tion and unemployment which are insepara[illegible] trade cycle, the international financial proble[illegible] which is wound up the struggle for favourable balance of payment involving tariffs and quotas and the buying of foreign currencies by speculators, the unwillingness consequent upon industrialisation of primary producing countries, are particularly the dominions and India; to receive imports of manufactured goods which previously they imparted freely, and the necessity of moving people from over populated to underpopulated countries."*

আজকালকার যুদ্ধজয় বাস্তবিক পক্ষে পরাজয় অপেক্ষা খুব বেশী গ্লানিকর বলিয়া মনে হয় না। এই যুদ্ধের অবসানে জেতার দুঃখ বিজিতের দুঃখ অপেক্ষা কোন অংশে কম হইবে না। জেতা পাইবে কতকগুলি [illegible]মাটি" (scorched earth); কিন্তু সেই সঙ্গে [illegible] বাহিরে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হইতে [illegible]স্ত্রের ঝনৎকারে সে সমস্যা দূর হইবে না [illegible]ই শোচনীয় পরিণাম সকল রাষ্ট্র ধুরন্ধরেরাই [illegible]নেন, তবু এই দানবকে দমন করিয়া রাখিবার কোন [illegible]পায়ই তাঁরা বাহির করিতে পারিতেছেন না। অনেক আশা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া জাতি-সংঘের সৃষ্টি হইয়াছিল কিন্তু আজ সেই জাতি সংঘ একটি কুৎসিৎ বিদ্রূপে পরিণত হইয়াছে। জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ সম্পূর্ণভাবে নিবারণ করা কিছুতেই সম্ভব নয়; কারণ মানুষ যতদিন জীবিত থাকিবে, দ্বেষ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা ততদিন

* Lord sempills speech in the House of Lords.

থাকিবে। মানুষকে দেবতায় পরিণত করিতে না পারিলে, যুদ্ধ একেবারে নিবারিত হইবে না। Combative instinct মানুষের অন্তর হইতে তাড়ান অতি দুষ্কর। তবুও এই সংস্কারকে একেবারে দূর করিতে না পারিলেও, তাহাকে কতকটা উন্নত (Sublimate) করা যাইতে পারে এবং সে কার্য্য একমাত্র শিক্ষার দ্বারাই সম্ভব।

গত মহাযুদ্ধের জন্ম হয় কাইজার উইলহেলমের গগনস্পর্শী উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও লোভের ফলে; বর্ত্তমান যুদ্ধেরও আদি কারণ হইল এই লোভ—অবশ্য ইহার সঙ্গে অন্যান্য কারণও যে নাই, সে কথা অস্বীকার করা চলে না। গত যুদ্ধেও দেখা যায়, যুদ্ধের বহু পূর্ব্ব হইতেই নিট্সে, ব্যারণ-হাডি প্রভৃতি মনীষীরা এবং বিসমার্ক, ফ্রেডারিক প্রভৃতি রাষ্ট্রনেতারা সমগ্র জার্ম্মান জাতিকে একটি প্রকাণ্ড সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্য ধীরে ধীরে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু তবু তাঁহাদের পরিকল্পনার কিছু খুঁত থাকিয়া গিয়াছিল, তাই জার্ম্মান জাতি পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত হইতে পারে নাই। তাঁহারা চাহিয়াছিলেন, অস্ত্রেশস্ত্রে দেশকে সুদৃঢ় করিয়া এবং তাঁহাদের ভাবধারা শুধু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার করিয়া জাতিকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করিতে। ভাবিয়াছিলেন, তাঁহাদের চিন্তাধারা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়া চুঁয়াইয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া পড়িবে। অর্থাৎ তাঁহারা চাহিয়াছিলেন, উপর হইতে আরম্ভ করিয়া নীচে নামিতে; আর হিটলার চাহিয়াছেন, একেবারে গোড়ার ধাপ হইতে আরম্ভ [illegible] উপরে উঠিতে। তাই তিনি সমগ্র জাতিকে [illegible] করিবার জন্য একেবারে পাঠশালার গুরুমহা[illegible] আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের [illegible] লইয়াছেন। তারপর তাঁর সুশিক্ষিত ও সুদক্ষ প্রচা[illegible] মন্ত্রীরা সুকৌশলে প্রচার করিতে লাগিলেন, জার্ম্মান জাতি[illegible] জগতের একমাত্র শ্রেষ্ঠ জাতি, সমগ্র ইউরোপে তাহারাই একমাত্র প্রভুত্ব করিবার অধিকারী। সুকুমারমতি শিশুরা খেলার ছলে পরিচিত হইতে লাগিল যুদ্ধের আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্রের সহিত। টিনের বা এলুমিনিয়মের ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ি, উড়ো জাহাজ, কলের কামান, রাইফেল, সাবমেরীণ হইল তাহাদের খেলার সামগ্রী। তাহারা শিখিল জার্ম্মান 'রাইখের' জন্য কায়, মন ও প্রাণ সমর্পণ করিতে; শিখিল তাহাদের দেহ ও মনের উপর তাহাদের অধিকার নাই—তাহা ষ্টেটের; কাজেই ষ্টেটের মঙ্গলের জন্য যখন যেভাবে প্রয়োজন তাহাকে নিয়োজিত করিতে হইবে; না করিলে তাহা হইবে কর্ত্তব্যচ্যুতি। ব্যায়াম ও কঠোরতার সাধনে দেহ তাহাদের তৈয়ারি হইল ক্রুপের কারখানার ইস্পাতের মত দৃঢ়; নিয়মানুবর্ত্তিতা, অবিচলিত ভাবে কর্ত্তব্যপালন, নিজ নিজ দলপতির উপর অবিচলিত শ্রদ্ধা ও আনুগত্য হইল তাহাদের নব দীক্ষার মূলমন্ত্র। স্বাধীন চিন্তা, ন্যায়পরায়ণতা, দর্শন ও কাব্য-কলার চিন্তা লোপ পাইল; বিজ্ঞান মানুষের কল্যাণ সাধনে রত না হইয়া মারণবিদ্যায় নিত্য নব কৌশল আবিষ্কারের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে ৬।৭ বৎসরের মধ্যে জার্ম্মান জাতি দুর্দ্ধর্ষ সামরিক জাতিতে পরিণত হইল—সমগ্র পৃথিবীতে ত্রাসের সঞ্চার করিল।

এই একই চিত্র দেখিতে পাই সোভিয়েট রাশিয়ায়। জারের রাশিয়া আর ষ্ট্যালিনের রাশিয়ায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ। এই প্রভেদ সম্ভব হইয়াছে শুধু শিক্ষার ফলেই। ষ্ট্যালিন বাইশ বৎসর ধরিয়া সমগ্র রুশ জাতিকে একদিকে জাপান ও অন্যদিকে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন। রাশিয়ার সম্বন্ধে হয়ত বলা চলে, সে যাহা করিয়াছে, শুধুই আত্মরক্ষার জন্য; কিন্তু ইহার সত্য [illegible] বিচার করিবে কে? ভবিষ্যতই তাহা একমাত্র [illegible] পারে।

[illegible] হউক আমাদের এত কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই [illegible] যুদ্ধের শোচনীয় পরাজয়ে হতাশা ও অবসাদ [illegible] যে জার্ম্মান জাতি অন্ধকারে দিশাহারা [illegible]টুখানি আশার আলোর জন্য হাতড়াইয়া [illegible]ছিল, সেই অবসন্ন জাতি যদি ৬।৭ বৎসরের [illegible] দ্বারা এত বড় দুর্দ্ধর্ষ ও নিয়মানুবর্ত্তী জাতিতে পরিণত হইতে পারে, তাহা হইলে জগতে ভবিষ্যৎ যুদ্ধ নিবারণের উপায়, দীর্ঘ শান্তির ব্যবস্থাও এই শিক্ষার দ্বারাই সম্ভব। পৃথিবী হইতে যুদ্ধ একেবারে উঠিয়া যাইবে, এ কল্পনা আমরা করি না; তবে যুদ্ধকে অন্ততঃ দীর্ঘকাল ঠেকাইয়া

রাখা সম্ভব এবং তাহার নিষ্ঠুরতাও হয়ত কিছু প্রশমিত করা সম্ভব। • পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে যুদ্ধ চলিয়া আসিতেছে এবং আসিবেও; কিন্তু তবু ইহার সম্ভাব্যতাকে শিক্ষার দ্বারা কিছু পরিমাণ হ্রাস করা যায়, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। ভারতের ইতিহাসেও দেখা যায়, রঘু, দিলীপ, দশরথ প্রভৃতি দিগ্বিজয়ী বীরেরা বহু যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পৌরাণিক যুগের কথা ছাড়িয়া দিয়া ঐতিহাসিক যুগে ফিরিয়া আসিলেও দেখা যায়, অশোক প্রভৃতি মহারাজারা বহু যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং সাম্রাজ্য বিস্তারও করিয়াছিলেন; কিন্তু তবু সে যুগের রাজ্যের সীমানা বিস্তারের সহিত বর্ত্তমান যুগের Imperialism বা সাম্রাজ্য লোলুপতার তুলনা হয় না। তাঁরা দেশ জয় করিয়াছিলেন কিন্তু সেগুলিকে কুক্ষিগত করেন নাই; বিজিত দেশে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন তাহাও সত্য, কিন্তু তাহা ত্যাগের দ্বারা শোধিত ও দুঃখের দ্বারা মার্জ্জিত করিয়াই করিয়াছিলেন—শক্তিপ্রয়োগ বা প্রলোভন প্রদর্শন করেন নাই। সে দেশের ইতিহাস, ধর্ম্ম, সাহিত্য, কৃষ্টি, এক কথায় জাতির প্রাণশক্তিকে নষ্ট করিয়া তাহার মর্ম্মে আঘাত হানেন নাই; তাই সে যুগের যুদ্ধ বা অধীনতা ছিল না এত ভয়ের কারণ। এই সব দিগ্বিজয়ী বীরেরা শুধুই অন্য দেশকে নিজেদের সার্ব্বভৌমিকত্ব স্বীকার করাইয়াছিলেন, তাহাদের স্বাধীনতা হরণ করেন নাই। যাহাই হউক এ প্রসঙ্গ লইয়া আর অধিক অগ্রসর না হইয়াও এই কথাই বলা যাইতে পারে যে, এক পুরুষের ম[illegible] যে দুটি পৃথিবী-ধ্বংসকারী মহাযুদ্ধ ঘটিল, তাকে [illegible] নিবারণ করিতে না পারিলেও, অন্ততঃ ইহার এ[illegible] সংঘটনকে যদি বন্ধ না করা যায়, তাহা হইলে [illegible] ভবিষ্যৎ অতি অন্ধকারময় বলিতে হইবে। হ[illegible] কারণ নাই, আমাদের বিশ্বাস যে কার্য্য জা[illegible] বিশ্বশক্তি-সংঘ করিতে পারে নাই, সে কার্য্য [illegible] যদি সমস্ত জাতি ও দেশ নিজ নিজ শিক্ষার আমূল[illegible] সাধন করেন। অবশ্য এই দুরূহ কার্য্যকে সফল করিতে হইলে, রাষ্ট্রনৈতিক কতকগুলি সমস্যারও সমাধান করিতে হইবে; কিন্তু উপস্থিত সেগুলির কথা এড়াইয়া যাইয়া বর্ত্তমানে শিক্ষার সংস্কারের দ্বারা বস্তুটি কি ভাবে সফল হইতে পারে, তাহাই আলোচনা করিব। এখন হইতে সকল মনীষীকে ভাবিতে হইবে এই প্রলয়ঙ্কর মহাযুদ্ধের অবসানের পর কোন্ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহার ফলে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে হানাহানি নিবারিত হইবে। যুদ্ধপূর্ব্বের শিক্ষা ব্যবস্থা যুদ্ধোত্তর যুগে একেবারেই অচল। আমাদের দেশের শিক্ষার ত বহু গলদই আছে এবং তাহার সংস্কার কিভাবে হইতে পারে, তাহার আলোচনাও বহু পূর্ব্বে প্রবর্ত্তকে করিয়াছি*। কিন্তু ইউরোপ, আমেরিকার শিক্ষা ধারাকেও বদলাইতে হইবে, তাহাকে নূতন আদর্শের সন্ধান করিতে হইবে, নূতন গুরুকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। এই নূতন আদর্শ ও গুরু এই বুদ্ধ-শঙ্কর নানক-চৈতন্যের জন্মভূমি ভারতবর্ষেই মিলিবে।

"Even the most enthusiastic believer in the Western civilisation must feel to-day a certain despondency of the apparent failure of the West to dominate its scientific discoveries and to envolve a form of society in which material progress and spiritual freedom march comfortably together. Perhaps the West will find in India's more general emphasis on simplicity and the ultimate spirituality of things a more positive example of the truthts which the most advanced minds of the West are now discovering." †

জগতের সমস্ত অশান্তি ও উপদ্রবের মূল হইল লোভ, গৃধ্নুতা। বিগত মহাযুদ্ধের মূলেও এই গৃধ্নুতা, লোলুপতা দেখা যায়। তাই উপনিষদ্‌কার জগৎকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন—মা গৃধঃ। কখন লোভ করিও না। লোভ হইতেই জগতের সমস্ত অমঙ্গল ও অনর্থের [illegible]। লোভ মানুষকে স্বার্থপর করিয়া তুলে—সকলের সহিত [illegible] ঘটায়।

[illegible]র শিক্ষা—"ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি।" যাহা ভূমা, [illegible] তাহাই সুখের কারণ, অল্পে সুখ নাই। আপন ক্ষুদ্র [illegible] করিয়া বৃহত্তের সন্ধানে আত্মনিয়োগ না করিলে জীবনে সুখ নাই। স্বার্থপরতার দ্বারা শান্তিলাভ হইতে পারে না।

উপনিষদের বাণী শুনুন—"মা বিদ্বিষাবহৈ।" পরস্পরকে বিদ্বেষ করিও না। বিদ্বেষ বা হিংসার দ্বারা শ্রেয়ঃ বা প্রেয় কাহারও লাভ

* ১৩৪৪ সালের বৈশাখ সংখ্যা প্রবর্ত্তকে "শিক্ষা সংস্কার" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† His Excellency, the Marquis of Linlithgow, in his opening address at the Silver Jubilee session of the Indian Science Congress, held at Calcutta on Jan. 3,. 1938.

করা যায় না। বিদ্বেষ হইতে বিদ্বেষেরই উৎপত্তি হয়—অশান্তির অনল জ্বলিয়া উঠে।

উপনিষদের প্রার্থনা—"ভদ্রন্নো অপি বাতয় মনঃ"। হে দেব, সকলের মনকে মঙ্গলের প্রতি প্রেরণ কর। সকলের মন যদি অপরের মঙ্গলের প্রতি উৎসুক হইয়া উঠে; তবে অশান্তি আসিবে কোথা হইতে?

উপনিষদের উপদেশ—"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" জগতের যাহা কিছু আছে সমস্তই ঈশ্বরের দ্বারা সমাবৃত বলিয়া জানিবে।

একদিন এদেশের লোক শিক্ষা পাইত—"সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ।" জগতের সর্ব্বত্রই ভগবান বিরাজমান। তাহা হইলে কি আর কেহ হানাহানি করিয়া অগ্রসর হইতে পারে?

"যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্"। এই প্রার্থনা আজ জগৎ হইতে কোথায় চলিয়া গেল। এ প্রার্থনার বাণী আর নাই তাই না জগতের এত দুঃখ? কোথায় সেই বিশ্বভৌমিক বাণী?

"সর্ব্বে সত্ত্বা সুখিতা হন্তু, অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্ঝা হোন্তু, সুখী আত্তানাং পরিহরন্তু, সব্বে সত্তা দুক্খা পমুচ্চন্তু। সব্বে সত্তা মা যথালব্ধ সম্পত্তিতো বিগচ্ছন্তু।" সকল জীব সুখী হোক্, নিঃশত্রু হোক, অবধ্য হোক্ সুখী হইয়া কাল হরণ করুক। সকল জীব দুঃখ হইতে প্রমুক্ত হউক, সকল জীব যথালব্ধ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত না হউক।

'গুহ্যম্ ব্রহ্ম তদ্ ইদম্ বো ব্রবীমি
মনুষ্যাৎ শ্রেষ্ঠতরম্ হি কিঞ্চিৎ।'

আশ্চর্য্য কথা বলিতেছি শুন—মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। "সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই"—এ সত্য আজ জগৎ ভুলিয়া গিয়াছে, তাই না এত হানাহানি!

"স মোহহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।"—আমি সকল প্রাণীরই প্রতি সমান ভাবে দয়া প্রকাশ করি। কেহ আমার প্রিয়, কেহ আমার অপ্রিয় এরূপ নহে। এ-শিক্ষা কোথায় অন্তর্হি[illegible]

ভারতবর্ষ ভোগকে কি একেবারেই বর্জ্জন ক[illegible] না, তাহা করে নাই। ভারতবর্ষ শুধু ত্যাগে[illegible] প্রচার করে নাই—ভোগকেও সে চাহিয়াছিল[illegible] সে ভোগ ত্যাগের দ্বারা শোধিত হইয়াছিল—আসক্তি[illegible] দ্বারা তাহা খণ্ডিত হয় নাই। রাজর্ষি জনকই ভারতের আদর্শ। তাই সে প্রচার করিয়াছিল—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"। আজ জগৎ ত্যাগের দ্বারা ভোগকে শুদ্ধ করিয়া লইতে চায় না—ভোগের দ্বারাই ভোগকে পাইতে চায়। তাই উঠিয়াছে এই হলাহল!

বর্ত্তমান যুগের শিক্ষার ত্রুটি-বিচ্যুতি আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'তপোবন', 'শিক্ষার মিলন' প্রভৃতি বহু রচনায় বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতের বাণী ইউরোপের দ্বারে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন; কিন্তু কে শুনিবে সেই অমৃতের বাণী? বিষয়লুব্ধ উদ্দাম ইউরোপ এখন স্বাধীকারপ্রমত্ত। এই মহা প্রলয়ের অবসানের পর হয়ত তাহার চিত্ত স্থির হইবে, তখন ভারতের বাণী শুনিবার অবকাশ পাইবে। ইউরোপ চাহিয়াছে কেবল speed, thrill, romance, adventure। সে কেবল আলেয়ার পশ্চাতে, নিত্য নূতনের পশ্চাতে দৌড়াইয়াছে। তাহার ফলে আসিয়াছে জীবনে অবসাদ। নানা উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া সে অবসাদ ঘুচাইতে চাহে। নিজেকে ভুলাইতে চাহে; কিন্তু পারিতেছে কৈ? ভোগ, সুখ, সম্পদের মধ্যেও জীবনের স্বাদ খুঁজিয়া পাইতেছে না—সর্ব্বত্রই world-weariness-র লক্ষণ দেখা যাইতেছে। যে আদর্শ শিক্ষা ভারতবর্ষ একদিন প্রচার করিয়াছিল তাহার কাব্যে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে, যে আদর্শ ব্যাখ্যাত হইয়াছে গীতায়, উপনিষদে, যে আদর্শ উদ্গীত হইয়াছিল বুদ্ধদেব, কবির, দাদু, নানক, চৈতন্যের বাণীতে তাহারই উল্লেখ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—

তাই আজ আমাদের অবহিত হ'য়ে বিচার করতে হবে যে, যে-সত্যে ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি নিশ্চিতভাবে লাভ করিতে পারে সে সত্যটি কী। সে সত্য প্রধানতঃ বণিক্‌বৃত্তি নয়, স্বরাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়; সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা। সেই সত্য ভারতবর্ষের তপোবনে সাধিত হ'য়েছে, উপনিষদে উচ্চারিত হ'য়েছে; গীতায় [illegible] হ'য়েছে, বুদ্ধদেব সেই সত্যকে পৃথিবীতে সর্ব্বমানবের নিত্য [illegible]কল করে' তোলবার জন্যে তপস্যা করেছেন এবং কালক্রমে [illegible]র্গতি ও বিকৃতির মধ্যেও কবির, নানক প্রভৃতি ভারতবর্ষের [illegible]সেই সত্যকেই প্রকাশ করে গেছেন। ভারতবর্ষের সত্য [illegible] অদ্বৈত তত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্ম্মে যোগসাধনা। [illegible]ন্তরের মধ্যে যে উদার তপস্যা গভীরভাবে সঞ্চিত হ'য়ে [illegible]পস্যা আজ হিন্দুমুসলমান বৌদ্ধ এবং ইংরাজকে আপনার [illegible]রে নেবে ব'লে প্রতীক্ষা করছে, দাসভাবে নয়, জড়ভাবে [illegible]কভাবে, সাধকভাবে। যতদিন তা না ঘটবে ততদিন আমাদের দুঃখ পেতে হবে, অপমান সইতে হবে, ততদিন নানাদিক্ থেকে আমাদের বারবার ব্যর্থ হতে হবে। ব্রহ্মচর্য্য, ব্রহ্মজ্ঞান, সর্ব্বজীবে দয়া, সর্ব্বভূতে আত্মোপলব্ধি একদিন এই ভারতে কেবল কাব্যকথা, কেবল মতবাদরূপে ছিল না; প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে এ'কে সত্য করে তুলবার জন্যে অনুশাসন ছিল, সেই অনুশাসনকে

আজ যদি আমরা বিস্মৃত না হই, আমাদের সমস্ত শিক্ষা দীক্ষাকে সেই অনুশাসনের যদি অনুগত করি—তবেই আমাদের আত্মা বিরাটের মধ্যে আপনার স্বাধীনতা লাভ করবে এবং কোন সাময়িক বাহ্য অবস্থা আমাদের সেই স্বাধীনতাকে বিলুপ্ত করতে পারবে না।

"প্রবলতার মধ্যে সম্পূর্ণতার আদর্শ নেই। সমগ্রের সামঞ্জস্যকে নষ্ট করে' প্রবলতা নিজেকে স্বতন্ত্র ক'রে দেখায় ব'লেই তাকে বড়ো মনে হয়—কিন্তু আসলে সে ক্ষুদ্র। ভারতবর্ষ এই প্রবলতাকে চায়নি, সে পরিপূর্ণতাকেই চেয়েছিল। এই পরিপূর্ণতা নিখিলের সঙ্গে যোগে—এই যোগ অহঙ্কারকে দূর করে' বিনম্র করে। এই বিনম্রতা একটি আধ্যাত্মিক শক্তি, এ দুর্ব্বল স্বভাবের অধিগম্য নয়।"

এতক্ষণ যুদ্ধোত্তর শিক্ষার আদর্শের দিক্ লইয়াই আলোচনা করিয়াছি—ইহার কার্য্যকরী দিকের বিষয় কিছুই বলা হয়নি। ঘন ঘন এইরূপ প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধের হাত হইতে সমাজকে বাঁচাইতে হইলে, যুদ্ধোত্তর যুগের শিক্ষা-পরিকল্পনায় শিক্ষার মূল আদর্শকে অতি উচ্চগ্রামের করিতে হইবে; অর্থাৎ যে আদর্শ আমাদের গীতা, উপনিষদে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যে আদর্শ প্রাচীন তপোবনে সাধিত হইয়াছে; যে আদর্শ আমাদের যুগেও বহু মনীষী জগতের সম্মুখে ধরিয়াছেন, সেই আদর্শ অনুসারেই গড়িতে হইবে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এই আদর্শের উপর সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থার কাঠামটি তৈয়ার করিতে হইবে। তারপর ইহার বস্তুতান্ত্রিকদিকের উপর দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। পরবর্ত্তী সংখ্যায় যুদ্ধোত্তর যুগের শিক্ষা-পরিকল্পনায় ব্যবহারিকদিকের কথা লইয়া আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

যুদ্ধ, জীবন ও সাহিত্য

শ্রীকালিপদ চক্রবর্ত্তী

জীবনের সঙ্গে গূঢ় সংযোগ আছে বলেই সাহিত্য-নামের সার্থকতা। জীবনকে বাদ দিয়ে সাহিত্য স্বয়ংসিদ্ধ হতে পারে না। জীবনকে উপলব্ধি করার যে দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা—সেই আকাঙ্ক্ষার অপরিপূর্ণতা ও পরিপূর্ণতা—এই দুয়েরই বহুধা প্রকাশই সাহিত্যে রূপ পরিগ্রহ করে বিভিন্ন ছন্দে। রবীন্দ্রনাথ এক কথায় তাই বলেছেন—'উপলব্ধির প্রকাশই সাহিত্য'। উপলব্ধির বিভিন্ন বৈ[illegible] আপেক্ষিক গুরুত্ব হিসাবেই সাহিত্যের আর্ট বা [illegible] ধর্ম্ম সাধনের বিভিন্ন মার্গের মতই সাহিত্য-সাধনা[illegible] স্তর, বিভিন্ন পর্য্যায় আছে। হৃদয়াবেগের ক্ষে[illegible] কবিতা, ধী বা প্রজ্ঞার ক্ষেত্র তেমনি সাহিত্য। [illegible] আবার দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্ত্তন আসে। আধুনি[illegible] কাব্য বা সাহিত্যের মধ্যে শ্রেণীগত পার্থক্য কিছু[illegible] পড়ে না। কাব্যের ক্ষেত্রেও ধীরে ধীরে প্রজ্ঞা[illegible] আত্মপ্রকাশ। সুতরাং সাহিত্য বা কাব্য-বিচারের দিক্ দিয়ে গোঁড়ামির প্রশ্রয় দিলে আত্ম-প্রবঞ্চনাই হবে বেশী। সাহিত্য জীবনের প্রকাশ—তা' সে খণ্ড জীবনই হোক বা অখণ্ড জীবনই হোক। কোনও আদর্শগত পরিণতি সাহিত্য-কলার মধ্যে নাও থাকতে পারে, তবুও যে ক্ষেত্রে তার আত্মপ্রকাশ, সে ক্ষেত্রে সে কতদূর সাফল্য অর্জ্জন করেছে, সেই সাফল্যের মাপকাঠিতেই সাহিত্যের বিচার।

বর্ত্তমান কাব্য বা সাহিত্যের মধ্যে কল-কারখানা, মজুর ও শ্রেণী-বিদ্রোহ প্রভৃতি ক্রমাগত আত্মপ্রকাশ করছে। জীবন-ছন্দে যে সুর ধ্বনিত হবে, সাহিত্যেও [illegible] যাবে সেই সুরেরই অনুরণন। আধুনিক কালের [illegible] যদি এই কারণেই 'কাস্তে' বা 'লাঙ্গল-সাহিত্য' [illegible] যুক্ত করি, সে অভিযোগ এসে লাগ্‌বে আমাদেরই। [illegible] মরা আমাদের জীবনকে ভালবাসতে পারি, তা'হলে সাহিত্যকে কেন ঘৃণা করব? আধুনিক কালের [illegible]ন্ত্রিক জীবন-যাত্রা যে কারণেই হোক, স্বীকার করতে আজ আমরা বাধ্য হয়েছি। যন্ত্র-জীবনের সুখ-সুবিধা ছেড়ে মনে প্রাণে কেউই বোধহয় প্রাচীন-জীবন-যাত্রার মন্দাক্রান্তা স্রোতে গা ঢেলে দিতে রাজী নয়। অথচ সাহিত্যে যদি সেই কর্ম্মমুখর ঘূর্ণি স্রোতের পরিচয় আজ আমরা পাই, তাকে অগ্রাহ্য করবার কোন কারণই থাকতে পারে না। এই প্রসঙ্গে আধুনিক জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে

ভার্জিনিয়া উল্‌ফ যে স্বীকারোক্তি করেছেন, আধুনিক সাহিত্য প্রসঙ্গেও সে কথা সর্ব্বথা প্রযুজ্য। উল্‌ফ বলেছেন :—

'There is something about the present which we would not exchange, though we were offered a choice of all past ages to live in. And modern literature. with all its imperfections has the same hold on us and the same fascination. It is like a relation whom we snub and sacrify daily, but after all cannot do without.'

—*How it strikes a contemporary.*

উল্‌ফের কথার মধ্যে যে যুক্তি আছে, তা' নিশ্চয়ই উড়িয়ে দেওয়া চলে না। আধুনিক জীবনকে আমরা গালি দিতে পারি, তার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আন্‌তেও পারি, কিন্তু সেই জীবন-যন্ত্রা বাদ দিয়েও এক পা চল্‌বার সাধ্য আজ আমাদের নেই। আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধেও সেই কথা প্রযুজ্য।

দৈনন্দিন জীবনে যে অবিরাম দ্বন্দ্ব আজ চলেছে, যে প্রচণ্ড ঘাত-প্রতিঘাতে জীবনধারা আজ চঞ্চল, সাহিত্যেও তার আঘাত এসে লাগবেই। যুধ্যমান রাষ্ট্রশক্তি সকল যখন পরস্পরের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করে, সে আঘাত লাগে সমস্ত জাতিকে। আজ রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজ ও ব্যক্তির নিরবিচ্ছিন্ন সংযোগ, তাই আঘাত যেখানেই পড়ুক, ভোগ করতে হবে সকলকেই। পলায়নের পথ আজ সকল দিক্ দিয়েই রুদ্ধ। ওয়ার্ডস্বয়ার্থ যেমন পালিয়েছিলেন প্রকৃতির শ্যামলায়তনে, কর্ম্মমুখর জীবনকে উপেক্ষা করে' ওয়ার্ডস্বয়ার্থোচিত পলায়নীবৃত্তি আজ অসম্ভব। জীবনকে পি[illegible] ফিরে আধ্যাত্মিক স্বর্গের অন্তরালে আত্মগোপ[illegible] যাওয়া আধুনিক জগতে এক বিড়ম্বনা। গত [illegible] শতকের জীবনযাত্রার মধ্যে যে সামঞ্জস্য ছিল, [illegible] শতধাবিচ্ছিন্ন ও বিকীর্ণ। গত ফরাসী-বিদ্রোহের [illegible] যে আধ্যাত্মিক আদর্শবাদে কবি ও সাহিত্যিক উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন, আধুনিক কালের যুদ্ধ ও রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্যে সে প্রেরণা কিছুই নেই।

বর্ত্তমান কালে সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহের মূল কারণ অর্থনৈতিক আত্ম-প্রতিষ্ঠার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা। এই আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও প্রভুত্ববাদ আজ যুধ্যমান জাতিকে দানবত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাই কবি বা সাহিত্যিক বর্ত্তমান যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে মুক্তির পথ খুঁজে পান না। জাপানের চীন-অভিযান সম্পর্কে জাপানী কবি নোগুচির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যে প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন, আধুনিক যুদ্ধ সম্বন্ধে তার চেয়ে ভাল জবাব আর হয় না। কবি বা সাহিত্যিক তাই বর্ত্তমান্ যুদ্ধোদ্যমের মধ্যে কাব্য প্রেরণার কোনও উপাদান খুঁজে পান না। বিশেষ করে' আধুনিক যুদ্ধপ্রণালী নৈর্ব্যক্তিক। সামরিক শক্তির পরাকাষ্ঠা শৌর্য্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়। জল, স্থল অন্তরীক্ষ থেকে নির্ব্বিচারে প্রবাহিত হয় ধ্বংসস্রোতঃ, জাতীয় সাধনা ও সংস্কৃতির অপচয় বর্ত্তমান যুদ্ধ-প্রণালীর গভীরতম কলঙ্ক। আধুনিক কালের যুদ্ধের গুরুত্ব তাই এত বেশী।

গত মহাসমরের পর যে দারুণ পরিবর্ত্তন এসেছিল এবং সেই পরিবর্ত্তনের আবর্ত্তে জীবন-যাত্রা যে কত জটিল হয়েই দেখা দিয়েছিল, তার পরিচয় পৃথিবীব্যাপী এই দারুণ অর্থ-সঙ্কট। একদিকে পুঁজিবাদী-ভিত্তিতে নয়া রাষ্ট্র-তন্ত্র গঠনের প্রচেষ্টা অন্যদিকে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সমাজ-তন্ত্রের অভ্যুদয়। সমরোত্তর যুগের কাব্যে ও সাহিত্যে এই সংঘাতের ছাপ বেশী ক'রেই এসে পড়েছিল। গত মহাযুদ্ধের সময়ে দেশ-প্রীতির উন্মাদনায় অনেক কবি বাঁশী ছেড়ে ধরেছিলেন অসি। যুদ্ধের প্রথম উন্মাদনা যে দেশ-প্রীতির ঝঙ্কার তুলেছিল, তাদের কণ্ঠে সে-ঝঙ্কার ম্লান হয়ে এল সমরাবসানের সঙ্গে। যুদ্ধের নিদারুণ [illegible]তা তারা জীবন দিয়ে অনুভব করেছিলেন বলে'ই [illegible]লী কিংবা ওয়ার্ডস্বয়ার্থের মত আদর্শের জয়গান [illegible]াদের কাব্যে। সমরক্ষেত্রে মৃত্যুর মুখোমুখী [illegible] প্রতিমুহূর্ত্তে চল্‌তে হয়, তাদের মধ্যে কোনও [illegible] প্রেরণা আস্‌তে পারে না। কবি ওয়েন ও [illegible]বিতাই তার প্রমাণ। গত মহাযুদ্ধের এই [illegible]ক কবি স্বীয় অভিজ্ঞতা যেমন করে' প্রকাশ [illegible] অন্য কোন যুদ্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে এমন কা[illegible]-সৃষ্টি হয়নি। যুদ্ধ বিরতির পর যুদ্ধবিরোধী ভাবধারা প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করল কাব্যে ও সাহিত্যে। *All Quiet on the Western front*-এর নাম সকলেই জানেন; এই রকম নানা ধরণের বই লেখা

চল্‌ল প্রায় এক যুগ ধরে'। মানুষের জীবন-যাত্রার যে প্রবল ভাঙন দেখা দিয়েছিল, তার আঘাত সাম্‌লে সহজ হয়ে ওঠা খুব সহজ-সাধ্য ছিল না। জীবনের শ্রী ও সৌষ্ঠবের বদলে দেখা দিল এক গ্লানিপূর্ণ ভয়াবহতা। জীবনের যে খণ্ডবিচ্ছিন্ন রূপ সমরোত্তর যুগে আত্মপ্রকাশ করেছে, সাহিত্য-সৃষ্টির দিক্‌ দিয়ে তার শত ত্রুটি থাক্‌লেও, তাকে অগ্রাহ্য করতে যাওয়া গোঁড়ামীর পরিচয়। সমর পরবর্ত্তী যুগে সকল দেশের সাহিত্যে এই ভাঙনের রূপ এসে দেখা দিয়েছে, এ কথা সত্য। সমাজ-ধর্ম ও আদর্শের বিরুদ্ধে এক প্রকাণ্ড বিদ্রোহ···এক গভীর নৈরাশ্যবাদ দেখা দিল শিল্প ও সাহিত্যে। সমরোত্তর যুগের ইংরাজী সাহিত্যে শুধু শুন্‌তে পাই 'নেতি'রই প্রতিধ্বনি।···জীবন যেন একটা কঠিন বিদ্রূপ···ধর্ম্ম ও নীতিবাদের যেন বালাই নেই এই খণ্ডিত জীবন কাব্যে···যন্ত্র-দানবের নিষ্পেষণে পীড়িত দলিত ও আবর্ত্তসঙ্কুল জীবনের স্রোতে উপক্ষীয়মান এক গভীর অবসাদ। তাই একজন আধুনিককালের সমালোচক বলেছেন,—

'The leterature that sprang up in Europe after the war was at once distinct in its attitude of cynicism and despair from that which preceded. (C. F. Calverton).

ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব এসে পড়েছে আমাদের বাংলা সাহিত্যে, এ কথা মিথ্যা নয়। বিশ্বজগতের সঙ্গে আজ আমাদের সম্বন্ধ—কেবল রাষ্ট্রনীতিক বা অর্থনৈতিক সম্বন্ধ নয়, সাহিত্য ও কাব্যের ভিতর দিয়ে সংস্কৃ[illegible] সম্বন্ধও আজ স্থাপিত হয়েছে পাশ্চাত্য জগতের [illegible] তাই দূরের তরঙ্গ এত বেশী করে' আজ আমাদে[illegible] এসে লাগে। বিশ্ব-ভাবধারার ঘাত-প্রতিঘাতে[illegible] আমাদেরও কাব্য বা সাহিত্য নূতন রূপ নিয়ে [illegible] উঠ্‌ছে, তাকে আমরা অবহেলা করতে পারি না। [illegible] প্রভাবকে অস্বীকার না করাই বীরত্ব। বর্ত্তমান [illegible] যদি অস্বীকার না করতে চাই, সাহিত্যকে গ্রহণ না ক[illegible] কোন যুক্তি থাকতে পারে না।

বিপ্লবেই জীবনের মুক্তি। সংগ্রামের মধ্য দিয়াই নব-জীবনের অভ্যুদয়। যে জাতির মন যত সংগ্রামশীল, ভাঙা-গড়ার স্রোতে তার অগ্রগতি অপ্রতিরোধ্য। আজ সাহিত্য ও শিল্পের দিক দিয়ে আমরা যে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছি, সে আমাদের সংবেদনশীল মনেরই পরিচয়। জগতকে আজ আমরা কাছে কাছে পেতে চাই—আমাদের বাস্তব কামনা দিয়ে তাকে নিবিড় করে' ধরতে চাই—বর্ত্তমানের সাহিত্য-সাধনা এই আকাঙ্ক্ষারই প্রতিরূপ।

ভাঙা-গড়ার স্রোতঃ নিয়েই জীবনের সার্থকতা। ধ্বংসের রূপান্তরই সৃষ্টি। আগের যুগের কবিগণ এই দার্শনিক দৃষ্টি দিয়ে জীবনকে কীর্ত্তিত করেছেন; তাই তাদের কাব্যে আধুনিক কালের মত শতধাবিচ্ছিন্ন খণ্ড-রূপ ফুটে ওঠেনি। প্রবহমান নদীস্রোতের মত জীবন আজ পরিণতিহীন, এই চলমান গতি-প্রবাহ সাহিত্যকেও রূপ হ'তে রূপান্তরে ঠেলে নিয়ে চলেছে।

একথা অবশ্য বলা সত্য যে, সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে যে যাবধি ও মুক্তি থাকা প্রয়োজন, আধুনিক সাহিত্যিকের পক্ষে তা' একান্ত অসম্ভব। কর্ম্মমুখর জীবন-দোলা থেকে একটু অন্তরাল সাহিত্য-সৃষ্টির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, একথা একবাক্যে সকলেই স্বীকার করে' থাকেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তা' ঘটে না। গত মহাযুদ্ধের সৈনিক কবির মত আধুনিক জীবন-যুদ্ধে আমরাও ওতঃপ্রোত ভাবে আজ জড়িত। কুরুক্ষেত্র মহাসমর বা ট্রয়ের মহাযুদ্ধ নিয়ে যে মহাকাব্য রচিত হয়েছে, আধুনিক যুদ্ধে তা' কেন হয় না, সেই সম্বন্ধে একজন ইংরাজ লেখক গত জানুয়ারী মাসের [illegible]iterary Supplement পত্রিকায় এক চমৎকার যুক্তি [illegible] তিনি বলেন :

[illegible] in this war are not in the same secure [illegible]eeds a superhuman power of detachment [illegible] oneself now a days to the cultivation of one's [illegible]less of any other consideration. Air raids [illegible]e brought the war too close ; the bombs are too [illegible]d. Besides such detachment depends on a subconscious feeling that the consequences of war however dreadful will not be such as to render the life of the detached intellect impossible.'

—(Lord Cecil, David.)

সাহিত্য ও শিল্পপ্রেরণার মূলে সাহিত্যিকের স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। প্রভুত্ববাদী রাষ্ট্রের স্বার্থসংরক্ষণের বাহন যদি হয় সাহিত্য, সে সাহিত্য বা শিল্প আদৌ কীর্ত্তনীয় নয়। সাহিত্য কোন ব্যক্তি বা সমাজবিশেষের মুখপাত্র

নয়। সাহিত্যিক বা কবি যদি রাষ্ট্রের তাড়নায় লেখনী ধরতে বাধ্য হন, তার চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কিছুই হতে পারে না। কবি ইয়েটসকে একবার যুদ্ধের কবিতা লিখ্‌তে বলা হয়েছিল, তার উত্তরে তিনি লিখেছিলেন—

'I think it better in times like these
A poet's mouth be silent, for in truth
We have no gift to set a statesman right,
He has had the enough of meddling who can please
A young girl in the indolence of her youth
Or an old man upon winter's night.'

কবি ইয়েটস্ অবশ্য তাঁর দিক্ দিয়ে কথাটা মিথ্যা বলেন নি। যুদ্ধের সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির সম্প্রসারণ দেখা দিলেও, কাব্য বা সাহিত্যের দিক্ দিয়ে সে প্রকার সম্প্রসারণের কোন প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে না। তবুও জীবন থেকে যেমন যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না—কাব্য বা সাহিত্যের দিক্ দিয়েও যুদ্ধের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না।*

* [বক্ষ্যমান প্রবন্ধে লেখক কাব্য ও সাহিত্যকে পৃথক করিয়া দেখিয়াছেন। কাব্য কি সাহিত্য নয়? প্রঃ সঃ]

গান ও স্বরলিপি

বসন্ত পঞ্চম—ত্রিতাল

বসন্ত এল ফিরে ফাল্গুন ফুলবনে
যৌবন জয়রথে সুগন্ধ সমীরণে।
রক্তিম তনু রাগে
পলাশের কলি জাগে
মঞ্জুল বনতলে সুকণ্ঠ পিক স্বনে।

কথা—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এম. এল. সি.

স্থায়ী

\+ ৩ ০ ১
না না II না না -র্সা র্সা | না ধা না গা | মা -ধা না র্সা | ঋা র্সা না সা I
আ জি ব স ০ ন্ত | এ ল ফি [illegible] | [illegible] ল্ গু ন | ফু ল ব নে

\+ ৩ ১
ধা -র্সা র্সা র্সা | না না [illegible] | [illegible] গা মা মা | গা -ঋা ঋা সা II
যৌ ০ ব ন | জ য় [illegible] | [illegible] ন্ধ স | মী ০ র ণে

\+ ৩ ১
II মা -মা মা মা | মা মা মপা গা | [illegible] ধা ঋা ধা | না না র্সা র্সা I
র ০ ক্তি ম | ত নু রা০ গে | [illegible] লা শে র | ক লি জা গে

\+ ৩ ০ ১
র্সা -র্গা র্গা র্গা | র্মা র্গা ঋা র্সা | না র্সা -ঋা র্সা | না ধা ঋা ধা II
ম ০ ঞ্জু ল | ব ন ত লে | সু ক ০ ণ্ঠ | পি ক স্ব নে

মধ্য যবদ্বীপে হিন্দু-মন্দির

স্বামী সদানন্দ গিরি

[একদা ভারতের সহিত আনাম, কাম্বোডিয়া, স্বর্ণদ্বীপ (সুমাত্রা), যাভা, বলী প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বস্তুতঃ ইহারা বৃহত্তর ভারতেরই অন্তর্গত। ভাষা, ধর্ম, পূজা-পার্ব্বণ, আচার-ব্যবহার, ক্রিয়াকলাপ, নামকরণ, পোষাক-পরিচ্ছদ, যজন-যাজন, দেবতা প্রভৃতি ব্যাপারে ভারতীয় প্রভাব যথেষ্ট বর্ত্তমান ছিল এবং এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। প্রবন্ধ-লেখক সুপণ্ডিত স্বামী সদানন্দ গিরি বহুবার বৃহত্তর ভারতে ভ্রমণ করিয়া এবং নিবিষ্ট গবেষণার দ্বারা এই কৃষ্টি ও সংস্কৃতিমূলক যোগাযোগের কথা বিশদভাবে কয়েকখানি গ্রন্থে ও বহু প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। জাপানের যুদ্ধ ঘোষণার পর হইতে এই সব শস্যশ্যামলা ঐশ্বর্য্যশালিনী দ্বীপপুঞ্জের যে ভাগ্যবিপর্য্যয় হইতে বসিয়াছে তাহার প্রতি আজ বিশ্বের দৃষ্টি নিবদ্ধ। লেখক বর্ত্তমান প্রবন্ধে মধ্য যবদ্বীপের অতীত অজ্ঞাতপ্রায় একটি অধ্যায়ের উপর আলোকপাত করিয়াছেন। প্রঃ সঃ]

মধ্য যবদ্বীপের অন্তর্গত যোকজকর্তা হইতে বোরোবুদুর ২৬ মাইল। মোটরে এই পথটুকু দুই ঘণ্টায় যাওয়া যায়। আগ্নেয়গিরিবেষ্টিত এই জিলাটির দৃশ্য অতীব মনোহর। চতুর্দ্দিকে ধান্যক্ষেত্র ও ইক্ষুক্ষেত্র, তাহারই মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে এই পথ বোরোবুদুর পর্য্যন্ত। প্রকৃতির এই সুন্দর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা বোরোবুদুর অভিমুখে চলিলাম। এই স্থানের অধিবাসিদিগের মধ্যে অধিকাংশই কৃষিজীবি। ইহারা অত্যন্ত পরিশ্রমী, বৎসরে তিনবার শস্য উৎপাদন করে। বোরোবুদুরের পথে চণ্ডীমেনছুত (Mendoot) নামে একটী বৌদ্ধমন্দির আছে। মন্দিরকে যবদ্বীপীয় ভাষায় চণ্ডী বলে। এই মন্দির বোরোবুদুর অপেক্ষা কিছু পুরাতন। এই মন্দিরে তিনটী বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি আছে। একটি মূর্ত্তি ১৪ ফুট উচ্চ এবং উহা একখণ্ড প্রস্তর হইতে কাটিয়া বাহির করা হইয়াছে। অপর দুইটী মূর্ত্তি উচ্চতায় ৮ ফুট। এই মূর্ত্তিগুলিতে যে ভাস্কর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা ভারতবর্ষের গুপ্ত-ভাস্কর্য্যের অনুরূপ। মন্দিরের কারুকার্য্য অতি সূক্ষ্ম। বোরোবুদুরে ও চণ্ডীমেনছুত দেখিতে প্রবেশপত্র লইতে হয়। একই প্রবেশপত্রে দুইটি স্থানই দেখা যায়। প্রবেশপত্রের মূল্য ৫০ সেণ্ট। চণ্ডীমেনছুত হইতে বোরোবুদুর যাইবার পথে চণ্ডীপবন (Pawan) নামে বৌদ্ধমন্দির পাওয়া যায়। বোধহয় এই বৌদ্ধমন্দিরটি বোরোবুদুরের সমসাময়িক। বোরোবুদুর ও চণ্ডীপবনের অতি নিকটে চণ্ডীবনোন (Banon) নামে একটী শিবমন্দির ছিল। এই মন্দিরের

পুরোহিতের পূজাকালীন একটি মুদ্রা : যবদ্বীপ

এক্ষণে কোন চিহ্ন দেখিলাম না। তবে ঐ স্থান খনন করিয়া সুন্দর শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, গণেশ ও শিবগুরু বা অগস্ত্যমূর্ত্তি প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে।

বোরোবুদুর দেখিতে অর্দ্ধগোলাকৃতি পাথরের স্তূপের ন্যায়। ইহা পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্তূপগুলির অন্যতম। তবে ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা একটী অট্টালিকাবিশেষ। এই স্তূপটির পথগুলি প্রাচীরে বেষ্টিত। ইহা যেন একটী গোলক-ধাঁধা। ইহার মঞ্চগুলি সুউচ্চ ও বেদীগুলি কারুকার্য্যবিশিষ্ট। এই সুদৃশ্য স্তূপের মূলে আছে নিম্নমুখি পদ্মসদৃশ মণ্ডলপরিবেষ্টিত চারিটী মঞ্চ ও তিনটী বেদী। নিম্নস্থ তিনটি মঞ্চ ৩৬টী দিক্‌বিশিষ্ট ও উচ্চতম মঞ্চটি ২০টী দিক্‌বিশিষ্ট। এই মঞ্চগুলিকে প্রাচীরের দ্বারা পৃথক রাখা হইয়াছে। প্রাচীরগুলিতে বহু কুলুঙ্গী ও ছোট ছোট চৈত্য আছে। মঞ্চগুলির একটী অপরটী অপেক্ষা উচ্চ। শ্রীবুদ্ধের কর্ম্ম ও ধর্ম্মপ্রচার কাহিনী প্রাচীরে উৎকীর্ণ আছে। প্রদক্ষিণ-পথটী শুশ্রূষাকারিণী ও যতিদিগকে বুদ্ধের কর্ম্মময় জীবনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রস্তরে উৎকীর্ণ বিষয়গুলির ললিত-বিস্তার, জাতক-মালা প্রভৃতি অধিকাংশই পালি-সাহিত্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। আগ্নেয়গিরি হইতে উৎপন্ন উচ্চভূমির উপর অবস্থিত এই স্তূপটী দূর হইতে গম্বুজের ন্যায় দেখাইলেও, ইহার তলদেশ হইতে কোণগুলি দেখিলে মনে হয়, ইহা একটী প্রায় চতুষ্কোণ স্তূপবিশেষ। এই স্তূপের তলদেশের এক দিকের আয়তন প্রায় ৩৫০ ফুট। ইহার ১৬টী কোণ আছে। একটি বেদী এই স্তূপটীকে বেষ্টন করিয়া আছে। এই বেদীর নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইবার কিছুকাল পরে যখন বুঝা যায় যে, ভিত্তিটি এরূপ বিরাট্ স্তূপের ভার সহিবার উপযুক্ত নহে, তখন উহাতে কতকগুলি প্রস্তরফলক যোগ করা হয়। এই অতিরিক্ত প্রস্তর ফলক যোগের ফলে বুদ্ধের কর্ম্মময় জীবনের কার্য্যাবলী-চিত্রিত ফলকশ্রেণীগুলি চাপা পড়িয়া যায়। এই সব ফলক আয়তনে ৩০×৪০ ইঞ্চি ছিল এবং ইহাদের মোট সংখ্যা ছিল ১৬০। তন্মধ্যে অধিকাংশ অক্ষত অবস্থায়, কতকগুলি অসম্পূর্ণ অবস্থায় এবং কতকগুলি ভগ্নাবস্থায় রহিয়াছে। চারিটীর মধ্যে প্রথম মঞ্চটীতে যাইবার জন্য সোপান-শ্রেণী আছে। সোপানশ্রেণীর উভয় পার্শ্বে দুইটি আক্রমণোন্মুখ সিংহ-মূর্ত্তি আছে। এই মঞ্চটিকে পরিবেষ্টিত করিয়া আছে একটী প্রাচীর। ঐ প্রাচীরের একটি উন্মুক্ত স্থান দিয়া মঞ্চের মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। ইহা প্রভূত কারুকার্য্যসম্পন্ন এবং প্রতিটি নক্সার মধ্যে সূক্ষ্মতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভিতরের খিলান প্রাচীরে

বুদ্ধ মূর্ত্তি : যবদ্বীপ

বরা এবং উভয় আলিসা ও প্রাচীর কারুকার্য্যবিশিষ্ট। র্ণনাগুলি প্রাচ্যের ধারার ন্যায় আবর্ত্তব্য পুষ্প ও পত্রের ...লার পাড়-দেওয়া। জাতকে র্ণনা দেওয়া সত্ত্বেও, কোন কান মনুষ্য মূর্ত্তির মধ্যে এরূপ াদৃশ্য দেখা যায় যে, একটী প্রস্তরের উৎকীর্ণ দুইটী বীরকে সনাক্ত করা কঠিন হইয়া পড়ে। আলিসার আরও উপরে কুলুঙ্গীর মধ্যে বিভিন্ন প্রকার মুদ্রায় উপবিষ্ট তথাগতের মূর্ত্তি আছে। তন্মধ্যে অধিকাংশ ধ্যানমগ্ন মুখে কোমলতা ফুটিয়া ।। আলিসার কার্ণিস হইতে মকরের মুখ বাহির হইয়া আছে। উহা শ্রেণীবদ্ধ উল্টান পদ্মের ন্যায় দেখায়।

বুদ্ধ-জীবনের কার্য্যকলাপ বর্ণনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় মকটিতে একটি গল্প উৎকীর্ণ আছে যে, বুদ্ধ ময়ূরের আকারে

বোরোবুদুর স্তূপ : মধ্য যবদ্বীপ

বাতার পূজারিণী

কিন্তু অপর তিনটী মক অপেক্ষা প্রথম মকটির সাজসজ্জার বিশেষ পার্থক্য নাই। কেবল গল্পগুলিতে জাতক লিখিত

ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি সত্যের অনুসন্ধান করিতেছেন। এইস্থানে শৈব প্রভাব প্রচুর বিদ্যমান। পার্শ্বে দণ্ডায়মান বৃষ হইতে বৃষবাহনের মূর্ত্তি চেনা যায়। যে তোরণের ভিতর দিয়া উচ্চ সোপানাবলী দিয়া তিনটী বেদীতে উঠিলাম, উহার দ্বারের দুই পার্শ্বে ... মকরের মুখ ও সর্দ্দালে কীর্ত্তিমুখ দেখিলাম। ইহা ...রখণ্ডের দ্বারা প্রস্তুত। গম্বুজের দুই পার্শ্বে ... প্রস্তরখণ্ড একটির উপর আর একটি দিয়া সা... আছে। চক্ষুদ্বয় স্ফীত ও জিহ্বা স্থূল ওষ্ঠের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, এইরূপ একটি অসুরের অদ্ভুত চোয়ালের প্রতিরূপ আছে। উহার মস্তক গম্বুজের ন্যায় এবং মুকুট দিয়া ভূষিত। ইহা আর কিছুই নহে, জল নিকাশের নল মাত্র। দরজার দুই পার্শ্বে দুইটী মনুষ্য মূর্ত্তি করজোড়ে প্রতিক্ষা করিতেছে। দরজার কারুকার্য্য খচিত তাক্ উর্দ্ধতম সোপান হইতে নিম্নতম সোপানে ঝালরের ন্যায় নামিয়া আসিয়াছে। মকগুলির বাহিরের ও ভিতরের প্রাচীরে দুই সহস্রের উপর জগদ্বিখ্যাত

চিত্র আছে। ক্ষুদ্র চৈত্যের সম্মুখে ৪৩২টি প্রস্তরফলক ব্যতীত মঞ্চগুলিতে আরও ১৫১৩টি আছে। কিছুদিন পূর্ব্বেও বহু ফলকের উদ্দেশ্য অজ্ঞাত ছিল। সম্প্রতি মূল সংস্কৃত আখ্যান হইতে এ সম্বন্ধে সবিশেষ জানা গিয়াছে। প্রথম মঞ্চের দুই শ্রেণীর দুই দিকে ৮০৮টী ফলকে বুদ্ধের পূর্ব্ব অবতারের জীবনের ঘটনাবলী চিত্রিত। উপরের মঞ্চগুলির এক শ্রেণীতে ১৬৮টী ফলকে বোধিসত্ব সুধনের ইতিহাস দেখা যায়। চারিটি মঞ্চের উপর ২০টী

অভিনেতা : যবদ্বীপ

দিক্‌বিশিষ্ট পাটাতনের উপর সমকেন্দ্রসম্পন্ন চক্রা[illegible] বেদী বর্ত্তমান। নীচের বেদীতে ৩২টী, দ্বিতী[illegible] ২৪টী, তৃতীয় বেদীতে ১৬টী সর্ব্বসমেত ৭২টী উল্টা[illegible] ন্যায় চৈত্যের ভিতরে বিভিন্ন প্রকার যোগের মুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি রহিয়াছে; যথা ভূমিস্পর্শ মুদ্রা, বরমুদ্রা, ধ্যানমুদ্রা, অভয়ামুদ্রা, বিতর্কমুদ্রা এবং ধর্ম্মচক্রমুদ্রা। মঞ্চগুলির ন্যায় বেদীগুলিও স্থাপত্যশিল্পের উৎকর্ষ ও শ্রীবৃদ্ধির নিদর্শন। পদ্মগুলি ছিদ্রবিশিষ্ট, মধ্যস্থানে একটী বৃহৎ উল্টান পদ্মের ন্যায় চৈত্যের ভিতর একটি অসমাপ্ত বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। উপরে প্রত্যেক পদ্মের ন্যায় চৈত্যের ভিতর ও নীচে পাঁচটি দেওয়ালের কুলঙ্গীতে একটী করিয়া ৪৩২টী ধ্যানমগ্ন উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। মধ্যস্থলে উল্টান পদ্মের ন্যায় চৈত্যের ভিতর গৌতম বুদ্ধের মূর্ত্তি যেন জগতের মুক্তির জন্য বাণী প্রচার করিতেছেন। একটি বৃহৎ বুদ্ধ মূর্ত্তির ও কতকগুলি বুদ্ধমূর্ত্তির মস্তক বিলুপ্ত হইয়াছে।

বোরোবুদুর ইতিহাস সম্বন্ধে নিশ্চিৎ করিয়া কিছু বলা যায় না। এই স্তূপের নাম কোন শিলালিপিতে অথবা কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নাই। স্তূপের তলদেশে আবৃত উৎকীর্ণের উপর সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত একটি ক্ষুদ্র শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। তাহার অক্ষরগুলি দেখিলে মনে হয়, সম্ভবতঃ ৭৫০ খৃষ্টাব্দে এই স্তূপ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করা হয়। সম্ভবতঃ ৯২৫ খৃষ্টাব্দে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যাহার দ্বারা মধ্য যবদ্বীপের হিন্দু রাজত্বের সম্পূর্ণরূপে পতন হয়। পক্ষান্তরে অল্পসময়ের মধ্যে পূর্ব্ব যবদ্বীপের হিন্দু-রাজত্বের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। কি কারণে এই হিন্দু-রাজত্বের পতন হয় তাহা বর্ত্তমানে অজ্ঞাত।

এই হিন্দু-রাজত্বের পতনের সহিত বোরোবুদুরেরও পতন হয়। সুমাত্রার শ্রীবিজয়ের শৈলেন্দ্র বংশীয় কোন রাজা সম্ভবতঃ ৭৫০ খৃষ্টাব্দে স্তূপটি নির্ম্মাণ করেন। উক্ত শৈলেন্দ্র বংশীয় কোন রাজা যবদ্বীপ জয় করিয়াছিলেন। সুমাত্রার শৈলেন্দ্র নরপতিগণ মধ্য-যবদ্বীপে একশত বৎসরের উপর রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং চণ্ডী কলমন, মেনদুত ও চণ্ডী-বোরোবুদুর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অনুমান ৮৬০ খৃষ্টাব্দে যবদ্বীপে শৈলেন্দ্র নরপতিদিগের রাজত্বের শেষ হয়। পরে পূর্ব্ব যবদ্বীপের শৈব রাজা তাঁহাদের হৃতরাজ্য উদ্ধার করিয়া মধ্য যবদ্বীপে প্রধানতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই যবদ্বীপে শৈব প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। বহু ভাগ্য বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া শস্যশ্যামলা, বিচিত্র বনাকীর্ণ, খনিজ-সম্পদশালী বারিধি-বিধৌত ও ঘনবসতিপূর্ণ এই যবদ্বীপ বিগত এক হাজার বৎসর অতিক্রম করিলেও, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধশাসনের প্রভাব এখনও তাহার অগণিত মন্দির এবং ধর্ম্ম, সমাজ ও জনসাধারণের মর্ম্ম হইতে একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি দরদী ব্যক্তি মাত্রেরই দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বৈচিত্র্য

সভ্যতার অগ্রগতি

বহু সহস্র যুগের প্রচেষ্টায় আদিম মানুষ কুটীর-বাস ছেড়ে গৃহ-নির্মাণ প্রচেষ্টায় অদ্ভুত সাফল্য লাভ করেছে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রুচি স্থপতি-শিল্পে

পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ প্রাসাদ: নিউইয়র্ক

বৈচিত্র্য দান করেছে। আধুনিক কালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ প্রাসাদ-নির্ম্মাণ বিষয়ে অগ্রণী বলা চলে।

বিজ্ঞানের কৃপায় মানুষ দূরত্বকে যেমন আয়ত্বে এনেছে, তেমনি সময়কেও সংক্ষেপ করেছে। উভচর-যান স্থলে মটরের এবং জলে

উভচর যান

নৌকার কাজ করে থাকে। এতে নদী বা জলাশয় পার হতে আর ওঠা-নামার হাঙ্গামা পোয়াতে হয় না। সময় ও আরাম উভয়ই মিলে।

বনমানুষকে তালিম দিয়ে যদি মটর চালানো সম্ভব হয়, তবে আর

বনমানুষের মটর-চালানো শিক্ষা

কিছু না হোক যুদ্ধ চালানো ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা হইবে। ইহা সভ্যতার উৎকৃষ্ট অগ্রগতি বলিতে হইবে!

ভস্মের টীকা

শ্রীজনরঞ্জন রায়

পশ্চিমের কোন একটা ছোট সহর। অরুণার স্বামী সেখানে প্রোফেসার ছিলেন। অল্পদিন হইল তিনি মারা গিয়াছেন। অরুণার ছেলেপুলে নাই যে, তাহাদের নিয়া কিছু সান্ত্বনা পান। কিছুদিন হইল একটি ভাইপো আসিয়া আশ্রয় নিয়াছে। তাহাকে নিয়াই শ্বশুরের ভিটায় বাংলাদেশে ফিরিয়া যাইবেন ঠিক করিয়াছেন। স্বামীহারা নিঃসন্তান শিক্ষিতা তরুণী—তাঁহার মন কিছুতেই গৃহপ্রাচীরে আবদ্ধ থাকিতে চায় না। বাৎসল্যে সব কিছুকেই যেন তিনি আঁকড়িয়া ধরিতে চান। পাহাড়ে-জঙ্গলে, নিকটস্থ বসতিতে স্বামী-স্ত্রীতে মিলিয়া একদা খুব বেড়াইতেন। এখনো প্রাণের আবেগে সে সব স্থানে ছুটিয়া যান। তাঁহার যে প্রধান নেশা ছিল ছবি আঁকা, তাহাতে আর প্রাণ ভরিতেছে না।

একটা খস্‌খসে খোঁয়াটে রঙের ছোট পাহাড়। তাহাতে মাঝে মাঝে কাটল্। কাটলের ফাঁক দিয়া সোঁদা শেওলা গন্ধ হাওয়া আসিতেছে। পাশের পাহাড়গুলোর ঝোপের ফাঁকে টিলার উঁচু-উঁচু মাথাগুলো দেখা যাইতেছে, যেন তেলজল না-পাওয়া আদিকালের অমর সব দানোর দল টোপর পরিয়া পাছু ফিরিয়া বসিয়া যুগান্তরের প্রতীক্ষা করিতেছে। নীচে শাল-পলাশের বন। এখানে সেখানে শ্বাপদের পায়ের দাগ। ছোট একটা পাহাড়ে নদী বনের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে যেন চকিত হরিণীর মত। নদীর ধারে বসিয়া এক জটাধারী প্রৌঢ় সাধু ধুনি হইতে ভস্ম মাখিতেছেন আর যে কেহ যাইতেছে, তাহাকেই এক টিপ করিয়া ছাই দিতেছেন। ছবি আঁকার সরঞ্জাম নিয়া অরুণা সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। সাধুকে দেখিয়া দাঁড়াইলেন। সাধু বলিলেন—ভসম্‌কো টিকা লে মায়ী। অরুণা সাধুর দেওয়া ছাইটুকু নিয়া মাথায় স্পর্শ করাইলেন। সাধুর সঙ্গে তিনি কত কথাই বলিলেন। বলিলেন—আমাদের সঙ্গে আসিও চল। আমরা তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বাংলা দেশে যাইব। [illegible] তোমার চোখে পড়িবে। অনেক কিছু শিখিতে জানি[illegible] এখানে বসিয়া শুধু তোমার জটা বাড়িবে আর ছাইমাখা [illegible] হইতে বৈ তো নয়! সাধু এক কথায় রাজী হইয়া গেলেন। বলিলেন একদিন তিনি নিশ্চয় সেখানে যাইবেন ।

অরুণা সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন অদূরে ঐ বেগণী ফুলের গাছটার কাছে। সে দিনও যে স্বামীর সঙ্গে এখানে বসিয়া তাঁহারই একটা ছবি নিয়া কত আলোচনা হইয়াছে। প্রকৃতির শোভাটি তাঁহার ছবিতে নাকি চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার স্বামী বলিয়াছিলেন ছন্দের ভিতর দিয়াও এইভাবে ছবি ফুটাইতে পারেন বাংলার একজন কবি। এই পারা না-পারা নিয়া কত কথাই না সেদিন হইয়াছিল। মানুষের মনে কোন জিনিষের যেটুকু রেখাপাত হয় সে সেইটুকুই দেখাইতে পারে। তাহা রং দিয়াই হোক বা কথা দিয়াই হোক। আবার দুইজন কবি একই কথা একরকমে বলিতে পারেন না। দুইজন চিত্রকরের হাতে একই ছবি একই ভাবে ফুটিয়া উঠে না। উঠে যে না তাহা অরুণার মানসিক পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আজ ভাল করিয়াই ধরা পড়িল। অরুণা আকস্মিকই মনস্থ করি[illegible] যে, সে দেশের বাড়ী ফিরিবে।

অরুণা দেশে ফিরিয়াছেন। বীরভূমের একটি বড় পল্লীগ্রাম, নাম আমলাপুর। সেখানে তাঁহার স্বামীর ভিটা। পুরাতন বাড়িখানি তাঁহার শ্বশুর করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বামী আর একখানি নূতন বাড়ি করাইয়াছিলেন। দুইখানিই কিন্তু সেকালের রুচিসঙ্গত। এমনতর কেন হইল? একালের কিছুই কি এ দেশে প্রবেশ করিতে পারে নাই! পুরাতন বাড়ির সম্মুখেই গাই বলদ সব জাব খাইতেছে। রাস্তায় আবর্জ্জনার স্তূপ। থেলো হুঁকা হাতে শিবু মিস্তির আসিয়া দেখা দিল। কি চেহারা, কি হাসি! চৌকোণা মাথা আর মস্ত হাঁ-মুখ তাহার। একমুখ হাসিয়া বলিল—কৈ আমাদের 'নেই মামা'? অরুণার ভাইপো বুদুকে সে 'নেই-মামা' আখ্যা দিল। অরুণাকে ডাকিতে লাগিল দিদিমণি বলিয়া। সে বলিল, স্বদেশীতে তাহার ছেলে মেঘলাল ভারি নাম করিয়াছে। কয়েদ থেকে সে বাড়ি ফিরিয়া আসিলেই দিদিমণির কাজে লাগিয়া যাইবে।

গ্রামে ভদ্রলোক নাই বলিলেই হয়। আছে সব চাষা-ভূষা—অত্যন্ত মূর্খ, অত্যন্ত গরীব আর অত্যন্ত লাজুক; একটু দয়া পাইলেই আহ্লাদে গলিয়া যায়। প্রায়ই সব অন্ত্যজ আর বুনো-বাগ্‌দী। অনেক সাঁওতালও আসিয়া বসতি করিয়াছে। ইহাদের মধ্যেই অরুণা কাজ করিতে নামিবেন, ঠিক করিলেন। আশ্চর্য্য যে ইহারা কোনো উন্নতিই চায় না—চায় অল্প কিছু কিছু বকশিশ্। পাঁচুই খাইবার জন্য বকশিশ্। অরুণা স্থির করিলেন, ইহাদের জীবনধারার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, নৈতিক উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। না আছে ইহাদের শিক্ষা,

না আছে দেহের কোনো আবরণ, না আছে আবরু। এমন কি মাথা গুঁজিবার চালাতে এক মুঠো খড়ও নাই। গাছের পাখি আর বনের পশুর সমান সবাই। যেখানে সেখানে পড়িয়া ঘুমায়। কেবল ক্ষুধা পাইলেই ছুটাছুটি করে। অরুণা ভাবিলেন—দুনিয়ায় ইহাদের চেয়ে আর কার কথা তিনি বেশী করিয়া ভাবিতে পারেন? সন্তান-স্নেহে তিনি ইহাদের বুকে করিয়া লইবার সঙ্কল্প স্থির করিলেন।

অরুণা ইতিমধ্যেই কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। শিশু ও মেয়েদের অভাব-অভিযোগ তাঁহার চোখে পড়িল বেশী করিয়া। প্রথমেই নিজের বাড়ীতে একখানি তাঁত বসাইলেন। অনেকগুলি স্ত্রীলোক সেখানে কাজ পাইল। পাট কিনিয়া বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকদের মধ্যে বিতরণ করিলেন। তাহারা দড়ি কাটিয়া আনিয়া দিতে লাগিল। হোমিও-প্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিলেন। হরিসভার আটচালাখানি মেরামত করাইয়া মেয়েদের ও শিশুদের নাইট স্কুল খোলা হইল। দ্বিধা ও সঙ্কোচের মধ্যে তিনি এই সব কাজ আরম্ভ করিলেন। যত দিন যাইতে লাগিল অসহায়দের জন্ত তাঁহার ব্যাকুলতা বাড়িতেই লাগিল।

পল্লীগ্রামের বর্ষায় অনভ্যস্ত অরুণা বর্ষাগতে স্বস্তি বোধ করিলেন। ভোর পাঁচটার পরেই তিনি মাঠে গিয়া দেখিতেন শরতের শিশিরে ধানগাছগুলি কেমন মানাইয়াছে। মাঠের ধারের কেয়া-বেড়া হইতে মধুর ঘ্রাণ বাহির হইতেছে। কোথাও কেয়া ফুটিয়াছে বোধ হয়। পাখীর দল কলরব তুলিয়া পাখা ঝাড়িতেছে। পতঙ্গের দল কত না সুর তুলিয়াছে! আকাশে একটুও মেঘ নাই। কি স্বস্তি!

অরুণা একখানি ছবি আঁকায় মন নিবিষ্ট করিয়াছেন। একটি গাছে দুইটি পাখি। পুরুষ পাখিটি নির্বিকারভাবে উপরের ডালে বসিয়া আছে। তাহার তলায় লিখিলেন—'মুক্ত শিব'। নিচের পাখিটি ডানা মেলিয়া উড়িবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু যেন উড়িতে পারিতেছে না। তাহার নীচে লিখিলেন—'বদ্ধ জীব'। একটু বেলা হইয়াছে। ছবি শেষ করিয়া অরুণা উঠিবেন এমনি সময়ে অজয়ের ঘাটে পাল গুটাইয়া একখানি নৌকা ভিড়িল। ঘাটের নিকটেই অরুণা বসিয়া ছবি আঁকিতেছিলেন। নৌকার যাত্রীরা লজ্জাহীনের মত তাঁহার দিকে তাকাইতে লাগিল। তিনি কিন্তু নিজেকে একটুও বিব্রত মনে করিলেন না।

এই নৌকাতেই আসিল মেঘলাল আর তাহার সঙ্গে একটি যুবতী; নাম সুন্দরী। মেয়েটির চেহারা বেশ লকলকে। মুখখানি নিটোল। দোহারা গঠন, শ্যামবর্ণ। কাণে লম্বা লম্বা দুল। বেশ রসালো আওয়াজ আর ফিকফিকে হাসি। চটুল দৃষ্টি যেন উল্‌টিয়া উল্‌টিয়া পড়িতেছে পল্লীর পথঘাট দেখিয়া অথচ কিছুই যেন না দেখার ভঙ্গীতে। হাসিতে হাসিতে সব দেহটা লীলায়িত করিয়া ক্ষুদ্র নমস্কার দিয়া সুন্দরী অরুণার কাছে আসিয়া নিঃসঙ্কোচে আলাপ জুড়িয়া দিল।

মেঘলাল আসার পর হইতে খুব কাজের ভিড় লাগিয়া গেল। সে সকলকেই দলের মধ্যে ভরিয়া লইতে চায়। সকলের সুখদুঃখেই ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। তাহার আদর্শমত সব কিছু ভাঙিতে গড়িতে গিয়া অনেককে উত্যক্ত করিয়াও তোলে। কিন্তু তাহার গড়িবার ক্ষমতার প্রতি অরুণা দেবীর আস্থা বাড়িতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যেই সে গ্রামের চাষী মজুরদের নিয়া একটা কৃষক সমিতি গড়িয়া তুলিল। তাহার সব কাজে সুন্দরী যেন দক্ষিণ হস্ত। দিনরাত বক্তৃতা আর চাষ-আবাদের ধূম লাগিয়া গেল। ধনসাম্যবাদ তাহার বুলি হইল। এদিকে অরুণা দেবী চাষের জমির জন্ত কয়েক শত টাকার উৎকৃষ্ট সার কিনাইয়া আনিলেন এবং আলু ধান গম প্রভৃতির ভাল ভাল বীজ সংগ্রহ করিলেন। মেঘলালের [illegible] তিনি কিছুতেই একমত হইতে পারিতেছেন না। [illegible]মের সব জমি কিনিয়া নিয়া তাহার মালিকানা সমি[illegible] দেওয়া অরুণা দেবীর মতে উচিৎ নয়। সকলে মিলিয়া যে ফসল উৎপন্ন করিবে, তাহার সবটাই সমিতি লইবে, ইহাও তাঁহার ইচ্ছা নয়। অবশ্য তাহার বদলে সমিতিকে দিতে হইবে বীজ, সার, আহার, ঔষধ, থাকিবার ঘর, পরিবার বস্ত্র, টেক্স, খাজনা প্রভৃতি সব কিছুই। অরুণা দেবীর ধারণা, এইভাবে সমিতির কর্তৃত্ব কায়েম হইলে মানুষের পুরুষকার নষ্ট হইবে, স্ত্রীপুত্রের প্রতি দায়িত্বজ্ঞান লুপ্ত হইয়া যাইবে, সাংসারিক বুদ্ধি লোপ পাইয়া মানুষ চোখবাঁধা বলদের মত সমিতির জন্ত

খাটিয়া যাওয়াই জীবনের সবখানি কাজ মনে করিবে। তাহার বদলে তিনি চাহেন, সমিতির হাতে ফসলের একটা কিছু ভাগ আসুক যাহার দ্বারা ঔষধ, শিক্ষা, খাজনা, টেক্স, পানীয় জল এবং প্রয়োজন মত বীজ ও সার দেওয়া যাইতে পারে। বাকী ফসল নিয়া চাষীরা নিজের মত নিজের সংসার প্রতিপালন করুক। তবে যাহার সংসারে যত লোক সেই অনুপাতে তাহাকে জমি চাষ করিতে দিতে হইবে। সমিতি তাহাকে নিজ শক্তিতে বিশ্বাস রাখিতে সাহস দিবে, বিপদে-আপদে তাহাকে সাহায্য করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবে। তথাপি জমির মালিকানা কৃষকের ইহা মানিয়া লইতে হইবে। সমিতির মালিকানা হইলে সমাজ-ব্যবস্থার বিপর্য্যয় অনিবার্য্য, ইহা তিনি জোরের সহিত দলের সকলকে শুনাইয়া দিলেন। হিন্দুর শ্রাদ্ধ ব্যবস্থার মূল নীতি পিণ্ডদান করিয়া মৃতের সম্পত্তির অধিকারী হওয়া। সম্পত্তি যদি না থাকে তবে মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ করিতে কেহই বিশেষ উৎসাহী হইবে না। স্ত্রীর একান্ত স্বামীপ্রীতির মধ্যেও স্বার্থ আছে। স্বামীর দ্বারা সে প্রতিপালিত হয় তাহা সে জানে। স্বামী-স্ত্রী, পুত্রকন্যা সবাই যখন হইবে সমিতির অধীনে দিনমজুর, তখন সতীত্ব, স্বামীপ্রীতি, পিতৃভক্তি এসব কথার কথা হইয়া দাঁড়াইতে বাধ্য। ক্রমে গাঁইগোত্র, রক্তের বিশুদ্ধতা, ঐতিহ্য সব রসাতলে যাইবে। মেঘলাল কিন্তু অরুণার এই যুক্তিতে ঘাড় বাঁকাইয়া বসিল। শেষে আপোষ হইল মেঘলালের ব্যবস্থা মতই কাজ চলিবে, তবে পরীক্ষামূলকভাবে মাত্র দুই বৎসরের জন্য। কিন্তু ইতিমধ্যে মধ্যে জমির [illegible] চাষীরই থাকিবে।

অরুণার খুব আভিজাত্য-বোধ ছিল। তবে [illegible]প্রীতি তিনি সমিতির কাজে যেন বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু ভাইপো বুড়ুকে কোনো কিছুতেই উৎসাহী হইতে না দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইতেছেন।

মেঘলাল চারিদিক্ হইতে স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকা সংগ্রহ করিতে লাগিল। অর্দ্ধ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেকার তরুণ-তরুণীদের আনাগোনায় ক্ষুদ্র গ্রামখানি মুখর হইয়া উঠিল। একসঙ্গে আনাহার, একসঙ্গে কাজকর্ম। শিক্ষা অশিক্ষার অভিমান নাই, জাতি অজাতির বিচার নাই। কাহারো উৎসাহ প্রতিহত হইবার কোনো বাধা থাকিল না।

সব জমির আল ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। নূতন করে গ্রাম পত্তন করিয়া নূতন নূতন রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে। গ্রামের মাঝে খাল আর জমিতে জোড়া পুকুর কাটা হইল। ছেঁচের জন্য তাহা যে একান্ত দরকার। পুকুরপাড়ে কলা ও নারিকেলের গাছ বসানো হইল। বিলের পলি পড়া জমিতে লাউ কুমড়া ফুটি কাঁকর প্রভৃতির ভাল বীজ লাগানো হইল। অরুণার বাসবাড়ীর পিছনেই এই বিল। বিলের নিকটেই লম্বা লম্বা একচালা উঠিতেছে। তাহাতে সমিতির সব লোক বাস করিবে। কাজের অভাব নাই, খাওয়া পরার অভাব নাই। অরুণার অগাধ ঐশ্বর্য্য এই সব কাজে ব্যয় হইতে লাগিল।

তাঁহার নূতন বাড়ীটায় হইয়াছে হাসপাতাল ও ডাক্তারখানা, আর পুরাতন বাড়ীটায় হইয়াছে অফিস। একটু দূরে পুকুরপাড়ে তিনি নিজের জন্য একখানি দোচালা তুলিয়াছেন। দেশের সকলেই যেখানে কুটীরবাসী সেখানে তিনি তো আর পাকা ঘরে থাকিতে পারেন না। তাঁহার ভাইপো পর্য্যন্ত চাষীদের সঙ্গে এক ভোজনাগারে খাইতে লাগিল। নূতন জীবনে তিনি পূর্ব্বের সব ধারা বদলাইয়া ফেলিয়াছেন। সমস্ত দিন কাজের মধ্যে কাটান, সন্ধ্যায় কুটীরে ফেরেন। তাহার পর স্নান পূজাদি সারিয়া গীতা-চণ্ডী নিয়া বসেন। ওদিকে হবিষ্যান্ন ফুটিতে থাকে।

সেদিন স্নানান্তে সন্ধ্যার সময় তুলসীতলায় আলো দিয়া সবে গীতাখানি নিয়া স্বামীর ছবির কাছে বসিয়াছেন, এমন সময়ে খবর আসিল, পাশের গ্রামে বিশম্ভর বাবাজীর আখড়ায় একটি নিরাশ্রয়া যুবতী আটকাইয়া পড়িয়াছে। সমিতিতে আশ্রয় নিতেই সে বাহির হয়। কিন্তু পথে আড়কাঠীদের হাতে পড়ে। তাহাকে উদ্ধার করিতে হইবে। অরুণা দেবী মাথায় গীতাখানি ঠেকাইয়া উঠিয়া পড়িলেন।

মেয়েটিকে উদ্ধার করিতে বেশী বেগ পাইতে হইল না। স্বেচ্ছাসেবক-সেবিকারা শোভাযাত্রা করিয়া তাহাকে লইয়া আসিল। অরুণা দেবী নিজ কুটীরেই তাহাকে আশ্রয় দিলেন। সে তাহার করুণ কাহিনী তাঁহাকে বলিতে লাগিল। কি করিয়া তাহার বিধবা মা খ্রীষ্টান হইয়া

আবার বিবাহ করিয়াছে এবং তাহাকেও খ্রীষ্টান করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কি করিয়া সে তাহাদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত পলাইয়া আসিয়াছে এবং বিনা টিকিটে অনাহারে অনিদ্রায় আসিতে আসিতে শেষে সমিতির সন্ধান পাইয়াছে···ইত্যাদি। সে অত্যন্ত মিনতি করিয়া বলিল, তাহার এক মামা আছে; কিন্তু খ্রীষ্টান সংস্পর্শের কথা শুনিয়া সে তাহাকে সহজে আশ্রয় দিতে চাহিবে না। তাই পুলিশকে জানাইতে বলিল। পুলিশ যদি ভয় দেখাইয়া তাহার মামাকে আশ্রয় দিতে বাধ্য করে। সে কাঁদিতে লাগিল। অরুণা তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিলেন। আবার স্নান করিয়া অরুণা দেবী হবিষ্যান্ন চড়াইলেন। এরূপ দুই চারিবার স্নান করিতে তিনি আজকাল অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সন্ধ্যার পর হবিষ্যান্ন গ্রহণের পূর্ব্বে কোথাও ডাক পড়িলে তিনি ফিরিয়া আসিয়া আবার স্নান করিয়া অন্ন চড়ান। এটাকে তিনি শুচিবাই বলিয়া মনে করেন না। তাঁহার কৈশোরের মিশনারী স্কুলের বোর্ডিংয়ের জীবনের সঙ্গে এখনকার জীবনধারা মিলাইয়া দেখিয়া হাসেন।

আবার বর্ষা আসিল ও গেল। কাজের ভিড় ততোটা নাই। অরুণা দেবী পুকুরপাড়ে বসিয়া সগু একটা ছবি আঁকা শেষ করিলেন। একটা পুকুরে একজন জেলে মাছ ধরিতেছে, কিন্তু মাছগুলো সব জেলের পায়ের কাছে আসিয়া জড় হইয়াছে তাই কোনোটাই জালে ধরা পড়ে নাই— এই রকম একটা ছবি। ছবির তলায় লিখিলেন—'চালাক মাছ জালে পড়ে না'। আর সংস্কৃত শ্লোক লিখিলেন— "দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া······"।

অরুণা দেবী একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ছবিখানি নিয়া উঠিলেন। পত্তনি খাজনা দাখিলের সময় আসিয়া পড়িল। কিন্তু হাত খালি হইতে বসিয়াছে। প্রাথমিক ব্যয় তো কম নয়। ফসল তো এখনিই বিক্রয় করা চলে না। রাখিয়া ঢাকিয়া বিক্রয় না করিলে দর মিলে না। মেঘলাল আসিয়া নূতন একটা ফরমাস করিয়া বসিল। সে বলিল, কর্মক্লান্ত এই পাঁচ ছয়শত লোক একটা ফসল তোলার পর দিন কতক আমোদ-আহ্লাদ চায়। একটা জলসা নাচগান এমনি কিছুর আয়োজন করিতে হইবে। অরুণা বলিলেন—ধর্ম্মমূলক কোনো যাত্রা গান প্রভৃতির আয়োজন হোক। তাহাতে চোখ খুলিবে এবং আনন্দলাভও হইবে। ধর্ম্ম, সংযম—এসব জীবনের প্রধান অবলম্বন। নতুবা জীবনটা পশুজীবন হইয়া যায়। আর দেখা যাইতেছে, এই দুইটার দিকে দৃষ্টি রাখিতে কাহারও তেমন উৎসাহ নাই। তিনি একটু উত্তেজিত ভাবেই বলিলেন, ব্যাভিচার তিনি কোনো মতেই সহ্য করিতে প্রস্তুত নন। সে দিকে তিনি কশিয়া লাগাম ধরিবেন। স্বেচ্ছাসেবিকার মধ্যে কাহার কাহার গর্ভ সঞ্চার হইয়াছে, তিনি খোঁজ পাইয়াছেন। এসব প্রণয়ীদের বিধিমত বিবাহ হওয়া বাঞ্ছনীয়। ডাক্তারখানার সঙ্গে শিশুপালনাগার ও প্রসবাগার শীঘ্রই খুলিতে হইবে। এবং কোনো স্থানে একটি প্রার্থনা গৃহ বা মন্দির প্রস্তুত করাও একান্ত দরকার। তাহার পর একটু বিশ্রাম লইয়া একটু করুণ কণ্ঠেই তিনি বলিলেন— তোমাকে জিজ্ঞাসা করা দরকার হইয়া পড়িয়াছে যে তুমি কেন সুন্দরীকে বিবাহ করিতেছ না?

অরুণা অতি রাশভারি স্ত্রীলোক। মেঘলালও এই নিষ্ঠাবতী নারীটিকে ভয় ও সম্ভ্রমের চোখে দেখে। মেঘলাল আমতা আমতা করিয়া যাহা বলিল তাহার অর্থ এই যে, তাহাদের আদর্শের সঙ্গে পৌত্তলিকতা, বিবাহবন্ধন, জাতি-সমাজ এ সব খাপ্ খায় না···। সে আরো কিছু বলিতে যাইতেছিল কিন্তু অরুণা দেবী দৃঢ় পদে তাঁহার কুটিরের দিকে চলিয়া গেলেন তাই আর কিছু বলা হইল না।

মেঘলালের পা টলিতে লাগিল। সে চলিয়া গেল [illegible]। অফিসের টেবিলে মাথা গুঁজিয়া সে কিছু[illegible]সিয়া আছে। তাহার মাথায় আজ যেন আকাশ ভাজিয়া পড়িয়াছে। শরতের এক পশলা বৃষ্টি খোলা জানালার ফাঁক দিয়া আসিয়া তাহার পিঠের দিকটা ভিজাইয়া দিয়া গেল। দমকা হাওয়ায় লণ্ঠনটি নিবিয়া গেল। অন্ধকারে সেই সময়ে সুন্দরী আসিয়া তাহার পিঠে হাত দিল। বলিল, "ওঠো ওদিকে ভারি বিপদ, গোলায় ডাকাত পড়েছে···চুপ্ ক'রে চ'লে এস।" বিদ্যুতের বেগে মেঘলাল উঠিয়া বসিল। তাহারা অন্ধকারে চলিয়াছে। পাশের বাড়ীতে ডাক্তারখানা। ঘরের মধ্যে কাহারা ফিস্‌ফিস্ করিয়া কথা বলিতেছিল। কাণ পাতিয়া

সুন্দরী তাহা শুনিল। শেষে হাসিয়া চলিয়া আসিল। সেদিন সেই যে নূতন মেয়েটি আসিয়াছে, সে ডাক্তারের কাছে প্রেম নিবেদন করিতেছে। তাহারা অরুণার কুঁড়ে ঘরের কাছে আসিল। পাশেই সারবন্দী গোলা। গোলার পাশেই একটা প্রকাণ্ড আটচালা। তাহার পর বাতান ও গোয়াল। এই আটচালার মধ্যে একটা মাট-কোঠায় লাঙল, বিদে, মৈ এবং দা, কুড়ুল, গাঁতি, কোদাল প্রভৃতি চাষের যন্ত্র থাকে। সেটাতে তালা দেওয়া থাকে। এই তালা ভাঙ্গিয়া ঢুকিয়াছে দুইজন লোক। তার মধ্যে একজন স্ত্রীলোক। অনিলার গলা বলিয়া মনে হইল। স্ত্রীলোকটি বলিতেছে—"কোনো অস্ত্রই তো নেই··· আর কত খুঁজবো···শেষে ধরা পড়বো···?"

পরদিন ভোরের দিকে মেঘলাল অরুণার কুটিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার হাতে মস্ত একখানা বাঁধানো গ্রুপ ফটো। সমিতির যত স্ত্রীপুরুষদের একখানি গ্রুপ ফটো তুলিবার জন্ত অরুণা আদেশ করিয়াছিলেন। ছবিখানি নিয়া অরুণা তাহার উপরের কার্ডবোর্ডে লিখিলেন—"সর্ব্বং খ স্বিদং ব্রহ্ম"। অর্থাৎ এই সব নর-নারী ভগবানেরই বহুরূপ। তিনি বুঝি এই সব লোক-সেবা দ্বারা ভগবানেরই সেবা করিতেছেন। অরুণা ছবিখানি মস্তকে স্পর্শ করাইলেন। তাহার পর মেঘলালকে বলিলেন—"দেখ, একটা হিসাব নিকাশ ক'রবার সময় এসেছে। এবারও অজন্মা গেল। আমার ব্যাঙ্কের পুঁজি প্রায় সব ফুরিয়েছে। কিন্তু তাতে দুঃখ করবার কিছু নেই। তবে দুঃখ হচ্ছে যে [illegible] সেবিকারা এই দুর্দ্দিনেও ধৈর্য্য অবলম্বন করতে [illegible]। পরীক্ষা ক'রে দেখলে তো চাষীদের সঙ্গে তারা চা[illegible] হতে চাইলে না। রোদ-বৃষ্টিতে তারা দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না। তারা আবার যা করলে তাতে আমাদের মাথা হেঁট ক'রে দিলে। যুবকরাই পালিয়েছে বেশী। তারা রেখে গেছে ঐ সব গর্ভবতী যুবতীদের। ওদিকে চাও ঐ চাষী মুনিষদের দিকে। তাদের জন্ত না-ক'রলাম কি? কত মাথার ঘাম পায়ে ফেললাম। ধর্ম্ম-মন্দির, অনাথ-আশ্রম, স্কুল, হাসপাতাল···কত সব ক'রলাম। কিন্তু কারো কি কোনো উপকার হ'লো? তারা পরিচ্ছন্নতা শিখলে না, নেশা ছাড়লে না, লেখাপড়া শিখলে না, শিশু মৃত্যুর হারও কমল না···। তোমাদের প্রচেষ্টা আর পরিশ্রম হয়তো কিছু তৃপ্তি দিলে, কিন্তু কি উপকার ক'রলাম আমরা জগতের···?"

মেঘলাল বলিল—"আজ বৈকালে ঝাউডাঙ্গায় যে সভা হবে তাতে সমিতি রাখা না-রাখা একটা কিছু স্থির করা যাবে মা, আপনি যাবেন।"

মেঘলাল চলিয়া গেলে অরুণা দেবী তাঁহার কুটিরে টেবিলের উপর গ্রুপ ফটোখানা রাখিয়া মেজের উপর বসিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। আরও একটা চিন্তা তাঁহার মাথায় আসিয়াছে। বুদ্ধু এবং অনিলার চালচলনও তাঁহার ভাল ঠেকিতেছে না। কৈ অনিলার মামার তো কোনো চিঠিপত্রই আসিল না। আলনায় অনিলার সেই ওভারকোটটা ঝুলিতেছিল। তিনি কি ভাবিয়া ঐ কোটের পকেটগুলিতে হাত ভরিয়া দিয়া খুঁজিতে লাগিলেন। একটা পকেট হইতে শুধু এক টুকরা কাগজ পাওয়া গেল। সেটাতে একটি কবিতা লেখা আছে। বুদ্ধুর হাতের লেখা। অনেক বানান-ভুলপূর্ণ একটি প্রেমের কবিতা। মাঘের শীতে এই কোটটা গায়ে দিয়া একবস্ত্রে অনিলা আসিয়াছিল। অরুণা দেবী একটু বিচলিত হইলেন। যাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন তাহাকে তাড়াইয়া দিতেও মন চাহিতেছিল না।

বৈকালে ঝাউডাঙ্গার সভায় অরুণা দেবী চলিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধু চা খাইয়াই যাইবে। চা'র পেয়ালা হাতে নিয়া সে ভাবিতেছে—"কেন বলে' ফেলতে পারছি না, অনিলা আমি তোমায় কত ভালবাসি···কেন মুখে বেধে যাচ্ছে···!"

হঠাৎ সেখানে স্বয়ং অনিলা দেখা দিল। তার মুখ চোখের ভাবভঙ্গী দেখিলে মনে হয়, সে যেন লজ্জায় বিকৃত হইয়া গিয়াছে। কোনো ভণিতা না করিয়াই সে বলিল—"দেখ বুদ্ধুবাবু, আমি এতদিন সব মিছে কথা বলেছি। আমার মাকে যে খ্রীষ্টানটা বিয়ে করেছে সে আমাকেও বলে খ্রীষ্টান হয়ে আবার বিয়ে করতে। কিন্তু আমার স্বামী আছে। আমি তাই পালিয়ে এসেছি। আমি সধবা —কুমারী নই···তোমাদের কাছে মিথ্যে বলেছিলাম।"

রাগে বুদ্ধুর মাথাটা যেন টন্ টন্ করিতে লাগিল।

টেবিলে একটা কিল্ মারিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। তাহার পর সে থানার দিকে ছুটিল। হাঁ থানার দিকে। সে দারগাকে বলিয়া দিবে মেয়েটা বিধবাও নয়, কুমারীও নয়—সে সধবা ...সে পুলিশ হয়রান করিয়াছে, তাহাকে চালান দাও...।

গ্রাম হইতে থানা অনেক দূরে। ছুইটা মাঠ পার হইতে হয়। মাঠ ক্ষেত-খামারে ভরা। গমের শিষগুলি বাতাসের বেগে ছুলিতেছিল। সরষে ক্ষেতে যেন আগুনের ফুল্‌কিগুলি উল্‌টিয়া-পাল্‌টিয়া পড়িতেছে। বুদু আলের পথ ধরিয়া ছুটিতেছে। তাহার মনে একটা দারুণ ঘৃণা। ছিঃ ছিঃ, একটা মেয়ে আসিয়া এতদিন শুধু ধাপ্পা দিলে। লোকে শুনিলে বলিবে কি! আজই সে পিসীমাকে বলিয়া ইহাকে বাহির করিয়া দিবে...। পুলিশ হাতকড়া দিয়া মেয়েটাকে চালান দেয় না কি?

ছুইটা আমগাছ জড়াজড়ি করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে একটা বট গাছের গায়ে। এইখানেই সেই মালীবৌটা গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছিল না? বৌটা যে রাত্রে হাব্‌লার সঙ্গে ধরা পড়ে তার পরের দিনই সকালে এখানে গলায় দড়ি দিয়া মরে। বুদুর গা ডুলি দিয়া উঠিল। একটা ঝড় উঠিতেই বুদু এখানে আশ্রয় নিয়াছিল। একটু বৃষ্টি পড়িতেই শুকনো মাটির সোঁদালে গন্ধ বাহির হইয়াছে। পিছন দিকে শেয়াল কাঁটা আর ভাঁটগাছগুলো থেকে কিন্তু পেত্নীর গায়ের গন্ধ আসিতে লাগিল। গোয়ালে লতার ঝোপের আড়াল হইতে কি যেন খস্ খস্ করিয়া উঠিল। একটা মেয়েমানুষ...সাদা কাপড়। মাগো...পেত্নী—বলিয়া বুদু চিৎকার করিয়া উঠিল। তাহার হাত পা কাঁপিতে লাগিল। ভিতর হইতে আসিয়া অনিলা তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। বলিল—"শোনো... আর থানায় যেতে হবে না। আমি মেয়ে-গোয়েন্দা তোমাদের সমিতির ভেতরকার সব কিছু জানতে এসেছিলাম। তা সবই জানতে পেরেছি। এমন কি কোদাল গাঁতি পর্য্যন্ত কি কোথায় আছে সব তুমি দেখিয়েছ। মা'কে বল, আমি সমিতির কোনো অনিষ্টই করব না। তিনি মা'র মতই আমার যত্ন করেছেন। কিন্তু তাঁর মহৎ উদ্দেশ্য নষ্ট হতে চলেছে ভলেন্টিয়ারদের দিয়ে। তাদের যেন শীঘ্র তিনি বিদেয় দেন...।"

ঝাউডাঙ্গা হইতে অধিক রাত্রে অরুণা ফিরিলেন। যেন তাঁহার সমস্ত উৎসাহ নিভিয়া গিয়াছে। তবুও স্নান করিলেন, তুলসী তলায় দীপ দেখাইলেন, স্বামীর ছবির কাছে আসিয়া কুটিরের মধ্যে বসিলেন। কিন্তু কবিতায় চড়ানো আর হইল না। স্বামীর ছবির নিচে তিনি লিখিয়াছিলেন—"তত্ত্বমসি—আমার ভগবান!" চোখের জলে ছবির কাছে অজস্র প্রণাম করিয়াও মনস্তাপ নিবারণ হইতেছে না। হঠাৎ কানে গেল দূরে সুরামত্ত সাঁওতালদের আসর হইতে ভাসিয়া-আসা একটি করুণ সুরের গান। সারঙ্গী ও বাইজী গাহিতেছে:

(বাইজী) তন মনমে নাচ্ গাওই
কয়দা নহি মিলয়্।
রাক্তিনীকি কনঠ গহি
চরণ নহি চলয়।
(সারঙ্গী) সব গেয়ী থোরি রহি
থোরিভি অব্ যায়!
বহে নট্ রে পিয়ারে
তাল ভঙ্ ন হোয়!!

বাইজী বলিতেছে প্রাণমন দিয়া নাচিলাম গাহিলাম কিন্তু কেহই আমাদের পরিশ্রমের মূল্য দিলে না। সারেঙ্গী বলিতেছে—তা হোক, তবু তোমার তালভঙ্গ না হয়... রাত্রি আর অল্পই আছে!

অরুণা ভাবিলেন এ যেন তাঁহাকেই কে উপদেশ দিতেছে...নিরাশার রাত্রি যাইবেই যাইবে, কিন্তু তালভঙ্গ না [illegible] কর্ত্তব্যের প্রতি বিশ্বাস না যায়।

[illegible]কে গান হইতেছিল তিনি সেই দিকে ছুটিয়া চলি[illegible]ছিলেন। পথের মাঝে এক সাধু ধুনি জ্বালাইয়া বসিয়াছিলেন। তিনি ডাকিলেন—মায়ী! সেই পরিচিত ডাক। কবে এই সাধু আসিলেন? আজই বোধ হয়। অরুণা নিকটে আসিলে সাধু তাঁহার ধুনির উপর চিমটা দিয়া জোরে জোরে দুই চারিবার আঘাত করিলেন। শেষে হিন্দীতে বলিলেন—"কি উড়ে যাচ্ছে দেখছিস্ মায়ী?...এসব প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তির ছাই!...তুই ভাল করে এই ভস্মের টিকা নে।"

অরুণা সাধুর নিকটে বসিয়া পড়িলেন।

সাম্যবাদ

সাম্যবাদ বিষয়ক আলোচনায় সাধারণতঃ নিরপেক্ষ মনের পরিচয় খুব কমই মিলে। এই হেতু কৌতূহলী মন যথাযথ তৃপ্ত হয় না। ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতে অধ্যাপক উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ, মহাশয় 'সংযম ও সাম্যবাদ' শীর্ষক প্রবন্ধে গভীর মানব-চরিত্র ও তার জটিল মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণমূলক আলোচনা যে নিরপেক্ষ আবেগহীন দৃষ্টিভঙ্গীতে করিয়াছেন তাহার প্রতি আমরা জিজ্ঞাসু ব্যক্তিমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করি। প্রবন্ধ শেষে তিনি মোটামুটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন :—

সাম্যবাদের কোন দার্শনিক ভিত্তি নাই, তাহা বলি না। যে-দেশে অর্থের উপরই সমাজের ভিত্তি—অর্থের প্রাচুর্য্যই সামাজিক পদপমর্য্যাদা ও প্রভুত্ব দিতে পারে, সে-দেশে অর্থের বৈষম্য বিলোপ করিতে মানুষ চাহিবেই। সেই জন্যই ইউরোপে সাম্যবাদ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। আর, বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ইউরোপে রুশিয়ার প্রভাব যে ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে সাম্যবাদের বিস্তৃতিও বাড়িবে। হিন্দুর সমাজ-গঠনে শুধু অর্থ দ্বারা মানুষ বড় হইত না। বশিষ্ঠ কিংবা বিশ্বামিত্র কিংবা দুর্ব্বাসা ধনের বলে বলীয়ান ছিলেন না। অবশ্যই সে সমাজ আর নাই। অর্থের প্রাধান্য এখন সর্ব্বত্র। সেই জন্যই এই অর্থের প্রাধান্য বিচূর্ণ করিয়া গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাও প্রবল হইয়া পড়িয়াছে। এই উদ্দেশ্যে গণশক্তিকে জাগাইবার জন্যও নানা রকম উদ্যম চলিতেছে। কিন্তু জনগণের মনে অসংযত বাসনার উদ্রেক করাই এক্ষেত্রে প্রধান উপায় কিনা ভাবিবার বিষয়।

সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইলেই মানুষের যে-কোন বাসনা[illegible]ান প্রকার তৃপ্তি যে সম্ভব হইবে না, ইহা আমাদের স্মরণ রা[illegible]। বর্ত্তমান জগতে জাতিতে জাতিতে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে এবং [illegible]ক্তিতে ব্যক্তিতে যে একটা লুব্ধ কাড়াকাড়ি দেখিতেছি, তাহাতে [illegible]নে হয় প্রাচীন জগতের প্রধান আবিষ্কার যে নীতি-ধর্ম্ম তাহা স্মরণ করার কোন দোষ নাই। অর্থাৎ কেহ ধনে কিংবা পদে কিংবা শক্তিতে বড় হইয়াই নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করিবে—সমাজের অন্যের চেয়ে নিজেকে অধিক মূল্যবান্ মনে করিবে, এমনটি হওয়া উচিত নয়। ধনীর কিংবা শক্তিমানের প্রভুত্ব-লিপ্সা সংযত হওয়া উচিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ধনীর অন্যায়লব্ধ প্রভুত্বের প্রতি নির্ধনের যে প্রচণ্ড লোভ, তাহাও সংযত হওয়া উচিত। ভোগাধিক্যের চেয়ে সেবা, প্রাপ্তির চেয়ে দান, দাবীর চেয়ে কর্ত্তব্য এবং লোভের চেয়ে সংযম বড় ও মহান্—এইটি স্বীকৃত না হইলে কখনও শান্তিময় ও সুখময় সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

ছোট গল্প

পাটনা সায়েন্স কলেজের দ্বাদশ বার্ষিক বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে শ্রীযুত সরোজকুমার রায় চৌধুরী 'আধুনিক সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি' শীর্ষক যে অভিভাষণ দিয়াছেন তাহা নানা দিক্ দিয়া অনুধাবনীয়। এই প্রসঙ্গে তিনি ছোট গল্প সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছেন তাহা খুবই মনোগ্রাহী :

ছোট গল্প ইঁট-পাথর লোহা দিয়ে গড়া সুদৃঢ় বিরাট হর্ম্য নয়। সে হ'ল উপন্যাসের গড়ন। ছোট গল্প একটি চরিত্রের একটি ক্ষণের রূপ মাত্র। এক বিন্দু শিশিরের মতো টুলটুলে, সুন্দর এবং আশ্চর্য। তার গোড়াও নেই, শেষও নেই। উল্কার মতো। আকাশের অগণিত তারার মধ্যে কোথায় ছিল লুকিয়ে কেউ খেয়াল করেনি। চমক লাগল তখন, যখন সে তার প্রতিবেশ ছেড়ে প্রচণ্ড বেগে একটি আলোর রেখায় নামতে লাগল। কিন্তু তাকে শেষ পর্যন্ত দেখতে পেলাম না। মাটি ছোঁয়ার আগেই সে গেল মিশিয়ে।

কৃষ্টির সংজ্ঞা

ঢাকা ইউনিভার্সিটির ঢাকা-হলের সাহিত্য সভায় শ্রীযুত অনিলবরণ রায় কৃষ্টি-সঙ্কট বিষয়ে যে সুচিন্তিত বক্তৃতা ইংরাজীতে দেন তাহার বাংলা সারাংশ ফাল্গুন মাসের "জয়শ্রী"তে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতেই কৃষ্টির সংজ্ঞা সম্বন্ধে তিনি বলেন :

মানুষের জীবন ও মনের প্রকাশই কৃষ্টি। মানুষের সিদ্ধির পরিপূর্ণ স-শরীরী রূপ—জড়জগতের সংস্পর্শে মানুষের মনের আনন্দোজ্জ্বল বিকাশই কৃষ্টি। কৃষ্টির দুইটী দিক্, বস্তুকেন্দ্রিক ও মনোকেন্দ্রিক। মনোকেন্দ্রিক ক্ষেত্রে মানুষ দর্শন, আর্ট, সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞান সৃষ্টি করেছে। চিন্তার সূক্ষ্মধারা, কল্পনাপ্রসূত অত্যাশ্চর্য দূরদৃষ্টি, আদর্শ ও স্বপ্ন, মন ও অনুভূতি এগুলিই কৃষ্টির মনোময় দিক।

কৃষ্টির অন্তর্মুখী ও বাহ্যিক দিকের মধ্যে কোন পরস্পরবিরোধিতা নেই। এরা একই বস্তুর দুই দিক্। জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে বিভিন্নমুখী ধারাকে সামঞ্জস্য করবার ক্ষমতা মানুষের আছে। জীবনের একটী পূর্ণ চিত্র সে মনে মনে আঁকে এবং সেই আদর্শানুযায়ী মূল্যের তারতম্যের অনুপাতে জীবনে তাদের স্থান নির্দেশ করে। মানুষের জীবনে সবকিছুর জন্যই স্থান আছে। বস্তুসম্পর্কে মূল্যনিরূপণই কৃষ্টি।

রবীন্দ্র-বৈজয়ন্তী—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীইন্দুমাধব সেনগুপ্ত, ৪৫।১-বি, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্যের উল্লেখ নাই।

আলোচ্য পুস্তিকা লেখকের কয়েকটি কবিতার সমষ্টি। সত্যেন্দ্রনাথের 'নমস্কার' কবিতা দিয়া রবীন্দ্র-অর্ঘ্যের সূচনা হইয়াছে, শেষ হইয়াছে লেখকের 'মুক্ত রবি' কবিতায়। কবিতাগুলির মধ্য দিয়া রবি-বন্দনায় যে পঞ্চপ্রদীপ জ্বালান হইয়াছে, তাহাতে লেখকের শ্রদ্ধাপ্লুত অন্তরের পরিচয় বিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কাব্য-সম্পদের দিক দিয়াও কবিতাগুলি রসিকের নিকট গ্রহণীয় হইবে।

প্রসন্ন-জীবনী-সার—শ্রীসুধীর মজুমদার প্রণীত। ১৭ পৃষ্ঠার পুস্তিকা। মূল্যের উল্লেখ নাই।

পাবনা জেলার চালুহারা গ্রামে স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার মজুমদার মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় জনহিতকর কার্য্যের সহিত ইনি নিজেকে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। পুস্তিকাটিতে তাঁহার জীবনের জনসেবার দিকটা সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিখ্যাত নেতা বা বাগ্মীর জনপ্রিয়তা তাঁহার ছিল না, তথাপি বাংলার বৃহত্তর জীবন সংগঠনের অলিখিত ইতিহাসে তাঁহার ও তাঁহার ন্যায় বহু কর্ম্মীর দান চিরকাল সম্মানিত থাকিবে।

শতাব্দীর ক্রন্দন—শ্রীজীবানন্দ ঘোষ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান: ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃঃ সংখ্যা ১০৫, দাম এক টাকা।

আলোচ্য উপন্যাসে লেখক একটি সুস্থ ও সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছেন যাহা পাঠককে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিবে। উপন্যাসটির আরম্ভ হইয়াছে ভাল সেই অনুপাতে ভিতরের বিভিন্ন ঘটনাগুলির মধ্যে একটা মাত্রাজ্ঞানের অভাব দেখা যায়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লেখকের বক্তব্য ও উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়, ভাষা সম্বন্ধেও বলিবার কিছু নাই বরং ইহা বলা চলে যে, লেখক আধুনিক চলিত ভাষার অস্বাভাবিক ন্যাকামির নিকট আত্মসমর্পণ করেন নাই। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের ছবি ত্রুটিহীন নয়, ঊষা দেবীর চরিত্রচিত্রণে অস্বাভাবিকতা আছে। লেখক এই পরিণত বয়স্কা মহিলার মুখ দিয়া আত্মপরিচয়ের যে সুদীর্ঘ বিবৃতি দিয়াছেন যাহা আমাদের নিকট শোভন মনে হয় নাই। ইহা সত্ত্বেও পুস্তকটি পাঠক সাধারণ উপভোগ করিবেন বলিতে পারি। শিল্পী আশু বন্দ্যোপাধ্যায় অঙ্কিত প্রচ্ছদপটটি ভাল হইয়াছে।

দেহলি—শ্রীহেমলতা দেবী প্রণীত। প্রকাশক—বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃঃ সংখ্যা ১৩৫, দাম একটাকা চারি আনা।

এই গল্প-পুস্তকটি আমাদের বিশেষ আনন্দ দিয়াছে। লেখিকার দৃষ্টি ও প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে যে নিজস্বতা আছে তাহা দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে না। বিশেষ করিয়া পল্লীচিত্রগুলির বাস্তবতা যাহা লেখিকার ভাষায় ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা উপভোগ করিবার মত। 'হাটতলা' ও 'চলাচল'—এই গল্প দুইটি উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টির পরিচয়-রূপে গণ্য হইবে। সাহিত্য-সৃষ্টি ছাড়াও পল্লীজীবনের দোষ ত্রুটি এবং ইহার সংগঠনের অপরিহার্য্যতার যে ইঙ্গিত লেখিকা দিয়াছেন তাহা তাঁহার রচনাকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে। আমরা পুস্তকটির প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। কবিগুরুর ভূমিকা পুস্তকটির গৌরববৃদ্ধি করিয়াছে।

শতাব্দী—শ্রীরণজিৎকুমার সেন প্রণীত। প্রকাশক: সংহতি পাবলিশিং হাউস্, ৭ নং মুরলীধর সেন লেন, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

কতকগুলি কবিতার সমষ্টি। কবিতার মধ্যে স্থানে স্থানে বাংলার কোন খ্যাতনামা কবির রচনার ছায়াপাত হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও কবিতাগুলির মধ্যে যে আদর্শবাদের পরিচয় আছে, তাহার প্রশংসার যোগ্য। মৌলিকতার খানিকটা অভাব ঘটিলেও, প্রথম পুস্তক হিসাবে ইহা বলা যায় যে, আর একটু আগ্রহ হইলে কবির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৫ম খণ্ড)—শ্রীঅনিলবরণ রায় কর্ত্তৃক [illegible]ত ও ব্যাখ্যাত। প্রকাশক, গীতা-প্রচার কার্য্যালয়, ১০৮।১ [illegible] মনোহরপুকুর রোড, কলিঃ। মূল্য—১৶০।

শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যা অবলম্বনে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই খণ্ডগুলি শিক্ষিত ধর্ম্মানুরাগী মহলের নিকট বিশেষভাবে আদৃত হইবে সন্দেহ নাই। আগাগোড়া সরল বাংলা ভাষায় বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা চলিতেছে। লেখকের বিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যাপদ্ধতি ও বিজ্ঞানী দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যাগুলির মূলে রস-সঞ্চার করিয়াছে। বর্ত্তমানে এই গ্রন্থের ৫ম খণ্ড বাহির হইয়াছে। প্রত্যেকটি খণ্ডের মধ্য দিয়া ব্যাখ্যাতার অন্তর্দৃষ্টি ও চিন্তাধারার সহজ ও অকুণ্ঠ আবেদন পরিস্ফুট হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই খণ্ডগুলি আমরা চিন্তাশীল, ধর্ম্মানুরাগী পাঠকগণকে পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

মানুষ

শ্রীফণিভূষণ মৈত্র

ক্ষমতার মদে মত্ত মানুষ তুমি—
তোমাকে নমস্কার!
দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করি'
নিষ্ফল ক্রোধে উঠি যে শিহরি',
ত্যাগ ও ভোগের সঙ্গমে মরুভূমি
পেয়েছি পুরস্কার!

মরুভূর সেই উল্কা-আগুন এসে
দিল যে আলিঙ্গন;
নিত্য সত্য সন্তাপ এ যে—
ক্রন্দন-চাপা সুরে ওঠে বেজে,
আশা ও আলোক অন্তরে ওঠে হেসে—
আঁকিল আলিম্পন!

জীবন-আহবে বজ্র-বাধার মুঠি
খুলো না অচঞ্চল,
শক্ত, সাধ্য, সঙ্কট মাঝে
দুর্বল হয় বলী, রয় কাজে,
সাধ ও সাধনা দুর্গতে দেয় ছুটি—
নিবারে অমঙ্গল!

জগত-সভায় ব্যর্থ হয়েছে গান—
হোক্ না অন্তরাল,
কাম্য সাম্য সঙ্গীতটাকে
অন্তর দিয়ে রাখ—যদি থাকে,
সুর ও ব্যথায় সঞ্চিত অপমান
বহুক অন্ধ কাল!

বেদনা তোমার বক্ষে চাপিয়া থাক্—
ভুলো না লক্ষণীয়,
শুষ্ক চক্ষু অঙ্গার সম
দুর্বার তেজে জ্বাল, দোষ ক্ষম,
আঁখি ও আধরে উজ্জ্বল হয়ে যাক্
যেটুকু রক্ষণীয়!

সমুখে আঁধারপুঞ্জ টুটিয়া যাবে—
আপনি সঙ্গোপনে,
শুদ্ধ শক্তি সঞ্চয় কর—
স্পন্দন হোক্ নিবিড়, নিথর,
অণু ও আনন উল্লাসে মধু পাবে—
মাধুরী সঙ্কলনে!

অশনে আসনে অর্ঘ্য ভরিয়া নিতে—
ভরিল বাষ্পবিষ,
স্নিগ্ধ, সিক্ত অঞ্চল পাতি'
সর্পিল মায়া হরি' লয় ভাতি,
কল্প ও মানস দ্বন্দ্বের দোহনিতে
প্রলয় অহর্নিশ!

বীণার নিগূঢ় ছন্দ সুগূঢ় কর—
পাষাণ চিত্তদলে,
সূর্য্য, চন্দ্র সঙ্গের সাথী—
সম্বল হ'লে নিভায় কে বাতি?
ঘর ও দুয়ার সুন্দর ক'রে গড়—
আপন বিত্ত-বলে!

ভিতরে বাহিরে সাম্য সমান হ'লে—
ঘুচিবে অন্ধকার;
দুঃখ-দুর্গ ধর্ষণ করা,
দুর্গম পথে রথ তুলে' ধরা—
কাম ও কামনা সন্ধির কোলে কোলে
লুকাবে অহঙ্কার!

ঘুমাবে ধরণী মুগ্ধ মানুষ ল'য়ে—
মিলন-মত্ততায়;
ক্ষুব্ধ হস্তী সুস্থির হবে
বিশ্বের দাহ সহিয়া নীরবে,
সুর ও অসুর অর্ঘ্যের থালি ব'য়ে
লভিবে তত্ত্ব তায়!

দেবতার মত উচ্চ মানুষ তুমি—
লভিবে স্বর্গদ্বার;
তুচ্ছ দম্ভ লঙ্ঘন কর—
নিষ্ফল ক্রোধে বৃথাই শিহর,
মধু ও মিলনে সুন্দর হবে তুমি—
জমিবে পুষ্পসার!

শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা ও শ্রীগৌরকৃষ্ণের জন্মযাত্রা

শ্রীমৎ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা ও শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মযাত্রা—এই দুইটী স্মৃতিকে বক্ষে ধারণ করিয়া ফাল্গুনী পূর্ণিমা ধন্যাতিধন্যা; তজ্জন্য ভক্তগণ পরম শ্রদ্ধার সহিত এই তিথিরাজের পূজা করিয়া থাকেন। প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও এই তিথিপূজা-মহোৎসব ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এবং ভারতের বাহিরেও বিভিন্ন স্থানে বৈষ্ণবগণ কর্তৃক মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

দোলযাত্রা

বঙ্গদেশে ও উড়িষ্যায় দোলযাত্রা ফাল্গুনী পূর্ণিমায়ই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আসামে এবং বিহারের কোন কোন স্থানেও এই সময়েই দোলযাত্রা উৎসব লক্ষিত হয়। কিন্তু যুক্ত প্রদেশে এবং ভারতের আরও কয়েকটী প্রদেশে চৈত্র-পূর্ণিমায় শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের দোলযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। কোন শাস্ত্রে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় এবং কোন শাস্ত্রে চৈত্র-পূর্ণিমায় দোলযাত্রা-মহোৎসবের কাল নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শাস্ত্রের অনুসরণক্রমে উৎসবকালের দ্বিবিধত্ব পরিদৃষ্ট হয়।

বর্ত্তমানকালে জনসাধারণ যেভাবে দোল-যাত্রায় জড় আমোদ-প্রমোদ করে, তাহা যে শুধু দোল-রহস্যসম্বন্ধে অনভিজ্ঞতারই জ্ঞাপক তাহা নহে, সভ্যতা ও শিষ্টাচারের অভাবও তাহাতে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। শ্রীকৃষ্ণ—সেব্য ভগবান্। ভক্তের দর্শনে 'ব্রহ্ম'-তত্ত্ব তাঁহার অঙ্গকান্তি, পরমাত্মা তাঁহার অংশ। সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয়টী ভগের বা ঐশ্বর্য্যের পূর্ণ আধার-স্বরূপ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ শ্রীনারায়ণ মাধুর্য্যলীলাময়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-মূর্ত্তি। ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-বর্ণনা করিয়াছেন—

> "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
> অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্।"

শ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ : শ্রীচৈতন্য মঠ—মায়াপুর

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা পৃথক্ বস্তু নহেন। একই অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব লীলারসাস্বাদনের নিমিত্ত আলঙ্কারিকের ভাষায় 'বিষয়' ও 'আশ্রয়' এই দুইরূপে নিত্য প্রকাশমান। বিষয়—শ্রীকৃষ্ণ; আশ্রয়—শ্রীরাধিকা। বিষয়—ভোক্তা;

আশ্রয়—ভোগ্য। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ অন্যোন্য-সম্ভোগময় বলিয়া কখনও 'বিষয়'—শ্রীকৃষ্ণ, কখনও বিষয়—'শ্রীরাধা' এবং কখনও 'আশ্রয়'—শ্রীরাধা, কখনও 'আশ্রয়'—শ্রীকৃষ্ণ হইলেও, লীলা-বৈশিষ্ট্যে শ্রীকৃষ্ণের 'বিষয়ত্ব' এবং শ্রীরাধার 'আশ্রয়ত্ব'ই অভিব্যক্ত। শ্রীরাধিকা—শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা আরাধিকা। তিনি আত্মসুখ জানেন না, জানেন মাত্র কৃষ্ণের সুখ। কৃষ্ণ সুখী হইলেই শ্রীরাধিকা সুখী। অপর কিছুতেই তাঁহার সুখ নাই। তিনি এবং তাঁহার অনুগত জনগণ আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছাকে 'কাম' ও কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছাকে 'প্রেম' জানিয়া কাম পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রেমকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। সুতরাং ভক্তের দোলযাত্রা মহোৎসবে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার পূতিগন্ধ বা জড় আমোদপ্রমোদ নাই। শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্যই তাঁহারা এই মহোৎসব করিয়া থাকেন। পরমার্থের লীলা-নিকেতন ভারতভূমির অধিবাসিবৃন্দের দৃষ্টি এই পরম শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হইলেই পরমানন্দের বিষয়।

গিরিধারী জীউর শ্রীমন্দির : মায়াপুর

শ্রীগৌরকৃষ্ণের জন্মযাত্রা

এবার স্মার্ত্তগণ ১৮ই ফাল্গুন তারিখে এবং বৈষ্ণবগণ ১৯শে ফাল্গুন শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব করিয়াছেন। বৈষ্ণব-বিচারের প্রতি দৃষ্টির অভাব নিবন্ধন বাজারে প্রচলিত অধিকাংশ পঞ্জিকায়ই মাত্র ১৮ই ফাল্গুন শ্রীগৌরজন্মোৎসব-বাসর লিখিত ছিল। "গোস্বামিমতে পরাহে" কথাটুকু লিখিবার অবসরও তাঁহাদের হয় নাই। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত ৪৪৫ গৌরাব্দার "বিশুদ্ধ সচিত্র শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা"র বৈষ্ণব-স্মৃতি "শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে"র নির্দ্দেশ উল্লেখপূর্ব্বক ১৯শে ফাল্গুন মঙ্গলবার যে শ্রীগৌরজন্ম-ব্রতোপবাস ও মহোৎসব বাসর ছিল, তাহা সুস্পষ্টভাবে লিখিত ছিল। বৈষ্ণব মহোদয়গণ সেই বিচারই অনুসরণ করিয়াছেন।

বিশ্বকে প্রেমদ্বারা ভরণ ও পোষণ করেন বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের একনাম বিশ্বম্ভর। শ্রীহরি বা শ্রীকৃষ্ণই ঔদার্য্য-লীলায় শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়া তিনি (শ্রীগৌরাঙ্গ) শ্রীগৌরহরি বা শ্রীগৌরকৃষ্ণ বলিয়াও অভিহিত। শ্রীকৃষ্ণের নাম ও প্রেমদ্বারা তিনি জীবগণের চৈতন্য সম্পাদন করেন বলিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণ-কালে তিনি শ্রীকেশব-ভারতী কর্ত্তৃক 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম প্রদত্ত হইয়াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে শক্তিমত্তত্ত্ব—অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বরূপে জানেন বলিয়া তাঁহার আবির্ভাব-তিথি ফাল্গুনী পূর্ণিমায় উপবাস করিয়া থাকেন। উপবাস-বাসর সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তি-বিলাস বলিয়াছেন,—

> "একাদশী তথা ষষ্ঠী পৌর্ণমাসী চতুর্দ্দশী।
> তৃতীয়া চ চতুর্থী চ অমাবস্যাষ্টমী তথা।
> উপোষ্যা পরসংযুক্তা নোপোষ্যা পূর্ব্বসংযুতা॥"

এবার ১৮ই ফাল্গুন চতুর্দ্দশী-সংযুক্ত ছিল বলিয়াই বৈষ্ণবগণ ১৯শে ফাল্গুন শ্রীগৌরজন্মব্রতোপবাস করিয়াছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে শ্রীরাধা-গোবিন্দ-মিলিত-তনু বলিয়া জানেন। মাধুর্য্যলীলায় যিনি শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুই নিত্য বিগ্রহে বিরাজমান, সেই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বই ঔদার্য্যলীলায় শ্রীগৌরাঙ্গ। তাঁহাদের আবির্ভাব-কালীন প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে একটী পরম রহস্য লক্ষিত হয়। শ্রীরাধিকার আবির্ভাব শুক্লাষ্টমীতে—যখন সন্ধ্যায় নভোমণ্ডলে অর্দ্ধ চন্দ্রের উদয় হয় এবং রজনীর প্রথমার্দ্ধ আলোকিত থাকে। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব কৃষ্ণাষ্টমীতে—যখন দ্বিপ্রহর রাত্রিতে অর্দ্ধ চন্দ্র উদিত হয় এবং রজনীর শেষার্দ্ধ আলোকিত

থাকে। আর শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব পূর্ণিমায় এবং সন্ধ্যাকালে যখন পূর্ণচন্দ্র উদিত হয় এবং সমস্ত রাত্রি আলোকিত থাকে। শ্রীরাধা-গোবিন্দ-মিলিত-তনুই যে শ্রীগৌরাঙ্গ, তাহা জানাইবার জন্যই যেন বিধাতা তাঁহাদের আবির্ভাবকালীন ঐ রহস্য প্রকৃতির দেহে কৌশলে অঙ্কিত রাখিয়াছেন।

সুখময় বসন্তের পরিপূর্ণ-বিকাশে মহাপ্রভুর আবির্ভাব। তাঁহার আগমনকে অভিনন্দিত করিবার জন্যই প্রকৃতি-দেবী মনোমুগ্ধকর শ্যামল বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক তৃণ, গুল্ম, লতা ও বৃক্ষশ্রেণীর নবপল্লবে সুশোভিত হইয়া সৌরভবাহী, সুশীতল মলয় অনিল, আম্রমুকুল-মাধবী-বকুলাদির পরিমল-প্রলুব্ধ অলিকুলের শ্রুতিসুখকর গুঞ্জন-ধ্বনি, মধু-ঋতুর দূত কোকিলের সুধাবর্ষী 'কুহু'-রব, বিবিধ বর্ণের কমল-শোভিত স্বচ্ছসলিল সরোবরসমূহের সুমধুর দৃশ্য এবং জলাশয়সমূহে হংস-চক্রবাকাদির এবং বনপ্রদেশে ময়ূর-কুলের কমনীয় নৃত্য প্রভৃতি সহ হাস্যাননে বিরাজমানা। বস্তুতঃপক্ষে সাধুসঙ্গে 'সেবন'-বসন্তে যখন হৃদয় আলোকিত হয়, তখনই সেই নির্ম্মলান্তঃকরণে বা শুদ্ধসত্ত্বে শ্রীভগবানের আবির্ভাব হয়।

সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে এশিয়া মহাদেশ শ্রেষ্ঠ, যেহেতু এই প্রাচ্য-মহাদেশ হইতে যাবতীয় ধর্ম্মের আলোক সমগ্র বিশ্বে বিস্তৃত হইয়াছে। এশিয়া মহাদেশের শিরোভূষণ পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ, কারণ এই পবিত্র-ক্ষেত্রে শ্রীভগবানের চিদ্বিলাস-রহস্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ন্যায়, বৈশেষিক ও পূর্ব্বমীমাংসা —প্রাকৃত-দর্শনত্রয় এবং সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্তের মায়াবাদী ভাষ্য — আধ্যাত্মিক-দর্শনত্রয়ের প্রকাশ ও বিকাশভূমি ভারতবর্ষ হইলেও, ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পৎ অপ্রাকৃত বেদান্ত-দর্শন স্বয়ং অর্থাৎ অভিধা বৃত্তিতে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বেদান্তের যে চিদ্বিলাসবিচার পর আলোক প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই পারমার্থিক ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পৎ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু প্রদর্শন করিয়াছেন যে, অমল পুরাণরাজ শ্রীমদ্ভাগবতই বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য। শ্রীভগবানের সবিলাস বিচারপর পরমার্থতত্ত্বের আবির্ভাব ভারতবর্ষের পুণ্যতোয়া সরস্বতীর তীরবর্ত্তী ব্রহ্মাবর্ত্তে, বাল্যলীলা—বদরিকাশ্রমে, পৌগণ্ড—নৈমিষারণ্যে, কৈশোর —দ্রাবিড় দেশে কাবেরীর তীরে এবং পূর্ণ যৌবন বা পূর্ণতম বিকাশ—গৌড়দেশান্তর্গত ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী শ্রীনবদ্বীপ-ধামে। সুতরাং পারমার্থিক ভারতের মুকুট-মণি

শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া

শ্রীনবদ্বীপধাম, যেখানে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়া বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর এবং সঙ্কীর্ত্তন-বিলাস-ময় যৌবনের চতুর্ব্বিংশ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত লীলা-বিলাস করিয়াছেন।

উপসংহার

কোনও ঐতিহাসিক এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের প্রচারে আমাদের দেশ নির্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে মহাপ্রভুর প্রচার

সম্বন্ধে এবং অপ্রাকৃত প্রেমের শক্তি-সম্বন্ধে তাঁহার অজ্ঞতাই প্রকাশ পাইতেছে। মহাপ্রভু রাজনীতি-সম্বন্ধে কোনও হস্তক্ষেপ করেন নাই। পক্ষান্তরে কেহ যাহাতে রাজস্ব অপহরণ না করে, তজ্জন্ত তাঁহার বড়ই কড়া শাসন ছিল। গোপীনাথ পট্টনায়কের রাজদণ্ড সম্বন্ধে মহাপ্রভুর

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের মন্দির : মায়াপুর

উক্তি পাঠ করিলে, সকলেই সহজে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। তদানীন্তন স্বাধীন উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর শিক্ষা শিরে ধারণ করিয়াও প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া যবনরাজকে বিতাড়িত করিয়াছেন। যে-সময়ে যবনকুলে আবির্ভূত ঠাকুর হরিদাস হরিনাম করিবার অপরাধে (?) যবন-শাসনকর্ত্তার আদেশে বাইশ বাজারে নৃশংস বেত্রাঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যে-সময়ে ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে মুসলমান-শাসন এবং ইসলাম ধর্ম্মের প্রবল বিক্রমে প্রচার চলিতেছিল, যে-সময়ে হিন্দুগণ 'জিজিয়া-কর'-ভারে প্রপীড়িত, যে-সময়ে বিভিন্নপ্রদেশের অধিপতিগণের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সঙ্কটময় অবস্থায় আবির্ভূত হইয়া যিনি প্রবলবিক্রমে সমগ্র ভারতে সনাতন আত্মধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী প্রদর্শন করিয়াছেন, যাঁহার বিক্রমের সাক্ষ্যস্বরূপে কাজী-উদ্ধার-প্রসঙ্গ, যাঁহার প্রচারিত প্রেম-ধর্ম্মের অচিন্ত্য ক্ষমতার সাক্ষ্যস্বরূপে 'পাঠান-বৈষ্ণব-গ্রাম' এখনও বিদ্যমান, তিনি দেশকে হীনবীর্য্য করিয়াছেন! যাঁহার স্বধামে চলিয়া যাইবার পরে সুদীর্ঘ ৫৫৬ বৎসর অতীত হইলেও, আজও বিশ্বের মনীষিগণ তাঁহার অপ্রাকৃত প্রেমধর্ম্মের মহীয়সী শক্তি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার পাদপদ্মে প্রণত হইতেছেন এবং ভারতের গৌরব ঘোষণা করিতেছেন, তিনি দেশকে নির্বীর্য্য করিয়াছেন! আলস্য, জাড্য, নির্বীর্য্যতা, কাপুরুষতা কখনও শ্রীচৈতন্যশিক্ষায় স্থান পায় নাই। তাঁহার শিক্ষার নামে যেস্থানে ঐ সকলের প্রাদুর্ভাব, সেই স্থান তাঁহার শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী এবং বিষকুম্ভপয়োমুখ সদৃশ প্রচ্ছন্ন শত্রুমাত্র। তাঁহার জীমূত-মন্ত্র—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"—হে জীবগণ উঠ, জাগ, মায়ার ঘুম পরিত্যাগ কর, ত্রিতাপের শৃঙ্খলে আর কেন অবস্থান করিতেছ? তোমরা যে অমৃতের পুত্র। ভগবৎ-সেবামৃত লাভ করিয়া ধন্য হও।

আশা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

গোলাগুলি অগ্নিবাণ যার যত বেশী, তার বশীভূত তুমি,
শক্তের বৎসল শুধু, অশক্তের পরে তব চিরবিমুখতা;
এই কি অভ্রান্ত সত্য আজি সভ্যতার যুগে মানিয়া লব তা?
সত্য, ন্যায়, প্রেম, দয়া কেবল রয়েছে যার, তার জন্মভূমি
শ্মশানের ভস্মরাশি মাঝে পাবে চিরন্তন বিরাম নির্বাণ।
এই তব ঐশী বিধি? জগতের যত সাধু, মহাত্মা, প্রেমিক
প্রচারিল যত যাহা সকলি বিভ্রান্তিময় অতথ্য অলীক,
দরিদ্রের কেহ নহ, দুর্বলের দরপুত্র তব ভগবান?

দুর্বলের ব্যথাভরা এ জিজ্ঞাসা কেন তুমি রাখো নিরুত্তরে?
তাহাদেরি আত্মমূল্যে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিতে চাও ধরাতলে?
অত্যাচারী দুর্বৃত্তের সমধিক প্রাণ, ঋদ্ধি, পরাক্রম ধরে—
অহিংস তিতিক্ষু নর, তাই তারে দুঃখ দিয়া পোড়াবে অনলে
যেমনে উত্তীর্ণ কর? মাঝে মাঝে এ মরতে নররূপে আসি'
দেবতারা দেখা দেন, আশার বিশ্বাসে বুক বাঁধে মর্ত্যবাসী।

সাময়িক সাহিত্য

শূলপাণি

পরিচয়—ফাল্গুন, ১৩৪৮ঃ

বাংলা ছন্দের নূতন সম্ভাবনা—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন। 'পদাতিক'-এর গ্রন্থকার ভাগ্যবান্‌, তাঁহার কাব্যপ্রচেষ্টার মূল্য যাহাই হউক না কেন, প্রচারক মিলিতেছে ভাল। রবীন্দ্র-পরবর্ত্তী বাংলার একাধিক কবির ভাগ্যে যাহা জোটে নাই, তাহা তাঁহার জুটিয়াছে। কবির কপাল ও কলম-যশঃ দুই যে ভাল, তাহা 'পরিচয়' পত্রিকার দীর্ঘায়িত রচনা হইতেই বোঝা যাইতেছে। একদা 'কবিতা'-এর আসরে যে 'প্রতিভা' ব্যক্ত হইয়াছিলেন, 'নিরুক্ত'-এর তদ্বিরের জোরে পরিচয়-এর প্রচারপত্র তিনি লাভ করিয়াছেন। বাংলা দেশের কবিযশঃপ্রার্থীর দল যে ইহাতে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা চোখের উপর দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু উপায় নাই, পদাতিকের ক্ষেত্রে যেরূপ অষ্টবজ্র সম্মেলন হইয়াছে, তাহা আপনি আশা করিতে পারেন না। অরসিকের পক্ষে বুদ্ধ-সঞ্জয় মিলনের মহিমা উপভোগ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। প্রবোধবাবুর বিরুদ্ধে আমাদের বলিবার কিছু নাই, তিনি ছান্দসিক, কাব্যের আঙ্গিক দিক্‌টাই তাঁহার নিকট বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। ইট, কাঠ ও রাবিশের মহারণ্যে পথভ্রষ্ট হইয়াও তিনি ছন্দঃ সম্বন্ধে সাধারণভাবে যাহা বলিয়াছেন, তাহার মূল্য আছে।

ব্যালজ্যাকের উপন্যাস—শ্রীশুভেন্দু ঘোষ। একটি অনুবাদ-গল্প।

লক্ষণ—শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তী। লক্ষণ শুভ নয়, বাঙলা ভাষা যে ইতিমধ্যে এতখানি দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে তাহা জানা ছিল না। রীতিমত কসরত করিয়াও যখন কবিতার অর্থ বাগে আনিতে পারা গেল না, তখন সর্ব্ব-সাধারণের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নাই।

> সমস্ত দুটিকে যদি বলি শুক্র সুর।
> তাহার রোদ্দুর
> তোলে চারা।

'শুক্র সুর' কোনও রকমে ধরা গেলেও 'তাহার রোদ্দুর' ব্যাপারটি রীতিমত জটিল। না-বোঝাই যদি বড় দরের কবিতার লক্ষণ হয়, তাহা হইলে অমিয়বাবু তাহাতে 'ফুল মার্ক' পাইয়াছেন নিঃসন্দেহ। তবে এই ধরণের রত্নের আদর করিবার মত লোক বেশী নাই, কবি বেণা-বনে মুক্তা ছড়াইতেছেন।

মোহনা—ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে চলিতেছে।

বিশ্বনাথের জ্যামিতিকী—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দত্ত। কয়েক সংখ্যা হইতেই লেখকের এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাটি বাহির হইতেছে। পাদপ-রাজ্যে জ্যামিতিকীর কথা ইহাতে আলোচনা করা হইয়াছে। উদ্ভিদ্‌-রাজ্যেও জ্যামিতিকীর যে কৌশল লেখক দেখাইয়াছেন, অদৃশ্য রূপকারের কারিগরীই তাহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে। লেখক এ সম্পর্কে শ্রীযুত জীন-রাজ দাসের যে উক্তি তুলিয়া দিয়াছেন তাহা চমৎকার—

"When we look at the flowers, each flower built as it is according to "number" is as a chord in a great musical octave" অর্থাৎ প্রত্যেক পুষ্পটি যেন বিশ্বপতির বিরাট্ ঐক্যতানের এক একটি রাগরাগিণী। আগামী সংখ্যায় পশুরাজ্যে জ্যামিতিকীর কি পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার আলোচনা লেখক করিবেন। আমরা গভীর উৎসাহের সহিত আলোচনাটি অনুসরণ করিতেছি।

সংহতি,—মাঘ, ১৩৪৮ঃ

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী কবি—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। কবি গোবিন্দচন্দ্র রায় ও উনবিংশ শতাব্দীর কয়েক জন অপরিচিতনামা কবির কাব্যপরিচয় প্রবন্ধটিকে উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যালোচনার ক্ষেত্রে বহু নামহীন, ছদ্মবেশী কবি, প্রবন্ধকার ও গল্প লেখকের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাদের সকলের আত্মপরিচয় এখনও সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক এইরূপ দুইজন লেখকের কবিতা

উদ্ধৃত করিয়াছেন। স্বাদেশিকতার দিক্ দিয়া সে যুগের এই সকল কবিতা যথেষ্ট বিস্ময়ের বস্তু, সন্দেহ নাই।

শরৎ-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা। শরৎ-সাহিত্যের আলোচনা হইলেও, রচনার বৈশিষ্ট্য কিছু খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

বৌদ্ধ-তীর্থ—স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ। লুম্বিনী, বোধগয়া ও সারনাথ—বৌদ্ধ তীর্থের এই তিনটি প্রসিদ্ধ স্থানের আলোচনা করা হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদে কাব্য—কবিরাজ শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্রী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ। ছন্দোবদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত কাব্য-রসধারা লেখক উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। প্রবন্ধটি ক্ষুদ্রাকার হইলেও, যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক। আমরা প্রবন্ধটি হইতে একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। লেখক বলিতেছেন, "এই চিকিৎসাসূত্রগুলিকে আরও রসভাবপূর্ণ করিয়াছেন আয়ুর্ব্বেদ-কবি লোলিম্বরাজ। তিনি রক্তপিত্ত রোগীকে বাসক দ্বারা চিকিৎসা করিতে কিরূপ অপরূপ বৈদগ্ধ্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দেখুন—

ভিন্দন্তি কে [illegible]কর্ণপালিং
কিমবাচ্যং ব্য[illegible]তে ন বোঢ়া।
সম্বোধনং স্থ কিমুরক্তপিত্তং
নিহন্তি বামোরু বদ ত্বমেব ॥

লোলিম্বরাজ প্রশ্ন করিতেছেন তাঁর প্রিয়াকে, হে সুন্দর উরুযুগশালিনী প্রিয়ে, বল দেখি কাহারা হস্তীর কর্ণপালি বিদীর্ণ করিয়া থাকে? ইহার উত্তর হইতেছে 'সিংহাঃ' অর্থাৎ সিংহরা হস্তীর কর্ণপালি বিদীর্ণ করিয়া থাকে? দ্বিতীয় প্রশ্ন, আচ্ছা, বল দেখি—নূতন [illegible]বাহ হইয়াছে এমন রমণী প্রথম সুরত-সম্ভোগের সময়ে কোন্ অব্যয় শব্দ বলে? ইহার উত্তর হইতেছে 'ন' অর্থাৎ 'না', লজ্জায় প্রিয়সম্ভোগে বাধা দিবার জন্য কেবলই বলে 'না, না' (ইহা কাব্যের অতিপ্রসিদ্ধভাবাচক শব্দ)। আচ্ছা, পুনরায় বল দেখি, 'নৃ' শব্দের সম্বোধনে কি পদ হয়? 'নৃ' শব্দের সম্বোধনে 'নঃ' এই পদ হয়। অর্থাৎ প্রিয়ার উত্তর হইল 'সিংহাননঃ' অর্থাৎ বাসক দ্বারা রক্তপিত্ত রোগীর বিশেষ চিকিৎসা বলা হইল।" নিরীহ 'বাসক' নিংড়াইয়া আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রকার এত রসের সন্ধান পাইবেন, তাহা কে জানিত!

লেখক বলিতেছেন, আয়ুর্ব্বেদ শারীরতত্ত্ব একবার যিনি আয়ত্ত করিয়াছেন তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত উহা কণ্ঠস্থ থাকিবে। না থাকাটাই আশ্চর্য্যের কথা। পাঠে অমনোযোগী, বিদ্যালয়ের এঁচোড়ে-পাকা ছেলের দলও যে রাতারাতি স্মৃতিধর ও কবিরাজ হইয়া উঠিতে পারে, তাহার যথেষ্ট ইঙ্গিত লেখক দিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায়—বিদ্যালোচনার সহিত এদেশে রসচর্চ্চার সুযোগের অভাব বলিয়াই ছাত্রদের কিছু হইতেছে না, কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নয়। তবে গবর্ণমেণ্ট আয়ুর্ব্বেদ ফ্যাকাণ্টির পাঠশালা খুলিতেছেন, ইহা আশার কথা বটে।

সংহতির অন্যান্য রচনার মধ্যে শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায় লিখিত 'রুশিয়ার নৈতিক জীবন' প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য।

দর্শন—প্রথম সংখ্যা, কার্ত্তিক, ১৩৪৮ঃ

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র 'দর্শন'-এর ইহা প্রথম সংখ্যা। বাংলা ভাষায় সাধারণের বোধগম্য করিয়া দার্শনিক চর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলাই বাহুল্য। বাঙলা ভাষায় জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক্ আলোচিত হউক, ইহা আজ সকলেরই কাম্য। এই দিকে বিবেচনা করিলে 'দর্শনপরিষদ' ও 'দর্শন' পত্রিকা প্রত্যেক চিন্তাশীল বাঙালীর সহানুভূতি ও সাহায্যলাভের যোগ্য।

সম্পাদকীয় আলোচনার একস্থানে বলা হইয়াছে "আমরা প্রকৃতই অনুভব করিতেছি যে, এখন রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তা সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণার প্রয়োজন; কারণ আমাদের ইহাই যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাস যে, তাঁহার এই দার্শনিক চিন্তাধারার সহিত সম্যক পরিচিত না হইয়া কেহ যদি তাঁহার কাব্য ও সাহিত্যের সমালোচনা করিতে বসেন, তবে সে সমালোচনা নিতান্তই অসম্পূর্ণ ও ভ্রমাত্মক হইবে।" আমরা আশা করি 'দর্শন' পত্রিকার পৃষ্ঠায় রবীন্দ্র-দর্শনের সত্যকারের আলোচনার সূত্রপাত হইবে।

বাংলা ভাষায় দর্শনচর্চ্চা সম্বন্ধে ডক্টর শ্রীরাসবিহারী দাস যাহা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে সমর্থনযোগ্য। ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'দর্শনের স্বরূপ' ও শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'উপনিষদের আলোচ্য বিষয়' প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা আনন্দলাভ করিয়াছি।

ভারতে চীন-সেনাপতি

মহাচীনের রাষ্ট্র-নেতা ও সমর মহানায়ক চ্যাংকাইজেক ও তদীয় পত্নী মাদাম কাইজেক সম্প্রতি ভারতে আগমন করিয়া ভারতবাসীকে সম্মানিত করিয়াছেন। তাঁহার বিদায়-কালীন ধারণা ও উক্তি শুধু এদেশের রাজশক্তির প্রতিনিধি-বর্গের সহিত নহে, পরন্তু জনসাধারণের প্রতিনিধিস্বরূপ মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, কংগ্রেস রাষ্ট্রপতি মৌঃ আবুল কালাম আজাদ ও এমন কি মুসলিম লীগ-সভাপতি মিঃ জিন্নারও সহিত সাক্ষাৎকার ও আলোচনার উপর প্রতিষ্ঠিত। এইজন্য উক্ত অভিমত কি রাজশক্তি, কি প্রজাশক্তি, উভয়েরই পক্ষে বিশেষভাবে অবধানযোগ্য।

চীন-সেনাপতি ভারতবাসীকে বলিয়াছেন—বর্ত্তমান মহাসমরে যে দুই বিরুদ্ধ পক্ষে সংগ্রাম চলিয়াছে, উহারা অন্ধকার ও আলোর ন্যায় পরস্পরবিরোধী শুভাশুভ নীতির অনুসরণরত। এই উভয় নীতির মধ্যে ভারতবাসীকে গণশক্তির বিরোধী ও স্বাধীনতাপহারক-অক্ষশক্তির বিপক্ষে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্ররক্ষক মিত্রপক্ষের সমর্থনেই আত্মশক্তি সংগঠন ও প্রয়োগ করিতে তিনি আহ্বান করিয়াছেন। তিনি বলেন—ভারতের স্বাধীনতা-লাভের অনুকূলে আজ বিশ্বমানবের অভিমত পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে—এই বিশ্বমতের মূল্য নিতান্ত কম নহে। শাসকজাতিকে সম্বোধন করিয়া সেনাপতি চ্যাংকাইজেক বলিয়াছেন, ভারতবাসীর দাবীর প্রতীক্ষা না রাখিয়াই তাঁহারা যেন ভারতকে স্বাধীনতাদানের ব্যবস্থা করেন। তাঁহার পরামর্শের গুরুত্ব আমরা আশা করি, ভারতের শাসক-শাসিত উভয় পক্ষই যথোচিত উপলব্ধি করিবেন।

চীন-রাষ্ট্রনায়কের রাজনৈতিক উপদেশ রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যাঁহারা চিন্তা ও কার্য্য করেন, তাঁহারা বিভিন্নভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। রাজশক্তির দৃষ্টিভঙ্গী বর্ত্তমান গুরুতর রাষ্ট্রীয় ও সমরনীতিক পরিস্থিতি এবং প্রয়োজনানুযায়ী স্বতঃই পরিবর্ত্তিত হইবে—কিন্তু ইহা যতটুকু না হইলে চলে না, ততটুকুই হইবে, ইহা বৃটিশ জাতির ঐতিহাসিক প্রকৃতি সম্বন্ধ যাঁহার অভিজ্ঞান আছে, তাঁহারই সহজানুমেয়। ভারতবাসীর পক্ষে জেনারেল চ্যাংকাইজেকের পরামর্শ-গ্রহণে কি বাধা আছে, তাহা ভাবিবার যোগ্য। মুসলিম-লীগের সভাপতি মিঃ জিন্না যে আপত্তি-বাক্য উচ্চারণ করিয়া মার্শ্যাল চ্যাং-এর উক্তির সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা অবশ্য ভারতের আত্মীয়তামূলক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে প্রসূত নহে, উহা শুধু মুসলিম লীগেরই কথা, এমন কি তাহা ভারতীয় মুসলমান সাধারণেরও কথা ঠিক বলা যায় না। সিন্ধুমন্ত্রী মিঃ আল্লাবক্সের প্রতিবাদই ইহার প্রমাণ। আমরা উহার আলোচনা এখানে করিব না। অবনমিত শ্রেণীর অন্যতম নেতা ডাঃ আম্বেদকরের সমালোচনা উড়াইয়া দিবার নহে—কারণ, সাম্প্রদায়িক নেতা হইলেও, তিনি একান্ত সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিষয়টী বিচার করেন নাই। ইহা এক[illegible]শার কারণ। অন্যপক্ষে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে রাষ্ট্রপতি আজাদ ও পণ্ডিত নেহেরুর যেটুকু অভিব্যক্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে বলা যাইতে পারে যে, জেনারেল চ্যাং-কাইজেকের মত বৃটিশ গভর্ণমেন্টের কার্য্য কতটুকু প্রভাবিত করিবে, তাহা না দেখিয়া তাঁহারা কংগ্রেসের পক্ষগ্রহণ-সিদ্ধান্ত চরমভাবে করিতে প্রস্তুত নহেন। ইহাদেরই মনের বাধা আমরা একটু বুঝিবার চেষ্টা করিব।

জেনারেল চ্যাং-কাইজেকের কথায় স্বাধীনতারক্ষা ব্যাপারে বৃটেন ও ভারতকে তুল্যপক্ষ দাঁড়াইবার যুক্তি আছে—এই যুক্তি কিন্তু সবিচারেই গ্রহণীয়। ইংরাজ যেমনভাবে তাহার দেশের স্বাধীনতারক্ষায় উদ্যত, সেই ভাবেই রুশিয়া বা স্বয়ং চীন নিজ নিজ আক্রান্ত স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষায় আজ সত্যই উদ্বুদ্ধ—কিন্তু ভারতের পক্ষে অবস্থা ঠিক ইহাদের কাহারও সমান নহে। ভারতবাসীর নিজাধীন দেশ আজ নাই, যাহার স্বাধীনতাবিনাশের সম্ভাবনায় তাহারা নূতন করিয়া

চিন্তিত, আতঙ্কিত হইতে পারে। ভারতের স্বাধীনতা বহুদিন পূর্ব্বে ইংরাজ জাতির দ্বারাই অপহৃত—তাই ভারতবাসীর পক্ষে স্বাধীনতারক্ষার প্রশ্ন নহে, স্বাধীনতা-পুনরুদ্ধারের প্রশ্নই আজ প্রকট। এই অগ্নিময় সমস্যার সমাধানেও অবশ্য মার্শ্যাল চ্যাং-কাইজেকের পরামর্শ একান্ত সম্পর্কশূন্য নহে। এখানেও তাঁহার কথাগুলি গভীরভাবে ভাবিয়া দেখিবার আছে। জাতীয় নেতৃগণ নিশ্চয়ই সেদিক্ দিয়াও চিন্তা করিয়া দেখিবেন ও মিত্র-পক্ষের সহিত সহযোগিতা সম্বন্ধে মতটীর পুনর্ব্বিবেচনাও করিবেন।

ভারতবাসীর স্বাধীনতা নাই, ইহা সত্য—কিন্তু স্বাধীনতাই আমরা চাই। সেই স্বাধীনতার অনুকূল শক্তির সহায়তাই আমাদের বাঞ্ছনীয় ও বরণীয়। যাঁহারা অক্ষশক্তির আদর্শ ও চেষ্টার সম্পূর্ণ বিরোধী হইয়াও, তাহাদের আরব্ধ মহাযুদ্ধের সুযোগে, তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারে সমুৎসুক, আমরা জানি, কংগ্রেস কখনই [illegible] দলের অন্তর্ভুক্ত নহেন। কংগ্রেসের কোনও নেতাই [illegible]ভাবে চিন্তা করেন না। তাঁহারা সকলেই অতি[illegible] করিয়াই জানাইয়াছেন— —জার্ম্মাণ বা জাপ, কোনও আক্রমণকারী আততায়ী শক্তিকেই তাঁহারা ভারতের পরিত্রাতারূপে আবাহন করিবেন না, পরন্তু স্বাধীনতার শত্রুমাত্রকেই তাঁহারা সমানভাবেই প্রতিরোধ করিয়া চলিবেন। এই অবস্থায় ভারতের জনমতকে মিত্রপক্ষের অনুকূলে সংযুক্ত ও তাহার সর্ব্বশক্তি সমরজয়ে প্রয়োগযোগ্য করিতে হইলে, ইংরাজ জাতিকেই আজ উদ্যত হইয়া ভারতের জনশক্তিকে মুক্তি দিতে হইবে। একমাত্র এই কার্য্যই বর্ত্তমান সমস্যার [illegible]মাধান করিতে পারে। ইংরাজ রাষ্ট্র-ধুরন্ধরগণ শুধু মার্শ্যাল চ্যাং-কাইজেকের কথায় নহে, যুগশক্তির ইঙ্গিত বুঝিয়াই এই গুরু প্রশ্নের সমাধানে অগ্রসর হউন, আমাদের ইহাই নিবেদন।

পার্ল্যামেন্টের মতি-পরিবর্ত্তন

সুদূর প্রাচ্যের ঘোরতর সঙ্কটে বৃটিশ সাম্রাজ্য জাপানের হস্তে যে আঘাত পাইয়াছে, তাহাতে ইংরাজের ন্যায় বীর-জাতি কথঞ্চিৎ হতমান হইলেও, যে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয় নাই, ইহা প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চহিলের মর্ম্মভাষণে স্পষ্ট করিয়াই বুঝা যায়। যে দুর্জ্জয় সঙ্কল্পশক্তি লইয়া বৃটিশ জাতি সেদিন জার্ম্মাণ বিমানশক্তি কর্ত্তৃক ইংলণ্ডের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ ধারণ ও প্রতিরোধ করিয়াছিল, তৎপূর্ব্বে ফ্রান্সের আত্মসমর্পণের পর যে অমোঘ আত্মবীর্য্য আশ্রয় করিয়া একক ইংরাজ ইউরোপ-জয়ী হিটলারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতে মনঃস্থ করিয়াছিল, সেই সঙ্কল্প ও আত্মপ্রত্যয় লইয়াই বৃটন প্রাচ্যের দুর্ঘটনাপুঞ্জ বহন ও তাহার প্রতিকারে কৃতসঙ্কল্প, ইহাতে কাহারও সন্দেহমাত্র নাই। বৃটিশ মন্ত্রিমণ্ডলের আমূল পরিবর্ত্তন ও পার্ল্যামেন্টের আলোচনার মধ্য দিয়া, ইংরাজ জাতির মনোভঙ্গ দূরে থাক, তাহার যুদ্ধজয়ের অদমনীয় সঙ্কল্পেরই জলন্ত পরিচয় পাওয়া যায়।

শুধু সঙ্কল্প ও বিশ্বাসই নহে, বর্ত্তমান সঙ্কটকালীন সমস্যার প্রকৃত মীমাংসায় উপনীত হইতে হইলে, সাম্রাজ্যের শাসননীতির যে পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য, সেই দিকেও বিশিষ্ট ইংরাজ-নায়কগণের দৃষ্টি ক্রমশঃ খুলিতেছে, এইটুকুই আমাদের পক্ষে আশার বিষয়। বিশেষভাবে মালয় ও বর্ম্মার শোচনীয় অভিজ্ঞতা আজ আর তাঁহারা যে কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারিতেছেন না, ইহা নূতন পার্ল্যামেন্টে ভারত সম্বন্ধীয় আলোচনায় অতি স্পষ্টাক্ষরেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষাধীন ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ এক দিকে, অপর দিকে মালয় ও বর্ম্মা, এই উভয় দেশে জাপ-শত্রুর প্রতিরোধে দেশবাসীর মনোভাব ও আচরণগত তারতম্যের কারণ কি, ইহাও বোধহয় কতক কতক তলাইয়া বুঝিবার তাঁহারা চেষ্টা সুরু করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইলে, শুধু সামরিক শক্তিই যথেষ্ট নহে, দেশের জনমতও অনুকূল হওয়া চাই—দেশবাসীর বুঝা চাই যে, এ যুদ্ধ তাহাদেরই, যুদ্ধজয়ে তবেই তাহাদের আন্তরিক আগ্রহ, আনুকূল্য ও প্রাণপণ সহযোগিতা সম্ভব হইবে—এই নির্ম্মম অভিজ্ঞতা-মূলক শিক্ষা ভারতের ক্ষেত্রে আজ আশু প্রয়োগ করার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে, সমর-সচিব হোর বেলিশার উক্তি তাহা প্রমাণ করে। সমর-সচিব মুক্তকণ্ঠেই বলিয়াছেন—

"আমাদের সহিত একযোগে জাপানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের জন্ত ব্রহ্মদেশের জনসাধারণকে আহ্বানের সময় বোধ হয় আর নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে এখনও সময় আছে। জেনারেল চ্যাং কাইজেক যে অনুরোধ করিয়াছেন, গভর্ণমেণ্ট অবিলম্বে তাহা করিবেন, আশা করি।" হোর বেলিশার এই উক্তি শ্রমিক ও লিবারেল দলের প্রতিনিধিগণও অনুরূপ তাগিদের সুরেই সমর্থন করিয়াছেন দেখা যায়। ইহার উপর, হাউস অফ কমান্সের নূতন লীডার স্যার ষ্ট্রাফোর্ড ক্রিপ্‌স যেটুকু দৃঢ় আশার বাণী শুনাইয়াছেন, তাহাতে ভারতবাসীর মনে এরূপ প্রত্যয় হওয়া স্বাভাবিক যে, বৃটিশ জাতি এবার ভারতের আন্তরিক সহায়তাকামনায় সত্য সত্যই কিছু মতি-পরিবর্ত্তন করিয়াছেন বা করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

কিন্তু ভারত সম্বন্ধে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ইতিপূর্ব্বের যে আচরণ, তাহার তিক্ত নৈরাশ্যকর অভিজ্ঞতা এমন ভাবে ভারতবাসীর চিত্তে বসিয়া আছে যে, এইরূপ প্রত্যয় প্রতি মুহূর্ত্তেই নানা দিক্‌ দিয়া সংশয়পীড়িত ও প্রতিহত হইতে পারে, অন্ততঃ এইরূপ হওয়া আমরা অসম্ভব মনে করি না। সংশয়বাদী কেহ যদি বলেন যে, শ্রমিকনেতা ৺র‍্যাম্‌সে ম্যাকডোনেল্ডের মন্ত্রিত্বগ্রহণের পর যেমন যান্ত্রিক-ক্রমে অন্ততঃ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার অভাবনীয় মতি-পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছিল, তেমনি স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স পূর্ব্বে বা সম্প্রতি যাহাই বলুন, শাসনযন্ত্রের কঠিন সীমায় তাঁহার মুক্ত অভিমত বা অভিপ্রায় চরিতার্থ করার সুযোগ তিনি পাইবেন না, সে দুর্ভাবনা অপনোদন করার উপায় কি, ইহা কর্ত্তৃপক্ষের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। তাহা ছাড়া, প্রধান মন্ত্রী চার্চহিল যে সর্ব্বযুক্ত ঘোষণার আশ্বাস দিয়াছেন, ইহাতেও কি ভারতবাসী নিশ্চিন্ত হইতে পারে? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যদি ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আজ সত্য সত্যই ভারতবাসীর চিত্ত জয় করিতে চাহেন, তাহা হইলে পার্ল্যামেণ্ট হইতে দ্বিধাহীন বাক্যে এই কথাই ঘোষণা করিতে হইবে—যে, যে বিশ্বজাতির স্বাধীনতা-রক্ষার জন্ত এই যুদ্ধ, সেই স্বাধীনতার অধিকার সত্য সত্যই ভারতবাসীরও আছে এবং সে স্বাধিকার-লাভ সুদূর নহে, আসন্ন, যথার্থই বস্তুতন্ত্ররূপে উহা হস্তগত হওয়ার আর কোন বাধা রহিল না। এইরূপ একটা কুণ্ঠাহীন সুস্পষ্ট ঘোষণাই শুধু সংশয়ীর সংশয় মোচন করিবে না, ভারতের রুদ্ধ শক্তি অনর্গল ধারায় মুক্ত করিয়া দিতে পারিবে—বিশ্বমানবের মুক্তি ও কল্যাণের জন্য। মিত্রশক্তির যুদ্ধ-পর্ব্বে ইহাই আনিয়া দিবে নূতন ভাব, নূতন শক্তি, বিজয়-লক্ষ্মীর প্রত্যক্ষ আশীর্ব্বাদ। বিশ্ব-মানবের প্রধান অভিনেতারূপে কি বৃটেন এই সঙ্কট-যুগের আপন শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি ও বিবেকানুমোদিত কর্ত্তব্যপ্রেরণার অনুসরণ করিবে না?

এ-আর-পি ও জাতীয় সেবক সমিতি

রেঙ্গুনের অভিজ্ঞতার পর, কলিকাতা প্রমুখ বাংলার নগর ও বন্দরগুলিতে বৈমানিক আক্রমণ হইতে নাগরিক জীবনের আত্মরক্ষা ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থার জন্য যে শিক্ষা ও আয়োজনের প্রয়োজন, তদ্বিষয়ে আর কাহারও উদাসীন থাকা কর্ত্তব্য নহে। গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে যে এ-আর-পি (বিমান-আক্রমণে-রক্ষা) [illegible]সংগঠিত হইয়াছে, তাহার সহিত জনশক্তির [illegible]তা আবশ্যক। গত নিখিল ভারত রাষ্ট্রসমি[illegible]বেশনে এ বিষয়ে যোগ্য প্রস্তাব গৃহীত হই[illegible]ছিল। মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং তাঁহার পূর্ব্ব মত পরিবর্ত্তন করিয়া এই ব্যাপারে দেশবাসী ও এমন কি কংগ্রেসের কর্ম্মীদেরও গভর্ণমেণ্টের সহায়তা করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াছেন। বাংলায় জনরক্ষা বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু ভবানীপুরের সভায় ভাল করিয়াই বুঝাইয়াছেন—অন্ততঃ বিমানাক্রমণের সময়ে যাঁহারা কার্য্য করিবেন, তাঁহাদের এ-আর-পি-র সহিত একটা [illegible]দেশের অনুবর্ত্তী হইয়া সেই কাজ করিতে হইবে এবং উক্ত আক্রমণকালীন সতর্কতামূলক উপদেশসমূহ বস্তির অধিবাসীদের ঘরে ঘরে প্রচার করিবার জন্ত তিনি আহ্বানও দিয়াছেন। নাগরিকদের রক্ষাবিধান সম্পর্কিত অন্যান্য বহু কার্য্য অবশ্য তাঁহার মতে, বে-সরকারী ভাবেও অনুষ্ঠান করা চলিবে।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক ফরোয়ার্ড ব্লক, উভয়েই দেশের এই বিপদের দিনে একযোগে পরামর্শ করিয়া কার্য্য

করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন এবং জাতীয় সেবক সমিতি নামক একটী স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠান উক্ত উদ্দেশ্যে গঠন করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠান নাগরিক মাত্রের সহায়তা ও সহযোগিতা লাভ করিবে, ইহা বলাই বাহুল্য।

অগ্নিযুগের অগ্নিহোত্রী সাধক ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রসমিতির সহ-সভাপতি শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস এই জাতীয় সেবক সমিতিতে দলে দলে স্বেচ্ছাসেবকরূপে যোগদানের জন্ম বাংলার যুবকদের আহ্বান করিয়া বলেন, সত্যাগ্রহী সংগ্রামে ৮ লক্ষ শান্তিসেনা সংগৃহীত হইয়াছিল—আজ এই সঙ্কটের দিনেও তরুণগণ তেমনি সাড়া দিবেন, সন্দেহ নাই। ইহার মূলে শুধু প্রাণ-রক্ষার প্রেরণা নহে, সংহতি-বদ্ধ প্রয়াসেই বাংলার মুক্তির দিন সন্নিকট হইবে, ইহা বুঝিলে উদীয়মান তরুণ জাতি দেশমাতৃকার আহ্বান বলিয়াই ইহা হৃদয়ে বরণ করিয়া লইবে। শ্রীযুক্ত দাসের সুন্দর প্রেরণাময়ী ভাষা উদ্ধৃত করিয়াই আমরাও বলি—"সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। বাংলাদেশেই যদি প্রথম স্বাধী[illegible]-সূর্য্য অস্তমিত হইয়া থাকে, তবে এ দেশেই আবার স্বাধীন[illegible] সর্ব্বপ্রথম নমস্কার করিবে। কারণ দিন আগত ঐ।"

সাম্প্রদায়িক মিলন-চেষ্টা

বাংলায় নূতন সম্মিলিত মন্ত্রিমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাঙালীর প্রাণে অনেকখানি আশার স্বপ্ন জাগাইয়াছে। এই আশার অন্যতম কারণ—এই সম্মিলিত শাসনাধীনে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাঙালী আপনাদের স্বাভাবিক শুভ বুদ্ধি ফিরিয়া পাইবে ও জা[illegible] জীবনে পুনরায় মিলন-নীতি প্রবল হইবে। প্রধান [illegible]ন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক ও ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী প্রমুখ হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দ এই কার্য্যে সরকারীভাবে যথোচিত সহায়তা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া আমরা অতিশয় আশান্বিত ও পুলকিত হইয়াছি। সরকারী তহবিল হইতে ইহার জন্ম লক্ষ টাকা বরাদ্দ হওয়ায়, তাঁহাদের চেষ্টা কার্য্যকরী হওয়ার পথ সুগম হইবে।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যে সম্প্রতি কলিকাতায় বিভিন্ন দল ও মতের বিশিষ্ট হিন্দু-মুসলমান সদস্য লইয়া মন্ত্রী খাঁ বাহাদুর হাসেমালি খাঁর সভাপতিত্বে একটী ঘরোয়া বৈঠকের আয়োজন হয় ও তাহাতে বাংলার সর্ব্বত্র হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য ও সম্প্রীতিপ্রতিষ্ঠার জন্ম "বঙ্গীয় সাম্প্রদায়িক ঐক্য কমিটী" নামে একটী সাময়িক সমিতি গঠিত হয়। প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং ইহার সভাপতি, মন্ত্রী ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি, মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু, মন্ত্রী খাঁ বাহাদুর হাসেমালি খাঁ প্রমুখ ১০ জন সহ-সভাপতি এবং খাঁ বাহাদুর মহঃ আনোয়ারুল আজিম সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। কমিটীর পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর হইতে আরম্ভ করিয়া কলিকাতার লর্ড বিশপ ও মিঃ আর্থার মূর পর্য্যন্ত বহু যোগ্য জনই গৃহীত হইয়াছেন।

এই কমিটীর কার্য্যনীতি কি হইবে এবং তাহ[া] কার্যকরী করার জন্ম কি কি উপায় অবলম্বন করা হইবে তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমা[ন] আব্‌হাওয়ার নিছক রাজনৈতিক পরিস্থিতিটুকু সম্মুখে ন[া] রাখিয়া, যাহাতে ইহা বাঙালী হিন্দু মুসলমান উভ[য়] সম্প্রদায়ের হৃদয় ও কৃষ্টিগত নিবিড়তর পরিচয় [ও] সম্বন্ধকেই সর্ব্বাগ্রে সুদৃঢ় করিয়া, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই বাহিরের সকল সমস্যা সমাধান ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থে সামঞ্জস্যবিধান সম্ভবপর করিয়া তুলে, আমরা সেই দিকে উদ্যোক্তৃবর্গের সচেতন দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া রাখিলাম।

স্বাধীনতা ও ভারতের ইউরোপীয় সমাজ

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী সম্পাদক মিঃ আর্থার মূরে[র] স্বাক্ষরিত একটি নিবন্ধ 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকায় প্রকাশি[ত] হইয়াছে। মিঃ মূর লিখিত এই নিবন্ধ হইতে এ দেশে ইউরোপীয় সমাজের ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি ও দেশরক্ষা সম্বন্ধীয় মতবাদের অনেকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে। জাপানের বর্ত্তমান যুদ্ধে যোগদানের কিছু পূর্ব্ব হইতে এদেশে ইউরোপীয় সমাজের মুখপাত্র যাঁহারা, তাঁহারা বৃটেনের প্রাচ্যনীতি বিশেষ করিয়া ভারতসম্পর্কিত রক্ষা ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছিলেন না। ইহার কারণ হয়তো বর্ত্তমান ছিল, গত দুই বৎসরের অধিককাল ইউরোপের বিভিন্ন রণাঙ্গণে যুদ্ধপরিচালনার যে দায়িত্ব বৃটিশ সমরপরিষৎ বহন করিতেছিলেন, তাহার অবকা[শে]

ভারতের রাষ্ট্রনীতিক ও দেশরক্ষা সম্বন্ধীয় ব্যবস্থায় বৃটিশ কর্তৃপক্ষের কার্য্যকলাপ ও সাম্প্রতিক উক্তিগুলি স্থানীয় অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যহীন বলিয়াই মনে হইয়াছে। ভারতের ইউরোপীয় সমাজ আতঙ্কের সহিত লক্ষ্য করিয়াছে, বৃটেনের ভারত সম্পর্কিত নীতি একটা কল্পনাহীন, আদর্শহীন গতানুগতিকতার পথ বাহিয়া চলিয়াছে। স্থানীয় সমস্যার সমাধান বা তাহার প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করা দূরে থাকুক, বৃটেনের বৃহত্তর সামরিক নীতি ভারতের সহিত একটা সক্রিয় যোগসূত্র হারাইতে চলিয়াছে। সারা পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের এই অভাবনীয় ঘটনাস্রোতে ভারত সম্পর্কে নূতন নীতি-নির্দ্ধারণ অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে, অথচ কার্য্যক্ষেত্রে তাহার অভাব আজ সুস্পষ্ট—বর্ত্তমান ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির এই দ্বিধাজড়িত অবস্থাটাই আজ এদেশের ইউরোপীয় সমাজকে সচকিত করিয়া তুলিয়াছে। জাপান কর্ত্তৃক প্রশান্ত মহাসাগরীয় আক্রমণের সূচনা হইতেই 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার বিভিন্ন সম্পাদকীয় প্রবন্ধের মধ্য দিয়া একটা তিক্ততার সুরই আমরা লক্ষ্য করিয়াছি।

সম্প্রতি বৃটিশ সমর-মন্ত্রিপরিষৎ হইতে লর্ড বীভারব্রুক, মিঃ আর্থার গ্রীনউড প্রভৃতি রাজনীতিকের অপসারণকে উপলক্ষ্য করিয়া ইউরোপীয় সমাজের মুখপত্র এই পত্রিকাখানি যে উক্তি করিয়াছে, তাহা উল্লেখযোগ্য। ইহার বহু পূর্ব্ব হইতেই 'ষ্টেটস্‌ম্যান' সমরপরিষদের অন্তর্গত বীভারব্রুক-গ্রীনউড উপদলের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। সমরমন্ত্রিপরিষদ হইতে তাঁহাদের সাম্প্রতিক অপসারণকে উপলক্ষ করিয়া 'ষ্টেটস্‌ম্যান' বলিয়াছেন—"Our misfits may retire unwept and unhonoured but at least they are unhung." ইহা অর্থপূর্ণ।

বর্ত্তমানে এদেশের ইউরোপীয় সমাজের এই যে মত-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা একান্ত অপ্রত্যাশিত নয়। যুদ্ধ ও ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির বিভিন্ন ঘটনা-বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে তাহাদের মতবাদের যে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাহার শিক্ষা গ্রহণ করিবার মত মনোবৃত্তি এখনও বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষীয় মহলের কোথাও দেখা যাইতেছে না। ফলে ভারতের আশা-আকাঙ্খার প্রতি দীর্ঘকাল সহানুভূতিহীন হইয়াও আজ অবস্থার গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজ ক্রমেই সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের উক্তির কোন কোন অংশ আজ হুবহু আমাদের আশা ও আকাঙ্খার প্রতিধ্বনি করিয়া থাকিলেও, আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

উপরোক্ত পটভূমিকায় মিঃ আর্থার মূরের প্রবন্ধটি পাঠ করিলে, সমস্ত বিষয়টির একটি সুষ্ঠু ধারণা করিয়া লওয়ার সুবিধা হইবে। মিঃ মূর একস্থানে বলিতেছেন—

"Well, Indian leaders need not talk any more about Britain transferring power. The power is transferred. Britain can do nothing to us; unless we help ourselves, she can do nothing for us. Together we can ourselves. Otherwise there is no answer to Japanese command of the air and the sea."

উপরোক্ত উদ্ধৃতির মধ্য দিয়া মিঃ মূর যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তাহাতে তাহার উদ্দেশ্যের সাধুতা প্রকাশিত হইতে পারে; কিন্তু বর্ত্তমান অস্বস্তিকর অবস্থাকে ইচ্ছা করিয়াই যেন তিনি এড়াইয়া গিয়াছেন। বৃটেনের কর্ত্তৃপক্ষ মহল হইতে যাহাই বলা হউক না কেন, ভারতের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতেই—মিঃ মূরের এই উপদেশ যুক্তি অপেক্ষা ভাবপ্রবণতার উপর প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত প্রবন্ধের মধ্য দিয়া অলক্ষিতে বৃটিশের ভারত-সম্পর্কিত নীতির প্রতি একটা হতাশাই প্রকাশ পাইয়াছে। দীর্ঘকাল বিলাতী সদিচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া এদেশের ইউরোপীয় সমাজ এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে, ভারতের রক্ষা-ব্যবস্থা আজ ভারতবাসীর উপরই নির্ভর করিতেছে। জাপানের বিরুদ্ধে অন্যনিরপেক্ষ হইয়া আজ আমাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা করিতে হইবে। সবই সত্য; কিন্তু তাহার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত কোথায়? যে বিশ্বাস ও আস্থার দ্বারা কর্ত্তৃপক্ষ ভারতের সামরিক মনোবৃত্তি ও দৃঢ়তা গড়িয়া তুলিতে পারিতেন, আজও তাহার পরিচয় কোথাও মিলিতেছে না।

বর্ত্তমান বৃটেনের এক শ্রেণীর রাজনীতিক হিন্দু-মুসলমান বিভেদের সমস্যাটাই বড় করিয়া দেখিয়া আধুনিক অবস্থার গুরুত্বের প্রতি উদাসীন আছেন। ইঁহাদের সতর্ক করিয়া মিঃ মূর বলিয়াছেন—

"If this country is what some Britons believe it to be, a land where Moslem, Hindus and Sikhs will never unite and will seek for-ever to do each other

[d]own, why should Britons waste their time dying for [i]t? What justification is there for pretending it as [o]ne country. Anyhow clearly such a country could [n]ot possibly be defended against the Japanese. Better [h]and it over and save blood-shed."

মিঃ মুরের উপরোক্ত উক্তি দ্বারা বিলাতের এক শ্রেণীর অদূরদর্শী রাষ্ট্রনীতিকের প্রতি যে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হইয়াছে, তাহা তাঁহারা কিরূপভাবে গ্রহণ করিবেন, তাহা তাঁহারাই জানেন। কিন্তু আধুনিক পরিস্থিতিটাকে লেখক যতটা সহজ ও সরলভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, ভারতের পক্ষে সেই দৃষ্টিকোণ দিয়া দেখিবার হয়তো সামর্থ্য নাই। অবস্থাকে মঙ্গল করিয়া তুলিবার বিরুদ্ধে বাধার অচলায়তন আজও অটুট রহিয়াছে। তাহা অপসারণ করিবার প্রচেষ্টাই আজ দেখার জন্যই আমরা উদ্‌গ্রীব রহিয়াছি।

ঝর্ণা

শ্রীরবীন বর্দ্ধন

ডানধারে দাঁড়াইয়া আছে পাহাড়টি—স্থির। একেবারে খাড়া—পাথরে ভরতি। গাছপালার চিহ্ন কোথাও নাই। সূর্য্যকিরণে চূড়ায় কি যেন ঝিক্‌মিক্ করে রূপার মত, হয়ত ঝরণা—রহস্যময়, অজানা। [illegible] সামনের দরজাটি দিয়া চোখে পড়ে—বিলের ধারে পাহাড়ের সারি [illegible] ঢেউয়ের পর লহর তুলিয়াছে। মাঝে মাঝে দু'একটা ঘর—মাটীর, খড়ে ছা[illegible] সামনে একটুখানি ময়দান—মেয়ে-পুরুষ সমানে কাজ করে। [illegible] গরু-মোষগুলি এখানে-ওখানে চড়িয়া বেড়ায়। বহির্জ্জগতে[illegible] যোগাযোগ কমই।

রেলের কলোনী। ঘর দশেক পরিবার [illegible]পাশে ছড়িয়ে বাস করে। তারপর রেল কোম্পানী আমাকে এত উঁচুতে তুলিয়া ধরিয়াছেন যে, আলাপ-পরিচয়ের জন্য মাথা নীচু করিতে একটু ঠেকিত বই কি!

বাহির হইতে না দেখাইলেও, কার্য্যতঃ নির্ব্বাসনদণ্ডই! সেজন্য কাহাকেও দোষী না। বিলাত হইতে ফিরিয়া যেদিন দেখিলাম—বিভা ঘরসংসার পাতিয়া বেশ গিন্নী সাজিয়া বসিয়াছে, মানুষমাত্রের উপরই সেদিন মনটা ঘৃণায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িল। তাহাদের পাশ কাটাইয়া চলিয়া আসিলাম—কারও সাথে কোন সম্বন্ধ রাখিব না। কিন্তু সত্যি যে আমি ইহা চাহি নাই, দু'দিনেই টের পাইলা[illegible] এমন অনেক জিনিষই আমরা চাই—যা' সত্যই চাই না!

কোন কাজে মন বসিতেছিল না। পাহাড়ের চূড়ার দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিলাম, ওটা ঝরণাই। হঠাৎ কাণে বাজিল কচিগলার কল্‌কল্ হাসি। অদূরে দাঁড়াইয়া ছোট একটি ছেলে। হাতে একটা ছোট বল। পরণে হাফপেন্ট—গেঞ্জিও। মাথায় কোঁকড়া চুল। দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছে—ভিতরে আসিতে সাহস পাইতেছে না। হয়ত পাড়ায় ছেলেদের কাছে আমার বদরাগের কথাই শুনিয়াছে—পদমর্য্যাদার কথাও। নিজেও দেখিয়াছে—পাগড়ীবাঁধা বড় বড় লোক সব দেখিলেই আমাকে সেলাম ঠুকে। না জানি কি!

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি খোকা?" আঙ্গুল দিয়া সে দেখাইয়া দিল—বলটা আসিয়া এখানে পড়িয়াছে।

বলটা তুলিয়া আনিলাম। ডাকিলাম—"এখানে এস।"

ধীরে ধীরে পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

—"তোমার নাম কি? কাদের বাড়ী এসেছ?"

নাম বলিয়া সে পার্সেল ক্লার্ক বারীনবাবুর বাড়ী দেখাইয়া দিল।

তাহলে বারীনবাবুর আত্মীয়! তার সঙ্গে বন্ধুত্ব ত আমার অসীম—আদায় কাঁচকলায়। সে-দলের ওইতো প্রথম নম্বর পাণ্ডা। কিন্তু, ছেলেটা উপর একটুও আক্রোশ হইল না। ছেলেটার চোখে যেন মায়াঞ্জন। জিজ্ঞাসা করিলাম—"বারীনবাবু তোমার কে হন?"

—"খুড়তুতো ভাই" বলিতে বলিতে ছেলেটার মুখে একটু আটকাইয়া গেল।

হাসিয়া বলিলাম—"কথা বলিতেও পার না—তোৎলা?"

সে মাথা নীচু করিয়া হাসিল। সামনের দিকে একটা দাঁত পড়িয়া গিয়াছে। সে ফাঁকটাই যেন তাহার মুখখানাকে আরও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে।

—"আর কে কে এসেছেন, মা?"

মাথা নাড়িয়া জানাইল—"হুঁ।"

—"মুখে বলতে পারনা, বোবা তুমি?"

—"হুঁ, বোবা" বলিয়া সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—"দুষ্টুমি হচ্ছে বুঝি।" হাত ধরিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া আনিলাম। মুখ হইতে সঙ্কোচ-ভয় মুছিয়া গিয়াছে;—একটা দুষ্টুমি-ভরা লাজুক হাসি। প্রশ্ন করিলাম—"কোন ক্লাশে পড়?"

—"ক্লাশ থ্রি।"

—"ও, তাহলে রবারের কাজ এখনও শেখনি?"

—"কি রবারের কাজ" বলিয়া সে আমার মুখের দিকে তাকাইল।

ডান ধারের সেলফ হইতে একটা খাতা লইয়া বলিলাম—"এই পেন্সিলের দাগগুলো তুমি রবার দিয়ে তুলতে পার ?"

—"হুঁ", বলিয়া সে ঘাড় কাৎ করিল। ঠোঁট ফুটিয়া উঠিল অবজ্ঞার হাসি। "আচ্ছা দিন।" বলিয়া সাগ্রহে আমার হাত হইতে রবার আর খাতা টানিয়া লইয়া তৎপরতার সহিত কাজে লাগিয়া গেল।

দুপুর বেলা অফিসের সামনে এলেই, তাকে ডাকিয়া আনি। এটা ওটা কাজ দিই, করিয়া যায়। হাসি ঠাট্টায় আমার অলস দুপুরটি বেশ কাটে।

—"ব্যস, এটাতো শেষ করে দিয়েছি।"

—"কই দেখি।" বলিয়া ধীরে ধীরে পাতা উল্টাই। নূতনতম ফন্দি মাথায় খেলে। বলি, "রুল টানতে বুঝি এখনও হাত কাঁপে, না ?"

উপর নীচে ঘাড়টাকে বার কয়েক দুলাইয়া বলে, "হুঁ। দিদিকে জিজ্ঞেস করবেন, দিদির সব খাতায় রুল কে টেনে দেয়।"

—"দিদি রুলটা ধরে থাকলে—এমন সবাই পারে।" গম্ভীর ভাবেই বলি।

রাগে মুহূর্ত কয় স্তব্ধ থাকিয়া, আমার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলে—"এক্ষুনি চলুন, দিদিকে জিজ্ঞেস করবেন।"

সহাস্যে বলি, "দিদির কাছে কেন আবার। এখানেই টান না কেমন দেখি।'

খাতা, পেন্সিল, রুল তার সামনে দিই। চট্‌পট্ কাজে লাগিয়া যায়। রুলটানার প্রয়োজন নাই। তবু আটকাইয়া যতক্ষণই রাখা যায়।

ছেলেটা বড্ড মুখ-চোরা। অনেক প্রশ্নে একটা উত্তর দেয়। কেবল মাথা নীচু করিয়া হাসে। খুঁটিয়া খুঁটিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিয়া আর দুধ-আউলীর নিকট হইতে যতটুকু সম্ভব জানিয়া যে পরিচয় তার পাইলাম, পোষাক পরিচ্ছদের সঙ্গে তার কোন অনৈক্য দেখিলাম না। পিতা যথেষ্ট অর্থই পুত্রের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পুত্র নাবালক—মাতা একেলা, সম্পত্তি রক্ষার ভার তাই খুড়তুতো ভাইদের হাতে যাইয়া পড়িয়াছে। তাহারা হয়ত এই নাবালক উত্তরাধিকারীর মধ্যে এমন লোভনীয় কিছু দেখিতে পাইয়াছেন, যার জন্যই তাহার চলার পথ ধীরে ধীরে নিষ্কণ্টক করিয়া দিতেছেন। কারণ, তার পিতাই পিতৃমাতৃহীন ভাইপোদের মানুষ করিয়াছিলেন কিনা। এতদিন গোলাঘর বারীণবাবুর বড় ভাইএর ওখানে গলগ্রহ হইয়া ছিল। কি বিশেষ কাজে এখন তিনি ইহাদের এখানে পাঠাইয়াছেন।

ছেলেটার সঙ্গে ভাব হইয়া গেল। রোজই আসে—আর কোন সঙ্কোচ নাই। কিন্তু প্রথমেই ধাক্কা খাইলাম তাহার সঙ্গে আমার সম্পর্ক পাতাইতে যাইয়া। একদিন বলিলাম—"জান খোকা, তোমার মত আমার একটা ভাই ছিল।"

বড় বড় চোখ দুটী মেলিয়া সে আমার দিকে চাহিল, বলিল, "তা'হলে আমি তোমার ভাই। তুমি দাদা।"

হাসিয়া বলিলাম—"হাঁ।"

গম্ভীরভাবে সে ঘাড় নাড়িল—"উঁহু।"

—"তবে, আমি তোমার কে ?"

—'তুমি!" নিজে নিজেই সে কি যেন আলোচনা করিতে লাগিল। এক সময় অস্ফুট শব্দ বাহির হইল : "মাষ্টার মশাই ?' আবার অসম্মতি সূচক ঘাড় নাড়িল। কৌতুহল হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি খোকা। মাষ্টার মশাই কি ?"

—"জান, মাষ্টার মশাইও বড্ড মারেন।"

হাসি পাইল—বলিলাম, "তোমাকেও!"

—"না, আমাকে না! কিন্তু অন্য সবাইকেই, রোজ ওরা কাঁদে! আমার বড্ড কষ্ট লাগে। মাষ্টার মশাই-এর একটুও দয়া হয় না।" তার চোখ দুটী ছল ছল করিয়া উঠিল।

আমার কাছে সেদিন সম্বন্ধ স্থাপন করিতে যাইয়া দেখিলাম আজ অবধি সে পরিচিত সবার কাছ হইতে শুধু দুর্ব্যবহারই পাইয়াছে। তাই আজ আমাকে কি ডাকিবে—মহা সমস্যা। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার মনঃপূত নাম আবিষ্কার করিলাম 'বড় মণি'।

পরের দিন অফিসে ঢুকিয়াই সে জিজ্ঞাসা করিল, "[illegible]বড়মণি। ও গাছটাতে সব রকম পাখী থাকে ?" চাহিয়া দে[illegible]—ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের বাড়ীর ভেতরের আম গাছটি দেখা[illegible]ছে। প্রকাণ্ড গাছ। ছেলেদের কাছ হইতে হয়ত শুনি[illegible]লাম, "হাঁ, আছে।"

"হলদে পাখী ? কাকাতুয়া'

ঘাড় কাৎ করিয়া সম্মতি [illegible]ানাইলাম।

"চলনা!" হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে সে রওয়ানা হইল।

ইঞ্জিনীয়ার সাহেব এমন সময় আমাকে অফিসের বাহিরে দেখিয়া ত অবাক। বুঝাই[illegible]াম কাজ কর্ম আজ বিশেষ কিছুই নাই—তাই।

গাছের নীচে আসিয়া আনন্দে সে ত আত্মহারা। কত রকম পাখী! সে বলিল "রোজ আমায় পাখী দেখতে নিয়ে আসবে, বল।"

বলিলাম, "না, তোমাকে সুন্দর দেখে একটা পাখী কিনে দেবো, তুমি পুষ[illegible]

বাধা [illegible]য়া বলিল—"না না, পাখী কক্ষনো পুষবোনা। তুমিও পুষো না।" চোখে মুখে তার আতঙ্ক ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম, "কেন, কি হয় ?"

"না খেয়ে ওরা মরে যায়। জান, আমি একবার মেলা থেকে একটা পাখী কিনেছিলাম। মরে গেল। কিছু খেত না। মাকে ফেলে এসেছিল কিনা, তাই মার জন্যে কষ্ট হতো!" বলিতে বলিতে তাহার গলা ভারী হইয়া আসিল।

বিলাত ফেরৎ, সভ্যতার চরম সীমান্তে উপনীত। এ সবকে এতদিন সেন্টিমেন্টাল বলিয়া ঠাট্টা করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু আজ তাহার বলিবার ধরণ দেখিয়া আমারও কষ্ট হইল।

আরেকদিন দিদির সঙ্গে হয়ত সে ঝগড়া করিয়া আসিয়াছিল। আসিয়াই টানিতে টানিতে আমাকে লইয়া চলিল বাড়ীর ভেতরের দিকে। একটা জিনিয়া ফুল ছিঁড়িয়া বলিল, "আচ্ছা বড়মণি, এটা জিনিয়া, না ?"

গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়িলাম, "না !"

সে তো চটিয়া লাল ! বলিল, "না !—চল বীরুর কাছে।" বীরু বাগানের মালী।

স্বীকার করিলাম। দুজনেই হাসিতে মাতিয়া উঠিলাম। সে ফুলটা আমার চুলে গুঁজিয়া হাতভালি দিয়া হাসিতে লাগিল কল্‌কল্‌ ঝরণার মত ! "তোমাকে ঠিক দিদির মত দেখাচ্ছে, বড়মণি।" বলিয়াই আনন্দে আত্মহারা হইয়াই যেই পিছাইতে গিয়াছে অমনি গোলাপ চারাটি মাড়াইয়া গেল। থতমত খাইয়া বিষন্ন মুখে প্রশ্ন করিল, "তোমার দাদা তোমাকে মারবেন না তো !"

গাছটাকে উপড়াইয়া ফেলিয়া আমি হাসিয়া আশ্বাস দিলাম বটে, কিন্তু বেশ অনুভব করিলাম, যেন ভয়ে তার হৃদপিণ্ডে হাতুড়ীর ঘা পড়িয়াছে। বুঝিলাম, ছেলেটি সত্যই স্নেহবঞ্চিত।

তাহার [illegible] বার এক ভাই ছিল, এতদিন জানিতাম না। সেদিন জানিলাম। [illegible] প্রসঙ্গে আমার ঝরণা কলমটা দেখাইয়া বলিল, "বড়দারও এমনি এক[illegible] পণ্টু [illegible] একদিন ধরতেই বড়দা ওকে কি মার !"

বলিতে বলিতে চোখ দুটি [illegible] [illegible]পসা হইয়া আসিল।

"পণ্টু আবার কে ?" জিজ্ঞাসা করিলাম।

"পণ্টুকেও চেন না ? আমার ছোট ভাই।" বলিয়া আমার অজ্ঞতায় হাসিয়া ফেলিল এ দুঃখেও। হাসিটুকু তার ভারি সুন্দর, ভারি মিষ্টি।

"কোথায় সে এখন ?" আবার প্রশ্ন করিলাম।

আঙুল দিয়া সে উপরে দেখাইল। বলিল, "মা বলেছেন ওখানে আছে। বড় হলে আমিও যেতে পারব। আচ্ছা, বড়মণি, তুমি গিয়েছ কখনো ওখানে ? পণ্টুকে দেখেছিলে ?"

ঘাড় নাড়িলাম। তাহার বিশ্বাসে ঘা দিতে মন সরিল না।

লোকে কত কথাই বলে। পাগলা ঘোড়ার মুখে লাগাম পড়েছে—ভাব জমাবার নূতন ফন্দি। অনেক কথাই কাণে আসে; কাণ দিই না। চাকুরীর ভয়েই হোক, কিংবা আমার সম্ভ্রম রক্ষার্থেই হোক আকারে ইঙ্গিতে এ পর্য্যন্তই। কিন্তু সত্যই কখন যে ছেলেটার সঙ্গে জড়াইয়া পড়িয়াছি তাহা একটুও টের পাই নাই। পাইলাম একদিন যে দিন নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরও অনেকক্ষণ পার হইয়া গেল—তার দেখা নাই। কোন কাজেই মন দিতে পারিলাম না। অনাকারণ অধীর হইয়া বার বার মাঠের দিকে তাকাইতেছিলাম। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহার দেখা মিলিল না। ক্ষুন্ন মনে অফিস হইতে ফিরিতেছি। তার ছোট বোনের সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞাসা করিলাম—"হারে, তোর ভাই কোথায় ? অসুখ-বিসুখ করেনিত ?"

—"সে তো লাইনে গেছে—মহান্তিদার সঙ্গে !"

মহান্তি সেখানকার সাব-পি-ডবলিউ-ইন্‌স্‌পেক্টার। লাইন পরীক্ষা করিতে সপ্তাহে দুইবার ট্রলিতে বাহির হয়। বুঝিলাম, সেও ট্রলি চাপিয়া গিয়াছে। নিজের উচ্ছ্বাসে লজ্জিত হইয়া পড়িলাম।

দিন কয়েক পরের ঘটনা। মুখখানি তার ভার ভার। দু'এক কথা হইতে না হইতেই অহেতুক সে প্রশ্ন করিয়া বসিল, "আচ্ছা, বড়মণি, তুমি গোলাঘর যাও না ?"

"হুঁ। কেন ?" কৌতুহলী হইয়া চাহিলাম।

"এমনিই।" বলিয়া সে মাথা নীচু করিল। বুঝিলাম, কিছু বলিবে না। দোয়াত লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে এক ঝলক কালি ছিট্‌কাইয়া টেবিল ক্লথে পড়িল। সে-দিনের আলাপ আর কেন যেন জমিল না। খোকা বার বার আনমনা হইয়া পড়িতেছিল। যাইবার সময় বলিল—"দাও, টেবিল-ক্লথটা !"

"টেবিল-ক্লথ নিয়ে কি করবে ?" বিস্মিত হইলাম।

"বারে, কালি পড়েছে, ধুতে হবে না বুঝি। দাও, দিদিকে দিয়ে ধুইয়ে আনব। তুমি পারবে না।"

নিঃসঙ্গতার বেদনা আমার বুকে নূতন করিয়া বাজিল। এই এক ফোঁটা ছেলেটাও আমার ব্যথা বোঝে !

তার পরদিনই দুই দিনের জন্য কলিকাতা যাইতে হইল। শত চেষ্টাতেও কয়দিন দেরী হইয়া গেল। মাহিনা বাড়িয়াছে। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব চলিয়া যাইতেছিল, অনেক লিখালিখি করিয়া তাহার কোয়ার্টারটা পাইয়াছি। ভাবিলাম, আসিয়া প্রথমেই খোকাকে খবরটা দিতে হইবে। তাহার উল্লসিত মূর্ত্তি আমার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। সমস্ত রাস্তা খোকার কথা ভাবিয়া কাটাইলাম। ফিরিয়া দেখি, খোকারা চলিয়া গিয়াছে। হতাশার বেদনায় বুকটা ভাঙ্গিয়া পড়িল। হয়ত যাবার সময়ও আমার অফিসের দিকে তাকাইয়া গিয়াছে !

মাহিনা বাড়িয়াছে—ভাল কোয়ার্টার পাইয়াছি। তবুও মনে স্ফূর্ত্তি পাই না। যেন সবই অর্থহীন। সেই কল্‌ কল্‌ হাসি, সেই কচি মুখ কেবলই চোখে ভাসিয়া ওঠে। উঠানের ফুল গাছটা তেমনই আছে। কত ফুল ফুটিয়াছে—ঝরিয়াছে। পাতা এখন নাই। ফুলও নাই। শুধু একটি ডালে একটা কুঁড়ি—কোটার মুখে বসন্ত চলিয়া গিয়াছে। সম্মুখে ঐ দূরে পাহাড়ের চূড়া তেমনি ঝল্‌মল্‌ করিতেছে। এ হয়তো সেই ঝরণা—তেমনি রহস্যময়, তেমনি অজানা।

রাস্তায় রঙ্গমঞ্চ

শ্রীরমণ

সুদূর প্রাচ্যের দিক্‌পাল সিঙ্গাপুরের পতন-সংবাদ আমরা গতবারেই দিয়াছি। ৭ই ডিসেম্বর মার্কিনের সুরক্ষিত প্রাচ্যের ঘাঁটি 'পার্ল হারবার' জাপান কর্তৃক অতর্কিত আক্রান্ত হইবার পর, তিন মাসের মধ্যে মিত্রশক্তির মিডওয়ে, হাবাম, গোয়াম, ফিলিপাইন, হংকং, মালয়, সুমাত্রা, বোর্ণিও, বলিদ্বীপ, সেলিবিস্, ডাচ্-ইষ্ট-ইণ্ডিজ, টিমোর প্রভৃতি জাপানের অধিকারভুক্ত হইয়াছে।

প্রাচ্য রণাঙ্গনের স্থল ও জলভাগের মানচিত্র

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে জেনারেল ম্যাক আর্থার এখনও বশ্যতা স্বীকার না করিলেও উহা জাপানী কর্তৃক অবরুদ্ধ। যবদ্বীপের সরকারী দপ্তর উচ্চ পরিষদবর্গসহ অষ্ট্রেলিয়ায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। সুমাত্রা ও যবদ্বীপের এখানে সেখানে খণ্ড-যুদ্ধ এখন পর্য্যন্ত চলিলেও শীঘ্রই এই ক্ষীণ প্রতিরোধ ক্ষমতা নির্ব্বাপিত হইয়া আসিবে। যবদ্বীপের পতনের সঙ্গে সঙ্গে স-সাম্রাজ্য ওলন্দাজের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তা সাময়িক হইলেও বিলুপ্ত হইল। ইহা ভাগ্যের চরম পরিহাস বটে। দক্ষিণ বর্মার টেনাসেরিয়াম অঞ্চল পূর্ব্বেই জাপানের কবলিত হইয়াছিল। সম্প্রতি সমরোপযোগি প্রয়োজনীয় সব কিছুর ধ্বংসসাধনপূর্ব্বক মিত্রশক্তি বর্মার রাজধানী ও প্রধান বন্দর রেঙ্গুন পরিত্যাগ করিয়াছে। অবশ্য বর্মার যুদ্ধ রেঙ্গুনের সঙ্গে শেষ হয় নাই। উত্তর বর্মায় একটা প্রচণ্ডতম সংগ্রাম আসন্ন হইয়া উঠিতেছে। জাভার যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতে জাপান নিউগিনিতে সৈন্য অবতরণ করাইতে ও অষ্ট্রেলিয়ার ডারউইন বন্দরে ভীষণ বোমা বর্ষণ করিতে সুরু করিয়াছে। ইহাতে অষ্ট্রেলিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হইল বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে এবং যুদ্ধকালীন যাহা কিছু করণীয় তাহা অষ্ট্রেলিয়া বস্তুতঃ করিতেছে।

আফ্রিকার লিবিয়া রণাঙ্গণে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। সম্ভবতঃ ভাবী আক্রমণের জন্য উভয় পক্ষই তোড়জোড় করিতেছে।

রুশিয়ার বিশাল রণক্ষেত্রে রুশবাহিনীর দ্রুত অগ্রগতি আগের মত তেমন না হইলেও, শত্রুপক্ষীয় সৈন্য ও প্রচুর সমরোপকরণ-ধ্বংসকার্য্য বিশেষ উগ্র ও তীব্রভাবে চলিয়াছে। বিগত কিঞ্চিদধিক এক মাসে জার্ম্মানীর প্রায় অর্দ্ধ লক্ষাধিক সৈন্য হতাহত হইবার সংবাদ পাওয়া

গিয়াছে। দক্ষিণে ওরেল-জংসন এলাকায় জার্ম্মাণীর দুই ডিভিসন এবং উত্তরে ষ্টারায়ারাশা অঞ্চলে ১৬০০০ জার্ম্মাণ সৈন্য সম্পূর্ণভাবে পরিবেষ্টিত হইবার সংবাদ জার্ম্মাণীর পক্ষে সত্যই ভয়াবহ। দক্ষিণ রণাঙ্গণ ডোনেৎস অববাহিকা বিশেষভাবে ক্রিমিয়ায় রাশিয়া প্রচুর নূতন সৈন্য আমদানী করিয়া প্রবল আক্রমণ চালাইয়াছে। সময়ের সঙ্গে দৌড়-পাল্লায় মনে হয় এবার রাশিয়া যেন আগাইয়া চলিতেছে।

বসন্ত সমাগতপ্রায়। হিটলারের বসন্তকালীন অভিযান লইয়া সারা দুনিয়ায় জল্পনা-কল্পনায় অন্ত নাই। জার্ম্মাণীর স্তব্ধ গুমোট আকাশ একটা প্রবল ঝড়েরই পূর্ব্বাভাস। মাল্টায় ঘন ঘন বিমান আক্রমণ, ভিসি গবর্ণমেণ্টের অস্পষ্ট গতিবিধি, ফরাসী যুদ্ধ জাহাজের মাদাগাস্কারে আগমন, তুর্কীকে লইয়া কূটনৈতিক পাকচক্র, আমেরিকার ইদানীং তুষ্ণীভাব, ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার পুনর্গঠন, স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপসের ভারতাগমন, এ সবই কুহেলিকাচ্ছন্ন হইলেও অনেকে ভবিষ্যতেরই সূচনা করে।

তবুও ইউরোপ ছাড়িয়া আজ বিশ্ববাসীর দৃষ্টি জাপান তথা টোকিওর উপর। যেহেতু রণ-রঙ্গমঞ্চে বর্ত্তমানে টোকিও-দলের চমকপ্রদ [illegible] হইয়াছে। আবিসিনিয়া-বিজয়ী মুসোলিনিকে আজ মানুষ ভুলিয়াছে। আড়াই বৎসর পূর্ব্বে পোলাণ্ডের রণাঙ্গনে হিটলারের ধূমকেতুর মত আবির্ভাব ও বিগত শীতের প্র[illegible] পর্য্যন্ত তাঁহার ঝটিকাবেগসম সকল অভিযান বিশ্বে নরনারী ত্রাস-কম্পিত হইয়া দেখিয়াছে। কুশলী ষ্টালিনের নীরব মূক সমরাভিনয়-নৈপুণ্য ইদানীং নাৎসীবীর হিটলারের স্মৃতিকে ম্লান করিয়া তুলিতে না তুলিতে টোকিওর আবির্ভাব। স্বতঃই মনে জাগে, 'ততঃ কিম্'।

প্রশান্ত মহাসাগরকে অশান্ত করিয়া জাপান জটিলতম আবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত ও আংশিক ভারত মহাসাগরে জাপ-নৌবহরের আপাততঃ [illegible] গতি-পথ নিষ্কণ্টক। দক্ষিণে অষ্ট্রেলিয়া, পশ্চিমে ভারত[illegible] আর উত্তরে রুশিয়ার সাইবেরিয়া তথা ভ্লাডিভোষ্টক, এই তিন দিকের মধ্যে কোন্ দিকে অথবা যুগপৎ সব দিকেই জাপান আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ করিবে? অথবা ত্রিভুজের মধ্যে তিন সহস্রাধিক [illegible] আয়তনের সম্পদকে জাপান গুছাইয়া স্থায়ীভাবে আয়ত্ত করার জন্য মনোনিবেশ করিবে? ইহা করাই অবশ্য জাপানের স্বার্থ; কিন্তু ইচ্ছা করিলেও সে তাহা করিতে পারিবে না মিত্রশক্তিপুঞ্জের প্রতি বিরোধিতায়। অতএব স্থলে চীন-রুশের বিপুল বাধা এবং জলে ইঙ্গ-মার্কিণের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য জাপানকে সতত প্রস্তুত থাকিতে হইবে। চীনকে বিচ্ছিন্ন করার অভিপ্রায়ে জাপান সমগ্র বর্মা দখল করিতে অগ্রসর হইয়াছে। বিচ্ছিন্ন বহু স্থলভূমি ও ব্যাপক বিস্তৃত জলাঞ্চল এখন জাপানকে রক্ষা করিতে হইবে। ইহাই তাহার দুর্ব্বলতা এবং দুর্ভেদ্যতার পক্ষে হানিকর। অষ্ট্রেলিয়াকে ঘাঁটি করিয়া মিত্রশক্তি যথাশীঘ্র জাপানের উপর আক্রমণ চালাইবে। অতএব অষ্ট্রেলিয়ার সহিত বোঝাপড়া করা জাপানের প্রথম দরকার। বিপুল মহাদেশ অষ্ট্রেলিয়াকে সম্পূর্ণভাবে করায়ত্ব করা সহজসাধ্য নয়। অষ্ট্রেলিয়ার বিমান ও নৌঘাঁটি ধ্বংস করিয়া অথবা উত্তরাংশ দখল করিয়া জাপান মিত্রশক্তির অভিপ্রায় সিদ্ধির পথে বিঘ্ন ঘটাইতে চেষ্টা করিবে। এই জন্য মার্কিণের মনোযোগ অষ্ট্রেলিয়া হইতে অন্যত্র আকৃষ্ট করিবার জন্য জাপান আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। এলাস্কা, তৎসংলগ্ন দ্বীপপুঞ্জ ও উত্তর আমেরিকার নিরাপত্তার জন্য ভ্লাডিভোষ্টক তথা সাইবেরিয়া শত্রু কবলিত না হয়, ইহা দেখা আমেরিকার স্বার্থ। ভ্লাডিভোষ্টকের দিকে হুমকি পোষণ করিলেও, দক্ষিণ-পশ্চিমের আক্রমণ-পথ উন্মুক্ত ও চীনের যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া অদূর ভবিষ্যতে উহা আক্রমণ করা জাপানীর পক্ষে হঠকারিতা হইবে। অবশ্য হিটলার ইহা করিতে জাপানকে উত্তেজিত করিবে। রাশিয়া দুই দিক হইতে আক্রান্ত হইলে জার্ম্মাণীর সুবিধা। সেয়ানায় সেয়ানায় এখানে কোলাকুলি চলিয়াছে। রণনীতির দিক দিয়া জাপানও উভয় দিক হইতে আক্রান্ত হইতে চাহিবে না। এই অবস্থায় জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মিত্রশক্তির একমাত্র ঘাঁটি অষ্ট্রেলিয়ার একটা কূলকিনারা করাই জাপানের মনে থাকা স্বাভাবিক। বিশাল মহাদেশ ভারতের বিরুদ্ধে আপাততঃ সমুদ্রপথে সামরিক অভিযানের সম্ভাবনা খুবই কম, জেনারেল ওয়াভেলের এই অভিমত সমীচিন। তবে পশ্চিম হইতে আক্রমণ সম্ভাবনা প্রতিরোধ

করিবার জন্ম ভারত মহাসাগরস্থ সিংহল ও মাদাগাস্কারের প্রতি জাপানের সামরিক লক্ষ্য ... [illegible]

বর্ত্তমানে অক্ষশক্তি ও মিত্রশক্তির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করিতেছে রাশিয়া। রাশিয়াকে মিত্রশক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করা অক্ষশক্তির অনুকূল এবং এদিকে উভয়েই সজাগ। জাপানের সামরিক গবর্ণমেণ্টের অধিনায়ক টোজোর রুশ-বিরোধী মনোভাব সুস্পষ্ট। জাপ-পররাষ্ট্র-সচিব টোগোর জার্ম্মাণ-স্ত্রী স্বভাবতঃই স্বামীর রুশ-সম্পর্কিত মনোভাবের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে। নানাকারণেই দু'দিন অগ্রপশ্চাৎ রুশ-জাপান সংঘর্ষ অনিবার্য্য। রাশিয়াও নিকট ভবিষ্যতে জাপানের সহিত সংঘর্ষ এড়াইয়া চলা বাঞ্ছনীয় মনে করিলেও, যে কোন আক্রমণ প্রতিরোধে সে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। বর্ত্তমান স্বার্থের খাতিরে ও ঘটনার চাপে জাপ-জার্ম্মাণ এই দুই অক্ষশক্তির মধ্যে একটা যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করাও উভয়ের পক্ষে স্বাভাবিক। যদিও 'তানাকা পরিকল্পনা' ও 'মাইন ক্যাম্পে'র স্বপ্নবিভোর বিশ্বজয়েচ্ছু পারস্পরিক বিদ্বেষপূর্ণ এই দুই জাতির স্থায়ী মিলন অসম্ভব।

তূণ হইতে নিক্ষিপ্ত তীরের মতই সংগ্রাম স্বকীয় বেগে চলে। কোন রাষ্ট্রনায়ক ইচ্ছা করিলেও আর উহা থামাইতে পারে না। ঘটনার আবর্ত্তে যুদ্ধের অভিপ্রায়, গতি ও প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান মহাসমর রাজকীয় গণ্ডী উলঙ্ঘন করিয়া জনগণের প্রত্যন্ত সীমায় গিয়া ঠেকিয়াছে। বস্তুতঃ বিশ্ব-সংগ্রামের সামরিক ভারকেন্দ্র ইউরোপ হইতে এশিয়ায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। আজ চীন ও রাশিয়াই মিত্রশক্তির যুদ্ধজয়ের প্রধানতম আশা ও ভরসা। ইউরোপীয় যুদ্ধ প্রাচ্যে রূপ বদলাইয়াছে। রণনীতি, সমর কৌশল, মারাত্মক যান্ত্রিক সাজ-সজ্জা গণদেবতার অমোঘ সঙ্কল্পের নিকট উহার ভীষণতা হারাইয়াছে। এ পরিচয় আমরা চীন ও রাশিয়ায় পাইয়াছি। ইউরোপে একের পর এক স্বাধীন রাষ্ট্র-সমূহ অবিশ্বাস্য অল্প সময়ের মধ্যে হিটলারের পদপিষ্ট হইয়াছে। প্রাচ্যে জনগণের আন্তরিক সমর্থনাভাবে ভাড়াটিয়া সাম্রাজ্যিক বাহিনী দিনের পর দিন অসহায় গণিয়াছে। ইহাই প্রাচ্যে জাপানের দ্রুত বিজয় ও মিত্রশক্তির শোচনীয় পরাজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ। পীড়িত পরাধীনের মানসিক বিরূপতা, আত্মিক ও নৈতিক অসহযোগিতা উপেক্ষা করিয়া যে সমর-বিজয়ী হওয়া সম্ভব নয়, তাহা সাম্রাজ্যভোগী রাষ্ট্রসমূহ ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ঠেকিয়া বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঐ সব দেশের মধ্যযুগের পুরোণো জমিদারী-মন অথবা উনবিংশ শতাব্দীর বণিক্-প্রাণ এখনও মোহাচ্ছন্ন রহিলেও, প্রগতিশীল চেতনা ইহা ভাবিতে সুরু করিয়াছে। বিশ্ব-বিবর্ত্তনের ক্রমধারায় সাম্রাজ্যশক্তিসমূহ স্বতন্ত্র স্বাধীন, স্বকীয় সংস্কৃতিসম্পন্ন জাতীয়তার বৈচিত্র্য লইয়াই অখণ্ড মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হওয়াই যেন যুগ-সঙ্কেত। সংহতিবদ্ধ না হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্র যে আত্মরক্ষায় অসমর্থ তাহা আজ প্রত্যক্ষ সত্য। সাম্রাজ্যলোভী অক্ষশক্তির বিশ্বজয়ের স্বপ্ন যদি সফল হয়, তবে এই গণদেবতার জাগরণ শতাধিক বর্ষ পিছাইয়া যাইবে, ইহা অবধারিত। কালচক্রের আবর্ত্তনে চীন ও ভারত-রুশের শত কোটি মানুষ ভাবীকালে [illegible] নব্য গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডলের মেরুদণ্ড হইবে। [illegible] ডাকে অনাগত যুগকে আবার এই [illegible] অমৃত-দীক্ষা।

বিশ্বচৈতন্যের যে স্পন্দন [illegible] তিক চাঞ্চল্যের হেতু হইয়াছে তাহার অভিপ্রা[য়] অজ্ঞাত। তাই যুদ্ধের ফলাফল সত্যই 'দেবাঃ ন জান[ন্তি]।' তবে বিশ্বব্যাপী এই সংগ্রাম যে একটা নব-সৃষ্টির গর্ভবেদনা ইহা সুনিশ্চিত। গীতায় কুরুক্ষেত্র এই জন্য ধর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। বর্ত্তমান মহাস[ম]রের অন্তর্নিহিত সত্য মনীষী ওয়েলসের প্রজ্ঞা দৃষ্টি[তে] [প্র]ফলিত হইয়াছে—"No power, no governm[ent] can win the present war becau[se, pl]ainly, it has ceased to be war and d[isso]lves visibly into world revolution. It (rev[o]lution) is a greater process than war. [It] may be quickened by war." পণ্ডিত জহরলাল ঐ এক কথাই বলিয়াছেন, "This war is someth[in]g much bigger than a war and out of its [womb] all manner of changes will arise." তবুও ঐ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া ভুক্তভোগী মানুষের মন সান্ত্বনা পায় না। পুরাতন বর্ষ রক্তের ক্ষতচিহ্ন বুকে আঁকিয়া মুমূর্ষু ধরণী হইতে বিদায় লইতে চলিয়াছে, আগামী বর্ষেও রক্ত-প্লাবন সাঁতরাইয়া মানবতাকে পথ-চলিতে হইবে, ইহাই আজিকার প্রত্যক্ষ সম্ভাব্য।

সাময়িকী

বৈদেশিক সংবাদ

বৃটিশ মন্ত্রিসভার রদ-বদল:

লণ্ডনের ১৯শে ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ মিঃ উইন্সটন্ চার্চ্চিল বৃটেনের সমর পরিষদ পুনর্গঠিত করিয়াছেন। নব-গঠিত সমর-পরিষদে লর্ড বীভারব্রুক পদ গ্রহণ করেন নাই; স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ বিশিষ্ট মন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। সাত জন সদস্য লইয়া এই সমর-মন্ত্রি-পরিষদ গঠিত হইয়াছে: মিঃ উইন্সটন্ চার্চ্চিল, মিঃ সি, আর, এটেলী, স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ (হাউস অফ কমন্স-এর নেতা) স্যার জন এণ্ডারসন, মিঃ এ্যাণ্টনি ইডেন, ক্যাপ্টেন অলিভার লিটলটন্ এবং মিঃ আর্ণেষ্ট বেভিনের

সিঙ্গাপুরের নূতন নামকরণ:

জাপ ইম্পিরিয়াল হেড কোয়ার্টার্স হইতে ঘোষিত হইয়াছে যে, সিঙ্গাপুরের নূতন নামকরণ করা হইয়াছে। সিঙ্গাপুরের নূতন নাম হইয়াছে 'সোনান'। ইহার প্রাচীন নাম ছিল 'সিংহপুর'। নামের আদি অক্ষর কাল-বিপর্য্যয়ের মধ্যেও বজায় আছে।

ব্রহ্মের প্রধান সেনাপতি:

ব্রহ্ম-সচিবের সুপারিশ অনুযায়ী সম্রাট ... হইতে ব্রহ্মের জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং লেঃ জেনারেল টি, কে, হাটনের স্থানে লেঃ জেনারেল স্যার আলেক্সাণ্ডারের নিয়োগ অনুমোদন করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের যোগ্য সম্মান:

ঠাকুর সোসাইটীর সেক্রেটারীর নিকট লিখিত পত্রে মিঃ জর্জ বার্ণার্ড শ' যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তদনুযায়ী ন্যাসন্যাল পোর্ট্রেট গ্যালারীর কর্ত্তৃপক্ষ উইলিয়ম রোটেনষ্টাইন এবং স্যার মায়ারহেড বোন কর্ত্তৃক কবি রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত চিত্রাবলী উক্ত গ্যালারীতে

প্রতিষ্ঠা করিতে সম্মত হইয়াছেন। ইণ্ডিয়া সোসাইটী ঠাকুর সোসাইটীর সহযোগিতায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠাকুর লেক্‌চারশিপ-এর ব্যবস্থা করার জন্যও সচেষ্ট হইয়াছেন। স্যার মায়ারহেড বোন ঠাকুর সোসাইটির পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন।

দেশিক সংবাদ

কলিকাতায় নেতৃ-সম্মেলন:

মার্শাল চিয়াং কাইসেকের ভারত আগমনকে কেন্দ্র করিয়া একটি রাজনৈতিক তরঙ্গ আবর্ত্তিত হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি মার্শাল, জওহরলাল ও মহাত্মা কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সিরাজগঞ্জে লীগের অধিবেশন সমাপ্তির পর মিঃ জিন্নার কলিকাতায় আগমনও উল্লেখযোগ্য। পারস্পরিক আলোচনার পর, রাজনৈতিক আবহাওয়া কতখানি পরিষ্কার হইয়াছে, বোঝা যাইতেছে না।

কার্ত্তিক—চৈত্র, ১৩৪৮ : ২৬শ বর্ষ

ষাণ্মাসিক বিষয়-সূচী : বর্ণানুক্রমে লেখকের নামানুক্রমিক

[প্রঃ—প্রবন্ধ, সঃ প্রঃ—সচিত্র প্রবন্ধ, উঃ—উপন্যাস, গঃ—গল্প, কঃ—কবিতা, ভ্রঃ—ভ্রমণ কাহিনী, সঃ ভ্রঃ—সচিত্র ভ্রমণ, সঃ—সচিত্র]

চিত্র-সূচী

কার্ত্তিক

অগ্রহায়ণ

পৌষ

মাঘ

ফাল্গুন

চৈত্র